শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি

পূর্বাংশ

বইওয়ালা

কলকাতা ৪৮

SREEHATTER ITIBRITTA-PURBANGSHO

[A History of Sylhet]

By Achyutcharan Choudhury, First Edition-1910

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০০

প্রথম প্রকাশ : ১৯১০ খ্রি.

বইওয়ালার পক্ষে রানা মিত্র কর্তৃক ১৪৯, ক্যানাল স্ট্রীট, শ্রীভূমি কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত এবং বাসন্তী প্রেস, ১৯এ, ঘোষ লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত

ভূমিকা

ইতিহাসের সত্যানুসন্ধান একটি কঠিন কাজ এবং দুরূহ দায়িত্ব। সাধারণ লেখকের পক্ষে এ ধরনের ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করা সত্যিই কঠিন। কিন্তু প্রায় একশত বৎসর পূর্বে শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি সিলেটের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাসের তথ্যগুলোকে একজন গবেষকের শ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে চয়ন করেছেন। সিলেটের অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে তার নিজস্ব সত্য ও তথ্যের আলোকে আলোকিত করেছেন। একজন লেখক ও গবেষক হিসেবে তিনি যে পরিশ্রম ও প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন আজীবন তা প্রশংসার দাবিদার।

সিলেট একটি প্রাচীন জনপদের নাম। সিলেট অঞ্চলের লোকজন প্রাচীনকালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। সর্বশেষ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এম এ জি ওসমানী রণক্ষেত্রে সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। সিলেটে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৪০ সালে ভ্রমণ করে— এই অঞ্চলকে শ্রীক্ষেত্র বলে বর্ণনা করেছেন। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেট ভ্রমণকালে এই অঞ্চলকে শ্রীভূমি আখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া অঞ্চলটির শ্রী এখনও অন্তর্হিত হয়নি। বরং আরও শ্রীময়ী হয়ে উঠেছে। সারা বিশ্বে সিলেটের মানুষ বাংলার গৌরবময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ঐতিহাসিক নিদর্শন, স্থাপত্য, পুরাকীর্তি, শ্রুতি, স্মৃতি, দলিল, দস্তাবেজ, প্রাচীন শিলালিপি, ভাস্কর্য ও লিপিবদ্ধ বিবরণ সিলেটের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে থাকা প্রাচীন সভ্যতাকে শ্রী অচ্যুত চরণ চৌধুরী আমাদের জনসম্মুখে হাজির করেছেন। শুধুমাত্র এই একটি কারণে তিনি আমাদের কাছে অমর হয়ে আছেন। এখানে তার গ্রন্থের সার্থকতা।

আমি দুই যুগ ধরে ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত। আমার লিখিত রাজনগরের ইতিবৃত্ত, মৌলভীবাজার জেলার ইতিহাস ও সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। অচিরেই উভয় বাংলা ইতিহাস নিয়ে লিখিত বাংলার ইতিবৃত্ত গ্রন্থ প্রকাশের পথে। ইদানীং অনেক লেখক ও প্রকাশক ইতিহাস গবেষণা ও প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। তা বাঙালিদের জন্য আনন্দের কথা। কারণ বাঙালিরা নিজের ইতিহাস সাধারণত না পড়ে পাশ্চাত্য ইতিহাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এদিক দিয়ে এটা গর্বের কথা। বিশেষ করে সিলেটের আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত শ্রী অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখিত তিন খণ্ডে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশনার দায়িত্ব জনাব সিকদার আবুল বাশার সাহেব গ্রহণ করে যে ঐতিহাসিক কার্য সম্পাদন করতে যাচ্ছেন তার জন্য যে কোনো ইতিহাস ও ঐতিহ্যপ্রেমিক লোক হিসেবে তাঁকে অভিনন্দন জানানো উচিত। জনাব সিকদার সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের জন্য ইতিহাসবিদদের পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গ্রন্থটি বাংলার ইতিহাস সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শেকড় সন্ধানী বাঙালি মাত্রেই গ্রন্থটি সংগ্রহে রাখা উচিত। নতুন সংস্করণের বহুল প্রচার কামনা করছি।

ভূমিকার পেছনের কথা

শ্রীহট্টের ইতিহাস রচিত হয় প্রায় একানব্বই বৎসর পূর্বে। শতাব্দী প্রাচীন সেই গ্রন্থ তিনটি আলোর মুখ দেখে এক অভাবনীয় ইতিহাস সৃষ্টি করে বসে। কারণ গ্রন্থকার সেই গ্রন্থ রচনাকালে সাধারণত ঐতিহাসিকগণ যে রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করেন তিনি তার ধারেকাছেও যাননি। লেখক স্বর্গীয় অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় যে কতটুকু মমত্ববোধে পুস্তক তিনটি রচনা করেছিলেন তা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। শুধুমাত্র একজন লেখকের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়— সম্ভব তাঁর পক্ষে যাঁর হৃদয়ে প্রগাঢ় দেশপ্রেম, স্বজাতির ও দেশবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং জন্মভূমিকে যিনি মাতৃ সমতুল্য বোধ করেন। এক্ষেত্রে শ্রী চৌধুরী প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন বিশ্বাস করার কারণ আছে।

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় নিজের দেশকে তার পরিবার, সন্তান, ভাই এমনকি প্রাণাধিক স্ত্রীর ভালোবাসার উপরে স্থান দান করেছিলেন। লেখার কাজে মনোনিবেশকালে তিনি স্ত্রী, শিশুকন্যা, এক ভাই ও পুত্রকে হারান। তারা বিভিন্ন কারণে রোগ-ভোগে ঐ সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কার্যকালে একেকটি আঘাত আসতে থাকে। তাঁর লিখিত ভূমিকায় পাঠক ঘটনাগুলো দেখতে পাবেন— তাতে অশ্রু রোধ করা পাঠকের পক্ষেও সম্ভব নয়। এহেন আঘাতও শ্রী চৌধুরীকে কাজের প্রতি অনীহা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি। কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা বিবেচনা করলে তাঁকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা থাকে না। এ কাজ সম্ভব কেন হয়েছিল আজ একশত বৎসর পরে যদি প্রশ্ন তোলা যায় তার জবাব হবে শ্রী চৌধুরী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন

প্রকৃতির ভাণ্ডারেতে শ্রীহট্টের মাঝে—
কতো শোভা মনোলোভা— সর্ব্বত্র বিরাজে :
বিদেশের বর্ণনায় মুগ্ধ তনুমন—
মোহবশে দেশপানে চাইনে কখন।

তিনি বলেছেন 'তখন সংকল্প করলাম শ্রীহট্টের অতীতকথা কিছু কিছু সংগ্রহ করিব।' সেই 'কিছু কিছু' সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তাও এক বিস্ময়ের বিষয়। বিভিন্ন এলাকার প্রধান- অপ্রধান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে তথ্যের জন্য তিনি প্রথমত প্রচারপত্র বিলি করেন। উচ্চ-নিম্ন-মধ্য বংশীয় পরিবার প্রধানদের কাছে তাদের বংশের গৌরব কীর্তিগাথা সুকর্ম-দুষ্কর্ম সকল বিষয় জানতে চান। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর সচেতনতা বজায় ছিল যেন কেউ নিজের বংশের নাম কামানোর জন্য অতিরঞ্জিত ভুল তথ্য দিয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত না করেন। এক্ষেত্রে তিনি অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত প্রতিটি তথ্যকে তিনি 'ক্রস্ চেক' করেন। তা সত্ত্বেও তিনি ভুল করতে পারেন এ বিষয়ে তাঁর সতত সতর্কতা ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর বিনম্র স্বীকারোক্তি তাঁকে মহাপুরুষের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। পরিতাপের বিষয়, আজ এমন মানুষের কীর্তির কথা, তাঁর নাম আমাদের

শিক্ষিতদের অধিকাংশই জানেন না। গুণের আদর ও মর্যাদা যেখানে নেই সেখানে গুণী জন্মে না, কথাটি কী সর্বাংশে সত্য?

বাংলাদেশের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে, সারাদেশটি যদি একটি দেহ হয় শ্রীহট্ট বা আজকের সিলেট তার মস্তক স্বরূপ বলতে হবে। হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সিলেট (শ্রীহট্ট) গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শাহজালাল (রঃ) কাল থেকেই এদেশের গণমানুষের পুণ্যভূমি। কারা বাস করতেন সেখানে, কেমন ছিলেন তারা? তাদের জীবনযাত্রাসহ এলাকায় প্রচলিত সর্বপ্রকার কিংবদন্তি এই বইয়ে অতি যত্নের সাথে পরিবেশিত হয়েছে। শ্রী চৌধুরীর বিজ্ঞানমনস্কতার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিংবদন্তিগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছে। মোট কথা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পড়তে শুরু করলে শেষ না করা পর্যন্ত পাঠক স্বস্তি পাবেন বলে বোধহয় না।

অন্যদিকে পুস্তক প্রকাশের ব্যয় আজকালকার বাজার মূল্য হিসেবে কম হলেও সেকালে একেবারে কম ছিল না। প্রথমত ৯০০ কপি প্রায় ২৫০০ টাকা, সেই ব্যয়ভার বহন করাও তত্ত্বনিধির পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশেষে একজন মহানুভব ব্যক্তি কোনো প্রকার আর্থিক লাভালাভ ছাড়াই সেই টাকাটা যোগান দিয়েছিলেন এটাও ইতিহাস বটে। আজকের দিনে বর্তমান সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত কয়টির দেখা মেলে? আরও একটি দৃষ্টান্তমূলক বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন— তত্ত্বনিধি ব্যক্তি হিসেবে দেশ-জনগণ ও জাতির প্রতি কেমন দায়বোধ করতেন সেই ঘটনা তার প্রমাণ। তার জন্ম গ্রামের ডাকঘর মৈনা-ডাকঘরটি পাথারকান্দি অফিসের অধীনস্থ একটি শাখা অফিস হিসেবে চালু ছিল। পরিচালনার ঝামেলার জন্য কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হন। তখন তত্ত্বনিধি নিজেই এগিয়ে এসে তার পরিচালনার ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। কানাই বাজারের ঐ অফিসে গ্রামের পথের পাশে— জমিদারির কাছারি বাড়িতে এক কোণে বসে আম, জাম, কাঁঠাল আর বাঁশবনের ছায়ায় ঘরের কোণে লাল রঙের টিনের চিঠির বাক্স ঝুলছে; হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে পোস্ট মাস্টার 'খালি গা, পরনের ধুতি হাঁটুর ওপর তোলা' চোখে গোল ফ্রেমের চশমা এঁটে ডাকঘরের পরিত্যক্ত কাগজে ইতিহাস রচনা করছেন— কল্পনা করা যায়? কাজের প্রতি, দেশের প্রতি কতটুকু মমত্ববোধ থাকলে এমন কাজ করা যায় আজ তাও বিবেচনার দাবি রাখে।

পুস্তক প্রকাশের পর সমগ্র ভারতবর্ষে তা কেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাও ভেবে দেখবার মতো। সেকালের বিখ্যাত সব দৈনিক সাপ্তাহিক পত্র- পত্রিকা এর গুণকীর্তন করেছিল। ইংরেজি দৈনিক এমপায়ার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। গুণকীর্তন করে 'ঐতিহাসিক চিত্র', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য সংবাদ', 'অমৃতবাজার', 'আনন্দবাজার', 'ঢাকা রিভিউ', 'সম্মিলন' এরাও।

গ্রন্থ রচনায় তত্ত্বনিধি মহাশয় একাদিক্রমে পনেরো বছর ব্যয় করেন। তার বক্তব্যের কিয়দংশ উপস্থাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করি : তিনি লিখেছেন "দীর্ঘকালের চেষ্টা ও প্রায় পঞ্চদশ বৎসরের পরিশ্রমে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে অবশ্যই আনন্দিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু কয়েকটি ঘটনা মনে হইয়া আজ সে সুখ পূর্ণাঙ্গ উপভোগ করিতে পারিতেছি না। ইতিবৃত্তের কপি লইয়া যখন সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় যাইতে হয় সেই সময় মদীয় সহধর্মিণী পীড়িতা হইয়া পড়েন; আমার আগমনাপেক্ষায় তাহার সুচিকিৎসার

বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে নাই। সেই বোগেই আট মাসেব একটি শিশুপুত্র রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। 'কুসুমাঙ্গ সেই শিশুটিকে বুকে তুলিয়া লইলাম। কিছুদিনেব জন্য ইতিবৃত্ত মুদ্রণের তত্ত্বাবধান স্থগি বহিল। শিশু লইযাই ব্যস্ত থাকিতে হইল সেই সময় কনিষ্ঠ সহোদর অনিরুদ্ধ চরণ চৌধুবী (যিনি ইতিবৃত্তের জন উপকরণ সংগ্রহ কবেছিলেন) কলিকাতায় যাওয়ার জন্য উত্তেজিত কবিতে লাগিল। ... কলিকাতায় চলিলাম। কিন্তু হায়... জানিলাম না যে ইহার তাহার সহিত শেষ দেখা। বিদ্যুৎবাতায ব্যাধি সংবাদ পাইযা তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলাম। কিন্তু অনিরুদ্ধকে পাইলাম না। সে তখন দু খময সংসাবেব বন্ধনমুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

মাত্র পাঁচটি মাসের মধ্যে এই দইটি শোক ঐ কুসুমাঙ্গের ফুল্ল মুখ চাহিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিলাম। যখন তাহার বয়স এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে তখন সে অমৃতভাষে পিতাকেই 'মা' বলিয়া ডাকে। ... ইতিবৃত্তেব মুদ্রণ শেষ করিতে কলিকাতায় যাইতে হইবে— কর্তব্য আর স্নেহ উভয়ের মহাযুদ্ধে শেষোক্তই পবাজিত হইল। কলিকাতায চলিলাম। যাত্রাকালেব সেই চিত্র এখনও মন হইতে মুছে নাই। বাটীব সম্মুখে অনেব কোলে থাকিযা ফুল্ল কুসুমেব ন্যায় সে আমার পানে চাহিয়া রহিল। অল্পদিন যে 'বাবা' বলিতে শিখিযাছে, কিছুদূরে গিযা শুনিতে পাইলাম যে সে ডাকিতেছে বাবা আইও।' সাতদিন যাইতে না যাইতে তাহার জ্বর হইল আর সেই ডাক শুনিয়াই সেই ডাক বাবা আইও (এস) থামিল না, কেহই থামাইতে পারিল না। ... কাজ একরূপ শেষ করিয়া বাড়ি আসিলাম। কিন্তু তাহার পীড়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

ইতিবৃত্ত (পূর্ব্বাংশ) রূপ-মানসপুত্র পাইলাম, কিন্তু আমাব সোনার কুসুমাঙ্গকে চিরতরে হারাইলাম।"

আমরা মনে করি শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের রচনা কাহিনী নিয়েই একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব। সে যাই হোক, এই গ্রন্থ বাঙালি জাতির গৌরব; এর অবদান কোনোকালে নিঃশেষ হবে না। গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করতে পেরে আমবা গৌরবান্বিত। আশা কবি অনিসন্ধিৎসু দেশপ্রেমিক পাঠকগণ এ গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে পরান্মুখ হবে না। তাহলে আমরা নিজেদের শ্রম সার্থক মনে করব।

ভূমিকা

একে গ্রন্থ রচনা করেন অপরে তাহার ভূমিকা লিখেন, এই আজ কালকার ফেশন। আমি তদনুবর্ত্তী হইয়া এই ভূমিকার অবতারণা কবিতেছি না। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহেন যে ভূমিকা লিখিয়া তাহাকে বাড়াইতে হইবে,— তবে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণয়ন কার্য্যে আমার অল্প একটু সম্পর্ক ছিল, অতএব একটা কৈফিয়ত ও দিবার আছে; সেই নিমিত্ত এই প্রয়াস।

প্রায় আট বৎসর হইল নিম্নলিখিত চিঠিখানি শ্রীহট্ট জিলার সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

শ্রী শ্রী কাত্যায়নী শরণম্

বহুমানাস্পদ

শ্রীযুক্ত

মহোদয় সমীপেষু

বিনীতনিবেদনমিদম্—

আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের এই একটা অতিশয় অগৌরবের কথা যে তাহারা স্বদেশের কাহিনী কিছুই পরিজ্ঞাত নহেন। কোনও কোনও ব্যক্তির আবার এইরূপ মতও আছে যে এদেশে এমন কিছুই নাই যাহা জানিবার উপযুক্ত। এইরূপ অজ্ঞানতা ও ঔদাসীন্যের মূল আমাদের জড়তা এবং ইহার ফল আমাদের অবশ্যম্ভাবী অধোগতি। আমরা যে দেশে জন্মিয়াছি তাহা মহিমান্বিত, এই চিন্তাটুকু মনে আসিলেও মন উচ্চ আশায় স্ফীত হয়। সমগ্র ভারতভূমির চিন্তা করা অস্মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষমতায়ত্ত নহে, তাই ক্ষমতায় যতদূর কুলায়, আপন জিলার কাহিনী সংগ্রহ নিমিত্ত বাসন করিয়াছি, জানিনা ভগবতী সেই বাসনা কতদূর পূর্ণ করিবেন। আপাততঃ ঐ বিবরণ সংগ্রহের নিমিত্ত আপনার নিকট এই সাহায্য প্রার্থনা যে আপনার জন্মস্থান যে পরগণায় সেই পরগণা সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহের বিবরণী যতদূর পারেন সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করেন। কিরূপ বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে তাহা স্বয়ং অবধারণ করিতে পারেন। যাহা কিছু জানিতে স্বদেশীয় বা বিদেশীয় লোকের ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে এইরূপ বিবরণীর সমাদরনীয় হইবে। দিঙ্মাত্রপ্রদর্শনচ্ছলে নিম্নে কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

১. প্রসিদ্ধ স্থান—

ক. তীর্থ বা দেবালয় বা মাহাত্ম্যযুক্ত স্থান (হিন্দু-মোসলমান নির্ব্বিশেষে)।

খ. দেশ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্মস্থান বা অবস্থিতির স্থান।

গ. প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার স্থল।

ঘ. প্রসিদ্ধ উৎপন্ন দ্রব্য, আয়কর, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির স্থান।

ঙ. অন্য কোনও কারণে প্রসিদ্ধ স্থান; যথা—হ্রদ, জলপ্রপাত এবং বিখ্যাত দীর্ঘিকা, মন্দির প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তি সংবলিত স্থান।

২. প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—

(হিন্দু-মোসলমান উচ্চ-নীচকূল অথবা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে)

ক. সাধু বা সিদ্ধ পুরুষ বা ধর্ম সম্প্রদায় প্রবর্তক।

খ. বিদ্ধান (যে কোনও ভাষায় হউন) এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি (যে বিষয়ে হউন)।

গ. কবি বা গ্রন্থকার (যে কোনও ভাষায় হউন)।

ঘ. সঙ্গীতজ্ঞ, গান রচয়িতা ইত্যাদি।

ঙ. উচ্চ পদবী যুক্ত কিংবা সম্পত্তি অর্জ্জনকারী।

চ. শিল্পী, কারবারী ইত্যাদি।

ছ. বিখ্যাত বংশের প্রবর্ত্তক বা প্রসিদ্ধ পরিবারের আদি পুরুষ।

জ. অন্য কোনও কারণে প্রসিদ্ধ; যথা—দয়াবৃত্তি, বুদ্ধিব তীক্ষ্নতা, শারীরিক সামর্থ্য ইত্যাদি।

৩. ভারতবর্ষের অন্যান্যস্থলে অপ্রচলিত আচার-ব্যবহার; কোনও তাম্রশাসন বা পুরাতন মুদ্রা ইত্যাদির বিবরণী; এবং কোনও মর্যাদাশীল সামাজিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস।

দ্রষ্টব্য—

১. কোনও প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্যযুক্ত স্থান সম্বন্ধীয় বিবরণে তৎসম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। সুপ্ত তীর্থাদি বিষয়েও উল্লেখ থাকিলে ভাল।

২. কোনও গ্রাম বা পরগণার নামেব ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলেও অনেক তত্ত্ব প্রকটিত হয়।

৩. কোন দেশ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বা বিখ্যাত পরিবাবের বংশের বা সম্প্রদায়ের বিষয়ে কোনও শাসনপত্র বা ঐতিহাসিক দলিল থাকিলে তাহার উল্লেখ করা এবং উহা কোথায় কি অবস্থায় আছে সেই বিবরণ জানা আবশ্যক। 'বংশবৃক্ষ' থাকিলে ইহার নকল কিম্বা তাহা পাইবার উপায় বলাও দরকার।

৪. কোনও প্রাচীন অথবা আধুনিক কবি বা গ্রন্থকাব সম্বন্ধে লিখিবার সময়ে তৎপ্রণীত গ্রন্থের বিবরণ, উহা কোন ভাষায় লিখিত, গ্রন্থের বিষয়, গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে কিনা, হস্তলিখিত হইলে কোথায় কিরূপে প্রাপ্তব্য ইত্যাদি লিখিতে চেষ্টা করিবেন। বলা বাহুল্য, প্রাচীন-নতুন বাঙ্গলা সংস্কৃত আরব্য পারস্য পদ্য-গদ্য যে কোন গ্রন্থই হউক এই জিলার অধিবাসী কাহারও লিখিত হইলে তাহার বিবরণ সংগৃহীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কোনও গ্রন্থের লোপ হইয়া থাকিলেও গ্রন্থকার এবং গ্রন্থ বিষয়ে বিববণ জানা থাকিলে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

৫. কোন শিল্প বা উৎপন্ন দ্রব্য বিষয়ে লিখিবার কালে ঐ শিল্প বা দ্রব্য কোন জাতীয় লোকের ব্যবসায়ের অধীন, কিরূপে উহার ব্যবহার চলে ইত্যাদির বিবরণ লেখা আবশ্যক। শিল্প বা দ্রব্য লুপ্ত বা অপ্রচলিত হইলেও তদ্বিষয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত।

৬. প্রাচীন কালেব প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিবরণ লিখিতে অনেক সময় প্রবাদ বাক্যের উপব নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু যদি যথাসাধ্য সুপরীক্ষিত সত্য ঘটনাই লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত, তথাপি যেন কোনও অলৌকিক বা আপাত দৃষ্টিতে অমূলক ঘটনাবলী উপেক্ষিত না হয়। তবে বিবরণ সংগ্রাহক অবশ্যই এই সকল সম্বন্ধে স্বীয় মতামত দিতে পারেন।

৭. কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বিষয়ে লিখিতে হইলে ঐ সম্প্রদায় সম্বন্ধেও বিশেষ বিবরণ থাকা দরকার।

৮. একই স্থানের বিবরণ সংগ্রহ নিমিত্ত একাধিক ব্যক্তিকে লিখা হইয়া থাকিলেও প্রত্যেকেই স্বীয় সামার্থ্যানুরূপ সংগ্রহ করিবেন, এবং কোনও বিষয়ে অন্য ব্যক্তি লিখিয়া থাকিলেও কেহ যেন সেই বিষয়ে উপেক্ষা না করেন। বলা বাহুল্য এই সম্বন্ধে আপনি অবশ্যই দেশহিতৈষণাপ্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিবেন। যেকোনও উপায়ে দেশের গৌরবাস্পদ বিষয় সমূহ সাধারণের নিকট প্রচারিত হয় তৎপক্ষে মনোযোগী হইবেন। আপনি যদি এমন কোনও ব্যক্তির নাম জানেন যাঁহার নিকট এই সকল বিষয়ে বহুল তত্ত্ব জানিতে পারা যাইবে, তবে দয়া করিয়া অনতিবিলম্বে তাঁহার নাম ধাম (পোঃ সহ) জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। এতদ্বিষয়ে মহাশয়ের নিকট অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। জিজ্ঞাসিত বিবরণ সহ উত্তর যত সত্ত্বর হইতে পারে দিয়া বাধিত করিবেন এই প্রার্থনায়। ইতি।

সন ১৩০৯ সাল। তারিখ ১৫ই আশ্বিন।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণ ঃ
শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মণ।
(ঠিকানা শ্রীহট্ট)।

এই চিঠিখানা পাইয়া শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় আমাকে লিখিয়া জানান যে তিনি ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে 'শ্রীহট্টদীপিকা' নামক একখানি শ্রীহট্টের ইতিহাস বিষয়ক পুস্তক লিখিয়া প্রেসে পাঠাইযা দিয়াছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ঐ পুস্তক খানি প্রেস হইতে ফিরাইয়া আনিতে অনুরোধ করিয়া লিখিয়া পাঠাই যে উপরি উদ্ধৃত চিঠির উত্তরে যে সকল বিবরণী আমার হস্তগত হইবে, তত্তাবৎ তাঁহারই হস্তে সমর্পিত হইবে. এবং তিনিই মৎসংকল্পিত ইতিবৃত্ত লিখিবার জন্য বৃত হইবেন। ১৩০৯ সালে চিঠি খানি সর্ব্বত্র বিলি হয়। কিন্তু বৎসর কালের মধ্যেও আশানুরূপ বিববণী হস্তগত হইল না দেখিয়া পুনশ্চ ১৩১০ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীহট্টস্থ ইক্‌লি ক্রনিকল সংবাদপত্রে এবং কাছাড়ের শিলচর পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণ হইতে ঐতিহাসিক মালমসলা প্রার্থনা করা হয়।

তখন আমি শ্রীহট্টের স্কুল ডেপুটী ইন্সপেক্টর ছিলাম। এই নিমিত্ত যাবতীয় মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়গণ এবং সংস্কৃত চতুষ্পাঠী সমূহের অধ্যাপক মহোদয়বৃন্দ আমাকে তাঁহাদের আপনার লোক ভাবিয়াই প্রভূত পরিমাণে নানাস্থানের বিবরণী প্রদান পূর্ব্বক চিরানুগৃহীত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইটা পাঁচগাও নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত হরকিঙ্কর দাস, তরফ সুঘর নিবাসী স্বর্গীয় ঈষানচন্দ্র মজুমদার, তুঙ্গেশ্চর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, পৈল নিবাসী জমিদার মৌলভী শাহ সৈয়দ এমদাদ উল হক এবং জয়ন্তীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল, এই সকল মহাশয় ব্যক্তি এই কাজটি যেন নিজের ভাবিয়া বিশেষ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের পরগণার বিবরণী দিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীহট্ট শহরের উপকণ্ঠ নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ধর মোনশী মহোদয় শহরের ও জিলার অনেক প্রাচীন কাহিনী প্রদান করিয়া অশেষ অনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষভাবে ইঁহাদের নাম উল্লেখিত হইলেও, অপর যে সমস্ত ভদ্রলোক কৃপা করিয়া বিবরণ সংগ্রহ কল্পে আমাদের সহায়তা বিধান করিয়াছেন, মাত্র বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদেব নাম এ স্থলে উল্লেখ করা হইল না. তাঁহারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

১৩১৩ সাল পর্যন্ত যে সকল উপকরণ হস্তগত হইয়াছিল, তাহাও প্রচুর বিবেচনা না করাতে, সংগৃহীত বিবরণাবলীর একখানি সূচিপত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া ১৩১৪ সালের প্রারম্ভে বিতরণ করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য এই ছিল, যে যদি কেহ ইহাতে কোনও স্থান বা ব্যক্তি

সম্বন্ধে উল্লেখ না দেখেন, তবে তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইবেন। ইহাতেও অনেক ফল হইয়াছিল। অনেকে গতবর্ষত্রয়ে এমনকি এই বৎসরেও বহু বিবরণী পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন।

শ্রীহট্টের কালেক্টরির মোহাফেজ খানায় যে সমস্ত কাগজ পত্র হইতে বহু ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে তাহা পর্যবেক্ষণার্থ ১৩১০ সালে ডেপুটী কমিশনার সাহেব বাহাদুর নিকট আবেদন করা হয়। ১৩১১ সালে মহামান্য শ্রীযুক্ত চিফ কমিশনার সাহেবের সেক্রেটারী বাহাদুর এতদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত অচ্যুত বাবু স্বয়ং এই কাগজপত্র তদন্ত করিবার ভার গ্রহণ করিয়া প্রায় বৎসরার্দ্ধ কাল প্রভূত পরিশ্রম সহকারে ইতিবৃত্তের বহু মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াছেন। পারস্যে লিখিত অনেকগুলো সনদের সার সংক্ষেপেও সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা বংশ বৃত্তান্ত ভাগ সংকলনে বিশেষ সহায়তা করিবে।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ১ম ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, ২য় ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত, ৩য় বংশ বৃত্তান্ত, ৪র্থ জীবন বৃত্তান্ত। সম্প্রতি এই 'পূর্ব্বাংশে' ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল, 'উত্তরাংশে' অপর দুই ভাগ প্রকাশিত করিবার সংকল্প আছে, তাহা ভগবদিচ্ছার উপর এবং অনেকটা এই পূর্ব্বাংশ সাধারণ্যে কিরূপ গৃহীত হয় তাহার উপর নির্ভর করে।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত 'সচিত্র' প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অনেক স্থানে ফটো চাহিয়াও পাওয়া গেল না। যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারা গেল, তা দেওয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইতিবৃত্তের লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের গুণ কীর্ত্তন এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নহে। তথাপি এইমাত্র বলা উচিত মনে করিতেছি যে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' এই আকারে প্রকাশিত হওয়া নিতান্তই বিধিনির্দিষ্ট ছিল। তাই অচ্যুত বাবুকে গ্রন্থপ্রণেতারূপে পাওয়া গিয়াছে। এই কার্য্য যদি আমার করিতে হইত তবে অদ্যাপি উহা আদৌ রচিত হইত কিনা তাহাই সন্দেহের বিষয় ছিল— রচিত হইলেও ইহা এতবড় এবং ঈদৃশ সুপাঠ্য না হইবারই কথা ছিল। অচ্যুত বাবুর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় পুরাতত্ত্বাভিজ্ঞতা ও লিপিকুশলতা আমার নাই। যত্রতত্র পাওয়া ও দুর্ঘট। তথাপি এমন বলিতেছিনা যে এই ইতিবৃত্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। এই প্রদেশে এতদৃশ জাতীয় ইতিবৃত্ত প্রণয়নের বোধ হয় এই প্রথম উদ্যম। প্রথম বলিয়াই ইহাতে নানা ত্রুটি থাকিবার সম্ভাবনা। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ দোষভাগ বর্জন পূর্ব্বক গুণটুকু গ্রহণ করিয়া প্রণেতার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, এই প্রার্থনা।

বঙ্গাব্দা ঃ ১৩১৭

শ্রী পদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির পরিচিতি

১২৭২ সনের (১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে) ২৩শে মাঘ করিমগঞ্জের অন্তর্গত জফরগড় পরগণার মৈনা গ্রামে অচ্যুতচরণ দেব চৌধুরীর জন্ম হয়। তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৩৬০ সনের ১০ই আশ্বিন। তত্ত্বনিধির শৈশব বাল্যকাল কেটেছে মৈনার গ্রামীণ জীবন পরিবেশে। বাঁশ ও বেত বনে ঘেরা, আম-জাম-কাঁঠাল গাছের ছায়া ঘেরা নিভৃত পল্লীর নির্জন অবকাশ, আদিগন্ত উন্মুক্ত আকাশ আর পারিবারিক সরল অনাড়ম্বর জীবন প্রতিবেশের মধ্যেই তিনি বেড়ে উঠেছেন।

শৈশবে তাঁর হাতেখড়ি হয় বাড়ির পাঠশালায়। গ্রামের বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে অচ্যুতচরণ শ্রীহট্ট সরকারী উচ্চ ইংরাজী স্কুলে শিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি হন। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের ভূমিকায় তত্ত্বনিধি তাঁর বাল্যকালের কথা স্মরণ করিতে গিয়া শ্রীহট্ট সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠকালের কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া বিনোদবিহারী চক্রবর্তী ও উপেন্দ্রচন্দ্র গুহের সম্পাদনায় শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'বিবর্তন'-এর মাঘ সংখ্যায় তত্ত্বনিধি 'মনি' শীর্ষক একটি সত্যমূলক ঘটনার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্কুলের কথা উল্লেখ করেছেন। এই নিবন্ধ তিনি যখন লেখেন তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর বছর; স্মৃতিশক্তি তখন অটুট। দেহ কর্মশক্তিহীন তবুও তিনি লিখে চলেছেন। কী অসাধারণ দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তখনও তাঁর ছিল ভাবলে বিস্ময় লাগে। স্কুলের অভিজ্ঞতা বর্ণনা থেকে সে কালের সরকারি স্কুলের পারিপার্শ্বিকতার একটি ছবি এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, যার অনেক কিছুই হয়ত আজ আর নেই।

'শ্রীহট্ট শহরের উত্তরাংশে 'ঈদগার মাঠ' নামে স্থান। মহরমাদি মুসলমান পর্বকালে ঐ স্থানে বহু 'তাবুজ' একত্রিত হয়। বালকবেলা যবে শ্রীহট্টে গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ইংরেজী অধ্যয়ন করিতাম, তখন বেড়াইবার উপলক্ষে অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় আমিও কখন কখন যাইতাম। ঈদগার ময়দানে উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলা, পশ্চিম দিকে ছোট পুকুরের মত গর্ত আছে। পূর্বদিকে একটা টিলা রহিয়াছে। মধ্যে সামান্য ফাঁকা স্থান। দেড়টা বাজিলে স্কুল ছুটি হয়, তখন অনেক ছাত্রের মত কখন কখন আমিও গিয়া 'চক' (ফুল খড়ি) দিয়া ঐ কোঠার গায় নামাদি যা মনে আসিত— লিখিতাম।'

(বিবর্তন মাঘ, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)

বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনকালে অচ্যুতচরণ, প্যারীচরণ দাসের নয়াসড়ক বাসায় বসবাস করতেন। এই প্যারীচরণ উনিশ শতকের শ্রীভূমির এক উল্লেখযোগ্য মনীষী। প্যারীচরণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও সাহচর্যেই অচ্যুতচরণ চৌধুরীর কিশোর মন সাহিত্য রচনার প্রেরণা লাভ করে। পরবর্তীকালে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ রচনাকালে এবং অন্যান্য সাহিত্য কর্ম বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ছোটবেলার এই অভিজ্ঞতার কথা তিনি নির্দ্বিধায় বারবার উল্লেখ করেছেন। স্কুল জীবনে তত্ত্বনিধি তাঁর সহপাঠী হিসেবে যাঁদের পেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই সাহিত্য ও অপরাপর ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রজনীকান্ত রায় দস্তিদার, সারদাচরণ ধর, ভারতচন্দ্র দাস, প্রহ্লাদচরণ সেন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

সাহিত্য, দর্শন, বিশেষত বৈষ্ণব-দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অচ্যুত চৌধুরীর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে এই অসাধারণ পরিচয়টিকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অর্জিত শিক্ষা ও অধ্যবসায় শুধু তাঁর সাহিত্যকর্মকেই সমৃদ্ধি দান করেনি, যথার্থ শিক্ষাকে জীবনের অনুষঙ্গ রূপে গ্রহণ করে তার সার্থক ঘনিষ্ঠ আচরণটিও তাঁর মধ্যে

সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর সংসার জীবন কিংবা পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন তথ্য অবগত হওয়া যায় না। বিচ্ছিন্নভাবে লেখা কিছু চিঠিপত্র, আত্মীয়-পরিজনদের নিকট থেকে সংগৃহীত অসংলগ্ন কিছু কথা কিংবা তাঁর নিজের হাতে লেখা 'জীবন কথা' বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা বিবিধ মন্তব্য ও প্রসঙ্গ থেকে তাঁর যে পরিচয়টি পাওয়া যায় তা কোন পূর্ণ অবয়ব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় না। তাঁর প্রকৃত পরিচয়টি খুঁজে পাওয়া সম্ভব তাঁরই সৃজনশীল প্রতিভা বৈচিত্র্য আর ব্যক্তি জীবন পরিচয়ের যোগফলের মধ্যে, যার মধ্যে দিয়ে তত্ত্বনিধির জীবন ও সাহিত্যের এক পূর্ণায়ত রূপকে অনুভব করা যায়।

শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি মৈনাতেই ফিরে আসেন। গ্রামে ফি্রে এসে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যসেবা ও ধর্মসাধনায় নিয়োজিত করার সংকল্প গ্রহণ করেন; কিন্তু অভিভাবকদের চাপে পড়ে তাঁকে বিয়ে করে সংসারী হতে হয়। পারিবারিক সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র সাতাশী বছরের বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চৌধুরীর মাধ্যমে তাঁর বিবাহিত জীবনের একটি পরিচিতি খুঁজে পাওয়া যায়। সংসার ধর্মপালনের জন্য তাঁকে তিনবারই বিয়ে করতে হয়। প্রথম বিয়ে হয় লাতু গ্রামের গোবিন্দচরণ রায়ের মেয়ের সঙ্গে। প্রথমা স্ত্রী চিন্ময়ী নামে এক মেয়ে ও হেমাঙ্গ নামে এক ছেলেকে রেখে মারা যান। তারপর দ্বিতীয় বিয়ে করেন শ্রীহট্ট জিলার ফেঁচুগঞ্জ শহরের ইন্দানগরে। এই স্ত্রীও দীর্ঘ রোগ ভোগের পর মারা যান। তারপর জলডুবের জনৈক ভবানীচরণ দাসের মেয়েকে বিয়ে করে পুনরায় সংসারী হন। এই তৃতীয় স্ত্রীর দিকে বীণাপাণি এখনও বর্তমান। দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ে সুষমার সঙ্গে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায়ের বিয়ে হয়। ছেলে কুসুমাঙ্গকে শিশু অবস্থায় রেখে দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যান। মেয়ে চিন্ময়ী সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। হেমাঙ্গ ও কুসামাঙ্গ এই দুটি ছেলেই অকালে মারা যায়। তাছাড়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনিরুদ্ধ, অপর কন্যা নীলিমা, এইসব একান্ত আপনজনরা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। এই মৃত্যুর পর মৃত্যুর বেদনা তত্ত্বনিধির জীবনকে তীব্রভাবে আঘাত করে রক্তাক্ত করে তুললেও তাঁর স্থিরপ্রজ্ঞ চেতনাকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়নি।

অচ্যুত চৌধুরীর পারিবারিক জীবন যে সুখকর ছিল না তাঁর বিবাহিত জীবনের এইসব দুর্ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু সুখ শব্দের গূঢ় অর্থকে বোধ হয় তিনি এই বয়সেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবন যুদ্ধে কখনো তিনি হার মানেননি বরঞ্চ মৃত্যুর এই বেদনা থেকে তিনি জীবনকে আরো গভীরভাবে ভালোবাসতে শিখেছিলেন। এর মধ্যে থেকে যে তত্ত্বনিধিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, যে মনন ও ধী-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বকে আমরা অনুভব করি তা সন্দেহাতীতভাবে পৃথিবীর যে কোন মনীষীর ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে তুলনীয়।

সংসার জীবনে স্ত্রীদের বিয়োগ ব্যথা তত্ত্বনিধির ব্যক্তিগত জীবনকে যতখানি নিদারুণ করে তুলেছিল তার চেয়ে বেশী আঘাত তিনি পেয়েছিলেন সন্তানদের ও ভাইয়ের মৃত্যুতে। তাঁর যৌবনের সমস্ত স্বপ্নসাধই শুধু নিঃশেষে হারিয়ে যায়নি— স্নেহ-মমতার আধারগুলো, যাদের মুখ চেয়ে এক দুর্ভাগা পিতার জীবন অন্তত বিশ্বাস করে ভালোবাসতে পারে, জীবনের সমস্ত নিষ্ঠুরতাকে ভুলে গিয়ে একটু সান্ত্বনার আশ্বাস পেতে পারে, সেই মৃৎপাত্রের তৈলাধারটিও পর্যন্ত জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। এই ক্ষতি শুধু তাঁর ব্যক্তিগতই নয়, বিশেষত হেমাঙ্গের মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের পক্ষেও এক বিরাট ক্ষতি হয়ে দাঁড়ালো। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল কৈশোর-যৌবনের বয়ঃসন্ধিকালে। এই বয়সেই সে এক প্রতিশ্রুতিবান কবিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

পুত্র কুসুমাঙ্গের জীবনস্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তত্ত্বনিধির সৃষ্টিপর্বের এক ইতিহাস। এক ইতিহাস, প্রকাশের আনন্দ আর মৃত্যুর বিড়ম্বনায় বড়ই বেদনাবহ। কুসুমাঙ্গের জন্ম হয় ১৯০৯

সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি। ছেলেটির বয়স যখন মাত্র সাড়ে সাত মাস, সে সময় লেখক 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ প্রকাশনাদিব ব্যাপারে কোলকাতায়। ঠিক সে সময় কুসুমাঙ্গের মা কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। জীবনের পরম প্রাপ্তির মুহূর্তে এমন নিদারুণ আঘাত তাঁর জীবনকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, তাঁর প্রাণের ফুল্ল কুসুমও অযত্ন আর অবহেলায় ক্রমে শুকিয়ে ঝরে পড়তে লাগলো। সেই অভিশপ্ত দিনগুলোর কথা স্মরণ কবে তিনি লিখেছিলেন— 'সোনার বান্ধ বুকে লইলাম তপ্ত হৃদয় শীতল হইল। জ্বলন্ত আগুন নির্বাপিত হইল আমি যথার্থই তাহার মাতৃ পদারূঢ়া হইলাম।'

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। দেড় বছরের শিশু কুসুমাঙ্গ ১৩১৭ সনের ২৭শে কার্তিক মারা গেল। এই মৃত্যুর আঘাত তাঁকে দারুণভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এক তীব্র অপরাধবোধ তাঁকে বৃশ্চিকের মতো দংশন করেছিল। তাঁর বারবারই মনে হয়েছে এই মৃত্যুর জন্য বুঝি নিজেই দায়ী ছিলেন। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ নিয়ে তিনি যদি ব্যস্ত না থাকতেন তাহলে হয়তো সংসারের প্রতি, ছেলের প্রতি তিনি যথা কর্তব্য সম্পাদন করতে সক্ষম হতেন। এই গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তিনি গ্রন্থখানি উপসর্গপত্রে কুসুমাঙ্গের উদ্দেশ্য লেখা কটি কথা সংযোজন করতে চেয়েছিলেন.—

'উপসর্গ'

'ইতিবৃত্ত!
তোমার বক্ষে অতীতের শত কাহিনী অঙ্কিত,
তুমি স্মৃতি— সস্ফুট বিশেষ।'

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়া যে স্মৃতিপীড়ক নিদারুণ স্মৃতি সম্বল করিয়াছি সমগ্র সাগর বারি সিঞ্চনে তাহা মুছিবে না। দেড় বৎসরের মাতৃহীন পুত্র যাহাকে দিবানিশি বুকে রাখিতাম যাহার চাঁদ মুখের তুলনায় পূর্ণচন্দ্রের প্রদীপ্ত প্রভা মলিন হইয়া যাইত হায়!'

ইতিবৃত্ত গ্রন্থে এই উপসর্গ পত্র সংযোজন শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। উত্তরাংশে ভূমিকা পত্রে তিনি এই সময়কার তাঁব মানসিক অবস্থা বিবৃত করেছেন। সেই সময় তিনি তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থগুলো নিয়ে বাড়িতেই একটি লাইব্রেরী স্থাপন করেছিলেন। এই লাইব্রেরীর নাম ছিল প্রথমে 'শ্রীহরি লাইব্রেরী।' পুত্র কুসুমাঙ্গের নাম ও স্মৃতি অক্ষয় করে রাখার জন্যই তিনি তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন 'কুসুম লাইব্রেরী।'

তত্ত্বনিধির নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলে এই কুসুম লাইব্রেরী পরবর্তীকালে এক বিশাল গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। তার রক্ষণাবেক্ষণ নানা কারণে অসুবিধাজনক হয়ে উঠায় পরবর্তীকালে তিনি শ্রীহট্ট সাহিত্য পবিষদকে সমগ্র লাইব্রেরীটিই দান করেন। তখন 'কুসুম লাইব্রেরী'র সংগ্রহে প্রায় দুই হাজার বই ছিল। এই দান করার মধ্যে একটি সাধারণ শর্ত ছিল এই যে 'আমার কন্যা, জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র কেহ বাড়িতে আনিয়া বই পড়িয়া ফেরত দিতে পারিবে।' এই দান সাহিত্য পরিষদের পক্ষে গ্রহণ করে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রয়াত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ যখন প্রকাশ পেল, তাঁর জীবন থেকে হারিয়ে গেল আরেক নয়নমণি— তাঁর মেয়ে— 'হৃদয় পটের নির্মল আলেখ্য নীলিমা।' এভাবে বার বার মৃত্যু এসে তাঁর চলার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে, এই ভয়াবহতা ও আকস্মিক আঘাত তাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে কিন্তু সাধনায় নিরস্ত করতে পারেনি। তীব্র সংকটের মুখে তাঁর ধ্যান-ধারণা তাঁকে অন্তহীন জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড় করিয়েছে; আবার জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় তাঁকে সেই সংকট থেকে মুক্তি দান করেছে। সমস্ত সংশয়ের উত্তর তিনি বিশ্ববিধানেরই মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। জগৎ সংসারের নিয়ম-নীতি সম্বন্ধে তিনি অনবহিত ছিলেন না। ত্রিকালদর্শীর মতো

তাঁর স্থিতধী বোধ বিশ্ব নিয়মের সারাৎসারকে উপলব্ধি করতে পেরে গভীর দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনার আশ্বাসকে খুঁজে পেয়েছিল।

অচ্যুত চৌধুরীর কর্মজীবন মৈনার গ্রামীণ জীবন পরিবেশেরই মতো সরল অথচ বৈচিত্র্যময় ছিল। জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে বাইরে যাবার কোনো প্রলোভন তাঁর ছিল না। যদিও চৌধুরী বাড়ির, বিশেষত অদ্বৈত চৌধুরী ও তাঁর বংশধরগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্য তখন তলানিতে এসে ঠেকেছে তবু অর্থের চাইতে পরমার্থ চিন্তাই ছিল তাঁদের মৌল আদর্শ। এই পরমার্থ শুধু ঈশ্বরের সাধনায়ই নিমগ্ন ও আত্মকেন্দ্রিক ছিল না, সাধারণের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনই ছিল তাঁদের জীবনব্রত। অন্য শরিকের ঘরে অবশ্য তখন লক্ষ্মী ছিলেন অচলা। মহাকালের জমিদার আর মৈনার চৌধুরী বাড়ির যৌথ কাঠের কারবার; বনাঞ্চল থেকে খেদা করে হাতী ধরা এক বিরাট লাভজনক ব্যবসা ছিল। তত্ত্বনিধি এই লাভকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে দিনাতিপাত করে চলেছেন। ফলে স্বভাবই প্রাচুর্যের মুখ তিনি দেখেননি; এর জন্য অবশ্য কোনদিনই তাঁর কোনো আক্ষেপ ছিল না। তাঁর জীবনের মৌল লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল সাহিত্য-সাধনা ও গবেষণা। এই আরাধনায় তাঁর ইষ্ট সিদ্ধি লাভ ঘটেছিল। এই সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত জীবন পরিবেশ তিনি তাঁর গ্রাম বাড়িতেই খুঁজে পেয়েছিলেন। সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চেতনার উন্নতি ও প্রসারণের জন্যও তিনি আজীবন নিরলস প্রয়াস করে গেছেন। আজন্ম লালিত বৈষ্ণবীয় পরিবেশে, সাধুসঙ্গ ও প্রসঙ্গে এবং সাহিত্য ও সাহিত্যিক সাহচর্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এই শিক্ষা ও সহবাস তাঁকে যথার্থ এক মনীষী রূপে গড়ে তুলেছিল। তাঁর নির্মল চরিত্রের সান্নিধ্যে যাঁরাই এসেছেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন। গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে বিশেষতঃ জমিদারির প্রজাসাধারণের প্রতি তাঁর ব্যবহার এতই আন্তরিক ছিল যে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই নীচ স্বার্থকেন্দ্রিক কোনো সংঘর্ষে তাঁকে লিপ্ত হতে হয়নি। আদর্শের সঙ্গে আত্মার এমন নিবিড় একাত্মতা, মানব চরিত্রের এমন দুর্লভ গৌরবে অধিকারীই তিনি ছিলেন। সৎজন হিসেবে তার জনপ্রিয়তা তাঁকে সাধারণ্যে 'বৈষ্ণব বাবাজী' নামেই পরিচিতি দান করেছিল। ব্যক্তিগত আদর্শ, মহত্ত্ব ও সৃজনশীল সাহিত্যস্রষ্টা রূপে তিনি দুর্লভ অমরত্ব লাভ করেছেন।

শিক্ষার পাঠ শেষ করে পাকাপাকিভাবে গ্রামে বসবাস করার আগে কিছুদিন তিনি শিক্ষকতার কাজও করেছেন। তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে উত্তর শ্রীহট্টের অধিবাসী মহেন্দ্রনাথ দে পুরকায়স্থ এবং সুনামগঞ্জের রমেশচন্দ্র চৌধুরী এই দুজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সহাধ্যায়ীদের মধ্যে যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রজনীকান্ত রায় দস্তিদার, 'পরিদর্শক' সম্পাদক ভারতচন্দ্র দাস, সারদাচরণ ধর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মৈনা গ্রামে বাসকালে তিনি সেই গ্রামের পাঠশালায়ও দীর্ঘদিন শিক্ষাদানকার্যে ব্রতী ছিলেন।

তত্ত্বনিধি-লিখিত আত্মকথামূলক বিবিধ বক্তব্য থেকে জানা যায় যে তিনি সরকারের রাজস্ব আদায়ের জন্য পাথারকান্দিতে যে তহশীল অফিস রয়েছে সেখানে বেশ কিছুদিন কাজ করেছিলেন। সে সময় সংসারের বোঝা ও দারিদ্র্য তাঁকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছিল।

মৈনা গ্রামের পোষ্ট অফিস ছিল কানাইবাজার। এই অফিসটি প্রথমে চৌধুরীদের কাছারী বাড়িতেই ছিল। তখন ছিল এটি পাথারকান্দি অফিসের অধীনস্থ একটি শাখা ডাকঘর। এই অফিস পরিচালনা নিয়ে একবার ঝামেলা হয়। বিভাগীয় তদন্তের পর অফিসটি উঠিয়ে নেবার অবস্থা দেখা দিলে তত্ত্বনিধি নিজে তার পরিচালনার দায়িত্বটি কাঁধে তুলে নেন। শুধুমাত্র জনসেবার স্বার্থেই যে তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সে কথা ডাকঘরকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অচল অবস্থার ঘটনা-সূত্র থেকেই জানা যায়। কানাই বাজারের সেই পোষ্ট মাস্টারের চেহারাটা

একবার ভেবে দেখা যাক, গ্রামেব পথের পাশে জমিদারের কাছারী বাড়ির এক প্রান্তে আম-জাম কাঁঠাল আর বাঁশ বনেব ছায়ায় এক ঘরের দাওয়ায় লাল চিঠির বাক্স ঝুলছে, ঘরের ভিতরে কাঠের হাতল দেয়া চেয়ারে উপবিষ্ট পোষ্ট মাষ্টার, খালি গা, পরণে হাঁটুর উপর তোলা ধুতি, চোখে গোল তারের চশমা এঁটে একমনে ডাক বিভাগের সরকারি কাগজপত্র, Mail List, কিংবা আসাম সরকাবেব বাজস্ব বিভাগের Form-এর পৃষ্ঠায় বাজার খরচের হিসেবের সঙ্গে তন্ত্র-মন্ত্র, গুরু নামাবলী, ঠিকুজী বিচার এমনকি প্রবন্ধ ও কবিতার খসড়া লিখে চলেছেন। মনে পড়ে যায় বামপ্রসাদ সেনের কথা।

মৈনার চৌধুরী পবিবারটি ছিল বৈষ্ণব ধর্মাশ্রয়ী এক আদর্শ ভক্ত পরিবার। তাঁদেরই পূর্বপুরুষ হুলাস রাম ও আকুল রামের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের যে বীজটি উপ্ত হয়েছিল তার ধাবা একাল পর্যন্ত এই বংশের মধ্যে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে রক্ষিত আছে। পিতামহ গৌরচন্দ্র ও পিতা অদ্বৈতচরণ শুধু ব্যক্তি পরিচয়েই বৈষ্ণব নামধারী মাত্র নন, যথাযথভাবে শ্রীগৌবাঙ্গ ও অদ্বৈত আচার্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত সাধক ছিলেন। তত্ত্বনিধির জীবন চবিত্রেব মধ্যে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবজনোচিত আদর্শ ও মহিমার যে প্রকাশকে অনুভব করা যায় তা তিনি পারিবাবিক ঐতিহ্য সূত্রেই লাভ করেছিলেন।

বৈষ্ণব মহাপুরুষদের সঙ্গ ও প্রসঙ্গ তাঁর জীবন ও সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে। শ্রীপত্রিকা, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, শ্রীশ্রীবিষ্ণু-গৌরাঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ পত্র-পত্রিকা ও শ্রীধাম নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন ধামকে কেন্দ্র করে চৈতন্যধর্মাশ্রয়ী যে আন্দোলন উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিংশ শতকেব পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত প্রায় একশত বছর ধরে প্রবাহমান ছিল সেই আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট সেবক ও প্রাণপুরুষরূপেও তিনি পরিগণিত ছিলেন, অহংভাবমুক্ত, আত্মপ্রচারবিমুখ এই সদাশয় যথার্থ ভক্ত বৈষ্ণব একান্তভাবেই নিজেকে গোপন রেখে অভীষ্ঠ লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান ও সক্রিয় ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ শাখা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানই শুধু উল্লেখ্য নয়, তাঁর মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি পর্যন্ত বাংলাদেশের এই শাখা সমাজকে যথেষ্ট গুরুত্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করতে হত। এই সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল চৈতন্য আদর্শের যথাযথ রূপকে এবং তাঁর প্রদর্শিত জীবনবেদকে গ্রামীণ মানুষের মর্মে পৌঁছে দিয়ে এক আদর্শ সমাজ গঠন। ধর্মীয় গোঁড়ামী কিংবা উগ্র সাম্প্রদায়িকতা প্রচার নয়, বরং সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ উদারতা নিয়ে তত্ত্বনিধি মৈনা গ্রামেও শ্রীগৌরাঙ্গ শাখা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি ভক্তি ও বৈষ্ণব সাহিত্য সেবার জন্য বৈষ্ণব ধামমণ্ডলের পণ্ডিতবর্গ তাঁকে 'তত্ত্বনিধি' উপাধিতে ভূষিত করেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর নিঃস্বার্থ চারিত্রিক মহত্ত্ব ও বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি দর্শন করে তাঁকে 'গৌরভূষণ' অভিধায় সম্মানিত করেছেন। তত্ত্বনিধিব সাহিত্য মানসের মর্মমূলে যে আধ্যাত্ম চিন্তা ও জীবনাদর্শ সতত প্রেরণশীল ছিল তাব যথার্থ পরিচয় আমার লেখা তত্ত্বনিধির জীবনী গ্রন্থে যথাসাধ্য তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। আলোচনা পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত না হলেও এই অতি দীন উপস্থাপনাব মধ্যে দিয়ে তাঁব একটা নির্দিষ্ট পরিচিতি লাভ করা সম্ভব। পরবর্তী কালের গবেষকদেব কাছে তত্ত্বনিধি প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই প্রচেষ্টা কিছুটা সহায়ক বলে আশা রাখি।

('পূর্বপ্রান্তিক' উয়েজুল্লা রোড, দীঘলিপুখুবি পাব, গুযাহাটি, ভারত কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' পুনঃমুদ্রণ এব প্রথম খণ্ড এ পবিচিতি সংযোজিত হয়েছে। এটি রচনা করেছেন সুবীর কর। —প্রকাশক)

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ : ভৌগোলিক বৃত্তান্ত

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

তৃতীয় খণ্ড : মোসলমান প্রভাব লাউড়

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ খণ্ড : মোসলমান প্রভাব জয়ন্তীয়া

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

পঞ্চম খণ্ড : ইংরেজ প্রভাব

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম ভাগ

ভৌগোলিক বৃত্তান্ত

প্রথম অধ্যায়
জিলার সংক্ষিপ্ত কথা

অবস্থান

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমির উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তভাগে শ্রীহট্ট অবস্থিত; শ্রীহট্ট প্রাচীন বঙ্গভূমির অংশ বিশেষ। কিন্তু ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে শ্রীহট্টকে আসাম প্রদেশভুক্ত করা হয়।[১] আসাম প্রদেশের (দ্বাদশটি জিলা[২]) মধ্যে শ্রীহট্ট সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিল।

এক ত্রিংশৎ বর্ষ কাল শ্রীহট্ট আসাম সংসৃষ্ট ছিল, অধুনা (১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখ হইতে) বঙ্গদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, (দারজিলিঙ ব্যতীত সমগ্র) রাজশাহী বিভাগ, এবং ভাগলপুর বিভাগের মালদহ জিলা, আসাম প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়া (সাতাইশটি জিলাতে) পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক নব প্রদেশ গঠিত হওয়ায় শ্রীহট্টও তদন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।[৩] সুতরাং ত্রিশ বৎসরের পর শ্রীহট্ট আবার পূর্ব্ববঙ্গের অঙ্গীভূত হইল বলিতে হইবে। এই পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের পরিমাণ ফল ১০৬৫৪০ বর্গমাইল, এবং লোকসংখ্যা (১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনানুসারে) প্রায় ৩১৭০০০০০। এই প্রদেশ একজন লেফটেন্যান্ট গবর্ণরের শাসনাধীন হইয়াছে।

---

১. আইন-ই-আকবরি ও রিয়াজ-উস-সালাতিন প্রভৃতি পারস্য গ্রন্থে শ্রীহট্ট বঙ্গদেশের অন্তর্গত বলিয়া লিখিত আছে। ভক্তিরত্নাকর নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, "বঙ্গদেশ" বলিতে পূর্ব্ববঙ্গ প্রধানতঃ শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতিই বুঝাইত।

২. আসাম প্রদেশ তিনভাগে বিভক্ত ছিল: যথাঃ—
সুরমা উপত্যকা—শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলা।
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা—গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁ, দরঙ্গ, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর জিলা। পার্বত্য প্রদেশ—গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়, নাগা পাহাড় এবং লুশাই পাহাড়।
(উত্তর কাছাড় পর্ব্বতময় বলিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশেব অংশরূপে গণ্য করা যায়।)
সমগ্র আসাম প্রদেশের পরিমাণ ফল ৫৬২৪৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে) ৬১২৬৩৪৩ জন হইয়াছিল। আসাম প্রদেশ একজন চিফ্ কমিশনার কর্তৃক শাসিত হইত। শিলং সহরই আসাম প্রদেশের রাজধানী ছিল।

৩. পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ পাঁচ বিভাগে বিভক্ত হইয়াছেঃ-
ঢাকা বিভাগ-ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জিলা।
চট্টগ্রাম বিভাগ—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি জিলা।
রাজশাহী বিভাগ—দিনাজপুর, বাজশাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, মালদহ ও জলপাইগুড়ি জিলা।
সুরমা উপত্যকা বিভাগ—শ্রীহট্ট, কাছাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়, নাগা পাহাড়, লুশাই পাহাড়।
আসাম উপত্যকা বিভাগ—গোয়াল পাড়া, কামরূপ, দবঙ্গ, নওগাঁ, লক্ষ্মীপুর, শিবসাগর এবং গারো পাহাড়।
মণিপুর ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরা এই নবপ্রদেশের কবদ রাজ্য।

সীমা

শ্রীহট্ট জিলার উত্তর সীমাস্থলে খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়। পশ্চিমে পূর্ব্বদিকে কাছাড় জিলা, দক্ষিণে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, এবং পশ্চিমে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জিলা। শ্রীহট্ট জিলা উত্তর অক্ষাংশ ২৩.৫৯ হইতে ২৫.৩১ এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৯০.৫৮ হইতে ৯২.৩৮ মধ্যে অবস্থিত। শ্রীহট্ট সমুদ্রগর্ভ হইতে ৫৫ ফিট উর্দ্ধে স্থিত।

পরিমাণ ফল ও লোকসংখ্যা

শ্রীহট্ট জিলার পরিমাণ ফল (জয়ন্তীয়া সহ) ৫৪৪৩ বর্গমাইল। এই জিলার দৈর্ঘ্য পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রায় ৯০ মাইল এবং প্রস্ত উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৭৫ মাইল। সমগ্র জিলার লোক সংখ্যা (১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনানুসারে) ২২৪১৮৪৮ জন।[৪]

দেশের প্রকৃতি

শ্রীহট্ট জিলার অধিকাংশ ভূমিই সমতল প্রান্তর। স্থানে স্থানে জঙ্গলাচ্ছাদিত বালুকাময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলা আছে। প্রান্তরে বহুতর নদী প্রবাহিত; সাধারণত: নদীগুলির তীর দেশেই জনবসতি দৃষ্ট হয়। শ্রীহট্টে হাওরের সংখ্যাও কম নহে,[৫] বর্ষাকালে হাওরগুলিতে অনেক জল হয়। শ্রীহট্টের পূর্ব্বদিক ক্রমোন্নত এবং পশ্চিমাংশ নিম্ন। শ্রীহট্টের ভূমিগুলি অতি উর্ব্বরা, বৃষ্টিপাত মাত্রেই মাটি কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কাকার ধারণ করে।

শোভা

শ্রীহট্ট ঘনবসতি সমাচ্ছন্ন জনপদ হইলেও ইহার অনেক স্থান জল ও জঙ্গলাবৃত। উত্তরে খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্ব্বত এবং দক্ষিণে ত্রিপুরা পর্ব্বত উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া উভয় দিক রক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় দণ্ডায়মান, এবং সুরমা ও বরাক নদী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে; সুরমা উপত্যকার সুরম্য প্রান্তর উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত রহিয়াছে। জঙ্গলাবৃত ভূমি পশ্চিমাংশে ক্রমশঃ হ্রাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং উত্তর-পশ্চিমাংশে জলা ভূমির বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। শ্রীহট্টের প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়ন-মনোমুগ্ধকর। পাহাড়ের নীরব গভীর ভাবের বিশদ বর্ণনা, বিস্তৃত বন-সুষমার মাধুর্য্য প্রকীর্ত্তন, সহজ সাধ্য নহে। বনে বৃক্ষের সারি বৃক্ষের পর বৃক্ষ, সরল সতেজ সুদীর্ঘ, শাখায় শাখায় আকাশ সমাচ্ছন্ন। কোন কোন পুষ্টাঙ্গ বৃক্ষে স্থুলাঙ্গী লতা; লতায় লতায় ফুল,—সুন্দর দৃশ্য।

কোন পাহাড়ের যে অংশে বংশবন, তথাকার শোভা অবর্ণনীয়,—শুধু অনুভব গম্য। ঈষৎ হরিদ্রাভ নবীন নধর শ্যামল পত্রাবলী বিশোভিত বংশদণ্ডশ্রেণী সজীবতা ও সৌন্দর্য্যের জীবন্ত ছবি। ক্রোশের পর ক্রোশ—দৃষ্টি যতদূর চলে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ অতুল জলধির ন্যায় চলিয়াছে। পার নাই—সীমা নাই, দেখিতে দেখিতে দর্শকের চিত্ত অজ্ঞাতে অভিভূত,—স্তম্ভিত হইয়া পড়ে: দর্শককে আত্মহারা হইতে হয়। উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে আর একরূপ দৃশ্য, শৃঙ্গ, তাহার পর আরও

৪. লোকসংখ্যা সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় ক-পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

৫ হাওর শব্দের অর্থ প্রান্তর। বর্ষাকালে জলমগ্ন অবস্থায় ইহা সাগরের ন্যায় হইয়া পড়ে বোধ হয়, সাগর হইতে হাওর শব্দটি হইয়া থাকিবে।

(See Assam District Gazetteer Vol. II. (Sylhet) P 12.)

উন্নত শৃঙ্গ, তদুপরি বিশাল বৃক্ষরাজি,—মহামহিমাময় দৃশ্য।

শ্রীহট্টের এই অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত-চিত্ত কবি যথার্থই গাহিয়াছেন :

"প্রকৃতির ভাণ্ডারেতে শ্রীহট্টের মাঝে;
কত শোভা মনোলোভা সর্ব্বত্র বিরাজে।
প্রতিভা প্রসূত নয়, প্রকৃত বিষয়,
দেখনা পথিক গিয়ে যদি মনে লয়?

"যে দেশের বন শোভা অতুলন ভবে,
প্রকাণ্ড দীঘল দ্রুম আপন গৌরবে
উচ্চশিরঃ; ঝোপ ঝাড়ে সুষমার সীমা
বিভূষণা বনবধূ লতার মহিমা

'কত শত বনফুল কাননে ফলিত,
কত শত পুষ্পকলি কন্দরে কলিত।

বিপিনের কলকণ্ঠ সুগায়কগণ
নিত্য প্রাতে বিভু গুণ করে সংকীর্ত্তন

'অদূরে পাহাড় শোভে নীল নভঃ তলে
কত নদী নির্ঝরিণী উপবীত গলে,
অপূর্ব্ব গম্ভীর মূর্ত্তি প্রশান্ত দর্শন
শেখ দূরে, যেন যোগী যোগে নিমগন।" ইত্যাদি।

(প্যারি চরণ দাস কৃত পদ্য পুস্তক ৩য় ভাগ)

বর্ষাকালে হাওরের দৃশ্য তদ্রূপই গাম্ভীর্য্যময়। যতদূর দৃষ্টির সীমা,—বহু যোজন ব্যাপী অনন্ত জলের রাশি,—কুল নাই, কিনারা নাই, যেন বিশাল সমুদ্র। সুনীল সলিল রাশি টলটল করিতেছে; বায়ুবেগে ছলছল চলিতেছে। কখন বা হুঙ্কার করিয়া সুশুভ্র ফুৎকার ছাড়িয়া, ঊর্ম্মিরাজি প্রধাবিত হইতেছে। কোথাও বা স্থির সলিলে, নীলাম্তরণে কুমুদ কহলারাদি জলজ পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত রহিয়াছে যেন নীলাকাশে অগণ্য নক্ষত্র পুঞ্জ।

হেমন্ত ঋতুতে মাঠের শোভা,—শ্যামল দুর্ব্বাদল বিলসিত মাঠগুলির মাধুর্য্যময় দৃশ্যই বা কি মনোরম! কিন্তু সর্ব্বোপরি যখন শস্য শ্যামল ক্ষেত্রগুলি বায়ুতর লহরে লহরে ক্রমোন্নত ভাবে খেলিতে থাকে, জলের সুষমা যখন স্থলে প্রতিভাসিত হয়, তখন লক্ষ্মীর স্নেহামৃত বৈভবা, গৌরবশালিনী সেই ক্ষেত্র-সম্পত্তির মাধুর্য্যে মন মোহিত না হইয়া যায় না। তখন কবির ভাবে মন যেন গাইতে থাকে—

'শ্রীহট্ট লক্ষ্মীর হাট আনন্দের ধাম;
স্বর্গাপেক্ষা প্রিয়তর এ ভূমির নাম।'

(কবি প্যারি চরণের পদ্য পুস্তক)

জলবায়ু

শ্রীহট্টের এই সৌভাগ্য সম্পদের, প্রকৃতির এই শুভাশীর্ব্বাদের বর্ণনা বাহুল্যের সম্প্রতি আবশ্যকতা নাই; বিষয় প্রসঙ্গে তাহা ক্রমে পরিব্যাপ্ত হইবে।

শ্রীহট্টের জলবায়ু কিঞ্চিৎ আর্দ্র হইলেও ইহা স্বাস্থ্যকর। স্বাস্থ্যকারিতার একটি প্রমাণ এই যে, শ্রীহট্টের লোককে স্থানান্তরে গেলে পেটের পীড়া বা জ্বরাদিতে কিছুদিন ভুগিয়া তথাকার জলবায়ু সহ্য করিতে হয়, কিন্তু অন্যস্থানের লোক শ্রীহট্টে আসিলে তাহাদিগকে কিছুমাত্র ভুগিতে হয় না। শ্রীহট্টের গ্রীষ্মাপেক্ষা শীতের প্রভাবই অধিক। এ জিলায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির গড় বার্ষিক ১০০ ইঞ্চির কম নহে।[৬] ইহার কারণ, শ্রীহট্ট চেরাপুঞ্জির নিকটবর্ত্তী, চেরাপুঞ্জি অতি বৃষ্টির জন্য পৃথিবী খ্যাত। এই জন্যই শ্রীহট্টের জলবায়ু কথঞ্চিত আর্দ্র ভাবাপন্ন।

বৈশাখ হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্তই সাধারণতঃ বৃষ্টি হয়। কার্ত্তিক হইতেই শীত অনুভূত হইতে থাকে, এবং পৌষ মাঘ মাসে শীতের প্রাচুর্য্য উপলব্ধি হয়। ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে রৌদ্রের তাপ তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীহট্ট জিলায় রোগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু বর্তমানে ম্যালেরিয়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

জনবসতি ও বাজার

শ্রীহট্ট জিলায় (জয়ন্তীয়া সহ) ১৯১টি পরগণা আছে।[৭] শ্রীহট্ট জিলায় গ্রামের সংখ্যা প্রায় অষ্ট সহস্র। অধিবাসীর বসতিবাটীর সংখ্যা পঞ্চ লক্ষের কম নহে।

শ্রীহট্টের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য প্রায় চারিশত বাজার আছে। বাজারের সংখ্যা শ্রীহট্টে ৩৬৪টি, এবং জয়ন্তীয়ায় ২৮টি।[৮]

বিদ্যালয় ও চিকিৎসা কেন্দ্র

শ্রীহট্টবাসী জন সাধারণের সুশিক্ষার জন্য শ্রীহট্টে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও সাতটি এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে। মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪২টি, এবং মধ্য-বঙ্গ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪টি। শ্রীহট্ট জিলায় বর্ত্তমানে ৩৭টি উচ্চ প্রাথমিক এবং ৭৫১টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তদ্ব্যতীত সদরে একটি মধ্য-বঙ্গ বালিকা বিদ্যালয় ও ৮৩টি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় আছে।[৯] "শিক্ষা প্রকরণে" বিশেষ বিবরণ লিখিত হইল।

সর্ব্ব সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও সুচিকিৎসার জন্য শ্রীহট্ট জিলায় গবর্ণমেন্ট ৪৩টি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। শহরের প্রধান দাতব্য চিকিৎসালয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে।

৬. সুনামগঞ্জ সবডিভিশনেই বৃষ্টির পরিমাণ অধিক; ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তথায় প্রায় ২১০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর শ্রীহট্টে বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড়ে ১৫৭ ইঞ্চি ও করিমগঞ্জে ১৬০ ইঞ্চি। দক্ষিণ শ্রীহট্টে বৃষ্টির গড় ১০৫ ইঞ্চি এবং হবিগঞ্জে ৯৪ ইঞ্চি মাত্র।

৭. পরবর্ত্তী ১০ম অধ্যায়ে পরগণার নামাদি বিবরণ লিখিত হইবে।

৮. বাজারগুলির নাম ও অবস্থান খ-পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

৯. এ সব সংখ্যা স্থিরতর থাকার সম্ভাবনা নাই; ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ ছিল।

পোস্ট আফিস ও টেলিগ্রাফ আফিস

শ্রীহট্ট জিলায় পোস্ট আফিসের সংখ্যা বর্ত্তমানে ১৩৮টি। ইহার মধ্যে একটি হেড আফিস, ৩৪টি সব আফিস এবং ১০৩টি ব্রাঞ্চ আফিস আছে।[১০] এই ১৩৮টি পোস্ট আফিসের মধ্যে কম্বাইণ্ড আফিস ৩২টি। কম্বাইণ্ড আফিসে টেলিগ্রাফের তার সংযুক্ত থাকায় ডাকের কাজ ও টেলিগ্রাফের কাজ উভয়ই হইতে পারে। শ্রীহট্টের পোস্ট আফিস সমূহের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।

শ্রীহট্টে টেলিগ্রাফের একটি হেড আফিস আছে। তথা হইতে টেলিগ্রাফ লাইন নিম্ন শাখাগুলিতে বিভক্ত হইয়াছে।

১. শ্রীহট্ট হইতে চেরাপুঞ্জি হইয়া শিলং ও তথা হইতে গোহাটী হইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে গিয়াছে।

২. শ্রীহট্ট হইতে ছাতক হইয়া সুনামগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩. শ্রীহট্ট হইতে ফেঁচুগঞ্জ হইয়া বালাগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৪. শ্রীহট্ট হইতে পূর্ব্বদিকে শিলচর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৪-ক. শিলচর হইতে বদরপুর ও করিমগঞ্জ গিয়াছে এবং তৎপরে দক্ষিণদিকে পাথরকান্দি ও দুর্ল্লভছড়া পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৫. শ্রীহট্ট হইতে কাজলদাড়া, শমশের নগর, মোনশীর বাজার, মৌলবী বাজার ও কালীঘাট হইয়া হবিগঞ্জ পর্য্যন্ত এবং হবিগঞ্জ হইতে একশাখা মাদনা পর্য্যন্ত এবং অপর শাখা বাণিয়াচঙ্গ হইয়া মারকুলি পর্যন্ত গিয়াছে।

বিভাগ ও উপবিভাগ

শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য শ্রীহট্ট জিলাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথাঃ—

	নাম	পরিমাণ	জনসংখ্যা
১.	উত্তর শ্রীহট্ট	৮৬৩.৫০ বর্গমাইল	৪৬৩৪৭৭
২.	করিমগঞ্জ	১০৬৬.০০ "	২২৪১৮৪৮
৩.	দক্ষিণ শ্রীহট্ট	১০৬৪.০০ "	৩৭৯১৫৮
৪.	হবিগঞ্জ	৯৯৯.০০ "	৫৫৫০০১
৫.	সুনামগঞ্জ	১৪৫০ "	৪৩৩৭৫২

এই পাঁচটি সবডিভিশনের অধীনে ১৬টি পুলিশ স্টেশন বা থানা ও তদধীনে ১৫টি আউট পোস্ট বা ফাঁড়ি থানা আছে।

(বর্তমান পুলিশ থানা সমূহের নামাদি ঘ-পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

শাসনকর্ত্তা

শ্রীহট্ট জিলা একজন ডিপুটী কমিশনার কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। এই ডিপুটী কমিশনার সুরমা উপত্যকার কমিশনার সাহেবের অধীন। তদ্ব্যতীত পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট ও তাঁহার

১০. পোষ্ট আফিস সমূহের নামাদি গ-পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

সহকারী, জেইল সুপারিনটেন্ডেন্ট প্রভৃতি উচ্চ কৰ্ম্মচারিগণ আছেন। বিচার বিভাগে ডিস্ট্রিক্ট জজ ও তদীয় সহকারী এবং সবজজ ও এডিশনেল সবজজ প্রভৃতি কর্মচারী আছেন।

প্রত্যেক সবডিভিশনের ভার এক এক জন এসিস্টেণ্ট বা একস্ট্রা এসিস্টেণ্ট কমিশনারের উপর অর্পিত। সবডিভিশনেল আফিসারের অধীনে একস্ট্রা এসিস্টাণ্ট ও সবডিপুটীগণ আছেন। মোহকুমা গুলিতে দেওয়ানী বিচার কার্য্য মোন্সেফগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।

মোহকুমা গুলিতে পুলিসের ইনিসপেক্টর প্রভৃতি অবস্থিতি করেন। শ্রীহট্ট জিলায় পুলিশের ৬ জন ইনসেপেক্টর, ৪৯ জন সবইনসপেক্টর, ৪ জন হেডকনেস্টেবল ও ২৬৭ জন কনেস্টেবল বর্ত্তমান আছে। গ্রাম্য চৌকিদারের সংখ্যা বর্ত্তমানে ৫১৫৮টি।[১১]

আয়

শ্রীহট্টের গবর্ণমেণ্টেব নানা বিষয়ে আয় হইয়া থাকে। ১৯৪০ খৃস্টাব্দের মে আয় নিম্নে প্রদর্শিত হইলঃ—

ভূরাজস্ব	৮৪২৪৪৩	টাকা
ঐ (বিবিধ)	৬৩২৯৫	"
	৯০৫৭৩৮	"
জলকর	৬৬৯০০	"
বনকর	৭০৪২৫	"
আবগারী	২৬০৭০৮	"
স্টাম্প	৫৫৫৭৯২	"
রেজেস্টারী	৫৩৭০৯	"
প্রভিন্‌সিয়েলরেট্	২৩৭৪১৫	"
ইন্‌কম্ টেক্স	৫৩৫১৯	"
	২২০৪২০৬	"

১১. এই সকল সংখ্যা ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত হয়। এইগুলি অবশ্যই পরিবর্ত্তনশীল। একটা মোটামুটি ধারণা জন্মাইবার নিমিত্ত এই সকল দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাকৃতিক বিবরণ

পাহাড়

প্রস্তরময় ও বৃক্ষাদি পূর্ণ অত্যুচ্চ স্থানকে পর্ব্বত অথবা পাহাড় বলে। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানকে পর্ব্বত শৃঙ্গ বলিয়া থাকে। বিচ্ছিন্ন পাহাড় খণ্ডের নাম টিলা।

শ্রীহট্ট জিলার উত্তরে খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় শ্রেণী উন্নত শীর্ষে শ্রীহট্টের পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই অত্যুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী শ্রীহট্ট জিলার সীমা বহির্ভূত হইলেও বড় আখিয়া ও পাণ্ডুয়া পরগণা এবং মুলাগোলে ঐ পর্ব্বতের অংশ বিশেষ শ্রীহট্ট জিলা ভুক্ত হইয়াছে।

শ্রীহট্ট জিলায় অনেকটি পাহাড় আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি বিখ্যাত। এই পাহাড় গুলির মূল, শ্রীহট্ট জিলার দক্ষিণ সীমাবর্ত্তী ত্রিপুরা পর্ব্বত শ্রেণী।

১. পল্‌ডহরের বা সরসপুরের পাহাড়—শ্রীহট্ট জিলার পূর্ব্ব সীমায়, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের মধ্যে অবস্থিত। ইহা উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ; প্রস্থ কোন কোন স্থলে ১৩ মাইল। ইহার পূর্ব্বে কাছাড় জিলা, পশ্চিমে পল্‌ডহর, এগারসতী ও চাপঘাট পরগণা। ইহার উচ্চ শৃঙ্গ ছত্রচূড়া (ছাতাচূড়া) ২০৩৪ ফিট উচ্চ।

ত্রিপুরার ইতিহাস লেখক শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র সিংহ বলেন যে, ত্রিপুরার মহারাজ ছত্র মাণিক্যের নামানুক্রমে এই অত্যুচ্চ শৃঙ্গটীর নামকরণ হয়। ছত্রচূড়া হইতে পর্ব্বতের উচ্চতা ক্রমশঃ হ্রাসতা প্রাপ্ত হইয়া, উত্তরাভিমুখে বদরপুর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। মধ্যস্থানের নাম সরসপুর, এস্থানের উচ্চতা প্রায় ১০০০ ফিট; বদরপুরের নিকট উচ্চতা ৪০০ ফিটের অধিক নহে।

২. দু-আলিয়া বা প্রতাপগড়ের পাহাড়—প্রতাপগড় পরগণার মধ্যে, উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ৩০ মাইল দীর্ঘ। ইহা পল্‌ডহরের পাহাড়ের প্রায় পাঁচ মাইল মাত্র পশ্চিমে অবস্থিত; সর্ব্বাধিক উচ্চতা ১৫০০ ফিট।

৩. আদম আইল বা পাথারিয়া পাহাড়-দু-আলিয়া পাহাড়ের অল্প কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ২৮ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থ প্রায় সাত আট মাইল। ইহার পূর্ব্বে প্রতাপগড়, জফরগড় ও রফিনগর পরগণা; পশ্চিমে পাথারিয়া ও শাহবাজপুর প্রভৃতি। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ—৮০০ ফিট উচ্চ। মাধবতীর্থ নামক জলপ্রপাত এই পাহাড়ে অবস্থিত।

৪. ষাঁড়ের গজ বা লংলার পাহাড়—ইহা আদম আইল পাহাড়ের পশ্চিম দিকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। বৃষের ককুদের ন্যায় ইহার আকৃতি বলিয়া এই নাম হইয়াছে। ইহা উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ১২ মাইল দীর্ঘ। ইহার পূর্ব্বে পাথারিয়া পরগণা, পশ্চিমে লংলা। উচ্চ শৃঙ্গ-ষাঁড়ের গজ, ১১০০ ফিট উচ্চ।

৫. আদমপুরের পাহাড়—লংলার পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে; উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ২৩ মাইল দীর্ঘ। ইহার পূর্ব্বে আদমপুর, ইটা ও পশ্চিমে চৌয়ালিশ। সর্ব্বাধিক উচ্চতা ৬০০ ফিট।

ইহা ষাঁড়ের গজ হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

৬. বড়শী যোড়া বা বালিশিরার পাহাড়—ইহা আদমপুর পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিমে। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে প্রায় ২২ মাইল, প্রস্থ ৪ মাইল। ইহার পূর্ব্বে ভানুগাছ ও ছয়চিরি পরগণা, পশ্চিমে বালিশিরা ও চৌয়ালিশ প্রভৃতি এই পাহাড় ক্রমশঃ উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে; ইহা ১৫০ ফিট হইতে ৩০০ ফিট মাত্র উচ্চ, শৃঙ্গের নাম—চূড়ামণি টিলা, ইহা ৭০০ ফিট উচ্চ। এই পাহাড়ে অনেকটি চা বাগান আছে।

৭. সাতগাঁও ও বিষগাঁয়ের পাহাড়—বালিশিরার পাহাড় হইতে ৮ মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহা উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ৩০ মাইল দীর্ঘ, সর্ব্বাধিক উচ্চতা ৬০০ ফিট; ইহার পূর্ব্বে বালিশিরা, সাতগাঁও ও পচাউন প্রভৃতি পরগণা পশ্চিম তরফ, ফৈয়জাবাদ প্রভৃতি। এই পাহাড় ধীরভাবে উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইহার উপর অনেক চা বাগান আছে।

৮. রঘুনন্দন পাহাড়—ইহা জিলার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত। বিষগাঁয়ের পাহাড় হইতে প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমে, উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৮ মাইল দৈর্ঘ্য ব্যাপিয়া অবস্থিত; সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৭০০ ফিট। বিষগাঁয়ের পাহাড়ের ন্যায় রঘুনন্দন পাহাড়ও অত্যুচ্চ নহে।

এ সকল ভিন্ন বাড়ুয়া বা ইটার পাহাড়, লাউড়ের পাহাড় প্রভৃতি আরও পাহাড় আছে। লাউড়ের পাহাড়ের দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত।

টিলা সকলের মধ্যে সদরের মিনারের (মনারায়ের) টিলা, করিমগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দেউলীর টিলা প্রভৃতি বিশেষ খ্যাত।

নদী

যে জলস্রোতঃ পর্ব্বতাদি হইতে নির্গত হইয়া সাগরে পতিত হয়, তাহার নাম নদী। কোন নদী বৃহৎ নদীতে নিপতিত হইলে তাহা উপনদী নামে কথিত হয়। শ্রীহট্ট জিলায় প্রকৃত পক্ষে সকলটিই উপনদী। শ্রীহট্টে প্রধান নদী বরাক বা বরবক্র, তাহার উপনদী সমূহ লইয়া, এক বৃহৎ জল প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে।

বরবক্র

বরবক্র বা বরাক নদী মণিপুরের উত্তরে আঙ্গামীনাগা পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া, প্রথমতঃ দক্ষিণাভিমুখে মণিপুর দিয়া প্রায় ১৮০ মাইল প্রবাহিত হইয়াছে; তৎপর কাছাড় জিলায় প্রবেশ করিয়াছে। কাছাড় জিলার পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত নৌকা চলিতে পারে, তাহার উপর দিক নৌগম্য নহে। বরাক নদী কাছাড় জিলা ভেদ করিয়া, বদরপুরের কাছে শ্রীহট্ট জিলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। তথা হইতে সাত মাইল প্রবাহিত হইয়া দুই প্রধান শাখাতে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর শাখা সুরম্যা বা সুরমা নামে খ্যাত এবং দক্ষিণ শাখার নাম কুশিয়ারা বা বরাক।

১. কুশিয়ারা বা বরাক—ভাঙ্গার বাজারের নিকট মূল বরাক নদী হইতে নির্গত হইয়া, স্থানে স্থানে বিভিন্ন নামে ধারণপূর্ব্বক বাহাদুরপুরের নিকট পুনঃ দ্বিশাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

(ক) উত্তর বা প্রথম শাখা বিবিয়ানা নাম ধারণ পূর্ব্বক কালনীর সহ মিশিয়া ধলেশ্বরী নদীতে পড়িতেছে।

(খ) দক্ষিণ বা দ্বিতীয় শাখা বরাক নামেই নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ হইয়া ঐ ধলেশ্বরীতেই পড়িতেছে।

কুশিয়ারা বা বরাক নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ মাইল। মূল নদী তীরে—ভাঙ্গা বাজার, করিমগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ, মনুমুখ প্রভৃতি। বিবিয়ানা তীরে—শেরপুর, ইনায়েৎগঞ্জ, মারকলি প্রভৃতি। এই পথে শিলচর পর্য্যন্ত বারমাস ষ্টিমার চলিতে পারে। দক্ষিণ শাখা (বরাক) তীরে—নবিগঞ্জ, কালিয়ার ভাঙ্গা, হবিগঞ্জ, রতনপুর, সুজাতপুর, বাজুকা।

২. সুরমা—হরুটিকরের নিকট মূল বরাক নদী হইতে বিভক্ত হইয়া উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিমাভিমুখে সুনামগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে, তৎপর দক্ষিণাভিমুখী হইয়া দিরাই দিয়া মারকলির নিকট বিবিয়ানার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার তীরে—আটগ্রাম, কানাইরঘাট, রামদা, গোলাপগঞ্জ, সাহাগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, ছাতক, দুহালিয়া, আমবাড়ী, সুনামগঞ্জ, পাথারিয়া দিরাই, প্রভৃতি। সুরমার দৈর্ঘ্য দুইশত মাইলেরও অধিক।

(ক) কালনী বিবিয়ানার সহিত সুরমা সংমিলিত হইয়া কালনী নাম ধারণ করিয়াছে। তীরে—রণভঙ্গি।

(খ) সুরমার দ্বিতীয় এক শাখা চরণার চর, শ্যামার চর হইয়া ময়মনসিংহে প্রবেশ করতঃ আজমীরগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

৩. ধলেশ্বরী বা ভেড়ামোহানা—ইহা মূল নদী নহে, কালনী, বিবিয়ানা প্রভৃতির সংমিশ্রণে আজমীরগঞ্জ হইতে এক বিশাল জল প্রবাহ প্রায় ৪৫ মাইল ধাবিত হইয়া পরে মেঘনা নদীতে পরিণত হইতেছে। ইহা শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জিলার মধ্যে সীমারূপে প্রবাহিত হইতেছে।

তীরবর্ত্তী স্থান—আজমীরগঞ্জ, কাকাইলছেও, বিথঙ্গল, মাদনা

ইহাদের উপনদী সমূহঃ-

১. লঙ্গাই—ত্রিপুরা পর্ব্বতান্তর্গত জম্পাই পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরাভিমুখে করিমগঞ্জের তিনমাইল দক্ষিণে (লঙ্গাই ষ্টেশন) পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তৎপর দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে হাকালুকি হাওরের মধ্যে দিয়া জুড়ী নদীর সহিত একত্রে ফেঞ্চুগঞ্জের নিকট কুশিয়ারাতে পতিত হইতেছে। হাকালুকিতে লঙ্গাই নদীর নিতান্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছে। বর্ষাকালে তথায় লঙ্গাইর অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া যায় এবং হেমন্তে জল শুষ্ক হইলে, হাওরের বিভিন্ন খাতে ক্ষীণ কলেবরে অবস্থান করে। ইহার দৈর্ঘ্য জুড়ী সম্মিলন পর্য্যন্ত প্রায় ৯৫ মাইল। তীরবর্ত্তী স্থান—হাতীখিরা, বৈঠাখাল, চান্দখিরা, পাথারকান্দি, নিলামের বাজার, লাতু, জলডুপ প্রভৃতি।

২. মনু—ত্রিপুরা পর্ব্বতান্তর্গত সজ্খলং পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া উত্তর পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া মনুমুখে কুশিয়ারাতে পতিত হইতেছে।

উৎপত্তি স্থান হইতে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মাইল।

তীরবর্ত্তী স্থান—কৈলাসহর, তীরপাশা, কদমহাটা, মৌলবীবাজার, আখাইল কুড়া প্রভৃতি।

(ক) ইহার প্রধান উপনদী—ধলাই। ধলাই নদী ত্রিপুরা পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইয়া মনুর সহিত মিলিত হইতেছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০ মাইল। তীরে—কমলগঞ্জ।

৩. খোয়াই—প্রাচীন ক্ষমা নদী। ত্রিপুরা পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া উত্তর পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া হবিগঞ্জের সন্নিকটে বরাক নদীতে পতিত হইতেছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ মাইল। তীরে—জয়ন্তীয়াপুর, গোয়াইনঘাট প্রভৃতি।

৫. পিয়াইন—জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া, দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ছাতকের উত্তরে সুরমাতে পতিত হইতেছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫ মাইল। তীরে—রস্তমপুর, কোম্পানীগঞ্জ প্রভৃতি।

৬. বৌলাই—খাসিয়া পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া, দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া কংস নদের সহ সম্মিলনে ধনু নাম ধারণে ময়মনসিংহ জিলায় প্রবেশ করিয়াছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ মাইল। তীরবর্ত্তী স্থান—তাহিরপুর, জগদীশপুর, হরিহরপুর প্রভৃতি। যাদুকাটা নদী ও রক্তি নদী ইহার উপনদী।

৭. কংস—গারো পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে (ধর্ম্মপাশার নিকট) শ্রীহট্টের সীমা রেখা রূপে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বৌলাইর সহিত সম্মিলনে ধনু নামে পুনঃ ময়মনসিংহে প্রবেশ করিয়াছে। দৈর্ঘ্য ৩৫ মাইল। তীরে—ধর্ম্মপাশা, তাজপুর প্রভৃতি।

শ্রীহট্ট জিলায় আরও বহুতর নদী আছে। তন্মধ্যেঃ—

উত্তর শ্রীহট্টে	—	লুবা, বার, কুইগাঙ্গ।
করিমগঞ্জে	—	লুলা, শিংলা, কচুগাঙ্গ।
দক্ষিণ শ্রীহট্ট	—	জুড়ী, গোপলা।
হবিগঞ্জে	—	করঙ্গী, সুতাং, কলকলিয়া।
সুনামগঞ্জে	—	ধামালিয়া, পীনি, মহাসিংহ (মাসিং)।

এই সকল নদী অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।

শিংলা নদী ত্রিপুরা পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া শণ বিলে পতিত হইতেছে। কচুগাঙ্গ শণ বিল হইতে বাহির হইয়া কুশিয়ারাতে পড়িতেছে।

জুড়ী ত্রিপুরা পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া হাকালুকি হাওরের মধ্যদিয়া লঙ্গাই সম্মিলনে কুশিয়ারাতে পতিত হইতেছে। তীরে—ঘিলাছড়া বাজার।

মাসিং নদী ভরল বিল হইতে উৎপন্ন হইয়া সুরমায় পড়িতেছে।

ছড়া ও খালা—পর্ব্বত নিঃসৃত ক্ষীণকায় স্রোতকে ছড়া (Brook) বলে। শ্রীহট্টে অগণ্য পার্ব্বত্য ছড়া আছে। উদাহরণ স্থলে—উত্তর শ্রীহট্টে (সদরে)— গোয়ালি ছড়া, করিমগঞ্জে (জাফর গড়ে)-বড় ছড়া, দক্ষিণে শ্রীহট্টে (লংলায়)—পালকী ছড়া, হবিগঞ্জে (মুচিকান্দি)—বেয়াছড়ার নাম করা যাইতে পারে।

মানব কৃত স্রোতকে খাল (খাত) বলে। যথা—মৌলবী খাল,—মৌলবী আবদুর রহিম কর্ত্তৃক খনিত। এই খাল সুরমা নদীর সহিত কুশিয়ারাকে সংযুক্ত করে। ইহাতে করিমগঞ্জ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চল হইতে শ্রীহট্ট সহরে যাওয়ার রাস্তা সংক্ষেপ হয়।

আমিরউদ্দীন খাল—বরাকের সহিত ইটাখলা নদীকে সংযুক্ত করিয়াছে। এই খালে শ্রীহট্ট হইতে ঢাকা যাওয়ার পথ সংক্ষেপে হয়।

নটী খাল—ইহা মানবকৃত নহে। করিমগঞ্জে কুশিয়ারার সহিত লঙ্গাই নদীকে সংযুক্ত করিয়াছে। এই খালের নাম তত্ত্বে একটু কবিত্ব বা রসিকতা আছে। যখন লঙ্গাই নদীতে জল বৃদ্ধি হয়, তখন ইহা লঙ্গাইকে কুশিয়ারার সহিত সংযোগ করে, তখন এই স্রোতস্বতী উত্তরবাহিনী হইয়া কুশিয়ারাতে আত্মসমর্পণ করে। আবার কুশিয়ারাতে জল বৃদ্ধি হইলে নটীখাল লঙ্গাইব দিকে ফিরিয়া যায়, দক্ষিণবাহিনী হইয়া লঙ্গাইর সহিত মিলিত হয়। নটীখাল হেমন্তে শুকাইয়া যায়।

শ্রীহট্ট জিলায় খালের সংখ্যা অগণ্য। প্রায় সমস্ত খালই হেমন্তে শুষ্ক হইয়া যায়।

শ্রীহট্ট জিলায় জোয়ারের বেগ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অল্প দূর পর্য্যন্ত যৎসামান্য অনুভব হয়। নদীর বেগ প্রখর কিন্তু হেমন্ত কালে অপেক্ষাকৃত অল্প।

হাওর বা প্রান্তর

হাওর শব্দটি শ্রীহট্টেই শুনা যায়, প্রান্তর ইহার ঠিক অনুবাদ না হইলেও ইহার অনেকটা ভাব প্রকাশ করিতে পারে। বর্ষার অনতি গভীর জলমগ্ন। ভূভাগ-যাহার অধিকাংশই হেমন্তে শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাকেই এতদঞ্চলে হাওর বলে। হাওরের যে অংশে হেমন্তে জল থাকে, সেই গভীর অংশকে কি বলা যায়। বিলই প্রকৃত পক্ষে হ্রদ।[১]

উত্তর শ্রীহট্টে নিম্ন লিখিত হাওর গুলি প্রসিদ্ধঃ—

১. জিল্‌কার হাওর ও ঝিন্‌কার হাওর। শ্রীহট্ট সহর হইতে ১৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে ইছাকলস পরগণার মধ্যে অবস্থিত।

২. বাডুয়া ও হাইল্‌কা হাওর। শ্রীহট্ট সহর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে রেঙ্গা পরগণার মধ্যে এই দুই হাওর অবস্থিত।

৩. চাতল ও মৈজল। শ্রীহট্ট সহর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে গহরপুর পরগণায় অবস্থিত।

৪. বড় হাওর। শ্রীহট্ট সহর হইতে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে মোক্তারপুর পরগণায় অবস্থিত।

৫. বানাইয়া হাওর। শ্রীহট্ট সহর হইতে ২২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে দুলালী পরগণায় অবস্থিত।

৬. শউলা হাওর। শ্রীহট্ট হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বে বরায়া পরগণায় অবস্থিত।

করিম গঞ্জের প্রসিদ্ধ হাওরঃ—

১. শণ বিল। ইহার উত্তরাংশের নাম রাতা বিল।[২] শ্রীহট্ট সহর হইতে ৪০ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণে এগারসতী পরগণা মধ্যে অবস্থিত।

২. হাকালুকি হাওর। শ্রীহট্ট সহর হইতে ২২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে পাথারিয়া পরগণায় অবস্থিত। শ্রীহট্টের পূর্ব্বাংশে ইহাই বৃহত্তম হাওর।

দক্ষিণ শ্রীহট্টের প্রধান হাওরঃ—

১. হাইল হাওর—এই প্রসিদ্ধ হাওর শ্রীহট্ট সহর হইতে প্রায় ৪৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে চৌয়াল্লিশ পরগণা মধ্যে অবস্থিত।

২. কাওয়া দীঘির হাওর—এই হাওর শ্রীহট্ট সহর হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ইটা ও শমশের নগর এই উভয় পরগণায় অবস্থিত।

হবিগঞ্জের প্রসিদ্ধ হাওর গুলিঃ—

১. মাকাল কান্দির হাওর—শ্রীহট্ট সহর হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাণিয়াচঙ্গ পরগণায় অবস্থিত।

---

১. সংস্কৃত বিল শব্দের অর্থ গর্ত্ত। "হাওর" শব্দটি বোধ হয় "সাগরের" অপভ্রংশ। ফলতঃ বর্ষায় হাওর গুলিকে এক একটি ক্ষুদ্র সাগরের ন্যায় দেখায়।

২. পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই দিকে পাহাড় থাকায় এই বিল অগ্রসর ও সুদীর্ঘ এবং গভীর ও তরঙ্গ সঙ্কুল হইয়াছে। এই বিল সম্বন্ধে প্রবাদ বাক্য এই—

"শণ বিলে নড়ে চড়ে, রাতায় পরাণে মারে।"

২. কাগাপাশা ও ঘোলডুবার হাওর—শ্রীহট্ট সহর হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বাণিয়াচঙ্গ পরগণায় অবস্থিত।

৩. ঘুঙ্গিয়া জুরি—শ্রীহট্ট সহর হইতে ৩৬ মাইল দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমে তরফ ও মান্দার কান্দি পরগণার মধ্যে অবস্থিত।

সুনামগঞ্জের অধীন হাওর গুলিঃ-

১. দেখার হাওর—শ্রীহট্ট হইতে ৩০ মাইল পশ্চিম উত্তরে পাগলা পরগণায় অবস্থিত।

২. শনির হাওর—শ্রীহট্ট সহর হইতে ৫০ মাইল পশ্চিম উত্তরে লাউড় পরগণায় অবস্থিত।

৩. জয়ার হাওর—শ্রীহট্ট সহর হইতে পশ্চিম উত্তরে ৩০ মাইল দূরে লক্ষ্মণ শ্রী (লক্ষ্মণ ছিরি) পরগণায় অবস্থিত।

৪. জামাই কাটা, নলুয়া, পরুয়া, মহাই হাওর—শ্রীহট্ট সহর হইতে ২৫ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে আতুয়াজান পরগণাতে এই হাওরগুলি অবস্থিত।

৫. টেঙ্গুয়ার হাওর—শ্রীহট্ট সহর হইতে ৫৫ মাইল পশ্চিম উত্তরে বংশীকুণ্ডা পরগণায় অবস্থিত।

৬. টগার হাওর—শ্রীহট্ট সহর হইতে ৬০ মাইল পশ্চিমে সেলবরষ পরগণায় এই হাওর অবস্থিত।

এতদ্ভিন্ন উত্তর শ্রীহট্টে—লঙ্গুয়ার হাওর; করিমগঞ্জে—মুড়িয়া; দক্ষিণ শ্রীহট্টে—ডেকার হাওর; হবিগঞ্জে—হরিপুরের হাওর এবং সুনামগঞ্জে—মাটি আইল প্রভৃতি আরও বহুতর হাওর আছে।

হাকালুকি সম্বন্ধে গল্প

হাকালুকি হাওরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য জনশ্রুতি আছে;-অতি প্রাচীন কালে ঐ স্থান সমভূমি ছিল। তথাকার অধিবাসী কয়েকটি ব্রাহ্মণ সদাচার সম্পন্ন না থাকায় যথেচ্ছাচারে শিবপূজা করিতেন। একটি নীচ জাতীয়া দাসী অশুচিভাবে পুষ্পচয়ন করিত; কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ এই সকল ব্যবহারে অন্তরে ব্যথা পাইতেন ও শুদ্ধভাবে শিবপূজা করিতেন। অবশেষে যখন তাহাদের পাপের ভরা পূর্ণ হইল, তখন একদা সেই শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণকে স্থানান্তরে পলাইয়া যাইতে দৈবাদেশ হইল। এ দিকে হঠাৎ দৈব উৎপাত উপস্থিত হইল, এক সঙ্গে ঝড় ও ভূকম্প ভীমবেগে প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করিল, দেখিতে দেখিতে সেই স্থান অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রবাদানুসারে সেই স্থানেই হাকালুকি হাওর হইয়াছে।[৩]

ডেকার হাওর সম্বন্ধে গল্প

ডেকার হাওর সম্বন্ধেও একটা গল্প প্রচলিত আছে, এ গল্পটি আরও অলৌকিক। প্রবাদ এইঃ- বরশীযোড়া পাহাড়ের নিকটস্থ হিন্দুরাজার দীঘী হইতে এক স্বর্ণকান্তি বৃষ উত্থিত হইত ও নিকটস্থ সুন্দরনাথ নামক ব্যক্তির পালিত একটা বৃষের সহিত যুদ্ধ করিত। একদা সুন্দরনাথের বৃষের শৃঙ্গাঘাতে আতিবাহিক বা দৈব দেহধারী সেই বৃষ পরাজিত হয় ও দশহাল গ্রামের পশ্চিমদিকে মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহে। তদবধি আর তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে দেখা যায় নাই।

৩. হাইল হাওর সম্বন্ধেও তদনুরূপ গল্প শুনা যায়। এবং পলায়িত ব্রাহ্মণই ছত্রবটের চৌধুরীদিগের আদি পুরুষ বলিয়া উক্ত হন।

হাকালুকি (খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর) বৈদিক তাম্রফলকোক্ত "হাঙ্কলা কৌকিকাং পুরীং" দ্বারা নির্দ্দেশিত ভূভাগ। তখন বোধ হয়, উহা জনপদ ছিল। ভূকম্পাদিতে যে উচ্চ নীচ হয়, তাহার প্রমাণ ১৩০৪ সালেই পাওয়া যায়।

অল্পবয়স্ক বৃষকে এতদঞ্চলে "ডেকা" বলে; দুইটি ডেকার যুদ্ধ হইতে এই হাওরের নাম ডেকার হাওর হইয়াছে।

হ্রদ

শ্রীহট্টে প্রকৃত হ্রদ নাই। নবিগঞ্জের নিকটস্থ "অমৃতকুণ্ড" শ্রীহট্ট জিলায় প্রকৃত হ্রদপদবাচ্য হইতে পারে। অমৃতকুণ্ডের জল অতি পরিষ্কার, চতুর্দ্দিকের যে সকল লোকে তাহা পান করে, তাহাদের ওলাউঠা প্রভৃতি ব্যাধি প্রায়ই হয় না। ইহা একটি পবিত্র জলাশয় পবিণত হইয়াছে; বারুণী যোগে বহুতর লোক অমৃতকুণ্ডে স্নান তর্পণাদি করিয়া থাকে। বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান বংশীয়গণ পূর্ব্বে অমৃত কুণ্ডের জল নেওয়াইয়া পান করিতেন।

উৎস ও প্রস্রবণ

পণা—লাউড়ের পণা একটি প্রসিদ্ধ ঝরণা, ইহা একটি তীর্থ বিশেষ; বারুণী যোগে বহুলোক পণাস্নানে যায়।

ফুলতলীর প্রস্রবণ—দিনাবপুরের ফুলতলির প্রস্রবণটিও বিশেষ বিখ্যাত।

ঠাণ্ডাকুয়া—বারপাড়া পরগণায়। এই উৎসের জল শীতল বলিয়া ঠাণ্ডাকুয়া নামে আখ্যাত।

দরগা মহলার উৎস—এই উৎসটি বিশেষ বিখ্যাত, মোসলমানগণ ইহার জল অতি পবিত্র মনে করেন। ইহা ইষ্টক দ্বারা বাঁধান। শাহজালাল এই উৎসের জল ব্যবহার করিতেন।

নয়া সড়কের উৎস—এই উৎসের জল ঈষৎ উষ্ণ।

এই দুইটি উৎস সদরে অবস্থিত, সদরের গাণিছড়াব কাছে আর একটি উৎস আছে।

তপ্তকুণ্ড—জয়ন্তীয়ার হরিপুরে (সরকারী ডাক বাঙ্গালাব সন্নিকট) আর একটি আশ্চর্য্য উৎস আছে। ইহার আয়তন প্রায় দেড় কেদার ভূমি ব্যাপী। কুণ্ডটি সমতল বিশিষ্ট নহে, পশ্চিমোত্তরাংশে গভীরতা অধিক। কুণ্ডের জল উষ্ণ নহে—শীতল, কিন্তু জলতলস্থ ভূমি অতি উত্তপ্ত—মুহূর্ত্তকালও দাঁড়ান যায় না। ভূমিতে পদসংলগ্ন না করিয়া সন্তরণ করিলে কোনও কষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ কুণ্ডতলে ভূগর্ভে কোনরূপ উত্তাপযুক্ত দাহ্য পদার্থ আছে। বর্ষাকালে এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে জল হয়, এবং কুণ্ডটি ১০/১২ হাত জলের নীচে পড়িয়া যায়। বারুণীযোগে এ স্থানেও কেহ কেহ স্নান তর্পণ করে।

প্রপাত

শ্রীহট্টের পাহাড়গুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্রপাত আছে। আদম আইল পাহাড়ের "মাধব" নামক প্রপাতটি বিশেষ বিখ্যাত। প্রায় শতাধিক হস্ত উর্দ্ধ হইতে প্রবলবেগে জল পতিত হইতেছে। বৃষ্টি হইলে বহুদূর হইতে জল পতন শব্দ শ্রুত হওয়া যায়।

মরুভূমি

প্রকৃতির লীলানিকেতন শ্রীহট্টে, মরুভূমিরও একটা নমুনা ক্ষেত্র আছে। লাউড় পরগণায় যাদুকাটা নদীর পার্শ্বদেশে কিয়ৎ পরিমাণ স্থান ব্যাপী এক খণ্ড বালুকাময় ভূমি আছে; তাহাতে বৃক্ষাদি কিছুই জন্মে না। শ্রীহট্টে এইরূপ বালুকাময় স্থান আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাকে ক্ষুদ্রায়তন মরুভূমির নমুনা বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষিজাত দ্রব্য

ধান্যাদি

শ্রীহট্ট বৃষ্টি-মাতৃক দেশ। বৃষ্টির জলই এখানে কৃষি কার্য্যের পক্ষে প্রচুর হয়। শ্রহিট্ট জিলার ভূমিতে সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কোন কোন স্থলে চারা ভূমিতে ও রবিশস্যের জন্য সামান্যরূপে সার ব্যবহারের প্রচলন আছে। এক মাত্র গোবরই সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আশু ও শালি ধান্য

শ্রীহট্টের সর্ব্বপ্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান্য; বহু জাতীয় ধান্য শ্রীহট্টের উর্ব্বর ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়। অনতি উচ্চভূমিতে নানা জাতি শালি ধান্য ও আশু ধান্য জন্মে। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত আশু ধান্যের সময়; শীঘ্র উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম আশু ধান্য। "দুমাই" নামক আশু ধান্য দুই মাসে জন্মিয়া থাকে।

নিম্নভূমিতে আছরা, বাগদার প্রভৃতি ধান্য জন্মে। জলাভূমে আমন, কাতারিয়া, আমনবাদাল জন্মে। জল বৃদ্ধির সহিত ধান্যের চারাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কোন কোন স্থলে ১৫/২০ হাত পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। যে নিম্নভূমিতে হেমন্ত কালেও কিছু কিছু জল থাকে, তথায় "শাইলবোর" জন্মিয়া থাকে। এ ধান্য পৌষ মাসে রোপণ করতঃ চৈত্র বৈশাখ মাসে কাটিয়া থাকে। সুনামগঞ্জে ও হবিগঞ্জেই ইহা অধিকরূপে জন্মিয়া থাকে।

বিরণী ধান্য অনতি উচ্চভূমে জন্মে। বিরণী কেবল পিষ্টকান্ন প্রস্তুত জন্যই ব্যবহৃত হয়।

রবি শস্য ও ইক্ষু

ধান্য ব্যতীত সর্ষপ, তিসি, মূলাবীজ, তিল, কলাই, মুগ প্রভৃতি রবিশস্য মধ্যে প্রধান ও প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে।

ইক্ষুর চাষও মন্দ হয় না, করিমগঞ্জে সবডিভিশনের দক্ষিণে, দক্ষিণ শ্রীহট্টে এবং হবিগঞ্জে প্রধানতঃ ইক্ষুর চাষ হয়। খাগড়া, ধল ও বোম্বাই এই তিন জাতীয় ইক্ষু সচরাচর চাষ করা হয়।[১]

---

১. ১৯০০-১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসরে ধান্যাদি চাষের কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।

শস্য	১৯০০-১ অব্দে যত একর	১৯০৩-৪ অব্দে যত একর	মন্তব্য
ধান্য	১৯৬৬৯৩০	২৪৯৩০২০	বৃদ্ধি
সর্ষপ	৩৮৪৩৩	৩৭০০০	হ্রাস
তিসি	৬৮৪৩৩	৬৯০০০	বৃদ্ধি
ইক্ষু	১১৩৪৬	১৫০০০	বৃদ্ধি
কলাই মুগ	৫৫২৮	৩০০০	হ্রাস
নানাবিধ	৪১০৪২৭	২৯৮৮২০	হ্রাস

শন ও পাট

শন নদীতীরেই সামান্যরূপ উৎপন্ন হয়, ইহার সূত্র সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী। শণসূত্র জাল প্রস্তুত কার্য্যেই ব্যয়িত হইয়া যায়। শ্রীহট্ট জিলায় পাটের চাষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। উত্তর শ্রীহট্ট হবিগঞ্জ ও দক্ষিণ শ্রীহট্টে এবং কুশিয়ারা ও মনুতীরেই ইহার চাষ অধিক হইয়া থাকে। ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৩০০০ একর ভূমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল।

তামাক

তামাক তরফ পরগণায় এবং অন্যান্য আনেও কিয়ৎ পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ফল-মূল

কমলা

শ্রীহট্টের কমলা অতি বিখ্যাত। এরূপ মিষ্ট রসাত্মক কমলা ভারতবর্ষের অন্যত্র জন্মে না। কমলার গাছ ১২-১৪ ফিটের অধিক উচ্চ হইতে দেখা যায় না, কমলার পত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; গাছ দেখিতে অতি সুন্দর। চেলা প্রভৃতি স্থানে কমলার বৃহৎ বৃহৎ বাগান আছে। ফলবান কমলা বাগানের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইবে না এরূপ লোক অতি বিরল। কমলা প্রধানতঃ খাসিয়া পাহাড়ে জন্মিয়া থাকিলেও শ্রীহট্টের জয়ন্তীয়া, পঞ্চখণ্ড প্রভৃতি স্থানেও ইহা নূন্যাধিক জন্মিয়া থাকে। পৌষ ও মাঘ মাস কমলা পাকিবার সময়; সুপক্ক কমলা দেখিতে অতি সুন্দর। কমলার শত বার আনা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হয়।[২] বর্ত্তমান রেইলওয়ে যোগে বহু পরিমাণে কমলা রপ্তানি হওয়ায় মূল্য বর্দ্ধিত হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ শাসন বিবরণীতে দৃষ্ট হয় যে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে ১৩৫২১৩ মন কমলা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল।

আনারস

শ্রীহট্টের আনারস বঙ্গ বিখ্যাত। আনারস যে এত সুমিষ্ট উপাদেয় হইতে পারে, ইহা বিদেশীয়ের ধারণাতীত।[৩] এই মিষ্ট রসাত্মক ফলের জন্মস্থান শ্রীহট্টের জলডুব ও পঞ্চখণ্ড। টীলা ভূমিতে আনারসের বাগান হয়। আনারস আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে পরিপক্ক হইয়া থাকে। আনারসের শত সাধারণতঃ দুই টাকা হইতে চারি টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। বর্ত্তমান রেইলওয়ে যোগে আনারসের রপ্তানি বর্দ্ধিত হওয়ায় মূল্যও বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভুবি বা লটকাফল

জলডুব, পঞ্চখণ্ড ও কুশিয়ার কুল প্রভৃতি স্থানের ভুবিফলও উত্তম বটে। ভুবি একরূপ বন্য ফল বিশেষ। ইহা ঈষৎ অম্লমধুররসাত্মক, আকার সুপারি সদৃশ। পাইকারী মূল্য প্রতি ধামা বা টুকরি তিন চারি আনা মাত্র।

---

২. আইন-ই-আকবরি প্রভৃতি গ্রন্থে কমলার মিষ্টতার সুখ্যাতি লিখিত হইয়াছে। শ্রীহট্টের সুকবি প্যারীচরণ দাস শ্রীহট্টের গৌরব ঘোষণা উপলক্ষে কমলার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন;

> "যে দেশেতে কমলার শোভা চমৎকার
> লোহিত ললাম লাম বর্ণের বাহার,
> কি কোমল অঙ্গ! আর সুরস সঞ্চার,
> কি মধুর রস! পানে তৃপ্তি সবাকার।" ইত্যাদি।

কদলী

শ্রীহট্ট জিলায় অনেক জাতি কদলী আছে।

১. "অমৃত সাগর" কদলী অতি বৃহৎ, সুগন্ধ বিশিষ্ট ও সুখাদ্য।

২. "ডিঙ্গামানিক" কলা সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা, সর্ব্বাপেক্ষা কোমল, কিন্তু অধিক পাকিয়া গেলে অম্ল স্বাদ বিশিষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য বাকল ঈষৎ সবুজ থাকিতেই সংগৃহীত হইয়া বিক্রয় করা হয়।

৩. "কুল-পতি" বা "সাফরি কলাই" কদলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও খাইতে অতি উত্তম। ইহা যথার্থই কলা-কুলপতি।

৪. "চিনি চাঁপা" বা "চাঁপা কলা" আকৃতিতে কুলপতি কলার মত, গুণে প্রায় "ডিঙ্গা মাণিক" প্রকৃতি বিশিষ্ট।

৫. "মত্তমান" "শাইল" বা "ভূষা" কলা দেখিতে যেমন, খাইতে তেমন উৎকৃষ্ট নহে। মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ।

৬. "আঠিয়া" কলা দুই জাতীয়,-ঘি আঠি ও ভীম আঠি। এই কদলী আকৃতিতে বৃহৎ, কিন্তু আঠি থাকায় খাইতে তেমন সুবিধাজনক নহে। ঘী আঠিতে বীজ কম থাকে। আঠি কলা অতি শীতল এবং ইহার পত্র কোমল ও বৃহৎ। ভোজনাদি উৎসবে সাধারণতঃ ইহার পত্রেই লোকে ভোজন করে।

শ্রীহট্টে সাধারণতঃ পুষ্করিণীর তীরে ও বাড়ীর চারিধারে কদলী বৃক্ষ রোপণ করা হয়। কলা একটি আয়কর ফল হইলেও ধান ব্যতীত অপর ফল মাঠে রোপণ করা শ্রীহট্টবাসিগণ উপযুক্ত মনে করেন না।

আম্র ও কাঁঠাল

আম্র ও কাঁঠাল শ্রীহট্টের সর্ব্বত্রই জন্মে। চৌকি ও বাণিয়াচঙ্গের আম্র অপেক্ষাকৃত মিষ্ট, ও তাহাতে পোকাও কিঞ্চিৎ অল্প হয়। তরফ, জলডুব, কুশিয়ারকুল প্রভৃতি স্থানের কাঁঠাল মিষ্টতর, কদলীর ন্যায় আম্র ও কাঁঠালে গাছ সাধারণতঃ বাড়ীর চারি পাশেই লাগান হইয়া থাকে।

লেবু বা জামির

শ্রীহট্টে বহুজাতীয় জামির আছে।

১. "মাথো" বা "জাম্বুরা" (বাতাপিলেবু)—ভিতরে লাল ও সাদা ভেদে দুই জাতীয়। ইহার এক একটা খুব বড় হইয়া থাকে।

২. "পানি" বা "ঝুটা জামির"—খাইতে প্রায় মাথো জামিরের মত, ইহাতে শীতলতা গুণ অধিক এবং আকৃতি মাথার মত গোল নহে।

৩. "জাড়া জামির" ও "জাজি জামির"—জাড়া জামিরের পুরু বাকলের সবুজ বর্ণ অংশ ফেলিয়া দিয়া, অবশিষ্ট নারিকেলের মত খাওয়া যায়; ইহা শীতলতা গুণবিশিষ্ট। "জাজি" আকৃতিতে ক্ষুদ্র, গুণে সামান্য ইতর বিশেষে মাথোর মত।

৩. আনারসের গুণে মোহিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত কবি সগৌরবে বলিতেছেন;
"যে দেশে জনমে অতি মিষ্ট আনারস,
সিন্ধুমথা সুধাসম মিষ্ট যার রস।" ইত্যাদি।

৪. "এলাচি জামির" "আদা জামির" এবং "চস্‌নি বা কলম্বক জামির"—ভক্ষ্য নহে, অন্ন ব্যঞ্জনাদি সুগন্ধ করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। এলাচি ও আদা জামিরের গন্ধ উৎকৃষ্ট। ইহা লংলা, ঢাকাদক্ষিণ পরগণায় অধিক পরিমাণে জন্মে। তদ্ভিন্ন—

৫. "সাতকড়া" "কাটা" "করুণ" প্রভৃতি আরও অনেক জাতি জামির আছে। সাতকড়া জয়ন্তীয়ায় বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

বিবিধ ফল

গোলাবজাম, কারজাম, জাম্রুল, এওলা বা আমলকী, বদরী, বেল, বন বাদাম, কয়ফল (পেঁপে), শফরি আম (পেয়ারা), দাড়িম (দাড়িম্ব) সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। তেঁতুল, চাল্‌তা, থৈকল, ডেফল, আমড়া এবং লেওইর ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চাল্‌তা, থৈকল, ডেফল ও লেওইর বন্যফল বিশেষ। ইহা অম্লরসাত্মক ও কেবল টক প্রস্তুতেই ব্যবহৃত হয়।

পাহাড় হইতে পানিয়ালা বা লুকলুকি (ত্রিপুরা অঞ্চলে বেকইর) ও পিঠাকরা নামে বালক বালিকার প্রিয় দুই জাতীয় ফল সংগৃহীত হইয়া সন্নিকটবর্ত্তী বাজারে বিক্রয় করা হয়। শ্রাবণ মাসে লুকলুকি পাকে। পিঠাকরার পুং বৃক্ষেই "আগর" প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গুবাক

চাপঘাট পরগণায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে গুবাক উৎপন্ন হয়, সাধারণতঃ নদীতীরবর্ত্তী বাড়ীগুলিতে গুবাগ বৃক্ষের সারি দেখিতে পাওয়া যায়,—একত্রে বহুবৃক্ষের সারি সমন্বিত বাড়ীগুলির দৃশ্য অতি সুন্দর। চাপঘাট ব্যতীত জয়ন্তীয়া, কুশিয়ারকুল প্রভৃতি পরগণাতেও বেশ সুপারি জন্মে। তাল ও নারিকেল যৎসামান্যরূপেই জন্মিয়া থাকে।

তরমুজ, চিনার ও শসা এবং খীরা বহু পরিমাণে চাষ করা হয়। তরমুজ ও চিনার কুকি জাতীয়েরা "জুমে" চাষ করে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে প্রতাপগড় ও লংলা প্রভৃতি স্থানে ইহা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়;-উভয় ফলই অতিশয় শীতল। চিনারের মধ্যে "বালিচিনার" সুপক্ক হইলে আপনা হইতেই ফাটিয়া যায়। শসা জ্যৈষ্ঠমাসে মিলে, ইহা বাড়ীতেই জন্মান হয়। শীত ঋতুতে খীরা পাওয়া যায়, ইহা সাধারণতঃ মাঠে উৎপন্ন করা হয়।

পানিফল ও মূল

পানিফল বা সিঙ্গাইর হাওর বা বিলাদিতে আপনা আপনি জলে জন্মিয়া থাকে এবং আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সংগৃহীত হইয়া বিক্রয় হয়।

মূলের মধ্যে "সাকরকন্দ" আলুই প্রসিদ্ধ, নদীতীরে ইহা প্রচুর রূপে চাষ করা হয়। শীতল গুণবিশিষ্ট "শাঁকআলু" ও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়।

শাক সব্জি

শ্রীহট্ট জিলার উর্ব্বর ভূমিতে সর্ব্বপ্রকার শাক সব্জিই প্রচুররূপে উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে গোল আলুই প্রধান। গোল আলু জয়ন্তীয়া, ভোলাগঞ্জ ও তরফ প্রভৃতি স্থানে বহু পরিমাণে জন্মে। বেগুন সর্ব্বত্রই জন্মে, তবে লংলার বেগুন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ। মূলক বা মূলা সর্ব্বত্রই জন্মে,

তবে তরফের মূলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তরপের গোলগাও নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মূলা উৎপন্ন হয়। শ্রীহট্ট ও জলডুবের কচুরমুখী উৎকৃষ্টতর।

প্রতাপগড় ও লংলা প্রভৃতি স্থানে কুকিরমুখী (pulp) ক্রয় করিতে মিলে। ইহার এক একটি ১০-১৫ সের পর্য্যন্ত ওজনের হইয়া থাকে।

কচুর মুড়া (মূল), মানকচু, ও ওলকচু সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। বিবিধ রকম 'উরি' (সীম), মিঠা লাউ, পানিলাউ, কুমড়া (কুষ্মাণ্ড) বহুলরূপে সর্ব্বত্র জন্মে।

তদ্ব্যতীত উদাইয়া (উচ্ছে) ও করালা, কাকরোল ও কাকুরা, পুরল ও চিচিঙ্গা এবং ঝিঙ্গা ও ডেড়েশ তরকারির জন্য পাওয়া যায়। (উদাইয়া ও করালা একজাতীয়, দ্বিতীয়টি আকারে বৃহৎ এবং সাধারণতঃ কুকিরা জুমে ফলাইয়া থাকে। কাকরোল ও কাকুরাও এক জাতীয় এবং দ্বিতীয়টি বৃহত্তর। এই দুইটিকে বন্য তরকারি, বিশেষ বোধ করা অসঙ্গত নহে। চিচিঙ্গা অতিশয় লম্বা হইয়া থাকে।

শাকের মধ্যে নালিশাক, নটে বা ডেঙ্গাশাক, লাইশাক (সর্ষপ জাতীয়) প্রধান। ক্ষুদ্র শাক ও পালইশাক টিলাভূমের সন্নিকটে স্বভাবজাতরূপে পাওয়া যায়। অম্লরসাত্মক খুঙ্গাশাক (টকপালং), সলিফা শাক সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

গন্ধিডাটা (গন্ধমাতৃকের ডাটা), রামকলার থোড় ও করিল (সংস্কৃত করির বা বাঁশের কচি অঙ্কুর) কোন কোন স্থানে পাহাড় হইতে সংগৃহীত হইয়া উপাদেয় তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়।

কপি, শালগম, বিট, গাজর প্রভৃতি অনেক লোকে সযত্নে উৎপাদন করেন।

মসল্লাদি

তেজপত্র—মসল্লার মধ্যে তেজপত্র শ্রীহট্টের চিহ্নিত প্রসিদ্ধ মসল্লা। আইন-ই-আকবরি প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। খাসিয়া পাহাড়, ছাতক ও জয়ন্তীয়ায় অত্যাধিকরূপে তেজপত্র পাওয়া যায়।

পাণ—জয়ন্তীয়ায় উৎপন্ন "পাণ" উৎকৃষ্টতর; খাসিয়াগণ ইহা প্রচুররূপে উৎপন্ন করে বলিয়া "খাসিয়া-পাণ" বলিয়া খ্যাত। "বাঙ্গালা পাণ" জিলার সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকিলেও, বারুই জাতীয় ব্যক্তিগণ সুরমা, মনু, কুশিয়ারা ও খোয়াই তীরেই ইহা অধিকরূপে উৎপাদন করিয়া থাকে।

মরিচ—লালমরিচ বা লঙ্কা সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। গোলমরিচ যথেষ্ট জন্মে না।

ঝলাঙ্গ—জয়ন্তীয়ায় রসুন জাতীয় ক্ষুদ্রাকৃতি ঝলাঙ্গ্ উৎপন্ন হয়। ঝলাঙ্গের গন্ধ, পেঁয়াজ অথবা রসুনাপেক্ষা অতিশয় মৃদু। উগ্রগন্ধী পেঁয়াজাদি হইতে ইহা এই জন্যই আদরণীয়। শ্রীহট্টের বাজারে ইহা কখন কখন ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত আদা, হরিদ্রা, ধনিয়া, পাটনাই জীরা, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি সর্ব্বত্রই জন্মে।

পাহাড়ে গন্ধমাতৃক (গান্ধি) যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

ঔষধাদি

শ্রীহট্টের পাহাড়ে যথেষ্ট পরিমাণে হরিতকী পাওয়া যায়। ইহা কখন কখন সংগৃহীত হয় বটে, কিন্তু এ ব্যবসায়ে বিশেষভাবে এ পর্য্যন্ত কেহ মনোযোগ দেন নাই।

চালমুগরার গোটা সম্বন্ধেও প্রায় তদ্রূপ। ইহাও কখন কখন পাহাড় হইতে সংগৃহীত করিতে সামান্যরূপ তৈল প্রস্তুত করা যায়। পাহাড়ে মুসব্বর গাছও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীহট্টের বংশলোচন বা বাঁশের চূণ প্রসিদ্ধ

সাধারণ লোকের মধ্যে জ্বরে নিম্বপত্র ও বলা, কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। চিরতা পত্রও অনেকে ব্যবহার করে। ইহা সর্ব্বত্রই উৎপন্ন হয়।

বিরেচক ঔষধরূপে সাধারণ লোকে "জামালগোটা" প্রায়ই ব্যবহার করে।

আমাশয়ে সচরাচর "বেলশুট" "ওলটকম্বলের ডাটা" ও "কাষ্টবরুজ" (কূটজ) ব্যবহৃত হয়। ইহা সর্ব্বত্র সুলভ।

গুলঞ্চ ("আমবরুজ") কখন কখন জ্বরে ব্যবহৃত হয়।

কফে শ্বেতবাসক পত্র সচবাচর ব্যবহাব করিয়া থাকে।

দন্তরোগে আম্রছাল ও নিম্বছাল এবং স্ত্রীরোগে অশোকছালের ব্যবহাব দেখা গিয়া থাকে!

তদ্ব্যতীত গঁদ, ধাতফল ("এওলা") প্রভৃতি পরিচিত ঔষধ পাহাড়ে ও গ্রামাদিতে প্রচুররূপে পাওয়া যায়। শতমূল ও অনন্তমূল প্রভৃতিও নানা স্থানে স্বভাবজাতরূপে উৎপন্ন হয়। শ্রীহট্টের জঙ্গলে প্রায় সর্ব্বপ্রকার বনজাত ("বনাজ") ঔষধ বহুলরূপে পাওয়া যায়।

পুষ্প

শ্রীহট্ট জিলায় বহুল প্রচারিত পুষ্পগুলির নামঃ—

বড়বৃক্ষ জাতীয়—চম্পক, বকুল, কদম্ব, কাঞ্চন, অশোক প্রভৃতি।

ছোটবৃক্ষ জাতীয় · সেফালিকা, করবীর, কামিনী, স্থলপদ্ম প্রভৃতি।

চারা জাতীয়— গর, গন্ধবাজ, বিবিধ জবা, গাঁদাফুল প্রভৃতি।

গুল্ম জাতীয়—'গালাপ, সেউতি (শ্বেতগোলাপ), যুঁথি (জুঁই), জাতি (বৃহৎ জাতীয় জুই), বেলি, চামেলি, কুন্দ, কেতকী, বঙ্গন ও নেযারি প্রভৃতি।

লতা জাতীয়—লবঙ্গ (লংফুল), মাধবী, বনমালতী, ঝুমকালতা, কুঙ্গলতা প্রভৃতি।

কন্দজাতীয়—বজনীগন্ধা, চণ্ডীফুল, চন্দ্রকলা, সর্ব্বজয়া/ভূইচাঁপা প্রভৃতি।

জলজ পুষ্পের মধ্যে শ্বেত ও রক্তপদ্ম এবং শ্বেত ও রক্ত কুমুদ (সাপলাফুল) এবং ঐ জাতীয় নীলাভ সালুক ফুলই প্রধান ; এতদ্ব্যতীত বিবিধ বনফুল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আয়কর ফুলের মধ্যে, মণিপুরী জাতি কুসুম ফুলের চাষ করিয়া থাকে। কুসুম্বের বীজে তৈল হয় ও ফুলে কাপড়ে গোলাপি বং হয় · কুসুম্বেব তৈল ঔষধে ব্যবহার্য্য।

বৃক্ষাদি

রক্ষিত জঙ্গল

শ্রীহট্টের বিস্তৃত জঙ্গল অকর্ম্মণ্য নহে। জঙ্গলগুলি আয়ের এক পন্থা বিশেষ। গবর্ণমেন্ট এই জঙ্গল হইতে প্রতিবর্ষে অনেক টাকা রাজস্ব আদায় করেন। প্রতাপগড় পরগণায় গবর্ণমেন্ট রক্ষিত ১০৩ বর্গমাইল জঙ্গলভূমি আছে, ইহার নাম "রিজার্ভ ফরেস্ট"। এতদ্ব্যতীত ১৭৭ বর্গমাইল "আনক্লাশস্ট ফরেস্ট" আছে;—ইহার পরিমাণ জয়ন্তীয়া পরগণায় অধিক। গবর্ণমেন্টের বনকর সম্বন্ধে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় সপ্ততি সহস্র টাকা আয় হইয়াছিল

আবশ্যকীয় বৃক্ষ

শ্রীহট্টের কাষ্ঠের কারবার আধুনিক নহে, আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, মোগল সম্রাট আকবরের সময়েও শ্রীহট্ট হইতে প্রচুর কাষ্ঠ ব্যবসায়ীগণ লইয়া যাইত।

শ্রীহট্ট (সদর), করিমগঞ্জ, ভাঙ্গা পাথারকান্দি, মৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ, লাখাই, আজমীরগঞ্জ কাষ্ঠ কারবারের প্রধান স্থান। নিম্নলিখিত বৃক্ষের কাষ্ঠ বিবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় ও প্রতিবৎসরেই প্রচুর পরিমাণে পাহাড় হইতে নামাইয়া আনা হয়। চাম ও আম (বন্য), রাতা ও কুর্ত্তা, পীং ও পোংতা, শিমইল ও জারইল, গন্ধরই ও সুতরং, পুমা ও তুলা, কদম ও ফরিস, কাওয়া ঠৌটি ও কাইমূলা, সুন্দি ও বনাক প্রভৃতি। তদ্ভিন্ন নাগেশ্বর ও গাম্বারি, কাঁঠাল ও পালান প্রভৃতিও নানা কার্য্যে লাগে।

জারইল বৃক্ষ একত্র অনেকটা বহুস্থান ব্যাপ্ত করিয়া উৎপন্ন হয়; গাছগুলি যখন গোলাপি রঙ্গের কুসুমে সুশোভিত হয় তখন বনস্থল অতি শোভনীয় দৃশ্য ধারণ করে। জারইল পুমা প্রভৃতিতে নৌকা প্রস্তুত হয়।

চাম, কাঁঠাল জাতীয় বৃহৎ বন্য বৃক্ষ। চাম, কাঁঠাল, সুন্দি, গন্ধরই প্রভৃতিতে উৎকৃষ্ট তক্তা হয়। চৌকি, খাট, আলমায়রা, সিন্দুক, টেবিল, বেঞ্চ প্রভৃতি ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি এই সকল কাষ্ঠে প্রস্তুত হয়। ঐ সকল এবং বনাক, গাম্বারি প্রভৃতির তক্তা গৃহ প্রস্তুত কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়। তদ্ব্যতীত গৃহের বরগা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

সুতরং তুলা প্রভৃতির তক্তাতে চা-র বাক্স প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঁঠাল, কাইমূলা, কাওয়াঠৌটি, কুর্ত্তা প্রভৃতিতে ঘরের খুঁটী হয়।

কদম্ব ও নাগেশ্বর (নাগকেশ্বর) স্বনাম প্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষ। নাগেশ্বরের সুগন্ধি পুষ্প হইতে একরূপ আতর ও ফল হইতে তৈল হয়। ইহার কাষ্ঠ অতিশয় দৃঢ় বলিয়া দালানের কড়ি (বিম), ববগা ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

পুমা ও পালানের কাষ্ঠ হালকা কেদারা দোলা ও খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

পাহাড়ে রবার বৃক্ষ আছে, রবারের ব্যবসায়ে অগ্রসর হইতে কাহাকেও দেখা যায় না। অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষাদি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। উচাইলের অন্তর্গত উজ্জ্বলপুরের মাঠে প্রায় ছয় কেদার ভূব্যাপী এক মহা বটবৃক্ষ আছে।

বিবিধ বৃক্ষ

প্রায় সর্ব্বত্র প্রাপ্য উদাল (উদ্দালক) বৃক্ষের বল্কল দ্বারা উৎকৃষ্ট সুদৃঢ় রজ্জু প্রস্তুত হয়। উপরোক্ত কাইমূলার নির্য্যাস দ্বারা গঁদ বা আঠার কার্য চলে। মহাল বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে ধূনা হয়। ধূনা দেবকার্য্যে লাগে। বলওয়া ও বনচাল্‌তা বৃক্ষের পত্র রৌদ্র-শুষ্ক করতঃ কাষ্ঠ পালিশ করার নীতি ছিল, এখন শিরিস কাগজ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। তথাপি খেলনা প্রভৃতির পালিশ কার্য্যে এখনও ঐ সব পত্র ব্যবহৃত হয়।

কীরতা পাতা, কন্দ জাতীয় একরূপ উদ্ভিদেব পত্র, ভোজনাদি উৎসবে ইহার পত্র বহুলরূপে ব্যবহৃত হয়। "ছাতাপাতি" ও কন্দ জাতীয় উদ্ভিদের পত্র, ইহা দ্বারা ছত্র প্রস্তুত হয়। "আনরকলি" একরূপ সুবৃহৎ পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ, ইহা পাহাড়ে জন্মে; ইহার পাতা এত বৃহৎ যে একজন মনুষ্য তাহার উপরে স্বচ্ছন্দে শয়ন করিতে পারে।

বাঁশ ও বেত

বাঁশের মধ্যে মূলি, খাং, ডলু, জাই, বরুয়া, পেঁচা, বাঁশকাল, মৃত্তিঙ্গা প্রভৃতি নানা জাতীয় বাঁশ আছে।

জাই, বরুয়া, পেঁচা বৃহৎ জাতীয় বাঁশ। তন্মধ্যে বরুয়া সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়। পেঁচা বাঁশ পাহাড় ব্যতীত অন্যত্র জন্মে না। জাই, বরুয়া এবং বেতো বাঁশ গ্রামাদিতে জন্মে। বেতো বাঁশ পরিপক্ক না হওয়া পর্য্যন্ত তদ্বারা বেতের ন্যায় গৃহের চালার বন্ধনাদি কার্য্য করা যায়। বাঁশকে চিরিয়া তদ্বারা বেত প্রস্তুত করিতে হয়।

মূলিবাঁশ সাধারণ কার্য্যে বহুলরূপে ব্যবহৃত হয়। খাং ও ডলু গৃহকার্য্যে (অর্থাৎ ঘরের চালের "রুয়া ও খাপ" প্রস্তুতে) ব্যবহৃত হয়। জাই ও বরুয়াতে ঘরের খুঁটী হয়।

করিমগঞ্জ সবডিভিশন ও লংলা প্রভৃতি স্থানে কচি ডলু বাঁশের চোঙ্গা কাটিয়া তন্মধ্যে বিরণীর চাল ও জল ভরিয়া চোঙ্গার মুখ বন্ধ ক্রমে পোড়ান হয়। পোড়ান হইলে চালগুলি পক্ক হইয়া একরূপ পিষ্টকে প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ পৌষ ও মাঘ মাসে এই পিষ্টক লোকে আগ্রহের সহিত ব্যবহার করে।

বেতের মধ্যে গল্লা, জালি ও সুন্দি প্রভৃতি নানারূপ বেত্র পাওয়া যায়। গল্লা বেত্র বৃহৎ জাতীয় এবং সুন্দি ক্ষুদ্র জাতীয়, উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম কার্য্যে সুন্দিবেত ব্যবহৃত হয়।

ছনের মধ্যে বড়লুথা ও উলু নামক ছন চাল ছাওয়ার কার্য্যে অধিকরূপে ব্যবহৃত হয়। যে স্থানে ছন উৎপন্ন হয়, তাহাকে "ছনের খলা" বলিয়া থাকে। বড়লুথা ছন পাহাড়ে জন্মে।

নল ও মুর্ত্তা পাহাড়ের পঙ্কিল স্থানে জন্মিয়া থাকে। নল চিরিয়া চাটি ও মুর্ত্তার বেত্র দ্বারা উৎকৃষ্ট পাটি প্রস্তুত হয়।

অদ্ভুত আকরিক উদ্ভিদ

সুনামগঞ্জের হাওরগুলির মধ্যে ও হবিগঞ্জের অনেক স্থলে (মকার হাওর, সৌলাগড় প্রভৃতি স্থানে) পঙ্কের নীচে (ভূগর্ভে) এক প্রকার অদ্ভুত উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। অন্য কোন দেশে এই প্রকার আশ্চর্য্য উদ্ভিদের কথা শুনা যায় না; এই উদ্ভিদের নাম "কচম বৃক্ষ"। এই উদ্ভিদ শাখা পত্রাদি বিহীন। জলতলে পঙ্কের নিম্নে অবক্র স্থুলাঙ্গ লতার ন্যায় দীর্ঘভাবে ইহা বর্দ্ধিত হয়। এক একটী সাধারণতঃ ১২/১৪ হাত লম্বা ও ৩/৪ হাত পরিধি (বেড়) বিশিষ্ট হয়। তদপেক্ষা লম্বা ও বড় কচমও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কচম কাষ্ঠের সামান্য একটা অংশ বা খণ্ড কাঁচা অবস্থায় মাটির নীচে রাখিলে তাহাও বর্দ্ধিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। কচম কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় লোক শুষ্ক করতঃ জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করে। হেমন্তে জলাভূমি শুষ্ক হইলে কাষ্ঠ সংগ্রহকারীরা লৌহশলাকা বিলের ধারে পঙ্কের মধ্যে প্রোথিত করিয়া, তন্নিম্নে কচম আছে কিনা দেখে। সন্ধান পাইলে খুঁদিয়া বা টানিয়া বৃক্ষ বাহির করিয়া লয়। এই কাষ্ঠের বর্ণ হরিদ্রাভ লোহিত। কচম একবার শুষ্ক হইয়া গেলে তন্মধ্যে সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না।

জুমের চাষ

জুম চাষের উল্লেখ পূর্ব্বে করা গিয়াছে, জুম চাষ কি, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। খাসিয়া, কুকি, নাগা, কাছাড়ী প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতীয় লোকেরা টীলার উপরে জুম আবাদ করে। আবাদের

জন্য স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া, এক এক পুঞ্জির বা পাড়ার লোক একত্র জুমের জন্য কাজ করিতে থাকে। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে সকলে মিলিয়া জঙ্গল কাটিয়া ফেলে; ঐ জঙ্গল শুষ্ক হইয়া গেলে, ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে তাহাতে আগুন লাগাইয়া জ্বালাইয়া ফেলে; তৎপরে বৈশাখ মাসেই সাধারণতঃ বীজাদি রোপণ করা হয়। "টাকল" নামক দা দিয়া ছোট ছোট গর্ত্ত করতঃ তাহাতে ধান্য, ভুট্টা (কুকিরদানা-Maze), কার্পাস, তিল, লঙ্কামরিচ, তরমুজ, চিনার প্রভৃতির বীজ একত্রে রোপণ করা হয়। থাবা নামক বেত্র নির্ম্মিত দীর্ঘাকার চাঙ্গারিতে ঐ সমস্ত বীজ একত্রে মিশ্রিত ভাবে থাকে। রোপণ কালে তাহার এক এক মুষ্টি এক এক গর্ত্তে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, কালক্রমে ফলবান হয়।

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে জুম একবার পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়, এই সময় ভুট্টা ও চিনার পরিপক্ক হইয়া থাকে। চিনার সাধারণতঃ টাকায় ২০/২২টি করিয়া পাওয়া যায়। যখন যে শস্য পক্ক হয়, তখনই তাহা সংগৃহীত হয়। তিলের গাছ কাটিয়া তিল সংগ্রহ করা হয় না, তিল পাকিলে বস্ত্রখণ্ড নীচে ধরিয়া; তাহার উপরে গাছ ঝাড়িয়া দেওয়া হয় মাত্র। বলা বাহুল্য যে ইহাতে অনেক অপচয় হয় ও অনেক তিল গাছে থাকিয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত শস্য ব্যতীত লাউ, কুমড়া, পেঁয়াজ ও কচুরমুখী জুমে ফলিত হয়। জুমের লাউ, কুমড়া ও কচুরমুখী ইত্যাদি অতি উত্তম, কিন্তু ধান্য সুখাদ্য নহে। কচুরমুখী এক একটা খুব বড় হয়, দেখিতেও সুন্দর। লুসাই জাতি তদ্বারা একরূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করে।

দীর্ঘকাল এক স্থানে জুম করিলে ফসল হয় না বলিয়া, দুই বৎসর কাল এক এক স্থানে জুম করার প্রথা দেখা যায়। দুই বৎসরান্তে জুমের জন্য নূতন স্থান নির্দ্ধারিত হয়। জুমের স্থান এইরূপে দূরে চলিয়া গেলে পুঞ্জি বা পাড়ার লোকও তথায় উঠিয়া গিয়া নূতন পুঞ্জি স্থাপন করে। কারণ ফসলের সময় প্রায়ই জুম পাহারা দিতে হয়।

চার চাষ

চা এক জাতীয় চারা বৃক্ষের পত্র। প্রথমে রৌদ্রে শুষ্ক, তৎপর অগ্নি তপ্ত করতঃ ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হয়।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আসামে সর্ব্বপ্রথম বন্য চা বৃক্ষ পাওয়া যায়। তাহাতে আসামের ভূমি চা আমাদের পক্ষে উপযোগী বিবেচিত হইলে, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীপুরে সর্ব্বপ্রথম এক চা বাগান প্রস্তুত করা হয়।

শ্রীহট্টে চা-র চাষ হইতে পারে কি না, অনুসন্ধান চলিলে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের জঙ্গলেও স্বভাবজাত চা বৃক্ষসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপর "নর্থ সিলেট টি কোম্পানী" স্থাপিত হইয়া, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে "মালনী ছড়া চা বাগান" নামে একটি চা ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। ইহার পর হইতেই শ্রীহট্টে ক্রমশ চার চাষ বর্দ্ধিত হইতেছে।

ইংরেজ কোম্পানীগণই সাধারণতঃ চার চাষ করিয়া থাকেন। শ্রীহট্ট জিলায় দেশীয়গণের পরিচালিত অনেকটি চা ক্ষেত্র আছে। দেশীয়গণের পরিচালিত চা বাগানগুলি এক এক ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি, তন্মধ্যে স্বর্গীয় রাজা গিরীশচন্দ্রের বিদ্যানগর চা-বাগান বিশেষ বিখ্যাত। দুইটি বাগান দেশীয়গণের যৌথ মূলধনে পরিচালিত। "ইন্দেশ্বর টি এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর" উত্তর ভাগ চা-বাগান ও "ভারত সমিতির" কালীনগর চা-বাগানের নাম উল্লেখিতব্য।

শ্রীহট্টে বর্ত্তমানে ষোলটি চা ক্ষেত্র দেশীয় লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে;

ঙ-পরিশিষ্টে ঐ সকল এবং অপর সমস্ত চা-বাগানের অধিকারীদের নামাদি লিখিত হইবে।

ইংরেজ চালিত চা বাগানসমূহ মধ্যে—এক বা একাধিক ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি স্বরূপও প্রায় পনরটি বাগান এখন এই জিলায় আছে। চা-করের সম্মান দেশীয় জমিদারাপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। এতাদৃশ স্বাধীন ব্যবসায় অগ্রসর হওয়া শ্রীহট্টবাসীর গৌরবের কথা। শ্রীহট্ট জিলায় বর্ত্তমান ১৫৪টি চা বাগান আছে।[৪]

বিস্তৃত ভূভাগে সারি সারি সতেজ চা বৃক্ষ সমন্বিত চা-বাগানের শোভা নয়ন তৃপ্তিকর। চা বৃক্ষের কচি পাতাতেই চা প্রস্তুত হয় বলিয়া গাছগুলি ছাটিয়া দেয়, এজন্য উচ্চ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। বীজ সংগ্রহের জন্য সামান্য দুই চারিটি গাছ কলম দেওয়া হয় না।

শ্রীহট্টের উর্ব্বর ক্ষেত্র চা চাষের উপযুক্ত হইলেও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উন্নতি কল্পে বিশেষ যত্ন দেওয়া হয় নাই। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২০৫০ একর ভূমিতে মাত্র চা আবাদ হইয়াছিল এবং ২৫১০০০ পাউণ্ড চা চালান হয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে চা চালানের পরিমাণ ৫৫৬১০০০ পাউণ্ড হইয়াছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চা চালানের পরিমাণ ২০৬২৭০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, বিগত ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আবাদের পরিমাণ ৭১৪৯০ একর ভূমি এবং চা চালানের পরিমাণ ৩৫০৪২০০০ পাউণ্ড। গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ১৩০৩৫৮ একর ভূমি আবাদ হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আনীত কুলিরা চা-বাগানের কাজ করিয়া থাকে। কুলিরাই চা পত্র সংগ্রহ করে, পরে কলের সাহায্যে তাহা ব্যবহারোপযোগী হয়। আড়কাটিয়া নানারূপ প্রলোভন দিয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দরিদ্রদিগকে ছোট নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতেই সচরাচর আনয়ন করে। ইহাদের সংখ্যা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৭১৯৫০ জন ছিল, পরবর্ত্তী দশ বৎসরে ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ১৪৪৮৭৬ জনে পরিণত হইয়াছে।[৫]

কফির চাষ

শ্রীহট্টের জঙ্গলে চার ন্যায় স্বভাবজাত কফি বৃক্ষও পাওয়া যায়; ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই তাহা জানা গিয়াছিল।[৬] শ্রীহট্টে কফির চাষও আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত মোনশীবাজার পোস্ট আফিসের অধীন, দৌরাছড়া ও লঙ্গাইছড়া নামে দুইটি কফিক্ষেত্র আছে।[৭] কফির চাষও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪. ঙ-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

৫. ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আগত কুলিদের নিবাসস্থান ও সংখ্যা—

বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে আনীত	২২০৬৭ জন
ছোটনাগপুর "	২২৭৪৫ "
মধ্যপ্রদেশ "	১২৬৮১ "
যুক্তপ্রদেশ "	৪১১৬৭ "
মান্দ্রাজ "	১০০৭৯ "
	মোট = ১৪৪৮৭৬৫ "

৬. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ১ম অধ্যায়ে এতদ্বিবরণ বর্ণিত হইবে।

৭. "Tea Garden in the Province of Assam"-Pub in 1902

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য

সূত্র শিল্প

শ্রীহট্টের সূত্র-শিল্প বা বস্ত্রবয়ন নিতান্ত অবহেলনীয় ছিল না, দেশের অভাব দেশীয় শিল্পেই পূর্ণ হইয়া যাইত; বিদেশের মুখ পানে চাহিতে হইত না, কিন্তু এখন অতীতের গৌরব করা বৃথা। লস্করপুরের উর্ণি চাদর, ঢাকাই উর্ণি হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। প্রমাণ চাদরের দৈর্ঘ্য ৭/৮ হাত ও প্রস্থ ৩ $\frac{১}{৪}$ হাত হইয়া থাকে। লস্করপুরের নিকটবর্ত্তী ছিলিমনগর নিবাসী তন্তুবায়গণ ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সূক্ষ্ম সূত্রকে লাজমণ্ডে আর্দ্র করিয়া শুষ্ক করিলেই তাহা বয়নোপযোগী হয়। তন্তুবায়গণ তাহাদের নিজের প্রস্তুত তাঁতে ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে; প্রতি চাদরের মূল্য ১৷৷০ হইতে ৪ পর্য্যন্ত। এই সকল তন্তুবায়েরা ধুতি ও শাড়িও প্রস্তুত করে। রঞ্জিত সূত্রের ডোরা বসাইয়া উৎকৃষ্ট শাড়ি প্রস্তুত হয়। ধুতি ও শাড়ির সাধারণতঃ ১০ হাত দীর্ঘ ও ২ $\frac{১}{২}$ হাত প্রস্তুত থাকে। কিন্তু মূল্য অধিক হওয়ায় ধুতি বা শাড়ি অধিক বিক্রয় হয় না। বিলাতি সূত্রের প্রচলন হওয়ায় তাঁতিরা ২৫০ নং সুতা দ্বারা ঐরূপ বস্ত্রাদি তৈয়ার করে। এক যোড়া উৎকৃষ্ট ধুতি প্রস্তুত করিতে একজন শিল্পীর অন্ততঃ পনর দিন সময়ের আবশ্যক করে; এবং প্রায় পাঁচ টাকা মূল্যের ২৫০ নং সুতা লাগিয়া থাকে সুতরাং এক যোড়া ভাল ধুতি ১০ টাকা এবং শাড়ি ১২ টাকার কম মূল্যে বিক্রয় করিতে পারা যায় না। মূল্যবান উড়ানি চাদর প্রভৃতিতে মধ্যে মধ্যে সোনালী কাজও থাকে।

এই গৌরবাত্মক ব্যবসাটি লোপ পাইতেছিল; দেশের লোক সস্তার মোহে ভুলিয়া স্থায়ীত্বের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, ইহার প্রতি যথোচিত আদর করেন নাই; ইহার সমধিক আদর বাঞ্ছনীয়। দেশীয় লোকের নিকট উৎসাহ পাইলে ছিলিমনগরের তন্তুবায়গণ ইহাতে আরও উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পারিবে।

সার্দ্ধ শত বর্ষ পূর্ব্বে তথায় ফ্লানেল বস্ত্রের থান প্রস্তুত হইত, কিন্তু এখন আর হয় না। অপকৃষ্ট হইলেও মূল্য অধিক দিয়া, দেশীয় দ্রব্যের আদর করা ও উৎসাহ দেওয়া উচিত, এ কথা সকলের বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না; কাজেই ইহা লোপ পাইয়াছে।

এণ্ডি বস্ত্র

হবিগঞ্জের উত্তর মাছুলিয়া গ্রামের নমঃশূদ্র জাতীয় লোকেরা ২০/২৫ বৎসর পূর্ব্বে গুটিপোকা পোষিয়া, তাহার সূত্রে এক প্রকার মোটা এণ্ডি বস্ত্র প্রস্তুত করিত। স্বভাবজাত এরণ্ড (ভেরেণ্ডা) বৃক্ষে পোকা ধরান হইত, এরণ্ড পত্র ভক্ষণ করিয়া গুটিপোকা বাঁচে। এণ্ডি রেসম সূত্রের ধুতি মুগার ধুতি নামে কথিত হইত।[১] ইহার এক খান ৮/১০ বৎসর কাল অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারিত। ইহাও দেশের লোকের উৎসাহ অভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে তত্রত্য হিয়ালাগ্রামে এখনও ২/৪ ঘর নমঃশূদ্র গুটিপোকা পোষিয়া এণ্ডি বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। জলসুখার সন্নিকটেও ২/৪ ঘর নমঃশূদ্র ঐরূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। যদি স্বদেশবৎসল শিক্ষিত ও ধনীদের অনুকূল দৃষ্টি সত্বর এদিকে পতিত না হয়, তবে অচিরে ইহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

১. East Indian Gazetteer Vol. II. (London-1828) p. 552.

জয়ন্তীয়াতেও এণ্ডি প্রস্তুত হইত, দেশীয় লোকের অবহেলা ও অনাদরে তাহাও বিলুপ্ত প্রায়; এখনও তথায় দুইজন শিল্পী বাঁচিয়া আছে এবং নিজ ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করতঃ এই শিল্পের নাম রক্ষা করিতেছে।[২]

মণিপুরী খেস

বস্ত্রবয়ন বিষয়ে মণিপুরীদের উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। মাঞ্চেষ্টারের সুলভ বস্ত্র, খেস প্রস্তুত বিষয়ে তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। নিজেদের প্রস্তুত খেস ফেলিয়া তাহারা বিদেশী সুলভ বস্ত্র ক্রয় করিতে অগ্রসর হয় না। মণিপুরী স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই এই খেস ব্যবহার করে। সদর, প্রতাপগড় ও ভানুগাছ প্রভৃতি স্থানের মণিপুরীরা উৎকৃষ্ট খেস ও পাতল মশারি প্রস্তুত করে। খেসের মূল্য ১ টাকা হইতে ৫/৭ পাঁচ সাত টাকা পর্য্যন্ত হয়। ভিতরে তুলা ভরিয়া মণিপুরীগণ "লাইচাং" নামে একরূপ শীতবস্ত্র বয়ন করে, লাইচাঙ্গের মূল্য ৪/৫ টাকা হইয়া থাকে। মণিপুরীদের প্রস্তুত গামোছা সুলভ অথচ ভাল।

যুগীয়ানা গিলাপ

যুগীয়ানা কাপড় এক সময় এ জিলায় সকলেই সাদরে ব্যবহার করিত; লজ্জানিবারক মোটা বস্ত্র পরিতে তখন কেহই লজ্জা বোধ করিত না। কিন্তু যে বিদেশী বস্ত্র পরিধান করা না করা প্রায় সমান, তদ্রূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র সমধিক আদরণীয় হওয়ায়, যুগীদের বস্ত্র ব্যবসায় নিতান্ত মন্দীভূত ভাবে চলিতেছে। যুগীদের প্রস্তুত কাপড়ের মধ্যে "গিলাপ" বা জোড়া চাদর শীত নিবারণোপযোগী; শীত ঋতুতে অনেকেই এই "গিলাপ" ব্যবহার করেন; বিলাতি মূল্যবান সার্জ্জ প্রভৃতি হইতে অল্পমূল্যের এই গিলাপ শীত নিবারণ পক্ষে কম উপযোগী নহে। গিলাপের থান ২২/২৪ হাত দীর্ঘ ও দেড় হাত প্রস্থ বিশিষ্ট হয়, সুতরাং মধ্যে সেলাই করিয়া ৬ হাত লম্বা জোড়া চাদর প্রস্তুত করতঃ ব্যবহার করিতে হয়। গিলাপের মূল্য ১।০ টাকা হইতে ৩ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। যুগীয়ানা ধুতি প্রভৃতির এখন আর আদর নাই; ইহার ব্যবহার একবারেই উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি নহে; তাহা না হইলে যুগী জাতির এ দুর্গতি কেন?

পূর্ব্বে এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা বিধবা হইলেই সুতা কাটিত, এখন তাহা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। বিধবার সুতা তখন যুগীরা ক্রয় করিয়া লইত। এখন তাঁতি এবং যুগীরা আমদানীকৃত বিদেশীয় সূত্র দ্বারাই প্রায়শঃ বস্ত্র প্রস্তুত করে।

শ্রীহট্টের দ্বাবিংশতি লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২৩৮৩ ব্যক্তি মাত্র সূতা কাটার ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে এবং পঞ্চ সহস্র ব্যক্তি মাত্র এখন বস্ত্র বয়ন ব্যবসায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে; কিন্তু তাহাতেও চলে না-সঙ্গে সঙ্গে কৃষি চালাইতে হয়। না হইবে কেন? ইতর-জন ভদ্রলোকেরই অনুকরণ করিয়া থাকে; সভ্য ভদ্র লোকের অনুকরণে দেশের কৃষকেরাও এখন বিদেশীয় বস্ত্র বহুল পরিমাণে ব্যবহার করে। মাঞ্চেষ্টার, দেশের অর্থ শোষণ করিয়া লইতেছে; সরকারী গ্রন্থ পত্রেই একথা প্রকাশ।[৩] মণিপুরীগণ পূর্ব্বে বিদেশীয় বস্ত্র স্পর্শ করিত না, এখন পুরুষদের মধ্য এ রোগ কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে।

---

২. "The Erisilk work is reared by Assamese immigrants who have settled at the foot of the Khasi and Jaintia Hills, and by a few poor Namasundra widows, but the cloth produced is generally intended for home wear and very little comes to market."
-Assam District Gezetteers (Sylhet) vol. II. p. 154.

৩. "The great mass of the rural population are dressed in the cheap fabrics of Manchester and not in home-made cloth. The Jugi caste is strongly represented, but few of them touch, the loom-----In 1901, there were only 5009 persons in Sylhet whose principal means of main tenance was the loom."
-Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap V. p. 154.

মৎস্যের জাল

মৎস্য শিকারের জন্য শণসূত্রের দ্বারা নানারূপ জাল প্রস্তুত করা হয়, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

মহাজাল—সর্ব্বপ্রকার জালের মধ্যে মহাজাল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহার এক এক খানা শতাধিক টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। এবং এ নৌকা সাহায্যে বহু স্থান ব্যপ্ত করিয়া এককালে বহুসংখ্যক মৎস্য ধৃত করা হয়।

বড় জাল অথবা গল্‌কা জাল—ইহার এক খানা ১৩-২০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হয়। ইহা প্রায় ৭০ হাত দীর্ঘ ও ৬ হাতের কম পরিসর যুক্ত হয় না। জালের উপরে বংশদণ্ড খণ্ড সমূহ বাঁধা থাকায় জালের উপরি ভাগ ভাসিয়া থাকে; তাহাতে উপর দিয়া মৎস্য পলায়ন করিতে পারে না। পায়ের সাহায্যে এই জালের নিম্নভাগ চালিত করিতে হয়।

ঝাঁকি জাল—ঝাঁকি জালের প্রান্তভাগে সীসক খণ্ড সমূহ সংলগ্ন থাকে। জাল হাতে লইলে সঙ্কুচিত থাকে, এবং ছুড়িয়া জলে ফেলিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন প্রান্ত সংলগ্ন এক গাছ দড়ি দ্বারা টানিয়া উঠাইয়া থাকে।

হুরাজাল—ইহাও অতি লম্বা হয়। দুই দিকে দুই ব্যক্তি জালের উভয় প্রান্তে ধরিয়া, জাল টানিয়া লইয়া মৎস্য শিকার করে। হুরাজালের মূল্য ৬-৮ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

খেত জাল—এই জাল চতুষ্কোণ বিশিষ্ট।[৪] +আকৃতি বংশদণ্ডে জালের চারি কোণ বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়া দেয়, ও দড়ির সাহায্যে ক্ষণে ক্ষণে টানিয়া তুলিয়া মৎস্য শিকার করে। ইহার এক খানা ৪-৭ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়।

হেফাজাল—ইহা ত্রিকোণাকার। Y ইংরেজী ওয়াই আকৃতি বংশদণ্ডে, ইহার তিন প্রান্ত বন্ধন করতঃ, নৌকায় বসিয়া মৎস্য শিকার করে। ইহার মূল্য ৩-৪ টাকা হইয়া থাকে।

আকৃতিতে ইহা ক্ষুদ্রতর হইলে "ছাটজাল" বলে, এবং তদপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলে "পেলুইন" বলিয়া থাকে। পেলুইন জালের ।।. মূল্য আনা পর্য্যন্ত হয়, অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত অল্প জলে ঠেলিয়া, তদ্দারা গুড়া মৎস্যই শিকার করে।

তদ্ব্যতীত "উথাল জাল", "সঙ্গা জাল", প্রভৃতি নামে মৎস্য শিকারের জন্য আরও অনেক জাতি জাল আছে।

ব্যাঘ্র শিকারের জন্যও দড়ির জাল প্রস্তুত হয়। ব্যাঘ্র শিকারের জালের আকৃতি অনেকটা হুরাজালের মত। বংশদণ্ড দ্বারা জাল খাটাইয়া ব্যাঘ্রকে বিতাড়িত করে। তাহাতে পলায়ন করিতে গিয়া ব্যাঘ্র জালে জড়িত হইয়া পড়ে। শূকরাদি জন্তু শিকারের জন্য তুল্যাকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট জাল ব্যবহৃত হয়। পক্ষী শিকারের জন্যও জাল প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়। দুই দিকে দুখানা জাল মাটিতে বিস্তৃত থাকে, মধ্যস্থলে খাদ্য ছড়ান হয়। খাদ্যের লোভে পাখী গুলি পতিত হইলে, দড়ির সাহায্যে সেই জাল হঠাৎ টানিয়া পক্ষীদের উপর ফেলান হয়।

Boat building has always been important industry in Sylhet Mr. Lindsay. who was collector there in 1780, built one ship of 400 tones burden, which drew 17 feet of water when fully loaded, and experience. considerable difficulty in navigating her to sea He also built a feet of 20 ships, and sent them to Mardras, loaded with rice on the occasion of a scarcity in that Presidency

-Assam District Gazetteers, vol. II (Sylhet) p. 115.

কাষ্ঠ শিল্প

শ্রীহট্টের কাষ্ঠ অতি উত্তম। মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালেও শ্রীহট্ট হইতে কাষ্ঠ বিদেশে রপ্তানি হওয়ার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে দেশে কাষ্ঠের এরূপ প্রাচুর্য্য এবং বৃহৎ নদী ও হাওরের বাহুল্য, সে দেশে নৌ-নির্ম্মাণ বিষয়ে যে দক্ষতা প্রদর্শন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীহট্টে প্রাচীনকালে সমর তরি প্রস্তুত হইত। ভাটেরার তাম্রফলকোল্লেখিত রাজা ঈশানদেবের সমর তরি ছিল, মোগল রাজত্বের সময় লাউড়াধিপতিকে রাজস্বের পরিবর্ত্তে সমরতরি যোগাইতে হইত। এই সমরতরি উৎরুষ্ট সল্লুক নৌকা বিশেষ।

পূর্ব্বে শ্রীহট্টে সমুদ্র যানও নির্ম্মিত হইত। মিঃ লিণ্ডসে সাহেব ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রায় একাদশ সহস্র মন বাহী এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি বিংশতি সংখ্যক জাহাজের এক বহর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ধান্য বোঝাই হইয়া ঐ বহর তথায় গিয়াছিল।[৫] এখন যদিও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট তরি নির্ম্মাতা নাই, তথাপি হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের সুদীর্ঘ "পলওয়ার" নৌকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৬]

বালাগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের নৌকাও সুন্দর ও সুবিস্তৃত। পাণ্ডুয়ার "বারকী" নৌকা অল্প জলে চলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও অভিনব আকৃতি বিশিষ্ট।

ভাঙ্গা, "মনুমুখ", আজমীরগঞ্জ প্রভৃতি অনেক স্থানেই কাষ্ঠ চিরিয়া তক্তা দ্বারা নৌকা প্রস্তুত করা হয়।

কাষ্ঠ নির্ম্মিত অন্যান্য দ্রব্য

কড়ি (বিম), বরগা, গৃহের খুঁটি, চৌকাট, কপাট ইত্যাদি সুদৃঢ় কাষ্ঠের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। পালঙ্গ, চৌকি, টুল, টেবিল, সিন্দুক, আলময়রা, শেল্‌ফ, কেদারা, আল্‌না প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি সূত্রধরেরা সুন্দর মত প্রস্তুত করিতে পারে।

চাপঘাট, লংলা, রাজনগর ও লস্করপুরে উৎকৃষ্ট পালকী প্রস্তুত হয়। শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ ও পঞ্চখণ্ডে উৎকৃষ্ট কেদারা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

ঢাকা দক্ষিণে কাষ্ঠের খাঞ্চা বা বাটা (কাষ্ঠ নির্ম্মিত থালা) এবং চাড়ী নামক কাষ্ঠপাত্র প্রস্তুত হয়।

শ্রীহট্ট, লাতু ও করিমগঞ্জে উৎকৃষ্ট কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম) প্রস্তুত হয়। কাষ্ঠ পাদুকার জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত বলুয়া এবং শিশুদের জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত সুরঞ্জিত খেলানা শ্রীহট্টের বিশেষ কাষ্ঠ-শিল্প। খেলানা প্রস্তুত বিষয়ে সূত্রধরগণ বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। ইহার পালিশ কার্য্যে ও রঙ্গের বাহারে সকলেরই মন মোহিত হয়। সাধারণতঃ ২৫টি খেলানার সেট ১।০ মূল্যে বিক্রয় হয়। বলুয়া এবং দাবা ও পাশাখেলার গুটিতেও রং দেওয়া হয়। তদ্ব্যতীত শ্রীহট্টে হুঁকার নারিচা, নারিকেল কুরানি প্রভৃতি নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

---

৫. "The Subdivision Habigang possesses at least two kinds of boats not found elsewhere, the Lakhai Palwar and Khawai boad
— General Administration Report for 1880-81

৬. সদরেব মটাই কোম্পানীর প্রস্তুত বেট ও লাঠি প্রসিদ্ধ।
কচুয়াদির সূত্রধর নিমাইচাঁদ বংশানুক্রমে বেহালা প্রস্তুত বিষয়ে সুশিক্ষিত।
ইন্দেশ্বরেব রাধাকিশোর সিংহ পাখাটানার কল আবিষ্কার করিয়াছেন; পঞ্চখণ্ডের এক ব্যক্তি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সূক্ষ্ম বেত্র-ফাড়া কল প্রস্তুত করিয়াছেন। তত্রত্য শ্রীবিপিনচন্দ্র দে কাঠের উপর উৎকৃষ্ট স্থায়ী নামের মোহর, চিত্র-ব্লক ইত্যাদি প্রস্তুত কবিতে সমর্থ, তাহা কোন অংশেই কলিকাতা নির্ম্মিত রবাবষ্ট্যাম্প প্রভৃতি হইতে নিকৃষ্ট নহে; ইনি ওয়াটারপেইন্টিং চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন।

লাউড়ের প্রস্তুত হুঁকার নল প্রসিদ্ধ।

সদরে কাঠের লাঠি ও খেলার বেট প্রস্তুত হয়। তরফের কচুয়াদি গ্রামের সূত্রধর উৎকৃষ্ট বেহালা প্রস্তুত করিতে পারে।[৭]

শ্রীহট্টে মণিপুরী জাতীয় সুত্রধরের কাষ্ঠের কার্য্যে, বিশেষতঃ গৃহ নির্ম্মাণাদিতে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

কাষ্ঠের রথ নির্ম্মাণে সূত্রধরগণ যথেষ্ট শিল্প চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছে; নবিগঞ্জ ও আখাইল কুড়ার রথ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। পূর্ব্বে সুতারের কার্য্যে জাতিগত ছিল, এখন শিক্ষাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সূত্রধরের বেতন সাধারণতঃ দৈনিক আট আনা হইতে বার আনা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

বংশ ও বেত্রশিল্প

এই শিল্পের মধ্যে শীতল পাটি সর্ব্বপ্রধান ও বিশেষ বিখ্যাত। মূর্ত্তা নামক এক জাতীয় গুল্মের বেত্র দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা শীতল, মসৃণ ও আরামজনক বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত। বঙ্গদেশের অন্য কোথাও এইরূপ পাটি প্রস্তুত হইতে পারে না।

পাটির বেত্র রঞ্জিত ক্রমে পাশা, দাবা প্রভৃতি বিবিধ খেলার ছক ইত্যাদি চিত্রিত করা হয়। পাটির মূল্য গুণানুসারে ℔০ আনা হইতে ১০ দশ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। বেত্র যত চিকণ হয়, মূল্য ততই বর্দ্ধিত হয়। পূর্ব্বে নবাবের আমলে ২০/২৫ টাকা হইতে ৮০/৯০ টাকা, এমন কি শত দ্বিশত টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের পাটি প্রস্তুত হইত বলিয়াও শুনা যায়। ২০/২১ হাত দীর্ঘ পাটিকে "সফ" বলিয়া থাকে। ইটা ও চৌয়ালিশ পরগণাতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শীতল পাটি প্রস্তুত হয়।[৮] করিমগঞ্জের অন্তর্গত কোন কোন স্থানেও পাটি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাটি প্রস্তুতকারণগণ "পাটিয়ারা দাস" নামে খ্যাত। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে ৩৯২৭ টাকা মূল্যের পাটি রপ্তানি হইয়াছিল।

নল নামক গুল্ম দ্বারা চাটি প্রস্তুত হয়; মূর্ত্তাতেও চাটি প্রস্তুত হইয়া থাকে। চাটি প্রস্তুতের বেত্র, পাটির ন্যায় সূক্ষ্ম নহে; কাজেই চাটি, পাটি অপেক্ষা মোটা এবং অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট চাটির মূল্য বার আনার অধিক হয় না; জলসুখা ও জগন্নাথপুর প্রভৃতি স্থানে চাটি প্রস্তুত হয়, জফরগড় ও প্রতাপগড়ের চাটি উৎকৃষ্ট।

চাপঘাট ও তরফ পরগণায় বাঁশের ছিল্কা দ্বারা "নেউলি" প্রস্তুত হয়, নেউলি দেখিতে শীতল পাটির অনুরূপ এবং দীর্ঘতর। নেউলিতে সাধারণতঃ ভাল গৃহের বেড়া প্রস্তুত করা হয়। আজ কাল নেউলির ব্যবহারটা পূর্ব্ববৎ দৃষ্ট হয় না।

শ্রীহট্টের চাঁচ বা ধাড়া (দরমা) প্রসিদ্ধ; ইহা দূরবর্ত্তী স্থানেও রপ্তানি হয়। করিমগঞ্জের অধীন

---

৭. এই উৎকৃষ্ট শিল্পটি ভগবানের কৃপায় এখন সমভাবে চলিয়াছে। ইটার ধুলীজুবা ও চৌয়ালিশের আটঘর গ্রামেই উৎকৃষ্ট পাটি প্রস্তুত হয়। ধুলীজুরার শিল্পী যদুরাম দাস বিগত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীতে ৯০ টাকা মূল্যের এক পাটি প্রেরণ করিয়া প্রশংসাপত্র ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

৮. "The cane and bamboo furniture of Sylhet is cheap and of a good quality, a serviceable chair costing as little ass As 6. Really cane baskets are also to be obtained in the bazar and the leaf rumberlla of Sylhet are quite a speciality. They are made of what is known as Chatapatti' on a frame work of bamboo, but though they only cost about three annas each, they are being ousted by the imported article which is more converient, in that it can be closed, and lasts much longer."

-Assam District Gazetteers vol II. (Sylhet) chap v p 158.

লক্ষ্মীর বাজার, সেওলা, পঞ্চখণ্ড, জফরগড় এবং জলসুখা ও জগন্নাথপুর প্রভৃতি স্থানে চাঁচ প্রস্তুত হয়। বিগত ১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে ষ্টিমার যোগে ১৪০০০০ মন ওজনের চাঁচ ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্ট সদরের বেত্র নির্ম্মিত পেটারা, বাক্স, মুড়া এবং বাঁশের চেয়ার ও ইজিচেয়ার অতি প্রসিদ্ধ। বাক্স ও চেয়ার ইউরোপীয়ানগনের বিশেষ আদৃত। সদরের পক্ষীর পিঞ্জর বেশ সুন্দর ও সুলভ।

বাঁশের টুকরি বা ধামা, ধান্য রক্ষার জন্য সুবৃহৎ "টালি" বা "আগুলি" এবং চালনি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সর্ব্বত্রই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই শিল্পে শ্রীহট্টের কারিগরগণ বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে। সদরের শেখঘাটস্থ ছাপরবন্দ পাড়ার কারিকরগণের প্রস্তুত বংশ— বেত্র নির্ম্মিত এক ছোট গৃহ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল। এই গৃহ বিশেষ প্রশংসিত ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়।

পর্ণ ও তৃণ–শিল্প

এই শিল্পের মধ্যে শ্রীহট্টের পাতার ছাতি অতি বিখ্যাত। "ছাতাপাতি" নামক একরূপ পত্রের দ্বারা ইহা প্রস্তুত করা হয়। বংশ-বেত্রের ফ্রেইমের ভিতরে 'ছাতাপাতি' রাখিয়া ছত্র প্রস্তুত করে। ইহার মূল্য সাধারণতঃ তিন আনা হইতে সাত আনা পর্য্যন্ত হয়। পূর্ব্বে বৃহদাকার "বেহারা ছাতি" প্রস্তুত হইত; বেহারাগণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপর তাহা ধারণ করিয়া যাইত; এখন ইহার ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রস্তুত হয় না।

পাতার ছাতি রৌদ্র বৃষ্টি বারণ পক্ষে অতি উপযোগী : এই আবশ্যকীয় দ্রব্যটির ব্যবহার অনেকেই লজ্জাকর মনে করেন, কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই পাতার ছাতি ও বাঁশের মুড়ার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।[৯]

পত্র নির্ম্মিত ক্ষুদ্রাকার ছত্র কৃষকেরা মস্তকে বাঁধিয়া কাজ কর্ম্ম করে, ঐরূপ ছত্রের নাম "ছাতা"। ইহার মূল্য তিন পয়সা হইতে পাঁচ পয়সা পর্য্যন্ত।

কুশ নামক তৃণ দ্বারা ভানুগাছ পরগণায় কুশাসন প্রস্তুত হয়। ঢাকা দক্ষিণ ও পঞ্চখণ্ডের কুশাসন অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট।

শ্রীহট্ট সদরের তালপত্রের পাখা বিখ্যাত ও অত্যুৎকৃষ্ট।

ধাতব শিল্প

তৈজসপত্রাদির মধ্যে শ্রীহট্ট জিন্দাবাজারের প্রস্তুত পিতলের লোটা (ঘটি) উৎকৃষ্ট ও বেশ ব্যবহারোপযোগী। ব্রহ্মচালে পিতলের বাসন ও পিটা কাঁসার কটোরা (বাটি) এবং করতাল প্রস্তুত হয়। শ্রীহট্ট, ব্রহ্মচাল, বদরপুর, মাধবপুর, আখাইলকুরা ও শ্রীমঙ্গল প্রভৃতি স্থানে পিতল ও ভরত-কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয়। পিতল দ্বারা সাধারণতঃ লোটা, কলস, তাগেরা, ডেগ, তসলা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কাঁসাতে বাটি বাট্‌লই (তসলা বিশেষ), লোটা ও চূণের কৌটা প্রস্তুত হয়।

বদরপুরে মণিপুরীরা ভরত-কাঁসার লোটা ও ভরত-পিতলের বর্ত্তুল (বাট্‌লই) ও করতাল প্রস্তুত করে। গলিত ধাতুই ভরত নামে কথিত হইয়া থাকে।

৯. এই বংশে বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ দে বি. এ বর্ত্তমান আছেন

ইটার পাঁচগাও ও রাজনগরের লৌহদ্রব্য অতি উৎকৃষ্ট। পাঁচগার কর্ম্মকারগণ বহু পূর্ব্ব হইতেই লৌহশিল্পে বঙ্গ বিখ্যাত হইয়াছিল, প্রসিদ্ধ জাহানকোষা তোপ ইঁহাদের কীর্ত্তি।

জাহানকোষা তোপ-কাঠরার দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে এক অশ্বত্থ তরুর সংলগ্ন কাণ্ড মধ্যে এই প্রসিদ্ধ তোপ অদ্যাপি অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১২ হাত, পরিধি ৩ হাত, মুখের বেড় দেড় হাত ও অগ্নি সংযোগ ছিদ্র দেড় ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। কামান সংলগ্ন পিত্তলফলক পাঠে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীরনগরে জনার্দ্দন কর্ম্মকার কর্ত্তৃক ১০৪৭ হিঃ সনে ইহা নির্ম্মিত হয়। হরবল্লভ নামক এক ব্যক্তির তত্ত্বাধীনে পাঁচগার জনার্দ্দন কর্ম্মকার এই কামান নির্ম্মাণ করেন। এই কামান নির্ম্মাণ করায় জনার্দ্দনের বংশ প্রসিদ্ধ লাভ করে, এবং কুলোজ্জ্বলকারী জনার্দ্দনের নামে তাহার বংশ "জনাইর গোষ্ঠী" নামে খ্যাত হয়। আজ পর্য্যন্ত জনাইর গোষ্ঠীর লোকেরা জাহান কোষার উল্লেখে গৌরব করিয়া থাকে। জনার্দ্দনের বংশে পরেও অনেক প্রসিদ্ধ শিল্পীর উদ্ভব হয়।[১০]

পাঁচগাও, রাজনগর থানার অধীন বলিয়া পাঁচগার প্রস্তুত লৌহ দ্রব্যও রাজনগরের জিনিষ বলিয়া খ্যাত। তন্মধ্যে খড়গ, বুকি দা, বটি দা, জাতি বা ছুরতা প্রভৃতি বিখ্যাত। খড়গ উৎকৃষ্ট ও বড় হইলে ১০/১৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। খড়গ প্রভৃতি উপর রৌপ্য ও পিতলের সুন্দর কারুকার্য করা হয়।[১১]

শ্রীহট্টে সোনারূপার কার্য্য দেশীয় স্বর্ণকার ও মণিপুরীগণ করিয়া থাকে; সহরে ঢাকাবাসী স্বর্ণকারদের দোকানও দৃষ্ট হয়। জয়ন্তীয়ায় স্বর্ণকারের প্রস্তুত বিশেষ বিশেষ দ্রব্য প্রশংসনীয়। লস্করপুরের সোনারূপার গিল্‌টির কার্য্য অতি চমৎকার ও প্রসিদ্ধ।[১২] কারিগরেরা লবঙ্গ প্রভৃতি মসলার উপরও গিল্‌টি করিয়া দিতে পারে।

মৃৎ শিল্প

হিন্দু কুমার জাতিরা এবং খুসকী নামক মোসলমানেরা মাটির বাসন প্রস্তুত করে। কলসী, ঘট, পাতিল, সরা, কাই, সানকি, কুজা, কলকি ও কাছলা এবং মটকা প্রভৃতিই অধিকরূপে প্রস্তুত হয়। মটকা ও কাছলা অতি বৃহৎ পাত্র। তদ্ব্যতীত সময় বিশেষে দেবমূর্ত্তি ও হাতী ঘোড়া প্রভৃতি খেলানাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেব দেবীর মূর্ত্তি গঠন উপলক্ষে কুম্ভকার ও গণকগণ মধ্যে মধ্যে শিল্পের চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে।

---

১০. পাঁচ গার কর্ম্মকারগণ পূর্ব্বে তরবারি ও বন্দুক প্রস্তুত করিত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার শিল্প প্রদর্শনীতে পাঁচগায়ের কমলচরণ ধর, কিশোররাম ধর কর্ম্মকাব লৌহ দ্রব্য প্রেরণ করিয়া বিশেষ পারিতোষিক লাভ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতেও তত্রত্য প্রাণকৃষ্ণ ধর, মধুসূদন ধর ও শম্ভুনাথ ধর কর্ম্মকার অনেক লৌহ দ্রব্য প্রেরণ করতঃ প্রসংশিত ও পুরস্কৃত হইয়াছেন। তত্রত্য গোবিন্দরাম ধর একপ্রকার তালা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, এই তালা যুক্ত বাক্সের ডালা ফেলিয়া দিলেই বাক্স আপনা হইতে বন্ধ হয়;-চাবি ব্যবহারের আবশ্যক করে না, বাক্স খুলিতেই মাত্র চাবির প্রয়োজন।

১১. "At Laskarpur, there are a few Musalmans who inlay silver scorll work upon iron with great skill. There are numerous workers in brass and iron scattered throughout the District."
-Statistical Accounts of Assam vol II (Sylhet) chap. p 22.

১২. Another speciality of Sylhet manufacture is ivory-ware, the carvers of which characterised by which ingenuity and taste. These work consists of ivory mats, which are sold at price from <20 to 60 each, fans from <1-12 to <2-10, sticks from <1-12 to <2, chesman from <3 to <5 a set, dice from 3 s to 6 s a set, and khutis from 2s to 3s a set
-Hunter's Statistical Accounts of Assam (Sylhet part)

বেযোড়া পরগণার বেঙ্গাডুবা গ্রামে পাক কার্য্যের উপযোগী সুদৃঢ় পাতিল প্রস্তুত হয়; ঐ সকল পাত্র "বেঙ্গাডুবি পাতিল" নামে পরিচিত। রিচি পরগণার লুকরা গ্রামও মাটির বাসন প্রস্তুত জন্য বিখ্যাত। তরফের মাটির বাসনও অতি উৎকৃষ্ট। তথায় কলসী, কলকি, সানকি, কুজা প্রভৃতি বহু প্রকার বাসন প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে কুজা ও কলকি প্রভৃতি দেখিতে চিনাবাসন বলিয়া বোধ হয়। শ্রীহট্ট সদরেও মাটির বাসন তৈয়ার হয়। বস্তুতঃ জিলার সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর মাটির বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট জিলার মাটির বাসন দৃঢ়ত, ব্যবহারোপযোগী ও সুন্দর।

প্রস্তর শিল্প

পূর্ব্বকালে শ্রীহট্টে যে প্রস্তর শিল্প উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, উনকোটি তীর্থের প্রস্তর মূর্ত্তি, জয়ন্তীয়া ও অন্যান্য স্থানের দেবমূর্ত্তি এবং প্রতাপগড়ের রাজবাটীতে প্রাপ্ত প্রস্তর-চিত্র তাহার প্রমাণ। বর্ত্তমানে শ্রীহট্টে এই শিল্পের কোনরূপ কার্য্য দৃষ্ট হয় না। কেবল মাত্র জয়ন্তীয়ায় প্রস্তরের "পাটা" (শিল নোড়া) শ্রীহট্টের প্রস্তর শিল্পের কঙ্কাল মাত্র রক্ষা করিতেছে।

দন্ত শিল্প

শ্রীহট্টের হস্তীদন্তের পাটি ভারত বিখ্যাত। সদর ও পাথারিয়া পরগণায় ইহার কারিকরগণ ছিল, এখনও দুই একটি আছে। হস্তীদন্তের বেত্র চুলের ন্যায় চিক্কণ করিয়া, তদ্দারা পাটি প্রস্তুত করা হয়। কখন কখন ইহার সহিত স্বর্ণতারের ফুল পাতা তুলিয়া সৌন্দর্য্য ও মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। এইরূপ এক একটি পাটি ৩-৬ শত টাকা মূল্যেও বিক্রয় করা হয়।

হস্তীদন্তে অতি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট পাখা প্রস্তুত হয়। কলিকাতার যাদুঘরে শ্রীহট্টের কারিকর প্রস্তুত একখানা হস্তীদন্তের পাখা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তদ্বতীত হস্তীদন্তের চূড়ী, চিরুণী, বাক্স, কৌটা, লাঠি, খড়মের খুঁটি ও দাবা এবং পাশাখেলার গুটি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।[১৩]

হস্তীদন্তের কারিকরকে "খণ্ডিকর" বলে। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই অত্যুৎকৃষ্ট দেশীয় শিল্পটি উৎসাহের অভাবে লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ধনবান বিলাসী ব্যক্তিগণ বিদেশজাত কাচ খণ্ড বহুমূল্যে ক্রয় করিবেন, কিন্তু স্বদেশজাত রত্নেরও যত্ন করিবেন না, দেশীয় শিল্পের অধঃপতন না ঘটিবে কেন?

মহিষ সিং এর চিরুণী শ্রীহট্টে প্রস্তুত হইয়া থাকে। হরিণের সিং কাটারীর বাঁট নির্ম্মাণ প্রভৃতি সামান্য কাজে লাগিয়া থাকে। শ্রীহট্ট সহরের শাখারীরা দক্ষতার সহিত সুন্দর শাখা প্রস্তুত করিয়া থাকে।[১৪]

১৩. The manufacture of Shell bracelets gives employment to a number of artificers in the town of sylhet These bracelets are cut out as solid rings from large white conch shells
—Hunter's statistical Accounts of Assam (Sylhet part).

১৪. ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌবাসী শের আলী জাফর "আফেল-ই-মাহাফিল" নামক উর্দ্দু গ্রন্থে শ্রীহট্টের বিবরণে এই বিষয়ে লিখিয়াছেনঃ-সিলেট, ইহা একটি পার্ব্বত্য নগর। এখানকার গণ্ডার চর্ম্মের ঢালের ন্যায় সুন্দর ঢাল ভারতবর্ষের কোন স্থানে প্রস্তুত হয় না। এখানকার কমলা লেবু প্রসিদ্ধ। পাহাড়ে মুসব্বর গাছ আছে। ইত্যাদি। ঢালের উৎকর্ষ বিষয়ে হামিল্টন সাহেব লিখিয়াছেন–
"Shields made in Sylhet have long been noted throughout India for their lustre and durability of the black varnish with which they are covered '
-W Humilton's East India Gazetteer vol. II-1828 p 552.

বিলুপ্ত চর্ম্ম শিল্প

শ্রীহট্টের ঢাল ভারত বিখ্যাত ছিল; শ্রীহট্ট সহরের লামা বাজারের পশ্চিমে ঢালকার পাড়া মহল্লায় পূর্ব্বে ঢাল প্রস্তুত হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র রপ্তানি হইত। পাথারিয়া পরগণাও উৎকৃষ্ট ঢালের জন্য প্রসিদ্ধ। ঢাল প্রস্তুতকারীরা "ঢালকর" নামে খ্যাত। লামা বাজারের ঢালকর বংশ এখন প্রায় নির্ম্মূল; ঢাল ব্যবসায়ও বিলুপ্ত। রিয়াজ-উস-সালাতিন প্রভৃতি পারস্য গ্রন্থে লিখিত আছে যে, উৎকৃষ্ট ঢালের জন্য শ্রীহট্ট সমস্ত হিন্দুস্থানে বিখ্যাত। অনেক ইংরেজ লেখকও ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।[১৫]

ইটার কেওয়ালীরা পূর্ব্বে জুতা প্রস্তুত করিত, দেশীয় লোক তাহাই ব্যবহার করিত।

গন্ধ ও খাদ্য শিল্প

শ্রীহট্ট জিলার আতর প্রসিদ্ধ। পাথারিয়া পরগণায় আগর কাষ্ঠ হইতে উৎকৃষ্ট আতর প্রস্তুত হয়। পিঠাকরা নামক এক জাতীয় বৃক্ষের সার কাষ্ঠ চূর্ণ করতঃ তাহা চোয়াইয়া আতর প্রস্তুত করে।[১৬] আতর প্রস্তুতের কাষ্ঠ পরিচয় করা সহজ নহে, সকল বৃক্ষেই আতর হয় না। অনেক বৃক্ষই আগরের কাষ্ঠের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট হইলেও চোয়াইলে আতর বাহির হয় না, এইরূপ কাষ্ঠকে "আষ্টাং" বলে। আতর প্রস্তুত হইয়া গেলে আগরচূর্ণ রাশি ফেলিয়া দেয় না, ইহাও কাজে লাগে। আগর-চূর্ণে মণ্ড মিশাইয়া উৎকৃষ্ট "ধূপ" প্রস্তুত করা হয়। দেবার্চ্চনাকালে ধূপ ও আগর-চূর্ণ, উভয়ই জ্বালান হয়। ইহার গন্ধ মনোহর। আগরের আতর মোসলমানদের অতি প্রিয় পদার্থ; প্রাচীন কালাবধি ইহার আদর সমভাবে আছে। আরব প্রভৃতি দেশেও আগরের আতর প্রয়োজনীয়।

আগর ব্যতীত নাগেশ্বর ফুল হইতে একরূপ আতর প্রস্তুত হয়; বিশুদ্ধ নাগেশ্বরী আতরের গন্ধ সুদীর্ঘকাল স্থায়ী। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে তরফের লালি গুড় অতি প্রসিদ্ধ। ইহাকে একরূপ অপকৃষ্ট চিনি বলিলেই হয়। এই গুড়ের দানা বড় বড় হয় এবং খাইতে উত্তম। চরগোলা প্রভৃতি স্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে গুড় রপ্তানি হইয়া থাকে।

---

১৫. 'In Patharia, a kind of Athar is prepared of the wood called Agor, which exported to Calcutta for despatch to Arabia and Turkey Agor is found on trees called Pithakara."

-Hunter's Statistical Accounts vol. II (Sylhet) p. 23.

পাথারিয়া ও ঢাকা দক্ষিণেই আগর চোয়ান হয়। আজিমগঞ্জের হামিদ আলী চৌধুরীর আতর প্রস্তুতের বিস্তৃত কারবার আছে।

১৬. ভিন্ন দেশীয় কেহ কেহ মনে করেন যে, কমলার রসে "কমলা মধু" প্রস্তুত হয়, "সখী" নামক পত্রিকায় এইরূপ একটা কথা প্রকাশিত হইয়াছিল; এ ধারণা ভুল;-মধুমক্ষিকারাই কমলার ফুল-রেণূ দ্বারা কমলা বাগানে মধুচক্র প্রস্তুত করে। ইহার উপাদেয়তা সম্বন্ধে কবি প্যারীচরণ দাস লিখিয়াছেন-

"ভারতে কোথাও আর খুঁজে মিলা ভার,
কমলা মধুর সম দ্রব্যে মিষ্ট তার।
হায় বৃথা পুরাকালে নয়নের নীরে,
তিতিলা দানবকুল জলধির তীরে;
না পাইয়া সুধা (যবে ঈষদ্ হাসিয়া,
ভুবন মোহিনী মুখে দিলেন বাটিয়া,
মোহিনী মোহন কান্তি,- দেবে দেব সীধু),
ছিল না কি এ সংসারে কমলার মধু?"-পদ্য পুস্তক।

কমলা মধু এত উৎকৃষ্ট, কবির এই সুন্দর বর্ণনায়ও যেন তাহার উৎকর্ষ প্রকটিত হয় নাই।

তরফ, ভানুগাছ, পাথারকান্দি প্রভৃতি স্থানের মণিপুরীগণ ভাল চিড়া প্রস্তুত করে।

মধু মনুষ্য শিল্পীর প্রস্তুত না হইলেও এই স্থলেই তাহার উল্লেখ আবশ্যক। ইন্দেশ্বর, চরগোলা প্রভৃতি স্থান হইতে মধু সংগৃহীত হয়। কমলা-মধু এক দেব-দুর্ল্লভ বস্তু, ছাতক হইতে শ্রীহট্টের বাজারে ইহা সংগৃহীত হয়।[১৭] বংশীকুণ্ডা, নবিগঞ্জ, আজমীরগঞ্জে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত প্রস্তুত হয়; এবং সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ সবডিভিশনের শুষ্ক মৎস্য দূরদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

লাক্ষা ও লাক্ষিক শিল্প

কুশিয়ারকূল, ভাটেরা, বরমচাল (ব্রহ্মচাল), লংলা, ইন্দেশ্বর, কাণিহাটী প্রভৃতি স্থানে বটবৃক্ষে লা-পোকা (পিপীলিকা বিশেষ) ধরান হয়। পোকাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখায় আঠার মত পদার্থ প্রস্তুত করে, ঐ পদার্থের বর্ণ লোহিত। প্রশাখা কর্ত্তন করতঃ ইহা সংগৃহীত হয়; ইহারই নাম "লার ঝুরি।"

লার কাজ যাহারা করে, তাহাদিগকে "লাহারি" বলে এবং কার্য্য "কুপ্তের কাজ" বলিয়া কথিত হয়। লস্করপুরের নিকটস্থ লাকুড়িপাড়া উর্দ্দু গ্রামের মোসলমানগণ লাক্ষারঞ্জিত লাঠি, রঙ্গীন বাক্স, বল্লম ও ছাতির বাঁট প্রস্তুত করে। এক সময় ছাতির রঞ্জিত বাট ও বল্লম বিশেষ আদরনীয় ছিল, এখন উভয়ই অনাবশ্যক হইয়া পড়ায় আর প্রস্তুত হয় না।

লস্করপুরের লার চূড়ি এখন মোসলমান রমণীগণ অতি আদরের সহিত ব্যবহার করেন, ইহা বিখ্যাত ও বহু পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

লার ব্যবসায় ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে, ২০/২৫ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখন তাহার চতুর্থাংশও নাই।[১৮] চাকরী ব্যতীত যে কোন আয়কব স্বাধীন ব্যবসায় করিলেই বাঙ্গালীর সম্ভ্রমের হানি হয়!!

খনিজ দ্রব্য

চূণ

শ্রীহট্টভূমি রত্নপ্রসূতি। নানাস্থানে নানাবিধ পদার্থ আছে, কিন্তু ব্যবসায়ের বন্দোবস্ত নাই। খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ের মধ্যে শ্রীহট্টের চূণের ব্যবসায়ই বিশেষ বিখ্যাত। মোগল রাজত্বের সময়েও ইহার ব্যবসায় চলিত, সে সমস্ত কথা যথাস্থানে উক্ত হইবে। ছাতকের নিকটবর্ত্তী উতম (উতমা) ও ব্রহ্ম পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে চূণা পাথর পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থান হইতে "চূণা পাথর" সংগৃহীত হইয়া থাকে, এবং ছাতক হইতে সুনামগঞ্জ পর্য্যন্ত সুরমা নদীর ধারে ভাটায় জ্বালাইয়া

---

১৭. "About 25 years ago, lac was produced in considerable quantities, but the industry is now in a very lanquishing condition. The insect is reared on the banian, but, for reasons, which the cultivators have not yet succeeded in discovering, it no longer thrives upon the tree.'

-Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap v p 166

১৮. প্রতি সহস্র মণ চূণা ছাতকে আনয়ন করার ব্যয় নিম্নলিখিত রূপঃ-

খনন কার্য্যের মজুরি	৩০ টাকা
ডিনামাইট	০২ "
নৌকা বোঝাই বাবতে	১০ "
নৌকা ভাড়া	৫০ "
সরকারী রাজস্ব	১১২ "

এতদ্ব্যতীত চূণাপাথর ভাটায় পোড়াইতে প্রায় ১২০ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হয়।

তাহা ব্যবহারোপযোগী করিয়া লয়।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথমে, রেসিডেন্ট (কালেক্টর) লিণ্ডসে সাহেব চূণার কারবার করেন। তৎপর "ইংলিশ কোম্পানী" বহুকাল যাবৎ ছাতকে চূণার কারবার করিয়া আসিতেছিলেন; সম্প্রতি (১৯০২ খৃষ্টাব্দে) ময়মনসিংহের গৌরিপুরস্থ স্বদেশবৎসল জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ঐ ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ পঞ্চম খণ্ডে ৪র্থ অধ্যায়ে বিবৃত করা যাইবে।

১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে প্রায় ২০ লক্ষ মণ চূণা রপ্তানি হইয়াছিল, কলিকাতায় প্রতি সহস্র মণের মূল্য ২৯০ টাকা হইতে ৪০০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।[১৯] জয়ন্তীয়ার জাফলঙ্গের পাহাড়েও চূণাপাথর আছে।

লাউড়ের পাহাড়ে লোহা আছে, কিন্তু তাহা উঠাইবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

তৈল

শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার মধ্যস্থ ঝালনা ছড়ায় মেটে তৈল মিলে। ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দের "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের এড্‌মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে" দৃষ্ট হয় যে, বদরপুরে বরাক নদীতীরে পিট্রিলিয়াম তৈল পাওয়া যায়। এই তৈলে স্নেহ পদার্থ অধিক থাকায় কিঞ্চিৎ ভারি।

জয়ন্তীয়া পাহাড়েও সম্প্রতি একরূপ খনিজ তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২০]

কয়লা

কয়লা শ্রীহট্টের পাহাড়ে পাওয়া যাইতে পারে কি না, এ বিষয়ে অনুসন্ধান হইলে, জানা যায় যে, শ্রীহট্টে কয়লার খনির অভাব নাই। জয়ন্তীয়া ও লংলার পাহাড়ে কয়লা আছে। লংলা পাহাড়স্থ কয়লার খনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এযাবৎ কয়লা উত্তোলনের কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই।[২১]

লবণ

বহু পূর্ব্বে দেশীয় লবণই লোকে ব্যবহার করিত বলিয়া জানা যায়। নবাবি আমলেও এদেশের লবণের খনি হইতে লবণাক্ত জল সংগ্রহ পূর্ব্বক লবণ প্রস্তুত করা হইত। লবণের খনিকে এদেশে "খুলি" বলিয়া থাকে। খুলির জল দেখিতে কর্দ্দমাক্ত বোধ হয়, ইহাই সংগ্রহ করতঃ জ্বাল দিলে লবণ পাওয়া যায়। খুলির লবণ ঈষৎ কষায়।

লঙ্গাই ও শিংলা উজানের পাহাড়ে খুলি আছে। লঙ্গাই-আটিল গাঙ্গের মুখ নামক স্থানের ও বাজারিছড়ার খুলি প্রসিদ্ধ; শিংলা উজানের গুদগুদি ছড়ার খুলি বিখ্যাত।

১৯. "The discovery of a new but unpromising patraleum oil springs in the jantia Hills by Mr Bose in also recorded
-The anual report on the work of the Geological Survey of India-1901.

২০. "Coal has recently (1876) been discovered at Langla, but no experiments have yet been made, to test the value of the discovery "
-Hunter's Statistical Accounts of Assam vol. II (Sylhet) p 21

২১. "Diposits of Coal exist near Patharia in the Langai valley, but no attempt has yet been made to work them "
-Assam District Gazetteers vol II (Sylhet) chap I 11

দু-আলিয়া পাহাড়ের নুন্টাছড়ার উৎপত্তি স্থলে লবণের খুলি থাকায় উহার জল লবণাক্ত ছিল; যে বংশীয় লোকেরা তদ্বারা লবণ প্রস্তুত করিত, অদ্যাপি তাহারা "নুনির বংশী" বলিয়া কথিত হয়েন।

আদম আইল পাহাড়ের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে দাসগ্রামের নিকট লবণের এক বৃহৎ খুলি ছিল, ঐ খুলির লবণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত; অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঐ খুলি পাথর চাপা দিয়া নষ্ট করা হয়।

লৌহাদি

শ্রীহট্টের নিকটস্থ পর্ব্বতের প্রস্তুর গুলিতে (ঝাওয়া পাথর) লৌহ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। পূর্ব্বে এই দেশী লৌহ "ঢেলিলোহা" নামে কথিত হইত, ও তদ্বারা লোকে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত।

শুক্তি ও মুক্তা—ঘুঙ্গিয়া জুরির হাওরে উৎকৃষ্ট শুক্তি মিলে। তরফের করঙ্গী নামক ক্ষুদ্র নদীর ঝিনুক হইতে মুক্তা পাওয়া যাইত বলিয়া কথিত আছে।

প্রস্তর ও মাটী—শ্রীহট্ট জিলার নানাস্থানে বহু পরিমাণে প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ প্রস্তর সমূহ ইমারত ও ঘাট ইত্যাদি প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। জয়ন্তীয়া পাহাড়ে প্রাপ্ত প্রস্তর রাশিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট।

"ঢেউমাটী" নামে কথিত লৌহমিশ্র রঞ্জিত মৃত্তিকা সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দিনারপুরের ঢেউমাটি উৎকৃষ্ট।

পঞ্চম অধ্যায়
বাণিজ্য

শ্রীহট্টের বাণিজ্য নিতান্ত অবহেলনীয় নহে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে পাশ্চাত্য বণিকগণ এক বৃহৎ কোম্পানী গঠিত করিয়া চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে মনস্থ করেন, তাহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে, এই শ্রীহট্ট নগরীই সেই প্রাচ্য বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান হইত, বণিক সমিতির মন্তব্যে ইহা অবগত হওয়া যায়।[১] তখনও ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে শ্রীহট্টই সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল।

বাণিজ্য স্থান

নদীতীরবর্ত্তী কয়েকটি প্রধান গঞ্জ বা বাজারই শ্রীহট্টের প্রধান বাণিজ্য স্থান। শ্রীহট্ট (কাজির বাজার ও বন্দর বাজার), বালাগঞ্জ, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নবিগঞ্জ, সমসেরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, আজমীরগঞ্জ ও বাণিয়াচঙ্গ প্রধান বাণিজ্য স্থান। এতদ্ব্যতীত বহুতর বাজার অন্তর্বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত: খ.—পরিশিষ্টে বাজার গুলির নামাদি লিখিত হইল। অন্তর্বাণিজ্য সাধারণতঃ নৌকা ও ভারবাহী মজুরদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিদেশের সহিত নৌকা, ষ্টিমার ও রেইলওয়ে এই ত্রিবিধ উপায়েই বাণিজ্য কার্য্য চলিয়া থাকে।

ষ্টিমার লাইন

ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ বন্দর হইতে "ইণ্ডিয়া জেনারেল ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর" একখানি ষ্টিমার প্রত্যহ শ্রীহট্টের জন্য যাত্রা করিয়া, তথা হইতে ১৭টি ষ্টেশন অতিক্রম করতঃ শ্রীহট্ট জিলায় প্রবেশ করে। শ্রীহট্ট জিলায় যথাক্রমে মাদনা, (এস্থান হইতে জলপথে এবং স্থলপথে হবিগঞ্জ যাইতে হয়।) বিথঙ্গল, আজমীরগঞ্জ, মহাকুলি, ইনায়েতগঞ্জ, শেরপুর, মনু-মুখ, (এস্থান হইতে স্থলপথে মৌলবীবাজার যাওয়া যায়।) বালাগঞ্জ, ফেঁঞ্চুগঞ্জ, (এস্থান হইতে স্থলপথে শ্রীহট্ট সহরে যাইবার সড়ক আছে।) নায়ের ঘাট, (এস্থান হইতে ঠাকুরবাড়ী অল্পদূরে।) বৈরাগীবাজার, সেওলা, লক্ষ্মীবাজার, করিমগঞ্জ, ভাঙ্গাবাজার ও বদরপুর এই ১৬টি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া, কাছাড় জিলায় প্রবেশ করে ও তিনটি ষ্টেশনের পরই শিলচর পৌঁছে। এই ষ্টিমার যথাক্রমে পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, কালনি-বিবিয়ানা ও কুশিয়ারা-বরাক দিয়া শিলচরে যায়।

উক্ত কোম্পানীর আর একখানা ষ্টিমার পূর্ব্বোক্ত পথে মহাকুলি পর্য্যন্ত আসিয়া, ভিন্ন পথে দিরাই, পাসাইয়া কলস, সুনামগঞ্জ, দোয়ারাবাজার, হরিপুর, ছাতক, কলারুকা, গোবিন্দপুর, লামা কাজিরবাজার, বাইয়ার মুখ ষ্টেশন হইয়া শ্রীহট্ট সহরে পৌছে। এই ষ্টিমার পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, কালনি-বিবিয়ানা ও সুরমা দিয়া শ্রীহট্টে পৌছে।

একখানা ক্ষুদ্র ষ্টিমারলঞ্চ অধিক বর্ষা হইলে, করিমগঞ্জ হইতে নটী খাল ও লঙ্গাই দিয়া প্রতাপগড়ের চান্দখিরা বাগান পর্য্যন্ত গমন করে। ফেঁঞ্চুগঞ্জ ষ্টেশন এই কোম্পানীর সমস্ত ষ্টেশন

---

১. "That the market place for this new trade would be at Sylhet, consequently in our own country,' &c -The Journal of the Asiatic Society of Bengal-1847 sept

হইতে বৃহত্তর। ষ্টিমারের কলকজা হঠাৎ নষ্ট হইয়া গেলে তাহা মেরামত করিয়া লইবার জন্য এখানে একটা ক্ষুদ্র কারখানা আছে।

রেইলওয়ে লাইন

আসাম বেঙ্গল রেইলওয়ের কার্য্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথমতঃ শিলচর পর্য্যন্ত গাড়ী চলিয়া ছিল। এই রেইলওয়ে লাইন শ্রীহট্ট জিলার দক্ষিণ দিক দিয়া সমস্ত শ্রীহট্ট জিলা ভেদকরতঃ চলিয়া গিয়াছে। চট্টগ্রাম বন্দর হইতে ১৩৫ মাইল দূরে, কাশিমনগর পরগণায় প্রবিষ্ট হইয়া, বদরপুরে ২৫৩ মাইল চিহ্নের নিকট শ্রীহট্ট জিলা ত্যাগ করিয়াছে। শ্রীহট্ট জিলার মধ্যে যে সকল ষ্টেশন পড়িয়াছে, পশ্চিম হইতে তাহাদের নাম যথাক্রমে লিখিত হইলঃ—

সর্ব্ব প্রথম ষ্টেশন (হবিগঞ্জের অন্তর্গত) মনতলা (১৪২ মাইল চিহ্ন), তৎপর ইটাখলা (১৪৭ মাইল চিহ্ন), সাহাজীবাজার (১৫৫ মাইল চিহ্ন), শায়েস্তাগঞ্জ (১৬০ মাইল চিহ্ন), দারাগাও (১৬৫ মাইল চিহ্ন), রসিদপুর (১৬৮ মাইল চিহ্ন); (দক্ষিণ শ্রীহট্টন্তর্গত) সাতগাও (১৭৫ মাইল চিহ্ন), শ্রীমঙ্গল (১৭৯ মাইল চিহ্ন), আলীনগর (১৮৭ মাইল চিহ্ন), শমশের নগর (১৯১ মাইল চিহ্ন) টীলাগাও (১৯৭ মাইল চিহ্ন), কুলাউড়া (২০৫ মাইল চিহ্ন), জুড়ী (২১২ মাইল চিহ্ন); (করিমগঞ্জান্তর্গত) দক্ষিণভাগ (২১৬ মাইল চিহ্ন), বড়লিখা (২২২ মাইল চিহ্ন), লাতু (২২৯ মাইল চিহ্ন), লঙ্গাই (২৩৮ মাইল চিহ্ন), করিমগঞ্জ (২৩৯ মাইল চিহ্ন), চরগোলা (২৪৩ মাইল চিহ্ন), ভাঙ্গা (২৪৭ মাইল চিহ্ন) ও বদরপুর জঙ্কশন (২৫২ মাইল চিহ্ন)। বদরপুর জঙ্কশন শ্রীহট্ট জিলার মধ্যে বড় ষ্টেশন। শ্রীমঙ্গল, শমশের নগর, লঙ্গাই ও চরগোলা; এই ষ্টেশনেই অধিক মাল উঠিয়া থাকে। ফেঁচুগঞ্জ হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী চলিয়া থাকে।

কাঁচা সড়ক

প্রাচীনকালে শ্রীহট্ট জিলায় কয়েকটি সড়ক ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। তন্মধ্যে (প্রতাপগড়, জফরগড় প্রভৃতি পরগণায়) পিঠাখাউরীর জাঙ্গাল, (ঢাকা দক্ষিণে) দেওয়ানের সড়ক, (লংলায়) রাজসড়ক প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বেই ঐ সকল সড়ক নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীহট্টের কালেক্টর মিঃ লোজ সাহেবের (১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের) রিপোর্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা (মিঃ আমুটীর) নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত একটি মাত্র সড়ক ছিল। হন্টার সাহেবের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে কাছাড় পর্য্যন্ত ৮২ মাইল দীর্ঘ একটি মাত্র পথ ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট-ছাতক রাস্তা আরম্ভ হয়। এই দুইটি সড়কই সুপ্রাচীন। ইদানীং বহুতর সড়ক প্রস্তুত হইয়াছে। চ-পরিশিষ্টে প্রধান প্রধান সড়ক গুলির বিবরণ লিখিত হইবে।

শ্রীহট্ট জিলায় সম্প্রতি পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের অধীনে প্রায় ১২০ মাইল এবং লোকেল বোর্ডের অধীনে প্রায় ১২০০ মাইল সড়ক সংরক্ষিত আছে।

শ্রীহট্ট হইতে শিলং ৭২ মাইল। শিলং যাওয়ার পথে একটু বিশেষত্ব আছে। শ্রীহট্ট সহর হইতে স্থলপথে হাঁটিয়া বা নৌকাযোগে ছাতক হইয়া কোম্পানীগঞ্জ, তথা হইতে থারিয়া ঘাট যাইতে হয়। থারিয়া ঘাট হইতে উর্দ্ধদিকে পাহাড়ের উপর উঠিতে হয়। পদব্রজে যাওয়া কষ্টকর বিবেচনায় অধিকাংশ লোকই "থাবা" আরোহণে শিলং যায়। থারিয়াঘাটে থাবা পাওয়া যায়। থাবা দুই প্রকার; ঝুড়িবৎ দীর্ঘাকার থাবা দ্রব্যাদি বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। মনুষ্য বহনোপযোগী

থাবা বাঁশের একরূপ মোড়া বা চেয়ার বিশেষ। খাসিয়ারা এই থাবা সংলগ্ন রজ্জু মাথায় দিয়া থাবা পৃষ্ঠদেশে লয়, আরোহী তদুপরি উপবেশন করে। খাসিয়ারা আরোহী সহিত থাবা পৃষ্ঠে লইয়া অনায়াসে পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়া যায়। শ্রীহট্ট হইতে শিলং যাইতে রাজারগাও, কোম্পানীগঞ্জ, ভোলাগঞ্জ, থারিয়াঘাট, চেরাপুঞ্জী, চেরাডিম, ডম্পেপ্, মালিম প্রভৃতি প্রধান জায়গা অতিক্রম করিতে হয়।

আমদানী রপ্তানি

আমদানী

শ্রীহট্ট জিলায় প্রতিবর্ষে লবণ, তৈল নানাজাতি দাইল, ঔষধ, চিনি, মিছরি, ময়দা প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য; কড়াই বর্গা প্রভৃতি লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য; মদ, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি মাদক দ্রব্য; চীনাবাসন, এনামেলড বাসন, পিতল ও কাঁসার বাসন; সুপারি ও নারিকেল; এলাচ ও লবঙ্গ প্রভৃতি মসল্লা; পেঁয়াজ, তামাক ও মৌরী প্রভৃতি; করগেটেড্ আয়রণ, আলকাতরা, বিলাতী মাটি প্রভৃতি আমদানি হয়।

রপ্তানি

রপ্তানির মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রধানঃ—চাল ও ধান; (করিমগঞ্জ, দক্ষিণ শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ হইতে অধিক।) চা, (করিমগঞ্জ ও দক্ষিণ শ্রীহট্ট হইতে অধিক।) তিসি, সর্ষপ, কমলা ও কমলামধু, (অধিকাংশই ছাতক হইতে প্রেরিত হয়।) মধু, মোম, লা, আগরকাষ্ঠ ও আতর; (করিমগঞ্জ সবডিভিশন হইতে); তেজপত্র, মরিচ, মধু (জয়ন্তীয়া হইতে); কার্পাস, চর্ম্ম, ঘৃত, (আজমীরগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ হইতে); পুরাতন ঘৃত (জলসুখা হইতে); চূণা (ছাতক ও লাউড়ের অন্তর্গত তেলিগা হইতে রপ্তানি হয়।) শীতলপাটি, সফ ও খড়গা, (দক্ষিণ শ্রীহট্ট হইতে); আনারস, বাঁশ, বেত, ছন, কাষ্ঠ, চাঁচ, চাটি, (করিমগঞ্জ সবডিভিশন হইতে প্রেরিত হয়।) পাতার ছাতি ও বাঁশের মুড়া (সদর শ্রীহট্ট হইতে) এবং আলু (ভোলাগঞ্জ ও জয়ন্তীয়া হইতে); ও শুষ্ক মৎস্য (সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ হইতেই প্রধানতঃ রপ্তানি হয়। প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষ টাকার শুষ্ক মৎস্য রপ্তানি হইয়া থাকে।) তদ্ব্যতীত সর্ষপ তৈল, মাছের তৈল, হস্তীদন্ত, মহিষের সিং, হরিণের সিং, চর্ম্ম, মৃত জন্তুর হাড় প্রভৃতি রপ্তানি হয়।

ঔষধের মধ্যে চারুচিনি, চালমুগরার তৈল, বংশলোচন, এবং পশুর মধ্যে হস্তী বিদেশে প্রেরিত হয়। ছাপরা জিলার হরিহরছত্রের মেলায় শ্রীহট্টের হস্তী বিক্রয় হইয়া থাকে।

ঢাকা, কলিকাতার সহিত পরোক্ষভাবে এবং খাসিয়া পর্ব্বত, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও কাছাড় জিলার সহিত সাক্ষাৎ ভাবে বাণিজ্য চলিয়া থাকে। খাসিয়া পর্ব্বত হইতে চূণা, আলু, কমলা, মধু ও পাণ এবং সূতা আমদানী হয়। খাসিয়ারা ইহা বহন করিয়া আনিয়া থাকে, এবং প্রত্যাগমনকালে ধান্য, তৈল, ও শুষ্ক মৎস্য লইয়া চলিয়া যায়।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা হইতে সুতা, তিল, বেত ও কাষ্ঠ প্রভৃতি লঙ্গাই ও শিংলা নদীপথে এবং জুড়ী, মনু ও খোয়াই নদী দিয়া আসিয়া থাকে ও শ্রীহট্ট হইয়া বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। এই সমস্ত দ্রব্য মনুমুখ ও মুছিকান্দিতে রিজেষ্টরী হইয়া থাকে।

শ্রীহট্ট হইতে পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় তামাক, মসাল্লা ও শুষ্ক মৎস্য রপ্তানি হয়। ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে প্রায় ২০০০০ টাকার শুষ্ক মৎস্য পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় রপ্তানি হয়। ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে

শ্রীহট্ট হইতে ১৩৫২১৩ মণ কয়লা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। নৌকাযোগে যে সমস্ত দ্রব্যাদি আমদানী ও রপ্তানি হয়, ভৈরব বাজারে তাহার রেজেষ্টরী হইয়া থাকে।[২]

শ্রীহট্টের বনজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন নদী পথে রপ্তানি হইয়া থাকে, ঐ সকল দ্রব্যের কর আদায়ের জন্য গবর্ণমেন্টের ১১টি ফরষ্টে আফিস আছে।[৩]

আবগারী সম্বন্ধীয় দোকানের সংখ্যা শ্রীহট্ট জিলায় প্রায় ১৬২টির ন্যূন নহে।[৪]

২. ১৯০৩ খৃষ্টাব্দেব ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের আমদানী বপ্তানিব গড়পড়তা মণ কবা (সহস্র মণের হিসাবে) প্রদর্শিত হইতেছেঃ—

আমদানী কত	দ্রব্য পাঁচ বৎসরের গড়	রপ্তানি কৃত দ্রব্য	পাঁচ বৎসরের গড়
আলু "	৩৫ সহস্র মণ "	কাষ্ঠ "	১৪ সহস্র মণ
কয়লা "	২১৯ "	চর্ম্ম ও শৃঙ্গ "	১৭ "
তণ্ডুল "	২৬৮ "	চূণা "	১৮৪৭ "
তামাক "	৮৯ "	তুলা "	১১ "
তৈল "	২১১ "	তণ্ডুল "	১৮৭০ "
ধাতু "	৮৯ "	পাট "	১৭ "
মটর ইত্যাদি	১৮৯ "	পাটি ও চাটি ইত্যাদি	১৩৮ "
মসাল্লা "	১৫৯ "	মসাল্লা "	২৮ "
লবণ "	২৮৪ "	শর্ষপাদি বীজ "	১০ "

৩. পাথারকান্দি, লঙ্গাই, শিলুয়া, মৌলবীবাজার, মনুমুখ, কানাইরঘাট, ছাতক, সুনামগঞ্জ লাউড়েরগড়, মুচিকান্দি ও দিনারপুর।

৪. দোকান সংখ্যা ও বিক্রয়ের পরিমাণঃ—

আফিম ২১টি দোকান। (১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে বিক্রয় ১৬/।০ মণ)
গাঁজা ৯৪টি " (১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে বিক্রয় ২৩২/৷০ মণ)
দেশীয় মদ ৪৭টি " (১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে বিক্রয় ২৩২/৷০ মণ)

ষষ্ঠ অধ্যায়
ইতর প্রাণী

শ্রীহট্টের জঙ্গলে প্রায় সর্ব্বপ্রকার হিংস্র জন্তুই আছে। আরণ্য জন্তুর মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রীহট্টে হস্তীর বিষয় উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

হস্তী

হস্তীরা দলবদ্ধ ভাবে বিচরণ করে। প্রতি দলেই চরাল কুন্‌কী নামে কথিতা এক একটি বৃহৎকায় হস্তিনী এবং গুণ্ডা নামে কথিত এক একটি দাঁতাল হস্তী থাকে। ইহারাই দলপতি স্বরূপ। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে চরালকুন্‌কী সর্ব্বাগ্রে ও গুণ্ডা সর্ব্ব পশ্চাতে থাকে। সাধারণতঃ হস্তিনীদিগকে কুন্‌কী বলা হয়। দন্তবিহীন হস্তীর নাম মাক্‌না। মধ্যে মধ্যে যুথভ্রষ্ট হস্তীও প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাদের ক্ষুদ্র দলে হস্তিনীরা থাকে না; এইরূপ দলে কখন কখন ৭/৮টি মাক্‌না ও গুণ্ডা হস্তী মাত্র থাকে। গুণ্ডার দল নির্ভীক এবং শিকারীরা সহজে ইহাদিগকে ধৃত করিতে পারে না।

দুই ভিন্ন দলে পরস্পর দেখা হইলে কখন কখন উভয় দলের দলপতি গুণ্ডা হস্তী মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়া থাকে। এক দলের মধ্যেও কখন কখন বলবান্ কোন মাক্‌না, দলপতি গুণ্ডার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে উভয়ে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ইহাতে যে পরাজিত হয়, সে দল ছাড়িয়া পলায়ন করে। এই রূপ যূথভ্রষ্ট কয়েকটি একত্র মিলিয়া "গুণ্ডার দল" হয়।

বর্ষাকালে হস্তীযূথ দুর্গম উচ্চতর পর্ব্বতে চলিয়া যায়। শীতাগমে নিম্নপ্রদেশে প্রত্যাগমন করে। এক প্রান্তরের বনজঙ্গল ভক্ষিত হইলে সমস্ত যূথ অন্য প্রান্তরে চলিয়া যায়। গমনকালে অগ্রবর্ত্তীগণ পথাবরোধক বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া, লতা ছিন্ন করিয়া সুন্দর পথ প্রস্তুত করিয়া যায়। এইরূপ পথকে "দোয়াল" বলে। দুর্গম পাহাড়ে হস্তীর দোয়ালই বন কামলাদের চলাচলের প্রধান রাস্তারূপে গণ্য হয়।

বন্য হস্তীর চলাচলের একটি কায়দা আছে, ইহারা "এক পাড়ায়" যায়; অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তিনী চরাল কুন্‌কীর পদচিহ্নের উপর পদ বিক্ষেপ করিয়া দলের তাবৎ হাতীই চলিয়া যায়, ইহাতে পদচিহ্ন দৃষ্টে সেই পথে মাত্র একটি হাতী গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। তবে শাবকগণ "এক পাড়ায়" যাইতে পারে না; এই জন্য শাবকের পদচিহ্ন দৃষ্টে দলের বৃহত্ত্ব অনুমান করিয়া লওয়া হয়।

তিনরূপ উপায়ে হাতী ধরা হয়, যথা- খেদা, ফাঁস ও পরতালা; যে সকল স্থানে প্রায়শঃ হস্তী ধৃত করা হয়, সে স্থানকে রম্‌না বলে। শ্রীহট্ট জিলায় ছয়টি রম্‌না প্রসিদ্ধ।[১] যথা-১. শিংলা, ২. লঙ্গাই, ৩. লাউড়, ৪. ভানুগাছ, ৫. মূলাগোল ও ৬. তারাপুর। এই রম্‌নাগুলির মধ্যে শিংলা ও লঙ্গাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে বহুদূর পর্য্যন্ত আবাদ হইয়া যাওয়াতে হস্তী পূর্ব্ববৎ আগমন করে না।

১. "Six tracts are now resumed for elephant hunting Mahals in Sylhet.
-Hunter's statistical Accounts of Assam vol. II. (Sylhet)

খেদা

খেদার প্রধান কার্য্যকারকের নাম পাঞ্জালী। পাঞ্জালীগণই প্রথমতঃ জঙ্গলে গিয়া হাতীর সন্ধান করে; পদচিহ্ন পরীক্ষায় তাহাদের গতি ও আনুমানিক সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। প্রতাপগড় পরগণায় অনেক মোসলমান এই কার্য্যে দক্ষতা লাভ করে, ইহাদের নামে গ্রাম ও তালুক প্রভৃতি আছে। পাঞ্জালীরা সুবিধাজনক স্থানে হস্তীযূথকে দেখিতে পাইলে, অপর লোকের সাহায্যে ঘেরাও করিয়া লয়। যে সকল লোক এইরূপে হস্তীযূথকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগকে "গড়ওয়া" বলে। প্রতি খেদায় পাঞ্জালী সংখ্যা অন্যূন ১৬ জন এবং গড়ওয়া সংখ্যা ৩০০ শত জন হওয়া চাই।

প্রথমতঃ এইরূপ বেষ্টন করিয়া, সকলে একসঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠে, ইহাতে হস্তীযূথ ভীত হইয়া, একস্থানে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহে। এই অবকাশে পাঞ্জালীরা কয়েক হাত অন্তর অন্তরে দুই দুই জন লোক পাহারার কার্য্যে রাখিয়া দেয়। দুই জনের একজন, নিকট হইতে বৃক্ষাদি কাটিয়া পাঞ্জালীদের নির্দ্দেশানুসারে হস্তীদের গমন পথের মুখে এক সুবৃহৎ "খোয়াড়" প্রস্তুত করিতে থাকে। যাহারা প্রহরায় থাকে, তাহাদের সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত রহে।

এই খোঁয়াড়ের বহির্ভাগে বৃক্ষের ঠেকান দেওয়া হয়, যেন ভিতর হইতে ঠেলিয়া ধরিলে কোন অনিষ্ট না ঘটে। উক্ত খোঁয়াড়ের নাম "গড়"।

যখন যে স্থানে হস্তীযূথকে, ঘেরাও করিয়া, অগ্নি জ্বালিয়া আবদ্ধ রাখা হয়, তাহার নাম "পাতবেড়"। এই পাতবেড়ের মধ্যেই গড় বান্ধা হয়। গড়ের মধ্যে একটি ছড়া থাকা চাই; হস্তীরা আবশ্যক মত তাহার জল পান করিবে। পাতবেড়ের পেছন দিকে অর্থাৎ হস্তী যে দিকে থাকে, সেই দিকে গড়ের মুখ রাখা হয়। মুখ হইতে দুই বিপরীত দিকে দুইটা বাহু বিস্তৃত করা হয়, ইহার নাম "পাইরালা"। গড়ের মুখ আবশ্যক মত বন্ধ করিবার জন্য বড় বড় বৃক্ষ নির্ম্মিত দুয়ার কৌশল ক্রমে রক্ষা করা হয়। পইরালার সম্মুখে (এবং দ্বার দেশেও) শুষ্ক বংশ পত্রাদি রাখিয়া দেয়। এদ্ব্যতীত গড়ের ভিতরে ৭/৮ হাত বিস্তার ও প্রায় দুই হাত গভীর এক পরিখা (খালা) খনন করা হয়।

গড় বাঁধনের কার্য্য শেষ হইলে, যথা নির্দ্দিষ্ট সময় পাতবেড়ের পশ্চাৎ দিক হইতে চিৎকার ধ্বনি, বন্দুকের আওয়াজ ও ঢাকের শব্দে তুমুল কোলাহল করিয়া, হস্তীযূথকে বিতাড়িত করে। হস্তীরা সম্মুখ দিক নিরাপদ ভাবিয়া গড়ের দিকে বিদ্যুৎগতিতে ধাবিত হয়। সমস্ত হস্তী পইরালার সীমায় যাওয়া মাত্রই তাহাদের পশ্চাতে, পূর্ব্ব রক্ষিত শুষ্ক পত্র সমূহে অগ্নিদান করা হয়, অগ্নি দৃষ্টে তাহারা অধিকতর ভীত হইয়া গড়ে প্রবেশ করে। দলের শেষ হস্তীটি দুয়ারের সীমা পার হওয়া মাত্র, সুকৌশলে রক্ষিত কপাট বা বৃক্ষ সমূহ দ্বারা পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ও এই স্থানেও শুষ্ক পত্র রক্ষিত থাকিলে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়।

সাধারণতঃ হস্তীরা পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি না করিয়া পলায়ন জন্য সম্মুখে ধাবিত হয়, কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়াই শুষ্ক পরিখা দৃষ্টে ভীত ও পশ্চাৎপদ হয়। কোন কোন দুরন্ত হস্তী পরিখা পার হইয়া, গড় ঠেলিয়া ফেলিয়া বাহির হইতে চেষ্টা পায়; কিন্তু গড়ের বহির্ভাগ হইতে ঠেকান থাকায় ও বাহিরের লোক বল্লম দ্বারা আঘাত করায় হস্তীকে নিরুদ্যম হইতে হয়। ইহাকে "গড়দাখিল" করা বলে। খেদার পক্ষে এই সময়টাই মূল্যবান ও বিপদজনক। খেদার লোকদিগকে এই সময় অতি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। গড়ের দুয়ার বন্ধকরণ, শুষ্ক পত্রে অগ্নিদান ইত্যাদি নিমেষ মধ্যে সমাধা করিতে হয়। হস্তী সমূহ গড়ে আবদ্ধ হইলে, সম্ভবতঃ যত সত্বর পারা যায়, এক একটি শিক্ষিতা পোষা কুন্‌কী সুবিধা মত গড়ে প্রবেশ করাইয়া, তৎসহায়তায় বন্য হস্তী বন্ধন করিয়া

ফেলা হয়। ইহারই নাম হাতী খেদা। খেদাইয়া অর্থাৎ বিতাড়িত করিয়া হাতীকে আবদ্ধ করা হয় বলিয়া, ইহা খেদা নামে কথিত হয়। খেদায় প্রায় সমস্ত দলকেই এক সঙ্গে আবদ্ধ করা যায়।

ফাঁস শিকার

কিন্তু ফাঁস শিকারে প্রতিবারে একটি হাতীর অধিক ধরা যায় না। যখন কোন কারণ বশতঃ অথবা আহারান্বেষণে একাকী একটি কুন্‌কী হাতী বিচরণ করিতে দেখা যায়, তখন মাহুতগণ দুইটি শিক্ষিত পোষা কুন্‌কী লইয়া তাহার নিকট গমন করে। পোষা হস্তিণীদের দেহলগ্ন একগাছি রজ্জুর এক পার্শ্বে ফাঁদ আটা থাকে। পোষা হস্তিণী বন্যটির নিকটবর্ত্তী হইয়া শুণ্ডদ্বারা নিমেষে তাহার মাথায় ফাঁসটি তুলিয়া দেয়। বন্য হস্তী স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস বশে তখন শুণ্ডটি গুটাইয়া লয়, তাহাতে তাহার গলদেশে ফাঁস লাগিয়া যায়। দ্বিতীয় হস্তিণীটিও তৎক্ষণাৎ নিজ দেহলগ্ন ফাঁস বন্যটির গলায় তুলিয়া দিয়া, উভয়ে পেছন ফিরিয়া দুই পার্শ্ব হইতে টানিতে থাকে, উভয়ের টানাটানিতে বন্য হস্তী পরিশ্রান্ত ও "কাবু" হইয়া পড়িলে, মাহুত তাহার পশ্চাদ্দিকের পদে রজ্জু সংলগ্ন করিয়া বৃক্ষে বাঁধিয়া ফেলে।

ফাঁস শিকারে এক উদ্যমে ৪/৫টি হাতীর অধিক ধরা হয় না। মূলাগোল প্রভৃতি স্থানে ফাঁস শিকার করা হয়। ফাঁস শিকারে মাক্‌না কি গুণ্ডা হাতী ধরা অতি বিপদজনক।

পরতালা শিকার

যূথভ্রষ্ট মাক্‌না কি গুণ্ডা হাতী ধরিবার উপায় পরতালা যখন ইহার মদমত্ত হয়, তখন মাহুতগণ চারিটি কুন্‌কী তাহার কাছে লইয়া যায়। হস্তিণী দেখিলেই মদমত্ত হস্তী তাহার কাছে আসে, হস্তিণীগণ তখন তাহার মুখের দিকে পাছা রাখিয়া দাঁড়ায়, প্রাণান্তেও সম্মুখে যায় না; গেলে জীবন রক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে। একটি হস্তিণী সর্ব্ব পশ্চাৎ থাকে, তাহার উপরে উঠিবার জন্য রজ্জু নির্ম্মিত সিঁড়ি রহে। মাহুত অতি সতর্ক ভাবে বন্য হস্তীর পায়ে রজ্জু বাঁধিয়া এই সিঁড়ির সাহায্যে হাতীর উপরে উঠিয়া যায়। এই সময়ে হস্তিনীগণ শুণ্ড দ্বারা স্পর্শাদি করিয়া মদমত্ত হস্তীকে ভুলাইয়া রাখে। শ্রীহট্টে পরতালা শিকারের প্রথা প্রচলিত নাই, খেদা করিয়াই প্রধানতঃ হাতী ধরা হয়।

অন্যান্য জন্তু

হস্তী ব্যতীত শ্রীহট্টের জঙ্গলে বড় বাঘ (Royal Tiger), চিতা বাঘ (Leopard), খুপিবাঘ (Wolf) প্রভৃতি হিংস্র জন্তু প্রায়ই পাওয়া যায়। দূরবর্ত্তী জঙ্গলে গণ্ডার ও কৃষ্ণভল্লুক আছে। পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জিলার দক্ষিণাংশে গণ্ডারের পাল বিচরণ করিত, বর্ত্তমানে লঙ্গাই ও শিংলা উজানের দূরবর্ত্তী জঙ্গলেই হস্তীযূথের ন্যায়, তাহাদিগকে পালে পালে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

প্রায় চল্লিশবর্ষ পূর্ব্বে জঙ্গল সন্নিহিত পল্লীতে বন্য মহিষের উপদ্রব ছিল, লোকে বন্য মহিষ শিকার করিয়া আত্মরক্ষা করিত; কিন্তু এখন আর বন্য মহিষের নাম শুনা যায় না। দুর্গম পাহাড়ে এখনও মহিষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মেট্‌না নামধেয় বন্যগো শ্রীহট্টের জঙ্গলে আছে। কুকি জাতি উহা পোষিয়া থাকে। জয়ন্তীয়ার জঙ্গলে গবয় (বন গরু) আছে।

হরিণের মধ্যে “শিঙ্গাল” ও “খাটলী বা আমড়াখাউরী” নামক দুই জাতি হরিণই সচরাচর দৃষ্ট হয়। শিঙ্গালের বৃহৎ শৃঙ্গ হয় ও ইহারা আকারে গরুর মত বৃহৎ। খাট্লীর আকার ছাগলেরই মত, লোহিত ও কৃষ্ণভেদে ইহারা দুই প্রকার।

জঙ্গল সন্নিহিত গ্রামাদিতে বন্য শূকরের উৎপাত আছে; তত্তৎ স্থানে লোকে পাহারা দিয়া শস্যাদি রক্ষা করে।

এতদ্ব্যতীত লজ্জাবতী বিড়াল, বনবিড়াল, কাষ্ঠবিড়াল, উদবিড়াল, দ্রুতধাবণশীল “বাড়ল” নামক বিড়াল জাতীয় জন্তু, শজারু, শশক, শৃগাল, বন্যরোহিত, নকুল (নেউল) প্রভৃতি বিবিধ জন্তু আছে।

শিকারী

“শিকারী” নামক এক অদ্ভুত জন্তুর নাম শ্রীহট্ট জিলার পূর্ব্বাঞ্চলে শুনা যায়। ইহাদের আকৃতি কুক্কুরের মত, বর্ণ লোহিত এবং লেজ প্রায় দুই হাত পরিমিত হয়। ইহারা বৃক্ষারোহণে সক্ষম। ইহাদের প্রস্রাব এরূপ তেজস্কর যে, কোন প্রাণীর চক্ষে কণামাত্র পতিত হইলে; তৎক্ষণাৎ চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ইহারা মাংসাসী এবং দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। বন্য শূকরের পাল প্রভৃতি দেখিতে পাইলে ইহারা বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক তাহাদের চক্ষে প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া থাকে ও কয়েকটিতে মিলিয়া অন্ধ পশুকে পশ্চাৎ বধ করতঃ ভক্ষণ করে।

শ্রীহট্টের জঙ্গলে বিবিধ জাতীয় বানর আছে। তন্মধ্যে “হনুমান” জাতীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাদের মুখমণ্ডল মশীকৃষ্ণ এবং শব্দ গভীর। ইহাদিগকে সাধারণতঃ হুল্লুক বলে। দ্বিতীয় লাঙ্গুলবিহীন বানর, ইহারা কৃষ্ণকায়, আকৃতিও নিতান্ত ছোট নহে। তৃতীয় দীর্ঘ লাঙ্গুল বানর, ইহাদের বর্ণ অল্প শ্বেতাভ ও লাঙ্গুল দীর্ঘ এবং কপাল রেখাবিশিষ্ট। এই জাতীয় বানর লোকালয়েও আসিয়া থাকে। চতুর্থ মর্কট জাতীয় ক্ষুদ্রাকার বানর সাধারণতঃ লোকালয় সন্নিধানে বাস করে। শ্রীহট্টের জঙ্গলে বনমানুষও মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়।

পালিত পশু

পালিত পশুর মধ্যে হস্তী, অশ্ব, মহিষ (মণিপুরী ও ভাঙ্গর ভেদে দুই জাতীয়), গো, মেষ, ছাগল, কুক্কুর, বিড়ালই প্রধান। শ্রীহট্টে গোজাতির অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে। গোচারণের ভূমির অভাব এবং বংশ বৃদ্ধির জন্য পৃথক ষাঁড় রক্ষা বিষয়ে অবহেলাই ইহার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। গো-রক্ষা বিষয়ে সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। বংশরক্ষাকল্পে বিশেষ ষাঁড় রক্ষা না করাই গো-কুলের অবনতির মূল কারণ বলিয়া গবর্ণমেন্ট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।[২]

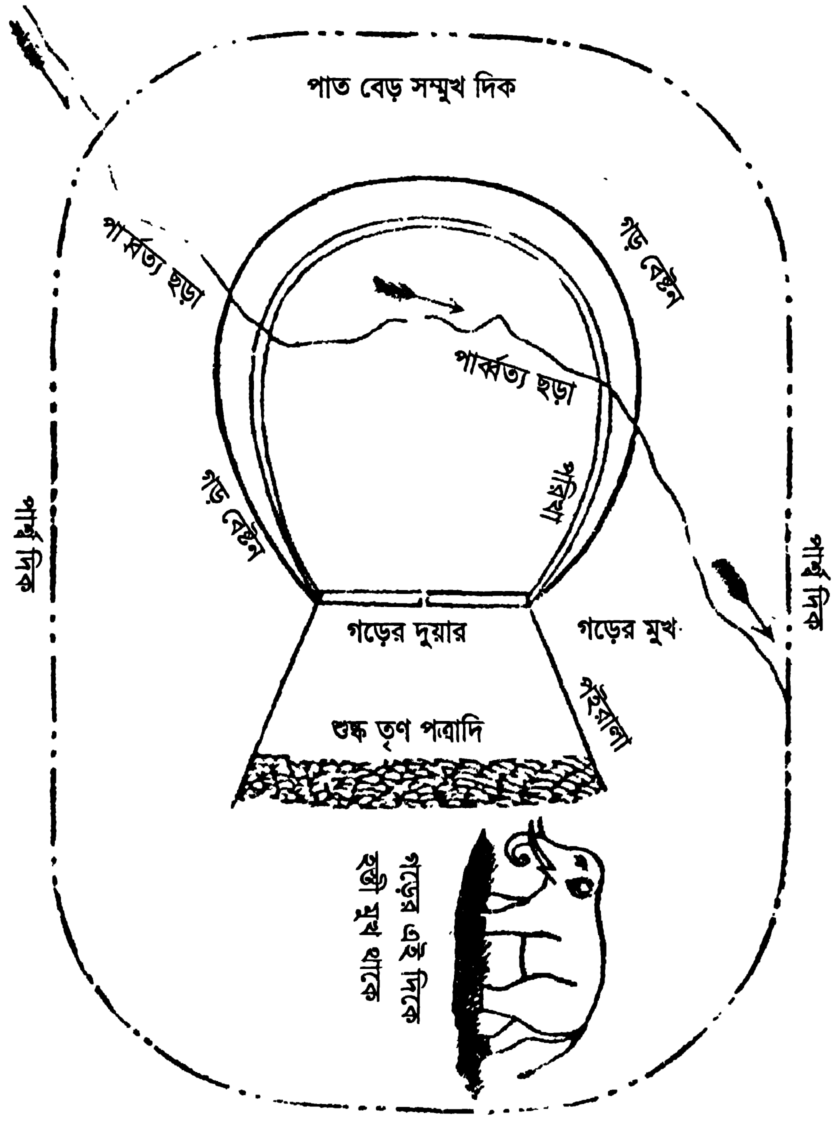
---

২. "The cattle of Sylhet are some of the sorriest of their kind, and are undersized, half starved, and not unfrequently diseased

No attention is paid breeding, cows, bulls alike excercise their reproductive powers at the earliest possible moment, and continue to do so without intermission, the parents of the calf are often close relations and no attempt is ever made to effect any improvement in stock."

-Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap. IV. p. 132.

গোজাতির অবনতির মূল কোথায়; উদ্ধৃত বিবরণে তাহা ব্যক্ত আছে, এ বিষয়ে সমভাবে অবহেলা অনুষ্ঠিত হইলে গো-কুল যে নির্ম্মূল প্রায় না হইবে, তাহা বলা যাইতে পারে না।


পাত বেড় সম্মুখ দিক
পার্ব্বত্য ছড়া
গড় বেষ্টন
পার্ব্বত্য ছড়া
পার্শ্ব দিক
গড় বেষ্টন
পরিখা
পার্শ্ব দিক
গড়ের দুয়ার
গড়ের মুখ
গইঠালা
শুষ্ক তৃণ পত্রাদি
গড়ের এই দিকে
হস্তী মুখ থাকে

খেদার ছবি

পক্ষী

শ্রীহট্ট জিলায় নানাজাতীয় পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য ভাষা অনুকারী পক্ষীর মধ্যে, শ্রীহট্ট জিলায় ময়না, তোতা (শুক), ও শারি (শালিক) প্রভৃতি প্রধান। ময়নার কথা ধীর, গম্ভীর ও স্পষ্ট। ময়নার মধ্যে "সোণাকাণি" অর্থাৎ স্বর্ণকর্ণবিশিষ্ট ময়নাই শ্রেষ্ঠ।

বিঙ্গরাজ (বিহঙ্গরাজ) নামক বিখ্যাত পক্ষী শ্রীহট্টেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আইন-ই-আকবরি প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীহট্টের বিহঙ্গরাজ পক্ষীর সুখ্যাতি লিখিত আছে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ এবং দীর্ঘ লাঙ্গুলবিশিষ্ট। ইহাদের বর্ণ বৈচিত্র না থাকিলেও স্বর বৈচিত্রের জন্য তাহারা বিখ্যাত। যখন ইহাদের সুমিষ্ট স্বর লহরীতে কানন প্রতিধ্বনিতে হইতে থাকে, তখন প্রাণীমাত্রই মুগ্ধ হইয়া থাকে। ইহারা বিবিধ জন্তুর স্বর অবিকল অনুকরণ করিতে পারে বলিয়াই "হরবোলা" নামেও আখ্যাত হয়। ইহাদের মিষ্ট স্বরে আকৃষ্ট হইয়া, অন্যান্য বন্য পক্ষীরা ঝাঁকে ঝাঁকে ইহাদের সঙ্গে থাকে; এই জন্যই ইহাদিগকে "বিহঙ্গরাজ" বলা হয়। ইহারা মাংসাসী পক্ষী; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবিধ পক্ষী ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরাতে, তাহাদের আহারের অভাব হয় না; আবশ্যক হইলে অপর পক্ষী ধরিয়া, তাহার মাংস ভক্ষণ করে।

শেরগঞ্জ নামক পক্ষীর বিষয়ও আইন-ই-আকবরি ও রিয়াজ-উস্-সালাতিন প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। শেরগঞ্জ নীলবর্ণবিশিষ্ট এবং দেখিতে সুন্দর, ইহাদের স্বরও সুমিষ্ট। বিহঙ্গরাজ ও শেরগঞ্জ শ্রীহট্টের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়।

সুমিষ্ট স্বরবিশিষ্ট শ্যামা, দৈয়েল, ক্ষুদ্রকায় তুতিয়া প্রভৃতি আরও অনেক পক্ষী আছে। এ সকল পক্ষীই সযত্নে লোকে পোষিয়া থাকে এবং বাজারেও বিক্রয় হয়।

কোকিল, বউ-কথা-ক (কাঁঠাল পাখী), হল্‌দে পাখী, কাঠঠোকরা, মেছোয়ারাঙ্গা (মৎস্যরঙ্গ), প্রভৃতি পক্ষী সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। পালক ব্যবসায়ীরা মেছোয়া রাখাল শিকার করিয়া লইয়া যায়। এই সকল পাখী বন্য হইলেও কখন কখন লোকালয়েও আসিয়া থাকে।

পাহাড়ে "ধনেশ্বর" নামক এক প্রকার পক্ষী পাওয়া যায়। ইহার আকৃতি বৃহৎ কাকের মত, কিন্তু ঠোঁটটা শরীর হইতেও বড়, এজন্য দেখিতে কদাকার। ইহাদের দেহে চর্ব্বির পরিমাণ অত্যধিক থাকায় রৌদ্রে বাহির হইতে পারে না। লোকে আগ্রহ সহকারে ধনেশ্বর শিকার করিয়া ইহার তৈল সংগ্রহ করে। সুতিকারোগে ইহার তৈল অতি উপকারী। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে ধনেশ্বর দ্বিবিধ।

ঘুঘু (ঢুপী) কয়েক জাতীয়ই দৃষ্ট হয়। "ঘুড়মাকড়" নামীয় বৃহৎ জাতীয় ঘুঘু লোকে আগ্রহ সহকারে শিকার করতঃ তাহার মাংস উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করে।

"মধুরা" নামে এক প্রকার পক্ষী পাহাড়ে থাকে, ইহাদের আকার বন্য কুক্কুট তুল্য কিন্তু শব্দ ঠিক ব্যাঘ্র গর্জ্জনবৎ। ইহাদের শব্দে কখন কখন পার্ব্বত্য প্রদেশের পথিককে বিত্রস্ত হইতে হয়। ময়ুরাকৃতি "পরকদম্ব" পক্ষী তিতর ও বন্য কুক্কুট প্রায় সর্ব্বত্রই আছে।

চিল, বলহা প্রভৃতি বৃহৎ মৎস্যাসী পক্ষী ও বুলবুল, বাবুই, খঞ্জন প্রভৃতি ক্ষুদ্র পক্ষী এবং বিবিধ প্রকার বন্য পক্ষী সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

জলচর পক্ষীর মধ্যে রাজহংস, পাতিহাঁস, সরালি (হংসবিশেষ), বিবিধ জাতীয় বক, ডাউক (দ্যাতুহ) প্রভৃতি বিস্তৃত হাওরে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রাম্য পক্ষীর মধ্যে কাক, চড়ই, শালিক প্রভৃতি প্রধান। জলালী কবুতরকেও এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। জলালী কবুতর পূর্ব্বে এদেশে ছিল না। দিল্লীনগরে পীর

নেজামউদ্দীন, শাহজালালকে এক জোড়া কাজলা (নীল) রঙ্গের কপোত উপহার দেন। শাহজালাল এই জোড়া কবুতর সহ শ্রীহট্টে আগমন করেন, ইহাদেরই বংশধর জলালী কবুতর নামে খ্যাত। ইহাদিগকে হিন্দু মোসলমান কেহই হিংসা করে না।

পালিত পক্ষীর মধ্যে—রাজহংস, পাতিহাঁস, কবুতর ও কুক্কুটই দৃষ্ট হয়। ময়না, তোতা, প্রভৃতি বন্য পক্ষী পোষ মানিলেও পিঞ্জরাবদ্ধ ভাবে রাখিতে হয়।

মৎস্যাদি

মৎস্যের মধ্যে রউ (রোহিত), বাউ (কাতলা), চিতল, বোয়াল, ঘাঘট, শউল প্রভৃতি প্রধান ও সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত পাওয়া যায়।

পার্ব্বত্য নদীর জঙ্গলাংশে মহাশউল ও পালান নামে দুই জাতীয় মৎস্য মিলে। মহাশউলের আকার দীর্ঘাকৃতি রোহিতের ন্যায়, এবং খাইতে সুস্বাদু ও মৃদু (মোলায়েম); আসামের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর উইলসন সাহেব, লাউড়ের পণাতীর্থে এক সময় একটা মহাশউল ধৃত করেন, উহা ওজনে একমণ পয়ত্রিশ সের হইয়াছিল।

শউল জাতীয় পীপলা নামক মৎস্যও পাহাড়ের নদীতে পাওয়া যায়।

সুরমা, কুশিয়ারা, বিবিয়ানা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদীতে প্রতি বৎসর অনেক ইলিশ মৎস্য ধৃত হয়। তদ্ব্যতীত ঘনিয়া, গজার, শউল, কানলা, পাবিয়া, বাচা, বাইন, মাগুর, কই, চেঙ্গ্, চিংড়ি (ইচা), রাণী, টেংরা, পুঁটি প্রভৃতি বহু প্রকার মৎস্য পাওয়া যায়।

ঘাঘট জাতীয় "বাঘমাছ" আকারে অতি বৃহৎ হইয়া থাকে। আট জনের কম লোকে বহন করিয়া নিতে পারে না, এরূপ বৃহৎ আকারের বাঘমাছও ধৃত হয়। বাঘমাছ, গজার, নানিন্দ ও শিঙ্গী প্রভৃতি মৎস্য হিন্দুগণ আহার করেন না।

সুনামগঞ্জ সবডিভিশনেই প্রতি বৎসর সর্ব্বপেক্ষা অধিক মৎস্য ধৃত হয়। মৎস্য ব্যতীত প্রতিবর্ষে অনেক কচ্ছপ ও কমট ধৃত হইয়া থাকে। "বাস্কা" নামীয় কচ্ছপের আদর অধিক। মোসলমানগণ কচ্ছপ স্পর্শও করে না।

সব সময় অনেক বৃহৎ মৎস্যের সংবাদ শুনা যায়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইনায়েতগঞ্জের নিকট কাতিয়া গ্রামে ১৩/১৪ বৎসরের একটি বালক হাওরের জলে ডুব দিয়া ঘাস কাটিয়া ভাসাইয়া দিতেছিল; তদবস্থায় এক বৃহৎ বোয়ালমাছ বালকের মস্তক হইতে কটি পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়াছিল; পরদিন উভয়েরই মৃত্যুদেহ ভাসিয়া উঠিয়াছিল।

সর্পের মধ্যে কৃষ্ণসর্প বা আলদ (ত্রিপুরায় পানক সর্প) অতি ভয়ঙ্কর। ইহাদেরই ফণের উপর গোক্ষুরের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। দাড়াইস, বেকাত্রিশ ও শাঁখানি প্রভৃতি অনেক জাতীয় বিষাক্ত সর্প আছে। বুড়া সাপও অনেক রূপ আছে। পাহাড়ে ওলোবুড়া নামক অজগর জাতীয় সুবৃৎ সর্পও পাওয়া যায়। অজগরেরা হরিণ ও শূকর প্রভৃতি অনায়াসে গিলিয়া ফেলে।

বিবিয়ানা ও ধনেশ্বরীতে ঘড়িয়াল ও কুম্ভীর মধ্যে মধ্যে দেখা যায়।

নদী ও হাওর হইতে বহু উদবিড়াল (উদ) ধৃত করিয়া গড়োয়ালেরা অনেক চর্ম্ম কলিকাতায় চালান দেয় এবং প্রতি বৎসর বহু অর্থ উপার্জন করে।

সপ্তম অধ্যায়

অধিবাসী

শ্রীহট্টের অধিবাসীর মধ্যে হিন্দু, মোসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, দৈত্য উপাসক প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি আছে। কয়েক সম্প্রদায় পার্ব্বত্য জাতি ভিন্ন সকলই বাঙ্গালী জাতি। নিম্নে প্রধান জাতি সমূহের সংক্ষেপ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল। কোন জাতীয় লোক কিরূপ সম্মান'ভাজন এবং তাহাদের সামাজিক অবস্থার বিষয় তৃতীয়ভাগে সামাজিক বিবরণে পশ্চাৎ বিবৃত হইবে, এই স্থানে তত্তাবৎ লিখিত হইল না। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন জাতিদের যে জনসংখ্যা লিখিত হইল, তাহা ১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনানুসারে প্রাপ্ত, বুঝিতে হইবে।

কামার—কামার নবশায়ক জাতির অন্তর্গত। লৌহ দ্রব্য প্রস্তুত করা ইহাদের ব্যবসায়, ইদানীং অনেকে স্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবসায়ও করিয়া থাকে। শ্রীহট্টে ইহাদের সংখ্যা ৯৪৯৫ জন হয়, (তন্মধ্যে পুং ৪৯৯১ এবং স্ত্রী ৪৫০৪ জন।) ছোট নাগপুরাদি অঞ্চলে ইহারা লোহার নামে পরিচিত, গত গণনা কালে ২০০৩ জন লোহার নামে পরিচয় দেয়। লোহারদের অধিকাংশই চা বাগানের কুলির কার্য্যে আমদানী কৃত।

কায়স্থ—কায়স্থ জাতি প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতি হইতে অভিন্ন। কায়স্থ জাতি অতি সম্মাননীয়। লিপি বিদ্যাই তাঁহাদের প্রধান ব্যবসায়। শ্রীহট্টে বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত আছে।[১] শ্রীহট্টে কায়স্থ অধিবাসীর সংখ্যা ৬৩৮৮৩ জন। (তন্মধ্যে পুং ৩২৬৭৬ এবং স্ত্রী ৩১২০৭ জন।)

কাহার—চাষ ও পালকী বহন করাই কাহারদের ব্যবসায়। ইহাদের সংখ্যা শ্রীহট্টে ২২০৭ জন। (তন্মধ্যে পুং ১১৫৫ এবং স্ত্রী ১১৫২ জন।) এই সংখ্যা মধ্যে চা বাগানের কুলির সংখ্যাও কতক সামিল হইয়াছে।

কুমার—ইহারাও নবশায়ক শ্রেণী ভুক্ত।
"গোপ তিলীচ মালীর্চ মন্ত্রীমোদক বারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥"

ইহাদের মধ্যে কুলালই কুমার নামে কথিত। সংখ্যা ১২২৭৮ জন; (তন্মধ্যে পুং ৬১৮৫ এবং স্ত্রী ৬০৯৩ জন।)

কুশিয়ারী—ইহারা "রাঢ়" নামেও কথিত হয়। ইহারা ইক্ষু অর্থাৎ কুশিয়ারের চাষ করিয়া থাকে বলিয়াই ইহাদের এই নাম হইয়াছে। এই জাতীয় লোক বঙ্গের অন্য কোন জিলায় নাই। ইহাদের আকার প্রকার দৃষ্টে অনুমিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে ইহারা কোন পার্ব্বত্য জাতির শাখা বিশেষ ছিল।[২] ইহারা বলবান, সাহসী ও অত্যন্ত পরিশ্রমী। বর্ণ সাধারণতঃ কৃষ্ণ। ইহাদের জল অচল ছিল, সম্প্রতি চল হইতেছে। ইহাদের সংখ্যা ১৩৯০ জন; (তন্মধ্যে পুং ৫৯৫ এবং স্ত্রী ৬০৫ জন।) শ্রীহট্টের জলডুব গ্রামেই ইহাদের বাস অধিক; তাহাদের ব্রাহ্মণগণই জলডুবের অন্যতম

১. এস্থানে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৪শ খণ্ড ১ম সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠা দেখিতে পারেন। নগেন্দ্রবাবু বলেন, সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে বৈদ্য কায়স্থে যৌন সম্বন্ধ ছিল।

২. "The Kusians are a caste indigenous to Sylhet. Their complexion in generally dark, and they are supposed to be descended from some hill tribe."

জমিদার। কুশিয়ার, ভুবি, কাঁঠাল ও আনারসের চাষ ও বিক্রয়ই ইহাদের প্রধান ব্যবসায়।

কেওয়ালী বা কপালী—প্রবাদানুসারে ব্রাহ্মণের দ্বারা শূদ্রার গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি, এবং ক্রিয়াহীনতায় পতিত। ইহাদের জল চল নহে, এবং ব্যবসায় বস্ত্র বয়নই ছিল, এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। সংখ্যা ১১২৬ জন; (তন্মধ্যে পুং ৫২২ এবং স্ত্রী ৬০৪ জন।)

কৈবর্ত্ত—মিঃ রিজলী সাহেবের মতে ইহারাই বাঙ্গালার আদি অধিবাসী। ইহারাই জালিক দাস। আসাম প্রভৃতি স্থানে হালিক নামক তাহাদের আর এক শ্রেণী আছে। ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতা হইতে ইহাদের উৎপত্তি ও তীবর সংসর্গে ইহাদের পাতিত্য কথিত হইয়াছে।[৩] শ্রীহট্টের জালিক কৈবর্ত্ত দাসের সংখ্যা ৪৪৭০১ জন; (তন্মধ্যে পুং ২৩১২৬ এবং স্ত্রী ২১৬১০ জন।)

গণক—গ্রহবিপ্র ও গণক শাস্ত্রে দুই পৃথক জাতি। ভবিষ্য পুরাণের মতে সূর্য্যদেবের ঔরসে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে গ্রহ নক্ষত্রাদির তত্ত্বালোচনার জন্য গ্রহ বিপ্রের উদ্ভব হয়। ইহারাই শাকদ্বীপী বিশুদ্ধ বিপ্র। উক্ত পুরাণের ১৩৯ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব ইহাদিগকে শাকদ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। ইঁহাদের বিশুদ্ধতা ও গৌরব কাহিনী ভবিষ্য পুরাণে বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু গণক জাতি এই গ্রহবিপ্র হইতে বিভিন্ন। শাকদ্বীপী দেবলের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে গণকের জন্ম হয়।[৪] মূলে উভয়ে দুই জাতি হইলেও, উভয় জাতীয় ব্যক্তিগণ "গণক" এই সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্গত হওয়াতে প্রকৃত গণক হইতে শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্র গণকে প্রভেদ করা কঠিন। এইরূপ নাম মাহাত্ম্যে আরও অনেক জাতির অধঃপতন এ অঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয়। সমাজে গণকের সম্মান অধিক নহে, ইহাদের জল অচল। শ্রীহট্ট জিলায় সংখ্যা ৫৬১০ জন; (তন্মধ্যে পুং ২৮৪৭ জন এবং স্ত্রী ২৭৬৩ জন।)

গণ্ডপাল বা গাড়ওয়াল—পূর্ব্বে ইহারা পার্ব্বত্য জাতীয় ছিল বলিয়া বিবেচিত হয়।[৫] নৌকা সংরক্ষণ ও নৌকাচালনে ইহারা অদ্বিতীয়। পূর্ব্বে শ্রীহট্টের পশ্চিমাঞ্চলে জলদস্যুর অত্যন্ত ভয় ছিল, তখন গাড়ওয়াল ব্যতীত কেহই নৌকা চালাইতে সাহস করিত না। ইহাদের সংখ্যা মোটে ৩৩২ জন মাত্র পাওয়া যায়; (তন্মধ্যে পুং ৮৩ এবং স্ত্রী ২৪৯ জন।)[৬]

গন্ধবণিক—প্রাচীন গন্ধবণিক জাতির ব্যবসায় সুগন্ধি দ্রব্যের বিক্রয়। বৈশ্যবর্ণ সম্ভূত বণিকগণ বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকারঃ—গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, কাংসবণিক, সুবর্ণবণিক, মণিবণিক।[৭] এই পঞ্চবণিক মধ্যে গন্ধবণিক শ্রেষ্ঠ। বল্লালচরিত লেখক আনন্দ ভট্ট বলেন যে, ক্রিয়া লোপ হেতু ইহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।[৮] ইহাদিগকে সাধারণতঃ "বাণিয়া" বলা হয়। বর্ত্তমানে স্বর্ণালঙ্কার

---

৩. "ক্ষত্র বীর্য্যেন বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীরব সংসর্গাৎ ধীবরঃ পতিতো ভুবি।"
–ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।
বটতলা মুদ্রিত জাতি মালায় লিখিত হইয়াছে-
"তার কেহ তীবর সঙ্গেতে সঙ্গ করি।
কলিতে পতিত হলো মৎস্য আদি ধরি।"

৪. "শাকদ্বীপাৎ সুপর্ণেন চাণীতো যশ্চদেবলঃ।
তস্মাদ্বৈগণকোজাতো বৈশ্যায়াং বাদকোহপি চ।"
–বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ৯ম অধ্যায়।

৫. "On theory of their (Gandapal's) origin is that they were hilmen who were employed as guards on boats navigating the haors of western Sylhet."-Report on the Census of Assam-1901, part I p. 129.

৬. সেন্সাসের সময় ইহারা বোধ হয় অন্য জিলায় নৌকাবাহনে নিযুক্ত ছিল; তাই পুং সংখ্যা এত কম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

৭. "গান্ধিক শাঙ্খিকশ্চৈব কাংশ্যক মণিকারক।
সুবর্ণ জীবিকশ্চৈব পঞ্চৈতে বণিজঃ স্মৃতাঃ।"
–পরশুরাম সংহিতা।

৮. "নিগমশ্চ গান্ধিকেশ্চ বৈশ্যবর্ণ সমুদ্ভবঃ।
শনৈঃ শূদ্রত্বমাপন্নঃ ক্রিয়ালোপাদি হেতুনা।"–বল্লাল চরিত।

বিক্রয়াদি ইহাদের ব্যবসায়। ইহারা এখন "নবশায়ক" শ্রেণীর ন্যায় পরিগণিত। সংখ্যা ১০৬৬ জন; (তন্মধ্যে পুং ৫৮০ এবং স্ত্রী ৪৮৬ জন।)

গোয়ালা—শ্রীহট্টে গোয়ালদের সংখ্যা অতি অধিক নহে; ইহাদের জল চল আছে। সংখ্যা ১৪১২৭ জন। এই সংখ্যা মধ্যে চা বাগানের কুলি সংখ্যাও আছে।

চামার—ইহারা অন্ত্যজ জাতি, হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে ইহাদের স্থান। চর্ম্ম প্রস্তুত করতঃ বিক্রয় ও চর্ম্মের কাজই ইহাদের ব্যবসায়। ইহাদের সংখ্যা প্রায় দ্বিসহস্র পাওয়া গেলেও, শ্রীহট্টে চামার অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। মুচিগণ পৃথকরূপে গণিত হইলেও, মুচি ও চামার দুই পৃথক জাতি নহে; ইহাদের সংখ্যাও প্রায় পঞ্চ সহস্র। কিন্তু এই সংখ্যার মধ্যে চা বাগানের কুলি সংখ্যাই অধিক। মুচিদের ভিন্ন পুরোহিত নাই।

চূণার—চূণপোড়া ও বিক্রয় ইহাদের ব্যবসায়, শ্রীহট্টে এই জাতীয় লোকের সংখ্যা ২৭০ জন; (তন্মধ্যে পুং ১১৬ এবং স্ত্রী ১৫৪ জন।)

ঢোলি বা বাদ্যকর—ডোম, পাটনি, বা কৈবর্ত্ত হইতে ইহাদের উদ্ভব বলিয়া অনুমিত হয়।[৯] ইহাদের সংখ্যা ১০২৫৫ জন; (তন্মধ্যে পুং ৪৯৮১ এবং স্ত্রী ৫২৭৪ জন।) যাহারা বাদ্যকর বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৫২ জন পূর্বোক্ত সংখ্যার মধ্যে ধৃত হইয়াছে।

তাঁতি—তন্তুবায়গণ মধ্যে সাধারণতঃ ক্ষীর তাঁতি আচরণীয়; অন্যান্য নহে। তাঁতিগণ নবশায়ক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হয়। যথা—

"গোপ তিলিচ মালীচ তন্ত্রীমোদক বারুজী।"

এই শ্লোকোক্ত তন্ত্রীই তাঁতি। শ্রীহট্টে গত লোক গণনার কালে ইহাদের সংখ্যা প্রায় তিন সহস্র হয়, এই সংখ্যা মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিমাঞ্চলের লোক ও চা বাগানের কুলির কাজে আমদানী কৃত।

তেলী—তেলী বা তিলি জাতি নবশায়ক শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ যোগে ইহাদিগকে বৈশ্যবর্ণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয় ইহাদের ব্যবসায়; ইহাদের জল আচরণীয়। সংখ্যা ৩০৩১২ জন; (তন্মধ্যে পুং ১৫৫২১ এবং স্ত্রী ১৪৭৯১ জন।)

দাস—দাস জাতীয়েরা বঙ্গের সামরিক জাতি বলিয়া কথিত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গণনাকালে শ্রীহট্ট জিলায় ইহারা, হালুয়াদাস বলিয়া জাতীয় পরিচয় লিখাইয়াছিল; কিন্তু গত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনায় হালুয়াদাস, দাস ও শূদ্রদাস এই তিন নামে জাতীয় পরিচয় দেয়। পূর্ব্বে ইহাদের জল চল ছিল না, এখন তাহাদের জল চল হইয়াছে। শ্রীহট্টে ইহাদের সামাজিক সম্মান কম নহে; নবশায়ক শ্রেণীর উপরে ইহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু ইহাদের ব্রাহ্মণদের সম্মান সমাজে নিতান্ত অল্প।[১০]

দাস জাতির মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোকও আছেন—তাঁহারা সমাজেও বেশ সম্মাননীয় হইয়াছেন। ইহাদের সংখ্যা ১৪৩০৪৩ জন; (তন্মধ্যে পুং ৭২১৮৯ এবং স্ত্রী ৭৩৮৫৪ জন।)

৯. "A Functional caste which has possibly sprung from the Dom, patni or Kaibarta."-Report on the census of Assam. p. 128.

১০. 'The people who have returned themselves under this name (Das) were called Halwa Das in 1891 According to their own account, the Das were originally a warlike race of Bengal. They had great power and influence in Sylhet, and they now claim to rank above the Nabasakh and in some parts of the Surma valley to be superior to Kayasthas, but this claims are not admotted by the higher castes of Hindus " Ie Report on the census of Assam-1901 p. 127

এই সংখ্যার ভিতর দাস পরিচয়ে পুং ৩৬৩৬৪ স্ত্রী ৩৪৩২৪ জন; শূদ্র পরিচয়ে পুং ২২০২০ স্ত্রী ২৩৩২২ জন, এবং হালুয়াদাস পরিচয়ে পুং ১৩৮০৫ স্ত্রী ১৩৫০৮ জন।

গত লোক গণনাকালে "শূদ্রদাস" বলিয়া অনেক ব্যক্তি (পুং সংখ্যা ১০৬৩২ এবং স্ত্রী ১০৫৮৮ জন।) জাতীয় পরিচয় দিয়াছিল, শূদ্রদাসের মধ্যে "ভাণ্ডারি" শ্রেণীর অনেক ব্যক্তি থাকিলেও, অধিকাংশ সংখ্যাই দাস জাতীয় লোকের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া নিঃসংশয়ে বলা যায়। সেই সংখ্যা যোগ করিলে শ্রীহট্ট জিলায় দাস জাতীয় লোক ১৬৪২৬৩ জন হয়। দাসেরা পরিশ্রমী ও বলবান; চাষ বাসই তাহাদের প্রধান ব্যবসায়।

ধোপা বা ধোবি—রজক জাতীয়গণ ধোপা বা ধোবি নামে কথিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের মতে ধীবর কন্যার গর্ভে ও ধীবরের ঔরসে রজকের উৎপত্তি।[১১] হিন্দুজাতির শুচিত্ব লাভের ইহারা একটি অবলম্বন। বস্ত্র ধৌত করাই ইহাদের ব্যবসায়। শ্রাদ্ধাদিতে ইহাদের সাহায্য ব্যতীত পবিত্রতা প্রাপ্তির পথ থাকে না। গত সেন্সাসের সময় শ্রীহট্ট জিলায় ধোপা ও ধোবি এই দুই সংজ্ঞায় ইহারা জাতীয় পরিচয় দিয়া থাকিলেও, ইহারা এক জাতি। মোট সংখ্যা ২৩৫০৮; (তন্মধ্যে পুং ১১৮৬৯ এবং স্ত্রী ১১৬৩৯ জন।) এই সংখ্যা মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের লোকও কতক আছে।

(নদীয়াল)[১২] ডোম ও পাটনি—মৎস্য ধরা ও জাল, দাম, চাটি, চাঁচ ইত্যাদি প্রস্তুত করাই ইহাদের কর্ম্ম। পাটনিরা নৌকার কাজও করিয়া থাকে। রামচন্দ্র জনকভবন গমন কালীন মাধব পাটনির নৌকায় নদী পার হন বলিয়া কথিত আছে। অন্নদামঙ্গলেও ঘাটিয়াল ঈশ্বর পাটনির নাম পাওয়া যায়। পাটনি আধুনিক জাতি নহে। ডোম ও পাটনি মূলতঃ একই জাতি হইলেও পাটনিরা এক্ষণে ডোম বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। ইহাদের সংখ্যা ৭৩২৪৬ জন; (তন্মধ্যে পুং ৩৭১৬৮ এবং স্ত্রী ৩৬০৭৮ জন।)

নমঃশূদ্র (চণ্ডাল)—নমঃশূদ্র ও চণ্ডাল একজাতি বলিয়াই খ্যাত। কিন্তু মূলতঃ ইহারা এক জাতীয় ছিল বলিয়া বোধ হয় না। চণ্ডালাপেক্ষা নমঃশূদ্র জাতীয়গণ আচার ব্যবহারে অনেকাংশে উন্নত ছিল বলিয়াই অনুমান করা যায়। বিষ্ণুসংহিতায়—"বধ্য ঘাতিত্বং চণ্ডালানাম" বলিয়া উল্লেখ আছে। অর্থাৎ রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে বধ করাই চণ্ডালের কার্য্য ছিল। ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে চণ্ডালের উৎপত্তি হয় বলিয়াই নির্ণীত আছে।[১৩]

নমঃশূদ্র জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, ঋতুর প্রথম দিবসে ঋষির ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে ইহাদের উদ্ভব হয়। কুৎসিত উদরে জাত প্রযুক্ত ইহারা "কূদর" নামে কথিত।[১৪] নমঃশূদ্রগণ সকলেই কাশ্যপ গোত্রীয়; তাহারা কশ্যপ ঋষির সন্তান বলিয়া প্রকাশ করে। পরাশরসংহিতায় লিখিত আছে যে, ঋতুর প্রথমবাসরে নারীগণ চণ্ডালীর ন্যায় পরিগণিত হয়।[১৫] সুতরাং ঋতুর প্রথম দিবসে (কুৎসিত বা অপবিত্র উদরে) গর্ভোৎপত্তি হওয়ায় সেই

১১. "তীবর্য্যাং ধীবরাৎ পুত্রো বভূব বজকঃ স্মৃতঃ।"–ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে।

১২. সেন্সাসরিপোর্টে ডোম ও পাটনি জাতিকে নদীয়াল সংজ্ঞায় অভিহিত করায় ঐ শব্দটি বন্ধনী রাখা গেল।

১৩. "ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেণ পতিতো জারদোষতঃ।
সদ্যো বভূব চণ্ডাল সর্ব্বস্যাধমশ্চাশুচি।"–পরশুরাম সংহিতা।

১৪. "ব্রাহ্মণ্যাং মৃষিবীর্য্যেণ ঋতোঃ প্রথম বাসরে।
কুৎসিতশ্চোদরে জাতঃ কূদর স্তেন কীর্ত্তিতঃ।
তদাশৌচং বিপ্রতুল্যাং পতিত ঋতু দোষতঃ।"–ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্ররাণ।

১৫. "প্রথমেহনি চণ্ডালা দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেনি শুদ্ধ্যতিয়"–পরাশর সংহিতা।

গর্ভোসম্ভূত নমঃশূদ্রগণ চণ্ডাল বলিয়া কথিত হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ ইহারা দুই পৃথক জাতি। সংখ্যা ১৩২৩০৭ জন; ইহারা পরিশ্রমী, কার্য্য তৎপর ও সহিষ্ণু জাতি। মৎস্য শিকার এবং নৌকা চালনাদি ইহাদের ব্যবসায়। চণ্ডালেরা হীনতম জাতি।

নাপিত—ইহারা নবশায়ক শ্রেণীর অন্তর্গত। শ্রাদ্ধ, বিবাহাদিতে ইহাদের সাহায্য ব্যতীত হিন্দুসমাজ পবিত্রতা লাভ করিতে পারে না। ভগবতীর ইচ্ছা ক্রমে সৃষ্টির আদিতে ইহাদের উৎপত্তি হয় বলিয়া কথিত আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে নাপিতের মোদক বৃত্তি অবলম্বন করার উদাহরণ পাওয়া যায়। ক্ষৌরকর্ম্মই ইহাদের ব্যবসায়। ইহাদের সংখ্যা এ জিলায় ২১২২৪ জন হয়; (তন্মধ্যে পুং ১০৭৭৫ এবং স্ত্রী ১০৪৪৯ জন।)

ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ জাতি ভারতবর্ষে হিন্দুজাতীয় সকলের শীর্ষস্থানীয় ও নমস্য। শ্রীহট্টে অতি প্রাচীন কালাবধি ব্রাহ্মণগণের অবস্থিতির প্রমাণ থাকিলেও, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সম্মানিত সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণ আগমন করেন; ইঁহাদের আগমনের সহিত শ্রীহট্টে মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের মত বিশেষ রূপে প্রচলিত হয়। সাম্প্রদায়িক গণের পরে, পশ্চিম দেশ হইতে আরও বহুতর উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এদেশে আগমন করেন। অবস্থাভেদে গুরুতা, জমিদারী ও পৌরোহিত্যই ইঁহাদের জীবনোপায়ের প্রধান পন্থা। অনেকে সরকারী চাকরীও করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা হিন্দু সমাজের ব্যবস্থাপক, শাসক ও সমাজ পরিচালক। ইহাদের উন্নতি অবনতির উপরে হিন্দুসমাজের শুভাশুভ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পূর্ব্বে হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ সমাজের পোষণ জন্য তীব্র দৃষ্টি রাখিত, এবং সাক্ষাৎভাবে তাহার শুভফল প্রাপ্ত হইতে; এখন সময়ের গতিতে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সদব্রাহ্মণের সংখ্যা শ্রীহট্টে ৩৯৭৬১ জন; (তন্মধ্যে পুং ২১২৬৯ এবং স্ত্রী ১৮৪৯২ জন।)[১৬]

ব্রাহ্মণ (বর্ণ্য)—যে সকল জাতির জল সমাজের চল নহে, তাহাদের পৌরোহিত্য করিয়া যে ব্রাহ্মণেরা স্বসমাজ পরিত্যক্ত হইয়াছেন, তাহারাই "বর্ণ ব্রাহ্মণ" নামে আখ্যাত হইয়াছেন। বর্ণ ব্রাহ্মণের সংখ্যা ২৪০০ জন; (তন্মধ্যে পুং ১২৬০ এবং স্ত্রী ১১৪০ জন।)

ভাট বা ভট্টকবি—কবিতা রচনা ও কবিতা গানই ইহাদের ব্যবসায়। ইহারা উপবীত ধারণ করে ও ক্ষত্রিয় জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। শ্রীহট্টে ইহাদের সামাজিক সম্মান কম নহে। ইহাদের সংখ্যা ৭৭৮ জন; (তন্মধ্যে পুং ৩৩২ এবং স্ত্রী ৪৪৬ জন।)

ভূঁইমালী—পাল্কী আদি বহন ও মাটী খনন প্রভৃতি কার্য্য ইহাদের জাতিগত ব্যবসায়। শ্রীহট্ট জিলায় হাড়ি বলিয়া যাহারা পরিচিত, তাহারা ও ভূঁইমালীরা এক জাতীয় লোক হইলেও হাড়ি আখ্যা ধারণ করিতে অনেকেই লজ্জা বোধ করে। গত সেন্সাসে শ্রীহট্টে ১৭৪৯ ব্যক্তি হাড়ি বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিল। এই জাতীয়ের মোট সংখ্যা ৪১১৮৪ জন; (তন্মধ্যে পুং ২০৫৬৪ এবং স্ত্রী ২০৬২০ জন।) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে লেট জাতির ঔরসে চণ্ডালিণীর গর্ভে হাড়ি জাতির উৎপত্তি হয়। কিন্তু ভূঁইমালী বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কোন জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ময়রা—মোদক বা ময়রাদের ব্যবসায় সন্দেশাদি মিষ্টান্ন প্রস্তুত ও বিক্রয়। ইহারা নবশায়ক শ্রেণীর অন্তর্গত শুদ্ধ জাতি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সংখ্যা ৮৫২ জন; (তন্মধ্যে পুং ৪৩৪ জন এবং স্ত্রী ৪১৮ জন।)

মাহারা—পাল্কী বহন ইহাদের কার্য্য। সম্প্রতি চাষ আবাদ করিতেছে। ইটার রাজা সুবিদ নারায়ণ এই জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কথিত আছে। ইহাদের জল চল না হইলেও হুঁকা চল আছে। (অন্যান্য জিলায় কাহার জাতীয়গণ অনেকাংশে মাহারাদের তুল্য।) সংখ্যা ৩৪৮১ জন;

১৬. শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণ সংখ্যা ইহার অনেক অধিক সন্দেহ নাই। সেন্সাসে অনেক ভুল আছে।

(তন্মধ্যে পুং ১৪৪৮ এবং স্ত্রী ২০২৩ জন।)

মালো—ইহারা মৎস্যজীবী জাতি। হিন্দু সমাজে কৈবর্ত্তের পরেই ইহাদের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।[১৭] শ্রীহট্ট জিলায় ইহাদের সংখ্যা ১৫৯৮২ প্রাপ্ত হওয়া গেলেও, ইহার মধ্যে প্রকৃত শ্রীহট্টবাসীর সংখ্যা অতি সামান্য। পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার অধিকাংশই চা বাগানের কুলিদের প্রাপ্য।

যুগী—গঙ্গাপুত্র কন্যার গর্ভে বেশধারীরপুত্র রূপে যুগী জাতির উৎপত্তি হয়।[১৮] বল্লাল চরিত লেখক গোপালভট্ট বলেন যে, রাজকোপে ও আচার ভ্রষ্টতা হেতু ইহারা অনাচরণীয় হইয়াছে। যুগীগণ আপনাদের আদি পুরুষের নাম গোরক্ষনাথ বলিয়া উল্লেখ করে, এবং নিজেরা "নাথ" উপাধি ধারণ করে।[১৯] তাহারা যোগীর সন্তান বলিয়া, মৃত্যু হইলে সন্ন্যাসীর ন্যায় দেহ সমাহিত করে। ইহাদের পুরোহিত নাই, স্বজাতির মধ্যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যজ্ঞসূত্রে ধারণ করতঃ পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়া থাকে; ইহারা মোহন্ত নামে পরিচয় দেয়। বস্ত্রবয়ন ইহাদের ব্যবসায়, অধুনা অনেকেই চাষ আবাদ করিয়া থাকে। সংখ্যা ৭৮৯১৫ জন; (তন্মধ্যে পুং ৩৯৬১৩ এবং স্ত্রী ৩৯৩০২ জন।)

লোহাইত কুরী—মেঘনা তীরবর্ত্তী লোহাইতেরা মৎস্য ধৃত ও বিক্রয় করতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। শ্রীহট্টবাসী লোহাইত কুরীগণ ধান্য সিদ্ধ দিয়া উষ্ণা তুণ্ডুল প্রস্তুত করতঃ তাহার ব্যবসায় করে। ইহাদের প্রস্তুত খৈ প্রসিদ্ধ। সংখ্যা ৩৯৮; (তন্মধ্যে পুং ২২৩ এবং স্ত্রী ১৭৫ জন।)

বারুই—বারুজীগণ বর প্রস্তুত করতঃ পাণের ব্যবসায় করে বলিয়া "বরজ" বা বারুই নামে কথিত হয়। বারুজীগণ নবশায়ক শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে ভদ্র, মিত্র, দত্ত, নন্দী, দেব প্রভৃতি উপাধির প্রচলন দৃষ্টে কেহ কেহ কায়স্থ হইতেই ইহাদের উদ্ভব অনুমান করেন। আবার কেহ কেহ ইহা দিগকে বৈশ্য বর্ণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শিক্ষিত বারুজীগণ মধ্যে (পশ্চিম বঙ্গে) "বৈশ্য বারুজী" সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, ইহাদিগকে বৈশ্যবর্ণ বলা অযৌক্তিক হয় নাই। শ্রীহট্টে বারুজীগণ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতেই অধিক আগ্রহান্বিত। এই রূপে কায়স্থ বলিয়া আত্মগোপন করায় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র আসাম প্রদেশে বারুজী সংজ্ঞায় ৪৪২৯ ব্যক্তিকে মাত্র পাওয়া গিয়াছিল। ১৯০১ অব্দে ইহাদের সংখ্যা শ্রীহট্ট জিলায় ১৬৩৪৬ জন; (তন্মধ্যে পুং ৮৩৩৮ এবং স্ত্রী ৮০০৮ জন।)

বৈদ্য—বৈদ্য জাতি অতি সম্মানিত। বৈদ্যগণই পৌরাণিক অম্বষ্ঠ জাতি। মনুসংহিতা মতে ব্রাহ্মণের, বিধিমত বৈশ্যকন্যাতে জাত সুপুত্রই অম্বষ্ঠ।[২০] ইহাদের জাতিগত ব্যবসায় ব্রাহ্মণের চিকিৎসা।[২১] শব্দকল্পক্রমেও বৈদ্যগণের ব্যবসায় চিকিৎসা বলিয়া কথিত হইয়াছে।[২২] কিন্তু ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ মতে বিপ্ররমণীর গর্ভে অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক উৎপন্ন পত্রই বৈদ্য।[২৩] রাজা রাধাকান্ত

---

১৭. Malo-A fisher caste, ranking below the Kaibarta.
-Report on the Census of Assam-190. p. 138.

১৮. "গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্যেন বেশধারিণ।
বভূব বেশধারীচ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ।" -ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

১৯. "In Surma valley they (Jugis) style themselves Nath, and claim descent from Goraksha nath, a devotee of Gorak pur." -Report on the Cunsus of Assam-1901. p. 131

২০. "ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্য কন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।" (১০ অধ্যায় ৮ শ্লোঃ)
"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতশ্চম্বষ্ঠ উচ্যতে।"-মনুসংহিতা।

২১. বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাত অম্বষ্ঠ মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দষ্টো মুন-পুঙ্গবৈ।"

২২. "অম্বষ্ঠ। বিপ্রাদ্বৈশ্যায়ামুৎপন্নঃ অয়ং চিকিৎসাবৃত্তিঃ,
বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ।"-শব্দকল্পদ্রুম ৫ম খণ্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা।

২৩. "বৈদ্যহশ্বিনী কুমারেন জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।"
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ-ব্রহ্মখণ্ড ১০ম অধ্যায়।

দেব বাহাদুর ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত বৈদ্যগণকে সর্পের মন্ত্রৌষধি পরায়ণ "মালবৈদ্য" বলিয়া লিখিয়াছেন।[২৪] সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত বৈদ্যদিগকে অম্বষ্ঠ বলা যাইতে পারে না। পশ্চিম বঙ্গে বৈদ্যগণ উপবীত ধারণ করেন। শ্রীহট্টে অতি প্রাচীন কালাবধি বৈদ্য জাতির বাস ছিল, ভাটেরার তাম্রফলকে জনৈক বৈদ্যবংশীয় রাজমন্ত্রীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে রাজা গৌড় গোবিন্দ বৈদ্যজাতীয় মহীপতি দত্তকে এদেশে আনয়ন পূর্ব্বক স্থাপন করার বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীহট্টের বৈদ্যগণ উপবীতধারী নহেন এবং কায়স্থের সহিত তাঁহাদের আদান প্রদান প্রচলিত আছে। তাঁহারা কায়স্থের ন্যায়ই মাসাশৌচ ধারণ করেন। শ্রীহট্ট জিলায় তুঙ্গেশ্বর প্রভৃতি ২/১ স্থানে বর্ত্তমানে বিশুদ্ধতা সংরক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি লক্ষিত হয়। ইহাদের সংখ্যা ৩৭৯৬ জন; (তন্মধ্যে পুং ১৯৬২ এবং স্ত্রী ১৮৩৪ জন।)

শাঁখারি—পরশুরাম সংহিতায় গান্ধিক, শাঙ্খিক, কাংস্যক, মণিকারক ও সুবর্ণ জীবিকা বলিয়া যে পঞ্চবণিকের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে শাঙ্খিক বণিকগণই শাঁখারি নামে কথিত হন। ইহারা বৈশ্যবর্ণ। কায়স্থ সমাজভুক্ত হইতে ইহাদের অত্যধিক আগ্রহ। ইহাদের ব্রাহ্মণগণ এখনও অনাচরণীয় রহিয়াছেন; ইহাদের সংখ্যা ৭০ জন মাত্র, কিন্তু এই সংখ্যা ঠিক নহে, অনেকেই কায়স্থ বলিয়া আত্মগোপন করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

শুঁড়ী— শৌণ্ডিক বা শুঁড়ী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের মতে বৈশ্য পুরুষ ও ধীবর কন্যার যোগে শুঁড়ীর উৎপত্তি।[২৫] পরশুরাম সংহিতার মতে কৈবর্ত্ত পিতা গাণিক মাতার যোগে ইহাদের উদ্ভব হয়।[২৬] শুণ্ডা বা সুরা প্রস্তুত ও বিক্রয়ই ইহাদের ব্যবসায়। বৈদিক যুগে যখন সোম সুরা পবিত্র বস্তু মধ্যে পরিগণিত ছিল, তখন শুঁড়ী জাতি অনাদৃত ছিল না, পরে কাল ক্রমে নীচ ব্যবসায়ী বলিয়া নীচ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। মদ্য ব্যবসায়ী শুঁড়ীর সংস্রবে গেলে, মদের প্রলোভনে পড়িতে হয়, এই জন্য হিন্দু সমাজের এই সতর্কতা। হস্তীপদতলে প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি শুণ্ডিকালয়ে যাইবে না,[২৭] ইতি বাক্যের উৎপত্তি এই জন্যই হইয়াছিল। শুঁড়ীগণ প্রায়শঃ সাহা উপাধি ধারণ করে; এই জন্য যাহারা নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে বৈশ্য-সাহা জাতি হইতে পরিচয় করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহারা যে বৈশ্য সাহা জাতি হইতে পৃথক, তাহারা নিজেই মুদ্রিত পুস্তকাদি প্রচার করতঃ তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিতেছে।

সাহা বা সাহু—পরশুরাম সংহিতায় "গান্ধিক শাঙ্খিক শ্চৈব কাংসক মণিকারক, সুবর্ণজীবিকশ্চৈব পঞ্চৈতে বণিজস্মৃতাঃ;" বলিয়া যে পঞ্চবণিকের উল্লেখ আছে, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় 'সিদ্ধান্ত সমুদ্র ষষ্ঠ খণ্ডে এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ঘোষ মহাশয় "কুলপ্রতিভা" গ্রন্থেব তৃতীয় খণ্ডে, বহুতর অকাট্য প্রমাণ সহযোগে সাহাজাতিকে সেই পঞ্চ বণিকের অন্তর্গত মণিবণিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুলপ্রতিভায় লিখিত হইয়াছে যে, মণি বণিকেরা পরবর্ত্তীকালে শস্যাদি বিক্রয় ব্যবসায়ে বৃত হওয়া খন্ধবণিক বলিয়া খ্যাত হয়। সুতরাং ইহারা

---

২৪. "বৈদ্যোহশ্বিনী কুমারেন জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।
তেচ গ্রাম গুণশ্চ মন্ত্রৌষধি পরায়ণ।
তেভ্যাশ্চ জাতো সন্তানং তে ব্যাল গ্রহিনৌভুবি।"
–শব্দকল্পদ্রুম।

২৫. "বৈশ্য তীবর কন্যায়াং সদ্যঃ শুণ্ডী বভূবহ।"–ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ।

২৬. "তাতো গাণিক কন্যায়াং কৈবর্ত্তাদের শৌণ্ডিকঃ।"

২৭. "হস্তিনা পীড্যমানোপি ন গচ্ছেৎ শৌণ্ডিকালয়ং।"

বৈশ্যবর্ণ সম্ভূত। প্রায় দ্বাদশবর্ষ যাবৎ ঢাকার সাহাগণ "স্বজাতি হিতসাধন সমিতি" প্রতিষ্ঠা করতঃ আপনাদিগকে বৈশ্যবর্ণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সাহা উপাধিটা প্রকৃত পক্ষে বৈশ্যদের উপাধি। অমরকোষ অভিধানে বৈশ্যদিগকে "সার্থবাহো" বলিয়া উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সাহা শব্দ এই "সার্থবাহ" শব্দ হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলেন যে, বণিকদিগকে সাধু বলিত, তৎপর সাহু এবং তাহার পর সাহা উপাধি দাঁড়াইয়াছে। সাহাদের আকৃতি এবং তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে তাহাদিগকে কখনই নীচ শ্রেণীর লোক বলিয়া বোধ করা যায় না। "প্রচ্ছন্না বা প্রকাশ্যা বা বেদিতব্যা স্বকর্ম্মভিঃ;" মনুসংহিতোক্ত ইতি প্রমাণে তাহাদের কার্য্যাদি দর্শন করিলে, পূর্ব্বকথিত সিদ্ধান্তে অবিশ্বাস করিবার হেতু পাওয়া যায় না। "সাহাকুল পরিচয়" নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, বৈশ্য জাতীয় খন্ধবণিকগণ বঙ্গভূমে আসিয়া বৌদ্ধভাবাপন্ন হওয়ায়, সমাজে অচল হয়; আবার কেহ কেহ, বল্লালের কোপে সুবর্ণবণিকের ন্যায় দশাগ্রস্ত হওয়ার কথাও বলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ফরেক্কাবাদে এবং আসাম-কামরূপে সাহাদের জল অচল নহে। যাহা হউক, সাহা উপাধিটাই বর্ত্তমানে তাহাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কারণ প্রকৃত শুঁড়ীরাও সাহা উপাধি ধারণ করায়, এবং তন্মধ্যে যাহারা মদ্য প্রস্তুত ইত্যাদি ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছে, বৈশ্য সাহা জাতি হইতে তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। এই এক উপাধির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সাধারণতঃ ইহারা অনেকাংশে অবজ্ঞাত হইয়াছে।

শ্রীহট্টে সাহা শ্রেণীর বহুতর লোক আছেন। সাধারণ সম্মানে কায়স্থের পরেই তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, ইহা (মিঃ ওয়ালটন প্রভৃতি) বহুতর রাজপুরুষ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উত্তর শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ ও দক্ষিণ শ্রীহট্ট (পূর্ব্বাংশ) বাসী সাহুগণ, সিদ্ধান্তসমুদ্র, কূলপ্রতিভা, সাহাকুল পরিচয় প্রভৃতি মুদ্রিত পুস্তকগুলির প্রতিপাদিত ঠিক বৈশ্যবর্ণ ছিল না, ইহারা উক্ত বৈশ্য সাহা-বণিকগণ হইতেও বিভিন্ন ছিল। রাজা সুবিদ নারায়ণের সময়, পূর্ব্বোক্ত বৈশ্য-সাহার সংস্রবে, বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজ হইতে ইহারা পৃথক হইয়া পড়ে এবং কালক্রমে আপনাদিগকে বৈশ্যসাহা জ্ঞানে তদনুরূপই চলিয়া আসিতেছে। "কুলাঞ্জলী" নামে হস্তলিখিত এক পুথিতে ইহাদের উৎপত্তি কথা সংক্ষেপে লিখিত পাওয়া গিয়াছে।[২৮] ইহাদের সংখ্যা অতি সামান্য এবং ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে; অনুমান ছয় সহস্রের অধিক হইবে না; ইহারাও সাধু (সাউধ) বা সাহু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহাদের বিবরণ পশ্চাৎ উক্ত হইবে।[২৯] সমগ্র শ্রীহট্ট জিলায় সাহাদের সংখ্যা ৩৪৪০৬ জন; (তন্মধ্যে পুং ১৬৮৫৫ এবং স্ত্রী ১৭৫৫১ জন।)

সুবর্ণ বণিক বা সোণার—সুবর্ণবণিকগণ, বৈশ্যবর্ণ সম্ভূত পঞ্চবণিকের একতম। কথিত আছে, রাজা বল্লাল সেন সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের বল্লভানন্দ নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট কোটি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করেন; বল্লভানন্দ বিনা "বন্ধকে" ঋণদানে অসম্মত হওয়ায় বল্লাল ক্রোধভরে জ্বলিয়া উঠেন এবং প্রতিফল স্বরূপ ইহাদিগকে সমাজে অচল করেন। কেহ বলেন যে স্বর্ণ অপহরণ দোষেই ইহারা পতিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতকে ইহাদের

২৮. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ইহাদের উৎপত্তি বৃত্তান্ত এখনও অতি প্রাচীন ঘটনা হইয়া দাঁড়ায় নাই, এখনও বহুতর ব্যক্তি পরম্পরায় সে সংবাদ জ্ঞাত আছেন। বৈশ্য-সাহা সংস্রবের পর তাহারা পরস্পর কি ভাবে চলিতেছে, সামাজিক বৃত্তান্তে সে কথা দ্রষ্টব্য।

২৯. হবিগঞ্জ প্রভৃতি ভাটী অঞ্চলের সাহাবণিকগণ পূর্ব্ববঙ্গের অপরাপর জিলাবাসী সাহা জাতি অপেক্ষা অনেক উন্নত হইলেও মূলতঃ বঙ্গদেশীয় তাবৎ সাহাবণিকই বৈশ্যবর্ণ সম্ভূত। বিহারাদি অঞ্চলের বৈশ্যজাতীয় প্রধান ব্যক্তিবর্গ ইহা স্বীকার করেন। (see the Report on the census of Bengal-1901)

পাতিত্যের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীহট্ট জিলায় ইহাদের সংখ্যা ৭৭৫ জন; (তন্মধ্যে পুং ৩৩৮ এবং স্ত্রী ৪৩৭ জন।) পঞ্চখণ্ডে ইহাদের ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেক অবস্থাপন্ন লোক আছেন।

পার্ব্বত্য জাতি

শ্রীহট্ট জিলায় কয়েকটি পার্ব্বত্য জাতির বাস আছে, ইহাদের মধ্যে অনেকটি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। যাহারা হিন্দু নহে, তাহারা ভূত, দৈত্য, বৃক্ষ বা পশুউপাসক। কেহ কেহ হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছে এবং কেহ কেহ বা একবারে হিন্দুভাব বর্জ্জিত। নিম্নে তাহাদের বিষয় লিখিত হইল।

কুকি—কুকিগণ পাহাড়ে বাস করে। অনেকে বলেন যে, ইহারাই অতি প্রাচীনকালে দেশের মালীক ছিল, আর্য্যজাতি দেশ হইতে ইহাদিগকে বিতাড়িত করেন। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ হালাম ও তিপ্‌রা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশ সংখ্যা তিপ্‌রাদের সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিগত লোক গণনা কালে কেবল মাত্র ৩৬১ জন ব্যক্তি কুকি বলিয়া জাতীয় পরিচয় দিয়াছিল; (তন্মধ্যে পুং ১৫৭ এবং স্ত্রী ২০৪ জন।)

খাসিয়া ও সিন্টেং—ইহারা খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্ব্বতের অধিবাসী। ইহাদের সংখ্যা ৩০৮৩ জন; (তন্মধ্যে পুং ১৬০৪ এবং স্ত্রী ১৪৭৯ জন।) এই সংখ্যা মধ্যে হিন্দু সংখ্যা ১৬৯৪ এবং সিন্টেং ৪২ জন মাত্র। খাসিয়াদের অনেকেই খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

শ্রীহট্ট কয়লা প্রভৃতি বিক্রয়কারী পাতরজাতীয় ব্যক্তিগণ হিন্দুমতাবলম্বী খাসিয়া জাতি হইতে পৃথক নহে।

গারো—গারো পাহাড়ের দৈত্যাদি ও পশু উপাসকদিগের নাম গারো। শ্রীহট্টে ইহাদের সংখ্যা ৭৪৬ জন মাত্র; (তন্মধ্যে পুং ৪১৩ এবং স্ত্রী ৩৩৩ জন।) এ তন্মধ্যে হিন্দু গারো সংখ্যা ৯৪ জন মাত্র।

তিপ্‌রা—ইহারা বোদো জাতীয়। ত্রিপুরা বা তিপ্‌রাগণ হিন্দু। তিপ্‌রারা বাঙ্গালী সংস্রবে অনেকটা উন্নত হইতেছে এবং মণিপুরীদের আচার ব্যবহার অনুকরণ করতঃ তাহাদের ন্যায় বেশভুষা ধারণ করিতে যত্ন করিয়া থাকে। তিপ্‌রা কুমারীগণকে অনেক সময় মণিপুরী "লাইচারী" হইতে চিনিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। শ্রীহট্টে বহুতর কুকি তিপ্‌রা পরিচয়ে আত্মগোপন করিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ৮২৬১ জন; (তন্মধ্যে পুং ৪০৯৩ এবং স্ত্রী ৪১৬৮ জন।)

মণিপুরী—মণিপুরীরা শ্রীহট্টের ঔপনিবেশিক জাতি। ইহারা অর্জ্জুন পুত্র বভ্রুবাহনকে আদিপুরুষ বলিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে ও উপবীত ধারণ করে। কিন্তু পূর্ব্বে এইরূপ পরিচয় দিত না। মণিপুররাজ চিংতোম্‌খোম্বার শাসনকালে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ অধিকারীগণ তাহাদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করতঃ উপবীত প্রদান করেন।[৩০] বিষ্ণুপুরীয়ারা ও কালাচাই ভেদে ইহারা দ্বিবিধ। বিষ্ণুপুরীয়ারা কৃষ্ণবর্ণ এবং পার্ব্বত্য জাতীয় বলিয়া সহজেই বোধ হয়। মণিপুরীরা পূর্ব্বে যে পার্ব্বত্য জাতীয় ছিল, তাহার বহুতর প্রমাণ আছে, কিন্তু শ্রীহট্ট অঞ্চলের মণিপুরীরা বহুদিন বাঙ্গালী সংস্রবে থাকায়, অনেক পরিমাণে বাঙ্গালী স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। মণিপুরীরা বলবান, সাহসী ও বীর। ইহাদের একতা অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহাদের স্বভাব উদ্ধত এবং তাহারা আইনের ধার বড় অধিক ধারে না।[৩১] শ্রীহট্ট সদর, প্রতাপগড়স্থ পাথারকান্দি, জফরগড়ের

৩০. বঙ্গদর্শন পত্রিকা-১২৮৪ সাল। এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস দেখ।

৩১. "The Manipuris are by nature a turbulent and unruly people, and have little respect for the majesty of the low." etc.

-The Assam District Gazetteers vol. (Sylhet) chap. III. p. 78.

লক্ষ্মীপুর, ডলু, শিলং, লংলা, ধামাই, গৌরনগর, পাথারিয়া, তরফ, আসামপাড়া ও সুনামগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস আছে। ব্রহ্মযুদ্ধের পরই মণিপুরীরা শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে আগমন করতঃ উপনিবেশ স্থাপন করে। মণিপুরীদের পৃথক এক কথা ভাষা আছে। ইহাদের সংখ্যা ১৬০৪৩ জন; (তন্মধ্যে পুং ৮০৮৫ এবং স্ত্রী ৭৯৫৮ জন।)

লালুং—ইহারা খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া বসতি করিতেছে। কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে ইহারা ডিমাপুরের (কাছাড়ের) নিকট বাস করিত, তথাকার রাজা মানবদুগ্ধ পান করিতেন এবং ইহাদিগকে প্রত্যহ ছয়সের দুগ্ধ যুগাইতে আদেশ করেন। ইহারা রোজ ছয়সের নারীদুগ্ধ যুগান অসাধ্য ভাবিয়া, ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক জয়ন্তীয়ায় আসিয়া বাস করে। ইহারা বিবাহান্তে স্ত্রীর পিতৃবংশভুক্ত হয়, কিন্তু স্বীয় মরণান্তে আবার নিজবংশত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট জিলায় ইহাদের সংখ্যা ৬৩৯ জন; (তন্মধ্যে পুং ৩১৫ এবং স্ত্রী ৩২৪ জন।)

মোসলমান জাতি

কুরেষি—ইহা এক বংশ বিশেষ। হজরত মোহাম্মদ এবং শ্রীহট্টের শাহজালাল এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের কুরেষি বংশীয়দের পূর্ব্বপুরুষ মক্কায় সন্নিহিত স্থান হইতে আগমন করেন। ইহাদের সংখ্যা ৩৭৫ জন; (তন্মধ্যে পুং ১৮৪ এবং স্ত্রী ১৯১ জন।)

গাইন—ইহারা নিম্নশ্রেণীর গায়ক সম্প্রদায়। কখন কখন পুতির মালা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া থাকে। সংখ্যা ২২০ জন; (তন্মধ্যে পুং ১০৫ এবং স্ত্রী ১১৫ জন।)

জোলা—নিম্নশ্রেণীর বস্ত্র ব্যবসায়ী। ইহাদের সংখ্যা ৪৯১ জন; (তন্মধ্যে পুং ২১৫ এবং স্ত্রী ১৭৬ জন।)

নাগারছি—ইঁহারা বাদ্যকর, কাড়া, ডোল সহকারে বাদ্য করিয়া থাকে। সংখ্যা ৪৯৪; (তন্মধ্যে পুং ২৫২ জন এবং স্ত্রী ২৪২ জন।)

পাঠান—শেখ, সৈয়দ, পাঠান, মোগল এই চারি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঠান একতম। ইহাদের সংখ্যা শ্রীহট্টের ৬৪২০ জন; (তন্মধ্যে পুং ৩৪৩৬ এবং স্ত্রী ২৯৮৪ জন।)

মাহিমাল—ইহারা মৎস্যজীবী। সংখ্যা ৩৫১৯৫ জন; (তন্মধ্যে পুং ১৭৫৫৬ এবং স্ত্রী ১৭৬৩৯ জন।)

মীর শিকারি—নিম্নশ্রেণীর শিকারি জাতি। পক্ষী প্রভৃতি শিকার করিয়া ভ্রমণ করে। সংখ্যা ৩৯৫ জন; (তন্মধ্যে পুং ১৭১ এবং স্ত্রী ২২৪ জন।)

মোগল—দিল্লীর বাদশাহগণ এই জাতীয় ছিলেন। ইহাদের সংখ্যা ৪৯৩ জন; (তন্মধ্যে পুং ২৪৯ এবং স্ত্রী ২৪৪ জন।)

বেজ—পক্ষী শিকার ও সর্প ক্রীড়া প্রভৃতিই বেজদের ব্যবসায়। ইহাদের সংখ্যা ২৩৩ জন; (তন্মধ্যে পুং ১১১ এবং স্ত্রী ১১২ জন।) এই এক ব্যবসায়ী বেদিয়া জাতির বাসও শ্রীহট্টে আছে; ইহাদের সংখ্যা ৫৮ জন মাত্র। বেদিয়ারা হিন্দুধর্ম্ম মানিয়া চলে।

শেখ—আরবের সাধারণ মোসলমানদের উপাধি শেখ। শ্রীহট্টে শেখ উপাধি বিশিষ্ট মোসলমানের সংখ্যা ১১২৬৩৪৯ জন; (তন্মধ্যে পুং ৫৭৩৬১৫ এবং স্ত্রী ৫৫৩০৩৪ জন।) লোক গণনা কালে অনেক মাহিমাল জাতীয় লোক শেখ সাজ্জায় আত্মগোপন করিয়াছিল।

সৈয়দ—যাঁহারা হজরত মোহাম্মদের জামাতা আলীর বংশ জাত তাঁহারাই সৈয়দ।

মোসলমান সমাজে ইহারা অতি সম্মানিত। ইহাদের সংখ্যা ৬৫৯৮ জন; (তন্মধ্যে পুং ৩৩১৫ এবং স্ত্রী ৩২৮৩ জন।)

খৃষ্টীয়ান জাতি

খৃষ্টীয়ান জাতি মধ্যে বুন্দাশিলের নেটিভ খৃষ্টীয়ানগণ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনৈক নবাব কর্ত্তৃক গোলন্দাজ সৈন্যরূপে শ্রীহট্টে আনীত হয়; সুতরাং তাহারা বহুদিনের ঔপনিবেশিক জাতি।[৩২] শ্রীহট্টে ছড়ার পারে কতক খৃষ্টীয়ান অধিবাসী আছে। সংখ্যা ৩৯৪ জন; (তন্মধ্যে পুং ১৮৬ এবং স্ত্রী ২০৮ জন।)

উপরের লিখিত অধিবাসীদের সংখ্যা কোন সবডিভিশনে কত তাহা ছ-পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

কুলি

চা বাগানের কাজে ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে হিন্দু, মোসলমান মধ্যে বহুতর বিভিন্ন জাতীয় লোক শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছে, ইহাদের মোট সংখ্যা ১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনায় ১৪৪৮৭৬ জন হইয়াছিল। ইহাদের জন্মভূমি শ্রীহট্ট নহে বলিয়া, অধিবাসীদের পরিচয় বর্ণনে তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন অল্প সংখ্যক, এক জাতীয় লোক, অন্য উচ্চতর জাতীয়ের পরিচয়ে সম্পূর্ণ আত্মগোপন না করিয়াছে, এমন বলা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীহট্টের ঢালকর জাতি ও কাঁসারী জাতির উল্লেখ এস্থলে করা যাইতে পারে। কাঁসারীরা বৈশ্য বর্ণ, ইহারা কায়স্থ পরিচয়ে আত্মগোপন করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা শ্রীহট্টে এত অল্প যে, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই।

ভিন্ন দেশাগত প্রত্যেক জাতির সংখ্যা পুং স্ত্রী অনুসারে জ—পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে।

৩২. "Their forefathers are said to have been settled there at the beginning of the 18th century by a Muhammadan Nowab." &
-Assam District Gazetteers vol II (Sylhet) chap. III. p. 90.

অষ্টম অধ্যায়

ধর্ম্ম ও শিক্ষাদি

ধর্ম্ম

মোসলমান

শ্রীহট্টের প্রায় সমস্ত অধিবাসীই বাঙ্গালী। পূর্ব্বাধ্যায়ে যে সমস্ত অধিবাসীর বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল, তন্মধ্যে মোসলমান সংখ্যাই অধিক। উত্তর শ্রীহট্ট বহুপূর্ব্বে মোসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হয় বলিয়া উক্ত সবডিভিশনেই মোসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। নীচ জাতীয় হিন্দুগণের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন ও মোসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহের বহু প্রচলনই এই সংখ্যাধিক্যের অন্যতম কারণ। শ্রীহট্টীয় মোসলমানদের মধ্যে সিয়া ও সুন্নি এই দুই সম্প্রদায়ের লোকই প্রধান। তন্মধ্যে সিয়াদের সংখ্যা অতি সামান্য, সুন্নিদের তুলনায় নাই বলিলেই চলে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনানুসারে শ্রীহট্ট জিলায় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মোসলমান সংখ্যা ১১৮০৩২৪ জন হইয়াছে।

হিন্দু

শ্রীহট্টে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রধান। শ্রীহট্ট জিলায় ১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনায় শক্তি উপাসক ৩১৩৫২২ ব্যক্তি, শৈবের সংখ্যা ৫৭৫৭১ জন, এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ৫৬০৩৭৯ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোট হিন্দু সংখ্যা ১০৪৯২৪৮ জন।

যাহারা বৃক্ষ, পশু বা দৈত্য দানবের উপাসনা করে, তাহাদের সংখ্যা ১১৩৩৭ জন এবং খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ৩৯৪ জন মাত্র।[১]

শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব

শাক্তদের মধ্যে পাশ্বাচার ও বামাচার উভয় মতই প্রচলিত আছে। বামাচারী মতে মদ্যপান দোষণীয় নহে।

---

১. এই সংখ্যা প্রত্যেক সবডিভিশনানুসারে বিভাগ ক্রমে নিম্নেপ্রদর্শিত হইলঃ–

ধর্ম্মাবলম্বী	উত্তর শ্রীহট্ট	করিমগঞ্জ	মৌলবীবাজার	হবিগঞ্জ	সুনামগঞ্জ
শাক্ত	৩৩৯৩	৪১৭২৪	৯২৮৪৫	২৭১৯৪	৩৭৩৬৬
শৈব	৩২২৪	১৮১৮৬	২১৪১৭	৯৩১৩	৫৪৩১
বৈষ্ণব	৭৪৬৬	১২৩২৮৩	৬১৮৪২	১৩২৮৪৫	১৪৬১৯৩
বৃক্ষাদি উপাসক	২৩৩৭	২৮১৮	১৯৪৬	৪০১৯	৮১০
খৃষ্টীয়ান	১৮১	২১৩	...	...	...
মোট মোসলমান	৩০৮৯৯৮	২৯২৭০০	১৪৬০৫৬	২৬২০০৪	২৩৮৫৯৫
মোট হিন্দু	১৫১৯০৮	২১৫২৪২	২৩০৮৫৯	২৫৬৯১৯	১৯৪৩২০

শৈবদের মধ্যে শ্রীহট্টে যুগী জাতীয় লোকের সংখ্যাই অধিক। ত্রিনাথ দেবতার অর্চ্চনা বা সেবা ইহাদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত। ত্রিনাথের সেবায় গাঞ্জা ভোগই প্রধান। উপাসকগণ রাত্রে শিবের লীলাত্মক গান গাইয়া শেষে প্রসাদ ভক্ষণ করে। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা উপলক্ষে কাণফোড়া প্রভৃতি ইহাদের ক্রিয়া ছিল।

কিশোরী ভজন

বৈষ্ণবেরা শাস্ত ও মদ মাংসাহার বিরত। অনেক উপধৰ্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তি আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকে; তাহাদের সংখ্যা লইয়াই বৈষ্ণব সংখ্যা পুষ্ট হইয়াছে।

এই উপধৰ্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কিশোরীভজন মতাবলম্বীগণের সংখ্যাই অধিক। শুদ্ধ বৈষ্ণব মতের সহিত সহজ বা কিশোরীভজন মতের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। ইহারা পঞ্চরসিকের মতে চলে বলিয়া কথিত আছে। প্রত্যেকেই উপাসনার জন্য এক এক জন সঙ্গিনীর সাহায্য গ্রহণ করে এবং তাহাকেই প্রেমশিক্ষার গুরু রূপে কল্পনা করা হয়। এই ধৰ্ম্মের প্রধান অবলম্বনই প্রেম। ইহারা উপাসনা কালে জাতি বিচার করে না; নিম্ন শ্রেণীর সহিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাও অবাধে আহারাদি করে।[২] তাহাদের উপাসনা কার্য্য ভিন্ন ধৰ্ম্মাবলম্বীর অসাক্ষাতে গভীর রাত্রে সম্পাদিত হয়। তৎকালে দলপতি ও দলে যিনি প্রধানা রমণী, তাহাদের বিশেষ সম্বৰ্দ্ধনা করা হয়। যে ভোজ্য দ্রব্য উপস্থিত করা হয়, প্রথমে তিনি তাহার আস্বাদ করতঃ ভক্তবর্গকে প্রসাদ বিতরণ করেন। তৎপর রাধাকৃষ্ণ লীলাত্মক সঙ্গীতাদি সহকারে উপাসনার অন্যান্য অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়।[৩] কিশোরী ভজন উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা আদর করেন না।

জগন্মোহনী

বৈষ্ণব ধৰ্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে জগন্মোহনী বৈষ্ণবগণও ভুক্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ নূতন একটি ধৰ্ম্মসম্প্রদায়। এই ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান শ্রীহট্ট জিলা। সুতরাং ইহা শ্রীহট্টের বিশেষত্ব জ্ঞাপক ঘটনার অন্যতম। প্রায় তিন শত বৎসর হইল, এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। গোপীনাথের শিষ্য বাঘাসুরাবাসী জগন্মোহন গোসাঞি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে অক্ষয় কুমার দত্ত, ইহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক উপসম্প্রদায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারা ব্রহ্মবাদী, প্রতিমা পূজায় তাহাদের স্পৃহা নাই। "গুরু সত্য, এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া, গুরুকেই ইহারা প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করে।"[৪] ইহারা স্ত্রীত্যাগী, ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই তাহাদের ধৰ্ম্মসঙ্গত বিধি। তাহারা তুলসী ও গোময়ের ব্যবহার করেন না;[৫] এবং সম্প্রদায়ের "নির্ব্বাণ সংগীত" গান করাই উপাসনার অঙ্গ মনে করেন। জগন্মোহন

২. "Each worshipper devotes himself to a woman whom he considers as his spiritual guide and with whose help he expects to secure salvation of his soul. His religion is a religion of love, and is not confined to any dogmas, the caste prejudice with him is much shakenm and in his festivals he mixes with all the low caste Hindus freely.
-Report on the census of Assam-1901, chap. IV. p. 41.

৩. "The members of his sect are said to have assembled secretly at night and to worship the mistress of their priest, who is supposed to represent Radha. The food is offered to her, and after she has taken a little, the Prasad are distributed amongst he congregation."
-Assam District Gazetteers vol. II p. 84.

৪. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ভাগ ২১০ পৃষ্ঠা।

৫. বর্ত্তমানে ইহার ব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে চলিতেছে।

গোসাঞির শিষ্যের প্রশিষ্য রামকৃষ্ণ গোসাঞি হইতে এই ধর্ম বহুল প্রচারিত হয়। বিথঙ্গলের আখড়াই ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। তদ্ব্যতীত মাছুলিয়া ও ঢাকার ফরিদাবাদে আরও দুই আখড়া আছে। ইহাদের শিষ্য সংখ্যা প্রায় পঞ্চসহস্র।

চাপঘাট পরগণাধীন কচূয়ার পার নামক স্থাননিবাসী ব্রহ্মনন্দ বৈষ্ণব তদঞ্চলে এইরূপ মত প্রচার করেন; তাহার শিষ্য সম্প্রদায় তথায় "ব্রহ্মানন্দী" নামে কথিত হয়। জগন্মোহনী মতের সহিত এমতের বিশেষ অনৈক্য নাই। ইহারা জাতিভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। ব্রহ্মানন্দীরা সংখ্যায় যৎসামান্য।

মণিপুরী রাস

মণিপুরীরা বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্ধবিশ্বাসী। রাসযাত্রা উপলক্ষে তাহারা আগ্রহ সহকারে "লাইচারী" অর্থাৎ কুমারীদের সহায়ে নৃত্যগীতসহকারে রাস গান করে। মণিপুরী রাস-নৃত্য সুন্দর বটে। ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের গাঢ় অনুরাগী হইলেও, হিন্দু সমাজের অজ্ঞাত একটি জাতীয় দেবতার পূজা প্রত্যেক বংশে প্রচলিত আছে। ইনি মৎস্যপ্রিয় বলিয়া এই দেবতাকে বোয়াল মৎস্যাদি উপহার দেওয়া হয়; এবং তিনি বংশের প্রধান ব্যক্তির জিম্বায়, বাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে অনাদৃত ভাবে বাস করেন। মণিপুরীদের এই দেবতা, তাহাদের ভূতপূর্ব্ব পার্ব্বত্য যুগের উপাস্য দেবতার ত্যক্তাবশেষবিশেষ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের পর চিতোম্ খোম্বা রাজার সময়ে, শ্রীহট্টবাসী "অধিকারী" ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক মণিপুরীরা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।[৬] যৌবন বিবাহ ইহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করে না; কাজেই বাল্য বিবাহের প্রচলন এবং অবরোধ প্রথা ইহাদের মধ্যে নাই।

কুকিদের বৃক্ষাদি পূজা

কুকি তিপ্‌রা প্রভৃতির জাতীয় দেবতা মণিপুরীদের মৎস্যাশী দেবতাপেক্ষা আরও এক পদ অগ্রসর। তিনি শূকর মাংস পর্য্যন্ত খাইতে পারেন; পূর্ব্বে কুক্কুট মাংস যথেষ্টরূপে আহার করিতেন। কুকিদের বাঁশ পূজা অতি আশ্চর্য্য। কথিত আছে, তাহাদের পূজার মন্ত্রবলে উদ্দিষ্ট বংশদণ্ডের অগ্রভাগ ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে।[৭] বংশাগ্র ভূস্পর্শ করিলেই পূজা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়।[৮] কুকিরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলেও পরকাল বুঝে না। কুকিরা পাহাড়ের উপর বংশনির্ম্মিত মাচা প্রস্তুত করতঃ তাহাতে বাস করে; বংশপত্রাদি দ্বারাই মাচার ছাউনি দেওয়া হয়। ইহারা অতিশয় মাংসপ্রিয় জাতি। কোন জাতীয় উৎসবে মদ্যপান ও মাংসাহারই প্রধান অঙ্গ বিবেচিত হয়।

খৃষ্টীয়ান ও ব্রহ্ম

শ্রীহট্ট জিলায় অল্প সংখ্যক খৃষ্টীয়ান অধিবাসী আছে; ইহারা রোমান কাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত। অল্প সংখ্যক প্রটেষ্টান্ট খৃষ্টানও আছে; ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টে প্রটেষ্টান্ট মিশন স্থাপিত হয়। শ্রীহট্ট

---

৬. বঙ্গদর্শন পত্রিকা–১২৮৪ সাল; এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত "ত্রিপুরার ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।

৭. সার জর্জ্জ বার্ডউড্ সাহেব কৃত অনারেবল্ জগন্নাথজি শঙ্করসেটের জীবনীতে এইরূপ বাঁশ পূজার আশ্চর্য্য আখ্যান লিখিত হইয়াছে।

৮. কুকিদের পূজার একটি মন্ত্র নিম্নে দেওয়া হইলঃ–
"আ খালে কাণূয়ই সাং যোয়ঙ্গর কাণূয়ই যেই চেকো যেই মা লয়ঙ্গ।" অর্থাৎ হে শ্বেতবর্ণা দেবী মাই, শূন্যপথে পিচ্ছিল গতিতে এখানে আসিয়া এ স্থান পূর্ণ কর।

সদর, করিমগঞ্জ ও মৌলবী বাজারে ওয়েলিশ মিশনের এক এক আড্ডা আছে। পরলোকগত রেভারেণ্ড প্রাইজ সাহেবের যত্নে শ্রীহট্টে খৃষ্টধর্ম্ম প্রথমে প্রচারিত হয়। প্রাইজ সাহেব স্বীয় চরিত্রগুণে হিন্দুজাতিরও অতি প্রিয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দুদের অর্থ সাহায্যেই তদীয় সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়।

শ্রীহট্টে জনকতক সহরবাসী ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। ইহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমত উপাসনাদি করেন। শ্রীহট্টে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজগৃহ স্থাপিত হয়।

ধর্ম্মোৎসব

মোসলমানদের মধ্যে শিয়া শ্রেণীর লোকের আসুরা পর্ব্বে "তাবুজ" বাহির করার যথেষ্ট উৎসাহ আছে। শ্রীহট্টের আসুরা অতি বিখ্যাত ছিল। এখনও আসুরা পর্ব্বে ঈদগার ময়দানে লাঠি খেলা, বানুটি খেলা[৯] ইত্যাদি হইয়া থাকে এবং অনেক তাবুজ আসিয়া জমা হয়। ঐ সময় ঈদগার ময়দানে এক মেলা বসে। মোসলমানগণ ঈদপর্ব্বোপলক্ষেও বিশেষ ধূমধাম করিয়া থাকেন।

হিন্দুদের দূর্গোৎসব পর্ব্বেই বিশেষ আড়ম্বর হয়। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সকলেই দূর্গা পূজায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। শৈবদের মধ্যে বারুণী পর্ব্ব এবং বৈষ্ণবদের ঝুলনযাত্রা ও রথযাত্রায় বিশেষ বিশেষ স্থলে বহুজনতার সমাবেশ হয়। শ্রীহট্টে মনসা পূজা ইতর ভদ্র সকলেই করে। মনসা পূজা ও মাঘী সংক্রান্তি প্রতিপালন বিষয়ে দরিদ্র ব্যক্তিরাও অবহেলা করে না।

নৌকাপূজা ও গোবিন্দকীর্ত্তন শ্রীহট্টের দুইটি বিশেষ ধর্ম্মোৎসব। কোন মাঠে গৃহ প্রস্তুত ক্রমে তাহাতে নৌকাকৃতি কাঠাম প্রস্তুত করা হয়। নৌকার কাঠামে মনসা মূর্ত্তিই প্রধান। তদ্ব্যতীত অপর বহুতর দেবমূর্ত্তি গঠিত করতঃ নৌকাগৃহ পূর্ণ করা হয়। নৌকা পূজায় মনসার পূজাই উদ্দেশ্য স্বরূপ থাকে। বহুতর দেবমূর্ত্তি সমন্বিত নৌকা গঠন ও সেবা পূজা ইত্যাদিতে নৌকা পূজায় অনেক অর্থব্যয় হয়।

গোবিন্দকীর্ত্তন সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত গাইতে হয়। ন্যূনাধিক দুইশত, দেড়শত লোক দলে দলে বিভক্ত হইয়া আসরে উপস্থিত হয়। লতাপুষ্পমণ্ডিত একটি কুঞ্জগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ রাখা হয় ও তৎসম্মুখে দলে দলে পর্য্যায়ক্রমে অবিরাম ভাবে গীত গায়। গীত শেষ হইলে প্রভাতে মঙ্গল আরতি গাইয়া উৎসব শেষ করা হয় ও প্রসাদ বিতরণ হয়। গোবিন্দকীর্ত্তনের সঙ্গীত, গৌর চন্দ্রিকা, জলসংবাদ, রূপ, খেদ, দূতীসংবাদ, অভিসার বা চলন এবং মিলন, এই পর্য্যায়ক্রমে গীত হয়।

শ্রীহট্টে কবির গান ও ঘাটুর নাচ এক সময় অতি প্রচলিত ছিল। বালকগণ বালিকা বেশে নৃত্যসহকারে ঘাটুগান গাইত। মান, মাথুর ইত্যাদি ভেদে এই গান গাইতে হয়। এই সকল সঙ্গীত শ্রীহট্টের কবিগণ রচনা করিতেন।

পূর্ব্বে "ভাষা পদ্ম পুরাণ" সঙ্গীত যোগে শ্রাবণ মাসে গঠিত হইত, এ প্রথাও প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কবি ষষ্টীবর এবং নারায়ণ দেবকে অনেকেই ময়মনসিংহবাসী বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু তিনি শ্রীহট্টবাসী বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীহট্টে অন্যান্য দেবদেবী পূজায়, পশ্চিম বঙ্গের সহিত প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। বারব্রতাদিতেও বড় বিশেষত্ব নাই। জন্মাহের ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠীপূজা, অবিবাহিতা বালিকাদের মাঘব্রত এবং

৯. বংশদণ্ডের উভয় প্রান্তে নেকড়া জড়াইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া লাঠি খেলার ন্যায় বানুটি খেলা করা হয়।

রমণীদের সূর্য্যব্রত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাঘব্রতে সমস্ত মাঘ মাস ভরিয়া অবিবাহিতা বালিকাদিগকে ভোরে উঠিয়া স্নানান্তে ব্রতের নির্দ্দিষ্ট বেদিকা সম্মুখে বসিয়া কথা বলিতে হয়। বেদীর সম্মুখে জলপূর্ণ দুইটি গর্ত্ত থাকে ও অভিভাবিকাগণ তণ্ডুল, হরিদ্রা, ইষ্টক চূর্ণ এবং আবির দ্বারা প্রত্যহ বেদীও ব্রতস্থান চিত্রিত করিয়া দেন। পনরদিন পরে "উদয় পূজা"। তৎকালে সমস্ত প্রাঙ্গন ভরিয়া চিত্র অঙ্কিত হয়। ব্রত সমাপ্ত দিন "দেউল" বিসর্জ্জন করিতে হয়। ব্রতের দিন নির্দ্দেশার্থ এক একটি মৃন্ময় গোলক তুলসী বেদীর নিম্নে রক্ষিত হয়, তাহাই দেউল। উত্তম স্বামী, ধন জন, বস্ত্রালঙ্কার ইত্যাদি লাভ করা এই ব্রতের উদ্দেশ্য।

শ্রীহট্টে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সূর্য্যব্রতও বিশেষ প্রচলিত, ইহা মাঘ মাসের কোন এক রবিবারে, অভূক্তাবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া করিতে হয়। কদলী বৃক্ষ গাঁদাফুলে মণ্ডিত করিয়া প্রাঙ্গনে প্রোথিত করা হয়। তাহার সম্মুখে দুইটি গর্ত্তে জল ও দুগ্ধ রক্ষিত হয়, ও রঙ্গিণ চূর্ণে চন্দ্র সূর্য্যের চিত্র ভূমিতে অঙ্কিত করা হয়। ব্রতধারিণীকে শুধু উপবাস ও পরিচর্য্যা করিতে হয়, ব্রাহ্মণই পূজা করেন। স্ত্রীলোকেরা কৃষ্ণলীলার গীত গাইয়া থাকেন, সূর্য্যাস্ত হইলে ব্রতধারিণী উপবেশন করেন ও প্রসাদ ভক্ষণ করেন।

শ্রীহট্টের নগর-সঙ্কীর্ত্তন ও বংশীবাদন অতি প্রসিদ্ধ। শ্রীহট্টবাসীরা নিজ জিলায় যে যে স্থান তীর্থবৎ মান্য করে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইবে।

বিদ্যাশিক্ষা

আদি বিবরণ

প্রাচীন কালে হিন্দু রীত্যানুসারে গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপন করিবার প্রথা ছিল। তাহার পরেও দেশে বিদ্যাশিক্ষার সুরীতি ছিল। কয়েক গ্রাম মধ্যেই এক বিদ্যালয় থাকিত, পণ্ডিত অথবা মৌলবী তাহাতে শিক্ষা দিতেন। কেতাবি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি শিক্ষাও চলিত; কোন ছাত্রের বিরুদ্ধে নীতি বিগর্হিত ব্যবহারের কথা শুনা গেলে কঠোর শাস্তি প্রদত্ত হইত।

রেভারেণ্ড প্রাইজ সাহেবই এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বীজবপন করেন; তৎকালে একটি স্কুল ছিল বটে, কিন্তু ইহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। উচাইলের জমিদার একজন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গে অল্পব্যক্তিই ইংরেজীর প্রতি অনুরক্ত ছিল। উচাইলে একটি বিদ্যালয়ও ছিল, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ হইতেও বহু ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়াছিল।

ঢাকার ঐতিহাসিক বিবরণের একস্থানে লিখিত আছে যে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জিলায় ২৮টি স্কুলে ১১২৭ জন ছাত্র ছিল। এই অত্যল্প ছাত্র সংখ্যার অর্দ্ধেক শ্রীহট্ট সহরে থাকিয়া শিক্ষা পাইত।[১০] সুতরাং মফঃস্বলে তখন লোকের শিক্ষানুরাগ কিরূপ ছিল, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে।

পরবর্ত্তী বিবরণ

বর্ত্তমান গবর্ণমেন্ট স্কুল ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়। এই স্কুল স্থাপিত হওয়ায় শ্রীহট্টবাসীর ইংরেজী শিক্ষার পথ প্রসারিত হয়। রায় সাহেব দুর্গাকুমার বসু মহাশয়ের কার্য্যকালে শ্রীহট্ট জিলা-স্কুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি গণনীয় স্কুল হইয়া দাঁড়ায়।

১০. Principal Heads of the History and statistics of Dacca Division 1868. p. 326.

সার জর্জ্জ কেম্বেল সাহেবের প্রবর্ত্তিত প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার জন্য শিক্ষক প্রস্তুতের আবশ্যক হওয়ায়, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টে একটি নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। শিক্ষক, গণিত শাস্ত্রবিশারদ স্বর্গীয় গোবিন্দচরণ দাস ও স্বরূপচন্দ্র রায়ের যত্নে এই স্কুলের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। কয়েক বর্ষে শিক্ষকের অভাব পরিপূর্ণ হইয়া গেলে এই স্কুল উঠাইয়া দেওয়া হয়।

হাইকোর্টের উকীল স্বর্গীয় জয়গোবিন্দ সোম শ্রীহট্টের সর্ব্বপ্রথম এম. এ উপাধিধারী। ভিন্ন দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীহট্টবাসীর মধ্যে, ছনখাইড়বাসী শ্রীযুক্ত গজনফর আলী খাঁ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড গমন করতঃ ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু স্বর্গীয় রমাকান্ত রায় এক বিষয়ে ভারতবাসীর পথ-প্রদর্শক হইয়াছেন। জলসুখাবাসী স্বর্গীয় রায় মহাশয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জাপান দেশে গমন করতঃ খনিজ বিদ্যা (মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং) শিক্ষা কর্তঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে শিক্ষার উদ্দেশ্যে কেহ ভারতবর্ষ হইতে জাপান যান নাই। ইহার পরে করিমগঞ্জের শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত সিভিল সার্ব্বিস, ও জলসুখার শ্রীযুত রাধামাধব রায় কুপারহিল কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন।

পূর্ব্বে শ্রীহট্ট, কাছাড় এবং ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার স্কুল সমূহ একজন ডিপুটী ইনিস্‌পেক্টরের অধীনে ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের জন্য স্বতন্ত্র ডিপুটী ইনিস্‌পেক্টর নিযুক্ত হন। তদবধি শ্রীহট্টে সাধারণ শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে। এস্থলে ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী ইনিস্‌পেক্টর রায় সাহেব নবকিশোর সেনের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে এদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। বিগত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ডিপুটী ইনিস্‌পেক্টরের স্থলে সুরমা উপত্যকার জন্য একজন ইনিস্‌পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন; তদধীনে ডিপুটী ইনিস্‌পেক্টর ও সবইনিস্‌পেক্টরগণ আছেন। বর্ত্তমানে প্রত্যেক সবডিভিশনেই এক একজন ডিপুটী ইনিস্‌পেক্টর আছেন।

স্কুলাদির বিবরণ

সহরের "রাসবেহারী স্কুল" দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী স্কুলের আদি। স্বর্গীয় রাসবেহারী দত্তের বাড়ীতেই এই স্কুল ছিল। "শ্রীহট্ট নেসনেল স্কুল" শ্রীহট্টের সুপুত্র দেশপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এবং স্বদেশপ্রেমী স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর কীর্ত্তি ছিল। শ্রীহট্টের "মুরারিচান্দ কলেজ" ও তৎসংসৃষ্ট স্কুল রায়নগরের উন্নতচেতা রাজা গিরিশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। কলেজটি তদীয় মাতামহের নামে (১৮৯২ খৃষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

উক্ত মুরারিচান্দ কলেজ ও তৎসংসৃষ্ট স্কুল রাজা গিরীশ চন্দ্রের ব্যয়ে পরিচালিত। অধুনা কলেজটির ভার গবর্ণমেন্ট স্বয়ং গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। শ্রীহট্ট গবর্ণমেন্ট স্কুল গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে পরিচালিত। করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ, বাণিয়াচঙ্গ ও সুনামগঞ্জস্থিত হাইস্কুলগুলি সাহায্যকৃত। শ্রীহট্টে বর্ত্তমানে এই সাতটি এণ্ট্রেন্সস্কুল চলিতেছে।

বর্ত্তমানে শ্রীহট্ট জিলায় গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত ৪০টি এবং বিনা সাহায্যে পরিচালিত ৪টি মধ্য ইংরেজী স্কুল আছে; মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪টি মাত্র। শ্রীহট্ট জিলায় ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৭৫১টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।[১১]

---

১১. ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দের ছাত্র সংখ্যাঃ–

কলেজের ছাত্র সংখ্যা ৩৯ জন ছিল, তন্মধ্যে ১৪ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সাতটি এণ্ট্রেন্স স্কুলের উর্দ্ধ শ্রেণী গুলিতে ৫৬৪ জন ছাত্র, মধ্য শ্রেণী গুলিতে ৫০৭ জন ছাত্র ও নিম্নশ্রেণী গুলিতে ৯০৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল।

এই অব্দে ৪৪টি মধ্য ইংরেজী স্কুলের ইং শ্রেণীতে ৩২১ জন ছাত্র এবং প্রাথমিক শ্রেণী গুলিতে ২৭৫৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করেন। ১৪টি মধ্য বঙ্গবিদ্যালয়ের উর্দ্ধ শ্রেণীতে ১০২ জন এবং প্রাথমিক শ্রেণী গুলিতে ৭৩৭ জন ছাত্র ছিল।

তদ্ব্যতীত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীন সদরে একটি জাতীয় স্কুল, এবং হবিগঞ্জ সবডিভিশন অপর একটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে (শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখ) শ্রীহট্টের কয়েকজন মনস্বী ছাত্রের যত্নে কলিকাতায়, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারার্থ "শ্রীহট্ট সম্মিলনী" সভা স্থাপিত ও গ্রাম্য রমণীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা হয়। বর্ত্তমানে বালিকাদের শিক্ষার জন্য ৮৩টি পাঠশালা চলিতেছে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টে একটি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি আথালিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সদয়া চরণ দাসের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দাসী বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ভাষা

শ্রীহট্টের পার্ব্বত্য অধিবাসীদের বিভিন্ন কথ্য ভাষা আছে। বাঙ্গালা ভাষায় ২০৬৮৫৪৯ জন কথা কহে। মণিপুরীদের নিজেদের একটা কথ্য ভাষা আছে কিন্তু লেখ্য ভাষা বাঙ্গালা। ২৮৬৫৭ ব্যক্তি মণিপুরপরী ভাষা কথা কহে। এইরূপ তিপ্‌রা প্রভৃতি প্রত্যেকেরই এক একটি স্বতন্ত্র কথ্যভাষা আছে। যথাঃ—

কুকিদের	ভাষায় কথা	কহে	—৪১৯ জন।
খাসিয়াদের	"	"	—২২৩২ জন।
গারোদের	"	"	—৬৪৬ জন।
তিপরাদের	"	"	—৯১৬৫ জন।

এই পার্ব্বত্য ভাষা গুলির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন।

শ্রীহট্টের উচ্চ শ্রেণীর মোসলমান পরিবারে উর্দ্দু ভাষায় কথা কহিবার রীতি প্রচলিত আছে

শ্রীহট্টের মোসলমানদের মধ্যে একরূপ নাগরাক্ষর প্রচলিত আছে। অনেক মোসলমানী কেতাব এই অক্ষরে মুদ্রিত হয়। এই অক্ষর অতি সহজে শিক্ষা করা যায়। কলিকাতায়[১২] শ্রীহট্টবাসী মোসলমানগণ এই অক্ষরে একটা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতেই পুস্তকাদি ছাপা হইয়া থাকে।[১৩]

সংবাদপত্র

সাধারণ শিক্ষা প্রচার পক্ষে সংবাদ পত্রের সহায়তা সামান্য নহে। শ্রীহট্ট—লংলাবাসী গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া সংবাদপত্র প্রচারের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তৎকালে শ্রীহট্টে থাকিয়া তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই তিনি কলিকাতায় গমন করেন এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজার হইতে সম্বাদ ভাস্কর নাম পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকা সপ্তাহে তিন দিন প্রকাশিত হইত। গৌরীশঙ্করের সম্বাধভাস্কর ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের সংবাদ

এই অব্দে ৩৮টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে ১৯২ জন ছাত্র এবং নিম্ন শ্রেণীগুলিতে ১২২৩ জন ছাত্র ছিল। ৭৫১টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ৯২২৮ জন এবং নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ১৫৯৫৯ জন ছিল।

৮৩টি বালিকা বিদ্যালয়ের উর্দ্ধ শ্রেণীতে ১৮ জন ছাত্রী উচ্চ প্রাথমিক পাঠ্য ও ১৮১৯ জন নিম্ন প্রাথমিক পাঠ্যশিক্ষা করিয়াছে।

১২. ১৬ নং গার্ডেনার লেন, তালতলা,-কলিকাতা।

১৩. ঝ-পরিশিষ্টে মোসলমানী নাগরীর বর্ণমালা দেওয়া যাইবে।

প্রভাবকরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।।

শ্রীহট্ট হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম "শ্রীহট্টপ্রকাশ" প্রকাশিত হয়। লাতু নিবাসী কবি প্যারীচরণ দাস অষ্টপতি ইহার সম্পাদক ছিলেন। শ্রীহট্টে ইহার বহুল প্রচার ছিল। প্যারী বাবু একজন হৃদয়বান কবি ছিলেন, পদ্যপুস্তক প্রথমভাগ, তৃতীয়ভাগ ও ভারতেশ্বরী কাব্য ইহার পরিচয় দিতেছে। শ্রীহট্টপ্রকাশ ছয় বৎসরকালে পূর্ণ উদ্যমে পরিচালিত হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট হইতে "পরিদর্শক" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শ্রীহট্টের কৃতি সন্তান প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও স্বদেশপ্রেমী স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর সম্পাদকতায় ইহা বাহির হয়। কিছু দিন মধ্যেই রাধানাথ বাবু স্বয়ং এক মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন পূর্ব্বক একাকী সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন।

পরিব্রাজক, শ্রীহট্টমিহির এবং শ্রীহট্টবাসী অল্পজীবী, শ্রীহট্টবাসী পরে পরিদর্শকের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। পরিদর্শক আজ পর্য্যন্ত কোনও রূপ জীবিত আছে।

শ্রীহট্টের একমাত্র মাসিক পত্র "শ্রীহট্ট দর্পণ" (প্রকাশিত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ) অল্পকাল মধ্যেই সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত হয়। ইহার পরমায়ু দুই বৎসর মাত্র ছিল।[১৪]

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম রহস্যাত্মক বার্ষিক পত্রিকা "ফুলতত্ব" প্রকাশিত হয়, এখনও মধ্যে মধ্যে ১লা এপ্রিল তারিখে, ভিন্ন ভিন্ন নামে, ইহার আবির্ভাব দৃষ্ট হয়।

শ্রীহট্টের একমাত্র সুপরিচালিত ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'Thc weekly chronicle.' ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীযুক্ত শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহ চৌধুরী কর্ত্তৃক যোগ্যতার সহিত প্রচারিত হয়। খৃষ্টীয়মানদের পরিচালিত "Friend of Sylhet" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা আছে।

মফঃস্বল (করিমগঞ্জ) হইতে "প্রভাত" নামক পাক্ষিক পত্রিকা (১৯০৬ খৃষ্টাব্দ) বাহির হইয়াছিল, সম্প্রতি হবিগঞ্জ হইতে "প্রজাশক্তি" বাহির হইতেছে।

শ্রীহট্টে বিভিন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাধীনে এখন পাঁচটি মুদ্রাযন্ত্রে কাজ চলিতেছে।

১৪. শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ হইতে শ্রীযুত নগেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় "মৈত্রী" নামে একখানি সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকা ১৩১৬ বাঙ্গালার বৈশাখ মাস হইতে যথানিয়মে প্রকাশিত হইতেছে।

নবম অধ্যায়
তীর্থস্থান

শ্রীহট্ট জিলার সীমাদেশে প্রায় চারিদিকেই দেবতাদের অবস্থান দৃষ্টে এ জিলাকে দেবরক্ষিত দেশ বলিলে, অসঙ্গত বলা হয় না। উত্তরে পণাতীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া, মহাদেব রূপনাথ, সিদ্ধেশ্বর, ঊণকোটি, তুঙ্গেশ্বর ও ব্রহ্মকুণ্ড পর্য্যন্ত জিলার তিনদিকেই বৃত্তাকারে দেবস্থান রহিয়াছে। এ সকল স্থান কেবল শ্রীহট্টবাসীরই পরিচিত, এমন নহে; পার্শ্ববর্ত্তী জিলার লোকও ঐ সকল তীর্থ সেবন করিয়া থাকেন।

শ্রীহট্টবাসীগণ তীর্থ সেবা পরায়ণ। কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা, প্রয়াগ, গয়া, গঙ্গা, জগন্নাথ যেখানেই যাও না কেন, বহু বহু শ্রীহট্টের নর নারী দেখিতে পাইবে। শ্রীহট্ট জিলাতেও ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীদের বাসনা পরিতৃপ্তির নিমিত্তে বহু দেবস্থান বিদ্যমান। এই সকল তীর্থস্থানের মধ্যে প্রথমেই আমরা বামজঙ্ঘা মহাপীঠের উল্লেখ করিতেছি।

বামজঙ্ঘা মহাপীঠ

মহাপীঠ

বামজঙ্ঘা মহাপীঠ সাধারণতঃ "ফালজোরের কালীবাড়ী" নামেই কথিত হয়। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, মানব জাতির প্রথম সভ্যতার যুগে (সত্য যুগে) দক্ষ প্রজাপতি এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে সর্ব্বদেব আহুত হন, কিন্তু দক্ষপ্রজাপতি মহাদেবের নিয়ন্ত্রণ না করিয়া, তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। দক্ষতনয়া সতী পিতার মুখে পতি নিন্দা শ্রবণে অপমানে ও দুঃখে দেহত্যাগ করেন। সতী দেহ ত্যাগ করিলে মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ভারতের বিবিধ অংশে ভ্রমণ করেন। ভগবান বিষ্ণু তখন চক্রান্তে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত করেন। যে স্থানে সতীর ছেদিত অঙ্গ পতিত হয়, তাহা এক একটি তীর্থে পরিণত ও মহাপীঠ নামে খ্যাত হইয়াছে। যে স্থানে সতীর অঙ্গাংশ বা অলঙ্কার পতিত হয়;—তাহার নাম উপপীঠ। প্রত্যেক পীঠের অধিষ্ঠাত্রী এক এক ভৈরবী ও তাঁহার রক্ষক স্বরূপ এক এক ভৈরব (শিব) আছেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে শ্রীহট্টে দুইটি মহাপীঠ আছেন।

বাউরভাগে বামজঙ্ঘা পীঠ

বামজঙ্ঘা মহাপীঠ জয়ন্তীয়ার বাউরভাগ (বউ=বাম=উরু=ভাগ) পরগণায় অবস্থিত।[১] পীঠাধিষ্ঠাত্র জয়ন্তী দেবীর নামেই সে অঞ্চল জয়ন্তীয়া রাজ্য, ও তদুত্তরবর্ত্তী পর্ব্বত জয়ন্তীয়া পর্ব্বত নামে খ্যাত হইয়াছে। বিশ্বকোষ ১২ ভাগ ৫৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"ফালজোর একটি প্রধান পীঠস্থান। এখানে দেবীর বামজঙ্ঘা পতিত হয়, এজন্য ইহাকে বামজঙ্ঘা পীঠও বলে। বামজঙ্ঘা পীঠের সাধারণ নাম ফালজোরের কালী বাড়ী। তন্ত্রচূড়ামণি মতে—"জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘা

---

১. "The place which is most sacred in Saktist eyes is Phalijor is pargana Bhaurbhag in Jaintia, where there is a stone pillar which is said to be Sati's left leg.'
-Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap. III p. 40

চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বর।"

"এখানকার দেবীর নাম জয়ন্তী, ইঁহারই নামানুসারে এই স্থান জয়ন্তী নামে পরিচিত। এখানকার ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর। তন্ত্র বলেন—'কৈলাসে দশ লক্ষ্যেণ জয়ন্ত্যাং পঞ্চ লক্ষত।' অর্থাৎ পঞ্চ লক্ষ বার মাত্র মন্ত্র জপেই এখানে সিদ্ধি হয়।"

"এই মহাপীঠ শ্রীহট্ট নগরী হইতে ৩৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে পর্ব্বত পাদদেশে একখণ্ড সমতল ভূমে, ইষ্টক নির্ম্মিত প্রকাণ্ড এক ভিত্তির মধ্যস্থিত চতুষ্কোণ অগভীর এক গর্ত্ত মধ্যে ও একখানি চতুষ্কোণ প্রস্তরোপরি অবস্থিত। ভৈরবও প্রস্তররূপী হইয়া দেবীর সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে বহুতর নরবলি হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ রাজ এই নৃশংস প্রথা রহিত করিবার জন্য জয়ন্তীয়া রাজ্য দখল করিয়া লন। তদবধি নরবলি বন্ধ হইয়াছে।"

"দেবীর মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি অতি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, ইহা প্রায় বুজিয়া গেলেও জল অতি পরিষ্কার থাকে কম বেশী হয় না; দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।"

"জয়ন্তীয়ার স্বাধীনতার সময় রাজোচিত ভাবেই দেবীর সেবা হইত। রাজারা বলিতেন 'সমস্ত জয়ন্তী রাজ্যই মায়ের—তাঁহার জন্য আবার পৃথক দেবোত্তর কি?' বস্তুত সেই জন্যই কোনও দেবোত্তর নির্দ্দিষ্ট নাই। জয়ন্তীয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এই পীঠেরও দূরবস্থা ঘটিয়াছে। এখন দেবী একখানি জীর্ণ কুটীরে বাস করিতেছেন।"

পীঠ প্রকাশ

এই মহাপীঠের প্রকাশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। ফালজোরের কালী ও নরবলির বিষয় উল্লেখ করা যাইবে। জয়ন্তীয়ায় কিরূপে কখন হইতে এই ভীষণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত কিংবদন্তী শ্রুত হওয়া যায়। জয়ন্তীয়ার বড় গোসাঞ্জির রাজত্বকাল (১৫৪৮-১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) একদা কতিপয় রাখাল বালক একখণ্ড প্রস্তরের সন্নিকটে নানারূপ খেলা করিতেছিল। ক্রীড়াচ্ছলে তাহাদের মধ্যে একজন রাখাল পূজক সাজিলে, অপর বালক ছাগশিশুরূপে তদ্বৎ শব্দ করিতে লাগিল। অন্য বালকেরা পুষ্পাদি আনিয়া দিলে ব্রাহ্মণরূপী বালক পূজায় বসিল। দৈবক্রমে তাহারা সেই প্রস্তরকেই পূজা করিল। পূজা সমাধা হইলে বলির জন্য ছাগরূপী বালক আনীত হইল এবং বিন্না তৃণের দীর্ঘ-পত্ররূপ খড়েগ ছাগরূপী বালকের গলদেশে আঘাত করা হইল। কিন্তু ইহাতে এক অলৌকিক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার সংঘটিত হইল, বিন্নাতৃণপত্রের আঘাতে সেই বালক দেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল!! ভয়ত্রস্ত বালকদল যার যার গৃহে দৌড়িয়া গেল, মুহূর্ত্তে সেই স্থান জনতা পূর্ণ হইল। এই অদ্ভুত হত্যা বিবরণ রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক রাজার শ্রুতি গোচর হইল; রাজা বড় গোসাঞ্জি (প্রথম) এই আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণে কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া, স্বীয় গুরুদেবকে সঙ্গে করতঃ স্বয়ং ফালজোরে গমন করেন। জয়ন্তীরাজের গুরু একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি বালকদের খেলা স্থলে উপস্থিত হইয়া, সে প্রস্তরখণ্ড দর্শনে বিস্মিত হইলেন ও আধ্যাত্মিক প্রমাণ প্রাপ্তে তাঁহাকেই বামজঙ্ঘা পীঠের ভৈরবী জয়ন্তীদেবী বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

মহারাজ, নিজ রাজ্যের জয়ন্তীয়া নাম হওয়ার মূল কারণ এই দেবীর পরিচয় প্রাপ্তে অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন। ঢাক ঢোল বাজাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং দেবীকে নিজপাটে (রাজধানীতে) লইয়া যাইবার জন্য খনক নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু খনন কারীরা ক্রমাগত খনন করিয়াও প্রস্তর খণ্ডের নিম্নপ্রান্ত বাহির করিতে সমর্থ হইল না; কারণ—কিছুটা খনন করিলেই পার্শ্বোত্থিত ভূরি পরিমাণ বালুকায় গর্ত্তটি পূরিয়া যাইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে, তাহা দৈব্য অভিপ্রায়ে সংঘটিত হইতেছে ভাবিয়া, রাজা সেই উদ্যমে ক্ষান্ত

হইলেন ও সেই স্থান সুচারুরূপে বাঁধাইয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত হইল, এবং প্রাচীরের গায় সহস্র প্রদীপ প্রজ্বালনের ও নিয়মিত পূজা পরিচালনের সুব্যবস্থা হইল।

সেই যে রাখাল বালক অলৌকিকরূপে নিহত হয়, তাহাতেই দেবীর নিকটে নরবলি দেওয়া প্রথা জয়ন্তীয়ায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, প্রায় সেই সময়েই কোঁচরাজ বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক কামাখ্যা মহাপীঠ আবিষ্কৃত হয়।[২] যখন জগতে শুভ যুগের আবির্ভাব ঘটে, তখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এক সময়ে এইরূপেই শুভ সূচিত হইতে থাকে, ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে তাঁহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান।

ক্রমদীশ্বর ও রূপনাথ

বামজঙ্ঘা পীঠে আঁকড়িয়া ধরা মূর্ত্তিকে কেহ কেহ ক্রমদীশবর ভৈরব বলে না মতান্তরে রূপনাথ শিবই উক্ত ক্রমদীশ্বর।[৩] রূপনাথ মহাপীঠ হইতে অল্প উত্তরে এবং অনুসন্ধানে পরে আবিষ্কৃত হন বলিয়া কথিত আছে।[৪] রূপনাথ আবিষ্কৃত হইলে মহারাজ রূপনাথের দক্ষিণ দিকে এক পাকা মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। কথিত আছে যে, স্বপ্নাদেশ হওয়ায় মহাদেবকে আর সেই মন্দিরতলে নেওয়া হয় নাই; তাঁহার বংশ ও পর্ণ নির্ম্মিত কুটীর খাসিয়া নারীরা প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকে।

রূপনাথ গুহা

রূপনাথের সন্নিকটেই প্রসিদ্ধ রূপনাথ গুহা। ইহা পূর্ব্বাঞ্চলের এক আশ্চর্য্য দর্শনীয় স্থান। দর্শনার্থীকে চিহ্নিত রাজকীয় পথে পর্ব্বতমূল হইতে ক্রমোর্দ্ধ বক্র গতিতে প্রায় দুই মাইল উর্দ্ধে উঠিতে হয়। অর্দ্ধ পথেই রূপনাথের কুটীর, তদুপরি গুহা। গুহাভ্যন্তর গাঢ় তিমিরে চির সমাচ্ছন্ন। আলোক ব্যতীত গুহাদর্শনার্থীর পাদার্দ্ধ অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই। খাসিয়ারা আলোক ও পথ প্রদর্শন কার্য্যে যাত্রীদের সহায়তা করে। (এখানে কোনরূপ পাণ্ডার উৎপাত নাই, কিছু পারিশ্রমিক দিলে খাসিয়ারাই দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়া দেয়।) প্রতি সোমবারে জয়ন্তীপুর হইতে ব্রাহ্মণ গিয়া রূপনাথের পূজার্চ্চা করিয়া থাকেন।

গুহাটিকে অন্ধকারের বিশ্রামাগার বলা যাইতে পারে; ভূগর্ভের অন্ধকার—সে চিরসঞ্চিত অন্ধকার মানব কল্পনার অতীত। প্রদীপ্ত আলোক যোগে সেই গভীর তমোরাশি মথিত করিয়া, সন্তর্পণে ধীরে ধীরে, অল্প একটু অগ্রসর হইলেই, দর্শকের দৃষ্টি উর্দ্ধদিকে একটি বিস্তৃত ঝালরের উপর হঠাৎ পতিত হয়। অতি সুরম্য প্রজ্বলৎ কিংখাপের ঝালরের মত শূন্যে ঝুলিতেছে। বুদ্ধিমান পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে, এ ঝালর প্রস্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে; অকৃত্রিম-স্বাভাবিক আর্দ্র প্রস্তর খণ্ড বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার উপর আলোকের প্রভা প্রতিফলিত হইলে নয়নরঞ্জন বস্ত্র ঝালরবৎ প্রতীয়মান হয়।

বস্ত্র ঝালর পার হইয়া গুহাভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, চতুষ্পার্শ্বে শিবলিঙ্গাকার অগণ্য প্রস্তর রাজি বিরাজিত রহিয়াছে দৃষ্ট হয়; কত যে শিবলিঙ্গ, তার সংখ্যা নাই। যদি এখন

২. এই বিষয়ে যাঁহারা কৌতুলাবিষ্ট, তাঁহারা শ্রীযুত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম.এ মহাশয়ের লিখিত "পূর্ণানন্দগিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ" প্রবন্ধটি পড়িবেন। উক্ত প্রবন্ধটি সুখপাট্য ও সুযুক্তিপূর্ণ। ইহা "আরতি" পত্রিকা (বৈশাখ-১৩১৪ বাংলা) ৭ম খণ্ড ৫ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৩. স্বর্গীয় কামাখ্যাতেও এই বিভ্রাট। কামাখ্যার ভৈরব রাবানন্দ, কিন্তু উমানন্দকেই সচরাচর ভৈরব বলিয়া গণ্য করা হয়। (বোধ হয় উভয় স্থলেই ভৈরবগণ সাধকের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪. Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap. III p. 87.

চিন্তনীয়—ভক্তিভাবোদ্দীপক কিছু থাকে, তবে তাহা এই শিবলিঙ্গ সমূহ। এত অগণ্য শিবলিঙ্গ কে জানে কখন কি উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছিল? এমন অনেক শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয় যাহার শীর্ষ দেশ হইতে অল্পে অল্পে অনবরত জলকণা নিঃসৃত হইতেছে। হাত দিয়া মুছিয়া দাও, দেখিতে দেখিতে আবার জল নির্গত হইবে।

আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে "নক্ষত্র মণ্ডল" দৃষ্টি গোচর হয়। নক্ষত্র মণ্ডল প্রকৃতই শোভার ভাণ্ডার। এমন মনোরঞ্জন—এমন মনোজ্ঞ, এমন তৃপ্তিপ্রদ ও সুখদ দৃশ্যে কাহার না বিস্ময় উৎপাদিত হয়? মস্তক উত্তোলন করিলেই সহস্র সহস্র নক্ষত্র উর্দ্ধে জ্বলিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে কৃষ্ণ চন্দ্রাতপের ন্যায় প্রস্তরের অঙ্গে সমুজ্বল বিন্দুগুলি, দর্শনে বুদ্ধিমানেরও ভ্রম উৎপাদিত হয়। কিন্তু এ হেন শোভার আস্পদ তারকাবলী জলবিন্দু মাত্র। বিন্দু বিন্দু জল চোয়াইয়া উপরের প্রস্তরছাদে ঝুলিতে থাকে, যাত্রীগণের দীপালোক তদুপরি নিপতিত হইয়াই বিচিত্র প্রোজ্জল নক্ষত্রবৎ অনুভূত হয়।

স্থলান্তরে স্থুলাকার এক অপূর্ব্ব শিবলিঙ্গ, তাহাতে অগণ্য স্বর্ণরেনু ঝিকিমিকি করিতেছে। একস্থানে স্তম্বাকার পাঁচটি প্রস্তর, ইহার নাম "পঞ্চ পাণ্ডব"। (এই শিবক্ষেত্রে পঞ্চ পাণ্ডব প্রস্তর দেহে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়।) স্থলান্তরে বট গাছের বোয়ার (শিকড়ের) মত চারিটি বৃহত্তম প্রস্তর নামিয়াছে; ইহাকে "চারিযুগের খম্বা" বলে। এরূপ আর এক প্রকাণ্ড প্রস্তরের "ভৈরব" আখ্যা। অতঃপর একটি গভীর গর্ত্ত দৃষ্ট হয়, ইহা "লক্ষ্মীরভাণ্ডার"। তৎপর "স্বর্গদ্বার"।

স্বর্গদ্বার স্থানটি শান্তভাবোদ্দীপক, অতি মনোরম ও তৃপ্তিপ্রদ। বহুক্ষণ অন্ধতমোময় ভূগর্ভে শ্রান্তদেহে, ক্লান্তমনে ভ্রমণ করতঃ হঠাৎ যখন স্বর্গীয় শুভ্রজ্যোতি রেখা নয়ন পথে পতিত হয়, তখন মনে মনে যেন এক উদাস ভাবে কোন অজানা দেশে চলিয়া যায়। নিবিড়তম অন্ধকারে—গুহাভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র পথে, উর্দ্ধ হইতে অতি সামান্য, মিটি মিটি আলোক ভিতরে আসিতেছে; সেই আলোকে, গুহার উর্দ্ধদিকে অল্প কিছুটা স্থান ঈষৎ আলোকিত হইতেছে; তাহাতে তথায় যেন কত শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহাই স্বর্গদ্বার। (লোকের বিশ্বাস যে, স্বর্গদ্বার দেখিলে, স্বর্গ গমনে আর বাঁধা থাকে না।)

এ স্থান হইতে কিছুদূরে, আর একটি অন্তগহ্বর বা গর্ত্ত দৃষ্ট হয়। অতি সতর্ক না হইলে সে গর্ত্তপথে প্রবেশের সাধ্য নাই। ইহার ভিতরে কয়েকটি প্রস্তরের 'ত্রিশূল' প্রথিত রহিয়াছে; এস্থানের নাম "যোগনিদ্রা"। সাধারণতঃ যোগনিদ্রা" হইতেই দর্শকগণ প্রত্যাবৃত্ত হয়। ইহার পর 'পাতল বা নাগপুরী'। ভীষণ সর্প গণের আবাস স্থান বলিয়া ব্যাখ্যাত। একথা বড় অসম্ভব নহে। প্রবেশ দ্বার হইতে যোগনিদ্রা পর্য্যন্ত যাইতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় লাগে। এই গুহাটি এত বৃহৎ যে, এককালে দুই তিন শত লোক প্রবেশ করিলেও পরস্পরে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। প্রবাদ এই যে, দেবাসুর যুদ্ধে পরাভূত দেবগণ অসুরভয়ে এই নির্জ্জন গুহায় লুকাইয়া আত্মরক্ষা করেন। পূর্ব্বে এই স্থানে মধ্যে মধ্যে অনেক মহাপুরুষকে বসিয়া সাধন করিতে দেখা যাইত। গুহার দ্বারে বঙ্গাক্ষরে রাজা রামসিংহের নাম খুদিত আছে।

সাতহাত পানি ও গুপ্ত গঙ্গা

গহ্বর হইতে বাহির হইয়া, ইহার নিকটবর্ত্তী "সাতহাত পানি" নামক এক নির্ম্মল সলিলা কুণ্ডে স্নান তর্পণ করিতে হয়। এই কুণ্ডের গভীরতার পরিমাণ হইতেই তাহার নামকরণ হইয়াছে। সাত হাত পানির অল্প উত্তরে "পাতাল গঙ্গায়" ও তর্পণাদি করিতে হয়। তাহার উত্তরে একটা অতি বৃহৎ ও উচ্চ পাথর আছে, ঐ পাথরের নীচে একটা গভীর কূপ। একটা গুপ্ত জলস্রোত সোঁ

সোঁ শব্দে অদৃশ্য ভাবে ঐ কূপে পতিত হইয়া, একদিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, ইহারই নাম "গুপ্ত গঙ্গা"। এস্থানে স্নান করা যায় না, ঘটিদ্বারা জল লইয়া লোকে মাথায় দেয়।

শিবের বাড়ীর দক্ষিণে একটা পুষ্করিণী আছে, জয়ন্তীয়ার জনৈক রাজা একরাত্রে ঐ পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। পুকুরের উত্তরে কৃষ্ণপ্রস্তরের একটা প্রকাণ্ড হস্তী রহিয়াছে, ঠিক জীবন্ত বন্য হস্তী জলপান করিতে আসিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। নিম্ন প্রবাহী "ভুবনছড়ার" পশ্চিমাংশে ঐরূপ আর একটি প্রস্তর নির্ম্মিত হস্তীমূর্ত্তি আছে। প্রস্তর শিল্পে এক সময় জয়ন্তীয়াবাসীরা বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল।

শিবের বাড়ীর পথে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরে, বৃহৎকায় একদণ্ড গণেশের এক মূর্ত্তি আছে, কিন্তু তাঁহার কোনরূপ পূজা অর্চ্চনা নাই। রূপনাথ শিবপূজার্থে যাত্রীগণকে অর্চ্চনার দ্রব্য ও নিজের পুরোহিত সঙ্গে নিতে হয়। গুহাভ্যন্তরে কোন দেবতার পূজার প্রথা নাই। শিবরাত্র ও বারুণী উপলক্ষে এই স্থানে বহুলোকের সমাগম হয়।

গ্রীবা পীঠ

গোটাটিকরের ভৈরবী বাড়ী

বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ ৪৬৮ পৃষ্ঠায় বিশেষ প্রমাণের সহিত লিখিত হইয়াছে যে, গ্রীবা পীঠ শ্রীহট্টে অবস্থিত,—ভৈরবীর নাম মহালক্ষ্মী ও ভৈরব সর্ব্বানন্দ। এই মহাপীঠ যে শ্রীহট্ট সহরে বা তন্নিকটে বিরাজিত, তাহা সকলেরই মনের ধারণা।[৫]

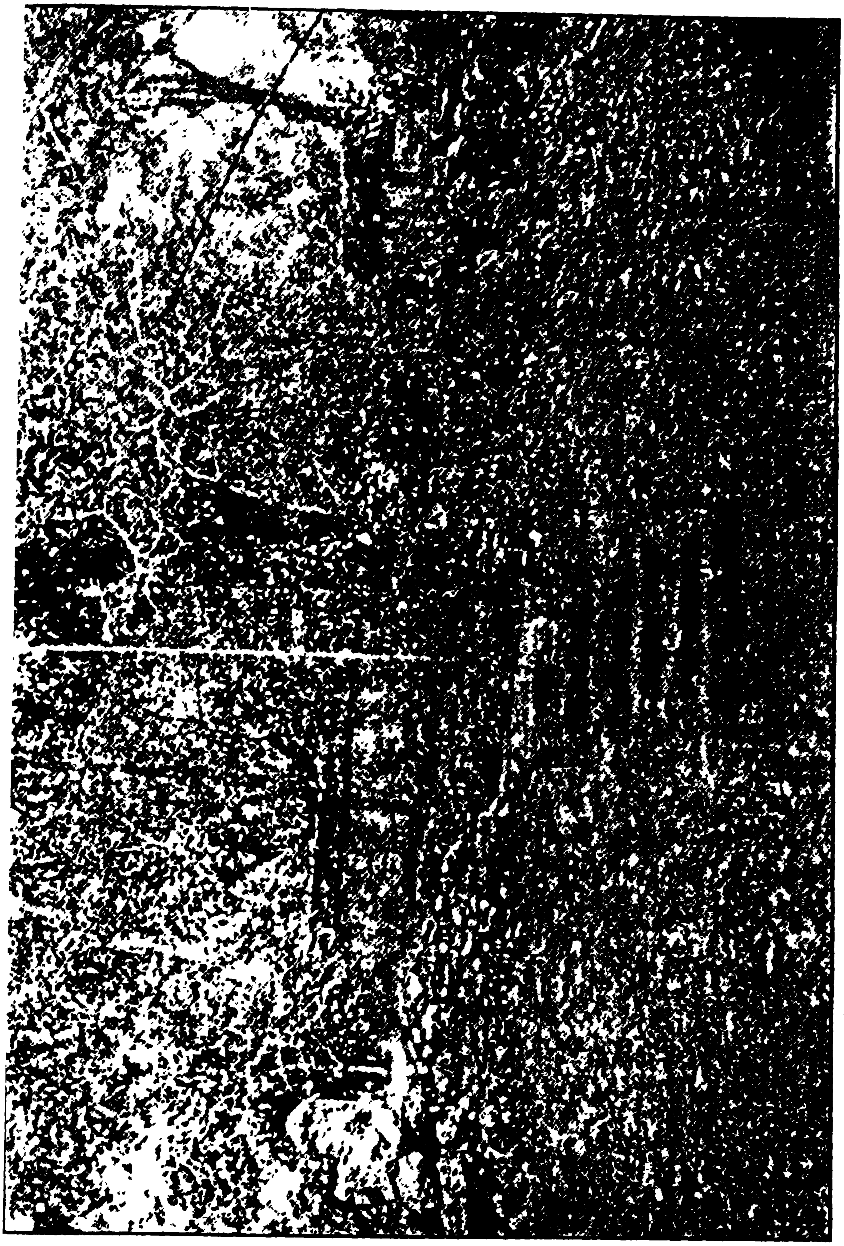
গোটাটিকরের ভৈরব বাড়ি

কিন্তু কোথায় যে সে পূণ্যস্থান অবস্থিত, তাহার যথার্থ নির্দ্দেশ সাহস সহকারে করা যাইতে পারিত না। কেহ কেহ মনে করিতেন, দরগা মহল্লায় এই মহাপীঠ ছিল, পরে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বা দুর্গাবাড়ীতেই এই পীঠের অবস্থিতি স্থান কল্পনা করিতেন; কিন্তু এই উভয় স্থানই যে প্রকৃত মহাপীঠ নহে, তাহা সহজেই জানা যায়।[৬] এই মহাপীঠ কোথায়, যখন তাহা জানিবার জন্য লোকের বিশেষ একাগ্রতা জন্মিল, যখন অনেকের ঐ এক বিষয়ই অনুধ্যেয় হইয়া দাঁড়াইল, তখন দেবী প্রসন্না হইলেন। মহাপীঠ কোথায়, তাহা জানিবার আর বাকি থাকিল না; গোটাটিকরেই তখন মহাপীঠের বিদ্যমানতার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল। ভক্তগণ উৎফুল্ল হইলেন, ভট্ট-কবিগণ চতুর্দ্দিকে এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন।[৭] সকলেই জানিতে পারিল যে, শ্রীহট্ট সহর হইতে দেড় মাইল মাত্র দক্ষিণে গোটাটিকরের জৈনপুরে প্রসিদ্ধ গ্রীবা পীঠ অবস্থিত। সরকারী ইতিহাস গ্রন্থে

৫. "Sati's left leg fell in Jaintia and her neck in or near the town Sylhet."
-Report on the Census of Assam-1901. vol. IV part I p, 40.

৬. দরগা মহল্লায় যে মহাপীঠ ছিল না, সুহেল-ই-এমন প্রভৃতি গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে কিছু বর্ণিত না থাকাতেই তাহা প্রমাণিত হয়। মোসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুতীর্থ বিনষ্ট হইলে সগৌরবে তাহা লিখিত হইত। বস্তুতঃ কোন দেবতার প্রতিই তৎকালে অত্যাচার হয় নাই, সম্ভবতঃ ঐস্থানেস্থিত হাটকেশ্বর শিবও স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। আর দুর্গাবাড়ীর প্রতিষ্ঠা বড় প্রাচীন ঘটনা নহে; ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে লাল গৌরহরি সিংহ দুর্গাবাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করেন।
-See Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet chap. III. p. 105.)

৭. পীঠ প্রকাশ সম্বন্ধে বহু ভাটের কবিতা আছে, স্থানীয় পত্রিকা পরিদর্শকে এতদ্বিষয়কে কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।



গোটাটিকরের ভৈরব বাড়ীর ছবি

এই গোটাটিকরের ভৈরবী স্থানকে মহাপীঠ বলিয়া লিখিত আছে।[৮]

স্কুলপাঠ্য ইতিহাস[৯] গ্রন্থাদিতে গ্রীবাপীঠ বলিয়া এই স্থানেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে; এবং প্রচলিত পঞ্জিকার তীর্থ পরিচয় স্থলেও এই গ্রীবাপীঠেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।[১০]

পীঠ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ও আপত্তি খণ্ডন

প্রসিদ্ধ "শিক্ষা পরিচয়" সম্পাদক ও দেবীযুদ্ধ প্রভৃতি প্রণেতা কবি শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি. এ মহাশয়ের লিখিত "মহাপীঠ প্রকাশ" প্রবন্ধটি এস্থলে (১৩শ ভাগ ১১শ সংখ্যা পরিদর্শক পত্র হইতে) উদ্ধৃত করা হইল। ঐ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে;—তন্ত্রে আছে—

"গ্রীবা পপাত শ্রীহট্টে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী।
দেবীতত্র মহালক্ষ্মী সর্ব্বানন্দশ্চ ভৈরব॥"

অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অনুবাদে আছে—

"শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব, বৈভব যাহা সেবি।"

উপরি উক্ত বাক্যগুরির অর্থ পরিগ্রহ করিলে বুঝা যায় শ্রীহট্টে একটি মহাপীঠ আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের সন্দেহ-সম্ভাবনা নিবারণার্থে এ স্থলে আরও একটু বক্তব্য আছে। এ অঞ্চলে যে পীঠমালা প্রচলিত আছে, তাহার কোন কোন গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছেঃ—

'শ্রীহট্টে মে হস্ততলং দেবতারণ্যবাসিনী।"

ইহাতে কেহ কেহ শ্রীহস্ত হইতে শ্রীহট্ট কল্পনা করিয়া, দেবীর হস্ত এই স্থানে পতিত হইয়াছেন বলেন। ইহা প্রামাণ্য হইলেও কল্পনান্তর ব্যবস্থা দ্বারা সামঞ্জস্য বিধানই যুক্তিসঙ্গত। পীঠস্থলে সমাগত অধ্যাপক মণ্ডলী এই সিদ্ধান্তই করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রচারিত পীঠমালা গ্রীবাদেশ শ্রীশৈলে পতিত হয় উল্লিখিত আছে। এই শ্রীশৈল, হয় শ্রীহট্টের স্থলে লিপিকর প্রমাদবশত লিখিত, নয় শ্রীহট্টের নামান্তর। নতুবা তন্ত্রের সঙ্গে সমন্বয় হওয়াও তো আবশ্যক। শ্রীশৈল দ্বারা শ্রীনামক কোনও পর্ব্বত বুঝাইবার প্রয়োজন দেখা যায় না। কেন না ইতি পূর্ব্বেই শ্রীপর্ব্বতেরও উল্লেখ দেখা যায়, উহাতে দেবীর তল্প মতান্তরে দক্ষিণ গুল্ফ পতিত হইয়াছে। লিপিকর প্রমাদ কল্পনার সমর্থনে ইহাও বলা যায় যে ভৈরবের নাম সর্ব্বানন্দ স্থলে সম্বরানন্দ লিখিত হইয়াছে।[১১]

৮. "About a mile and a half south of Sylhet town, where sati's neck is said to have fallen when her body was dismembered by Vishnu. This pith, as the places consecrated by the fragments of Sati's severed body are called, has only rcently been rediscovered. Sati's neck is represented by a pirce of flat rock, similar to the found on most of the tilas round Sylhet. Her bhairab or guardian left to protect her by Siva, takes the usual form of a small upright piller of rock shaped like a phullus. There is no temple over these remains, and hardly anything neighbour hood of Sylhet town.
-Assam District Gazetteers vol. II. chap III. p 86.

৯. আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ—২য় সংস্করণ।

১০. শ্রীযুক্ত পি এম্ বাগচী প্রকাশিত পঞ্জিকা ও গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা।

১১. মলয় পর্ব্বতের উত্তরাংশে বর্ত্তমান পাল্‌নি হিল্‌ই শ্রী পর্ব্বত। মহাভারত বনপর্ব্বের ৮৫ তম অধ্যায়ে ১৮শ শ্লোকে ইহার উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীশৈলের উল্লেখ আছে। মান্দ্রাজের কাসুল জিলায় ইহা অবস্থিত। শ্রীশৈলের অবস্থিতি যথার্থ হইলেও, তথায় গ্রীবা পতিত হয় নাই, শিবচরিত গ্রন্থ মতে তথায় গ্রীবাংশ পতিত হয় এবং তাহা উপপীঠ মধ্যে গণ্য। বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ ৪৬৯ পৃষ্ঠায় এই উপপীঠের কথা লিখিত আছে; ইহার ভৈরবীর নাম সর্ব্বেশ্বরী ভৈরবের চর্চ্চিতানন্দ। অতএব শ্রীহট্টেই যে গ্রীবাপীঠ অবস্থিত, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

পরিচয়ের পন্থা

"যাহা হউক, অস্তিত্বে সন্দেহ করিবার অধিকার নাই বটে, কিন্তু পরিচয়ে সন্দেহ করিবার অধিকার বিলক্ষণ রহিয়াছে। পরিচয় সম্বন্ধে কেবল পদার্থ ও নাম জানাই যথেষ্ট নহে, কিন্তু অমুক নামে যে অমুক পদার্থ বুঝায়, ইহা জানা চাই। এই প্রকার পদার্থের সঙ্গে নামের বিচ্ছেদ ঘটাতে অনেক জিনিস বিলুপ্ত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অনেক ঔষধির নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু চিকিৎসকেরা নাম জানিয়াও সকল ঔষধ চিনিয়া উঠিতে পারেন না। আলোচনার অভাবে অনেক জিনিসেরই এরূপ দুর্গতি হইয়াছে। উপস্থিত ক্ষেত্রেও আমরা এইরূপ সমস্যায়-এইরূপ বিড়ম্বনায় পড়িয়াছি। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এইখানেই তিনি বিরাজিত থাকিয়া আমাদের দুর্দ্দশা দেখিতেছেন, লোক মুখে ও গ্রন্থে তাঁহার নামও আমরা অবগত হইতেছি, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, আমাদের কি দুর্গতির বিষয়, আমরা সেই নাম প্রকৃত পদার্থের সঙ্গে যোগ করিতে না পারিয়া দেবীর পরিচয় পাইতেছি না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, পদার্থ পরিচয় কিম্বা পার্থিব ঘটনা আত্মপরিচয়ের প্রমাণের জন্য, ইতিহাসের উপরে যতদূর নির্ভর করিতে বাধ্য, দেবতত্ত্ব আপন প্রমাণের জন্য, ইতিহাসের প্রতি সেরূপ নির্ভর না করিলেও চলে। দেবতত্ত্ব আধ্যাত্মিক ব্যাপার, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণের অতিরিক্ত একটা আধ্যাত্মিক প্রমাণও আছে। কিন্তু এই প্রমাণ যত্র তত্র পাইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা সাধন বলে হৃদয়ের নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছেন, যাহাদের জ্ঞানচক্ষু ও জ্ঞানকর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া দেবদর্শন ও দৈববানী শ্রবণের শক্তিলাভ করিয়াছে, এই আধ্যাত্মিক প্রমাণ তাঁহাদিগেরই প্রাপ্য এবং তাহাদিগের নিকট হইতেই সাধারণের গ্রাহ্য। যে আধ্যাত্মিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সহর হইতে প্রায় দুইমাইল দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত (গোটাটিকরের সমীপস্থ জৈনপুরে) ভৈরবী দেবীকেই মহালক্ষ্মী আর তত্রত্য শিবটিলার শিবকেই সর্ব্বানন্দ বলা হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা এ প্রমাণ কদাপি উপেক্ষা করিবেন না।"

মহাপীঠ প্রকাশ

"শতাধিক বর্ষ হইল, বৈদ্য বংশীয় দেবীপ্রসাদ দাস জৈনপুরে একটি পথ প্রস্তুত করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করেন, পথিমধ্যে প্রস্তরময় একটা স্থান দেখিয়া লোকটি সেই প্রস্তর উঠাইয়া ফেলিবার নিমিত্তে প্রয়াস পায় এবং একটা টুকরা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। সেই সময় একটি কন্যামূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া ছেদনকারীর গণ্ডদেশে ঠোকর মারাতে ঐ ব্যক্তি পলাইয়া যায় এবং অচিরেই মারা পড়ে। সেই রজনীতে নিয়োগকারী দেবীপ্রসাদ আদিষ্ট হন, —"আমি ভৈরবী, এস্থানে আছি, তোমার লোক আমার অঙ্গে আঘাত করিয়াছে, তুমি তোমার কুশল আকাঙ্খা করিলে নিত্য সেবা পূজার ব্যবস্থা করিবে। দেবীপ্রসাদ যথার্থই দেবীর প্রসাদ ভাজন ছিলেন, নতুবা তাঁহার প্রতি মায়ের এত করুণা কেন? যাহা হউক, ভক্ত দেবীপ্রসাদ ধনী ছিলেন, তিনি মায়ের নিত্য সেবা পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না, (কেনই বা হইবে) তিনি লক্ষ ইষ্টক প্রস্তুত করাইয়া মন্দির প্রস্তুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু দেবী স্বপ্নে পুনশ্চ আদেশ করিবেন;-'আমি মন্দিরে থাকিব না।' সেই ইষ্টক দ্বারা দেবীপ্রসাদ তখন প্রাচীর দিয়া ভৈরবীর স্থানটি বেষ্টন করিয়া দিলেন এবং নিকটে শিবমন্দির নির্ম্মানপূর্ব্বক শিবপ্রতিষ্ঠা করিলেন। মায়ের তখনও লুকোচুরি ভাব, তাই 'ভৈরবী' এই প্রচ্ছন্ন অথচ যথার্থ পীঠসূচক নামেই পূজা পাইতে লাগিলেন।"

পীঠস্থান ও সাধক ভক্ত

"কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশে পূর্ণানন্দ নামে একজন মহাত্মা ছিলেন, ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং সাধনা সাধারণে বিদিত ছিল এবং শেষাবস্থায় ইনি ব্রাহ্মণন্দপুরী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ১২৮১ সালে উনি দেহত্যাগ করেন। জীবিত কালে ইনি কখন কামাখ্যায়, কখন বাণিয়াচঙ্গে এবং কখন বা গোটাটিকরে থাকিয়া সাধন ভজন করিতেন এবং একদা মণিপুর গিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজকে স্বীয় যোগবল প্রত্যক্ষ করাইয়া ছিলেন। গোটাটিকর অবস্থান কালে এই ভৈরবীর বাটিতেই তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। অনেক লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের কেহ বা কেহ সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত।"

ভৈরবের স্থান নির্দ্দেশ ও পীঠ পরিচয়

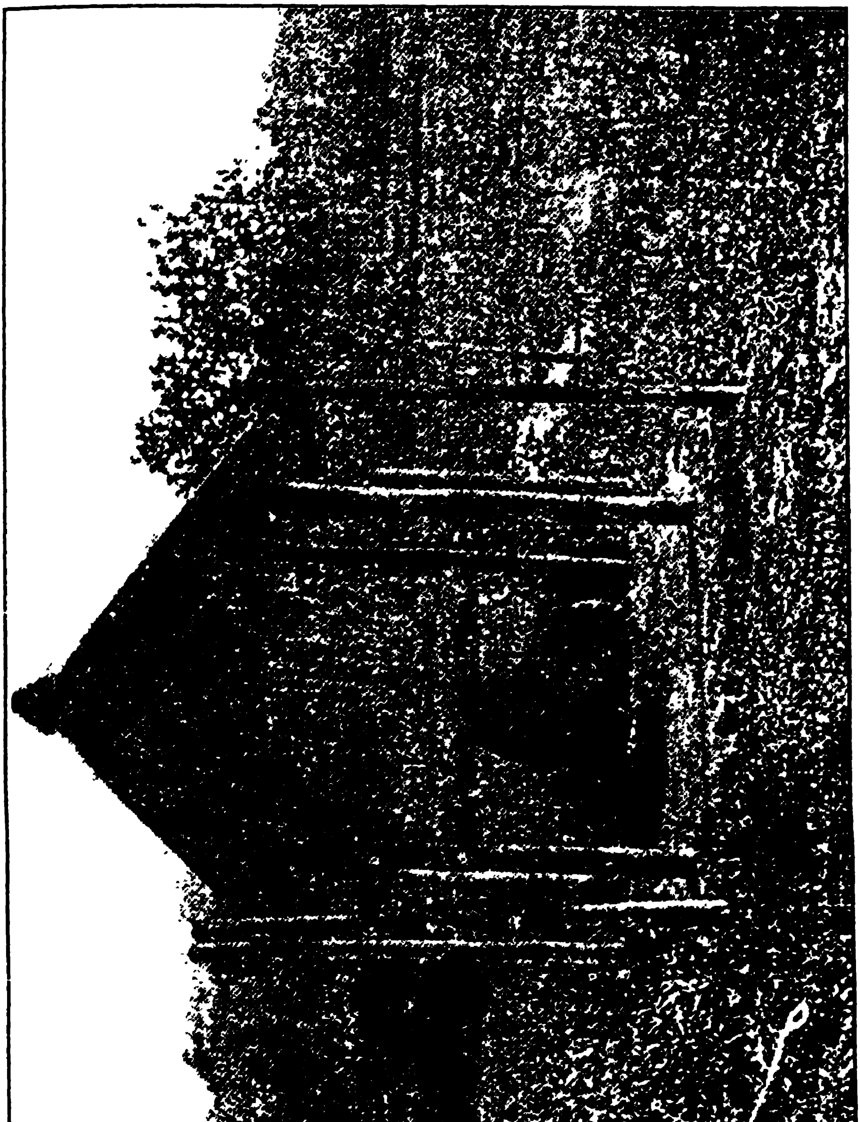
"একদিন ব্রহ্মানন্দপুরী রজনীযোগে সঙ্গিদিগকে লইয়া ভৈরবীর বাড়ীর ঈশান কোণাভিমুখে যাইয়া শিবটিলা নামক পাহাড়ে আরোহণ করেন এবং সঙ্গিদিগকে বলেন 'এই স্থান অতি পবিত্র এবং মহিমান্বিত, এই বনাচ্ছন্ন স্থানে অনাদি লিঙ্গ শিব বর্ত্তমান আছেন। এই 'ভৈরবী' মহাপীঠ এবং এই শিব তাঁহার ভৈরব; এই সম্বন্ধে তোমরা কিছুমাত্র সন্দেহ করিবে না।' যাঁহাদিগকে তিনি এ সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন, কিন্তু তখন তাঁহার কথায় কেহ বিশেষ প্রণিধান করেন নাই, সুতরাং এ বিষয়ে যতদূর আলোচনা ও আন্দোলন হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই।"

ভৈরব প্রকাশ

"এই ঘটনার কয় বৎসর পরে ১২৮৬ সালের মাঘ মাসে গোটাটিকর নিবাসী শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিরজা নাথ ন্যায়বাগীশ একদা রজনীযোগে স্বপ্নে দেখেন, সেই ব্রহ্মানন্দপুরী তাঁহাকে বলিতেছেন, 'চল, শিবটিলায় যাইয়া তোমাকে শিব দেখাই।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী, পণ্ডিত মহাশয় ও তাঁহার দুই ছাত্রকে লইয়া শিবটিলায় গমন করিলেন ও তাঁহার নির্দ্দেশমতে পূর্ব্বোল্লিখিত শিখরস্থিত সেই স্তূপ খনন করিয়া শিব দেখিতে পাইলেন। এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে পণ্ডিত মহাশয়, স্বপ্নের কথা কাহাকেও না বলিয়া তদ্বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ছাত্র দুইটি পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট আসিয়া বলিল যে, তাহারাও সেই রজনীতে স্বপ্নে সেই সন্ন্যাসী ও পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে শিবটিলায় যাইয়া স্তূপের ভিতর হইতে শিব বাহির করিয়াছেন! (এই ছাত্রদ্বয়ের মধ্যে আখালিয়া বাসী কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য এখন মৃত, এবং জানাইয়া নিবাসি শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র ভট্টাচার্য্য জীবিত আছেন।)[১২]

স্বপ্ন দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের চিত্ত সংশয়ে দোদুল্যমান ছিল, কিন্তু ছাত্রদের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয় হইতে সংশয় দূর হইয়া গেল, তিনি সানন্দ চিত্তে ছাত্রবর্গ প্রতিবাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া স্তূপ খনন করিতে শিবটিলায় গমন করিলেন। সন্ন্যাসী স্বপ্নে যেইরূপ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, সকলে মিলিয়া ঠিক সেইরূপ ভাবে স্তূপ খনন করিতে লাগিলেন। প্রথমেই একখণ্ড প্রস্তর পাওয়া গেল, প্রস্তর সরাইয়া দেখিলেন, তাহার নিম্নে শিবের উপরিভাগ দেখা যাইতেছে। ক্রমে চারিদিক হইতে বৃক্ষ ও মৃত্তিকা সরাইলে শিবের গৌরীপাট পর্য্যন্ত বাহির হইয়া

১২. শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ লিখিবার বৎসর কাল পরেই কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেলাসধামে শিবসাযুজ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি তর্কশাস্ত্রের পরীক্ষায় প্রথম হইয়া তর্কতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।



সর্বানন্দ ভৈরব

পড়িল। তখন সকলেই খনন হইতে নিবৃত্ত হইলেন। এই শিবই আমাদের নিকট সর্ব্বানন্দ ভৈরব রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। এই আবিষ্কারের বিষয় পণ্ডিত মহাশয় শ্রীহট্টবাসী কোনও সম্ভ্রান্ত আস্থাবান তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় (হাইকোর্টের উকীল) এবং স্বর্গীয় রায় প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায় বাহাদুর (শ্রীহট্টের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার) শিবটিলা গমনপূর্ব্বক মহাদেবের দর্শন এবং পূজাদিও করিয়াছিলেন।" এইরূপে সর্ব্বানন্দ ভৈরব প্রকাশ হন।[১৩] এই ঘটনার পরে শিবসম্বন্ধে একটি ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা এতদিন প্রকাশ পায় নাই, সম্প্রতি (১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখের) পরিদর্শকে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাগুক্ত কৈলাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছিলেন,—"যে দিন মাটি কাটিয়া শিব বাহির করিয়াছিলাম, সেই দিনের কথা এখনও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে মনে অঙ্কিত আছে। উপস্থিত জনগণ সকলেই দেখিয়াছেন, প্রায় দেড় হাত মাটির নীচে গৌরীপীটের সমস্থলে একখানা প্রদীপের মুছি এবং তিন চারিখানা মৃন্ময়পাত্র পাইয়াছিলাম, ইহা কি পূর্ব্বপূজার প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না? এই শিব সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনা আমার সমক্ষে হইয়াছিল, তাহা এযাবৎ কাহারও নিকটে ব্যক্ত করি নাই, কারণ 'অসম্ভাব্যং ন ব্যক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।"

পূজার প্রমাণ ও মাহাত্ম্য

'শিব আবিষ্কারের কয়েক মাস পরে একদা আমার সহযোগী ও সতীর্থ কৃষ্ণকুমার বলে যে, "চল ভাই, আমরা শিবের নিম্নভাগ খনন করিয়া দেখি।" আমি তাহার কথায় অনুমোদন করিলাম এবং উভয়ে শিবের নিকট উপস্থিত হইলাম। প্রথমতঃ কৃষ্ণকুমার খনন করিতে আবম্ভ করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কারণ যে দিকে খনন করিতে চায় সেই দিকেই প্রস্তর ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। তখন আমার মনে হইল যে এই প্রস্তর শিবের অঙ্গ, ইহাতে আঘাত করা উচিত নয়। তাহাকেও মনোভাব ব্যক্ত করিলাম; কিন্তু তাহার মনে বিশ্বাস হইল না। সে বলিল "এ পাথর শিবের অঙ্গ নয়, অতিরিক্ত।" এই বলিয়া পাথর কাটিতে আঘাত আরম্ভ করে কিন্তু প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিতে থাকে। সাধারণতঃ পাথরে লোহার আঘাত করিলে যেরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয়, এ সেরূপ নহে, ইহা তদপেক্ষা অধিক ও প্রোজ্জল। এইরূপ দুই চারিবার আঘাতের পর হঠাৎ সে মূর্চ্ছিত হয়, তখনি আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম, চক্ষে জল আসিল, মনে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল, তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। সেই দিন বৈকালে কৃষ্ণকুমার বলিল, "আমার বুকে ব্যথা হইযাছে, অদ্য বাড়ী যাইব।" এই বলিয়া সে আখালিয়া নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল। বাড়ী যাওয়ার দুইদিন পরেই তাহার মুখ হইতে প্রবল বেগে রক্ত উঠিতে থাকে ও সেই রক্ত উঠাই পশ্চাৎ তাহার মৃত্যুর কারণ হয়। এ রক্ত উঠা যে তাহার মৃত্যুর কারণ, ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু পূর্ব্ব ঘটনা আমি ভিন্ন কেহই জানে না। কাতর সংবাদ জানিয়া তাহাকে দেখিতে গেলে সে আমাকে বলিয়াছিল, "ভাই আমি মরিতেছি; কিন্তু একথা সহসা প্রকাশ করিও না, লোকে আমাকে অবিমৃষ্যকারী বলিয়া গালি দিবে। আমিও অধ্যাপকের ভয়ে এবং মৃতের বাক্য পালন কর্ত্তব্য বিবেচনায় এযাবৎ প্রকাশ করি নাই। এখন এই সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছে দেখিয়া কর্ত্তব্য বোধে প্রকাশ করিলাম। সেই কথা মনে হইলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে।"

১৩. "Sarbananda about a mile and a half south of Sylhet town."
-Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap. III p. 87.

মহাপীঠের প্রকৃষ্ট পরিচয়

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে আরও কিছু উদ্ধৃত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—"কামাখ্যাস্থ ভুবনেশ্বরীর প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীঅভয়ানন্দ তীর্থ (১৯০২ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে) এখানে পদার্পণ করিলে, তাঁহাকে আনিয়া গোটাটিকরে উপস্থিত করা হইল। তিনি শিবটিলা ও ভৈরবীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই আপনাতে ভাবান্তর অনুভব করিলেন এবং সন্নিহিত জনগণের নিকট দুই স্থানের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই ভৈরবী যে মহালক্ষ্মী পীঠ এবং এই শিবই যে সর্ব্বানন্দ ভৈরব, একথা তিনিও অতি দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। অভয়ানন্দ কি আধ্যাত্মিক প্রমাণের উপর তদীয় মত স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণে জানিবার কথা নহে। কিন্তু তিনি কৌতূহলাক্রান্ত সমাগত ব্যক্তিদিগকে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনটি অনেকেই স্মরণ রাখিয়াছেনঃ—

ক. ভৈরবীপীঠের আকার ও পরিমাণ মহাপীঠেরই সদৃশ, কামাখ্যা পীঠেরও এই আকার ও পরিমাণ; শিব হস্তে ৮ হাত।

খ. শিবটিলার শিবের যথাস্থানেই অবস্থান অর্থাৎ ঠিক ভৈরবী পীঠের ঈশান কোণে।

গ. সমীপস্থ জয়ন্তী বামজঙ্ঘা মহাপীঠ সম্বন্ধে যেরূপ মন্দির করিতে আদেশ নাই, এই স্থানেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল।"

"শিবের উপরে যে প্রস্তর খণ্ড ছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহাই শিবের শক্তি মনে করিয়া তাঁহার বাম পার্শ্বে রাখা হইয়াছিল, অভয়ানন্দ সে ভ্রম দূর করিলেন। তাঁহার প্রসাদেই মহালক্ষ্মীর সঙ্গে সর্ব্বানন্দের যোগ সাধারণে বিশেষভাবে বুঝিতে পারিল।"

পূর্ব্বকথার আলোচনা

"দেবতার নাম কেহ না জানিলেও দেবতা এখানে চিরকাল বর্ত্তমান আছেন। ইহা মনুষ্য স্থাপিত নহে। কত কত মনোজ্ঞ স্থানে কত মনোহর প্রস্তর খণ্ড রহিয়াছে, কেহ তাহার পূজা করে না, কেহ তাহাতে দেবত্ব দর্শন করে না। এখানে মহাদেবী ও মহাদেবের মহিমা আধ্যাত্মিক চক্ষুষ্মান লোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের পূজা দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তবে প্রভেদ এই, লোকে তাঁহাদিগকে সাধারণ দেবতা বলিয়া জানিত, মহাপীঠ বলিয়া জানিত না, এরূপ প্রমাণ কি আছে? তাহা না জানিলেও ক্ষতি নাই, কারণ তন্ত্রোক্ত পূজার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে কলির জীবের জন্য। এই কলিতেই নানাস্থানে নানারূপে আপনা হইতে যত্ন করিয়া তাঁহারা জীবের নিকট প্রকাশ পাইতেছেন; ভবানীপুর, (ফালজোর ও কামাখ্যা) প্রভৃতি পীঠস্থানের বিবরণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই জন্যই কলি ধন্য। মহালক্ষ্মী ও ভৈরবীরূপে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া শতাধিক বর্ষ যাবৎ পূজা পাইতে ছিলেনই, সর্ব্বানন্দও পূজা হইতে বঞ্চিত ছিলেন না। তাঁহার উপরে চতুঃপার্শ্বের লোকে দুগ্ধ ঢালিত এবং সময় সময় পূজাও দিত। পূর্ব্ব হইতে কোনও কিছু জানা না থাকিলে মৃত্তিকা স্তূপে এইরূপ দুগ্ধদানের কোনও অর্থ পাওয়া যায় না। এই পাহাড়টি শিবটিলা নামে চিরদিনই পরিচিত।"

এই দেশে কোনও সময়ে বিজাতীয়ের আক্রমণে দেবনিগ্রহ ঘটিয়াছিল; প্রসিদ্ধ ঊনকোটি এবং ভুবনেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে ছিন্ন হস্তপদ বিশিষ্ট দেবদেবী দর্শন করিলে এ কথা অসঙ্গত বোধ হয় না, খুব সম্ভব এই সময়ে বিধর্ম্মীর হস্তে অন্যান্য তীর্থেও দেবদেবীর দুর্দ্দশা দেখিয়া এস্থলে শিব শিবাণীর বুদ্ধিমান সেবকেরাই স্বয়ং তাঁহাদের নাম ও পার্থিবাংশ লুকাইয়া প্রকাশ্য পূজা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া

দিয়াছিল, কেননা তীর্থ এবং দেবতা রক্ষা পাইলে ত পূজার্চ্চনা? এই সুগুপ্তির উপরে বিস্মৃতির স্তর পড়িয়া একবারে বিলুপ্তি ঘটাইয়াছিল। কিন্তু নামটি লোপ হয় নাই, তাই বহুকাল পরে বিপ্লবের অত্যন্ত অবসান হইলে, শিবটিলার নামে আকৃষ্ট হইয়াই যেন স্থানীয় হিন্দুগণ অজ্ঞাতসারে হইলেও মহাদেবের উপরেই দুগ্ধাদি ঢালিত। ভৈরবীও প্রস্তর খণ্ড মাত্র, তাঁহাকে বিকৃত, স্থানান্তরিত (কিম্বা শিবের ন্যায় পাথর ঢাকা দিয়া গোপন) করিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহারও পূজার বিলোপ ঘটিয়াছিল এবং কালক্রমে স্থানের পরিচয় পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়।"

এই মহাপীঠের মাহাত্ম্যে অনেকেই আকৃষ্ট। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উৎসাহে শিবরাত্রি ও অশোকাষ্টমীযোগে এখানে মেলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ঠাকুর বাড়ী ও গোপেশ্বর শিব

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের নিকট ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজিত। তাঁহার প্রেমের পরিচয় আমেরিকা পর্য্যন্ত পরিব্যপ্ত হইয়াছে। এই শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বাসভূমি শ্রীহট্ট। ঢাকা দক্ষিণ পরগণার দত্তরালি গ্রামে জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম হয়। তদীয় ভ্রাতষ্পুত্র প্রদ্যুম্ন মিশ্রের প্রণীত "কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর, তদীয় পিতামহীর আগ্রহে ঢাকাদক্ষিণে আগমন করতঃ তাঁহার বাসনা পূর্ণ করেন। আগমন কালে বরুঙ্গায় তিনি একরাত্র ছিলেন, তথায় যে বকুলতলে তিনি প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন, সে স্থান এখনও লোকের নিকট বন্দনীয়। ঢাকাদক্ষিণে, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পিতামহী তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভুর মূর্ত্তি ও এক কৃষ্ণমূর্ত্তি হইতেই এ স্থান খ্যাতাপন্ন হইয়াছে। বিশ্বকোষ ৭ম ভাগ ৪৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ— "ঢাকাদক্ষিণ শ্রীহট্টের মধ্যে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত ও গুপ্তবৃন্দাবন নামে খ্যাত।[১৪] এই স্থান শ্রীহট্ট সহর হইতে সাত ক্রোশ দূরে দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। সহর হইতে ঢাকাদক্ষিণ পর্য্যন্ত বাঁধা রাস্তা আছে। নৌকা যোগেও যাওয়া যায়। ঢাকাদক্ষিণ শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান ও তাঁহার পিত্রালয়। উপেন্দ্র মিশ্রের বাসভবনই এখন বৈষ্ণবতীর্থ রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রতি বৎসর অনেক বৈষ্ণব এ তীর্থ দর্শনে সমাগত হইয়া থাকেন।"

"চারিশত বর্ষের প্রাচীন কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী এবং পরবর্ত্তী মনঃসন্তোষী গ্রন্থে এই তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছেঃ—ঢাকাদক্ষিণে উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র জগন্নাথ মিশ্রের বাস। জগন্নাথ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করেন, তথায় নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুহিতা শচীদেবীর সহ তাঁহার পরিণয় হয়। বিবাহের পর তিনি নবদ্বীপেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তিনি সপরিবারে পিতৃদর্শনে আগমন করেন, এখানে শচীর গর্ভ হয়; এই গর্ভের সন্তানই শ্রীচৈতন্যদেব। গর্ভাবস্থায় শচীকে লইয়া জগন্নাথ পুনর্ব্বার নবদ্বীপ গমন করেন, বিদায়ের পূর্ব্বে শচীকে তাহার শ্বাশুড়ী অনুরোধ করেন যে, তাঁহার পুত্র হইলে তাঁহাকে যেন একটিবার ঢাকাদক্ষিণে পাঠাইয়া দেন।"

"যথাকালে শ্বাশুড়ীর অনুরোধ শচীদেবী পুত্রকে জানাইয়া ছিলেন, কিন্তু গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত আসিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসের পর ১৪৩১ শকেই তিনি ঢাকাদক্ষিণ আগমন করেন।"

১৪. "The place which is held by the Vaishnavites in most respect is the temple of Chaitanya at Dhakadakshin or Thakurbari."
-Assam District Gazetteers vol II, (Sylhet) chap. III p. 87.

"পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে বৃদ্ধা স্বীয় পৌত্রের কাছে নানা কথা বার্ত্তার সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথাও বলিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে দুইটি মূর্ত্তি দেন, একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি, অপরটি তাঁহার নিজের। এই মূর্ত্তি দুইটি প্রদান করিয়াই তিনি চলিয়া যান, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দুইটি মূর্ত্তির প্রভাবে সে গ্রাম হরিভক্ত হইল—বিরুদ্ধবাদী কেহই রহিল না এবং এই মূর্ত্তি দুইটির প্রভাবেই মিশ্রবংশের পারিবারিক অভাব দূরীভূত হইল।"

"এই উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী; যেখানে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিদ্বয় বিরাজিত, তাহা এখন 'ঠাকুরবাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ। এই ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে ডাকঘর, বাজার প্রভৃতি আছে। রথযাত্রা ও ঝুলনোৎসবই অধিক জাক জমকের সহিত হইয়া থাকে।"

"এতদ্ব্যতীত ঢাকা দক্ষিণে প্রসিদ্ধ 'গোপেশ্বর শিব' আছেন। ঠাকুরব্যড়ী হইতে তাহা প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। কৈলাশ নামক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর শিবালয়। চৈতন্য দেব এই শিবদর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কৈলাসের পার্শ্বেই অমৃতকুণ্ড।" শ্রীচৈতন্য দেব অমৃতকুণ্ডও দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন ঐ কুণ্ডের চিহ্ন পাওয়া যায় না, ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পণাতীর্থ ও শ্রীঅদ্বৈতের আখড়া

পণাতীর্থের প্রকাশ

যে অদ্বৈতাচার্য্যের বাসস্থান বলিয়া শান্তিপুর বৈষ্ণবগণের কাছে এক দর্শনীয় স্থানে পরিণত হইয়াছে, সে মহাত্মার জন্ম স্থানের সন্নিধানেই পণাতীর্থ বিরাজিত। ষ্টিমারে সুনামগঞ্জে অবতরণ পূর্ব্বক পণাতীর্থে যাওয়া সুবিধাজনক।

"অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্থে লিখিত আছে যে একদা রজনীযোগে অদ্বৈত প্রভুর জননী স্বপ্নে দর্শন করেন যে, তিনি নানা তীর্থ জলে স্নান করিতেছেন। প্রভাতে ধর্ম্মশীলা নাভাদেবী স্বপ্ন কথা স্মরণ করতঃ ও তীর্থ গমনের বিবিধ অসুবিধার বিষয় চিন্তা করিয়া বিমর্ষভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে পুত্র অদ্বৈতাচার্য্য তথায় আগমন করতঃ মাতার বৈমর্শের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

জগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই যে, কেহ জন্ম হইতেই অতুল্য প্রতিভা, কেহ বা অমানুষিক শারীরিক শক্তি ও কেহ বা দৈববল লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। অদ্বৈতাচার্য্য ঐরূপ এক অদ্ভুত বালক ছিলেন। তিনি মাকে বিষণ্ন দেখিয়া "পণ" (প্রতিজ্ঞা) করিলেন যে, এই স্থানেই তাবৎ তীর্থের আবির্ভাব করাইবেন। মনঃশক্তির প্রভাব অসীম, যোগবলের শক্তি অসাধারণ, অদ্বৈতাচার্য্য এই শক্তির বলে তীর্থ সমূহকে আকর্ষণ করতঃ লাউড়ের এক ক্ষুদ্র শৈলের উপরে আনয়ন করিলেন। ঐ শৈল খণ্ডের একটি ঝরণা তীর্থবারি পরিপূরিত হইয়া ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। অদ্বৈত জননী তাহাতে স্নান করতঃ পরিতৃপ্তা হইলেন।[১৫] প্রায় চারশত ষষ্টি বর্ষ হইল, এইরূপে লাউড়ে এক তীর্থের উৎপত্তি হয়। অদ্বৈতের ন্যায় তীর্থ সমূহও "পণ" করিয়াছিলেন যে,

১৫. "প্রভু কহে আজি নিশায় আসিবে সর্ব্বতীর্থ;
কালি স্নান করি সিদ্ধ করিহ সর্ব্বার্থ।
নাভা কহে এই কথা কে করে প্রত্যয়;
প্রভু কহে এই কথা সত্য সত্য হয়।
তবে নিশাকালে প্রভু করিয়া মনন,
যোগে তীর্থগণে তবে কৈলা আকর্ষণ।
যৈছে লৌহগতি অয়স্কান্ত আকর্ষণে;
তৈছে তীর্থগণ আইলা ঈশ্বর স্মরণে।
মূর্ত্তিমতি শ্রীযমুনা গঙ্গা আদি তীর্থ,

প্রতি বারুণীতেই এস্থলে তাঁহাদের আবির্ভাব হইবে। এই "পণ" শব্দ হইতেই পণাতীর্থ নাম হইয়াছে। পণাতীর্থে বারুণী যোগে বহুলোকের সমাগম হয়।[১৬] বারুণী ব্যতীত অন্য সময়ে পণাতীর্থ দর্শনে যাওয়ার সুবিধা অল্প। এই তীর্থের একটা আশ্চর্য্য সংবাদ এই যে, শঙ্খধ্বনি বা উলুধ্বনি করিলে অথবা করতালি দিলে, পর্ব্বত হইতে তীব্রবেগে জলরাশি পতিত হয়।

অদ্বৈতের আখড়া

লাউড়ের নব গ্রামে অদ্বৈতাচার্য্যের জন্ম হয়, এই স্থানেই তাঁহার বাড়ী ছিল। অদ্বৈত প্রকাশ, অদ্বৈত মঙ্গল, ভক্তি রত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীন বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহা লিখিত আছে। অদ্বৈতের জন্ম স্থান বৈষ্ণবগণের নিকট তীর্থরূপে খ্যাত।[১৭] কালপ্রভাবে যখন লাউড় রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত হয়, তখন অদ্বৈত্য প্রভুর বাড়ীও জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়ে। তদবস্থায় অদ্বৈতের জন্মস্থান লাউড় পরগণায় কোন অংশে অবস্থিত, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণ ক্ষুণ্ন হইতেন।

প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ হইতে চলিল, এই বিষয়ের অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। অদ্বৈত বংশোদ্ভব উথলিবাসী স্বর্গীয় বৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী ইহার সূত্রপাত করেন। তাঁহার অনুরোধ ও আদেশে সুনামগঞ্জের তহশীলদার শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকান্ত আচার্য্য একান্তমনে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই জন্য তাঁহাকে হিংস্র জন্তপূর্ণ কণ্টকাবৃত জঙ্গলে কত দিন ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, কত নিশা জঙ্গলের বৃক্ষমূলে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হন নাই, অধ্যবসায় ত্যাগ করেন নাই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া, ভক্তিবল হৃদয়ে ধরিয়া, মাস মাস, বৎসর বৎসর, লাউড়ের জঙ্গল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন; সফলকাম হইতে পারেন নাই। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে তিনি প্রাচীন দীর্ঘিকা, গৃহাদির ভগ্নাবশেষ, ভগ্ন কৌড়ির স্তূপ চিহ্নাদির নিদর্শনে রাজবাটিকার স্থান নির্দ্দেশ করিতে

প্রভুরে পূজিয়া সবে হইলা কৃতার্থ।"
"প্রভু কৈল মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী যোগে,
সকলে আসিবা পণ করে মোর আগে।
তীর্থগণ কহে মোরা সত্য কৈলু পণ,
তব শ্রীমুখের আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন।
তদবধি পণাতীর্থ হৈল তার নাম।
পণাবগাহনে সিদ্ধ হয় মনস্কাম।–অদ্বৈত্য প্রকাশ–২য় অধ্যায়।
মাতার বিস্ময় দৃষ্টে অদ্বৈত আরও বলিয়াছিলেনঃ–
"প্রভু কহে– দেখ মাতা সদা জল ঝরে,
শঙ্খ আদি ধ্বনি কৈলে বহুজল পড়ে।"
"আশ্চর্য্য দেখিয়া মাতা নমস্কার কৈলা;
ভক্তি করি স্নান করি দানাদিক সমাপিলা।
তদবধি পণাতীর্থ হইল বিখ্যাত।
বারণী যোগেতে স্নান বহু ফলপ্রদ।–অদ্বৈত প্রকাশ ২য় অধ্যায়।

১৬. "There are places revered by all Hindus alike, irrespective of their sect. A certain portion of Panatirtha river, near the village ghatia bocomes as sacred as the Ganges on the occasion of Banni and pilgrimims flock in numbers to bathe in the holy waters."
-Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) Chap III p. 89.

১৭. অদ্বৈত প্রকাশে লাউড়কে ক্ষীরোদ সাগরের আবির্ভাব স্বরূপ বর্ণনা করা গিয়াছে, যথা–"শ্রীলাউড় ধাম কারণ রত্নাকর হয়।"
"At Nayagaon in Sunamganj, a akhra has recently been started i the honour of Adwaita, one of Chaitanya followers."
-Assam District Gazetteers vol II (Sylhet) chap III p. 88

পারিয়া উৎসাহিত হন, কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট তখনও সুসিদ্ধ হয় নাই। তার পরে ধাম ধরা দিলেন, সেই জনমানবহীন নিবিড় কাননে এক রাত্রে তিনি হঠাৎ শঙ্খ করতাল ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন। অনেকেই তাহা ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া ব্যাখ্যা করিল, কিন্তু তাঁহাব মনে অন্য ধারণা জন্মিল। যাহা ইউক, প্রভাতে সেই দিকে ভ্রমণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল. এবং অল্পায়াসেই রাজ বাটীর পার্শ্বে— সেই গহন বনে, একস্থানে অগণ্য তুলসীবৃক্ষ বেষ্টিত অদ্বৈতাচার্য্যের জন্মবাটিকা ও তীরে বহু প্রাচীন মাধবীবেষ্টিত বিশাল আম্রবৃক্ষ সমন্বিত পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। (ইহাই যে অদ্বৈতাচার্য্যের জন্মস্থান, তৎপক্ষে অনেক অকাট্য আধ্যাত্মিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।)[১৮] ফলতঃ এই স্থানই যে, অদ্বৈতের জন্মস্থান, সে বিষয়ে কাহারও মনে অনুমাত্র সন্দেহ রহে নাই। এই স্থানে রেঙ্গুয়া নামে নদী প্রবাহিত, এই নদীতীরেই রাজবাটী ছিল। সুনামগঞ্জের তদানীন্তন মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামী ও পূর্ব্বোক্ত তহশীলদার বাবুর বিশেষ উদ্যোগে গোকুলচন্দ্র দাস পুরকায়স্থ মহাশয় কর্ত্তৃক নবগ্রামে অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ীতেই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে "অদ্বৈতের আখড়া" স্থাপিত হয়। বারুণী পর্ব্বে তথায় বহুলোকের আগমন ঘটে।

এই স্থান প্রকৃতির এক রম্য নিকেতন। নীলায়ত পর্ব্বত, চঞ্চল নির্ঝরিণী, সুজল হ্রদ বা কুণ্ড এবং শ্যামল কাননশোভা বড়ই প্রাণারাম। এ স্থানে গেলে স্থান মাহাত্ম্যে মন কোন অজানিত দেশে যেন চলিয়া যায়, মনে বাঁধ যেন ভাঙ্গিয়া যায়, মনে স্বভাবতই ভগবৎ ভক্তির উদয় হয়। অধিক বলিয়া প্রয়োজন নাই, লাউড়ের বিবরণপ্রসঙ্গে জনৈক সম্ভ্রান্ত মোসলমান লেখক লিখিয়া পাঠাইয়াছেনঃ-"এ স্থানে প্রকৃতির শান্তিময়ী কান্তি অবলোকনে আত্মহারা হইতে হয়, এ স্থানে আত্মীয়বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগ জনিত সংসারে জ্বালাযন্ত্রণা মনে থাকে না।"

নির্ম্মাই শিব

শিব স্থাপন বিষয়ক জনশ্রুতি

বালিশিরা পরগণায় এই শিব অবস্থিত। ইহার নাম বাণেশ্বর শিব; কিন্তু সাধারণতঃ নির্ম্মাই শিব নামেই কথিত হন। কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে নির্ম্মাই ও হর্ম্মাই নামে ত্রিপুর রাজবংশীয়রা দুই জন কুমারী অতি রূপবতী ছিলেন। এই ধর্ম্মপরায়ণা ভগিনীদ্বয়ের বিবাহ যোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে, রাজা যখন তাঁহাদের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহারা প্রকাশ্যে জানাইলেন যে বিবাহ করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা নাই। রাজা কুমারীদের এইরূপ অবাধ্যতায় অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিলেন; তদবস্থায় নিরাশ্রয়া ভগ্নী দুটি বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে বালিশিরা পাহাড়ে আগমন করেন। যে স্থানে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, সে এক সুরম্য স্থান, প্রকৃতির রম্য নিকেতন; তাহারা এই স্থানে বাস করতঃ শিবস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনায় জীবন পাত করেন। জ্যেষ্ঠা নির্ম্মাইর নামানুসারেই তৎপূজিত শিব নির্ম্মাই শিব বলিয়া খ্যাত হন। কথিত আছে যে, প্রায় ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে এই শিব স্থাপিত হন।[১৯] নির্ম্মাই সঙ্গে যে স্বর্ণালঙ্কার আনয়ন করিয়াছিলেন, কথিত আছে যে, তাহা বিক্রয় করতঃ তল্লব্ধ অর্থে শিবের সম্মুখে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা নির্ম্মাই-দীঘী নামে কথিত হয়।

---

১৮. ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ তারিখে "বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে এ বিষয়ে কতকটা ঘটনা প্রকাশিত হয়। কৌতুহলান্বিত পাঠক তাহা দেখিবেন।

১৯. "Name of founder and date of foundation. Nirmai and Harmai two unmarried ladies of the Tippera Royal family in 1454 A. D."
-Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap. III p. 107.

দ্বিতীয় আখ্যায়িকা এই যে, ঐ স্থানে প্রবাহিত বিলাস নামে পার্ব্বতীয় ছড়ার স্রোতে এই শিব গড়াইয়া গড়াইয়া যাইতেছিলেন, জনৈক যবন কাজী শিবকে প্রাপ্ত হইয়া, স্বপ্নাদেশানুসারে কোন এক ব্রাহ্মণকে দান করেন। সেই ব্রাহ্মণ নির্ম্মাই দীঘীর তীরে তাঁহাকে স্থাপন করেন। (কিন্তু এই প্রবাদের উপর লোকের অধিক আস্থা নাই।)

নির্ম্মাই শিব অতি প্রসিদ্ধ। বারুণী ও অশোকাষ্টমী যোগে এখানে এত অধিক জনতা হয় যে, ঢাকাদক্ষিণ ব্যতীত শ্রীহট্টের অন্য কোন দেবস্থানে তত লোকসমাগম ঘটে না। অনেক লোক এস্থানে মানসিক আদায় জন্যও আগমন করিয়া থাকে।[২০] সাতগাও রেইলওয়ে ষ্টেশনের প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে নির্ম্মলসলিলা প্রশস্তবক্ষা নির্ম্মাই দীঘীর তীরেই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। স্থানটি অতি রম্য, তথায় উপস্থিত হইলে স্বতঃই ভক্তিরসে মন আপ্লুত হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বিগত ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বাসন্তীয় অষ্টমী যোগে হঠাৎ এই শিবের অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছিল, অনেক চেষ্টায়ও না পাওয়ায় পূর্ব্ব শিবের অনুকরণে কাশীধাম হইতে এক নূতন শিব আনয়ন করতঃ স্থাপন করা হইয়াছিল। পরে পূর্ব্ব শিব প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তিনিই এখন স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্থান-মাহাত্ম্যও পূর্ব্ববৎ আছে; এখনও বহুলোক তথায় গিয়া কৃতার্থ হয়। এই শিবের সেবায়েত মধ্যে ধর্ম্মবলে কেহ কেহ অতি খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন, পশ্চাৎ তাঁহাদের বিবরণ বর্ণিত হইবে।

হর্ম্মাইর বিশেষ কোন কীর্ত্তিকথা জ্ঞাত হওয়া যায় না। কেবল শিবের বাড়ী হইতে কয়েক মাইল দূরে "হর্ম্মাইর দীঘী" নামক জঙ্গলাবৃত একটি দীঘী তাহার নামে ক্ষীণ পরিচয় দিতেছে।

ঊনকোটি তীর্থ

ঊনকোটি তীর্থ শ্রীহট্ট সীমার সন্নিকটবর্ত্তী ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার প্রান্তবর্ত্তী। এই তীর্থও শ্রীহট্টবাসীর তীর্থ বলিয়াই গণ্য। ইহা স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্গত এবং কৈলাসহর হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। আসাম-বেঙ্গল রেইলওয়ের টীলাগাও ষ্টেশন হইতে পদব্রজে কয়েক মাইল অতিক্রম করিলেই এ স্থানে যাওয়া যায়।

ঊনকোটি তীর্থে কোনরূপ পূজার প্রথা নাই। কারণ দেবতাগণও পূর্ণাঙ্গ নহে। ঊনকোটিতে অগণিত দেবমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। কত যে মূর্ত্তি, কে গণনা করিবে? এক সময় ইহা পূর্ব্ববঙ্গে যে এক প্রধান তীর্থ ছিল, তাহা দেবমূর্ত্তির সংখ্যানুপাত বলা যাইতে পারে। এক স্থানে এত অধিক দেবমূর্ত্তি বড় অধিক দৃষ্ট হয় না।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ কৃত "কৈলাসহর ভ্রমণ" পুস্তিকায় বিরল প্রচারিত ঊনকোটি মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থ হইতে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, বরবক্র ও মনুর মধ্যে ঊনকোটি পর্ব্বত অবস্থিত।[২১]

দেবমূর্ত্তিসমূহ

ইহাতে জানা যায় যে, কৈলাসহর হইতে কাছাড়ের পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিরিশ্রেণী ঊনকোটি পর্ব্বতের অন্তর্ভুক্ত। এবং প্রসিদ্ধ কপিল তীর্থও ইহার অন্তর্গত। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়

---

২০. "Nirmai in the South Sylhet subdivision, where there is an image of Siva, before which people sometimes shave their hair in the hope of being delivered from disease."
-Assam District Gazetteers vol III. chap. II p. 86.
-Vide Hunter's Statisticl Accounts of Assam vol II p. 25.

২১. "বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদসম্ভূতো বরবক্রঃ সুপুণ্যদঃ
দক্ষিণস্যাৎং নদস্যাস্য পুণ্যামনুনদী স্মৃতা।
অনয়োরন্তরা রাজন্ ঊনকোটি গিরির্মহান্।"—ঊনকোটি তীর্থ মাহাত্ম্য

লিখিয়াছেন "উনকোটি গিরি শ্রেণীর যে শৃঙ্গটি তীর্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহার উচ্চতা নিতান্ত কম নহে। শৃঙ্গটির শিরোভাগে এবং পশ্চিম পার্শ্বে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। শিরোভাগের মূর্ত্তিগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত, পার্শ্বের মূর্ত্তিগুলি পর্ব্বত গাত্রে খোদিত।"

"শিরোভাগের অনেকগুলি মূর্ত্তি চিনিতে পারা যায় না। ঐ সকল মূর্ত্তির কতকগুলি কিঞ্চিৎ আধুনিক ও কতকগুলি বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।"

"পর্ব্বত গাত্রে খোদিত মূর্ত্তিগুলি যে বহু প্রাচীন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ করিবার যো নাই। ঐ সকল মূর্ত্তিতে নির্ম্মাণ কৌশল বিশেষ কিছুই নাই। প্রত্যেক মূর্ত্তির কর্ণে 'পাণপাশা'র ন্যায় বৃহৎ কুণ্ডল আছে।"

"পর্ব্বত পার্শ্বে বহুসংখ্যক মূর্ত্তি খোদিত ছিল, কালক্রমে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন যাহা আছে, তাহাও আর বেশীদিন থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ প্রস্তর ক্রমে ধসিয়া পড়িতেছে।"

"উনকোটি শৃঙ্গের পশ্চিম পার্শ্বে প্রস্তরে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ঐ গুলি দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি, এখন স্পষ্ট বুঝিবার উপায় নাই।"

"ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে মহাদেবের মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহা অতি প্রকাণ্ড। দুইটি কর্ণ দুইখানি কপাটের ন্যায়, দুইখানি ঢালের ন্যায় দুইটি কুণ্ডল তাহাতে শোভা পাইতেছে। গোঁপের একদিক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, একদিকে একহাত দেড়হাত পরিমাণ বর্ত্তমান আছে। হাতে ত্রিশূল, সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড বৃষ।

"শৃঙ্গাগ্রে প্রস্তর ও ইষ্টক রাশি প্রকীর্ণাবস্থায় ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। কোন সময় ঐ স্থানে যে প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির ছিল, তাহা বেশ অনুমিত হয়। একটি মন্দির অতি অল্পদিন পূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়।"

দেবমূর্ত্তি ভগ্ন হওয়া

রাজমালায় লিখিত আছে যে, ত্রিপুরার মহারাজ বিজয় মানিক্য উনকোটি দর্শনে গমন করিয়াছিলেন।[২২] ঐ সময় পর্য্যন্ত উনকোটি তীর্থের মূর্ত্তিগুলি ভগ্ন হয় নাই বিবেচনা করা সঙ্গত। ইহার অব্যবহিত পরে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কালা পাহাড় কর্ত্তৃক বহুস্থানের দেবমূর্ত্তি বিভগ্ন হয়, উনকোটি তীর্থের দুর্দ্দশাও তৎকর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল বলিয়া অদ্যাপি কথিত হয়। কেবল ইহাই নহে, পার্শ্ববর্ত্তী ভবনেশ্বর তীর্থ ও তুঙ্গেশ্বর শিবও তৎকর্ত্তৃক বিভগ্ন হওয়ার জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ হজরত শাহজালালের সময়—কেহ কেহ বলেন, এই সময় সংগোপন করা হয়।

সিদ্ধেশ্বর শিব

চাপঘাট পরগণার অন্তর্গত শ্রীগৌরী মৌজার তিন মাইল পূর্ব্বে, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের সীমা মধ্যে এই শিব স্থাপিত। বারুণী উপলক্ষে এখানে পঞ্চদশ দিবস ব্যাপী এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। রেইলওয়ে অথবা ষ্টিমার যোগে বদরপুর ষ্টেশনে অবতরণ পূর্ব্বক শিবের বাড়ী যাওয়ার বিশেষ

২২. "কতদিন পরে রাজা উনকোটি গেলা।"– রাজমালা।

ত্রিপুরার প্রখ্যাতকীর্ত্তি মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সপারিষদ উনকোটি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন।

সুবিধা। শিবেব বাড়ী শ্রীহট্ট সীমা চিহ্নের কয়েক হস্ত মাত্র পূর্ব্বে অবস্থিত মেলা স্থান শ্রীহট্টেই।

উনকোটি তীর্থ মাহাত্ম্য নামক বিরল প্রচারিত হস্তলিখিত গ্রন্থের মতে এই শিব কপিল মুনি কর্ত্তৃক স্থাপিত ও পূজিত হন। কপিল মুনি এক সময় এই স্থানে তপস্যা করেন।[২৩] অতি অল্পদিন হইল, শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উনকোটি মাহাত্ম্যের শ্লোক স্বীয় "কৈলাসহর ভ্রমণ" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন। কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্ব হইতে এদেশে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা এ শ্লোকার্থের ঠিক অনুরূপ। বায়ুপুরাণের মতে ও জনশ্রুতিতেও এই স্থানের নাম "কপিলতীর্থ"। এবং এই শিব "কপিল পূজিত"। এই স্থানেই ভগবান কপিলদের তপস্যা করিয়াছিলেন।[২৪] এই স্থান উনকোটি গিরির একদেশ স্থিত বলিয়া জানা যাইতেছে।

পুণ্য সলীলা নদী

এই স্থানেই পাদদেশ ধৌত করিয়া বরবক্র প্রবাহিত হইতেছে। এই বরবক্র নদ পাপ প্রনাশক বলিয়া বারুণীযোগে ইহার স্থানে স্থানে লোকে স্নান তর্পন করে।[২৫] খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িক পঞ্চবিপ্র "বরবক্র তীর্থযাত্রা পুরঃস্বর"[২৬] শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বায়ুপুরাণ অতি প্রাচীন, তাহাতে "বরবক্র মাহাত্ম্য" নামে একটি পৃথক অধ্যায়ে ঐ পুণ্যদ নদ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।[২৭] তদ্ব্যতীত মনু নদীর মাহাত্ম্যও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।[২৮] ভগবান মনু এক সময় ইহার তীরে শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া তন্ত্রে উল্লেখ আছে।[২৯] যে স্থানে

---

২৩. "বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদসম্ভুতো বরবক্র সুপুণ্যদঃ।
অনয়োরন্তরা রাজন্ উনকোটি গিরিমহান্।
অত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলোমুনিঃ॥
তত্র বৈ কপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্।
লিঙ্গঞ্চ কাপিলং তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদং নৃণাম্॥"
–উনকোটি তীর্থ মাহাত্ম্য।

২৪. যত্রতেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলমুনিঃ।
যত্র বৈ কপিলং তীর্থং তত্র সিদ্ধেশ্বরোহরিঃ॥–বায়ুপুরাণ।

২৫. "রূপেশ্বরস্যদিগ্ ভাগে দক্ষিণে মুনিসত্তম।
বরবক্র ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বপাপ প্রণোদকঃ।"–তীর্থচিন্তামণি।
(তীর্থ চিন্তামণি একখানি প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থ, পুরাণ তন্ত্রাদি হইতে ইহাতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তীর্থমহিমা প্রকটিত করা গিয়াছে।)

২৬. বৈদিক সংবাদিনী গ্রন্থ।

২৭. "বিন্ধ্যপদে সমুদ্ভূতো বরবক্রঃ সুপুণ্যদঃ।
যতস্ত্বস্নাত্বা জলং পিত্বা নরঃ সদগতিমাপ্নুয়াৎ।
যজ্জলে মনুজব্যাঘ্র মনুজো মৃত এবহি।
তৎক্ষণাদেব স স্বর্গং যাতি সূর্য্য পথেনচ॥
প্রাচ্যদেশে মৃতোজন্তু নরকং প্রতিপদ্যতে।
ষষ্টি বর্ষ সহস্রানি যজ্জলেত্বমৃতোভবেৎ॥
যস্যেবং নদরাজস্য বক্রে বক্রেচ পুণ্যদঃ।
তীর্থঃ প্রশস্তঃ বিখ্যাতঃ বরবক্র স্ততঃ স্মৃতঃ॥" ইত্যাদি।
–বায়ুপুরাণে সুতসৌনকসম্বাদে বরবক্র মাহাত্ম্য।

২৮. তীর্থচিন্তামণি গ্রন্থ এবং বায়ুপুরাণে বরবক্র মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য।

২৯. "পুরা কৃত যুগে রাজন্ মনুনা পূজিত শিবঃ।
তত্রৈব বিরলে স্থানে মনুনাম নদী তটে॥"–প্রাচীন রাজমালাধৃত যোগিনীতন্ত্র বচনং।

বরবক্রের সহিত মনু মিলিত হইয়াছে, সে সঙ্গমস্থান বহু পুণ্যদ বলিয়া খ্যাত।[৩০] মনুনদীর পবিত্রতারিকতায় বিশ্বাস করিয়া ত্রিপুরার মহারাজ অমর মাণিক্য মনুসলিলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।[৩১] তীর্থ—চিন্তামণি গ্রন্থে শ্রীহট্টের ক্ষমা (খোয়াই) নদীর নামও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হাটকেশ্বর শিব

মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রোক্ত শিবের শতনামে লিখিত আছেঃ—

"নকুলেশঃ কালীপীঠে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ।"

শ্রীহট্টের নামতত্ব

দেবীপুরাণোক্ত পীঠ পূজায় আছে যে, "শ্রীহট্টে হট্টবাসিন্যৈ নমঃ" অর্থাৎ এই মন্ত্রে শ্রীহট্টের দেবী পূজিতা হন। এই হট্টবাসিনী এবং হাটকেশ্বর নামের সহিত শ্রীহট্ট নামের সম্বন্ধ থাকার বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই স্থানে ভটেরার তাম্রফলকের লিখিত শ্রীহট্টনাথ শিবের নাম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। শ্রীহট্টনাথ ও হাটকেশ্বর এক কি না বলা যায় না।

কালীপীঠের নকুলেশ্বরের নামের সহিত হাটকেশ্বরের নাম একত্র লিখিত হওয়ায়, কেহ মনে করিতে পারেন যে, হাটকেশ্বর গ্রীবাপীঠের ভৈরব; বস্তুত তাহা নহে, এ স্থলে শিবের শতনাম প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য,—ভৈরব নির্দ্দেশ উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং উভয় নাম একত্র লিখিত হইয়াছে মাত্র।

আদি কথা

শ্রীহট্টের রাজা গৌড় গোবিন্দ এই হাটকেশ্বর শিবের পূজা করিতেন মিনারের টিলা বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন টিলাতে হাটকেশ্বর স্থাপিত ছিলেন। হজরত শাহজালালের আক্রমণের সময় যখন প্রসিদ্ধ গ্রীবাপীঠ সংগোপন করা হয়, তখন রাজপূজিত হাটকেশ্বর জয়ন্তীয়ার জঙ্গলে নীত হন; বহুকাল যাবৎ হাটকেশ্বর জয়ন্তীয়ায় ছিলেন; তথা হইতে চূড়খাইড় পরগণার সেনগ্রামে নীত হন।[৩২]

আগমবাগীশ ও হাটকেশ্বর

সেনগ্রামে আগমবাগীশ উপাধিধারী একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার একটি কপিলা গাভী ছিল, একদা ঐ গাভী হারাইয়া যাওয়ায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে আগমবাগীশ জয়ন্তীয়ার বড় হাওরে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে তাঁহার কপিলা দাঁড়াইয়া এক শিবের উপরে দুগ্ধধারা বর্ষণ করিতেছে। আগমবাগীশ গাভী লইয়া বাড়ী আসিলেন ও এই ঘটনা সকলের নিকট বলিলেন। অনেকেই তখন শিব সন্নিধানে যাইতে ও শিবকে নিজ গ্রামে আনিয়া স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিল। আগমবাগীশেরও তাহাই অভিপ্রায় ছিল, সুতরাং পরমানন্দে গ্রামবাসীকে লইয়া

৩০. "মনুনদ্য মহারাজ বরবাকেণ সঙ্গমঃ।
তত্রস্নাত্বা নরোযাতি চন্দ্রলোকমনুত্তমং॥"—বায়ুপুরাণ।
'Special sanctity is also said to attach to the place where the manu and Kusiyara meet."
-Allen's Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) p. 89

৩১. বিশ্বকোষ-ত্রিপুরা শব্দ এবং শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র সিংহের ত্রিপুরার ইতিহাস।

৩২. "Larte lingams, or stone pillars intended to represent the phallus, are situated three miles south of Jaintiapur, at Hatakeswar on the left of the Surma in the Karimganj subdivision, where it is said to have been worshipped by Gaur Gobind, the last Raja of Sylhet."
-Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap. III p. 87.

শিবদর্শনে চলিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কমল নারায়ণ ভট্টাচার্য্য শিবকে দেখিয়াই দণ্ডবৎ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া, নিজ গ্রামে লইয়া আসিলেন ও নিকটবর্ত্তী এক উত্তম স্থানে স্থাপন করিলেন।

জয়ন্তীয়ার রাজা জয়নারায়ণ ১৭০৮ হইতে ১৭৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন বলিয়া কথিত হয়। রাজা জয়নারায়ণের রাজত্ব সময়ে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। জয়নারায়ণ যখন শিবাপহরণ বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার ক্রোধে সীমা থাকিল না; তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন এবং নিজ পুরোহিত সহ স্বয়ং সসৈন্যে শিব উদ্ধারের জন্য সেনগ্রামে আসিলেন।

রাজার আগমন সংবাদে আগমবাগীশ ভীত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজার সহিত দেখা করিলেন। রাজা কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর কল্পনা করিয়াছিলেন, তৎপরিবর্ত্তে দেখিলেন যে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভীতভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন; সুতরাং তিনি ক্রোধ ত্যাগ করিয়া, তাঁহার বিনানুমতিতে শিব আনয়নের হেতু কি, জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজার প্রশ্নে ব্রাহ্মণ, কপিলার কথা, গাভী অনুসন্ধান ও গাভীর ব্যবহার, গ্রামবাসীদের ও তাঁহার নিজের অভিপ্রায় এবং শিব আনয়ন ঘটনা যথাযথ জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিলেন যে, শিবের ইচ্ছানুসারেই এরূপ ঘটিয়াছে, ইহাতে তাঁহাদের অপরাধ নাই; এবং মহারাজ ইচ্ছা করিলে শিবকে পুনর্ব্বার লইয়া যাইতে পারেন।

মহারাজের অভিপ্রায় মত শিবকে উত্তোলন করিতে যাইয়া দেখা গেল যে, সদস্য আনীত শিব ভূলগ্ন হইয়া গিয়াছেন; ইহাতে সকলেই চমকিত হইল। ইহা ব্রাহ্মণগণের কৌশল বিবেচনায় রাজা মৃত্তিকা খননের আদেশ দিলেন, কিন্তু বহুদূর খননেও শিবের অধঃদেশ পাওয়া গেল না, ভূগর্ভে ক্রমাগত সাতখানা গৌরীপাট দেখিতে পাইয়া দর্শকগণ স্তম্ভিত ও খননকারীরা ভীত হইয়া পড়িল। কথিত আছে যে, রাজা তখন রণকুঞ্জর নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু হস্তীর বল বিফল হইল, শিব নড়িলেন না। তখন রাজার খাসিয়া সেনাপতি বন্য পশুবৎ হুঙ্কার করিয়া বীরদাপে সলম্ফে শিবের পার্শ্বে আসিয়া বিষম অস্ত্রাঘাতে শিবের একাংশ ভগ্ন করিয়া দিল, এবং কথিত আছে যে, তন্মুহুর্ত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল। তাহার সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না, সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

রাজা তখন আগমবাগীশের কথা সত্য বলিয়া বুঝিলেন; বুঝিলেন যে, শিবের স্বইচ্ছাতেই তিনি চলিয়া আসিয়াছেন। রাজা তখন শিবকে স্থানান্তর করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন ও আগমবাগীশকেই দেবত্র দিয়া শিবের পূজক নিযুক্ত করিলেন। আগমবাগীশের মহিমায় সকলেই আকৃষ্ট হইল, স্বয়ং রাজপুরোহিত তাঁহার শিষ্য হইলেন, এবং বর্ণফৌদ ও খরিল পরগণার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ আগমবাগীশ বংশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

এই ঘটনা হইতে হাটকেশ্বরের নাম ও মহিমা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হয়। জয়ন্তীয়া রাজ্যের পতনের সহিত হাটকেশ্বরের প্রভাব ম্লান হইয়া যাওয়ায় এখন এ স্থানে আর পূর্ব্ববৎ লোক সমাগম ঘটে না। বারুণী উপলক্ষে এস্থানে অদ্যাপি একটি মেলা হইয়া থাকে। চুড়খাই পোষ্ট আফিস হইতে এস্থান এক মাইল মাত্র উত্তরে অবস্থিত। শ্রীহট্ট সহর হইতে চুড়খাই পর্য্যন্তই নৌকা আসিয়া থাকে।

তুঙ্গেশ্বর মহাদেব

তুঙ্গনাথ নামক ভৈরব হইতেই তুঙ্গেশ্বর গ্রামের নাম হইয়াছে বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে। একটি শ্লোকে তুঙ্গনাথ শিবের নাম পাওয়া যায়।[৩৩] খোয়াই নদীর তীরে এই বৃহৎকায় শিব বিরাজিত। সায়েস্থাগঞ্জ রেইলওয়ে ষ্টেশন হইতে এখানে যাওয়ার সুবিধা আছে। কথিত হয় যে, এ স্থানে দেবীর নয়টি অঙ্গুরীয়ক পতিত হইয়াছিল, এবং এ জন্য তুঙ্গেশ্বর নবরত্ন উপপীঠ বলিয়া খ্যাত।

৩৩. "ক্ষমায়াঃ পূর্ব্বভাগেচ তুঙ্গনাথস্তু ভৈরবঃ।
নবরত্ন মহাপীঠ তুঙ্গনাথশ্চ রক্ষকঃ॥"–তীর্থচিন্তামনি

বাচস্পতি ও তুঙ্গনাথ প্রকাশ

প্রায় আটশত বৎসর অতীত হইল, শম্ভুনাথ বাচস্পতি রাঢ় দেশ হইতে সপরিবারে তরফে আসিয়া বাস করেন। তাহার একটি কপিলা গাভী ছিল, ঐ গাভী প্রতিরাত্র বৎসকে দুগ্ধপান করাইয়া থাকে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল যে, গাভী কোথায় চলিয়া যায়। একদা প্রহরায় থাকিয়া দেখা গেল যে, ঊষাকালে গাভী সবলে বন্ধনমুক্ত করতঃ অল্পদূরবর্ত্তী এক মৃত্তিকা স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া দুগ্ধধারা বর্ষণ করিতেছে। ইহার কারণ কি, কিছুই বুঝা গেল না। ভয়ে কেহ সেস্থান খনন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সেই রাত্রে বাচস্পতি স্বপ্নে তথায় নবরত্ন পীঠের অবস্থান জানিতে পারিলেন। পীঠ স্থানান্তরিত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে, তৎপ্রতি আদেশ হয়। তদনুসারে পরদিন তিনি পুত্রগণ ও প্রতিবাসীগণ লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হন ও সেই স্থান খনন করায় ভূনিম্নে একখানা প্রস্তর দৃষ্ট হইল, ইহাতে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি প্রমাণ আটটি ও মধ্যস্থলে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ একটি, এই নয়টি গর্ত্ত দৃষ্ট হইল এবং মধ্যস্থ গর্ত্তে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত এক শিবলিঙ্গ পাওয়া গেল। স্বয়ং বাচস্পতি শিব হইলেন, পুত্র ভৃত্যগণ গর্ত্তযুক্ত প্রস্তর বহন করিয়া চলিল। বাচস্পতি সেই শিব ও প্রস্তরপীঠ তথা হইতে বহন করিয়া আনিয়া নিজ বাটীর সন্নিকটে স্থাপন করেন। তুঙ্গনাথ বর্দ্ধনশীল অনাদি লিঙ্গ, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে।

কালাপাহাড়ের অত্যাচার

বাচস্পতির সপ্তম পুরুষে যদুমাণিক্য ব্রহ্মচারীর জন্ম হয়। ইঁহার সময়ে দেবদ্বেষী যবনের মুদগরাঘের তুঙ্গনাথের দক্ষিণ পার্শ্ব ভগ্ন হইয়া যায়। এই যবন কালাপাহাড় বলিয়া উক্ত আছে। এই সময়ে ঊনকোটি তীর্থেরও দুরবস্থা ঘটে। শিব যবনসৃষ্ট ও বিভগ্ন হইলে ব্রহ্মচারী স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন যে যবনস্পৃষ্ট বলিয়া নিয়মিত পূজায় যেন অবহেলা না হয়; তাঁহার ক্ষোভ করিবার কারণ নাই, শিবের ভগ্নাংশ পূর্ণ হইয়া যাইবে। এইরূপ স্বপ্নাদেশ হওয়ায় শিবের পূজা বন্ধ হয় নাই এবং শিব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায় ভগ্ন স্থানও পূর্ণ হইয়া আসিতেছে।

মনুষ্যদেহে যেমন শুষ্ক ব্রণ হয়, শিবের দক্ষিণ পার্শ্বে তদ্রূপ কয়েকটি শ্বেতদানা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দানা গুলি কিছুদিন পরে মিশিয়া গিয়া ভগ্নস্থান পূর্ণ হইতে থাকে, তৎপর আবার নূতন দানা দেখা দেয়। তদ্ব্যতীত শিবও ধীরে ধীরে ক্রমশঃ প্রবর্দ্ধিত হইতেছেন। ধীরতার জন্য প্রবর্দ্ধন ক্রিয়া চক্ষে ধরা যায় না। যে শিব প্রথমে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ছিলেন, এই আটশত বর্ষে তিনি প্রায় তিনহাত উচ্চ ও পাঁচ হাত পরিধি বিশিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই শিবও মন্দিরে থাকেন না; ব্রহ্মচারী মন্দির প্রস্তুতের উদ্যোগ করিলে "আমি মন্দিরে থাকিতে ভালবাসি না" এইরূপ স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বাচস্পতি বংশে ষড়বিংশ পুরুষ চলিতেছে।[৩৪]

ব্রহ্মকুণ্ড ও তপ্তকুণ্ড

জনপ্রবাদ

ব্রহ্মকুণ্ড পার্ব্বত্য ত্রিপুরার অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও ইহা শ্রীহট্টের লোকেরই তীর্থ। ইহা কাশিমনগর পরগণার সীমান্ত রেখার অতি নিকটে অবস্থিত। আসাম বেঙ্গল রেইলওয়ের মনতলা

৩৪. শিবের ভূপ্রোথিত নিম্নভাগের চতুর্দ্দিক পদ্মের পাপড়ীর ন্যায়। ২৫/৩০ বৎসর হইল, পূজার সুবিধার জন্য একটি বেদী প্রস্তুত করা হয়। সেই সময় তিন হাত পর্য্যন্ত খনন করা হইয়াছিল। ঐ সময় একটি পাপড়ীতে খনিত্রের আঘাত লাগায় প্রথমে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়া, ক্ষণপরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। এতদৃষ্টে ভয়বশতঃ তৎক্ষণাৎ কাজ সমাধা করা হয়। তুঙ্গনাথের উচ্চতা ২ হাত ১৪ অঙ্গুলি, পরিধি ৫ হাত ১৬ অঙ্গুলি।

ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া এ স্থানে যাওয়া যায়। ব্রহ্মকুণ্ড একটি পার্ব্বত্য উৎস। ত্রেতাযুগে পরশুরাম মাতৃবধান্তর কুঠার পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে (তীর্থ) ভ্রমণ করতঃ স্থানে স্থানে আঘাত করিয়া কুঠার ত্যাগের চেষ্টা করেন। আসাম সাদিয়ার পূর্ব্বে ব্রহ্মকুণ্ডে তাঁহার হস্তস্থিত কুঠার পরিত্যক্ত হয়। তিনি এই পথে আসাম গমন কালীন, এই স্থানে আসিয়া মৃত্তিকায় কুঠারাঘাত করিয়া ছিলেন, এবং তাহাতেই এই কুণ্ডের উৎপত্তি হয় বলিয়া কথিত আছে।

এই কুণ্ডের আকৃতি ক্ষেপনী বা প্যারাবোলার ক্ষেত্রের ন্যায়। ক্ষেপনীর বক্ররেখা কুণ্ডের পশ্চিমোত্তর কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দক্ষিণ কোণে শেষ হইয়াছে। কুণ্ডের পশ্চিম সীমা সরলরেখা বিশিষ্ট, এই সরল রেখা ভেদ করিয়া এক অপ্রশস্ত খাত অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। এবং পূর্ব্বতীর দিয়া এক অপ্রশস্ত-সঙ্কীর্ণকায় জলপ্রণালী কল কল রবে ব্রহ্মকুণ্ডে আত্মসমর্পণ করিতেছে। ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ তীর পরিষ্কার এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক জঙ্গলাবৃত। ইহার তীরভূমি আন্দাজ ২০ ফিট উচ্চ এবং জলভাগের পরিমাণ অন্যূন ২৫৩০ বর্গ ফিট হইবে। চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে লোকে এই কুণ্ডে স্নান করে। স্নানান্তে যাত্রীগণ কৃষ্ণপুরের মন্দিরে আগমন করে।[৩৫]

ব্রহ্মকুণ্ডে যাত্রীগণ কবুতর, ছাগ ও ফলমূলাদি অর্পণ করিয়া থাকে। তীরে কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর লোক দণ্ডায়মান থাকে, তাহারাই এ সমস্ত উঠাইয়া লয়। এই সময় এখানে এক বাজার বসে, তাহাতে অনেক পার্ব্বত্য বস্ত্র ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

তপ্তকুণ্ড

জয়ন্তীয়ার পাঁচভাগ পরগণাস্থিত তপ্তকুণ্ডের বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। মধুকৃষ্ণাত্রয়োদশী যোগে এ স্থানে অনেক লোক তর্পণাদি করিতে সমাগত হয়। এই স্থানের বিশেষত্ব এই যে, এই কুণ্ডের ভূমি অতি উষ্ণ,—পদ সংলগ্ন করা যায় না, কিন্তু জল শীতল। সম্ভবতঃ কুণ্ডতলে ভূগর্ভে কোনরূপ দাহ্য পদার্থ থাকায় এইরূপ হইয়াছে।[৩৬] বর্ষাকালে কুণ্ডটি ১০/১২ হাত জলের নীচে পড়িয়া থাকে।

মাধবতীর্থ ও শিবলিঙ্গ তীর্থ

পূর্ব্বে মাধব প্রপাতের উল্লেখ করা গিয়াছে। এই প্রপাত একটি ক্ষুদ্র তীর্থ রূপে গণ্য হইয়াছে; মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী যোগে এখানে ৮/৯ সহস্র লোক স্নান তর্পণ করিয়া থাকে। মাধব পাথারিয়া পরগণার অন্তর্গত, বড়লিখা ষ্টেশন হইতে তিন মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

ছড়ার বিবরণ

আদম আইল পাহাড়ের মাধবছড়া পশ্চিমমুখে প্রবাহিত হইয়া, হঠাৎ উচ্চ পাহাড় হইতে নীচে পড়িয়া যাওয়ায় নীচে এক বৃহৎ কুণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। যদি কেহ মাধবছড়ার স্রোতাভিমুখে

---

৩৫. "In the south-east corner of the Habiganj subdivision, there is a temple at Krisnapur, at which pilgrims worship after they have bathed in the sacred pool of Brahmakunda, which is situated just across the boundary of Hill Tippera."
-Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap. III p. 89.

৩৬. "Another sacred pool is known as Tamptakunda and is situated in pargana Panchbhag in Jaintia. This pool is said to become quite warm on the occasion of the Baruni and it is possible that the water has in reality some mineral properties."
-Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap. III p. 89

পূর্ব্বাঞ্চল হইতে গমন করে, তবে ছড়ার বক্ষে মধ্যে মধ্যে বৃহৎকায় প্রস্তরখণ্ড সমূহ দেখিতে পাইবে। মাধবকুণ্ড হইতে প্রায় এক মাইল উপরে এইরূপ এক সুবৃহৎ পাষাণ খণ্ড আছে। বৃহৎ পাষাণটি ছড়ার সমস্ত প্রস্থ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। জল এক পার্শ্ব দিয়া ভয়ে ভয়েই যেন বাঁকিয়া চলিয়া যাইতেছে ও একেবারে সজোরে সেই প্রস্তরের সম্মুখে আসিয়া এক কুণ্ড প্রস্তুত করিয়াছে, ইহার পরিসর বৃহৎ না হইলেও অতি গভীর,—সুচিক্কণ নীলসলিলে টলমল করিতেছে। এইরূপ ছয়টি শিলা ও তন্নিম্নে ছয়টি কুণ্ড সেই স্রোত বক্ষে দৃষ্ট হয়। বলা আবশ্যক যে এই ছয়টি কুণ্ডই পাহাড়ের উপরে।

এই ছড়ায় হাঁটুজলের অনেক কম জল থাকে, এবং দুদিকে উচ্চ পাহাড় থাকায় সূর্য্যরশ্মি দৃষ্ট হয় না। এইরূপ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ছড়ার একটি "বক্র" (পাক) ঘুরিলেই ষষ্ঠ কুণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেখানে হইতে সূর্য্য রশ্মি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। এই স্থানে আসিলে একটি হুঁ হুঁ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, মধুচক্র আঘাত দিলে উড্ডীয়মান মক্ষিকার ঝাঁক হইতে যেরূপ শব্দ হয়, ঐরূপ শব্দ শুনা যায়। তৎসম্মুখেই অভীষ্ট সপ্তম কুণ্ড, তথায়ই যাত্রীগণ স্নানাদি করিয়া থাকে।

প্রপাতের উৎপত্তি

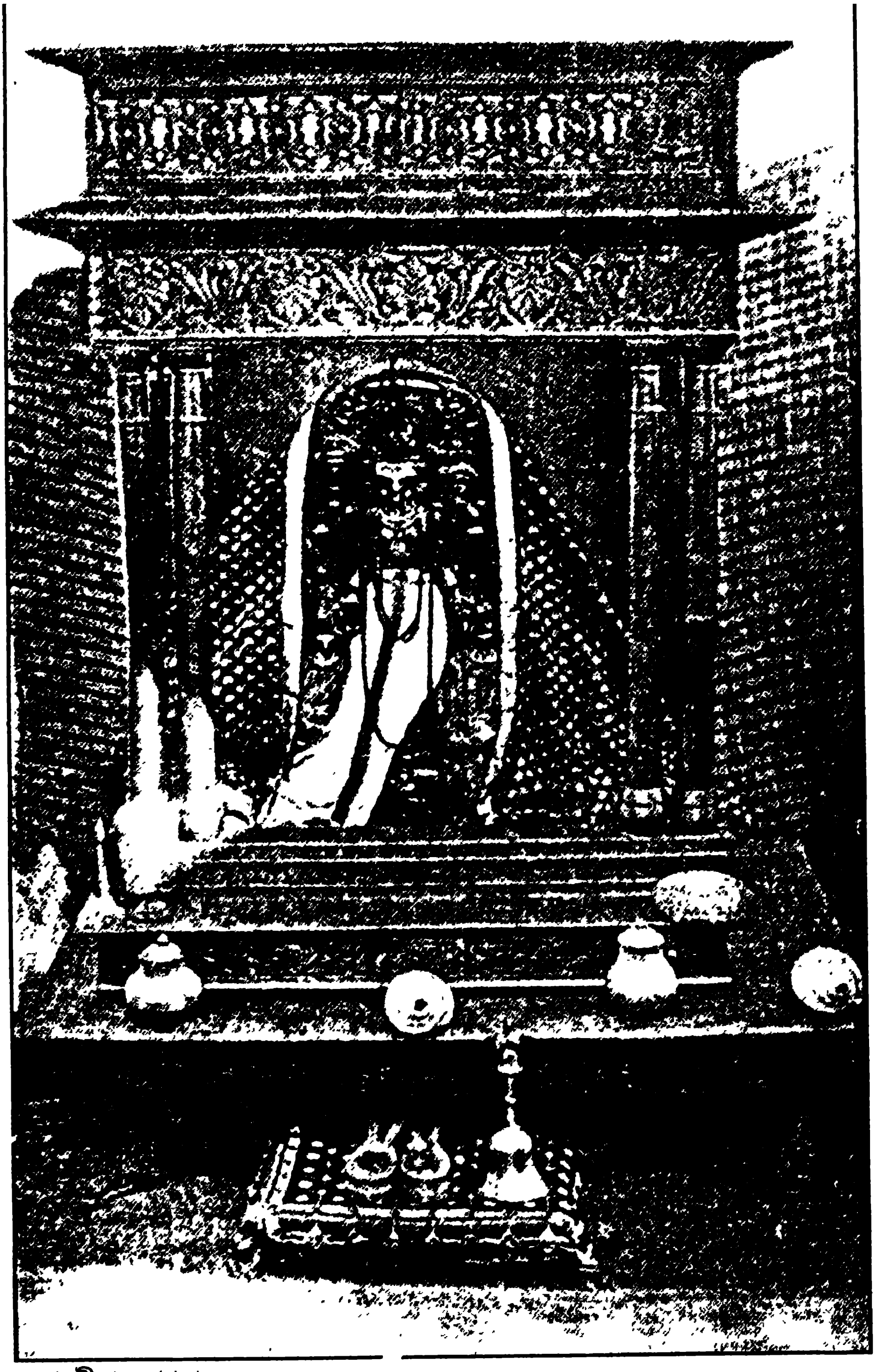
সেই পূর্ব্বোক্ত স্রোতটি (ছড়া) শৈল গাত্রে প্রস্তরের উপর দিয়া চলিয়া দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া, হঠাৎ উচ্চ পর্ব্বত হইতে একবারে নিম্নে পড়িয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গা-বাহিয়া পড়ে নাই। পাহাড়টি যেন সম্মুখে নত হইয়া "ঝুকিয়া" রহিয়াছে। তাহার উপর হইতে জলরাশি শূন্য দিয়া সলম্ফে পড়িতেছে। যেখানে জলরাশি পতিত হইতেছে, তাহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ পাহাড় শ্রেণী, মধ্যদেশ একটি গুহা বিশেষ। দৈর্ঘ্যে পোয়া মাইলের অধিক হইবে না। ইহার মধ্যে কতকটা স্থান ব্যাপী এক বৃহৎ কুণ্ড-জল ভাগ প্রায় ৫০০০ বর্গ ফিট হইবে। ইহারই নাম মাধবকুণ্ড। ইহার মধ্যদেশ অতি গভীর। সাহসী লোক কেহ কেহ সাঁতার কাটিয়া ধারাতলে গমন করে; কিন্তু শীতল জলে সাঁতার দিয়া কুণ্ড পার হইতে গেলে ক্লান্ত হইতে হয়। ক্ষুদ্র ধারাতলে, শূন্যে—পর্ব্বতগাত্র হইতে বহির্গত হইয়া একটি প্রস্তর আছে। "ছাতিজলে" সেই প্রস্তরের উপর দাঁড়ান যায়। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র ধারাটির জলপতনবেগই মস্তক অধিকক্ষণ ধারণ করিতে পারেন না; বৃহৎ ধারাতলে যাওয়া দুঃসাহসিকতা ও অসম্ভব।

কাব্

ইহার এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র গহ্বর রহিয়াছে, সেই গহ্বরটিকে সাধারণ লোকে "কাব্" বলে। (কেব্ Cave বলিলেই শুদ্ধ হইত।) পাহাড়ের একদিক যেন মানুষে বহু যত্নে খুঁদিয়া রাখিয়াছে,— যেন পাথরের একটি একচালা ঘর। বৃষ্টির সময় প্রায় দুই শত লোক ইহার নীচে প্রবেশ করিলেও সমাবেশ হইতে পারে। যাত্রী গণ স্নানাদি করিয়া, পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া, পশ্চিম দিকে গৌরনগরে, মাধববাজার নামক স্থানে বারুণী মেলায় আসিয়া জলযোগ করে। মাধবমেলা দিন মাত্র স্থায়ী। এস্থানে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হয় ও নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। মাধব যাত্রীগণের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অধিক দৃষ্ট হয়।

শিবলিঙ্গ তীর্থ

শিবলিঙ্গ তীর্থ মাধব বা অন্য তীর্থের ন্যায় খ্যাতনামা না হইলেও, স্থানীয় লোকে পবিত্র বলিয়া ভক্তি করে ও সোমবার নন্দাদি তিথিতে, বিশেষতঃ চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ যোগে তথায় গমন



যুগলটীলার আখড়া

করিয়া থাকে। ইহা মনুষ্যকৃত নহে। প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে, ইহা একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। ইহাও আদম আইল পাহাড়ে অবস্থিত; বড়লিখা ষ্টেশন হইতে ইহা অধিক দূর নহে। ছোট লিখার ভদ্রপল্লী হইতে লোকেল বোর্ড সড়কে দুই মাইল গমন করিয়া ক্ষীণকায় "শিবছড়া" প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার গর্ভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণ খণ্ডময়; অল্প পরিমিত জল, সেই পাষাণ খণ্ড সমূহের উপর দিয়া ঝির ঝির করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। প্রস্তরখণ্ড গুলি অতি পিচ্ছিল। অতি সতর্কে এই দুর্গম পথে প্রায় দেড় মাইল গমন করিলে, পর্ব্বত গাত্রস্থিত প্রস্তর গুলির অভিনব অবস্থান দৃষ্টে মনে স্বভাবতঃই ভাবান্তর উপস্থিত হয়। আরও অর্দ্ধ মাইল অগ্রসর হইলেই অভীষ্ট শিবলিঙ্গ নামক স্থানে পৌঁছা যায়। এখানে টীলার উপর ক্ষুদ্র এক পাষাণ আছেন, কিন্তু শিবলিঙ্গের কোনরূপ নিত্য পূর্জা অর্চ্চনা হয় না।

এ স্থানের প্রধান দৃশ্য "শিবের জটা"। প্রস্তরময় পর্ব্বত গাত্র হইতে প্রকৃত জটার ন্যায় ৩/৪টি জটা বাহির হইয়াছে, এবং ঐ নিরেট প্রস্তরময় জটা হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া জল বহির্গত হইতেছে। এ স্থানে উপস্থিত হইয়া বম্ বম্ শব্দ করতঃ লোকে হাততালি দেয় এবং তাহাতে অধিক পরিমাণে জল বাহির হয়। যাত্রিকেরা সেই জল ভক্তিভরে শিরে ধারণ করে। এই জটার নিম্নে একটি গর্ত্ত আছে, লোকে বলে যে, বহুপূর্ব্বে তথায় জনৈক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। বর্ত্তমানে প্রস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় গর্ত্তের মুখটা সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

এই স্থানে দুইটা ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে, একটা পাহাড়ের উপরে, অপরটি নীচে। উর্দ্ধ ও অধঃকুণ্ডের ব্যবধান ১২/১৩ হাত মাত্র। উর্দ্ধ কুণ্ড হইতে অধঃকুণ্ডে ঝির ঝির শব্দে জল পড়িতেছে। (সুতরাং বলিতে হইবে যে, ইহাও প্রপাতের এক ক্ষুদ্রতম নমুনা মাত্র।) কুণ্ডদ্বয় অপ্রশস্ত, কোনরূপে ১০/১২ জন লোক একত্র স্নান তর্পণ করিতে পারে। স্থানান্তর যাত্রীরা মহাদেবের পূজা দেয়, কেহ কেহ বা কীর্ত্তনাদিও করে। এখানকার জল লোকে সযত্নে গৃহে লইয়া যায়। নিবিড় পাহাড়ের ভিতরে বলিয়া এস্থানে সূর্য্যের আলো স্পষ্টরূপে পতিত হয় না।

বাসুদেবের বাড়ী

পঞ্চখণ্ডের বাসুদেব

হিন্দু রাজত্বের সময় পঞ্চখণ্ডের সুপাতলা গ্রামে জয়ন্তীয়ারাজের দুর্গাদলই নামক জনৈক কর্ম্মচারী বাস করিতেন। তাঁহার বাসবাটীর সম্মুখে একটা প্রাচীন পুষ্করিণী ছিল, তাহাতে জল থাকিত না; দুর্গাদলই এই পুষ্করিণী খনন করাইতে আরম্ভ করেন। কিছুদূর খনন করা হইলে মাটির নীচে বাসুদেবের প্রস্তরময় মূর্ত্তি সহিত একখানা দুর্গামূর্ত্তি পাওয়া গেল। কথিত আছে, দুর্গাদলই এই দেবী মূর্ত্তিকে জয়ন্তীয়ায় পাঠাইয়া দেন; এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে রাজাদের আস্থা নাই বলিয়া বাসুদেব মূর্ত্তি, বিজয়কৃষ্ণ পাঠক নামক তত্রত্য এক ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণকে দেন; তখন হইতেই বাসুদেবের পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাসুদেবের নামে ঐ স্থানকে বাসুদেবপুর বলা হয়। দুর্গাদলইর পুষ্করিণী এখনও জীর্ণাবস্থায় আছে।

কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে অতি সুন্দর বাসুদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত,—দুই দিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি। একখণ্ড প্রস্তরে মূর্ত্তিত্রয় উৎকীর্ণ। বাসুদেবের উল্টা রথ বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রায় ৬/৭ সহস্র লোক ঐ সময় সমবেত হয়। বৈরাগীবাজার ষ্টিমার ষ্টেশন হইতে এস্থান প্রায় ৫ মাইল এবং রেইলওয়ের লাতু ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

জগন্নাথপুরের বাসুদেব

সুনামগঞ্জ সবডিভিশনের অন্তর্গত জগন্নাথপুরের বাসুদেব মূর্ত্তি ও পঞ্চখণ্ডের বাসুদেব মূর্ত্তি ঠিক একরূপ। জগন্নাথপুরের বাসুদেব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জগন্নাথ বিপ্র কর্ত্তৃক পরিপূজিত হন. জগন্নাথের নামানুসারে জগন্নাথপুরের নাম হইয়াছে। এই বাসুদেব মূর্ত্তির বিবরণ ২য় ভাগ ১ম খণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে পাঠক দেখিতে পাইবেন। অনেক দূরের যাত্রীকগণ গিয়া ও মূর্ত্তি দর্শন করে। সরকারী ইতিহাস গেজেটিয়ারে এই মূর্ত্তির স্থাপনকাল সম্রাট শাহজাহানের সময়ে বলিয়া লেখা হইয়াছে, কিন্তু এ কথার কোন প্রামাণ্য ভিত্তি নাই।

আখড়া

বিথঙ্গলের আখড়া বা রামকৃষ্ণের আখড়া

বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদের স্থাপিত বিষ্ণু বা তৎসংসৃষ্ট দেবতার স্থানই সাধারণতঃ আখড়া নামে খ্যাত। শ্রীহট্ট জিলার সকল আখড়ার মধ্যে বিথঙ্গলের আখড়াই বৃহৎ। কিন্তু তথায় কোনরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত নাই। জগন্মোহিণী সম্প্রদায়ের উল্লেখ পূর্ব্ব অধ্যায়ে করা গিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের লোক গৃহত্যাগী ও বৈরাগী বেশধারী। ইহারা তুলসীপত্র বা গোময়ের ব্যবহার করে না, কোন মূর্ত্তি পূজা করেন না,[৩৭] এবং গুরুকেই শ্রেষ্ঠ উপাস্য বলিয়া জ্ঞান করে। এই আখড়া রামকৃষ্ণ গোসাঞি কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়; এই স্থানেই তাহার সমাধি আছে শিষ্যবর্গের "বার্ষিকী" প্রভৃতি হইতেই এই আখড়ার আয় প্রায় ৪০,০০০ টাকা হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ভূসম্পত্তির আয়ও অনেক আছে।[৩৮] এই সম্প্রদায় বৈষ্ণবসমাজ বহির্ভূত বলিয়াই বৃন্দাবনে মীমাংসিত হইয়াছে। জগন্মোহন গোস্বামী ও রামকৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তে পশ্চাৎ এই সম্প্রদায় ও আখড়া সম্বন্ধে অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য বিবৃত হইবে।

যুগলটিলার আখড়া

শ্রীহট্ট সহরের উপকণ্ঠে যুগলটিলা নামে আর একটি প্রসিদ্ধ আখড়া আছে। প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুর যুগল কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। ঠাকুর যুগল একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এই আখড়ার ভূসম্পত্তি আছে; তাহার আয় প্রায় পনর শত টাকা হইবে এবং শিষ্য সংখ্যাও প্রায়

---

৩৭. এখন কিন্তু ইহারা তুলসী গোময়াদির সম্মাননা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

৩৮. "At Bithangl, near Mymensingh boundary there is an Akhra under the management of the Jaganmohini sect. At one time there was neither idol nor tulsi objection was, however, taken at Brindaban at this disregard of what the ordinary Hinduholds sacted and a more orthbodox ritual is now observed. Ramkrishna, the founder of this place, is held in the greatest veneration, and offerings are made at his shrine by men who desire off-spring or the increase of their herds. This section of the Vaishnavites at one time tried to worship an abstract God without shape or farm, but this proved to be beyound the spiritual capacities of their deciples, and they sing the praises of Hari, Krishna Ram and even Chaitanya. Bithangal has complectely eclipsed the akhra at Masulia near Habiganj, which contains the tomb of Jaganmohan, the founder of the sect. It is the wealthiest and most pros-perous akhra in Sylhet, and is said to receive as much Rs. 40,000 per annum in the form of offerings from its deciples The buildings are of considerable size, and of masonry, and several of the rooms are paved with marble."

-Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap III p. 88.

আটশতের কম নহে।[৩৯] ঝুলন পর্ব্বে যুগলটিলায় অনেক শিষ্যের সমাগম হয় এবং তাহাতে অনেক জাঁকজমক হইয়া থাকে।

এতদ্বতীত ইন্দেশ্বর পরগণার পাণিশালির আখড়াও বিশেষ বিখ্যাত, এই আখড়াতেও ভূসম্পত্তি আছে এবং ঝুলনের সময় অনেক শিষ্য সমবেত হওয়ায় বিশেষ ঘটা হয়। এই আখড়া গুলি ব্যতীত শ্রীহট্টে আরও বহুতর আখড়া আছে, তাহা তত খ্যাতনামা নহে; এ-পরিশিষ্টে আখড়া সমূহের বিষয় উল্লেখিত হইবে।

মোসলমান তীর্থ

মোসলমান তীর্থ মধ্যে শ্রীহট্ট সহরের দরগামহল্লাস্থিত প্রসিদ্ধ শাহজলালের দরগাই উল্লেখযোগ্য। এই বিখ্যাত দরগার বিবরণে দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহজলাল এই দরগার প্রতিষ্ঠা করেন। শাহজলাল পীর মোসলমানগণের অতীব মান্য। শাহজলাল নামে চারিজন প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীহট্টের শাহজলাল অন্যতম ও সকলের মধ্যে প্রধান। ইঁহার সাধনা স্থান ও কবর শ্রীহট্টে অবস্থিত বলিয়া ইহা মোসলমান তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

সুন্দরবনে অনেক হিন্দু মোসলমান মধু, মোম প্রভৃতি আহরণ করিতে যায়। তাহারা তত্রত্য যে সকল পীর বা দেবতার কথা বলিয়া থাকে, তন্মধ্যে 'শাহজলাল পীর' একজন; ইনি আমাদের শ্রীহট্টের শাহজলাল হইতে ভিন্ন নহেন; শ্রীহট্টের পার্ব্বত্য অংশেও এইরূপ পীরের দোহাই দেওয়া হয়। সুতরাং পীর শাহজলালের প্রভাব সুন্দরবন পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট মোহাম্মদ শাহের পুত্র ফিরোজশাহ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে হৈ দরগা দর্শনের জন্য আগমন করেন। সুদূর হায়দরাবাদ প্রদেশ হইতে নিজাম বাহাদুরের মন্ত্রী এই দরগা দর্শনার্থী হইয়া শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন; ইহাতেই দরগার মাহাত্ম্য ও প্রখ্যাতির বিষয় বুঝা যাইতে পারে। ফলতঃ ভারতবর্ষে মোসলমান তীর্থের মধ্যে এই দরগার সমকক্ষ স্থান আর আছে কি না সন্দেহ।

অন্যান্য স্থানের দরগা ও মোকাম

শাহজালালের দরগা ব্যতীত শ্রীহট্টে আরও অনেকটি দরগা ও মোকাম আছে; তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করা গেল।

১. শাহ আরপীনের মোকাম বা বড় দরগা। ইহা লাউড়ে অবস্থিত। শাহ আরপীন শাহজলালের এক প্রধান অনুসঙ্গী ছিলেন, তিনিই এই স্থানে বাস করিতেন।

২. ফতেপুরে ফতেগাজীর মোকাম। ইনিও শাহজলালের অনুসঙ্গী ছিলেন, ইহার মোকামে মোগল সম্রাট প্রদত্ত বহু পীরোত্তর ভূমি আছে এবং অগ্রহায়ণ মাসের শেষদিনে তথায় এক মেলা হয়। এ স্থানে আহাম্মদ গাজী, মসউদ গাজী ও ফতে গাজীর সহিত তিনি একত্র বাস করিতেন।[৪০]

---

৩৯. "The Akhra of Jugaltila is said to have been founded some 200 years ago by one Jugalkisore mahunta, who is supposed to have been an Incarnation of the deity It is endowed with landed property which brings in from 1000 to 1500 Rupees a year, and has some seven or eight hundred deciples." etc.
-Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap. III p. 88.

৪০. "Near the Shajibazar Railway Station, in the South west corner of the district, is the darga of shah Fateh Ghazi, one of the companions of Shah Jalal. This darga is maintained from the rents received from a village which was granted to it by Mughal government, and has since been exempted from payment of land revenue."
Assam District Gazetteers vol II (Sylhet) chap. III p. 82.

তদ্ব্যতীত গিয়াস নগরে গিয়াসউদ্দীন সাহেবের দরগা, বদরপুরে শাহবদরের মোকাম, চাপঘাটে গয়ভীর মোকাম, লস্করপুরের দরগা প্রভৃতি বিখ্যাত। দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকাধ্যায়ে বহুতর মোকাম ও দরগার বিষয় উল্লেখিত হইবে।

মোকাম শব্দের অর্থ বাসস্থান। প্রতাপগড় পরগণায় জঙ্গলের ভিতর ছাগল মোহার মোকাম বিশেষ বিখ্যাত। ইহা বাদশাহর মোকাম বলিয়াও কথিত হয়। পাহাড়ের লাকড়ী ব্যবসায়ী হিন্দু মোসলমান সকলেই প্রথমে এই মোকামে গিয়া বাদশাহকে প্রণাম করিতে হয়। ব্যবসায়ীরা মোকামে যে সকল দ্রব্যাদি উপহার দেয়, কখন কখন ব্যাঘ্র আসিয়া সেই দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া যায়। করিমগঞ্জ অঞ্চলের কোন কোন স্থানে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ ও সহিজা বাদশাহর দোহাই দিয়া থাকে। এই সহিজা বাদশাহকে বনের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলিয়াই লোকে মনে করে। সরকারী ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে, দিল্লীর কোন বাদশাহ প্রতাপগড়ে নির্জ্জন জঙ্গলে মোকাম প্রস্তুত ক্রমে বাস করিয়াছিলেন।[৪১] একথা সত্যমূলক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ লোকে সহিজা বাদশাহর নামই উল্লেখ করিয়া থাকে, দিল্লীর কোন শাহজাদা বা বাদশাহের উল্লেখ করে না।

৪১. "In the Pratapgarh pargana, to the south of Karimganj, there are several Mukams which are said to have been founded by one of the Badshas of Delhi, who turned fakir and settled in that lonely spot. Timber traders, whether Muhammadan or Hindu, still worship at this places, and it is said that tigers in former days used to visit these shrines on Thursday nights, and eat any food left far them without molesting the persons stopping in the mukam."
-Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap III p 83.

দশম অধ্যায়

পরগণাসমূহ

প্রাচীনকালে শ্রীহট্ট লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তীয়া এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে এই ত্রিভাগের সীমাদি কথিত হইবে।

মোসলমান শাসন কালেও শ্রীহট্টের সীমা বর্ত্তমান কালাপেক্ষা বহুদূরে ছিল। তখন ত্রিপুরার সরাইল ও ময়মনসিংহের জোয়ানশাহী প্রভৃতি সমস্তই শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্রাট আকবরের সময়ে শ্রীহট্ট জিলা আটভাগে বিভক্ত ছিল, ঐ এক এক ভাগ মহল নামে কথিত হইত। যথাঃ—

মহলের নাম	রাজস্ব (দাম)	মন্তব্য
প্রতাপগড় (ও পঞ্চখণ্ড)	৩৭০,০০০	পঞ্চখণ্ড একটি পৃথক পরগণা, ইহা পরে প্রতাপগড় হইতে খারিজ হয়; পূর্ব্বে পঞ্চখণ্ড পর্য্যন্ত প্রতাপগড়ের সীমা ছিল বলা যাইতে পারে।
বাণিয়াচঙ্গ	১,৬৭২,০৮০	বর্ত্তমানে বাণিয়াচঙ্গ বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে, ঐ নামে এখন তিনটি পরগণা পাওয়া যায়।
বাজুয়া বা বাহুয়া সহর	৮০৪,০৮০	বর্ত্তমানে ইহা একটি ক্ষুদ্র মহালে পরিণত হইয়াছে।
জয়ন্তীয়া	২৭,২০০	রাজস্ব হিসাবে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ছিল বিধায় বোধ হয় যে জয়ন্তীয়ার অংশ বিশেষ মোগল সম্রাটের করদ রূপে গণ্য হইয়া থাকিবে।
হাবিলি সিলেট	২,২৯০,৭১৭	বর্ত্তমান শ্রীহট্ট সহরাদি লইয়া ইহা ছিল।
সতর খণ্ডল (সরাইল)	৩৯০,৪৭২	সতর খণ্ডল সরাইলের অন্তর্গত হইলেও এক্ষণে একটি খারিজা মহালে পরিণত হইয়াছে। সম্রাট আকবরের পূর্ব্ব হইতে সরাইল শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ ত্রিপুরার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, সরাইলের অধিকারী "দেওয়ানগণ তাঁহাদের রাজস্ব শ্রীহট্টের আমিলের নিকট প্রেরণ করিতেন। সম্রাট আরঙ্গজেবের শাসন কালে সরাইল—সতরখণ্ডল শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হইয়া ঢাকা-নেয়ামতের নেজামত সেরেস্তাভুক্ত হয়।"
লাউড়	২৪৬,২০২	বর্ত্তমানে একটা পরগণা মাত্র।
হবিনগর	১০১,৮৫৭	বর্ত্তমানে একটা পরগণা মাত্র।

দাম আধুনিক ডবল পয়সার ন্যায় এক প্রকার তাম্রমুদ্রা, আট দামড়ীতে এক দাম এবং চল্লিশটা দামে এক শেরশাহী টাকা হইত। আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী রাজা তোডরমল্ল কর্তৃক "ওয়াসিল তোমার জমা" নামে যে রাজস্ব হিসাব প্রস্তুত হয়, তাহাতেই উক্ত হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীহট্টের রাজস্বমোট ১৬৭,০৪০ টাকা ধার্য্য হয়।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ "জমা কামালে তোমারি" নামে যে রাজস্বের পাকা হিসাব প্রস্তুত করেন, তাহাতে রাজস্ব বর্দ্ধিত হইয়া ৫৩১,৪৫৫ টাকা লিখিত হইয়াছে এবং শ্রীহট্ট জিলা ১৪৮টি মহলে বিভক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এবং মহল গুলিই ভিন্ন ভিন্ন পরগণায় আখ্যাত হইয়াছে।

এই সংখ্যা পরে আরও বর্দ্ধিত হয়; তরফ, লংলা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পরগণা হইতে অনেক পরগণা পরে খারিজ হইয়া বাহির হইয়াছে। এক তরফই গদাহাসন নগর প্রভৃতি দশটি ভিন্ন ভিন্ন পরগণায় বিভক্ত হয়। আসামের ষ্টেটিস্‌টিকেল একাণ্ট্‌স্ পুস্তকে (জয়ন্তীয়া ব্যতীত) শ্রীহট্টে ১৬৮টি পরগণার নাম লিখিত হইয়াছে। জয়ন্তীয়ার অষ্টাদশ সংখ্যা এতৎসহ যোগ করিলে শ্রীহট্টের পরগণা সংখ্যা ১৮৬টি হয়। হণ্টার সাহেব ১৮৬টি পরগণারই উল্লেখ করিয়াছেন। (হাওলি পানিশালি, বেতাল, কিসমত বেতাল, ও লক্ষ্মণ ছিরি গং এই) পাঁচটা পরগণার নাম তৎকর্তৃক উল্লেখিত হয় নাই। তৎসহ ইহা যোগ করিলে শ্রীহট্টের পরগণা সংখ্যা বর্ত্তমানে মোট ১৯১টি।

হণ্টার সাহেব (১৮৫৯-১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের থাকবস্তের জরিপানুযায়ী) একর উল্লেখে প্রতি পরগণায় যে ভূপরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কালেক্টরীর কাগজে উল্লেখিত (১৮২০-১৮২৯ খৃষ্টাব্দের হালাবাদী জরিপানুযায়ী) হাল হিসাবের সহিত তাহার অনৈক্য লক্ষিত হয়, নিম্নে সবডিভিসনানুসারে একর ও হাল পরিমাণের সহিত পরগণা গুলির নাম লিখিত হইল। হালাবাদি কাগজের উল্লেখিত মতে পরগণা গুলির গ্রাম সংখ্যা এবং রাজস্বের পরিমাণও লিখা গেল।

কালেক্টরী বিভাগ—

পূর্ব্বে রাজস্ব সংগ্রহের এক একটি কেন্দ্র স্থান ছিল, তাহা জিলা নামে খ্যাত. উত্তর শ্রীহট্ট সবডিভিশনে পারকুল, তাজপুর ও জয়ন্তীয়াপুর এই তিনটি জিলা বা কালেক্টরী বিভাগ। করিমগঞ্জের কালেক্টরী বিভাগ—লাতু। দক্ষিণ শ্রীহট্টের—নয়াখালি, রাজনগর ও হিঙ্গাজিয়া।

হবিগঞ্জের কালেক্টরী বিভাগ—নবিগঞ্জ, লস্করপুর, শঙ্করপাশা। এবং সুনামগঞ্জের কালেক্টরী বিভাগ—বসুলগঞ্জ।

উত্তর শ্রীহট্ট

নং পরগণার নাম	মৌজা বা	হাল গ্রাম সংখ্যা	একর (আবাদি)	রাজস্ব টাকা	তালুক সংখ্যা
১. অরঙ্গপুর (ঔরঙ্গপুর)	১০৬	১৯৭৫	৭০৪৫	২৮৬৮	২৪০
২. ইছাকলস	৫৩	১৫২৩	৪৩২১২	৩৬২১	৪৩০
৩. ইন্দানগর	৭	৫০৮	৪০৫০	৬৬৩	১১১
৪. উত্তরকাছ	৪	১৬৪৬	৯৩৩৪	১৪৯৫	২৮৩
৫. করণসী	৭	৪৮৪	১৮৬৫	৪৯২	৭০
৬. কসবা শ্রীহট্ট	২৩১	৬৩১	২৫২৭	৪৭	৫
৭. কাজাকাবাদ	১৪	১১৮৪	৫৮২৭	১১৪৮	৫০৯
৮. কুরুয়া	৫৭	১৭৭৬	৮৪৪১	২৯৪৪	৫৯৯
৯. কৌড়িয়া	২৭৮	৯৭৬	৪৮৫৯৯	১০৫৫	১৭৫৫
১০. খিত্তা	৯৪	১৯৫৭	১০৬২২	৩৯৮৪	৯৮৬
১১. গঙ্গানগর	৪	১২	৫৫৯	৩৪২	৬৫
১২. গহরপুর	০	০	১৮৪২০	৪৪৮৫	৬৮০

১৩. গিলাছড়া	১৬	১২১৯	৫৭৭৩	৫৮৯	২০০
১৪. গোধরালি	৪৫	১৭৮০	৯২৮৭	৫৬৭	৩৯০
১৫. গোয়ার	২০	৯০৯	৪৬১৪	৩৬৩	৭৬
১৬. চৈতন্য নগর নং ১	৮	১০৫০	৫১৭৪	৫৭৯	২
১৭. চৈতন্য নগর নং ২	১৪	৪৫৭	৩২০৪	১০১০	১৭
১৮. জয়ন্তীয়া (১৮ পরগণা)	০	০	০	০	০
১৯. জলালপুর	১৯	১৫৭৩	৭১১২	৩৪০৬	৪৬৫
২০. ঢাকাদক্ষিণ	৬৬	৭৩৬২	১৫৩৫৯	৫২৭৮	১৩২৭
২১. দক্ষিণকাছ	১২	১৪১৭	৮৮৫৮	১৩১১	৪৩৮
২২. দুলালী	১১৮	২৮০৫	১৫৫৩১	৪০২৯	৭১৩
২৩. ফুরকাবাদ	৩০	৭১২	৩২৮১	৮২৬	৪১১
২৪. বগাথ	১	১৫	৭৭	২১	৮
২৫. বরায়া	৪৫	৩৬৪৬	১৮৭৬০	৪৪৫৭	১০১৭
২৬. বরুঙ্গা (বরগঙ্গা)	৫৭	১৭৭৬	২১৪০	৭৭৬	২৯০
২৭. বনভাগ (খালিসা)	৫৯	১৮৩৩	৮৩৭১	২৪৪০	১০৯৫
২৮. বাজু বনভাগ	৬১	১৪৯২	৬৫৫৪	১৩৭১	৩৭৮
২৯. বেত্রীকুল	২৭	২৭০২	১২৮০১	১৪৫২	১৪৮
৩০. বোয়ালজোর	৫৩	৩৮৪৭	১৯৩৪০	২৫৭৬	৩১১
৩১. ভাদেশ্বর (আরাঙ্গাবাদ)	২৬	২০১১	১২৭১	১১৯৩	৩২১
৩২. মোক্তারপুর	০	০	৮২৭৩	১৭৫৪	১৫৪
৩৩. মোহাম্মদাবাদ	১১	১৩২	৭৪০	১১৫	১০
৩৪. মৌরাপুর (হাউলি)	১৫	১০৫৬	৫১৮৯	১১০৯	৮৫০
৩৫. মৌরাপুর (ইটা)	১৩	৩৬০	১৬০৩	৪৩৮	১০৭
৩৬. রাণাপিং (নারাপিং)	১৩	৩৯৯	১৭১৯	৫৭০	১৮৯
৩৭. রেঙ্গা	৬৫	৬০৪৭	৩০৮৬৮	৬৭৪২	৯৯১
৩৮. লক্ষীপুর	৪৯	১৭৫৫	৬৪৮৮	২৪৬৭	২৬৫
৩৯. শিকান্দরপুর	৩	১৩৭	৬৫৪	১৪৪	৩৬
৪০. সনখাউড় (ছনখাই)	৪৫	১৪৪৬	৬৬৩৬	২৫০৪	৮৫০
৪১. হরিনগর	৮৪	১২৭৬	৭৩৫৩	২০৪৭	৩

করিমগঞ্জ

১* আকবরপুর	৭	১৬২	৬৯৮	১৪৯	৪১
২* আগিয়ারাম	৩০	৬৭১	৩১৯৩	৯৮৯	২৬০
৩* আরঙ্গাবাদ মাটিকাটা	০	০	২৬১	৫৫	৫৫
৪* ইছামতি	৫৯	২৮৭৫	৩৬৫০	৩৬৫০	৬৬৮
৫* ইয়াকুব নগর	১২	৩২৩	১৫২২	৩৬৩	৪৭
৬* এগারসতী	৮২	৭৯১৩	৩৬৭৬৪	২৯১১	৩৪০
৭* এগারসতী পলডর	০	০	০	০	০
৮* এতোসামনগর	৯	১৭৫	১২৮১	৩৬৮	৪৩
৯* কুমড়ীসাল (বাদে)	৬	১৫৬	৭২৫	৭০	২৮
১০ কুশিয়ারকুল	৫৪	৩৪২৭	১৬৪৭৩	৩৪৪০	৬৪৯
১১* ঐ (কিসমত)	৪০	৩৩৪৬	১৯১১	৫৮৭	১৫১
১২* ঐ (বাদে)	৩৯	৬১৬	২৪৮৭৪	২৪৭	৫৯

১৩ চাপঘাট	৩০	৩২৫৩	২১৫৫৬	৯৩২৫	২৯৬
১৪ চুড়খাইড়	২১	১৭২৪	৮০৪৯	১২৫৬	২৫৫
১৫ চৈতন্যনগর নং ৩	১১	১৪১৯	২০৭৮	৯৭০	১
১৬* ঐ নং ৪	১	৯৭	৮৬২	২৩৯	১
১৭ ছোটলিখা	২২	১৮২৩	৮৫২৭	১৫৫০	৪৩৮
১৮ জফরগড়	১২	১৪০৩	১০৩১৮	২৭৮৬	৪৯৮
১৯ দুবাঘ	৮	৫৭৩	৫৭৯০	৫৯৯	৩৫৮
২০ পঞ্চগড় (কালা)	৮৯	৪২৩০	১৭৩৬১	৩১৩৫	১১৫৬
২১* ঐ খুরাদ	১৯	৪৪৩	৪৭৯২	৫৩৪	২৬২
২২ পলডর	১৩	১৫৩৯	৭৩২৬	৯৭	৪
২৩ পাথারিয়া	৬২	৩২৭৪	৬৬৫৫৩	৪১১১	৪২১
২৪ প্রতাবগড়	১৯	৫৫২০	৮৪২৪৭	৫২১৮	১৩৮
২৫ বড়লিখা	২৮	৬৭৫	৩২৮২	৮০৬	১২৩
২৬* বাদে দেওরালি	২৩	১৭৯	১৯১৪	১৭৬	৫২
২৭ বারপাড়া	১৯	১৮৬৬	৮৮৯৮	১১৪০	১২০
২৮ বারহাল	১০	৯৯৬	৪৬৯৭	৮৩০	১৮৮
২৯ বালাউট	২৩	১৪২৮	৬৬৭৫	৬০১	৭৬
৩০ বাহাদুরপুর	৯৭	৩৫৪০	২২৬৭৫	২৯০৪	৬৭৭
৩১ ভরণ	২১	১৩৫	২৬৬৭	১১৩৭	৬১
৩২* মোহাম্মদপুর	৫	৩৬০	১৩৫৬	৪৭৬	১৩০
৩৩ রফিনগর	২৮	৮৩৯	৪৪৬৮	১০০৬	১৫১
৩৪ শায়বাগ	১১	৫১২	২৭০০	২৬২	২৭
৩৫ শাহবাজপুর	৬৯	২৫৮৩	১৮১৪৪	২৩৯৫	৩৩২
৩৬* সাহাবাদ	৫	১০৯	৪৩৬	১০৪	১৩
৩৭* সেনগ্রাম	৩	১২৫	৪৪৮	২০১	২০

দক্ষিণ শ্রীহট্ট

১* আথানাগার	৭	৮০৭	৩৭১৭	৬৪০	৬৫
২ আদমপুর	৪	৫৯৮	৩১৯৩	১৭৩	৩
৩ আলীনগর	২৮০	২৯০৩	৩৪৮৫১	৬৯৯০	১৩৭৬
৪ ইটা	২১৯	২৫৮৮	২৮৫০০	৫১০২	১১৩৩
৫ ইন্দেশ্বর	৭০	১৫৫২	৭৯২৯	১৯৪৭	৬১১
৬ কাণিহাটী	৪৭	৩৭৭৫	২৭৮৮২	২৭০২	২৮৪
৭ গোয়াসনগর	১০	২৯৪	১৭০৫	১৫১	২৯
৮ চৈতন্যনগর নং ৫	৭৮	২৬২	১০৭২	৩১৫১	৪৯০
৯ ঐ নং ৬	১৫৬	২২৮২	৪৯৩	২০০	১
১০ চৌতলী	৯	১৬৭	২৫৪৯	১১৯০	১৭৯
১১ চৌয়ালিশ	৬৫	৭৮৩১	৪০৪২৮	১১১৭০	২৮১২
১২ ছয়চিরি	১৭	৭৭৬	৫২২৩	১৩০৬	১৬৪
১৩* পঁচাউন	০	০	৩০৬৪	৪২০	২৭
১৪* পানিশুলি (ইটা)	৬	১১	৫৫	২৪	২
১৫* পানিশালি (হাউলি)	৩	১৭৪	৮০৪	২৩০	২৪
১৬ বরমচার	১৬	১৭৫৯	১৭৮৭১	২৭৮০	৭০৭
১৭ বালিশিয়া	৩৩	০	২৫১১	৬৮৭৪	৬১৭

১৮ ভাটেরা	২৪	৭৭৭	৫৭৫৪	১১৩৭	১৭০
১৯ ভানুগাছ	১০২	৮৫৪৬	৩৯৫৭১	২৫৩০	২৫৮
২০ লংলা	৫৬	১৪৮৫৩	৮২৬৪৭	১৪৮১৯	৩৪৯২
২১ শায়েস্তানগর	৯৬	৩০৭৩	১৫০৮৬	৩৭৫৬	৯২৯
২২ সতরসতী (হাউলি)	৭৯	২৫৬৪	১২৩৩৪	৩৬৭০	৯১৮
২৩ শমশের নগর	২৭৫	৫২৮৮	৬৩৮৫০	১০৩৪০	১৯৮৯
২৪ সাতগাও	১৫	১৭৬৫	৮১৫৪	২২৮	৩০৩
২৫* ঐ (হাউলি)	১৩	৩০৯	১১৭১	৫৭৬	১৫৬
২৬* সুজাবাদ	২	৩৪	১৪১	২৮	১১

হবিগঞ্জ

১ আগনা	৮৩	২৮১৬	৩১০৮৮	১৩১২	১৩৭
২* আনন্দপুর	৫	০	০	০	২
৩ উচাইল	০	০	৭৮৯৬	৩৭৬০	২৯
৪* উসাইনগর	১৬	০	১৬৯	১৮৩	৬
৫ কাশিমনগর	০	০	৬০৪৬	৩৭৫৩	১৬০
৬ কিসমতবাজুসতরসতী	৩২২	২৫৪	১১৩৮	২০৬	১০
৭ কুরশা	৪৮	৩১৫৭	১৫৭৮৯	১৯৫০	১৯৫
৮ গদাহাসন নগর	১৪৪	০	৮০৬৯	৬৬৯৯	৫৪৩
৯* গিয়াসনগর	১৩	১৯৩	১২২৩	৩৭৩	৪২
১০ চৌকী	২৭	১০৬৩	৪৭৪৪	১০৭৬	৬১
১১ জনতরি	৩৬	১৭৪৩	৮৭০৯	৮৪৩	৮৫
১২ জলসুখা	৭৫	২৫৮৫	১২১৩২	২৮৩১	৬৮
১৩ জোয়ান শাহী	৪০	১০৭৯	৫০৪২	১১৬৪	১২
১৪ জোয়ারবানিয়াচং নং ২	১৫৯	১৩৯৩	৬৩৫৮৬	৭০৭৮	৩৩৮
১৫ তরফ	৬৩০	০	৫০৯৯৬	৪৪০০০	১৬০১
১৬* দাউদনগর	১৮	৭৩৬২	৮৬৪০	৫৭৫০	১৭
১৭ দিনারপুর	৭৩	৪৭২৫	২৭৩৬২	৩৯৯৪	৬৮৩
১৮* নুরুলহাসননগর	০	০	৩১৩২	২৭৮৪	৭০
১৯ পুটিজুরী	১২৩	০	৬১৩৬	১৭৫৪	১৮৯
২০ ফৈয়াজাবাদ	৬১	০	১৩২৮	৫৫৮	১১৫
২১ বাজুসরসতী	৩৩	৪৭৪	২৭৫৮	৩২২	৫৬
২২ বাসুসোণাইতা	০	০	৯৬৮৩	৭১৭	১৭৭
২৩ বাণিয়াচঙ্গ (কসবা)	৩২২	৩২০২৪	১০৬৮৭৬	১০৮৬৫	৩৫৮৫
২৪ বামৈ	১৩৭	০	৮৮৫১	৩৭৭৫	৩৩৩
২৫ বিথলঙ্গ	১৯	১৬৯৪	৭৮৪৫	২২০১	১৭
২৬ বেজোড়া	১০২	৯৬৬১	৫২৩৫৬	৩০৭৬	১২৯৪
২৭* মগিসপুর	৫	১৮৪	৮৯২	১৮১	৮
২৮ মনতলা	০	০	০	০	০
২৯ মান্দারকান্দি	২৩	১২২৭	৮০৫৮	১৫১৯	১৩১৩
৩০ মুড়াকড়ি (দুই পং)	৮	০	১৪৭৯	৪৩৯	৪
৩১ মুড়াকাঁড়ি (দুই পং)	৮	০	১৪৭৯	৪৩৯	৪
৩২* রঘুনন্দন	১২	০	১১০	১৫৭	২

৩৩ রিচি	১১	২৪২৯	১১৭০৫	১২০৬	২৫
৩৪ রিয়াজপুর	০	০	১১৬	৪৩	২
৩৫ লাখাই	৩৫	৫৭৪৩	২৭২২৩	৩৭১০	১৬০

সুনামগঞ্জ

১ আটগাও	১২	০	৯০০	৮২	৮
২ আতুয়াজান	২৭১	৭৪০২	৩৫৫৫২	৩২৭৫	৪৫৩
৩ ঐ (কিসমত)	২১৯	৮১৫৯	৩৭৯৮৫	৩৪৩৩	২৮১
৪ চামতলা	৫৬	৪২৩০	১৯৪২৭	১১৬২	৬২
৫ ছাতক	১৭	১১৯৫	৫৭৯৯	৮৪৩	৪৮
৬* জাতুয়া (হাউলি)	৮	১৮৫	২৮২৯	২০৬	১৪
৭ ঐ (বাজু)	৩৫	৮৮৯	৪৪৩৯	১০১১	৪৮
৮ জোয়ার বানিয়াচং ১	৩১৪	২২০৯৫	১০৮৩৫৬	৩৮৩১	১৭০
৯ দু-হালিয়া	৯১	১৯৭৯	১০৮৪২	৮৮৭	৫১
১০ নৈগাঙ্গ	৪২	১১৭২	৫৪১৫	৫৩৭	৯
১১ পলাস	১৭	৯৫৯	৩৭৪১	৫৪০	৯
১২ পাগলা	২৬	১৯৭৮	৯৫৮৭	১৫৩৭	৭৫
১৩ পাণ্ডুয়া	১৩	২৮৯০	৩০৬৪	৪২২	২৭
১৪ বড় আখিয়া	৫৩	৬৭০৯	৩৩৩৫৯	৯৯২	৩৯
১৫ বংশীকুণ্ডা	৬৫	০	৩২৩৩১	১৮১৩	১
১৬ বেতাল	০	০	০	০	০
১৭* ঐ (কিসমত)	০	০	০	০	০
১৮* বেতাল (খালিসা)	৮৫	০	৪৭১০	১২৭৫	৪৬
১৯* ঐ (নাওরা)	৪৭	০	৯৪৮	৮৮৪	১৮
২০ মহারাম	২৩	৩৯০৭	১৩২০২	১৭৬২	৮৬
২১ রণদিঘা	৬৫	৬০৪৭	৯৩২	৩২০	১৬
২২ লক্ষণছিরি (শ্রী)	৫৫	৩০৮৯	৫৬৩	১২৪	৬
২৩ লক্ষণছিরি গং	২০	১১৬	০	০	১৬
২৪লাউড়	৯০	১৫২০৬	৬৭৬১০	৩০৮০	৩০৫
২৫ সিংহচাপড় (হাউলি)	৪১	১২২৭	৮৪৮৯	১৪৯৪	১৩৯
২৬ ঐ (বাজু)	৩৫	১১১৯	৬৭৩৩	৫৯৫	১০০
২৭ সিকসোণাইতা (সোণাউতা)	৯২	২৩২৫	১৮৮২৪	১২৯৫	২৯৪
২৮ সুখাইড়	২৫	০	৮৩০৩	৭৮	০
২৯* সফিনগর	৪	৫	২৫	৭	১৩
৩০ সেলবরষ (সেনবর্ষ)	১৭	০	৬১৪১	১৬৯৮	৩৫
৩১ হাউলি সোণাইতা	২৩	১১১৪	৪৭৯৭	৮৫৬	১২০
৩২ হাসনাবাদ	৫	৪৫৮	২২২৭	৩১২	১৬

পরগণা সংখ্যা মোট ১৭৩, জয়ন্তীয়া সহ ১৯১টি। উপরিউক্ত বিবরণে পরগণাগুলির রাজস্বের (আনা ইত্যাদি) এবং হালের (কেদার প্রভৃতি) ভগ্নাংশ লিখিত হয় নাই। ক্রমিক নম্বর গুলির (অধিকাংশের), এই পুস্তক সংলগ্ন মানচিত্রে অঙ্কিত সংখ্যা সহ ঐক্য আছে, তদ্দৃষ্টে মানচিত্রে স্থান নির্দ্দেশের সুবিধা হইবে। জয়ন্তীয়ার ১৮ পরগণার বিবরণ ২য় ভাগ ৪র্থ খণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে লিখিত হইবে। (* চিহ্নাঙ্কিত পরগণা গুলির স্থান মানচিত্রে নির্দ্দেশিত করা হয় নাই।)

দ্বিতীয় ভাগ

ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত

প্রথম খণ্ড

হিন্দু প্রভাব
প্রাচীনত্ব

প্রথম অধ্যায়

প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য

বঙ্গদেশ কত প্রাচীন?

বঙ্গদেশ কত প্রাচীন? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হয়। বেদে বঙ্গদেশের নাম পাওয়া যায় না, অথর্ব্ববেদে[১] অঙ্গদেশের নাম উল্লেখিত হইলেও বঙ্গদেশের প্রসঙ্গ নাই। মনুসংহিতাতেও বঙ্গভূমির নাম পাওয়া যায় না, তবে পুণ্ড্রদেশের উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান ভাগলপুর অঞ্চলই পূর্ব্বকালে বঙ্গ নামে খ্যাত ছিল, এবং উত্তর বঙ্গই পুণ্ড্রদেশ বলিয়া আখ্যাত ছিল।

যখন রামায়ণ রচিত হয়, তখন বঙ্গভূমি যে আর্য্যগণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল, এমন নহে। রামায়ণে বঙ্গদেশের নামোল্লেখ আছে। যদিও তখন এদেশে জনবসতি স্থাপনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি তখন ইহা একটি দেশ রূপে খ্যাত হইয়াছে। রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দশরথ কৈকেয়ীকে বলিতেছেন—"সূর্য্যের রথচক্র যতদূর পরিভ্রমণ করে, ততদূর পর্য্যন্ত পৃথিবী আমার অধীন। দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ. বঙ্গ, অঙ্গ, মৎস্য এবং অতি সমৃদ্ধশালী কোশল রাজ্য এ সকলই আমার অধিকারে আছে।"[২]

ঐ সময় বঙ্গদেশ আর্য্য সমাজে পরিজ্ঞাত ও দশরথের অধিকারভুক্ত থাকিলেও এখন আমরা যাহোক বাঙ্গালা দেশ বলি, প্রাচীন বঙ্গ তাহা নহে, পূর্ব্ববঙ্গই তখন বঙ্গদেশ নামে খ্যাত ছিল। রামায়ণের বঙ্গ তাহারও সামান্য একটু অংশ বই ছিল না এবং তাহাও তখন মনুষ্য বাসের অযোগ্য ছিল। তবে ইহার পরে মহাভারত বর্ণিত সময়ে বঙ্গদেশের অনেক পরিমাণে উন্নতি হইয়াছিল, ইহা অবগত হওয়া যায়।

শ্রীহট্টের প্রাচীনত্ব

আমরা যে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা যে বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রাচীন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীহট্টের ভূতত্ত্ব বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে শ্রীহট্ট অতি প্রাচীন দেশ। শ্রীহট্টের উত্তর দিগ্বর্ত্তী অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা কত যুগ যুগান্তর হইতে এদেশের মেরুদণ্ডরূপে দণ্ডায়মান, তাহা কে বলিবে? বরবক্র ও সুরমা এ জিলার প্রধান নদী; মনু, ক্ষমা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণাঙ্গিনী স্রোতস্বতী বরবক্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। শেষোক্ত নদীত্রয় পুণ্যসলিলা নদী বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মনু নদী সম্বন্ধে তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে সত্যযুগে ভগবান মনু এই নদী তীরে শিব পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম মনু নদী হইয়াছে।[৩] এবং বরবক্র নদ

---

১. অথর্ব্ব সংহিতা ৫।২২।৪

২. প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদ–১ম অধ্যায়।

৩. সংস্কৃত রাজমালায়ও একথা উদ্ধৃত হইয়াছে, যথাঃ–

"পুরা কৃতযুগে রাজন্ মনুনা পূজিতঃ শিবঃ;
তত্রৈব বিরলে স্থানে মনুনাম নদীতটে।" ইত্যাদি।

সর্ব্বপাপ প্রনাশক বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত।[৪] এই নদ গুলিই শ্রীহট্টের ভূ-বিস্তৃতির প্রধান কারণ।

পূর্ব্বকালে শ্রীহট্টের সমস্ত পশ্চিমার্দ্ধ ভাগ গভীর জলতলে নিমজ্জিত ছিল, এই নদীগুলি-প্রবাহিত মৃত্তিকায় কতকালে তাহা উচ্চ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে কে জানে? সেই সময়ে শ্রীহট্টের পর্ব্বত ও পর্ব্বতকল্প উচ্চ স্থল গুলি জনশূন্য ও কেবল মাত্র ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির বিস্তৃত বিচরণ ক্ষেত্র মাত্র ছিল, তাহা নহে। তখন অনার্য্য বংশীয়েরাই দেশের অধিকারী ছিল, অনার্য্যরাই প্রধান ছিল। বর্তমান কুকি খাসিয়া প্রভৃতি জাতি অপরিবর্ত্তিতাবস্থায় তাহাদেরই বংশধর; এর বহু সহস্র বর্ষের ঘাত প্রতিঘাতে রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে তাহাদেরই শোণিত কণা যে হাড়ি, ডোম, মাহিমাল প্রভৃতি জাতির দেহে সংগৃহীত আছে, তাহা বলা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু সে অনার্য্যযুগ বহুপূর্ব্বে অতীত গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

আর্য্যযুগ হিসাবেও শ্রীহট্ট, অতি প্রাচীন দেশ। যখন বঙ্গভূমির অধিকাংশ স্থান ব্যাঘ্র ভল্লুকের বিচরণ ক্ষেত্র মাত্র ছিল, যখন বঙ্গদেশ অনার্য্য জাতির বাস ভূমিরূপে পরিগণিত ছিল, তখনও শ্রীহট্টে আর্য্য নিবাসের প্রমাণ একবারে প্রাপ্য হয় না। এ অতি সাহসের কথা যে যখন বঙ্গদেশ অনার্য্য ভূমি, তখন প্রান্তবর্ত্তী সুদূর শ্রীহট্ট আর্য্যবাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের গঠন

প্রাচীন পৌরাণিক কালের গ্রন্থপত্রে শ্রীহট্টে, আর্য্যবাসের পরিচয় যদিও স্পষ্ট রূপে নাই, তথাপি আনুসঙ্গিক প্রমাণে শ্রীহট্টের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে "ইওসিন্" যুগে হিমালয়ের ও তল দেশ জলতলে ছিল, কিন্তু সে কতযুগের কথা; তখন মনুষ্য সৃষ্টির চিহ্ন পাওয়া যায় না! ইহার পরে 'মিওসিন্‌স্তরেই মনুষ্য চিহ্ন লক্ষিত হয়, তখনও সাগরবারি দেশের অধিকাংশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। এ সকল পণ্ডিতদের কথা আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই, যখন রামায়ণ রচিত হয়, তখন বঙ্গভূমে আর্য্যনিবাস স্থাপিত হয় নাই, সম্ভবতঃ তখন ইহার অধিকাংশ স্থল সমুদ্রগর্ভোত্থিত জলা ও জঙ্গলা ভূমি ছিল। হিমালয়ের পাদদেশে সামুদ্রিক জীবকঙ্কাল দৃষ্টে ভূতত্ত্ববিৎগণ বলেন যে, পুরাকালে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিলনা, তখন সাগরোর্ম্মি হিমালয়ের পাদতটে প্রহত হইত। পর্ব্বতধৌত মৃত্তিকা ও গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের পলি দ্বারা ক্রমে বঙ্গভূমি গঠিত হইয়াছে।[৫] বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যেরূপে বঙ্গদেশের উৎপত্তি হইয়াছিল (তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ) বর্তমানে সুন্দরবন ও গঙ্গাসাগরে তদ্রুপ ক্রিয়া চলিতেছে। নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ এর খড়দহ, এড়েদহ প্রভৃতি দ্বীপ ও দহান্তক নাম গুলিও পূর্ব্ব স্মৃতির পরিচয় দিতেছে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য

রামায়ণবর্ণিত সময়ে আর্য্যগণ বঙ্গদেশকে বাসের উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন নাই। রামায়ণে উত্তরবঙ্গ পুণ্ড্রভূমির নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও আর্য্য নিবাসের প্রসঙ্গ নাই; তৎপ্রতিকূলে বরং বর্ণিত আছে যে, বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ পিতৃশাপে অনার্য্যত্ব (কুক্কুর মাংশভোজী

---

৪. "রূপেশ্বরস্য দিগ্‌ভাগে দক্ষিণে মুনিসত্তম;
বরবক্র ইতি খ্যাত সর্ব্ব পাপ প্রনাশনঃ-তীর্থচিন্তামণি
এবং-বিন্ধ্যপাদ সমুদ্ভূতো বরবক্র সুপুণ্যদঃ।
যত্র স্নাত্বা জলং পিত্বা নবঃ সদ্‌গতিমাপ্নুয়াৎ॥"-বায়ুপুরাণ।

৫. See principles of Geology. Vol. Ip. 470 (By Sir Charles Lyell.)

মুষ্টিক জাতিত্ব) প্রাপ্ত হইয়া পুণ্ড্রভূমিতে বাস করেন। রামায়ণেই বর্ণিত আছে যে, চন্দ্রবংশীয় রাজা অমূর্ত্তরজা পুণ্ড্রভূমি অতিক্রম করতঃ কামরূপে ধর্ম্মারণ সমীপে প্রাগ্জ্যোতিষ নামে এক আর্য্য রাজ্যস্থাপন করেন।[৬] তাহার পরে, মহাভারতের সময়েও প্রায় তদ্রূপ। তবে রামায়ণের কাল হইতে, এই সময়ে সাগর বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল এবং দেশের ভূভাগও অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে কৌশিকীতীর্থে, কৌশিকী (নদী) গঙ্গার সহিত সম্মিলিতা হইয়াছেন, তাহারই কিছুদূরে পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গা-সাগরসঙ্গম।[৭] মহাভারতে পুণ্ড্রভূমিকে অনার্য্যভূমি বলা হইয়াছে এবং পুণ্ড্র জাতি অনার্য্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।[৮] অনার্য্য অধ্যুষিত সেই তখন বঙ্গাদি দেশ ঘৃণ্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং তীর্থযাত্রা ব্যতিরেকে তত্তদ্দেশে গমনে পাতিত্য জন্মিত।[৯]

সর্ব্বতঃ প্রতিভাশালী সাহিত্য কেশরী বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধপুস্তক ২য় ভাগে "বঙ্গেপ্রবেশাধিকার" প্রবন্ধে "শতপথ ব্রাহ্মণ" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই আছে, সদানীরা নদীর[১০] পরপার প্রদেশ জলপ্লাবিত। "স্রাবিতর" শব্দে প্লবনীয় ভূমিই বুঝায়। যদি তখন ত্রিহুত প্রদেশের এই দশা, তবে অপেক্ষাকৃত নবীন বঙ্গভূমি সুন্দরবনের মত অবস্থাপন্ন ছিল। পৌণ্ড্রেরাই তথায় বাস করিত। মহাভারতে সভাপর্ব্বে আছে যে ভিম পুণ্ড্র বঙ্গাদি জয় করিয়া তাম্রলিপ্ত এবং সাগরকুলবাসী ম্লেচ্ছদিগকে জয় করেন।[১১] অতএব তৎকালে এদেশ আসমুদ্র জনাকীর্ণ ছিল কিন্তু তথায় যে আর্য্যজাতির বাস ছিল, এমত প্রমাণ মহাভারতে নাই। পুণ্ড্ররাজের নাম বাসুদেব। আর্য্য বংশীয় নহিলে এ নাম সম্ভবে না, কিন্তু নাম কবির কল্পিত বলিয়া বোধ করাই উচিত।"

বঙ্গদেশ গঠিত হইবার কথা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যেরূপ বলেন, তাহাতে সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে উত্তর বঙ্গই বয়োধিক। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভাদিগের গ্রীকদূত মিগেস্থিনিসের লিখিত

৬. "তথামূর্ত্তরজা বীরশ্চক্রে প্রাগ্জ্যোতিষং পুরুং
ধর্ম্মারণ্য সমীপস্থং" ইত্যাদি রামায়ণ।
এই কামরূপের পূর্ব্বদিকে তৎপরেই কৌণ্ডিল্য নামে দ্বিতীয় আর্য্যরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, ভীষ্মক ইহার রাজা ছিলেন। (আসাম-সাদিয়ায় কুণ্ডিল নদীর তীরে কৌণ্ডিল্য নগরী ছিল।)

৭. "স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদী শতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্।
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।"–মহাভারত, বনপর্ব্ব ১১৪ অধ্যায়।
কৌশিকী বর্ত্তমান কুশী নদী; কুশীসঙ্গম ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত। সুতরাং তৎঅঞ্চল কালে ভাগলপুর পর্য্যন্ত সাগর বিস্তৃত ছিল।

৯. "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ।
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।"
–শুদ্ধিতত্ত্বং।

১০. "এক্ষণে সদানীরা নামে কোন নদী নাই, শতপথ ব্রাহ্মণেই কথিত হইয়াছে যে এই নদী কোশল ও বিদেহ (মিথিল) রাজ্যের মধ্যসীমা।"–প্রবন্ধ পুস্তক।

১১. "মহাভারতের যুদ্ধে বঙ্গাধিপতি গজসৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গেরা ম্লেচ্ছ ও অনার্য্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে।"
প্রবন্ধ পুস্তকে গ্রন্থকার লিখিত টীকা।
"সুহ্মানামাধিপঞ্চৈব যে চ সাগর বাসিনঃ।
সর্ব্বান ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ।"–সভাপর্ব্ব ২৯ অধ্যায়।
–(আমাদের সংগৃহীত)

বিবরণ হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১২] ঐ সময় পাটুলিপুত্র (পাটনা) হইতে সাগরসঙ্গম প্রায় তিন শত মাইল দূরে ছিল। সাগর ক্রমশঃই দূরে চলিয়া যাইতেছে। রাজতরঙ্গিনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমুদ্রের সন্নিকটবর্ত্তী গৌড্র অধিকার করেন।[১৩] ললিতাদিত্য ৭৩২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং বলিতে হইবে যে ঐ সময় পূর্ণরূপে না হউক, কিয়দংশে জলা ও জঙ্গলা ভূমি সমন্বিত পূর্ব্ব সমুদ্রের সুস্পষ্ট নিদর্শন গৌড়ের নিকটে প্রকট ছিল। বস্তুত উত্তরবঙ্গই নিম্নবঙ্গ হইতে বয়োধিক, এবং তজ্জন্য ঐ সকল প্রদেশেই প্রথমে নগর গ্রামাদি স্থাপিত হওয়া সঙ্গত। হইয়াছেও তাহাই।[১৪] তথাপি রামায়ণের ঐ পুণ্ড্রভূমিও অমূর্ত্তরাজার নিকট বাসের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। বরং তিনি তদতিক্রম করতঃ কামরূপে পূর্ব্বদেশের প্রথম আর্য্য নিবাস স্থাপন করেন।

এ সম্বন্ধে মহাত্মা বঙ্কিম চন্দ্র লিখিয়াছেনঃ- "যেমন এখন যাহাকে বাঙ্গালা বলি আগে তাহা বাঙ্গালা[১৫] ছিল না; তেমনি এখন যাহাকে আসাম বলি, তাহা আসাম ছিল না। অতি অল্পকাল হইল আহোম নামে অন্য জাতি আসিয়া ঐ দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছে। সেখানে, যথায় এখন কামরূপ, তথায় অতি প্রাচীন কালে আর্য্যরাজ্য ছিল। তাহাকে প্রাগ্ জ্যোতিষ বলিত। বোধ হয় এই রাজ্য কালের অনার্য্যভূমি মধ্যে একা আর্য্য জাতির প্রভাব বিস্তার করিত বলিয়া ইহার এই নাম।[১৬] মহাভারতের যুদ্ধে প্রাগ্জ্যোতিযের্শ্বর ভগদত্ত, দুর্য্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অধিবাসী, তাম্রলিপ্ত, পৌণ্ড্র, মৎস্য প্রভৃতি সে সময় উপস্থিত ছিল। তাহারা অনার্য্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাঙ্গালা যে সময়ে জন্ম ভূমি, সে সময়ে আসাম যে আর্য্যভূমি হইবে, ইহা এক বিষম সমস্যা। কিন্তু তাহা অঘটনীয় নহে। মোসলমান দিগের সময়ে ইংরেজদিগের এক আড্ডা মাদ্রাজে, আর আড্ডা পিপ্পলী ও কলিকাতায়; মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সকলের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার ইতিহাস আছে, বলিয়া বুঝিতে পারি তেমনি প্রাগ্জ্যোতিষের আর্য্যদিগের ইতিহাস থাকিলে, তাহাদিগের দূর গমনের কথাও বুঝিতে পারিতাম। বোধ হয়, তাহারা প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগেই বাস করিয়াছিল। তার পর আর্য্যেরা দাক্ষিণাত্যজয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সেখানকার অনার্য্য জাতি সকল দূরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া উহা পূর্ব্ব মুখে আসিয়া বাঙ্গালা দখল করিয়াছিল। তাহাদেরই

১২. Megasthenes Frag VI.

১৩. "গৌড়রাজ্য ললিতাদিত্যের অধিকৃত হইল, তিনি তথা হইতে বহুসংখ্যক হস্তী সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন, তথায় তদীয় সেনাও গজদিগকে সমুদ্রতরঙ্গে ক্রীড়া করিতে বোধ হইল যে, যেন তাহারা সমুদ্রকে পরাভূত করিয়া তাহার তরঙ্গরূপে কেশ আকর্ষণ করিতেছি। ক্রমে তিনি বনশ্যামল সমুদ্রতীর দিয়া দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন।"
রাজতরঙ্গিনী–চতুর্থ তরঙ্গ।
(পণ্ডিত শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র বিদ্যারত্ন যত অনুবাদ)

১৪. চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্থসঙ্গ, বঙ্গীয় যে সকল গ্রাম নগরাদির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মালদহের নিকটবর্ত্তী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সুবর্ণকর্ণ, সমতট প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। দহান্তক মালদহ নামটিও পূর্ব্বস্মৃতির উন্মেষক নহে কি?

১৫. পূর্ব্বে বাঙ্গালা বা বঙ্গদেশ বলিতে (ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টাদি) পূর্ব্ববঙ্গ বুঝাইত।

১৬. এই নামের অর্থ বোধ হয় এইরূপ নয়। পূর্ব্বাঞ্চলে তৎকালে কৌণ্ডিল্য প্রভৃতি আরও আর্য্যরাজ্য ছিল। কলিকাপুরাণে ইহার অর্থ অন্যরূপ কথিত হইয়াছে;
"খস্য মধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা প্রাগু নক্ষত্রং সসর্জ্জহ।
তেন প্রাগ জোতিষাজ্জেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা।"–(আমাদের সংগৃহীত)

ঠেলাঠেলিতে অল্প সংখ্যক আর্য্য ঔপনিবেশিকেরা সরিয়া সরিয়া ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মপুত্র পার হইতে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।"

"এক সময় কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্তীয়া, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল।"[১৭]

শ্রীহট্ট দেশ কামরূপের অধীন

প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত বলেন যে ব্রহ্মপুত্রের পরবর্ত্তী কামরূপ রাজ্যের বিস্তৃতি প্রায় দ্বি সহস্র মাইল। আসাম, মণিপুর এবং ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট কাছাড় প্রভৃতি লইয়া কামরূপ রাজ্য বিস্তৃত ছিল।[১৮] জাতিতত্ত্ববারিধি গ্রন্থের ২৬০ পৃষ্ঠাতে লিখিত হইয়াছে, —"ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট প্রাগ্‌জোতিষ দেশের এবং ত্রিপুরা প্রভৃতি কিরাত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; এইক্ষণে এই সকল স্থানও পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে।" শ্রীহট্ট দেশ প্রাচীন কালে এই বিশাল প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বৈদিকসংবাদিনী ধৃত কামাখ্যাতন্ত্রের শ্লোকে দেখা যায় যে পশ্চিমে করোতোয়া, দক্ষিণে চন্দ্রশেখর অবধি মত যোজন বিস্তীর্ণ দেশই কামরূপ রাজ্য।[১৯] যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, শ্রীহট্ট কামরূপেরই অন্তর্গত শ্রীহট্টের যে সীমা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তৎকালে শ্রীহট্ট যে স্বল্পায়ত বলা যায় না।[২০] পরন্তু কামরুপ রাজ্যের দক্ষিণসীমা কামাখ্যাতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে, যোগিনীতন্ত্র মতে শ্রীহট্টের সীমা তাহাই; কাজেই কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত হইতেছে। কামাখ্যাতন্ত্রে কামরূপ রাজ্যের প্রতি যে সপ্তপর্ব্বতের উল্লেখ আছে, তাহাতে জয়ন্তী, কাছাড়, মণিপুর, মগধ ইত্যাদির নাম দৃষ্ট হয়।[২১] কেবল জয়ন্তী নহে, এই মগধ নামটিও যে শ্রীহট্টের কোন এক পর্ব্বতের নাম, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ আছে।[২২]

১৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কৃত প্রবন্ধ পুস্তক ৩য় ভাগ–"বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ" প্রবন্ধ।

১৮. "To the east and beyond river. was the powerth kingdom of kamru pa, 2000 miles in circuit. It apparently included in those times modern Assam. Manipur, and Kachar Mymensingh and Sylhet'- Dutt's Civilization in Ancient India.

১৯. "করতোয়া সামারভ্য যাবদ্দিকর বাসিনীং
উত্তরে বটকী নাম্নী দক্ষিণে চন্দ্রেশেখরঃ।
তন্মধ্যে যোনিপীঠঞ্চ নীলপর্ব্বত বেষ্টিতং
শত যোজন বিস্তীর্ণং কামরূপং মহেশ্বরি।"
যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের যে সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এতৎ সহ তাহার কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও, তাহাতেও কামরূপ শত যোজন বিস্তীর্ণ বলিয়া লিখিত আছে।

২০. "পূর্ব্বে স্বর্ণ নদীশ্চৈব দক্ষিণে চন্দ্রশেখরঃ।
লৌহিত্য পশ্চিমে ভাগে উত্তরেচ নীলাচলঃ।
এতন্মধ্যে মহাদেব শ্রীহট্ট নামো নামতা।"– যোগিনী তন্ত্র।

২১. 'ত্রিপুরা কৌকিকাচৈব জয়ন্তী মণি চন্দ্রিকা;
কাছাড়ী মাগবী দেবী অস্যামী সপ্ত পর্ব্বতঃ।"
বৈদিক সংবাদিনী ধৃত কামাখ্যা তন্ত্র বচনং।
এই শ্লোকোক্ত কৌকিক শব্দে কুকিপাহাড় (লুশাই পর্বত), মণি মণিপুর, চন্দ্রিকা কাছাড়ের সীমান্তবর্ত্তী চন্দ্রগিরি বলিয়া কথিত হয়। শ্রীহট্টের আদি কালেক্টর লিণ্ডসে সাহেবের লিখিত আর বিবরণে কুকি পাহাড়ের উল্লেখ আছে। মগধ শ্রীহট্টেরই কোন পর্ব্বত হইবে।

অতএব শ্রীহট্ট পুরাকালে প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি ভগদত্ত[২৩] এই বিশাল দেশ শাসন করিতেন। যুগবিপর্যয়ে হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভগদত্ত রাজার নাম আজও শ্রীহট্টে জনশ্রুতি মুখে শ্রুত হওয়া যায়। শ্রীহট্টের লাউড় পর্ব্বতে তাঁহার (এ দেশ শাসনের জন্য) রাজধানী ছিল, দ্রুতগামী দৈবশক্তি সম্পন্ন গজারোহণে তিনি রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতেন, এ বিচিত্র জনশ্রুতি যখন সর্ব্বধ্বংসী কাল এযাবৎ বিলোপ করিতে পারে নাই, তখন আর যে কখন পারিবে, এমন বোধ হয় না।

লাউড় পর্ব্বতে ভগদত্ত রাজার বাড়ী।

"নাহ্য মুলা জনশ্রুতি;" ভগদত্ত রাজা সম্বন্ধে এদেশে যে জনশ্রুতি প্রচলিত, এস্থলে তাহা সন্নিবেশিত করা অসঙ্গত নহে। এই জনশ্রুতির বিষয় স্কুল-ডিপুটি ইনিস্‌পেক্টর মৌলবী মহম্মদ ওয়াসিল চৌধুরী কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম উল্লেখিত হয়।

তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীহট্টে যে আর্য্য জাতির বসতি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ জনশ্রুতি এরূপ যে, অতি প্রাচীনকালে লাউড়ের পাহাড়ে ভগদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন, সেই রাজার কালে লাউড় হইতে দিনারপুর সদরঘাট পর্য্যন্ত এক "খেওয়া" ছিল। কখন কখন লাউড়ে থাকিতেন। লাউড়ের পাহাড়ের উপর একটা উচ্চ স্থান দেখাইয়া লোকে এখন পর্য্যন্ত ভগদত্ত রাজার বাড়ী নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। মনে হয়, লাউড় হইতে দক্ষিণে ত্রিপুরার সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড এক ভগদত্ত রাজার করায়ত্ত ছিল। ভগদত্ত দুর্যোধন পক্ষে কুরুক্ষেত্রের সময়ে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। এই জন্যই যুদ্ধের পরে যখন ভীমসেনের বিজয়অশ্ব ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া গমন করে, তখন শ্রীহট্টের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভগদত্ত তখন জীবিত থাকিলে ভীমের সহিত তাহার কোনরূপ সংঘর্ষ অবশ্যই হইত।

আরও দুই ব্যক্তি রাজা ভগদত্ত সম্বন্ধে এইরূপই জনশ্রুতির বিষয় আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন;—ভগদত্তের লাউড়ের রাজত্বের বিষয় এ অঞ্চলে বহুল প্রচারিত। প্রসঙ্গতঃ শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় "ত্রিপুরার ইতিহাসে" লিখিয়াছেন—"তরফ, শ্রীহট্ট, লাউড় প্রভৃতি স্থানে যে সকল রাজবংশ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন, তাহারা অপ্রাচীন নহেন।"

২২. "শ্রীহট্ট নগরে বাস মগধ নৃপতি।"–বাবাম্বর নামক প্রাচীন একখানি পাঁচালীতে এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কোন মগধ দেশীয় রাজা এস্থানে উপনিবেশ করায়, ঐ নামে কথিত হইয়াছেন কিনা তাহা মীমাংসা করা কঠিন। শ্রীহট্টস্থ মগধ পর্ব্বতের নৃপতি, এইরূপ অর্থই সঙ্গত ও সুমীমাংসিত বোধ হয়।

২৩. আসামের ইতিহাস প্রণেতা মিঃ গেইট "অসুর" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টে নরকাসুরবংশীয় নৃপতিগণকে অনার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। "অসুর" শব্দে অনার্য্য নহে। এমন কি, ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় যে বৈদিক বরুণ দেব অনেকস্থলে অসুর বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। (ঋগ্বেদ ১। ২৪। ১৪ দেখ) ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য অসুর শব্দের অর্থ "প্রাণদাতা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; (১। ৩৫।১০ ঋগ্‌ভাষ্য দেখ); তবে অসুরেরা দেবদ্বেষী, এইমাত্র; বস্তুতঃ নরকাসুর পুত্র ভগদত্ত ক্ষত্রিয় নৃপতিই ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ কৃত গেইট সাহেবের ইতিহাস সমালোচনা পুস্তিকায় ৫ম পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে–"Asura means 'opposed to God,' hence we find the wicked Kansa, brother of Krisna's mother, styled sometimes as Asura. Narak and Bana, who were styled Asuras, were no Doubt Hindus in religion. From the fact that they were related to the Kshatriya princes."

নারীদেশ

জৈমিনি ভারতে অর্জ্জুনের স্ত্রীরাজ্য গমন ও যুদ্ধবৃত্তান্ত[২৪] বর্ণিত আছে। এই স্ত্রীরাজ্য শ্রীহট্টের সীমান্তবর্ত্তী জয়ন্তীয়া বলিয়া সুধীজন বিবেচনা করেন। এমন কি, শিশুপাঠ্য এ⌐খানা পুস্তকেও লিখিত হইয়াছে—"পুরাণ মতে জয়ন্তীয়া নারীদেশ নামে অভিহিত। অর্জ্জুণ যধিষ্ঠিরের অশ্ব মেধযজ্ঞের অশ্বসহ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে এই প্রদেশেব অধিশ্বরী প্রমীলা তাঁহার অশ্ব বাঁধিয়া রাখেন। অবশেষে তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হওয়ায় তাঁহার অশ্ব ছাড়িয়া দেন।"[২৫]

জৈমিনি—ভারতে দৃষ্ট হয় যে, স্ত্রীরাজ্য হইতে অর্জ্জুন তৎপার্শ্ববর্ত্তী মণিপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।[২৬]

২৪. জৈমিনি ভারত ২১শ অধ্যায় ১৩৪-৭ শ্লোক এবং ২২শ অধ্যায় ১-৯ শ্লোক দেখ।

২৫. আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ, ২য় সংস্করণ ২৭ পৃষ্ঠা।

২৬. কেহ কেহ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ত্তমান মণিপুর মহাভারতের মণিপুর নহে। মণিপুর সমুদ্রতীরবর্ত্তী ছিল এবং অর্জ্জুন মহেন্দ্রপর্ব্বত দর্শনান্তে মণিপুর উপস্থিত হন। উইলসন সাহেবই এই মতের প্রবর্ত্তক। কিন্তু আমরা প্রায় পঞ্চসহস্রবর্ষ পূর্ব্বকার বিষয়ে ঈদৃশ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে সাহসী নহি। বর্ত্তমান মণিপুরের লগতাক হ্রদ যে তৎকালে বৃহদায়তন না ছিল এবং সাগররূপে বর্ণিত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? পর্ব্বত, নদী, বা দেশ এক নামে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতির বহু উদাহরণ আছে। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় মিঃ গেইট সাহেবের ইতিহাস সমালোচনা পুস্তিকায় এই বিষয়ে লিখিয়াছেন:-Where there is land now. there might have been waters of the ocean then; and where there is now nothing but hills and forests, there might have been in those days plains of crowded population; and vice verse.---Arjuna, who guarded the horse, was met in Manipur by his wife Ulupi. The daughter of the Naga king and if the Naga Hills are what was styled the kingdom of the Nagas well established"-p. 16. নাগরাজকন্যা উলুপী মণিপুরে উপস্থিত হন, এ আখ্যান আলোচনায় এবং নাগা পহাড় ও মণিপুরের অবস্থান বিবেচনায়, বর্ত্তমান মণিপুর যে মহাভারত বর্ণিত মণিপুর নহে, তাহা অভ্রান্তরূপে বলা চলে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভাটেরার তাম্রশাসন

পূর্ব্বে লাউড়ে ভগদত্তের রাজধানী বিষয়ক যে জনশ্রুতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত শ্রীহট্টের প্রাচীনত্বের একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন "ভাটেরার তাম্রফলক।"

প্রায় পঞ্চত্রিংশ বৎসর অতীত হইল ভাটেরার "হোমের টীলা" নামক ক্ষুদ্র শৈলখণ্ডে আট ফিট মাটির নীচে ঐ দুখানা তাম্রফলক পাওয়া যায়। এই তাম্রফলকদ্বয়ে এক রাজবংশের উল্লেখ ও পাঁচজন মাত্র রাজার কীর্ত্তি কথিত হইয়াছে।

প্রশস্তিদ্বয় পাঠে এমন বোধ হয় না যে ইহারা কোন সম্রাটকল্প নৃপতির অধীনে করপ্রদ রাজা ছিলেন। ইঁহারা ক্ষমতায় নিজরাজ্যে স্বপ্রাধান্য স্থাপন করতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী কোন কোন ক্ষুদ্র রাজাকে পরাভূত করতঃ আপনাদের অধীনে রাখিয়াছিলেন বলিয়াই জানা যায়।

উভয় প্রশস্তি আলোচনায় নিম্নলিখিতরূপ বংশ তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারেঃ—

প্রথম-নবগীর্ব্বান;
|
তৎপুত্র-গোকুলদেব;
|
তৎপুত্র-নারায়ণদেব;
|
তৎপুত্র- কেশবদেব;
|
তৎপুত্র (৩য় পুত্র) ঈশানদেব।

এই রাজগণ চন্দ্রবংশীয় ছিলেন, ইঁহাদের পূর্ব্বে কে রাজা ছিলেন, এবং পরেই বা কাঁহারা তাঁহাদের সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছুমাত্র উপায় নাই, সুতরাং এই প্রশস্তিদ্বয় "শ্রীহট্ট ইতিহাসের একটি ছিন্ন পৃষ্ঠা" বলিয়া উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না। যা হোক, প্রশস্তিদ্বয়ের সারমর্ম সংক্ষেপে নিম্নে একত্রিত করা গেল।

রাজশ্রেষ্ঠ নবগীর্ব্বান প্রভাবশালী ও ধনুর্বিদ্যা বিশারদ ছিলেন, তৎপ্রতি কমলার বিশেষ অনুকম্পা ছিল।

বর্ত্তমান রাজার পিতামহ গোকুলদেব তাঁহারই পুত্র। গোকুলদেবের বীরত্ব-গৌরব শত্রুদের উৎসাহ শিথিল ও জড়ভাবাপন্ন করিয়াছিল।

তৎপুত্র নারায়ণদেব। মন্দর-মথিত সমুদ্র হইতে যেমন লক্ষ্মী উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তদীয় শরমথিত প্রতিপক্ষ নৃপতিসমুদ্রের মধ্য হইতে তিনিও উন্নত মস্তকে বাহির হইয়া আসিতেন।

তৎপুত্র কেশবদেব। তিনি অশেষ গুণকীর্ত্তিযুক্ত; তাঁহার পাদপীঠ রাজগণের মুকুটমণি দ্বারা শোভিত, তিনি রাজগণের মধ্যে ভূষণ স্বরূপ, এবং কংস-বিজেতা গোবিন্দের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী বিনাশক।

তিনি মনুষ্যত্বের সীমাভূমি স্বরূপ, যশের আবাসস্থান স্বরূপ, সৌন্দর্য্যের আশ্রয় স্বরূপ, সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষার আধার স্বরূপ; এবং ন্যায়ের আশ্রয় ও বদান্যতা, বাগ্মিতা, ভদ্রতা প্রভৃতি সর্ব্বসদগুণের আকর বা প্রতিমূর্তি স্বরূপ।

তিনি অস্ত্র সাহায্যে অধীন নৃপতিবর্গকে রক্ষা করেন, এবং শত্রুকে চক্রাস্ত্রে বিঘূর্ণিত করেন।

তিনি (নিকটে) রাজ্যান্তর দর্শনে অনিচ্ছুক হইয়া অস্ত্র সাহায্যে পৃথিবীকে একছত্রাধীন করিয়াছিলেন।

তদীয় কর কল্পপাদপরে, সৌর্য্য সূর্য্যের, যশ চন্দ্রের এবং বাহুবল পৃথিবীর পুনঃ স্থাপনে নিযুক্ত; তাঁহার চক্ষু আকর্ণ বিস্তৃত।

তদীয় তরবারী দ্বারা চতুর্দ্দিক বিজিত হইয়াছে; প্রাচ্য রাজগণের মধ্যে তিনিই প্রধান।

তদর্জ্জিত চন্দ্রকরোজ্জ্বল যশে পৃথিবী শুভ্র, শত্রুরূপী পদ্ম মুদ্রিত, ও সুভোগরূপী কুমুদ প্রফুল্লিত হইয়াছে।

তদীয় তেজ নির্ধুম বহ্নির ন্যায় প্রোজ্জ্বল,—শত্রুর নয়নবারিতে তাহা নির্ব্বাপিত হইবার নহে। এই অগ্নি পৃথিবীর চতুর্থাংশে আচ্ছাদিত আছে।

এই রাজা কোন যুদ্ধে দুই শ্রেষ্ঠ নৃপতির মধ্যে একজনকে ধনুর্গুণে স্বীয় মহিমায় বশীভূত করেন।

ফুল্লকরণের ন্যায় তদীয় গৌরব পৃথিবী প্লাবিত করতঃ সমুদ্র পার গিয়াছে।

তাহার ভক্তিতে অনাদি লিঙ্গরূপী ত্রিলোকনাথ ভগবান বটেশ্বর কেলাশ পরিত্যাগ করতঃ হট্টপাটকে বাস করিতেছেন।

পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিগনের মুকুট-চুম্বিত পাদপীট, রাজচূড়ামণি কেশবদেব তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে ৩৭৫ হল ভূমি ও ২৯৬ বাড়ী দান করেন।[১]

১. এই স্থানে দাতব্য ভূমির সীমাদি নিদ্দেশোপলক্ষে বহুতর অধুনা লুপ্ত প্রাচীন গ্রাম ও ইত্যাদির নাম কথিত হইয়াছে, পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে কয়েকটি লিখিত হইল।

অথিনহাটকে
অনীকাথী
অনিঘনাকোণার্ক
অথনাটভবিক
আখানিকৃত
আথাবী
আয়তনীক
উগডাট
উপপথ
(Foot path)
কডডিয়া
কাটাবাঙ্গুতে
ববনী
ববপঞ্চ
বদবসা
বড়গাম
বাঙ্কুত
বাড্ডা
বান্নুসীগাম
বেদাম্বুদি
বোবতুছানি

কানিয়ানী (নদী)
কতীমুতাক
কৈবাম
গূড়ডভাটপড়া
গুড়াবয়ী
গোবামী
গোপথ
(Cow way)
গোস্যয়া
ঘটীভূ
চাটপড়াদেবসত্র
জোগাবনিয়া
বোংবাকটায়ি
ভাটপড়া

ভোগডত্তাকনি
মহবাপুর
য়িথায়ীনগর
য়োডাতিথার্ক
শরগানদী
শিজ্জব

থাগন
দেগিগান
ধনকুণ্ডী
নবভাট
নডকূটীগাম
নবছাদি
নবপঞ্চাল
নাটয়ান
নেনৃবতাগ
পাছানিয়াঅথানি
পাকাদি
পিশ্রাপিনগর
সনাগজদাক
সাগর (sea)
সিহাডবগ্রাম
হট্টবব
হটীথানক
হট্টপাঠক
হড্ডিপগৃহ
হুহুকমহাসাহ

তিনি শিবানুরক্ত এবং শ্রীহট্টনাথ শিবকে বহুতর কৃতদাস এবং নানা জাতীয় ভৃত্য দিয়াছেন। এই ভূমি ২৩৮ পাণ্ডবকুলাধিপালাব্দে প্রদত্ত হয়।[২]

দ্বিতীয় প্রশস্তি খানা ঈশান দেবের ভূদান সম্বন্ধীয়। তাহাতে গোকুল দেব হইতে বংশাবলী আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রথমে নারায়ণের স্তুতিগান আছে; দ্বিতীয় প্রশস্তির সারমর্ম্ম এইরূপঃ—

দ্বিতীয় প্রশস্তির মর্ম্মার্থ

চপ্পবংশাবতংশ গোকুল দেবের জন্ম জন্য তদ্বংশ উজ্জ্বল হইয়াছিল; তিনি প্রার্থীর পক্ষে কল্পপাদক সদৃশ ও পৃথিবীর শান্তিদাতা সংরক্ষক ছিলেন। নারায়ণ দেব তাঁহার পুত্র। শস্ত্রসাগরে মন্দর ভূধরের ন্যায় তিনি গর্ব্বোন্নত ছিলেন; তাঁহার আকৃতি মাধুর্য্যময় ছিল।

তিনি কলা বিদ্যায় নিপুণ ও ধীর, বিনীত ও শৌর্য্যশালী, সভ্য ও সাহসী এবং ভব্য ও বিশ্বভূষণ স্বরূপ ছিলেন।

সাহসের প্রতিমূর্ত্তি কেশবদেব তাঁহার পুত্র। তিনি গোবিন্দের (কৃষ্ণের) ন্যায় শত্রু বিমর্দ্দক ছিলেন, তাঁহার পাদপীট রাজগণের মুকুট রত্নে ভূষিত হইত।

তদীয় গুণকীর্ত্তি শ্রবণে যে সব বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ আগমন করিতেন, অভীষ্ট লাভে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহারা নিজেদের জন্মস্থান ভুলিয়া যাইতেন।

তাঁহার শাসনকালে পার্শ্ববর্ত্তি রাজগণ নিজ ধনরত্ন কখন তাঁহাকে উপহার দিতে পারিবেন, এই চিন্তায় বিনিদ্র থাকিতেন।

অসংখ্য পদাতিক, সমরতরি, তুরঙ্গসেনা ও রণমাতঙ্গের অধিপতি সেই বিজয় কুন্দ-কুসুম শুভ্র যশে পৃথিবী গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

তিনি কংসনিসূদনকে এক আকাশস্পর্শী মেঘবিদারি উচ্চচূড় প্রস্তর মন্দির করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি "তুলাপুরুষ" দান করিয়াছিলেন; তাহাতে ব্রাহ্মণগণ এত ধন লাভ করবে যে, তাঁহারা সুবর্ণ ও রত্নাদিতে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কল্পবৃক্ষের সদৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শম্ভুনন্দন কার্ত্তিকেয়ের ন্যায়, রাজ-কুল-শশী ঈশান দেব তাঁহার পুত্র।

যখন ইঁহার পদাতিক, তুরঙ্গসেনা, রণমাতঙ্গ জয়ার্থ বহির্গত হয়, তখন সূর্য্যরশ্মি আচ্ছাদিত হইয়া থাকে।

(জলপথে) পালভরে প্রধাবিত তদীয় (সসৈন্য) সমরতরির গতিবেগে জলরাশি চতুর্দ্দিকে (স্থলদেশ পর্য্যন্ত) এতাদৃশ বিকীর্ণ হয় যে, (তাহা সংক্ষিপ্ত হওয়ায় তীরস্থিত) রৌদ্রতপ্ত তদীয় রথাশ্বগণ ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে। (অর্থাৎ উৎক্ষিপ্ত বারিকণা তীরস্থিত অশ্বগণের দেহস্পর্শ করায় তাহারা স্নিগ্ধতা অনুভব করে।)

এই গৌরবান্বিত রাজা মধুকৈটভারির জন্য অভ্রভেদি যে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহার ধ্বজা কোন বায়বীয় বৃক্ষের কুসুমের ন্যায় বোধ হয়। বৈদ্যকুল প্রদীপ বনমালী কর তাঁহার মন্ত্রী।

ইহারই সুমন্ত্রণায় গৃহ ও শস্য শোভিত দুই হাল ভূমি রাজকর্ত্তৃক (মধুকৈটভারির তুষ্টার্থে) প্রদত্ত হয়।

২. পরবর্ত্তী টিকাধ্যায়ে প্রশস্তির মূল প্রদত্ত হইবে।

এই সম্প্রদান; পুত্রহীন স্থবির রাজপুত্র এবং মৃত রাজপুত্রের কুল-পালিকা পত্নী ও বালক তনয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়।

যাঁহার যশ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই ক্লেশ সহিষ্ণু, সাহসী, সমর-প্রবীর সেনাপতি বীরদত্ত কর্ত্তৃক ইহা অনুমোদিত হয়। দাস বংশাবতংশ সুবিদ্বান মাধব ১৭ সম্বতীয় ১ বৈশাখে এই প্রশস্তি রচনা করেন।

(প্রশস্তি কথিত তত্ত্ব)

প্রশস্তিদ্বয় হইতে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি জ্ঞাত হওয়া যায়।

১. প্রশস্তি বর্ণিত রাজবংশাবলীর রাজগণ চন্দ্র বংশ সম্ভূত ছিলেন।[৩]

২. ইহাদের সকলই বীর, দাতা ও যশস্বী নৃপতি ছিলেন।

৩. নবগীর্ব্বান নামটি পৌরানিক যুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বোধ হয়। যাহোক নবগীর্ব্বান ও গোকুল দেবের শাসন কাল শান্তিপূর্ণ ছিল বলিয়া বোধ হয়; বর্ণনার আভাসানুসারে নারায়ণ দেবের শাসন সময়ে শত্রুগণের উৎপাতের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে জানা যায় যে, তদীয় শৌর্য্যে তাহারা পরাভূত হইতে ছিল এবং তিনি শত্রুসাগরে মন্দর গিরির ন্যায় অটল ছিলেন।

৪. এই বংশে কেশবদের একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করত; করপ্রদ করিয়াছিলেন এবং শস্ত্র সহায়ে তিনি তাহাদের রক্ষা বিধান করিতেন।

৫. তিনি পৃথিবীকে একছত্রাধীন করিয়াছিলেন ইত্যাদি বর্ণনা পাঠে বোধ হয় যে তৎকালে শ্রীহট্টে ক্ষুদ্র অনেকটি রাজ্য ছিল এবং তিনি তন্মধ্যে সার্ব্বভৌম নৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৬. যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি শত্রুদিগকে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত করিতেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। কেশব দেব ভগবান গোবিন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) ন্যায় শত্রু বিমর্দ্দক ছিলেন।

৭. তাঁহার সৈন্য সম্ভার যৎসামান্য ছিল না পুরাকালীন চতুরঙ্গ বিশিষ্ট ছিল।

৮. তিনি শিবভক্ত বলিয়া গণ্য হইলেও আকাশস্পর্শী প্রস্তরময় এক বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই প্রস্তর মন্দিরের নিদর্শন চতুস্পার্শ্বে কোথাও দৃষ্ট হয় না। কোন সুদীর্ঘ কাল গর্ভে তাহার ভগ্নাবশেষ বিলীন হইয়া গিয়াছে কে বলিবে?

৯. প্রাচীন কালে রাজা অথবা বিশিষ্ট ধনশালীগণ "তুলাপুরুষ" দান করিতেন। সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের তুলাপুরুষ দান করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে কথিত আছে। দাতা স্বদেহের তুল্য পরিমাণে স্বর্ণ ও রত্নাদি ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত দান করিতেন; ইহারই নাম তুলাপুরুষ। কেশব দেব শাস্ত্রোক্ত এই তুলাপুরুষ দান করিয়াছিলেন।

১০. কেশব দেবের সময়ে দুরদেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সভায় সমাগত হইতেন এবং তদীয় দাতৃত্বে ও ঔদার্য্যে এত কৃতজ্ঞ ও বিমোহিত হইতেন যে অনেকেই স্বদেশে ফিরিয়া

৩. পার্শ্ববর্ত্তী ত্রৈপুর নৃপতিগণও চন্দ্রবংশীয়। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলেন, "দ্রুহ্য হইতে যখন ত্রৈপুর রাজবংশ গণনা হইতেছে, তখন দ্রুহ্য হইতেছে হিন্দুনাম বজায় রাখিয়া একটা শাখা এই অঞ্চলে যে রাজত্ব করিতেছিল না, তাহাদি প্রমাণ কি? দ্রুহ্যর সন্তুতি মধ্যে এক শাখা হয়তঃ অসভ্যতর অবস্থান পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।" তিনি লিখিয়াছেনঃ—'They might have been as offshoot of the royal house of the neighbouring state of Tipperah who had, during some obscure period of history come and settled here and ruled for a century or two and then become extinct somehow, and so were heard of no more.'

-A critical study of Ms. gait's History of Assam. p. 19.

যাইতে ইচ্ছা করিতেন না।

১১. জ্ঞাত হওয়া যায় যে ইহাদের সমরতরি ছিল, অর্থাৎ জলযুদ্ধ করিতে হইত। এতদ্দ্বারা শ্রীহট্টের অংশ বিশেষ তৎকালে জলতলে ছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হয় না।

১২. ঈশান দেবের সময়েও প্রাচীন যুদ্ধ-রথ ব্যবহৃত হইত, বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন যুদ্ধরথের প্রচলন কত সুদীর্ঘ কাল পূর্ব্ব হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা ঈশান দেবের কাল নির্ণয় বিষয়ে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

১৩. ঈশান দেব বিষ্ণু উপাসক ছিলেন।

১৪. বৈদ্য আধুনিক জাতি নহে, পুরাণ সংহিতাদিতে ইহাদের উল্লেখ আছে।[৪] এই বৈদ্যবংশীয় বনমালী কর ঈশান দেবের মন্ত্রী ছিলেন। এই উপাধিও আধুনিক নহে।[৫]

ক্ষত্র-কুল-ভূষণ বীরদত্ত তাঁহার সেনাপতি ছিলেন।

মনুসংহিতাদিতে শূদ্রের দাসোপাধি ধারণের ব্যবস্থা দেখা যায়।[৬] শূদ্রজাতীয় মাধব দাস তাঁহার প্রশস্তির পদ্য রচনা করেন। দেবত্ত, বীরদত্ত, মাধব, গোবিন্দ নারায়ণ ইত্যাদি নাম যেমন প্রাচীন পৌরানিক যুগেও দৃষ্ট হয়, বনমালী নাম আপাততঃ তদ্রুপ বোধ হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের "বনমালী" নামটি আধুনিক নহে। অতএব ঈশান দেবের সময়ে শ্রীহট্টে বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, ও শূদ্র জাতীয় লোকের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়। হিন্দুরাজা যথায় ব্রাহ্মণ তথায় থাকিবেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

১৫. যদিও দ্বিতীয় প্রশস্তিতে ঈশান দেবের গুণগরিমা ও বীরত্ব বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে কেশব দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবেচনা করা যায় না। বর্ণিত হইয়াছে যে তদীয় ভূদান কালে তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্থবিরও পুত্রহীন ছিলেন। বার্দ্ধক্যে পুত্রহীন হওয়ায় সম্ভবতঃ তিনি স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ করতঃ পুত্র শোকে সময়াতিবাহিত করিতেছিলেন। স্থবির শব্দে বিশেষিত সেই সর্বজ্যেষ্ঠ রাজপুত্র, নিজ কনিষ্ট ভ্রাতাকে (অর্থাৎ কেশব দেবের দ্বিতীয় পুত্রকে)[৭] রাজ্য দান করিয়াছিলেন।

১৬. দ্বিতীয় প্রশস্তি লিখিত ভূদানকালে কেশব দেবের এই মধ্যম পুত্র ও জীবিত ছিলেন না, তিনি বিধবা পত্নী ও শিশু রাখিয়া পরলোকবাসী হইয়াছিলেন।

১৭. ইঁহার মৃত্যুর পরই (কেশব দেবের তৃতীয় পুত্র) সর্ব্ব কনিষ্ঠ ঈশান দেব রাজ কার্য্য চালাইতেছিলেন।

---

৪. 'ব্রাহ্মণাদ বৈশ্য কন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে"।-মনু ১০ অধ্যায় ৮ শ্লোক যথা বা-"অম্বষ্ঠ বিপ্রাদ্বৈশ্যায়ামুৎপুন্নঃ অয়ং চিকিৎসাবৃত্তিঃ বৈদ্যঃ ইতি খ্যাতঃ"
-শব্দকল্পদ্রুম ১ম খণ্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা

৫. "অথ অস্য বরেণেব খ্যাতো বৈদ্যাঃ মহাযশাঃ।
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেব করো ধর।"

৬. "শর্ম্ম বদ্‌ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রয়োঃ রক্ষা সমন্বিতং।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য পৈষ্য সংযুতং"-কুল্লুক ভট্টের টীকা

৭. (কেশবদেবের তিনপুত্র) ঃ-

কেশব দেব

১। 'স্থবির পুত্রহীন' রাজপুত্র।	২। বিধবা মহিষীর স্বামী শিশু পুত্রের পিতা, মৃত রাজপুত্র।	৩। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ঈশানদেব।

১৮. এই সময় পিতৃহীন বালকই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন বোধ করা অসঙ্গত নহে; এই জন্যই বিধবা মহিষী "কুলপালিকা" শব্দে বিশেষিতা হইয়াছেন; এবং এই জন্যই দুই হাল মাত্র ভূমি দান করিতেও ঈশান দেবকে স্থবিরতা বিধবা মহিষী ও বালকের অভিমত গ্রহণ পূর্ব্বক সেনাপতির অনুমোদনে কার্য সম্পাদন করিতে হইয়াছিল।

১৯. প্রশস্তিদ্বয়ের লিখিত ভূমি ভাটেরার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি হওয়াই সম্ভব। প্রথম প্রশ্বস্তিতে প্রায় শতাধিক গ্রাম ও নদী ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সেই প্রাচীন নাম গুলির মধ্যে একটি নামের সহিত ও (ঐ অঞ্চলের গ্রামাদির) বর্ত্তমান নামের মিল নাই। অনেকে অনুমান করেন যে হট্টপাঠক ভাটেরারই প্রাচীন নাম। দক্ষিণ শ্রীহট্টের মহরাপুরই (মৌরাপুর) বোধ হয় প্রশস্তি লিখিত মহবাপুর। "নবপঞ্চাল" বর্ত্তমান বরমচাল বলিয়া অনুমিত। ভাস্কর টেঙ্করী বর্ত্তমান টেঙ্গরা গ্রামের প্রাচীন নাম কি না বিবেচ্য বটে। প্রশস্তিতে 'গুড়াবয়ী" বলিয়া যে একটি নাম পাওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান "গুড়াভই" হইবে বোধ হয়। এই কয়েকটি নাম ব্যতীত অপর নামগুলি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়ায় পরিচয় করা একেবারে অসম্ভব। কানিয়ানী নদী, নাগাই নদী প্রভৃতির নামও এখন বিলুপ্ত। স্থানে স্থানে উল্লেখিত "গোপথ, শব্দের পরিবর্ত্তে শ্রীহট্টে এখন "গোবাটি" শব্দ প্রচলিত।[৮] 'ভাটপড়া"গ্রামের উল্লেখ একাধিক বার আছে, সম্ভবতঃ এই গ্রামটি বৃহত্তর ছিল; ইহাই ভাটেরার পূর্ব্ব নাম কি না, কে জানে?[৯] আবার "গাম" এই গ্রাম্য শব্দেরও ভূরি ব্যবহার পাওয়া যায়। জয়ন্তীয় পরগণায় গাম শব্দের অধিক প্রচলন।

অনন্তর এক স্থানে "সাগর পশ্চিমে" এইরূপ সীমা নির্দ্দেশ আছে। ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র, সাগর ইংরাজি sea (সমুদ্র) শব্দে অনুবাদিত করিয়াছেন। শ্রীহট্টের অনেকাংশ তখন সাগর গর্ভে নিহিত ছিল, ইহাই তাহার প্রমাণ। এবং কেশব ও ঈশান দেবের সমরতরি ব্যবহারের কথায় তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। হাইলহাওর ঘুঙ্গিয়াজুরী, কাগাপাশা প্রভৃতি উক্ত সাগরের শেষ নিদর্শন। নদী প্রবাহে নীত পলিতে হাওরগুলি ক্রমশঃ ভরিয়া যাইতেছে, অদ্যাপি এই ভরাট ক্রিয়া সমভাবে চলিতেছে. "সাগর" শব্দ হইতেই "সায়র" এবং শ্রীহট্টে তাহা হইতে "হায়র" বা "হাওর" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। (কেহ কেহ বলেন যে, হ্রদশব্দ হইতেই হাওর হইয়াছে।)

২০. শেষ কথা--কাল নিরূপণ। প্রথম প্রশস্তিতে ২৩২৮ যুধিষ্টিরাব এবং দ্বিতীয় প্রশস্তিতে ৭ সম্বৎ অঙ্কিত আছে। পণ্ডিতা রমাবাইয়ের ভ্রাতা মহারাষ্ট্রীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রথম প্রশস্তি ২৯২৮ যুধিষ্ঠিরাব্দের বলিয়া পাঠোদ্ধার করেন। প্রখ্যাত নামা পণ্ডিত রাজেন্দ্র লাল মিত্র ভিন্নরূপ পাঠ কল্পনা করেন। বস্তুতঃ কাল নির্ণায়ক অঙ্কগুলি অস্পষ্ট ও অপাঠ্য। কালনির্ণয় বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া তিনি গুরুতর ভ্রমে নিপতিত

৮ গোবর্ব্ব শব্দ হইতে গোবাট শব্দের উৎপত্তি; 'গোবাট' শব্দও একস্থানে আছে।

৯ অধ্যা শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেনঃ–একটা কথা বিবেচ্য। শিবের নাম বট্টেশ্বর, অথচ তাঁহাকে "শ্রীহট্ট নাথায়' বলা হইয়াছে। তাঁহার স্থান "হট্টপাটকে" নিরূপিত ছিল। এখন শিবের নাম বটেশ্বর এব, এই শিব হইতেই "বটেশ্বরেরহাট" নাম হইয়া বটেশ্বরের অপভ্রংশ হইয়া ভাটেরার বাজার হইয়াছে। বটেশ্বরের অপভ্রংশে "বটেহর" (যথা শ্রীহট্টের প্রামান্তর শালেশ্বর স্থানে হালেহর), তৎপর হকারের জোর রয়ের উপর পড়িয়া 'ভাটেরা' হইয়া থাকিবে। তারপর 'হট্টপাটকে' অর্থ হাটের একদেশে অর্থাৎ এক প্রান্ত শিবের স্থান ছিল: এই জন্য শ্রী-হট্টনাথায় অর্থাৎ শ্রীযুক্ত হট্টের অধিপতি (শ্রীহট্টপতি নহে) এই শেষ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।"

১০. প্রদীপ পত্রিকা-১৩১১ বাংলা কার্ত্তিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের লিখিত "ফকির শাহজলাল" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তবে দ্বিতীয় অঙ্কটির নির্দ্দেশ সম্ভবতঃ ডাঃ মিত্রেরই যথার্থ, তদনুসারে দ্বিতীয় অঙ্কটি তিন হইলে প্রথম প্রশস্তির কাল ২৩২৮ যুধিষ্ঠিরাব্দ হয়; (আমরা ইহাই স্থির রাখিযাছি), তাহা হইলে উভয় প্রশস্তিতে প্রায় ৮০ বৎসর বৈষম্য দাঁড়ায়। ইহা অমীমাংশ্য নহে। বিবেচনা করিতে হইবে যে, ঐ সময়ের লোক আমাদের ভগ্নজীবী ছিল না, এবং শূর কেশব দেবের প্রশস্তি তাঁহার রাজ্যাধিকারের সময়—প্রথম বয়সে প্রদত্ত ও তাঁহাকে দীর্ঘজীবী বিবেচনা কবিলে এবং তৎপব তদীয় দুই পুত্রের রাজ্যশাসনের পর বৃদ্ধ ঈশান দেব ১৭ সম্বতে ভূমিদান করেন অনুমান করিলে উভয় প্রশস্তিতে যে দীর্ঘকালের (৮০ বৎসর) বৈষম্য দাঁড়ায়,[১১] তাঁহার কোন প্রকারে সামঞ্জস্যা হয় কি?[১২]

যাহা হোক, এই প্রশস্তিদ্বয় যে খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বকার, একথা কি বলা যাইতে পারে না? গ্রামগুলির প্রাচীন নামের বিষয় ভাবিলে প্রশস্তির প্রাচীনত্ব বিষয় কিছুমাত্র সংশয থাকেনা। প্রায় শতাবধি নামের মধ্যে সকলটিই অশ্রুতনাম ও অপরিচিত, ইহা অল্প আশ্চর্য্যেব বিষয় নহে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর (পশ্চাদুক্ত) দান পত্রের লিখিত নামগুলিব সহিত বর্ত্তমানকালীয় গ্রামাদির নামের বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এই প্রশস্তিদ্বয় যে তৎপূর্ব্ব সময়েব, তাহা বলিতে আপত্তি কি? শ্রীহট্টে সংস্কৃত বহুল শব্দ পূর্ব্ব প্রচলিত ছিল, এবং সংস্কৃত দলিলাদি লিখিত হইত, তাহাব প্রমাণ আছে।[১৩]

দ্বিতীয়তঃ, কেশবদেব ও ঈশান দেব প্রস্তরময় অভ্রভেদি যে মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ কবেন, তাহাদের ভগ্নাবশেষ চিহ্নও এখন বিলুপ্ত ইহা কি কম প্রাচীনদের পরিচায়ক? প্রাগুক্ত তাম্রপত্র আট ফিট মাটির নীচে পাওয়া যায়; যে রূপের হউক, পর্ব্বতের শীর্ষদেশে আট ফিট মাটির স্তর পড়া সহজ কথা নহে। এ সমস্ত বিবেচনা করিলে তাম্রফলকদ্বয়কে খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যাইতে পারে কি না, পাঠক বিবেচনা করিবেন।

---

১১. বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণ, এবং রাজতরঙ্গিণী ও বরাহমিহির এই প্রত্যেকমতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বা যুধিষ্ঠিরের কাল বিভিন্ন হইয়া পড়ে। রাজতরঙ্গণী মতে (১) ৬৫৩ কলের্গতাব্দে কুরুপাণ্ডবগণ প্রাদুর্ভূত হন। কাশ্মীরের রাজা গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন। গোনর্দ্দ ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫১৩৫ হইতে (৬৫৩+৩৫=৬৯৯ বিয়োগ করিলে যুধিষ্ঠিরাব্দের কাল (৪৪৪৭ বর্ষ) যাওয়া যাইতেছে। তাহা হইতে ১ম প্রশস্তির ২৩২৮ বিয়োগে, প্রথম প্রশস্তির ভূদানকাল ২১১৯ বৎসর পূর্ব্বকার ঘটনা বলিতে হয়। ইহা হইতে ২য় প্রশস্তির সময়টি ১৯৪৭ বৎসর বিয়োগ করিলে উভয় প্রশস্তির ব্যবধান ১৭২ বর্ষ দাঁড়ায়।
কিন্তু বরাহমিহিরের মতে পিতাপুত্রের তফাৎটা খুব কমিয়া যায়। তাহার মতে শালিবাহনের সালে ২৫২৬ যোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের কাল পাওয়া যায়।
যথা–"আসন মঘানু মৃনয়ঃ শাসিন্তি পৃথিবীং যুধিষ্ঠির নৃপতৌ।
ষড়দ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃ শক কালস্তস্য রাজ্যশ্চ।"–বারাহী সংহিতা ১৩ অধ্যায়। অতএব বারাহীমতে (বর্ত্তমান সম্বৎ ১৮২৯+২৫২৬)= ৪৩৫৫ যুধিষ্ঠিরাব্দ পাওয়া যাইতেছে; তাহা হইতে প্রথম প্রশস্তির ২৩২৮ সংখ্যা বিয়োগে যে ফল হয়, তাহা প্রথম প্রশস্তির কাল, এবং ইহা হইতে ২য় প্রশস্তির সময়টা (১৯৪৭) বাদ দিলেই উভয় প্রশস্তিতে অর্থাৎ পিতাপুত্রের সময়ে ৮০ বৎসর মাত্র ব্যবধান দাঁড়ায়। যথাঃ-৪৩৫৫-২৩২৮=২০২৭-১৯৪৭=৮০।
১. "শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্রয়োধিকেষু ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবা"।–রাজ তরঙ্গিণী ১ম তরঙ্গ

১২. প্রথম তাম্র ফলকে "নন্দ" শব্দটি শ্লিষ্টার্থে শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ('শিতনন্দকেন') মহাভারতে শ্রী কৃষ্ণের গোপলীলার উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু হরিবংশে ইঙ্গিতাভাস আছে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে স্পষ্টত; তাহা বর্ণিত আছে। (যিনি যাহাই বলুন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকেও আমরা নিতান্ত আধুনিক বলিতে রাজি নহি।) মহাভারতে গোপলীলার উল্লেখ নাই বলিয়া গোপলীলারক সমস্ত বিষয়কেই পৌরাণিক যুগের পরবর্ত্তী নির্দ্ধারণ করা সুসঙ্গত নহে। এই জন্য তাম্র ফলকের বয়সহ্রাস করিতে যাওয়া সমীচীন হয় না।

১৩. ২য় ভাগ ২য় অধ্যায়ের পাদটীকায় উদাহরণ স্বরূপ ঐরূপ একখানি দলিল উদ্ধৃত করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকা

নবাবিষ্কৃত না হইলেও ভাটেরা তাম্রফলকদ্বয়ের বিষয় সমালোচ্য বটে। এ জিলার অন্তর্গত ভাটেরা নামক স্থানের একটি টীলা "হোমের টীলা" বলিয়া কথিত হয়। পরম্পরাগত ঐ নাম চলিয়া আসিতেছে। টীলাটি কেন যে ঐ কথিত হয়, তাহা কেহ জানে না। ১২৭৯ বাংলায় তত্রত্য জমিদার দেব চৌধুরীর অনুমতি মতে কোন কার্য্যবশতঃ শেখ কটাই নামক এক ব্যক্তি ঐ স্থান খনন করায় এক ইষ্টকমন্দিরের ভিত্তি ও আট ফিট মাটির নীচে দু'খানা তাম্রপত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীহট্টের তদানীন্তন ডিপুটী কমিশনার জনসন সাহেব প্রথমেই ইহা পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে প্রদর্শন করেন; (এই মহারাষ্ট্র পণ্ডিত তৎকালে শ্রীহট্টে উপস্থিত ছিলেন), তিনিই ইহার গ্রন্থ্ পাঠোদ্ধার করতঃ এতৎসম্বন্ধে এক প্রস্তাব লিখেন।

উভয় প্রশস্তিই উপরে ছিদ্র বিশিষ্ট সমচতুষ্কোণ তাম্রফলকে খোদিত। তন্মধ্যে শেষ দেবের প্রশস্তি ১২×১১´´ ইঞ্চি ও ঈশান দেবের প্রশস্তি ৮×৬´´ ইঞ্চি আকার বিশিষ্ট এবং যথাক্রমে উভয় তাম্রপত্র ২৯+২৮ ছত্র এবং ১৬+১৬ ছত্র অক্ষর অঙ্কিত আছে। প্রশস্তি দ্বয়ের অক্ষর দেবনাগর।

প্রথম প্রশস্তির মূল

(ছত্র সংখ্যা-সম্মুখভাগ।)

১. ওঁ শিবায়॥ যঃ কর্ত্তাভুবনহত্রয়স্য তদুভিবিশ্বং পৃথিব্যাদিভির্যস্যেদং ধ্রিয়তে য ঈশ্বর ইত খ্যাতো—

২. ভবান্নাপরঃ। যঃ সংজ্ঞাত্রয়মেক এব ভজতি ত্রৈগুণ্য ভেদাশ্রিতো
ব্রহ্মোপেন্দ্র মহেশ্বরেতি জগতামীশায়

৩. তস্মৈ নমঃ॥ ত্রিপুরহরশিরঃ কিরীটরত্নং স্মরযুবতেরভিষেক
রৌপ্যকুম্ভঃ কুসুম বিশিখবাণ শাণ চক্রং

৪. জয়তি নিশাতিলকস্তুষার রোচিঃ॥ বংশেস্য ভূমি পতয়ঃ কতিতে
নিষ্পার পৌরুষা জাতা:॥ যেষাং যশঃ—

৫. প্রশস্তির্ভূবি ভারত সংহিতৈ বাস্তি॥ অথ বিশ্রুত প্রভাবঃ
প্রভবঃ স্বচ্ছরাজ্য কমলায়াঃ। সমজনি নবগীর্ব্বা—

৬. ণঃ খরবাণঃ ক্ষ্মাভূজাং শ্রেষ্ঠঃ॥ তস্যাত্মজো রাজপিতামহোভূৎ
মহীপতির্গোকুল দেব নামা। যস্য প্রতা—

৭. পার্করুচোপি চিত্রং দিশন্ত্ররিক্ষ্মাপতিজাড্যমুদ্রান্।
তস্মাদমন্দ ভুজমন্দর মথ্যমান প্রত্যথি পার্থিব

৮. সমুদ্র সমুদ্ধৃত শ্রীঃ। নারায়ণোহজনি মহীপতিরন্বকারি
যেন স্বয়ং স ভগবান শ্রিতনন্দকেন॥ তস্মাদসী—

৯. মগুণ-গৌরবগীতকীর্ত্তির্ভূ পালমৌলি মণিমণ্ডিত পাদপীঠঃ।
শ্রীমান ক্ষিতীন্দ্র তিলকো রিপুরাজ

১০. শোষী গোবিন্দ ইত্যজনি কেশব দেব এষঃ॥
যঃ সীমাদ্ভুত পৌরুষস্য যশসাংরামশ্রিয়া মাশ্রয়োবিদ্যা

১১. নাং র্বসতির্ণয়স্য নিলয়ো ধাম্নান্তদেকস্পদং।
ত্যাগস্যায়তনং বিলাসভবনং বাচঃ কলানাং নিধিঃ।
১২. সৌজনস্য নিকেতনং বিজয়তে মৃত্তোর্কাগুণানাং গুণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমুদ্ধৃ তক্ষিতিভৃতাং সংক্ষ্য গোমশু
১৩. ল সদ্‌বৃন্দাবনমাদরেণ বিদধৎ উচ্ছিন্নকং সোৎসবম।
শ্রীমৎ কেশবদেব এষ নিরতং চক্রেহবশেষৎ রূষা য
১৪. ত্রৈকং শিমুপালমপ্যরি কুলে ক্ষিপ্তারিচক্রো নৃপঃ।
কৃত্বা যেন ভূজৌজসা বসুমতি মেকাত পত্রামি
১৫. মাং লোক্যেস্মিন্নভিলষ্যতে বিজয়িনানন্যাধিকার স্থিতিঃ।
পাণিঃ কল্পতরোঃ দে দিনকৃতঃ কৃত্যে
১৬. প্রতাপোযশঃ শীতাংশোবিষয়ে ন্যধায়িভূজগা
ধীশাধীকারে ভূজঃ॥ যস্মিন শাসতি নিখিলামা
১৭. দিমহকীপাল দীক্ষয়া ক্ষৌণীম্। শ্রুতিপথ লঙ্ঘন
সাহসমাসীৎ কান্তাদৃশামের॥ আয়ং সুহৃচ্চক্র
১৮. মুদং বিভাবয়ন প্রসাধিতাশঃ করবাল লীলয়া।
সুদুরমুৎসারিত রাজমণ্ডলো ররাজপূর্ব্বাবলিভৃৎ।
১৯. শিরোমণি:॥ করোতি ধ্বলংজগৎ বিলয়তেহরি—
পদ্মোদগমং তনোতি কুমুদং যশঃ সদৃশমস্য চ—
২০. দ্রোজ্জ্বলং। সিতং কিমথরঞ্জকং ভ্রমদনারতং কিং
স্থিরং সকারণমিদঞ্চ সৎ কিমিব নিত্যমিত্যদ্ভু—
২১. তম্॥ বাষ্পৈরুর্ব্বীপতীনাং যদয়মনুসিতোহমূর্চ্ছিতো
যদ্রিপূণাং কীলালৈর্যত্তনোতি দ্বিষদবনিভূজাং
২২. জাড্যমচ্চিবিতানৈঃ। কাষ্টপনাং যদ্ব্যতীতপ্রকর
মুপযযাবম্বরং লেলিহানস্তেনাশ্চ র্য্যৈকসীমা জয়তিনর
২৩. পতেঃ কোপি তেজঃ কৃশানুঃ॥ ক্ষৌণীভূজা যুগপদা
হবসঙ্গতেন তেনোন্নতদ্বয়মনামি গুণদ্বয়েন একে
২৪. ন কার্মুকমসীম সহঃ প্রকর্ষগম্যেন বৈরিনিবহঃ
সহসাপরেণ॥ মহীভূজাজীয়ত চন্দ্রহাসকরেণতে
২৫. নামিত বিক্রমেণ। বিলঙ্ঘিখতানেকপয়োধিনেয়ং স্বৈনৈব
কৃৎস্না যশসা ধরিত্রী॥ তথাস্তি কৈলাস নি—
২৬. বাস নিস্পৃহঃ কৃতাবতারো ভুবি হট্ট পাটকে।
অনাদিরূপো জগদাদিরপ্যয়ং ত্রিলোকনাথো ভগ—
২৭. বানবটেশ্বরঃ। শশিশেখরায় তস্মৈ নৃপশেখররত্ন
বিস্ফুরচ্চরণঃ। প্রদদৌ নানাগ্রামে নিখিল নৃপ—

১. গ্রামণীরেষঃ॥ অধিকং পঞ্চসপ্তত্যা ভূহলানাং
শতত্রয়ং। শতদ্বয়ঞ্চ বাটীনাং ষণ্ণবত্যা সমন্বিতং॥ নানা

২. পরিজনাংস্তস্মৈ জনজাতীরনেকশঃ। প্রাদাৎ শ্রীহট্ট
নাথায় শিবায় শিবকীর্ত্তনঃ॥ চাটপড়াদেবসত্রে ভূহ

৩. ল ৩৫॥ বাটী ১১০ বড়গ্রামে ১৩ মহবাপুরে বাটী ১
হটীথানাকে ভূহর ৭ বাটী ৬ দেহিগানোত্তরে ভূহল ১ নব-

৪. পঞ্চালে ভূহল ৫ বাটী+আয়তনীকে+হল ৭ শিড্ডবে বাটী ১
অমনাটেভবিকে ভূহল ৬ গুড়াবয়ীকে বাটী ৩ কটাবাঙ্গ-

৫. তে ভূহল ৩ অথানিকৃতেঞ্চনীঘনাকোণার্কে বাটী ১ যিথায়ি
নগরে ভূহল ১৭ বাটী ৪ নেন্নবতাগে বাটী ৬ যোড়াতি-

৬. থার্কে ধৃতকব ভূহল ৩ বাটী ১১ কৈবামে হলা বাটী ১
বালুসী গামে হল ৫ নবছাদি পশ্চিমে হল+++ভূহল ৫ বা

৭. টী + অথিনহাটকে ভূহল ৫ বাটী ৮ কডডিয়া দক্ষিণে
গোস্যয়া পূর্ব্বে গোবাটোত্তরে ববনী পশ্চিমে

৮. ভূহল ১৮ সবগানয়ো দক্ষিণে ভূহল ৫ বাটী ৩ তথা
নদ্যুত্তরে ভূহল ৩৫ বাটী ১৩ তথা নদ্যত্তরে বাটী—

৯. সস্তপূর্ব্বে বাটী ১ তথা নদ্যুত্তরে বাটী—
সর্ব্বভূ দক্ষিণে ভূহল ৭ কানিয়ানী নদ্যুত্তরে যেগমডগণি—

১০. য়া পূর্ব্বে ভূহল ৮॥ বাটী ৭তথা নদী দক্ষিণে থবসোন্তী পূর্ব্বে
ভাস্কর টেঙ্করী পশ্চিমে ভূহল ১৫ বাটী+

১১. জগায়ান্তরে নাটয়ান গ্রামদ্বয়ে ভূহল ৫ বাটী ৩০
সমাগয়ড়াকে অনীকাথী পূর্ব্বে সাগর পশ্চিমে ভূ-

১২. হল ১০ কানিয়ানী নদী দক্ষিণোত্তরে ভূহল ৮॥
নাগায়ি নদী দক্ষিণে ভূহল ৬ বাটী ১০ ভোগাডত্তবাত

১৩. ডোত্তরে ভূহল ৯ বাটী ৯ তথোগাসনে পশ্চিমে হট্টব
বোত্তরে ভূহল ৭ বাটী ১০ সাহকোপপাদক্ষিণে বড়সোচ—

১৪. স ভূহল ১০ চেদগম্বুড়ীকে ভূহল ৩ বাটী ১ আডানকাথীকে
বাটী ৭ ভূকে +গ+নদ্যানীকে বাটী ৭মে+পরা-

১৫. ক বাটী ১ ভূকে উপংসিবো পূর্ব্বে আথাবীভূহল ৮০ বাটী ১৩
নডকুটী গামে বাটী ৮ তথাগামে থাগন-

১৬. দুত্তরে বাটী ৬ ভূকে + গোস্তেপপাত পূর্ব্বে গোপথ+
ত্তরে হডীগঙ্গ দক্ষিণে ধনকুণ্ডী পশ্চিমে কবগা

১৭. সনস্থল ৫ পছানিয়া অথানি উতাক ভূহল ১০+ দ্য
দেবগাসন পূর্ব্বে ভূহল ৫ বো বাড্ডা দক্ষিণে

১৮. জোগাবনিয়া উত্তরে বাটী ১ ভাটপড়াকে কেদাফা
দিবাবগুঢ ১০ তথাকেতীমৃতাকাদী গোপগুড

১৯. তথা বা + পাকাদি তে নৃড্ড তথাকেকাস্য
নোবিন্দাগৃহ ১ বড়গামে গোপগদা ১ তথাকে আবপা-
২০. নাকাদিবাবগৃহ ৭ ভোগডত্তাবনি নিমাবশূয়।
তে গুড্ড ভাটপড়া ছটাথানা। ন+ উসড়াকানি গুড়
২১. মাটপড়া ববপঞ্চ তক্‌পথাননি বিবাকবাকাদিসানা
গূড্ডভাটপড়া নিমেবাকাদি গো গূড্ডভাট-
২২. পড়া নিজাপিত গোতিনু। গৃহ ১ রজকসিবসম্পাগৃহ ১
ববাতুছানি বংবাবাটায়ি পাকাকীয়গৃহ ৫
২৩. তথা। নিডো+ বে++কাদিগৃহ ৫ নবভাট। নিডো+
ভাট পাকাদি গৃহ ৩ ভাটপড়া নিবাপ পাকা-
২৪. দি হড্ডিপগৃহ ২ পিশ্রাপি নগরে দ্যোন্যেনবিকা+
দি গৃহ ৩ সিহাডব গ্রামে দন্তক বিবজবি গোগৃহ ১
২৫. কোদ্যী হুহুক মহাসাহুটো কোদ্যীসহুণ কোদ্বীনো
কৃতাং বুঢোভাং হবিষট্টোদ্বপত্র আসি এ ন পিথুয়া
২৬. আপিয়াবে ভাল + ড দয় আকাদয়ঃ প্রদত্তাঃ॥
বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভি: সগরাদিভি র্যস্য যস্য
২৭. যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলং॥ স্ব দত্তাং পরদত্তাং বা
যো হরেত বসুন্ধরাং স বিষ্টায়াং কৃমির্ভূত্বা পি-
২৮. তৃভিবঃ সহ পচ্যতে। পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ ২৩২৮।
যে যে স্থলে সংখ্যা কি অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে, তথায় (+) চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশস্তির মূল

১. ওঁ নমো নারায়ণায়॥ মহানীলমণিশ্যামঃ সুবর্ণরুচিরাম্বরঃ পা-
২. তু বঃ কমলাকান্তঃ সবিদ্যুদিব বারিদঃ॥ তুগোত্তুঙ্গতমস্তোম নাগ-
৩. যুথমৃগাধিপঃ। মৌলিরত্নং মহেশস্য জয়ত্যমৃত দীধিতিঃ॥ তদন্বয়েভূ-
৪. ভুবনাবতংসঃ ক্ষীরোদযোপ্রোজ্জ্বল কীর্ত্তিরাশিঃ। সশস্র তৃন্মণ্ডুল হংসসার্থ
৫. কল্পদ্রুমো গোকুলভূমিপালঃ। তস্যাত্মজঃ শস্ত্রভৃতাংবিশিষ্টঃ সম্ভ্রান্তশত্র
৬. র্নবমন্দরাদ্রিঃ। শ্রিয়াহৃদা সঙ্গতমঞ্জুমূর্ত্তি র্বভূব নারায়ণ দেব এষঃ॥ নিধিঃ ক-
৭. লানাং ভবনং গুণানাং শৌর্য্যস্যরাশি বিনয়স্য ভূমিঃ। সৌজন্য পথোনিধি র-
৮. ন্নতশ্রীঃ প্রজ্ঞাত কীত্ত্বিভুবনাবাংতংসঃ॥ তস্যোন্নতেজা রিপুরাজ শোষী গোবি-
৯. ন্দবীরো দ্রুমনাথসংজ্ঞ। ক্ষ্মপালচূড়ামণি মণ্ডিতাড়্‌ঘ্রিঃ পুত্রোহভবৎ কেশ-
১০. ব দেবদেবঃ॥ গুণৈর্যদীয়ৈঃ শ্রবণাভির মৈরাকৃষ্যমাণা গুণিনঃস-
১১. মন্তাৎ। আগত্য সম্পন্ন মনোরথাশ্চ ন সস্মরুজর্ন্মভূবং দ্বিজেন্দ্রাঃ॥
১২. যস্মিন্ মহীংশাসতি ভুমিপাল নিদ্রাং রজন্যামপি নাধিজগ্মুঃ। সন্ধি
১৩. স্তয়ন্তঃ পরিতোষহেতোরমুষ্য বিশ্রাণয়িতুং বসূনি॥ নিঃসীম নৌবাটকপ-
১৪. ত্তিবাজি প্রভিন্ন দন্তাবলমৈন্য সম্পৎ। স রাজরাজঃ কুমুদাবদাতৈ র্যশো-

১৫. ভিরুব্বীং বিমলী চকার॥ স মন্দিরংকংশনিসূদনস্য শিলাভিরুচ্চৈর্বিদধে
১৬. মহৌজাঃ। যত্তুঙ্গশৃঙ্গস্থিতচক্রধারাক্ষাতঃ ক্ষরন্ত্যম্বুগনাদিবস্থাঃ॥

১. তুলাপুরুষদানস্য সম্প্রাপ্য দ্রবিণন্দিজাঃ। কল্পবৃক্ষাইবা ভুবন্ হেমাল
২. ঙ্কার ভূষিতা:॥ তস্মান্মহেশাদিব বাহুনেয়ঃ পীযুষরশ্মেরিব রৌহিণেয়ঃ।
৩. শ্রীমানভূন্নির্ম্মলকীর্ত্তিরাশিরীশানদেবঃ ক্ষিতিপালচন্দ্রঃ॥ যজ্জৈত্রযাত্রাপ-
৪. চলৎ পদাতিতুরঙ্গ দন্তাব লসৈন্যকীর্ণেঃ। রজোভিরুর্ব্বাঃ পরিমৃষ্যমানস্থ-
৫. ন্নোন্মহাঃ সন্ন্যমিনীলদর্কঃ॥ যদীয় নৌবাটককেলিপাতঘাতোচ্ছলদ্বারিভিরু-
৬. গ্ররশ্মেঃ। রথৈস্তরঙ্গে রভিসন্তপদ্ভিঃ সন্তাপশান্তিঃ সুতরামলম্ভি॥ বিনি-
৭. র্ম্মমেসৌ মধূকৈটভারেঃ প্রাসাদমভ্রংলিহমূর্জিতশ্রীঃ। যত্তুঙ্গশৃঙ্গপ্রচলং। পতাকা-
৮. নভস্তরোর্মঞ্জকের ভাতি॥ এতস্য পৃথিবীভর্তুরাজপট্টকৃতী। বৈদ্য বং-
৯. শপ্রদীপঃ শ্রীবনমালিকরোভবৎ॥ তস্যবিজ্ঞাপনাদ্ধু পঃ শাসনংকৃতবানয়ম। রাজপু-
১০. ত্রো যঃ স্থবির পুত্রশূন্যঃ স্বহস্ততঃ॥ পাল্যং ভূহলদ্বয়ং সভাস্থশস্যবিস্তৃতং
১১. মৃতস্য রাজপুত্রস্যপত্নী যা কুলপালিকা। শিশুশ্চতনয়ঃ তস্যাপাল্যমেব তয়ো-
১২. রপি॥ আদেশিকভূৎ সমর প্রবীরঃ শ্রীবীরদত্ত পৃতনাধি নাথঃ। দিগ-
১৩. ন্ত সংক্রান্ত যশ; প্রশস্তিঃ প্রতাপভানূর্জ্জিতধৈর্য্যরাশিঃ॥ স্বদত্তাংরদত্তাং বা যো-
১৪. হরেত বসুন্ধরাং। স বিষ্টায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহপচ্যতে॥ এতাং
১৫. প্রশস্তিং বিদধে বিবেকী শ্রীমাধবদাসকুলাবতংসঃ। যাবৎ সমুদ্রা গিরয়শ্চ-

উদ্ধৃত প্রশস্তিদ্বয়ের মর্ম্মার্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহার কাল নির্ণয় নিয়া কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে। প্রশস্তির প্রথম পাঠোদ্ধারক মহারাষ্ট্র পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, কেশব দেবের প্রশস্তির সময় ২৯২৮ যুধিষ্ঠিরাব্দ বলিয়া অনুমান করেন। ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র এই প্রশস্তিদ্বয়ের দ্বিতীয় পাঠোদ্ধারকারক। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের আসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে তদীয় মত প্রকাশিত হয়। তিনি কেশব দেবের ভূমিদান কাল ৪৩২৮ যুধিষ্ঠিরাব্দ বলিয়া অনুমান করেন। তিনি "অনুমান" মাত্রই করিয়াছেন এবং কাল নিরূপণে বিশেষ সন্ধিহান হইয়াছেন। তথাপি এ ক্ষেত্রে তিনি গুরুতর ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্র ও ডাঃ মিত্র ইঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন দুইমতের মধ্যে কোনটি যথার্থ?

ডাঃ মিত্র লিখিয়াছেন—"In the original the first figure is very Unlike the third, and has been morover seratched over, and is abundantly doubtfu. The second is also open to question. I am disposed to take the first for a 4 and the second for 3, which would make the date equal 4328=1245 AD. or about the time when Shah Jellal invaded Sylhet. That the Gobinda of the Tillah is the same with that the record I have no reason to doubt." (Proceedings, Asiatic Society of Bengla for August, 1880.)

সত্য অনেক স্থলে বড় কঠোর। সত্যের অনুরোধে আমরা ভারত বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার মিত্রের ভ্রম প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইতেছি। ক্ষুদ্র লেখকের ইহা দাম্ভিকতা নহে, ধৃষ্টতা নহে,—কর্ত্তব্যানুরোধে আমাদিগকে বাধ্য করিতেছে।

প্রথমতঃ গোবিন্দ নামক কোন রাজার বিষয় প্রশস্তিতে লিখিত হয় নাই, ইহা ডাঃ মিত্রের কল্পনা। তিনি শ্রীহট্ট প্রদেশের গোবিন্দ ও শাহজালালের আখ্যায়িকা শুনিয়াছিলেন। পরে কেশব দেবের প্রশস্তিতে "গোবিন্দ ইত্যজনি কেশব দেব এষঃ" স্থলে "গোবিন্দ" পাইয়াই কেশব দেবের নামান্তর কল্পনা করিয়া বসিলেন। এই গ্রন্থের অন্যত্র শাহজালাল-পরাজিত গোবিন্দ নামক রাজার বিবরণ লিখিত হইবে। সেই গোবিন্দের সহিত কেশব দেবকে অভিন্ন কল্পনা করাই ডাক্তার মিত্রের প্রথম ভ্রম।

প্রথম প্রশস্তির নবম শ্লোকের তৎকৃত অনুবাদঃ—"This Kesava Deva (alies Govinda) who had whirled his discus at his enemies,' এবং অন্যত্র "Who was the ornament of earthly sovereigns, the destroyer of rival kings even as Govinda (The God Krisna) himself." স্বয়ং এইরূপ লিখিয়াও কোন সূত্রে কেশব দেবের নাম গোবিন্দ কল্পনা করিলেন, বুঝিতে পারি না।

শাহজলাল বিজিত রাজা গোবিন্দের নামের দিকে লক্ষ্য থাকায়, তিনি সময়টাকে শাহজলালের সময়ে টানিয়া নিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। উপায়ও মিলিল;-প্রথম অঙ্কটা অপাঠ্য! যদি প্রশস্তির সময়জ্ঞাপক প্রথমাঙ্ককে '৩' বলেন, শাহজলালের সময়ের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইয়া যায়; এবং '৫' বলিলে আধুনিক সময় হইয়া পড়ে; কাজেই ঐ অঙ্কটিকে '৪' বলিয়া, '৪৩২৮' যুধিষ্ঠিরাব্দই প্রশস্তির সময় বলিয়া কল্পনা করা হইল। কিন্তু ৪৩২৮=১২৪৫ খৃষ্টাব্দও যে শাহজলাল এবং তৎকর্ত্তৃক পরাজিত গৌড় গোবিন্দের সময়ের প্রায় ১০৭ বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী? এই বৈশম্যের কোনরূপ মীমাংসা নাই। একমাত্র প্রদীপ পত্রিকায়[১৪] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ব্যতীত এই বৃহৎ ভ্রমের আর প্রতিবাদ কেহ করেন নাই। শাহজলাল এবং তৎকর্ত্তৃক বিজিত গৌড় গোবিন্দ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক, ঐ সময়কার বহুতর ব্যক্তির বংশভূমিকার পুরুষ গুণনায় নিঃসন্দেহে তাহা বলা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সুবিজ্ঞ ব্যক্তি বর্গেরও এই মত।

ডাঃ মিত্র প্রশস্তিতে কেশবদেবের কীর্ত্তি পাঠ করিয়া,—যাহাকে গোবিন্দদেব নাম প্রদান করিয়াছেন, জানিয়াছেন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ। বীরপুরুষকে পরাজয় করা বীরত্বের কার্য্য, বীরপুরুষ ব্যতীত কোন সংসারত্যাগী ব্যক্তি তাহাতে সম হওয়া কঠিন, অতএব তিনি লিখিয়াছেনঃ—

The prince was overthrown by Shah Jellal alias Jellaludin khany. who following the footsteps of his predecessor Muik Tuzbek, led his army to the eastern parts of Bengal invaded Sylhet in 1257 A. D."

এ স্থলে তাঁহার উদ্যম আর এক পদ অগ্রসর হইয়াছে। প্রশস্তির স্বনির্ণীত ১২৪৫ খৃষ্টাব্দের সহিত শাহজলালের সমসাময়িকতা প্রদর্শন করিতে হইবে; কাজেই বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ জেলালুদ্দিন খানির নামান্তর শাহজলাল ছিল বলিয়া কল্পনা করা হইল; এবং তাঁহাকে একবারে শ্রীহট্টে আনিয়া শ্রীহট্ট বিজয়ের যৎসামান্য যশও তাঁহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু যদি তিনি একটু অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলেই জানিতে পারিতেন যে, শ্রীহট্টের শাহজলাল সংসারবিরাগী সাধু ব্যক্তি ছিলেন, তিনি যুদ্ধব্যবসায়ী জেলালুদ্দীন খানি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।[১৫]

১৪. প্রদীপ, কার্ত্তিক-১৩১১; "ফকির শাহজলাল" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৫. See the Statistical Accounts of Assam VOL. II. by W. W. Hunter And also The History and Statistic of Dacca Division.

একটু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিতেন যে, শ্রীহট্টের শাহজলালের পিতা এবং জেলালুদ্দীন খানির পিতা ভিন্ন ভিন্ন নামীয় বিভিন্ন ব্যক্তি, উভয়ের জন্মস্থানও বিভিন্ন, কাজেই তাঁহারা ভিন্ন ব্যক্তি। উভয়ে যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহার প্রমাণ তল্লিখিত প্রসিডিং এই আছে, তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীহট্ট বিজেতা জেলালুদ্দীন, ইরসিলান খাঁর আক্রমণ হইতে গৌড় ভূমি রক্ষা করিতে গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।"[১৬]

শাহজলালের জীবনবৃত্ত "সুহেল-ই-এমন" ও তদনুবাদ "তোয়ারিখে জলালি" গ্রন্থে, শাহজলাল শ্রীহট্ট হইতে অন্যত্র গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, এমন প্রসঙ্গ নাই। শ্রীহট্ট বিজেতা দরবেশ শাহজলালের শ্রীহট্টেই মৃত্যু হয়, শ্রীহট্টেই তাঁহার মৃত দেহ সমাহিত হয়. সেই সমাধি ক্ষেত্র অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।[১৭] এবং তাহা এক অতিপ্রধান মোসলমানতীর্থে পরিণত হইয়াছে।[১৮] এই সমাধির ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অদ্যাপি গবর্ণমেন্ট মাসিক হিসাবে সাহায্য করিতেছেন। শ্রীহট্টের শাহজলালের দরগা আবাল বৃদ্ধ সকলের কাছেই সুপরিচিত, তাই বলিতেছিলাম সামান্য একটু অনুসন্ধানের অভাবে এত বড় পণ্ডিত ব্যক্তির এরূপ হাস্যকর ভ্রম হইয়াছে।

আর একটা কথা,— কেশবদেবের পুত্র ঈশানদেব। যদি কেশবদেবের রূপান্তর কল্পনা স্থির রাখিয়া তাঁহাকে শাহজলাল কর্ত্তৃক পরাজিত বলা হয়, তবে তৎপুত্র ঈশানদেব কিরূপে পিতৃ পরিত্যক্ত রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইলেন?[১৯] পরন্তু শাহজলাল যে গৌড়গোবিন্দকে পরাজিত করেন, তিনি পলায়ন পূর্ব্বক সর্ব্বত আশ্রয় করেন; সেই অবধি শ্রীহট্ট যবনাধীন হয়, এই অতি প্রসিদ্ধ ঘটনার বিষয় পাঠক ২য় খণ্ডে দেখিতে পাইবেন।

কেশব ও ঈশানদেবের যেরূপ বীরত্ব ও কীর্ত্তি প্রশস্তিফলকে উৎকীর্ণ, তাহাতে তাঁহাদিগকে সামান্য রাজা বলা যাইতে পারে না। তাঁহাদের সৈন্য সম্ভার অল্প ছিল না। এমতাবস্থায় ইঁহারা একবারে নির্জ্জিত হইয়াছিলেন, কোন প্রকারেই বলা যাইতে পারে না। তর্কস্থলে যদি বলা হয় যে, ঈশানদেব পরে পৈত্রিক রাজ্য উদ্ধার করিয়া লয়েন, কিন্তু তাহারও প্রমাণ নাই। তাহা হইলে স্বোপার্জ্জিতরাজ্যে দুইহাল মাত্র ভূমিদান করিতে তাঁহাকে বিধবা মহিষী প্রভৃতির অভিমত নিতে হইত না। পক্ষান্তরে শাহজলালের পরে, তাঁহার সেনাপতি সিকান্দর গাজী এবং তৎপর হায়দর গাজী শ্রীহট্ট শাসন করেন তাহার প্রমাণ পাঠক পরে পাইবেন।

শাহজলাল বিজিত গৌড়গোবিন্দের কোন নামান্তর ছিল না; প্রশস্তি-কথিত রাজার (ডাঃ মিত্রের মতে) নামান্তর থাকায়, তাঁহাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিতে আপত্তি কি? প্রথম প্রশস্তির ৭ম শ্লোকে এবং ২য় প্রশস্তির ৬ষ্ঠ শ্লোকে স্পষ্টতঃ কেশবদেব, এইনাম থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে গোবিন্দনামে অভিহিত করা হইয়াছে, রহস্য মন্দ নহে। বস্তুতঃ কোন প্রকারেই শাহজলাল বিজিত গৌড়গোবিন্দের সহিত কেশবদেবের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হয় না।

---

১৬. 'He was suddely called back to defend Gour from the invasion of Irsilan khan and soon after killed in the battle.'
-The proceedings of Assiatic Society of Bengal 1880.

১৭. 'Jalal-ud-Din khani fought and died in Gaur, while Shak Jalal's tomb still stands at Sylhet to mark his place of devotion, death an burial. The fact is, shah Jalal was not Jalal-ud-Din Khani, nor was Raja Gobinda-Kesava of Sylhet.'
-A critieal study of Mr. Gait's History of Assam.
-By Prof. Padma nath Bidyabinod M. A.

১৮. See the Report of Mr. R. Lindsay, the early Residant (collector) of Sylhet.

১৯ See the Anual Report of the Archacological Survey, Bengal cirele. April-1903, p.p-23, 24

গবর্ণমেন্ট প্রকাশিত ইতিহাস (Allen's Gazetteers Vol. II,) এবং হান্টার সাহেবের ইতিহাস (Statistical Accouns of Assam) প্রভৃতি অনুসারে ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে গৌড়গোবিন্দ শাহজলাল কর্তৃক পরাভূত হন। শাহজালালের অনুসঙ্গীগণের বংশাবলীর পুরুষ হিসাবে এই সময়ই প্রকৃত বলা যাইতে পারে,—ইহা পূর্ব্বেও বলা গিয়াছে। ঈশানদেবের প্রশস্তিতে অব্দ সংখ্যা সুস্পষ্ট। কিন্তু ডাঃ মিত্র এই ১৭ সং বা সম্বৎকে "It is obviously intended for the Era of the kings reign." বলিয়া ইহার এক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি যাহাই করুন, কেশবদেবের প্রশস্তির অব্দ সংখ্যা যে ৪৩২৮ যুধিষ্ঠিরাব্দ নহে, এবং ১৭ সম্বতের সহিত তাহার সুসঙ্গতি আছে, তাহা নিশ্চিত। এই প্রশস্তিদ্বয় এখনও জগচ্চন্দ্র চৌধুরীর উত্তরাধিকারী ভাটেরা নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দেব চৌধুরীর নিকট আছে; এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের আসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে ইহার অবিকল চিত্র আছে, কৌতূহলাবিষ্ট পাঠক, মূল তাম্রফলকে দেখিবেন যে কেশবদেবের প্রশস্তির অব্দ সংখ্যার প্রথম অঙ্কটী কোন মতেই '৪' হইতে পারে না। বিদুষী রমাবাইয়ের ভ্রাতা, পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর অব্দ নির্দ্দেশ অপেক্ষাকৃত সমীচীন মনে করি। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে তর্কিত প্রথম অঙ্কটা '২' স্থির করিলে, উভয় প্রশস্তিতে কত ব্যবধান দাঁড়ায়, দেখা যাউক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাজতরঙ্গিণী মতে উভয় প্রশস্তির সময়ে ২৭২ বর্ষ ব্যবধান দাঁড়ায়, এই সময়টা ঠিক নহে। যদিও কেশবদেবের দুই পুত্রের রাজ্য শাসনের পরে, ঈশানদেব বৃদ্ধাবস্থায় বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তথাপি এ দীর্ঘতর কালের সুসঙ্গতি হয় না। কিন্তু বরাহমিহিরের মতে বিচার করিলে আর অসঙ্গতি থাকে না। বারাহমিতে পিতা পুত্রে ঈদৃশ ব্যবধান লক্ষিত হয় না, ৭৮০ কলির্গতাব্দে যুধিষ্ঠিরের কাল; তদনুসারে উভয় প্রশস্তির ব্যবধান বৎসর মাত্র হয়। (কঃ গঃ-৫১৩৫-৭৮০=৪৪৫৫-২৩২৮=২০২৭=৮০ বর্ষ।) পিতাপুত্রের সময় মধ্যে এই ৮০ ব্যবধান নানাকারণে অসঙ্গত না হইতে পারে।

প্রাচ্যবিদ্যামহাকর্ণব বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় একখানি পত্রে লিখিয়াছেন যে, প্রশস্তিদ্বয়ের অক্ষর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর অক্ষরের অনুরূপ।

প্রশস্তিদ্বয় নাগরাক্ষরে অঙ্কিত হইলেও কোন কোন অক্ষর যে বঙ্গাক্ষরের আদিরূপ, তাহা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বঙ্গাক্ষরও নিতান্ত আধুনিক বলিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ললিত বিস্তারগ্রন্থে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব অধ্যাপক শ্রীমিত্রের নিকট বঙ্গলিপি, অঙ্গলিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী ও মাগধলিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব খৃষ্টের ৫৫৭ বর্ষ পূর্ব্বে আভির্ভূত হন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব সময়ের অক্ষর যে প্রশস্তির অক্ষরের ন্যায় হইতে পারে না, তাহার সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়ার প্রয়োজন। তর্কস্থলে দশম শতাব্দী মানিয়া লইলেও ইহা সহস্র বর্ষের পূর্ব্বকার বলিতে হইবে। তাহা হইলে ঈশানদেবের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নবগীর্ব্বানের-রাজত্বকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। প্রায় এই সময়েই শ্রীহট্ট প্রদেশের অপরাংশে "ফা" উপাধি বিশিষ্ট এক রাজবংশ ছিলেন; এবং তাহা হইলে এই সময় শ্রীহট্ট বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল বলিতে হইবে।

যাহা হউক, প্রশস্তি লিখিত অধুনালিপ্ত নাম গুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে এবং রাজগণের ব্যবহৃত যুদ্ধ-রথাদির বিষয় বিবেচনা করিলে তাহাদিগকে অতি প্রাচীন নরপতি না বলিয়া উপায় নাই। বলা হইয়াছে, কেশবদেব একটি সুদৃঢ় প্রস্তরময় বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; তাহার চিহ্ন কোথায়? শ্রীহট্টনাথের প্রস্তব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কোথায়? কেশবদেবের সময় ১২৪৫

খৃষ্টাব্দ হইলে ঐ সকল মন্দিরের চিহ্নমাত্র না থাকার সম্ভাবনা ছিল না। শাহজলালের সময়ের অব্যবহিত পরবর্ত্তী মসজিদাদি এখনও ভগ্নস্তূপে পরিণত হয় নাই। ইহা কি প্রাচীনত্বের অন্যতর প্রমাণ নহে?

ডাঃ মিত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমের পরিচয় দিয়া প্রয়োজন নাই; এই রাজবংশের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ইঁহারা কাছাড়রাজবংশীয় ছিলেন।[২০]

শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাসে কাছাড় রাজগণের এক বংশতালিকা যোজিত আছে, এবং আমরা স্বয়ংও কাছাড় হইতে এক পরিশুদ্ধ বংশপত্র[২১] সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু কোনটিতেই প্রশস্তির উল্লেখিত নামগুলি পাওয়া যায় নাই। প্রশস্তিতে পাণ্ডবকুলাধিপাব্দ শব্দ দৃষ্টে এক হৈড়ম্বের (কাছাড়ের) রাজবংশের সহিত পাণ্ডবদের সংশ্রব ছিল, ইতি প্রবাদমূলে তিনি নবগীর্ব্বান বংশীয়দিগকে, কাছাড় রাজবংশীয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই অনুমানের পূর্ব্বে কাছাড়ের রাজবংশ তালিকাটা সংগ্রহ পূর্ব্বক দেখা কি ভাল ছিল না?

আবার, প্রশস্তির লিখিত "ভূহল" শব্দ লইয়া তিনি এক বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। "ভূহল" জিনিসটা কি? "ভূহল" যে কি পদার্থ, তৎনির্ণয়ার্থ তিনি কত স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি অনুসন্ধান করিয়াছেন, কত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যদি তিনি শ্রীহট্ট অঞ্চলের একটা চাষাকেও ইহা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলেও জানিতে পারিতেন যে, কেদার অথবা কেয়ার, হল অথবা হাল শব্দে এদেশে অধ্যাপি জমির পরিমাপ করা হয়।[২২]

সম্ভত ডাঃ মিত্র অবজ্ঞার সহিত— কোনরূপ অনুসন্ধান না করিয়াই এই সম্বন্ধে নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, নতুবা তৎসদৃশ মহামহোপাধ্যায়ের এই সব সামান্য বিষয়ে ঈদৃশ অমার্জ্জনীয় ভ্রম হওয়া সম্ভাবনীয় নহে। শিলালিপি ও তাম্রপত্রের পাঠোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, এই সামান্য আলোচনায় প্রতিপদে তাঁহার কেন এত ভ্রান্তি হইয়াছে, ভাবিলে বিস্মিত বলিতে হয়—"মুনিনাঞ্চ মতি ভ্রমঃ।"

২০. 'These Rajas were sovereigns of Kachar and professed to be of the dynesty of Ghatakacha, son of Bhima by Hidimba, the daughter of an aboriginal chief.'
-The proceedings. A. S. of Bengal for August, 1880.

২১. ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড জ–পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২২. পঞ্চম খণ্ড পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়
বৈদেশিক উল্লেখ

শ্রীহট্টের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহার অতিরিক্ত প্রমাণ আর কি আছে? বলা গিয়াছে যে, পুরাকালে বঙ্গভূমি সাগরগর্ভে ছিল; সাগর-বারি সরিয়া গেলে বঙ্গদেশ ক্রমশঃ যখন ভাসিয়া উঠিয়া মনুষ্য বাসযোগ্য হয়, তাহার পূর্ব্ব হইতেই এদেশ কামরূপের অধীনে ছিল; এদেশে ভাটেরা প্রভৃতি স্থানে যে সকল প্রাচীন রাজবংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি অনেক পূর্ব্বেই অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাহার পর অনেকদিন এ দেশের সংবাদ আর কোথাও জ্ঞাত হওয়া যায় না।

"কিরাদিয়া"

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের অনেক কথা গ্রীকদূত মিগেস্থিনিস-কথিত বিবরণ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরবর্ত্তী টলেমী, ভারতবর্ষের অনেক সংবাদ দিয়াছেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে একজন গ্রীকবণিক সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখেন, মেকক্রিণ্ডেল সাহেব, টলেমী ও উক্ত গ্রীকবণিকের পুস্তক অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে "কিরাদিয়া" নামক দেশের উল্লেখ আছে। এই কিরাদিয়া বিষ্ণুপুরাণ বর্ণিত পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী "কিরাতভূমি।" কিরাত ভূমির অবস্থান পুরাকালে "কোপন" নদীর তীরে ছিল, পরে তাহা ত্রিপুরা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অতএব মেকক্রিণ্ডের শ্রীহট্টের পার্শ্ববর্ত্তী কিরাদিয়া সংজ্ঞক উক্ত দেশেরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে কিরাদিয়া দেশের সীমাস্থানে একটি মেলা হইত, ঐ মেলায় উত্তর দেশের তেজপত্র আমদানী হইত। চীনদেশবাসীরা রেশমী বস্ত্রের পরিবর্ত্তে তেজপত্র ক্রয় করিত। আরও বর্ণিত আছে যে নূতন দ্রাক্ষাপত্রের ন্যায় পাটি বিস্তার করিয়া দ্রব্যাদি তাহাতে রক্ষা করিত।[১]

প্রাচীন কিরাত রাজ্যের সীমাস্থলেই শ্রীহট্ট ভূমি। অতএব ঐ মেলা সম্ভবতঃ শ্রীহট্ট ও কিরাত ভূমির লোক লইয়া বসিত এবং শ্রীহট্টের তেজপত্র বহুলরূপে উক্ত মেলায় যাইত বলিয়া জানা যাইতেছে। চীনদেশীয়দের ব্যবহৃত দ্রাক্ষাপত্রের ন্যায় পাটি সম্ভবতঃ শ্রীহট্টেরই প্রসিদ্ধ শীতল পাটি হইবে, তাহা শ্রীহট্ট হইতেই মেলাস্থলে লইয়া যাইত। ঐ সময় শ্রীহট্টভূমি প্রকৃত ক্ষীণকলেবরা ছিল, সন্দেহ নাই; এবং ঐ সময়েও আধুনিক শাখা বঙ্গের অবস্থা শোচনীয় ছিল।

বাঙ্গালার আর্য্যনিবাস

ইহার পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে আর্য্যনিবাস স্থাপিত হয় নাই। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন—"খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গলা ব্রাহ্মণশূন্য আর্য্যভূমি ছিল। পূর্ব্বে কদাচিৎ কোন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে যদি আসিয়া বাস করিয়া থাকেন, তাহা গণনীয়ের মধ্যে নহে। অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল না।"[২]

---

১. Mc crindel's Periplus of the Ereetyhrean. PP. 148, 149.

২. খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তদ্দেশ ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত না হইলেও, টলেমীর বিবরণে তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহারা বঙ্কিচন্দ্রও তৎসময় "গঙ্গারিদে' গঙ্গারাঢ়ীর উল্লেখ করিয়া বাঙ্গালার প্রাচীনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈণিক পরিব্রাজক হিউয়েন্থসাঙ্গ্ ভারতবর্ষে আগমন করেন; তিনি নিজ ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এদেশের অবস্থাদি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সময় যদিও বাঙ্গালা দেশ বহু বিস্তৃত ছিল, তথাপি তখন পর্য্যন্ত ইহার পূর্ব্বাংশে নিদর্শন বিলুপ্ত হয় নাই।

সাগরতীরে শ্রীহট্ট

হিউয়েন্থসাঙ্গ্ ভারতবর্ষের বিবিধ স্থান পরিভ্রমণান্তর কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মা কর্ত্তৃক আহুত হইয়া তদীয় রাজ্যে গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "সমতট হইতে[৩] পূর্ব্বদিকে সাগরপার্শ্বে পর্ব্বত ও উপত্যকার পরস্পরে শিলিচটল দেশে আমরা পহুঁছিয়া ছিলাম।"[৪] হিউয়েন্থসাঙ্গ্ এই শিলিচটল অতিক্রম করিয়া পরে কামরূপে গমন করেন। হিউয়েন্থসাঙ্গের অপর এক অনুবাদক একথার এরূপ অনুবাদ করিয়াছেন যে, "সমতট দেশের উত্তর পূর্ব্বে মহাসাগরের সন্নিকটবর্ত্তী উপত্যকাভূমে শিলিচটল অবস্থিত।[৫] এই শিলিচটলই শ্রীহট্ট। তৎকালে যদিও বাঙ্গলাদেশ বহু বিস্তৃত ছিল, তথাপি তখন পর্য্যন্ত ইহার পূর্ব্বাংশে সাগরের স্পষ্ট নিদর্শন বিলুপ্ত হয় নাই, তখনও একটি বৃহত্তম হ্রদ ঐ সাগরের সাক্ষ্য দিতেছিল; চৈনিক পরিব্রাজক তত্তীরেই শ্রীহট্ট নগরীর বিদ্যমানতা বর্ণন করিয়াছেন।

ত্রিপুরার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে—"শ্রীহট্ট জিলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ, ত্রিপুরা জিলার উত্তর পশ্চিমাংশ দর্শনে বোধ হয়, এই স্থানে পূর্ব্বে একটী বৃহৎ হ্রদ ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদে প্রবাহিত কর্দ্দম দ্বারা ঢাকা ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার সন্ধিস্থল সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইলে, এই হ্রদ বিশেষরূপে মানবমণ্ডলির দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। এইজন্যই দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হিউয়েন্থসাঙ্গ্ শিলহট্ট রাজ্যটি সমুদ্রতীরবর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বরবক্র প্রভৃতি নদীসমূহ এই হ্রদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। নদী আনীত কর্দ্দমরাশি দ্বারা এই হ্রদ ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া অসংখ্য বিল সৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল বিলের কান্দি বা উচ্চস্থানস্থিত গ্রামগুলি অদ্যাপি সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। আনুমানিক শ্রীহট্ট জিলার প্রায় চতুর্থাংশ বিল ও নিম্নভূমি; ইহার সহিত ময়মনসিংহ জিলার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত ও ত্রিপুরা জিলার উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থিত নিম্নভূমি সংযুক্ত করিলে বোধ হয় উল্লিখিত হ্রদের পরিমাণ ফল দুই সহস্র বর্গমাইল হইতেও অধিক ছিল।[৬]

"অধিক যে ছিল" তাহার সন্দেহ নাই। সুনামগঞ্জ সবডিবিসনের অধিকাংশই জলতলে ছিল। এখনও ইহার নিম্নভূমির পরিমাণ অল্প নহে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, লাউড় রাজ্য হইতে সদরঘাট পর্য্যন্ত এক খেওয়া ছিল; এর দ্বারা সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জের অনেকাংশ যে জলতলে ছিল তাহার প্রমাণ হয়। যাহাহউক যৎকালে নবদ্বীপাদি বিখ্যাত দেশগুলিও অস্তিত্বহীন অবস্থায় ছিল। হিউয়েন্থসাঙ্গ সেই সমস্ত স্থানের কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া যে একবারে সাগরতীরবর্ত্তী শিলিচটর বা শ্রীহট্টের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ইহা শ্রীহট্টের কম গৌরবের কথা নহে।

---

৩. হিউয়েন্থসাঙ্গের বর্ণনাতে সমতটরাজ্য কামরূপ হইতে ২৫০ মাইল দক্ষিণে, ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গই তাঁহার অভিপ্রেত সমতট বলা যাইতে পারে।

৪. 'Going from this (sama-tata) north east along the borders of the sea, across mountains and valleys we come to the country of Shi-li-t'sa-ta-lo'
-S. Beal's Life f Henen Tsiang P. 138.

৫. 'The first place is shi-li-cha-ta-lo which was situated in near the great sea, to the north of sama-tata."
-Julien's Henen Tsiang. iii. 82.

৬. শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস ৩য় ভাগ ৩য় অধ্যায় ২৬৮ পৃষ্ঠা।

সাগরের আরও উল্লেখ

শ্রীহট্টের ভাটেরা হইতে যে দুখানা তাম্রফলক আবিষ্কৃত হয়, যাহার বিষয় বিস্তারিতভাবে পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, অনেকের মতে সে দুখানা তাম্রফলকই খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী। একখানি বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকে এ বিষয়ে লিখিত হইয়াছে,—"প্রাচীনকালে এই প্রদেশ হিন্দুরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইত কিন্তু ইহার কোন বিশেষ নিদর্শন অধুনা বর্ত্তমান নাই। এই প্রাচীনতার প্রমাণের এক নিদর্শন ভাটেরার তাম্রফলক। এই দুখানা তাম্রফলক দ্বারা ইহা নিঃসংশয় রূপে প্রমাণিত হইতেছে ১৭ সংবতেরও পূর্ব্ব হইতে শ্রীহট্ট প্রদেশের অন্ততঃ কোন কোন অংশ আর্য্য নৃপতি কর্ত্তৃক শাস্তি হইত।"[৭] শ্রীযুক্ত স্বরূপ রায় "শ্রীহট্টের ভূগোলে" এবং মৌলবী মোহাম্মদ আহমদ সাহেব "শ্রীহট্টদর্পণ" পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভাটেরার তাম্রফলকের বয়স "দুই হাজার বৎসর। এই প্রাচীন তাম্রফলকে, কোন একটি স্থানের সীমা নির্দ্দেশ স্থলে "সাগরপশ্চিমে" পদ পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় "সাগর" শব্দে sea (সমুদ্র) অর্থই করিয়াছেন। এতদ্বারাও পূর্ব্বকথিত সাগরের বিদ্যমানতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

সাগরের নিদর্শন

শ্রীহট্টের ঐ প্রদেশের ভূমির সীমা নির্দ্দেশ স্থলে প্রাচীন দলিলপত্রে "রত্নাংভরা" বলিয়া লিখিত আছে ও পূর্ব্বানুরূপ লিখিত হয়। এই "রত্নাং ভরাং" পদ সাগরভরটের প্রতিশব্দ বা পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত। এই প্রদেশে নিম্ন স্থানগুলি অদ্যাপি "রত্নাং ভরাং" বলিয়াই নির্দ্দেশিত হইতেছে। "রত্নাং" নামে কোন নদী ঐ অঞ্চলে পূর্ব্বকালে আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইত, পরে তাহা ভরিয়া জমি হইয়া গিয়াছে এরূপ অনুমান যথার্থ নহে। একটি নদী কদাপি এরূপভাবে কোথাও প্রবাহিত দেখা যায় না। শ্রীহট্টের কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত বহুল শব্দ থাকায় সমুদ্রকে রত্নকার বলিত বিচিত্র নহে,—রত্নাং রত্নাকরেরই সংক্ষেপার্থ সূচক শব্দ।

এতৎ প্রমাণ স্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হান্টার সাহেবের বাক্য এস্থলে করা যাইতে পারে; তিনি বলেন—"শ্রীহট্টের উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বতের পাদদেশে সামুদ্রিক শম্বুকের নিদর্শন দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, অতি পূর্ব্বকালে ঐ পর্ব্বতের নিম্নে সমুদ্রবারি প্রবাহিত হইত।"[৮] ঐতিহাসিক ভ্রমণকারী হামিল্‌টন সাহেবও বলেন—পূর্ব্ব ও উত্তর দিগ্বর্ত্তী প্রাচীরবৎ পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্টে বোধ হয় যে, পূর্ব্বকালে তাহার নিম্নে সাগর তরঙ্গ খেলা করিত।[৯] অতএব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দেশ সাগরতীবর্ত্তী ছিল এবং উল্লেখযোগ্য একটি রাজ্য ছিল; নিঃসংশয় বলা যাইতে পারে।

শ্রীহট্টের আর্য্য রাজ্য

যে সময় হিউয়েন্থসাঙ্গ শ্রীহট্ট দর্শন করতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপে ভাস্কর বর্ম্মার সভায় গমন করেন, তৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট ও জয়ন্তী কামরূপ রাজ্যের অঙ্গ ছিল। বিলসাহেব বর্ণন

৭. আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ-২৪ পৃষ্ঠা।

৮. "The conformation of some of the sandy hillocks and the presence of marine shells at the foot of the hills along the northern boundary, indicate that the sea flowed at the base of the hills at a (geologically speaking) comparatively recent period."
-A Statistical Accounts of Assam, VOL. II. P. 263.

৯. "While to the north and east lofty mountains rise alomptly like a wall and appear as if at some remote period they had with stood the surge of the ocean."
-East Indian Gazetteers VOL. II. P. 352.

করিয়াছেনঃ—"পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের পরপারে কামরূপ (ইহার রাজধানী প্রাগ্জ্যোতিষপুর), রাজ্য, রংপুরের করতোয়া নদী হইতে ইহা পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত। মণিপুর কাছাড়, জয়ন্তীয়া, পূর্ব্ব আসাম এবং ময়মনসিংহের কোন কোন অংশ ও শ্রীহট্ট ইহার অন্তর্গত।"[১০]

অতএব নিসংশয়িত রূপে বলা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে শ্রীহট্ট আর্য্য জাতির শাসনে ছিল। প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষ পূর্ব্বদেশে যখন অল্প প্রতিভাজ্যোতিঃ বিস্তার করিয়াছিল, তৎসঙ্গে শ্রীহট্ট ও সেই প্রজ্জ্বলৎপ্রভায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীহট্ট বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত যে কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী কামরূপ রাজ্যের অঙ্গ ছিল। তাহা বিদেশীয় ভ্রমণকারীর বর্ণনায় জ্ঞাত হওয়া যায়।

শ্রীহট্ট বহুদিন কামরূপের অন্তর্গত ছিল বলিয়া অগৌরব কিছু নাই, যে কামরূপ যোগিনীতন্ত্রে বারানসীর ন্যায় মাহাত্ম্যময় বলিয়া উল্লেখিত, তদধীনে থাকা অগৌরবকর নহে; ইহাতে "চিরপরাধীন" বলিয়া শ্রীহট্টের প্রতি বিদ্রুপ করা যাইতে পারে না। নিজ পল্লী, নগর, বা জিলার লোক নহিলেই যদি পরাধীনতা হয়, তবে বহুতর দেশের ভাগ্যই শ্রীহট্টের ন্যায়। বস্তুতঃ তাহা অগৌরবসূচক নহে, কামরূপের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অতি প্রাচীনকাল হইতেই শ্রীহট্ট আর্য্য সভ্যতার ফল ভোগ করিতে পারিয়াছে বলিয়া বরং বিশেষ গৌরবাস্পদ।

১০. "From this going eastward, crossing the great river, we came to the country of Ka-mo-lu-po."
"Kamrup (its capital is called in the purans Pragiyotishpur) extended from Kara-toya river in Rangpur to the eastward. The Kingdom included Mainpur, Jayantia, Kachar, east Assam and parts of Moymansingh and Sylhet (Srihatta.)"
-A. Foot note from S. Beal's Buddhist Records of the E. countries Vol. II. P. 19

চতুর্থ অধ্যায়

ত্রিপুর বংশীয় রাজগণ

শ্রীহট্টের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইলেও বর্ত্তমানে এ জিলা যতদূর বিস্তৃত, পূর্বকালে ভূপরিমাণ ততদূর ছিল না। পূর্ব্ব ও উত্তর এবং উত্তর পূর্ব্ব ব্যতীত ও পশ্চিম দিক ও দক্ষিণ পশ্চিমদিগস্থ ভূভাগ সাগরগর্ভে ছিল। হিউয়েন্থসাঙ্গ্ পর্ব্বতসঙ্কুল উচ্চাংশাত্রই দর্শন করেন। ঐ সময়ের পরে শ্রীহট্টের ভূভাগ কিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, কাহারাই বা তখন এদেশে শাসন করিতেন তাহার কিছুমাত্র জানা যায় না। শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ বরবক্র নদের সীমা পর্য্যন্ত দেশ বহুকার ত্রৈপুর রাজবংশীয়ের শাসনাধীন ছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়।

ত্রিপুর বংশীয় রাজগণের প্রাচীন রাজ্য ত্রিপুরা নহে

মহাভারতে সুক্ষ্মদেশের উল্লেখ আছে; এই সুক্ষ্মদেশেই প্রাচীন কিরাত রাজ্য। রঘুবংশে কালিদাস এই দেশকে "তালীবন শ্যাম উপকণ্ঠ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও সমুদ্রের উপকণ্ঠ ছিল এবং শ্রীহট্টের পার্শ্বেই ইহার অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে। এই দেশ বহুকালাবধি ত্রৈপুর রাজবংশের শাসনাধীনে। পরে ঐ বংশীয় বিভিন্ন রাজগণের সময়ে রাজ্যবৃদ্ধির সহিত সেই রাজ্যই ত্রিপুরা নামে খ্যাত হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে ত্রিপুর বংশীয় রাজগণের রাজ্য বর্ত্তমান ত্রিপুরা জিলায় ছিল না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন্থসাঙ্গ্ বর্ত্তমান ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লা দেশকে "কমরাঙ্ক" নামে পৃথক একটি রাজ্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ত্রিপুর বংশীয় রাজগণের রাজধানীর সহিত তৎকালে ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া জানা যায় না।

প্রাচীন পৌরাণিক যুগে দ্রুহ্যু বংশাবতংস ত্রিপুর[১] কিরাতভূমে স্বীয় রাজ ঘাট স্থাপন করেন। প্রাচীনকালাবধি "ফা" উপাধিধারী উক্ত ত্রৈপুর রাজবংশীয়গণ পূর্ব্বাঞ্চলীয় বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা অপেক্ষা ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের রাজধানী পূর্ব্বকালে, কামরূপের সন্নিকটে "কোপল" নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সে প্রাচীন রাজ্যের রাজধানীর নাম ত্রিবেগ। পরে কাল সহকারে এই ত্রিবেগ নগরী পরিত্যক্ত হয়, এবং তাহা হইতে বর্ত্তমান কাছাড় ও তৎপরে শ্রীহট্টের ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাজধানী স্থাপিত হয়। প্রাচীন রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে যে ত্রিলোচন-তনয় দক্ষিণ, কোপল বা কপিলা তীরবর্ত্তী রাজপাট পরিত্যাগ পূর্ব্বক বরবক্রতীরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।[২]

---

১. ত্রিপুর রাজবংশাবলী, ক-পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। (২য় ভাগ ১ম খণ্ড)

২. কবি শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর কর্ত্তৃক ১৩২৯ শকাব্দে রাজমালা রচিত হয়, তাহাতে লিখিত আছেঃ–
"কপিলা নদীর তীরে ছাড়ি দিয়া;
একাদশ ভাই মিলি মন্ত্রণা করিয়া,
সৈন্য সেনা সমে রাজা স্থানান্তরে গেলা।
বরবক্র উজানের খলংসা রহিলা।'–রাজমালা।

ত্রৈপুর রাজগণের প্রাচীন রাজধানী

বরবক্র উজানস্থ সে প্রাচীন রাজধানী বর্ত্তমান কাছাড় জিলার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। এই রাজধানীতে তাঁহারা অধিক দিন ছিলেন না। উক্ত খলংসা রাজধানী মনোমত না হওয়ার ইহাও পরিত্যাগের কল্পনা করা হয়।[৩] সম্ভবতঃ ৩/৪ পুরুষ পরে সেই রাজধানীও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ত্রৈপুর রাজগণ যজ্ঞপরায়ণ ছিলেন, মহারাজ তরদক্ষিণ নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া সর্ব্বদা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন।[৪]

যে মহারাজ ত্রিপুর হইতে এই বংশীয়ের প্রাধান্য, সেই ত্রিপুর হইতে একষষ্টিতম পর্য্যায়ে[৫] শুক্ররায়ের পুত্র প্রতীত রাজা হন। ইহার রাজত্ব সময়ে বরবক্র নদী কাছাড় ও ত্রৈপুর রাজবংশীয়ের রাজ্যের মধ্যসীমা ছিল।[৬] এই সময় ত্রৈপুর রাজগণের বিবরণ শ্রীহট্ট ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সঙ্গত।

প্রতীতের পুত্র মিরিছিম, তৎপুত্র গগণ, তাঁহার পুত্র নওরায়, তৎপুত্র বা নবরায় জুজারু ফা (যুদ্ধজয়রাজ বা হিমতিছ) ইনি রাঙ্গামাটী জয় করতঃ এক নূতন রাজবাটী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নবদেশ বিজয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে আদিপুরুষের নামানুক্রমে ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করেন। সম্ভবত; ঐ সময় হইতে তদীয় নবজিত রাজ্য ত্রিপুরা অভিধা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মাটীতে নূতন রাজবাটী নির্ম্মিত হইলেও পূর্ব্বরাজধানী পরিত্যক্ত হওয়ার প্রমাণ নাই। ইঁহার কি তাঁহার পুত্রের সময়ে সেই রাজধানী কৈলাসহরে হইয়াছিল। কৈলাসহরের প্রাচীন নাম কৈলাড়গড়; মোসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে জাজিনগর নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

ত্রৈপুর রাজগণের রাজধানী শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্রেও একস্থানে ছিল না, রাজপাট ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।[৭] ত্রিপুরার ইতিহাস প্রণেতা বিশিষ্ট প্রমাণ সহকারে লিখিয়াছেনঃ—"শ্রীহট্ট জিলার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত বিবিধ স্থানে ইঁহাদের রাজধানী ভগ্নাবশেষ

---

৩. "না রহিব এথাতে যাইব অন্য স্থান।
মন স্থির করে রাজা যাইতে উজান॥"–রাজমালা।

৪. "তরদক্ষিণ নাম রাজা তাহার তনয়।
বহুকাল পালে রাজ্য নিতি যজ্ঞময়॥"–রাজমালা।

৫. ক-পরিশিষ্ট দেখ।

৬. শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস ২য় ভাগ ২য় অধ্যায় ২৩ পৃষ্ঠা।

৭. প্রতাপগড় পরগণার বহুদূর দক্ষিণে গবর্ণমেন্ট-রক্ষিত জঙ্গলের প্রান্তে "নগরছড়া" নামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তীরে নরবসতি ও অট্টালিকার সামান্য চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এই সময় ঐ স্থানে ত্রিপুর বংশীয়গণের রাজধানী ছিল বলিয়া বিবেচনা করা অসঙ্গত হয় না। ইহার একটা প্রাসঙ্গিক প্রমাণও আছে। করিমগঞ্জের নিকটবর্ত্তী চাপঘাট পরগণা পর্য্যন্ত ঐ রাজ্যের অধিকার ভুক্ত ছিল, সেই স্থানে সীমান্ত রক্ষকরূপে এই রাজা থাকিতেন, পরবর্ত্তী (২য় খণ্ড) নবম অধ্যায়ে প্রসঙ্গাধীন তাঁহার বিষয় উল্লেখিত হইবে। ঐ প্রদেশে অতি প্রাচীন "পীঠাখাউরীর জাঙ্গাল" নামে এক সড়কের ভগ্নাবশেষ চিহ্ন লক্ষিত হয়, উহার দৈর্ঘ্য উত্তরে দক্ষিণে বহুক্রোশব্যাপী। দক্ষিণ দিকে যথাক্রমে ডৌয়াদি, জাফরগড়, প্রতাপগড় এই তিনটি বিস্তৃত পরগণা ভেদ করিয়া ঐ জাঙ্গাল জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। কত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, তথাপি যে জাঙ্গালের চিহ্ন একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রতি বৎসর চাষের সময় কাটিয়া কাটিয়া ক্ষয় করিলেও এযাবৎ যাহা একবারে বিনষ্ট হয় নাই, তাহা নিশ্চিতই অতি বৃহৎ পথ ছিল এবং তাহা যে কোন রাজকীর্ত্তি তাহার সন্দেহ নাই। পিঠাখাউরী উপনামে আখ্যাতা রাজকন্যার দ্বারা ঐ জাঙ্গাল প্রস্তুত হয় বলিয়া জনশ্রুতিমুখে শ্রুত হওয়া যায়। ইহা যে ত্রিপুরবংশীয়দের কীর্ত্তি এবং তাঁহাদের রাজধানী হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইটার পরগণার বড়শীজোড়া পাহাড়েও এক প্রাচীন রাজবাটীর ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।"[৮] পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে ঐ রাজধানী এক সময় পুণ্যনদী মনুতীরে স্থানান্তরিত হয়, সত্যযুগেও ভগবান মনুপূজিত শিব মনুতীরস্থ কিরাত নগরে আছেন বলিয়া সংস্কৃত রাজমালায় লিখিত আছে।[৯]

ত্রৈপুর রাজগণের রাজধানী বহুকাল কৈলাড়গড়ে ছিল বলিয়া ইহা এক সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। কৈলাড়গড় বহুকাল হইতেই শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ প্রাচীনকালে শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ ত্রৈপুররাজছত্রের ছায়াতলে অবস্থিত ছিল।[১০] বরবক্রের দক্ষিণ তীরবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ তাঁহাদের অধিকারে ছিল বলিয়া জানা যায়, বস্তুতঃ করিমগঞ্জ সবডিভিসনের অধিকাংশ স্থানই এক রাজবংশের রাজ্যান্তর্গত ছিল।[১১]

ত্রৈপুর রাজবংশীয়ের এক অতি প্রধান কীর্ত্তি,—পূর্ব্বাঞ্চলে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করা। ইতিহাস প্রসিদ্ধ আদিশূর (জয়ন্ত)[১২] খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে[১৩] যজ্ঞসম্পাদনার্থে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন সাগ্নিক আনয়ন করিয়া বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনার প্রায় পূর্ব্বে শ্রীহট্টে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমন হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।

আদিধর্ম্মপা ও ব্রাহ্মণগণ

রাঙ্গামাটী বিজেতার নামোল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে, তাঁহার পুত্রের নাম (জনক ফা বা রাজবন্ত), তৎপুত্র দেবরায় (দেবরাজ বা পার্থ), শিবরায় (বা সেবরায়), তাঁহার পুত্রের নাম ডুঙ্গুর ফা বা দনকুরু ফা। আর্য্য ভাষায় তিনিই আদিধর্ম্মপা নামে কথিত হইয়াছেন। প্রায় তেরশত বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই প্রসিদ্ধ নৃপতি পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় বৈদিক যজ্ঞ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু সদব্রাহ্মণের অভাব এই সদনুষ্ঠানের প্রধান অন্তরায় হইল। সেই সময়ে যখন গৌড়ভূমিতেই ব্রাহ্মণাভাব ছিল, তখন প্রান্তবর্ত্তী কামরূপান্তর্গত প্রদেশে ব্রাহ্মণাভাব অসঙ্গত ব্যাপার নহে।

বৈদিক সংবাদিনী নামক কুলগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মহারাজ আদিধর্ম্মপা[১৪] ও স্বীয় মন্ত্রী হইতে জ্ঞাত হইলেন যে মিথিলা দেশ হইতে যজ্ঞাদি বিশারদ্ বিপ্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে।

---

৮. শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহের ত্রিপুরার ইতিহাস ২য় ভাগ ১ম অধ্যায় ১০ম পৃষ্ঠা।

৯. "পুরাকৃত যুগে রাজন্ মনুনা পূজিতঃ শিবঃ।
তত্রৈব বিরলে স্থানে মনুনাম নদীতটে।
গুপ্ত ভাবেন দেবেশঃ কিরাত নগরে বসৎ।"

১০. "The southern portion, at least, was at times under Tippers rule."
-History of Assam. By Mr. E. A. Gait. Chap. XIII. P. 268.

১১ (১) 'A thousand years ago, the Karimganj subdivision seems to have been included in the Tippera Kingdom."
-Allen's Assam District Gazetteers Vol. II. (Sylhet) chap. II. P. 22.
(২) কোন সময়ে ডৌয়াদি পরগণাস্থিত আলতামতী দীঘী ঐ রাজ্যের উত্তর সীমা ছিল বলিয়া এখনও এ থাকার লোকমুখে শুনা যায়।

১২. গৌড়াধিপতি জয়ন্ত, কুলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক আদিশূর নামে কথিত হইয়াছেন। (তিনি পূর্ব্বদেশে প্রথম বীর বা শূর অথবা কীর্ত্তিমন্তু ছিলেন বলিয়া এ উপনাম লাভ করিয়া থাকিবেন।) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ ৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৩. "বেদবাণাঙ্গ শাকে"–বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা মতে ৬৫৪ শকাব্দ (৭৩২ খৃষ্টাব্দ।) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৪. ত্রিপুরার ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ স্বীয় পুস্তকে ত্রিপুরার রাজবংশাবলী মুদ্রিত করিয়াছেন। বিখ্যাত বিশ্বকোষাভিধানে দ্বিতীয় এক বংশপত্রিক প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ

মিথিলা প্রাচীনকালাবধি প্রসিদ্ধ; এই স্থানেই গৌতমের ন্যায়শাস্ত্রের প্রকাশ, এই স্থানেই রাজর্ষি জনকের নির্ব্বিকল্প কর্ম্মক্ষেত্র। পরবর্ত্তী কালেও মিথিলার নাম এতদ্দেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, মিথিলাধিপতি সম্মানিত "পঞ্চগৌড়াধিপ" উপাধির অধিকারী ছিলেন।[১৫]

আদিধর্ম্মপা স্বীয় মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ ক্রমে মিথিলাধিপতির নিকটে অতি বিনীতভাবে এক পত্র প্রেরণ করিয়া, যজ্ঞার্থে পাঁচজন ব্রাহ্মণ প্রেরণের অনুরোধ করিলেন।

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে, মিথিলায় সিংহোপাধিযুক্ত অংশ বহুকাল হইতে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। ঐ সময়ে মিথিলাদেশে বলভদ্র সিংহ নামক নৃপতি রাজত্ব করিতেছিলেন।[১৬] তিনি মহারাজ আদিধর্ম্মপার বিনীত পত্র পাঠে পরিতুষ্ট হইয়া পাঁচজন বেদজ্ঞ বিপ্রকে স্বীয় রাজ্যে গমন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কামরূপান্তর্গত উক্ত রাজ্য সদাচার বর্জ্জিত দেশ বলিয়া ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত কাতর হইলেন, কিরূপে তাহারা সেই কুদেশে গমন করিবেন? অনন্তর তাঁহারা ঐ দেশের অবস্থাদি জ্ঞাত হইবার জন্য জনৈক ধীর ব্যক্তিকে অগ্রে তথায় প্রেরণ করিলেন। ঐ ব্যক্তি মিথিলায় প্রত্যাগত হইয়া জানাইল যে, সে দেশ জঘন্য নহে, তথায় পুণ্যপ্রদ বরবক্র ও মনু প্রভৃতি নদী প্রবাহিত, তথাকার রাজা চন্দ্রবংশসম্ভূত ক্ষত্রিয় এ বিবিধ গুণগ্রাম সমন্বিত।[১৭]

দূতমুখে তাঁহারা এদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে তথায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন, বরবক্রতীর্থ যাত্রার সংকল্প করত বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাপর এই পঞ্চগোত্রোৎপন্ন পাঁচজন তপস্বী এ দেশে আগমন করিলেন।[১৮] ইহাদের নাম যথাক্রমে শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোত্তম ছিল,[১৯] ইঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে যথাবিধি যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল এবং যথাকালে

বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সাহায্যে বহরমপুরের পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বহুটীকা সমন্বিত যে শ্রীমদ্ভাগবতের বিতরণ করেন, তাহার ভূমিকায় এক রাজ-বংশ-তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কোন বংশপত্রেই আদিধর্ম্মপা বলিয়া কোন রাজারনাম দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মপাল বলিয়া একজন রাজার নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তিনি অতি প্রাচীনতম, (সংস্কৃত রাজমহল মতে তিনি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক),–ত্রিপুর হইতে সপ্তম স্থানীয়। সুতরাং প্রাগুক্ত সময়ের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। বর্ত্তমান মহারাজের ৩৯ পুরুষ পূর্ব্বে ডুঙ্গুরফা নামে এক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি রাজা হন, বিশ্বকোষে ইহার নাম দানকুরুফা লিখিত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় ত্রৈপুর "ডুঙ্গুর" শব্দে "হরি" অর্থ করিয়া, ইহাকে হরিরায় (কোথাও বা শিবরায়) বলিয়াছেন। পশ্চাদুক্ত দানপত্রে এই ডুঙ্গুর শব্দই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক আর্য্যভাষায় "ধম্ম" এবং "ফা" "পা"তে পরিণত হইয়াছে।

তিনি এ অঞ্চলে প্রথমেই ধর্ম্মপালকরূপে আবির্ভূত বলিয়া আদিধর্ম্মপা নামে কথিত হইয়াছেন, বিচিত্র নহে; কারণ জয়ন্ত নৃপতিও তদ্বৎ আদিশূর নামে কির্ত্তিত। উভয়েই পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, উভয়েই যজ্ঞ কর্ম্মকর্ত্তা এবং উভয়ের নাম আদি শব্দপূর্ব আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ নাম, আর অপর অপ্ররিচিত, ইহাও অদ্ভুত। যাহাহোক কেবল আদিধর্ম্মপার নাম সম্বন্ধেই যে এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্রৈপুর নাম স্বাধীন ভাবে বিভিন্নরূপ বঙ্গানুবাদিত হইয়াছে।

ক-পরিশিষ্টের বংশপত্রিকায় তাহা দ্রষ্টব্য।

১৫. "পঞ্চ গৌড়াধিপ, রাজা শিবসিংহ, লছিমাদেবী পরমাণ।" ইত্যাদি বিদ্যাপতির কবিতা।

১৬. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ৩য় অংশ ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৭. বৈদিক সংবাদিনী দ্রষ্টব্য।

১৮. নব্যভারত পত্রিকা ১৮শ খণ্ড ৭ম সংখ্যায় (কার্ত্তিক-১৩০৭ বাংলা) শ্রীযুত দ্বারকা নাথ চৌধুরী বি এ মহাশয় একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "মহারাজ আদিধর্ম্মপা ৫১ ত্রিপুরাব্দে মিথিলাধিপতি বলভদ্র সিংহকে অনুনয় বিনয় করিয়া পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।"

১৯. শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ৩য় অংশ ৮৫ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইল (৬৪১ খৃষ্টাব্দ)। শ্রীহট্টের অন্তর্গত বর্ত্তমান ভানুগাছ পরগণাধীন মঙ্গলপুর গ্রামই যজ্ঞ সম্পাদনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ণীত এবং সেই স্থানেই সঙ্কল্পিত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়। সেই প্রাচীনতম যজ্ঞকুণ্ডের পরিচিহ্ন তথায় এখনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

চৈনিক পরিব্রাজক ও ভারতসম্রাজ্য

প্রাসঙ্গিকরূপে এস্থলে একটা কথা বিবেচ্য। দেখা যাইতেছে যে, আদিধর্ম্মপা একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি। বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পাদন ও ব্রাহ্মণ স্থাপনাদি দ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকটিত হইতেছে। ঠিক ইঁহার রাজত্ব সময়েই চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্থসাঙ্ এদেশে আগমন করেন। তিনি ২৬ বর্ষ বয়সে (৬২৯ খৃষ্টাব্দে) চীন হইতে যাত্রা করিয়া ভারত ভ্রমণান্তর (৬৪৫ খৃষ্টাব্দে) স্বদেশে যাত্রা করেন। তিনি এই যজ্ঞের বিষয় বর্ণন করেন নাই। খৃষ্টীয় ৬৩৪ অব্দে কান্যকুব্জাধিপতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৃপতি শিলাদিত্য, প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মে সাধারণের প্রবৃত্তি জন্মাইবার গূঢ় উদ্দেশে[২০] যে উৎসব করেন,[২১] তাহাতে হিউয়েন্থসাঙ্ উপস্থিত ছিলেন। নলন্দার সঙ্ঘারামে অধ্যয়নে তাঁহার পাঁচবৎসর অতীত হয়, তৎপর পাটনা প্রভৃতি স্থান হইয়া বঙ্গদেশে গমন করেন। আদিধর্ম্মপার যজ্ঞ ৬৪১ অব্দের ঘটনা, ঐ সময় তিনি মধ্যভারতে কোন স্থানে ছিলেন, বিবেচনা হইতে পারে এবং তাহাতেই তৎকর্ত্তৃক এতৎযজ্ঞ বিবরণ বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু যখন তিনি শ্রীহট্টরাজ্যের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তখন ইহার পরে তাঁহার এই প্রদেশে আগমন করার বিষয় অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ঐ সময়ে ভারত বহুতর খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, ভ্রমণকারী এক হিন্দুস্থানেই ৭০টি খণ্ড দর্শন করেন। কান্যকুব্জাধিপতির উৎসবে,—কাণ্যকুব্জের পশ্চিম ও পূর্ব্ব ১৮ হইতে জন করদ রাজা উপস্থিত হইতেন।

(আমাদের পূর্ব্বাধ্যায়বর্ণিত তাম্রফলক [প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নাথ বসু মহাশয়ের নির্দ্দেশ মত] খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর অনুমান করিলে এই সময় শ্রীহট্টে ত্রৈপুর রাজবংশ ব্যতীত নবগীর্ব্বান বংশের বিদ্যমানতা নিরূপিত হওয়ায়, এ দেশেও যে খণ্ড খণ্ড রাজ্য ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়।)

যাহাহউক, যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ, স্বদেশে গমনোন্মুখ হইলে মহারাজ আদিধর্ম্মর্কপা (ডুঙ্গুর অথবা দানকুরু ফা[২২]) পঞ্চ তপস্বীকে সেই স্থানে বাস করিতে কৃতাঞ্জলী পূর্ব্বক অনুরোধ করিলেন; ব্রাহ্মণগণ রাজার বিনয়ে তুষ্ট হইলেন ও তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে

২০. ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত এই উৎসবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম, নিজ ঔদার্য্য, জন সাধারণের চিত্তের উপর আধিপত্য স্থাপন, দস্যুদিগকে নিরুদ্যম করা, রাজস্ব প্রদানে প্রজাবৃন্দের প্রবৃত্তি সম্পাদন, ইত্যাদি ব্যতীত হিন্দুব্রাহ্মণদিগকে বৌদ্ধধর্মের বিশুদ্ধতা, জ্ঞান ও প্রভাব প্রদর্শনে আকর্ষণ করাও ইহার অন্তর্নিহিত ছিল।

২১. "In the northern India, for example, a famous Buddhist king Siladitya, ruled at the latter date (634 A.D.) He seems to have been an Asoke of the 7th century A D , and he strictly carried out the two great Buddhist duties of charity and spreading the faith. He tried to extend Buddhism by means of a General Council in 634 A D "
-Hunter's Brief History of Indian people chap V. P 72

২২. "ফা" শব্দ অনার্য্যভাষা সমুদ্ভূত বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন, শ্যান ও ব্রহ্ম দেশীয় নরপতিগণ "ফ্রা" উপাধি ধারণ করিতেন, ফ্রা হইতেই ফার উদ্ভব। ফ্রা প্রভু বাচক, ফা অর্থে পিতা। আসামের আহোম নৃপতিগণও ফা উপাধি ধারণ করিতেন। কিন্তু ত্রৈপুর রাজবংশীয়গণ তৎপূর্ব্ব হইতেই এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। দ্বিতীয় ডুঙ্গুরফাব হইতে এই বংশে উক্ত উপাধি ধারণ রহিত হইয়াছে।

স্বীকৃত হইলেন।[২৩] তখন মহারাজ অতি আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ রাজ্যে ব্রহ্মত্র ভূমিদান করেন।[২৪] ঐ ভূভাগের উত্তর ও পশ্চিমে বক্রগামিণী কুশিয়ারা নদী এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণে যথাক্রমে হাঙ্কলা[২৫] কুকিদের বাসস্থান ছিল; টেঙ্করী[২৬] নামক কুকিসম্প্রদায় ঐ স্থানে জুম চাষ করিত। ঐ স্থান ব্রাহ্মণগণকে দান করায় কুকিগণ দূর পর্ব্বতে চলিয়া যায় এবং তাহাদের পরিত্যক্ত স্থানটী পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় পঞ্চখণ্ড নামে খ্যাত হয়।[২৭]

বৈদিকদের উপনিবেশ

"আসামের বিশেষ বিবরণ" পুস্তিকায় এই বিষয়ে লিখিত আছে, যথা "প্রায় ১৩০০ বর্ষ অতীত হইল, ত্রৈপুর ভূপতি আদিধর্ম্মপা কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এবং হাকালুকি হাওরের পশ্চিমে কতক ভূমি শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি এবং পুরুষোত্তম নামে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। ইহাদিগকে তিনি কোনও যজ্ঞসম্পাদনের জন্য মিথিলা হইতে আনয়ন করিয়া ছিলেন।"

এইরূপ ৬৪১ খৃষ্টাব্দের পরেই ব্রাহ্মণগণ শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে উপনিবিষ্ট হন। তাঁহারা এদেশে বাস করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন না, কিন্তু দৈববশতঃ এদেশেই যখন তাঁহাদিগকে বাস করিতে হইল, এবং এদেশকে নিজেদের বাসের ও নির্জ্জনে ধর্ম্মসাধনের উপযোগী স্থান বলিয়া বোধ হইল, তখন তাঁহারা এদেশে চিরবাসের ব্যবস্থা করার জন্য একবার জন্মভূমে যাইতে

২৩. বৈদিক সংবাদিণী গ্রন্থ ও নব্যভারত পত্রিকা–১৩০৭ বাংলা কার্ত্তিক সংখ্যা দেখ।

২৪. বৈদিক সংবাদিনী ধৃত তাম্রপত্রোৎকীর্ণ শ্লোক এইঃ–

"ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশঃ শ্রীশ্রীযুক্তাদিধর্ম্মপাঃ।
সমাজ্ঞং দত্ত পত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপস্বিষু॥
শ্রীনন্দানন্দ গোবিন্দ শ্রীপতি পুরুষোত্তমাঃ॥
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ বক্রগা ক্রোশিরা নদী।
দক্ষিণস্যাঞ্চ পূর্ব্বস্যাং হাঙ্কলা কৌকিকাপুরী॥
এতন্মধ্যাং সশস্যা যা টেঙ্করী কুকিকর্ষিতা।
প্রালভ্য দত্ত তদ্ভুমি স্তেষু পঞ্চ তপস্বিষু॥
মকরস্থেরবৌ শুক্লে পক্ষে পঞ্চদশী দিনে।
ত্রিপুরা চন্দ্রবাণান্দে প্রদত্তাদত্ত পত্রিকা॥"

এই তাম্রপত্র সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "Report on the Progress of Historical Reasearches in Assam." পুস্তকে ১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ– "Two copper plates of Tippera kings have been reported by Babu Giris Chandra Das, who sent me copies of the inscriptions. The plates themselves, however are not forthcoming at present, and it is feared that they have been lost. The first date, it is said, records a great Dharmapha, king of the mountains of Tippera, invited five vedie Brah mans from mithila in the year 51 of Tippera era.' & এবং গেইট সাহেব প্রণীত আসামের ইতিহাসের ২৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ– "The inscriptions of two old copper-plates recorded the grant of land of Brahmans." &

২৫. হাঙ্কলা কুকিদের নামানুক্রমে হাকালুকি এই হাওরের নাম হইয়াছে। প্রাগুক্ত সময়ের পরে ঐ স্থান ভুকম্পাদিত হাওরে পরিণত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। হাকালুকি সম্বন্ধে কিংবদন্তী ১ম ভাগে ২য় অধ্যায়ে বলা গিয়াছে।

২৬. ভাটেরার তাম্রপত্রোক্ত ভাস্করটেঙ্করী শব্দের সহিত সম্বন্ধ আছে কিনা বিবেচ্য।

২৭. উক্ত স্থানই বর্ত্তমান পঞ্চখণ্ড পরগণা।

প্রস্তুত হইলেন। বৈদিকসংবাদিণীতে লিখিত আছে যে, তাঁহারা এইরূপে একবর্ষ এদেশে বাস করার পর স্ব স্ব স্ত্রীপুত্রাদিকে আনয়নের জন্য রাজাভিপ্রায় মতে পুনঃ স্বদেশে গমন করিলেন। এদেশে আসিয়া নিজেদের শাস্ত্রীয় ব্যাপার ও সম্বন্ধাদি বিষয়ে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে প্রত্যাগমন কালে তাঁহারা স্বসমাজস্থ আরও কতিপয় ব্রাহ্মণকে এদেশে আনয়ন করা আবশ্যক বোধ করিলেন। তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধে অপর পঞ্চগোত্রীয় অর্থাৎ কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদগুল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম গোত্রীয় সপরিকর পাঁচজন দ্বিজ এবং ভৃত্যাদি ও নাপিতাদিসহ পঞ্চখণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।[২৮]

বিষ্ণুপুরবাসী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চৌধুরী আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে ঐ সময়ে অপর পঞ্চগোত্রীয় মধ্যে কেহ কেহ আগমন করিয়া থাকিলেও, ইঁহারা একসময়ে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়না। যাহা হউক, তাঁহারা সকলেই বহুবর্ষ পর্য্যন্ত পরম প্রীতিতে একত্র ছিলেন; মৈথিলীয় কুলাচার ও প্রথানুসারে তাঁহাদের সমস্ত "কর্ম্মকলাপ নির্ব্বাহ হইত।

সমস্ত বঙ্গদেশে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি সম্মানিত, সমস্ত বঙ্গদেশ রঘুনন্দনের মতে পরিচালিত, কিন্তু শ্রীহট্টের শাস্ত্রীয় "ক্রিয়া" মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের মতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহাতেই উপলব্ধি হইবে যে শ্রীহট্টে মৈথিল দ্বিজগণের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল এবং কিরূপ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

বিষ্ণুপুরবাসী শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ কয়েক জনের মতে সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণ কান্যকুব্জাগত; এই বিতর্কের প্রতিকূলে এ কথাটা প্রবলরূপে দণ্ডায়মান হইতেছে।

২৮. "ততঃ স্বদেশীয় স্বগণ বিরহেণ স্তে ক্লিষ্টাঃ সন্তুঃ পুনঃ স্বদেশং গত্বা অবশিষ্ট পঞ্চ গোত্রীয়ৈস্তে পস্বিতিঃ সমবেতাঃ স্ব স্ব কুটুম্ব পুরোহিত যজমানৈঃ শিষ্য ভৃত্য নাপিতাদিভিঃ সহ এতস্মিন্নের পঞ্চখণ্ডাখ্যদেশে- - ---
---বসতিং পরিকল্প্য মৈথিলতুলাচারতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারতশ্চ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম কলাপং এতদ্দেশীয়াচরণাপ্রযুক্তং কর্ম্মচ বিধায় স্থিতাঃ স্বগণৈঃ সাম্প্রদায়িক শ্রেণীবদ্ধাঃ স্বচ্ছন্দং প্রতিবাসিতা।"–বৈদিক সংবাদিণী। এ সম্বন্ধে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস–লিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

প্রঞ্চম অধ্যায়

শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িকগণ

কৈলাসহর ও কাতলের গল্প

বর্ত্তমান কৈলাসহর গবর্ণমেন্ট পোষ্ট আফিসাদি সহ শ্রীহট্ট জিলার,দক্ষিণ পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। এই পরগণা স্বাধীন ত্রিপুরার অধীন। ইহা দীর্ঘে তিন মাইল ও প্রস্থে দুই মাইল বিস্তৃত। গ্রাম-সংখ্যা ৩৬ এবং জনসংখ্যা প্রায় ৬০০০০ মাত্র। কৈলাসহর নগরটিও "ব্রিটিশ" ও স্বাধীন ত্রিপুরার সীমাক্ষেত্রেই অবস্থিত। ত্রিশবৎসর যাবৎ এই সহর স্থাপিত হইয়াছে। কাতলের দীর্ঘী নামক একটি দীর্ঘিকার চারিপার লইয়াই এই ক্ষুদ্র সহর। এই কাতলের দীঘী সম্পর্কে একটি গল্প আছে।

কাতল ও কাকচান্দ নামে দুই ভাই ছিল। কাতলের প্রচুর নগদ টাকা কাকচান্দের গোলাভরা ধান্য ছিল। এক সময় উভয় ভ্রাতা কোনও কার্য্যপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিলেন। তখন দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ধান নাই—নগদ টাকা হাতে থাকা সত্ত্বেও কাতলের স্ত্রীকে উপবাসী থাকিতে হয়। কাতলের স্ত্রী নিরুপায় হইয়া অন্নক্লেশ নিবারণার্থ কাকচান্দের স্ত্রীর অনুগ্রহপার্থিণী হইল, কিন্তু সেই কঠোর প্রাণা রমণী এই অন্নক্লেশ সময় তাহাকে সাহায্য করা দূরে থাক—বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিল। তদবস্থায় অনশনে তাহার মৃত্যু হয়। কাতল দেশে আসিয়া এই ঘটনা শুনিতে পায় ও শোকে বিহ্বল হইয়া যে টাকা তাহার স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পারিল না, এই দীর্ঘিকায় তাহা নিক্ষেপ করতঃ তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া আলৈ অল্পপ্রাণ বিসর্জ্জন করে। কিছুদিন পরে কাকচান্দ বাড়ী আসিয়া এই ঘটনা শ্রবণে ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল হয় এবং নিজের গোলাভরা ধান্য সত্বেও এইরূপ শোকাবহ ঘটনা ঘটিল বলিয়া ধান্যগোলা ভাঙ্গিয়া প্রথমেই এই দীর্ঘিকা-জলে সমস্ত ধান্য নিক্ষেপ করিল এবং পরে স্বয়ং ভ্রাতার শোচনীয় পথের অনুসরণ করিয়া স্ত্রীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

এ গল্পটি এই স্থানে সংযোজিত করিবার উদ্দেশ্য আছে। যখন প্রাচীন কৈলাড়গড় পরিত্যক্ত হয়—যখন ত্রৈপুর রাজগণ শ্রীহট্ট সীমা হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়াছেন, এই ঘটনা তৎকালের। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষেই প্রাচীন সহরটিকে ধ্বংস মুখে পতিত করিয়াছে।

প্রাচীন রাজবাটী

বর্ত্তমান কৈলাসহর যেখানে, সহর তথায় ছিলনা, কিন্তু কাতলের দীঘী পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত ছিল। বর্তমান কৈলাসহরের চারি মাইল উত্তরে প্রাচীন রাজবাটী ছিল, সেই স্থান এখন জঙ্গলাকীর্ণ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রাচীন কৈলাড়গড়ের রাজবাটী সম্বন্ধে (শ্রী শ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ পুস্তিকায়) লিখিয়াছেনঃ—"এই রাজবাটী প্রাচীন মনুনদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, অধুনা মনু প্রায় এক মাইল পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে।"

"রাজবাটীর দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে একটী বিল। এক সময়ে ইহা একটী গম্ভীর হ্রদ ছিল, বেশ বুঝা যায়।"

রাজবাটীর দক্ষিণ প্রান্ত হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত একটি প্রশস্ত রাজপথ আছে, এই "রাজশড়ক" শ্রীহট্ট জিলায় হাকালুকির হাওর বলিয়া যে একটি প্রসিদ্ধ বিল আছে, উত্তরদিকে ঐ হাওর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রাজশড়ক লংলা পরগণার মধ্যদিয়া উত্তর দিকে গিয়াছে। শ্রীহট্টের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কিয়দংশ মেরামত করিয়াছেন। ঐ শড়কের পূর্ব্বে ডাহিনে ও বামে দুইটি মৃৎস্তূপের বাটীর চিহ্ন আছে, ঐ স্থান "কামান দাগার জান, বলিয়া সাধারণে পরিচিত। রাজবাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত একটী জলাশয় "রাজার দীঘী" নামে কীর্ত্তিত, উহার জল অদ্যাপিত উৎকৃষ্ট আছে।'

বর্ত্তমান কৈলাসহরের ছয় মাইল পূর্ব্বে, প্রাচীন রাজবাটীর কিছুদূরে ঊনকোটি তীর্থ। এইস্থান শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোকের একটী তীর্থস্থান। তথায় বহুতর প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি সমূহ রহিয়াছে, মূর্ত্তিগুলি দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। (এই গ্রন্থের ১ম ভাগ ৯ম অধ্যায়ে ঊনকোটির বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।) এই ঊনকোটি তীর্থ দর্শনে শ্রীহট্টের পূর্ব্বভাস্কর্য্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রৈপুর রাজবংশের ইহা একটি কীর্ত্তি।

পরবর্ত্তী ত্রৈপুর নৃপতিবর্গ

পূর্ব্বাধ্যায়ে মহারাজ আদিধর্ম্মকৃপার যজ্ঞ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার পরে পঞ্চদশ পুরুষ পর্য্যন্ত কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বংশপত্রিকা গুলিতে কেবল তাঁহাদের নামের তালিকা মাত্রই আছে। তাহাতে জানা যায় যে আদিধর্ম্মপা বা ডুঙ্গুরফার পুত্র কিরীট কুরঙ্গফা বা খারুংফা), তৎপুত্র রামচন্দ্র, তাঁহার দুইপুত্র, জ্যেষ্ঠ নৃসিংহ (সিংহফণি বা ছেংফনাই) রাজা হন। তিনি নিঃসন্তান হওয়ায় ভ্রাতা ললিত রাওয়ের পুত্র মুকুন্দ ফা তৎপরে রাজ্য প্রাপ্ত হন, মুকুন্দের পুত্র কমল রায়, তৎপুত্র কৃষ্ণদাস, তৎপুত্র যশোফা (যশোরাজ), ইঁহার দুইপুত্র,—উদ্ধব (মুচঙ্গ ফা প্রথমে রাজা হন, কনিষ্ঠ সাধুরায় (সাধরায়) পরে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহার পুত্র প্রতাপ রায়, তৎপুত্র বিষ্ণুপ্রসাদ, তৎপুত্র বাণেশ্বর, তৎপুত্র সম্রাট, তৎপুত্র চম্প বা চম্পকেশ্বর, তৎপুত্র মেঘরাজ। ইঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ ধর্ম্মধর (সংখ্যাচাগ বা ছেংফাছাগ); এই ধর্ম্মধরই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক স্বধর্ম্মপা অথবা সুধর্ম্মপা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার সময় হইতে ত্রৈপুর রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নিধিপতি

পুর্ব্বে কৈলাড়গড়ের যে প্রাচীন রাজবাটীর উল্লেখ করা গিয়াছে, ধর্ম্মধর বা স্বধর্ম্মপার সময়ে ঐ রাজবাটী যে বিশেষ সৌষ্ঠব বিশিষ্ট ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। ঐ সময়ে বাৎস্য গোত্রীয় নিধিপতি দ্বিজের অভ্যুদয় হয়। নিধিপতি দ্বিজের বিষয়ে দুইটি মত আছে। প্রধান ও সুপরিচিত মত এই যে, নিধিপতি পূর্ব্বোক্ত মিথিলাগত আনন্দের সন্তান। বাৎস্যগোত্রীয় আনন্দের পঞ্চদশ পুরুষ পরে তাহার জন্ম হয়।[১]

১. বাৎস্য গোত্রীয় নিধিপতির অনেকগুলি বংশপত্রিকা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু কোনটীতেই কেহ নিধিপতির উর্দ্ধতন উক্ত পঞ্চদশ পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া পাঠান নাই; সকল তালিকাতেই নিধিপতি হইতে বংশাবলী আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি কেহ লিখিয়াছেন যে, বৈদিক পুরাবৃত্ত নামক এক খানি পুঁথিতে ঐ নামগুলি আছে।

মতান্তরে তিনি কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ। এ কথা বলিবার মূলে একটি কবিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে এরূপ লিখিতঃ—

"বাৎস্য গোত্র যজুর্ব্বেদ কান্বশাখা নিজ।
কনৌজ হইতে আসিলেক নিধিপতি দ্বিজ॥"[২]

এই কবিতার উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বাৎস্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকায় নিধিপতিকে কান্যকুব্জাগত বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু যদি নিধিপতি আনন্দের সন্তান হন এবং আনন্দ যখন বহুপূর্ব্বেই এদেশবাসী, তখন উক্ত কবিতার লিখিত "কনৌজ হইতে আসিলেক" এই কথার সার্থকতা থাকে না। এই জন্যই বোধ হয় তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী লিখিয়া পাঠাইয়াছেনঃ—"বাৎস্য গোত্রীয় আনন্দাচার্য্যের বংশধর কোনও এক মহাপুরুষ পুনঃ কনৌজ চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। তৎপর নিধিপতি সেখান হইতে পুনরায় এদেশে আসেন।"[৩]

গুড়াভই বাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর চৌধুরীরও এই মত; তবে একটু বিশেষ আছে। তিনি লিখিয়াছেন,—আনন্দ মিথিলাগত এবং নিধিপতিও তাঁহার বংশীয় বটেন, কিন্তু তিনি কারণাধীনে কনৌজ চলিয়া গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে কারণানুরোধেই মহারাজ স্বধর্ম্মাপার সদনে পুনরাগমন করেন।

যদি নিধিপতি নবাগত না হইয়া, আনন্দের বংশধর হন, তবে এই মতটা কতকাংশে সমীচিন নহে কি?

নিধিপতিই ইটা দেশের স্থাপয়িতা; কথিত আছে, ইটোয়া নামক স্থানে তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল এবং সেই নামানুক্রমে তিনি নববসতি স্থানের নাম ইটা রাখেন।[৪] শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, মিথিলায় ইটা বা ইটোয়া নামে কোন জিলা বা ভূখণ্ড আছে বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইটা এবং ইটোয়, এই উভয় জিলা আধুনিক যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত আগরা বিভাগে।"

এখন বিবেচ্য এইঃ—

১. মিথিলায় আনন্দের বাসগ্রাম ইটোয়ায় ছিল কি না?

২. পূর্ব্বে যে জিলায় নিধিপতির বাস ছিল, তৎনামানুসারে তিনি যে ইটা নাম রাখেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার হেতু আছে কি না?

৩. কেহ কোন গ্রামের নাম কোন জিলার স্মরণে রাখিয়া থাকে কি না এরূপ প্রমাণ আছে কি না?

৪. ইটা বা ইটোয়া নামে কোন নগর কি গ্রাম কখন মিথিলাপ্রদেশে ছিল না। এবং তাহার প্রমাণ সংগ্রহে কি উপযুক্ত চেষ্টা হইয়াছে?

৫. এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর নহিলে নিধিপতিকে কান্যকুব্জাগত বলা যাইতে পারে কি না?

---

২. এই কবিতা মজঃফর নামক জনৈক মোসলমান সাত পুরুষ পূর্ব্বসময়ে রচনা করেন। তদ্বিবরণ পশ্চাৎ উক্ত হইবে।

৩ ইঁহারা নিজ কথার প্রমাণ স্বরূপ বলেন যে বৈদিক পুরাবৃত্ত নামক কুলগ্রন্থে পঞ্চগোত্রীয় দ্বিজগণকে কান্যকুব্জাগত বলিয়া লিখিত আছে। ইঁহারা এই গ্রন্থে প্রামাণ্য স্বীকার করেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িকেরই অপব সম্প্রদায় এই গ্রন্থের প্রামাণ্য ও অস্তি.ত্ব বিশ্বাস করেন না।

৪ কেহ কেহ বলেন যে ইটোয়া হইতে ইটা নহে, দ্বিজগণ নির্দ্দেশার্থ উচ্চভূমে দণ্ডায়মান হইয়া ইটা (ডেলা) নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া পরে তাহা ইটাদেশ বলিয়া আখ্যাত হয়।

ধর্ম্মধর বা স্বধর্ম্মপার যজ্ঞ

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ধর্ম্মধর (স্বধর্ম্মপা বা ছেংফাচাগ) কৈলাড়গড়ের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাৎস্য গোত্রীয় নিধিপতি তদীয় সভায় আগমন করেন। ঐ সময়ে পশ্চিমে নানা উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় তিনি পূর্ব্বঞ্চলীয় এই ক্ষমতাশালী রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া শান্তিতে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক বাস করিতে পারিবেন, এই কল্পনায় এদেশে আসিয়া থাকিবেন।

মহারাজ ধর্ম্মধর বা স্বধর্ম্মপা নিধিপতির সদগুণে সত্বরেই তুষ্ট হন। তাঁহারই উপদেশে সম্ভবতঃ তিনি এই সময়ে, পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় বিশেষ আড়ম্বর সহকারে একটি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

নিধিপতি যে কেবল শাস্ত্রজ্ঞ মাত্র ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি ছিল বলিয়া কথিত আছে।[৫] যজ্ঞ সম্পাদনে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকটিত হয়, তাহাতেই স্বধর্ম্মপা যজ্ঞান্তে তাঁহাকে এক বিশাল জনপদ ব্রহ্মত্র স্বরূপ দান করেন। ইহা তৎকালে মনুকুল প্রদেশ নামে কথিত হইত। বর্ত্তমান ইন্দানগর, ইন্দেশ্বর, ছয়চিরি, ভানুগাছ, বরমচাল, চৌয়ালিশ, সাতগাও ও বালিশিরা, এই কয়েকটি পরগণা ঐ মনুকুল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

স্বধর্ম্মপার[৬] এই যজ্ঞস্থান কৈলাড়গড়ের রাজবাটীর জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। অদ্যাপি লোকে ইহাকে "হোমেরগাত" বলিয়া পরিচিত করে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয়

৫. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন কবিতার যে অংশ পাঠাইয়াছেন তাহাতেও নিধিপতির অলৌকিক ক্ষমতার কথা—অলৌকিকভাবে যজ্ঞ সম্পাদনের কথা পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত—
"অগ্নি হোত্রী মহাশয় নাম নিধিপতি।
মুখ দ্বারা অগ্নি আনি দিলেন আহুতি॥"

৬. বৈদিকসংবাদিনী ধৃত উপবোক্ত ভূমি দানের (তাম্রপত্রোৎকীর্ণ) শ্লোক এইঃ—
"ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশঃ শ্রীশ্রীযুক্ত স্বধর্ম্ম পাঃ।
সমাজ্ঞং দত্তপত্রঞ্চ মৈথিলায় তপস্বিনে॥ (১)
শ্রীনিধিপতি বিপ্রায় বাৎস্য গোত্রায় ধর্ম্মিণে।
প্রাচ্যাং লংলাই [২] কুকিস্থানং প্রতিচ্যাং গোপলা নদী॥ [৩]
চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরস্য দক্ষিণস্যামরণ্যকং। [৪]
ক্রোশিরানদ্যুত্তরস্যাং প্রাগদত্তস্থানমেবহি॥[৫]
এতন্মধ্যা সশস্যা যা মনুকুল প্রদেশিনী।
সপি প্রদত্তা তস্মৈতৎ বৈদিকায় তপস্বিনে॥
শুক্ল পক্ষে তৃতীয়ায়াং দিনে মেষগতে রবৌ।
চতুঃষষ্ঠী শতাব্দেতু ত্রৈপুরে দত্ত পত্রিকা"॥ [৬]
[১] "মৈথিলায়" শব্দ থাকায় নিধিপতি যে মিথিলাগত আনন্দের সন্তান, তাহা বলা যাইতে পারে কি? এই দান পত্র দ্বারা স্থানগত প্রশ্নের মীমাংসা হইতেছে কি?
[২] ইহাদের নামানুসারে লংলা পরগণার নাম হইয়াছে।
[৩] এই নদী সাতগাও ও শমশেরগঞ্জের নিকট দিয়া বরাকে পড়িয়াছে।
[৬] এই অরণ্যই বর্ত্তমান কমলপুর।
[৫] ক্রোশিরাই কুশিয়ারা নদী বা বরাক।
[৬] চতুষষ্টীশতাব্দ অর্থে ৬৪০০ অব্দ, কিন্তু তাহা নহে। "চতুঃ"=৪, "ষষ্টী"=৬০, চতুরধিক ষষ্টী অর্থ ধরিয়া এবং "অঙ্কস্য বামাগতি" অনুসারে ৬০৪ অব্দ হয়। শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "চতুষষ্টা" পাঠ করিয়া ১৬৪ অব্দ লিখিয়াছেন।

বিদ্যাবিনোদ লিখিয়াছেন,—

উক্ত (হোমের গাত) স্থানটি দীর্ঘে এবং প্রস্থে ১৬ হাত করিয়া হইবে। প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে। তথাপি কোনকালে সেখানে যে একটা ছিল, প্রান্তভাগের উচ্চতা দেখিয়া তাহা অনুমিত হয়।"

"হোমেরগাত কথাটি শুনিয়া ত্রিপুররাজদত্ত দুইখানি সনন্দের কথা আমার স্মরণ হইল।"

"এই সনন্দের উল্লিখিত ভূমিদান, প্রচলিত আখ্যায়িকা ও রাজবাড়ীর অবস্থানের বিষয় আলোচনা করিলে মনে হয়ঃ—

১. এই রাজবাড়ী মহারাজ ধর্ম্মপালের (ধর্ম্মপা) সময় বর্ত্তমান ছিল।

২. এই বাড়ীতেই আখ্যায়িকা কথিত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

৩. মহারাজ সুধর্ম্মপাও এই বাড়ীতে থাকিয়াই রাজত্ব করিয়াছিলেন।"

"হোমকুণ্ডের দ্বারা ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা নিঃসংশয় রূপে প্রমাণ হয়।"[৭]

("শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ,"—৩৪ পৃষ্ঠা।)

ধীমান নিধিপতি, ধর্ম্মধর হইতে খৃষ্টীয় ১১৯৪ অব্দে (৬০৪ ত্রিপুরাব্দে) এই ভূমিখণ্ড লাভ করেন।[৮] এইরূপে তিনি বিস্তৃত ভূখণ্ড প্রাপ্ত হওয়ায় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। অতঃপর

৭. ত্রিপুরার ইতিহাসের বংশপত্র লিখিত ছেংপাচাগ, বিশ্বকোষে সংখ্যাচাগ এবং বিদ্যারত্ন প্রকাশিত বংশাবলীতে ধর্ম্মধর ও দানপত্রে স্বধর্ম্মপা বলিয়া লিখিত। রাজমালা মতে ত্রিপুর হইতে সপ্তম স্থানীয় মহারাজ ধর্ম্মপালের পুত্রের নাম সুধর্ম্ম। অনেকে সেই ধর্ম্মপাল ও ধর্ম্মকে যজ্ঞানুষ্ঠানকারী এবং এই ১ম ও ২য় দানপত্র প্রদাতা মনে করেন। আসামের ইতিহাস প্রণেতা গেইট সাহেব ও পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, উভয়েই উক্ত নামে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বলিয়াছি যে, সংস্কৃত রাজমালা মতে (যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক) রাজা ত্রিপুর হইতে তাঁহারা সপ্তম ও অষ্টম বংশীয়, সুতরাং অতি প্রাচীনকালের নৃপতি। [সুতরাং সেই ধর্ম্মপাল কিরূপে ৫১ ত্রিপুরাব্দের দানপত্রোল্লিখিত ভূমিদান করিতে পারেন?] যাহা হউক, শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই উভয় দানপত্রের [অর্থাৎ তাঁহার মতে পিতা পুত্রের] সময়ের সামঞ্জস্য বিধান জন্য প্রথম দান পত্রে "ত্রিপুরা চন্দ্র বানাজে" পাঠ হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপাল তনয় সুধর্ম্ম নৃপতি বর্ত্তমান মহারাজ হইতে ১০৫ পুরুষ উর্দ্ধ; [সুতরাং "বানাজে" পাঠ কল্পনায়ও সময়ের মীমাংসা হইতেছে না,] এদিকে নিধিপতি হইতে তদ্বংশে ২৩।২৪ পুরুষ চলিতেছে। বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুর হইতে ২৩ পুরুষউর্দ্ধে আমরা ধর্ম্মধরকে সিংহাসনাধিষ্ঠিত দেখিতে পাই; অতএব নিঃসংশয়ে তাঁহাকেই যজ্ঞকর্ত্তা ও নিধিপতির আশ্রয়দাতা বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—"হোমের গাত।" ইহা আদিধর্ম্মপার যজ্ঞকুণ্ডের স্থান নহে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে সেস্থান ভানুগাছ পরগণার মঙ্গলপুরে অবস্থিত। এই কুণ্ডের স্থানে স্বধর্ম্মাপা [সুধর্ম্মপা, ধর্ম্মধর বা ছেংপাচাগ] যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহার সন্দেহ নাই। একই যজ্ঞকুণ্ডে দুইজন নৃপতি যজ্ঞ করেন নাই। যজ্ঞকর্ত্তা দুইজন, যজ্ঞস্থানও দুইটি পাওয়া যাইতেছে। কাজেই অধিক প্রাচীনটি প্রথম এবং দ্বিতীয়টী, দ্বিতীয় যজ্ঞস্থান; সুসিদ্ধান্ত ইহাই বটে।

৮. "In 1195 A. D. a Brahman named Nidhipati, who was descended from one of the five original immigrants from Kanouj, received a grant of land in what is now known as the Ita paraganna from the Tipper King."

-Assam District Gazetteers, chap. II. (Sylhet) P. 22.

এই তারিখটা শুদ্ধ নহে—এক বৎসর পশ্চাদ্বর্ত্তী করা হইয়াছে। এবং নিধিপতি কনৌজাগত হইলেও পঞ্চ তপস্বী যে কনৌজাগত নহেন, তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। গেজেটীয়ার গ্রন্থের রচয়িতা ফুটনোটে লিখিয়াছেন যে বাবু দ্বারকা নাথ চৌধুরী হইতে এই বৃত্তান্ত জানিয়েছেন, কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের মত আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে উদ্ধৃত করিয়াছি, সুতরাং ইহা গেজেটীয়ার রচয়িতার আকৃত ভ্রম বই বিচেনা করা যাইতে পারে না।

ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব তাঁহার Statistical Accounts of Assam গ্রন্থে শ্রীহট্টের বিবরণে লিখিয়াছেন যে "খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কোন কোন ব্রাহ্মণ বল্লালী কৌলীন্য প্রথার জ্বালায় পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টের আগমন করেন।" এই সময়ে কেহ কেহ আসিয়া থাকিলেও, তাঁহারা শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িকগণের প্রতিপত্তি দর্শনে ও তাঁহাদের সংশ্রবে তৎসমাজভুক্ত হইয়াছেন।

নিধিপতি নিজ ব্রহ্মত্রপ্রাপ্ত ভূভাগে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া, পঞ্চখণ্ড বাসী বৎস, বাৎস্যাদি অপরাপর বিপ্রবর্গকে তথায় বাসবাটী প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিলেন। অনেকেই তদনুরোধে সম্মত হইলেন, ইহাতে নিধিপতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া, তাঁহাদের সহিত স্বয়ং তথায় বাড়ী প্রস্তুত করিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, যে নিধিপতি ইটোরা নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন, জন্মভূমির নামানুক্রমে তিনি নববসতি স্থানের "ইটা" নাম রাখেন। একস্থানে আমলকী কানন ছিল, স্থানীয় ভাষায় ঐ স্থান "এওলাতলি" নামে কথিত হইত, সেই আমলকী বনবেষ্টিত সুরমা স্থানে তিনি নিজ বাসবাটী নির্ম্মাণ করিলেন।

কথিত আছে, বাৎস্য গোত্রীয় বিদ্যাবিনোদ নামীয় জনৈক তপস্বী তাঁহার পুরোহিত ছিলেন, তাঁহাকেও তিনি স্বীয় নবাধিকৃত ইটা দেশে লইয়া গিয়া ছিলেন। নিধিপতির প্রযত্নে পঞ্চখণ্ড হইতে বহুতর দশগোত্রীয় প্রধান দ্বিজ সেই সময় ইটায় গিয়া বাস করেন, ইহাতে অচিরকাল মধ্যে ইটা সৌষ্ঠবশালী জনপদে পরিণত হয়। এই সময় হইতে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। দেশের মধ্যে তাঁহারা গুণে, ধনে ও জনে সর্ব্বপ্রকারেই ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। নিধিপতি যে ভূভাগ দান প্রাপ্ত হন, তাহা এক সুবিস্তৃত জমিদারী, সুতরাং নিধিপতি হইতে ইটায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সূত্রপাত হয়। বলিতে গেলে ইটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ। একজন বিদেশাগত ব্রাহ্মণ শুধু নিজ গুণগৌরবে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রভাবে এইরূপ একটি হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন।

নিধিপতির পুত্র ভূধর, তৎপুত্র কন্দর্প। পর শতাব্দীতে ইহারা, ত্রৈপুর বংশের আশ্রিতভাবে সুখে শান্তিতে ইটা রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের টীকা

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে যে বিষয় কথিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কয়েকটা আলোচ্য কথা আছে

ত্রৈপুর নৃপতি মিথিলা হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহা ঠিক হইতে পারে,—এবং যখন যজ্ঞকুণ্ড অধুনাও বর্ত্তমান আছে, তখন এই ব্যাপার অমূলক হইবার কথা নহে। তাম্রপত্র দ্বারা ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যমধ্যে স্থাপিত করাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু তাম্রফলকদ্বয়ের যে প্রতিলিপি বৈদিকসংবাদিনীর রচয়িতা তদীয় গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার মৌলিকত্বে গভীর সন্দেহ হয়। তাহার কারণগুলি একে একে বিবৃত করা হইতেছে।

১. তাম্রফলকের ভাষা। যে প্রদেশে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে (বা সমকালে) শ্রীমাধবোদাসকুলাবতংসঃ" (তাম্রফলকের) কবিতার সুনিপুণ লেখক শ্রেষ্ঠকবিজনোচিত ঝঙ্কার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পাঁচজন মহামহিম ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার কালে "সমাজ্ঞং দত্তপত্রঞ্চ" "প্রালভ্য দত্তা তভুমিঃ" "প্রদত্তা দত্ত পত্রিকা" এইরূপ ভাষায় অনুষ্টু পছন্দে মাত্র পটু (?) কেবল কাজের কথা টুকু কষ্টে সৃষ্টে ছন্দোবন্ধকারী একজন লোক ভিন্ন তাম্রশাসন লিখিবার আর কাহাকেও পাওয়া গেল না।

২. দুই তাম্রফলকের ভাষার সমত্ব। দুইখানি তাম্রফলকের তারিখের সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসরের পার্থক্য থাকিলেও দুইখানি যেন একই ছাঁচে লিখিত। সেই "ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশং শ্রীশ্রীযুক্ত," সেই "সমাজ্ঞংদত্ত পত্রঞ্চ" প্রভৃতি উভয়েই বর্ত্তমান। তখন ছাপার ফারম অবশ্যই ছিল না, থাকিলেও শাসন পত্রে ব্যবহৃত হওয়ার কথা শুনা যায় নাই। একই ব্যক্তি এক সঙ্গে

দুইখানি রচনা করিয়াছেন, এই মাত্রই সূচিত হয়।

৩. "আদিধর্ম্মপার" আইদ এই বিশেষণ টুকুর অর্থ কি? মনে করুন ইংলণ্ডে প্রথম উইলিয়মকে কোনও আদেশ পত্র জারি করিতে হইবে। তখনও আর দ্বিতীয় উইলিয়মের উদ্ভব হয় নাই যে তাঁহাকে "প্রথম" এই বিশেষ গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং তিনি কেবল "উইলিয়ম" এই লিখিবেন। দ্বিতীয় উইলিয়মের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণই কেবল তাঁহার কথা বলিতে গিয়া "প্রথম উইলিয়ম" এইরূপ লিখিবেন।

৪. "শ্রীশ্রীযুত" এই বিশেষণ আজকাল ত্রিপুরার রাজ সরকারের কাগজ পত্রে ব্যবহার হয়; বহুপূর্ব্বে এইরূপ ভাষা ছিল না।

৫. পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর শ্রীহট্ট দেশীয় ছিলেন। তাঁহারা রাজমালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে এই যজ্ঞ কাহিনী, শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণস্থাপন, ব্রহ্মত্র দান সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। অথচ রাজমালায় আদি ধর্ম্মপার বহু পূর্ব্বের সময় হইতে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৬. ত্রৈপুর শালের উল্লেখে প্রাচীন তাম্রশাসনে রহিল, অথচ তাহার বহু পশ্চাৎ সময়ে ত্রিপুরার শাসনে শকাব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

দানপত্রের প্রতিকূলে এই সকল আপত্তি করা যাইতে পারে। সমগ্র বৈদিক সংবাদিনীতে এইরূপ অনেক আপত্তিজনক কথা স্থান পাইয়াছে, তন্মধ্যে শাকুনিক যজ্ঞ উল্লেখযোগ্য।

৭. শ্যামল বর্ম্মা নামক প্রসিদ্ধ নৃপতি কর্ত্তৃক ঠিক অপর এক স্থানেও নিবন্ধন যজ্ঞকর্ম্ম কাহিনী ও ব্রাহ্মণ আনয়নের উল্লেখ দেখা যায়। তদনুকরণে যজ্ঞ এবং "আদি" শূরের অনুকরণে "আদি" ধর্ম্মপার দ্বারা ব্রাহ্মণ আনয়ন ব্যাপারটা কল্পিত বলিয়া বোধ হয় নাকি?

এই সকল প্রশ্ন উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক, এই জন্যই এগুলির উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিলাম।

আমাদের বিবেচনায় যজ্ঞ ও ভূদানাদি যথার্থ হইলেও দানপত্রগুলি বহুপূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিবরণটা প্রসিদ্ধ, অনেকেই জ্ঞাত ছিলেন, এবং তাহাই অবলম্বনে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ বংশীয় এক ব্যক্তি (শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য) ইদানীং বৈদিক-সংবাদিনী রচনা করিয়া যতটা কিংবদন্তীর সহায়তাতে পারেন, ততটা ইতিহাসরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাম্রফলক একটা কি দুইটা ত্রৈপুর নৃপতি দিয়াছিলেন,—ইহা ঠিক হইতে পারে, যজ্ঞকুণ্ডের অস্তিত্বে যজ্ঞ ব্যাপারও অমূলক নহে, ইহাই সূচিত হয়। তবে তাম্রশাসনের প্রতিলিপি না পাইয়া বৈদিকসংবাদিনীকার নিজ ভাষায় উহার বিবরণ যতটা শুনিয়াছেন, ততটা স্বশক্তি অনুসারে পদ্যে রচনা করিয়াছেন। "কথায়াং সরসং বস্তু পদ্যৈরেব বিনির্ম্মিতম্" ইহা অলঙ্কার শাস্ত্রের সম্মত। সুতরাং গদ্য রচনার মধ্যে এই পদ্য সন্নিবেশ অসঙ্গত হয় না। এইটা সুতরাং তাম্রলিপির অবিকল নকল নহে—তাহাদের কথা জনশ্রুতি দ্বারা যেরূপ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তন্মধ্যে পদ্যে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। এই জন্যই "শ্রী শ্রীযুক্তাদিধর্ম্মপা" আধুনিকোচিত ভাব ও ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

যজ্ঞ হইয়াছিল, ইহা ঠিক; কিন্তু কি জন্য হইয়াছিল, এতকাল পরে স্মরণ না হওয়াতে অপর স্থানের তাদৃশ ঘটনার ছায়াপাত হওয়া অস্বাভিক নহে।

শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে রাজমালা রচনা করেন, ইঁহারা যজ্ঞকালের বহুপরবর্ত্তী—আধুনিক লোক এবং বোধ হয় সাম্প্রদায়িক শ্রেণীর নহেন; তাই এই বিষয়টা ভুল করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য বড় গুরুতর। কোনও কথা চাপিয়া না রাখিয়া যথাশক্তি আন্দোলন করাই সঙ্গত। এই জন্যই সাম্প্রদায়িকাগমন সম্বন্ধে এস্থলে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে এক শ্রেণীর মত এই যে আদিধর্ম্মপা আদিশূরের মতই কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহারা তাঁহাদেরই বংশধর। নিজ কথার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বৈদিক পুরাবৃত্ত নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ করেন। বৈদিক পুরাবৃত্তের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান আছেন; এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ২য় ভাগ ২য় খণ্ডের ৬/৭ অধ্যায়ের টীকাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

আমরা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ পত্রিকায় রঘুনাথ শিরোমণি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সে প্রবন্ধ প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব্বে, সাম্প্রদায়িকগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ যে মিথিলা হইতে আসিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করিতে শুনা যাইত। এখনও অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের মত এই যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ মিথিলাগত। যাঁহারা আপনাদিগকে মিথিলাগত বলেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বৈদিকপুরাবৃত্তের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন। বস্তুতঃ এইরূপ গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ করা নিরাপদ নহে।

বৈদিক পুরাবৃত্তে লিখিত আছে যে, বলভদ্র সিংহের নামান্তরই শিলাদিত্য বা শ্রীহর্ষবর্দ্ধন। এক "পুরাবৃত্ত" ব্যতীত শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনেব এইরূপ নামান্তর আর শুনা যায় নাই। সাম্প্রদায়িক সমাজের পরিচিত বলভদ্র নামটী কোনরূপ রক্ষা করাই এস্থলে গ্রন্থলেখকের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রসিদ্ধ শিলাদিত্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ইহা বলা গিয়াছে। তিনি প্রয়াগে যে উৎসব করেন, তাহা বৈদিক যজ্ঞ নহে। পুরাবৃত্তকার এই উৎসবকেই বৈদিক যজ্ঞ আখ্যা দিয়াছেন। উক্ত মতে সেই "যজ্ঞে" আদিধর্ম্মপা নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন, এবং "যজ্ঞ" দর্শনে তাঁহারও তদ্রূপ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নৃপতি বৈদিক যজ্ঞ করিতে যাইবেন কেন? যিনি উক্ত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, সেই হিউয়েন্থসাঙ্ এই সময়কার একটা ঘটনার বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মণেরা শিলাদিত্যের শ্রমণানুরাগ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গুপ্তহত্যা করিতে প্রয়াস পায়। তাঁহারা সংঘারামে অগ্নি প্রদান করেন। সেই সময় ছুরিকা হস্তে একটি লোক ধরা পড়িল। এই ব্যক্তি শিলাদিত্যকে হত্যা করিতে উদ্যোগ করিয়াছিল। শিলাদিত্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কেন এই কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ?" সে বলিল "মহারাজ বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, "শ্রমণদিগকে সমধিক শ্রদ্ধা করিতেছেন, ইহাতে বিধর্ম্মীরা (ব্রাহ্মণেরা) লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছে এবং আমার মত হতভাগ্যকে উৎকোচ ও তোষামোদে বাধ্য করতঃ এই গোলযোগের অবকাশে রাজাকে গুপ্তহত্যার জন্য নিযুক্ত করিয়াছে।" অচিরাৎ ষড়যন্ত্রকারী ৫০০ ব্রাহ্মণকে নৃপাগ্রে অভিযুক্ত করা হইল, এবং নৃপতি প্রধান প্রধান বিদ্রোহীকে দণ্ড দিলেন।'

(বিল সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত সি-যু-কি গ্রন্থ ১।৫।২৮১ পৃষ্ঠা-২১)

শিলাদিত্য যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, উক্ত গ্রন্থে এইরূপ বহুতর ঘটনাতে প্রকাশ পায়। তিনি বৈদিক যজ্ঞ করিবেন কেন?

যাহা হউক, পুরাবৃত্তে লিখিত আছে যে, আদিধর্ম্মপা শিলাদিত্যের অনুকরণে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে আগত পঞ্চতপস্বী সিন্ধুদেশে যবনোপদ্রব জন্য ("জ্ঞাত্বা সিন্ধুপ্রদেশতু যবনস্য পরাক্রমং", আর কান্যকুব্জ না গিয়া, আদিধর্ম্মপার নিকট কিছু ভূমি প্রার্থনা করেন, এবং তৎপ্রাপ্ত এদেশেই থাকিয়া যান।

আদিধর্ম্মপার যজ্ঞ ৬৪১ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, মোহাম্মদের মৃত্যু ৬১২ খৃষ্টাব্দে হয়। ইহাব একশত বৎসর পরে (৭১১ খৃষ্টাব্দে) কাশেম সিন্ধুতীরে উপস্থিত হন। সুতরাং পঞ্চতপস্বীর সময় সিন্ধুতীরে যেন ভয়ের কোন কারণই ছিল না। পুরাবৃত্ত মতে পঞ্চবিপ্র পথে পথে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়া আগমন করায় দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম দূরীভূত হয়। তাঁহাদের তর্কপ্রবাহে বৌদ্ধগণ তিষ্ঠিতে পারে নাই। বৌদ্ধ প্রচারকেরা তাঁহাদের ভয়ে নানাদেশে পলায়ন করে। ("বৌদ্ধপ্রচারকঃ সর্ব্বেভয়াত্তেষাং পলায়িতাঃ") কিন্তু শঙ্কর-বিজয়াদি গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, মহামতি কুমারিল ভট্টই প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তিনিই সুধন্বা-সভায় পিকধ্বনি লক্ষ্য করিয়া শ্লেষাত্মক—

"মলিনৈশ্চেন্ন সঙ্গতে শঠৈঃ কাককুলৈঃ পিক।

শ্রুনিদূষক নিহ্লাদৈঃ শ্লাঘনীয়স্তদাভবে।"—(শঙ্করবিজয়)

ইতি শ্লোকবাক্য পাঠ করিলেই যুদ্ধারম্ভ হয়। ফলতঃ কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বাকার এই বৌদ্ধ বিজয় সম্বন্ধে আমরা আর কোথাও একটী ছত্রও প্রাপ্ত হই না।

পুরাবৃত্ত মতে পঞ্চতপস্বী "ত্রিপুরার রাজধানী জয়পুরে (?) শক্তি, বিষ্ণু ও শিব প্রতিষ্ঠা ও সংকীর্ত্তনাদিতে ন্যস্তচিত্ত ছিলেন।"

বৈদিক পুরাবৃত্ত ব্যতীত অপর কেহই যেরূপ পঞ্চতপস্বীর বৌদ্ধ-বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করেন নাই, সেইরূপ তাঁহাদের এই কীর্ত্তিটা-সেই প্রাচীন কালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি, শিব ও বিষ্ণু মূর্ত্তিরও কোন নিদর্শন ত্রিপুরায় যে মিলে না? বরং অব্রাহ্মণ পূজিত চতুর্দ্দশ দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি ঐ সকল দেবদেবীর বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্বপ্রচারিত (!) সেই সংকীর্ত্তনের সংবাদ সংবলিত কিছুই পাওয়া যায় না!

আরও লিখিত আছে,—বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তাবৎ "জাতিহীন" ব্রাহ্মণগণকে তন্ত্রোপদেশ করা হয়। এত লোক সমাজ বহির্ভূত থাকিলে চলিবে কেন? কিন্তু দুঃখের বিষয়, শঙ্কর বিজয়াদি আলোচনায় দেখা যায় যে, শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণসমাজে তান্ত্রিক দীক্ষাপদ্ধতির একান্ত অভাব ছিল। অতএব পুরাবৃত্তের এইরূপ সংবাদ কতদূর সত্যমূলক তাহা বিবেচ্য বটে।

নিধিপতি দ্বিজ সম্পর্কে লিখিত আছে যে, তপস্যার্থে তিনি কান্যকুব্জ হইতে প্রয়াগে আগমন করেন, পরে যবনভয়ে স্বধর্ম্মপার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন।

এস্থলে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক যে, যবন ভয় কোথায় উপস্থিত হইয়াছিল? প্রয়াগে?—তাহা হইলে দেশে ফিরিয়া গেলেই চলিত। তাহা যাহাই হউক, তপস্যাকামী নিধিপতি কাশী প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ ত্যাগ করিয়া কেন একবারে ত্রিপুরা রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, কেনইবা মন্ত্রিত্বরূপ মহাসাংসারিকতায় বিজড়িত হইলেন, পুরাবৃত্তে এ প্রশ্নের সদুত্তর মিলিবে না।

আর অধিক কথার আবশ্যক নাই, নিধিপতি কান্যকুব্জাগত না হইতেই ক্ষতির কি কারণ আছে? ফলকথা—নিধিপতির জন্মস্থান যে কান্যকুব্জে তাহা সুনিশ্চিতরূপে কেহই বলিতে পারিবেন না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমাজে অবিসংবাদীরূপে যখন দানপত্রদ্বয়ের যথার্থ স্বীকৃত, এবং তাহাতে যখন সে "মৈথিলেষু" ও "মৈথিলায়" শব্দ পাওয়া যাইতেছে, তখন সাম্প্রদায়িকদের পূর্ব্বপুরুষ ও মিথিলাগত, তাহা একরূপ নিশ্চিত এবং ইহা তাঁহাদেরই মত-সম্মত বলা যাইতে পারে। বৈদিক পুরাবৃত্তের কথায় অনেক স্থলেই যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, ইহা যে অপ্রামাণ্য গ্রন্থরূপে অসঙ্গত ভাবে পরিত্যক্ত হয় নাই, এই সামান্য কথা কয়েকটিতেই তাহা বুঝা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মোসলমান আক্রমণ

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ধর্ম্মধরের গৌরবাত্মক রাজত্ব কাল। ঐ সময়ে তিনি যে শ্রীহট্টের একছত্র নরপতি ছিলেন, তাহা বলা যায় না। ঐ এক সময়েই বর্ত্তমান সুনামগঞ্জ সবডিভিশনের অন্তর্গত লাউড়ে বিজয় মাণিক্য নামে জনৈক হিন্দু নৃপতির রাজ্য ছিল বলিয়া জানা যায়। তৎকাল পর্য্যন্ত ত্রৈপুর রাজবংশে মাণিক্য উপাধি ধৃত হয় নাই। বিজয় মাণিক্য দ্বাদশ শতাব্দির নৃপতি বলিয়া (সময়ের ক্রমানুরোধে) এস্থলে তাঁহার উল্লেখ মাত্র করা গেল, তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে পাঠক তাঁহার কাহিনী দেখিতে পাইবেন।

কীর্ত্তিধর ও হীরাবন্ত

মহারাজ ধর্ম্মধরের পুত্রের নাম কীর্ত্তিধর (সিংহতুঙ্গ বা ছেংথুম ফা), তিনি সত্যনিষ্ঠ, ঈশ্বরভক্তি পরায়ণ ও রণনিপুণ ছিলেন। তিনি মিহিরকুল রাজ্য (প্রাচীন কমলাঙ্ক) জয় করিয়া মেঘনাদ তীর পর্য্যন্ত নিজ রাজ্য সীমা বিবর্দ্ধন করেন। রাজমালা লেখক বলেনঃ—

"তান পুত্র ছেংথুম রাজা মেহেরকুল জিনে।"

হীরাবন্ত নামে তাঁহার জনৈক সামন্ত তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হইলে হীরাবন্ত ভয়াতুর হইয়া গৌড়েশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৌড়াধিপতি আশ্রিতের সাহায্যে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। সেই সৈন্যের আধিক্য দর্শনে মহারাজ কীর্ত্তিধর ভয়াতুর হইয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরদিবস রাজা স্বয়ং গজারোহণে রণসাজে রণক্ষেত্রে সৈন্যগণসহ উপস্থিত হইলেন। ভীষণ সংগ্রামে শত্রুপক্ষ পরাজিত হইল। যুদ্ধাবসানে মহারাজ যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের সংখ্যা দর্শনে বিস্মিত হইলেন। দুঃখের বিষয় বীরেন্দ্র সমাজ বরণীয়া এই বীরনারীর নাম রাজমালায় উল্লিখিত নাই। এই সংগ্রামে রাজ জামাতা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি প্রধান সেনাপতির পদে বরিত হন, এবং তদবধি ত্রৈপুর রাজবংশে রাজ-জামাতাকেই সেনানায়ক প্রদান করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ত্রৈপুর সামন্ত এই হীরাবন্তের কাহিনী হীরানন্দের উপাখ্যান স্মরণ করাইয়া দিতেছে। হীরানন্দের উপাখ্যান বারনারন[1] নামক একখানি প্রাচীন পুস্তকে লিখিত আছে। হীরাবন্ত এবং হীরানন্দ উভয়েই শ্রীহট্ট প্রদেশীয়, সুতরাং একব্যক্তি কি না, বিচার সাপেক্ষ। হীরানন্দের উপাখ্যান এস্থলে সন্নিবেশিত করিবার আর এক কারণ এই যে, শ্রীহট্টে সর্ব্ব সময়েই যে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড রাজ্য ছিল, এই উপাখ্যান হইতে তাহাও প্রমাণিত হয়।

---

১. বাবাম্বর একখানি পাঁচালী। শ্রীহট্টবাসী রঘুনাথ নামে কোন কবি ইহার রচনা করেন। ইহার ভাষায় এমত বহুতর শব্দ রহিয়াছে, যাহা শ্রীহট্ট ভিন্ন অন্যত্র প্রচলিত নাই। অন্যান্য পাঁচালীকারের ন্যায় এই গ্রন্থকারও নানা অপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীব্রজগোপাল বন্ধ্যঘাটী উড়িষ্যাদেশে তালপত্রে এই লিখিত পুঁথি পাইয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত করেন। বাঙ্গালার পূর্ব্ব প্রান্তে রচিত এই পুঁথিখানা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল, অথচ স্বদেশে ইহার নামও হয়ত অনেকে জানে না!!

পাঁচালীমতে শ্রীহট্টের মগধ রাজ্য

শ্রীহট্টে মগধ নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। শ্রীহট্টের মগধের নাম কামাখ্যাতন্ত্রে আছে। পুরাকালে শ্রীহট্টের একটা পর্ব্বতের নাম মগধ ছিল,[২] এই স্থানে অবশেষে তন্নামে একটা খণ্ড রাজ্য স্থাপিত হয়। এই রাজ্যের রাজা পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ পাঠ হইত; পূর্ব্বে এইরূপ প্রথা সর্ব্বত্রই ছিল। বৈষ্ণব গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, বিষ্ণুপুরের রাজা দস্যু দলপতি হইলেও এই প্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করেন নাই। যাহোক, রাজা একদা কৃষ্ণগুণ শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন কোষাধ্যক্ষ চন্দন চামরের অভাব জ্ঞাপন করিলে, রাজা তদ্দেশীয় হীরানন্দ সাধুকে চন্দন চামর যোগাইতে আদেশ করিলেন। সাধু আদেশানুযায়ী "সোণামুখী ফেরুয়াল" (সোণামুখী নামে নৌকা) সাজাইয়া চন্দন চামরের জন্য যাত্রা করিলেন; ত্রিপুরা, রঙ্গপুর প্রভৃতি কত দেশ পাইলেন, তার পরে সাধু "নৈরাট পাটনে" উপস্থিত হইলেন! তত্রত্য রাজা সাধুকে পরিচয় জিজ্ঞাসিলে সাধু কহিলেনঃ—

"শ্রীহট্ট নগরে বাস মগধ নৃপতি।
চিরকাল করি তার রাজ্যেতে বসতি॥
মোর নাম হীরানন্দ শুন নৃপবর।
রাজার ভাণ্ডারে নাই চন্দন চামর॥
আমারে পাঠাইল রাজা তোমার এদেশে।
চন্দন চামর লৈয়া যাইব বিশেষে॥" (বাবাম্বর)

তৎপরে জনৈক যাদুকরের কোপে পড়িয়া হীরানন্দকে বহু দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু হীরানন্দের সেই সকল কাহিনী বিস্তারিতরূপে বর্ণন করার প্রয়োজন নাই, ইতিবৃত্তে যোজন যোগ্যও নহে।

সে যাহা হউক, মহারাজ কীর্ত্তিধর প্রথম যৌবনে বলবীর্য্যের পরিচয় দিয়া থাকিলেও বৃদ্ধকালে তদীয় ভীরুতার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তদীয় উদ্যমে হীরাবন্তের আশ্রয়দাতা পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অতি সত্বরেই গৌড়-পতি ইহার প্রতিশোধ লইতে দ্বিতীয় আয়োজন করেন। এই নরপতির নাম গিয়াসউদ্দীন।

মোসলমানের প্রথমাক্রমণ

শ্রীহট্টের পুণ্যভূমি সর্ব্বপ্রথম গিয়াসউদ্দীনের সময়েই মোসলমানগণ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়। গিয়াসউদ্দীন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন, তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা ও রাস্তাদিতে গৌড়রাজ্য ভূষিত করেন। তিনি হিন্দু মোসলমান ভেদে শাসন প্রভেদ করিতেন না। তিনি দিল্লীর অধীনতা পাশ ছেদন করতঃ স্বাধীনতাবলম্বন করিয়াছিলেন; এবং পূর্ব্বাঞ্চলীয় কোন কোন রাজাকে পরাভূত করিয়া ছিলেন।[৩] এই পূর্ব্বাঞ্চলীয় রাজগণের মধ্যে ত্রৈপুর বংশীয় মহারাজ অন্যতম।[৪] কেহ

২. "ত্রিপুরা কৌকিকা চৈব জয়ন্তি মণি চন্দ্রিকা।
কাছাড়ী মাগধী দেবী আসামী সপ্ত পর্ব্বতোঃ॥"
–বৈদিক সংবাদিনী ধৃত কামাখ্যা তন্ত্র বচনং।

৩. "At a time-Ghyas Addin was employed in subduing some of the Rajas in the eastern parts of Bengal.'
-Stewart's History of Bengal Sect. III. P. 65

কেহ বলেন যে, এই পরাজয়ের পর কৈলাড়গড় হইতে রাজ্যপাট আধুনিক কসবা নামক স্থানে নীত হয়, এবং তাহাও পূর্ব্বনামানুসারে মোসলমানগণ কর্ত্তৃক জাজিনগর নামে কথিত হইতে থাকে।

কসবা শ্রীহট্ট জিলাধীন নহে, সুতরাং কীর্ত্তিধরের রাজত্বকাল পর্য্যন্তই শ্রীহট্টের ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ। কসবাতে যে একসময় ইঁহাদের রাজধানী ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণও আছে। এ সময়ের পরবর্ত্তী কালে মোসলমানদের জাজিনগর বিজয়ের যে সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা শ্রীহট্টের কৈলাড়গড় সম্বন্ধে নহে,—এই কসবা সম্বন্ধে। উদাহরণ স্বরূপ তুগ্রলের জাজিনগর আক্রমণের নাম করা যাইতে পারে।

মহারাজ কীর্ত্তিধরের পুত্রের নাম রাজসূর্য্য (আচঙ্গফা বা কুঞ্জহোম ফা), তদীয় মহিষী অতি গুণবতী ছিলেন; তাঁহার উৎসাহে রাজ্যে শিল্পবিদ্যার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ইহার পুত্র মোহন (বা খিছুংফা); তাহার পুত্র ধর্ম্মপা (ডুঙ্গুর ফা, দানকুরু ফা বা হরিরায়।) ইহাকে দ্বিতীয় ধর্ম্মপা বা দ্বিতীয় ডুঙ্গুর ফা বলাই সঙ্গত। ইহা হইতে পৃথকত্ব সূচনার জন্য কি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপা আদি ধর্ম্মপা নামে পশ্চাৎ কথিত হইয়াছেন? যাহাই হউক, ইঁহাদের রাজত্ব কালে শ্রীহট্ট দ্বিতীয় বার মোসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল; কিন্তু সে আক্রমণ ইঁহাদের উপর হয় নাই।

মোসলমানের দ্বিতীয় আক্রমণ

সম্রাট নসিরউদ্দিন কর্ত্তৃক ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে এক্তিয়ার উদ্দীন তুগ্রলখাঁ মালিক ইয়াজবেগ বাঙ্গালার গবর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি উড়িষ্যার ভূপতির সহিত ভীষণ আহবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধে কতক কৃতকার্য্য হইলেও তৃতীয় যুদ্ধে ঘোরতর পরাজিত ও পলায়ন পরায়ণ হন। তখন আর দক্ষিণ দিকে কোন সুযোগ না দেখিয়া তৎপর বর্ষে সসৈন্য শ্রীহট্টাভিমুখে যাত্রা করেন। তৎপ্রচলিত অগণ্য পাঠান সৈন্যের পক্ষে শ্রীহট্টের খণ্ড রাজ্য বিশেষ জয় করা আয়াস সাধ্য হয় নাই। জয়ান্তে নগরী বিলুণ্ঠনে তিনি বহু হস্তী ও অর্থ লাভ করেন।[৫]

ঐ রাজার নাম কি ছিল এবং তাঁহার রাজ্য শ্রীহট্টের কোন অংশে ছিল, নিশ্চিত বলা যায় না। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসে আছে যে, ইয়াজউদ্দীন এই উদ্যমে শ্রীহট্টের আজ্‌মরদন নামক স্থানের অধিপতিকে পরাজিত করেন এবং তিনি তথায় কিছুদিন বাস করিয়া সেই নগরী বিলুণ্ঠনে বহুতর মূল্যবান সম্পত্তি ও হস্তী প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। যখন সেই দেশের অধিবাসী মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়, তখন তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দীদিগকে লইয়া লক্ষণাবতী গমন করিয়াছিলেন।[৬]

---

8. "Of all the Goveiners of the first period of independence, Ghyasoodeen was the only one who ruled well. He is said to have made no distinction between the Hindoos and the Mahomedans and to have been a great benefactor to the country. He was very powerful, far he made the Raja of Assam, Tirhoot and Tipperah pay tribute."
-Barton's Bengal chap. IV. P. 76.

৫. "Returning to Gour, he next invaded Sylhet and obtained much plunder"
-Marshman's Out-line of the History Bengal, Sect. I. P. II.

6. "In the followin year, he invaded the territories of the Raja of Asmurdan and took the capital of that prince, with all his treasures and elephants. After overrunning that country for some months, he returned, loaded with plunder and captives to Lucknowty."
-Stewart's History of Bengal. Sect. III P. 73.
এই বর্ণনা পাঠে অনুমিত হয়, আজ মরদনপতি, ইরাজবেগকে বিশেষ যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, সেই আক্রোশে তিনি এই রাজ্য কে সমূলে বিনষ্ট করিয়া বন্দীসহ গৌড়ে গমন করিয়াছিলেন।

ষ্টুয়ার্ট সাহেব শ্রীহট্টাধীন এই আজ্‌মরদন নগরীকে তত্রত্য "আজমরগঞ্জ" (বর্ত্তমান আজমীরগঞ্জ) বলিয়া অনুমান করেন। বস্তুতঃ আজ্‌মরদন নাম রূপান্তরিতাবস্থায় আমীরগঞ্জ নামের সহিত যত সাদৃশ্যাত্মক, শ্রীহট্ট জিলার কোন নামের সহিত সেইরূপ সাদৃশ্য নাই।

অপরিচিত বিলুপ্ত রাজ্য

ইতিপূর্ব্বে শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত "মগধ" নামক খণ্ড রাজ্যের উল্লেখ করা গিয়াছে। সেই মগধ ও এই আজ্‌মরদন রাজ্য ব্যতীত ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে যে আরও খণ্ডরাজ্য ছিল, তাহা জানা যায়। (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) করমণ্ডকল উপকূলের ওলন্দাজ গবর্ণর ভান-ডিন-ব্রোক (Van den Broucke) কৃত মানচিত্রে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতীরে "অসুই" এবং "উদিসি" নামে দুই ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যের উল্লেখ আছে। সৈয়দ হুসেন শাহের সময়ে ঐ অঞ্চলে "মুয়াজ্জমাবাদ" নামে এক ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্য থাকার সংবাদ পাওয়া যায়। মুয়াজ্জমাবাদ অর্থে পুণ্যময় স্থাণ। শ্রীহট্টও মোসলমানগণের কাছে পুণ্য ভূমি। কিন্তু এ সকল স্থানের পরিচয় করা এখন দুরূহ ব্যাপার। ঐ মানচিত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের পাশে "কোডাবাস্‌কাম" নামে আর একটী স্বতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীহট্টেও "চিবিটাবিটিয়" (Civite Betia) নামে আর একটা স্থান ছিল; এই নাম লাটিনের বাঙ্গালা রূপান্তর মাত্র। মগধ ও আজ্‌মরদন রাজ্য শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল বলিয়া যেমন নির্দ্দেশ আছে, অসুই ও উদিসি প্রভৃতি সম্বন্ধে তদ্রূপ স্থান নির্ণায়ক কোন প্রমাণ নাই।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বাঞ্চলীয় সমস্ত নিম্ন ভূমিকে মোসলমান ঐতিহাসিকগণ "ভাটী" এই সাধারণ নামে পরিচিত করিয়াছেন। "আইন-ই-আকবরি" তে ভাটী প্রদেশের উল্লেখ আছে। ঢাকা, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ প্রভৃতি ভাটী প্রদেশের অন্তর্গত। শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার প্রণীত ময়মনসিংহের ইতিহাসের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ময়মনসিংহের পূর্ব্ব সীমায় প্রাচীনকালে মেঘনা নদী ছিল, বর্ত্তমান সময়ে ঐ নদী ঐ অংশে ধনু নামে পরিচিত, মোসলমান ঐতিহাসিকগণ মেঘনা তটভূমিকে ভাটী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ময়মনসিংহের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ খালিসাজুরীকে ভাটী নামে অভিহিত হইতে অনেক কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাটী প্রদেশের কথা শ্রীহট্টেও শুনা যায়, শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশে ইহা ছিল, এখনও শ্রীহট্টে "ভাটী" শব্দে হবিগঞ্জাদি পশ্চিমভাগস্থ দেশই উদ্দীষ্ট হয়।

নিষ্কর্ষ

পূর্ব্বে এই যে সকল রাজকীর্ত্তি বর্ণিত হইল, এ সমস্তই খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। এই সময় পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের ঐতিহাসিক বিবরণ যদিও যৎসামান্যরূপ পাওয়া যায়,—যদিও ইহাতে ইতিহাস পাঠকের পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা নাই, তথাপি এই পর্য্যন্তই শ্রীহট্টের গৌরবাত্মকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জনশ্রুতির বীণাধ্বনি যদি একেবারে মিথ্যা না হয়,—এই সময়টিতেই শ্রীহট্ট প্রাচীনত্ব গৌরবে বিশেষ স্পর্দ্ধা করিতে পারে।

সভ্যতা সম্পদে গৌরবান্বিত প্রাচীন গৌড় দেশও ঐ বিষয়ে শ্রীহট্টের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। প্রাচীন কাল হইতেই শ্রীহট্ট আর্য্য সভ্যতা সমীরণের স্পর্শ অল্প অল্প অনুভব করিতে পারিয়াছিল। সেই মৃত সঞ্জীবন সমীরণের সে স্পর্শমণি সংস্রবের প্রমাণ স্বরূপ রাঢ়, ডোম, মাহিমাল প্রভৃতি বলা যাইতে পারে। সে প্রাচীন পৌরাণিক যুগে মহাবীর ভগদত্তের মহত্ত বীরেন্দ্রাণী প্রমীলার সমরলীলা শুধু স্মৃতিপটে অক্ষয় তরঙ্গ লেখা রাখিয়া অতীতের গর্ভে লুকাইয়া গিয়াছে। তারপর নবগীর্ব্বাণি বংশের প্রভাবঃ—পূর্ব্বাঞ্চলে আর কোন রাজবংশ এইরূপ হস্তী

অশ্বরথ পদাতি চতুরঙ্গিণী সেনাসহ শত্রু ত্রাস সমুৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই, আর কাহারও সমরতরির পতাকা প্রকাশে প্রসূন ফুটায় নাই, আর কোন রাজবংশের পাদপীঠ এইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতি বৃন্দের মুকুট কর্ত্তৃক চুম্বিত হওয়ার কথা শুনা যায় নাই; এই জন্যই পরিব্রাজক হিউয়েন্থসাঙ্গ বহুতর সুসভ্য জনপদের সহিত শ্রীহট্ট রাজ্যের উল্লেখ আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। আদি ধর্ম্মপার যে যজ্ঞ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, যদি তাহা কিছুমাত্র সত্যমূলক হয়, তবে আদিশুরের সুমহৎ কীর্ত্তি হইতে তদীয় কীর্ত্তি কোন অংশেই ন্যূন নহে। পূর্ব্বপ্রান্তে জঙ্গলের আড়ালে আদিধর্ম্মপার এই মহতী কীর্ত্তি লুক্কায়িত ছিল তাই আদিশূরের যশে দেশ পরিপূর্ণ। অবিধ্বংসী সত্য, এই গুপ্ত তত্ত্ব বুঝি এতকাল পরে প্রকাশ করিয়া দিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কত রাজা অতীতের তলগর্ত্তে লুক্কায়িত হইয়াছেন, তাঁহাদের নামও আজ জানিবার উপায় নাই, কিন্তু যাঁহারা জনহিতকর কীর্ত্তি করিয়াছিলেন, সেই সৎকীর্ত্তি তাঁহাদিগকে বিলুপ্তির অন্ধকার গর্ভ হইতে তুলিয়া দিতেছে; সত্য ও সৎপ্রতিষ্ঠার বিলোপ নাই, তাহার মূল সুদৃঢ়-অনড়-অক্ষয়। এই সময়ই শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের আদি অভ্যুদয় হয়; বল্লাল কর্ত্তৃক উৎপীড়িত বহু ব্রাহ্মণও তৎপরে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল এবং এই সময়েই বৈদ্য কায়স্থাদিরও এদেশে উপনিবেশ হইয়াছিল। এই সময় যদিও কোন সাহিত্য সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায় না, তথাপি তাম্র শাসনগুলির রচনা প্রণালী অল্প কবিত্বের পরিচায়ক নহে। শ্রীহট্টের জয়ন্তীয়া প্রদেশে গৌরবান্বিত হিন্দুরাজত্ব ছিল, যথাস্থানে তাহা কথিত হইবে এবং সেই প্রদেশ সংস্কৃত কাব্যের গভীর ঝঙ্কারে নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। এই কাল পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট মোসলমানদের পদানত হয় নাই, এই পর্য্যন্তই শ্রীহট্ট স্বাধীনতা সম্পদ ভোগ করিয়াছিল। যদিও গিয়াসউদ্দীনের সময় (খৃঃ ১২১২ অব্দ) কৈলাড়গড় আক্রান্ত হইয়াছিল যদিও ইয়াজবেগের সময় (খৃঃ ১২৫০ অব্দ) শ্রীহট্টের অন্যতর খণ্ডরাজ্য (আজ্‌মরদন) বিনষ্ট হইয়াছিল, তথাপি ইহকে শ্রীহট্ট বিজয় বলিয়া যাইতে পারে না; পূর্ব্বোক্ত মোসলমান রাজগণ ক্ষণকালের নিমিত্ত শ্রীহট্টে আপতিত হইয়া, কেহ বা পরাভূত এবং কেহ বা দস্যুর ন্যায় ধন রত্ন লইয়া চলিয়া গিয়াছেন মাত্র। সেই সময়ে অবস্থা বিবেচনায়, শ্রীহট্টে শাসন বিস্তার করা তাঁহারা সহজ মনে করেন নাই। গিয়াসউদ্দীন নিজ রাজধানী লক্ষ্মণাবতী আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাইয়া চলিয়া গেলে, এবং ইয়াজবেগ আসাম বিজয়ে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে নিপতিত হইলে শ্রীহট্টে ভূমি পুনঃ যবন স্পর্শশূন্য হইয়াছিল; ইহাদের ক্ষণিক অত্যাচারে কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই; হিন্দু নৃপতিবর্গের দৃপ্ত তেজোগর্ব্ব খর্ব্ব হয় নাই; অতএব এই সময় পর্যন্তই গৌরাবান্বিত হিন্দু রাজত্বের কাল বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। যদিও মহারাজ কীর্ত্তিধর শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্রে অতঃপর রাজধানী রাখা নিরাপদ মনে করেন নাই; তথাপি স্পর্দ্ধা সহকারে বলা যাইতে পারে যে, মহারাজ প্রতীত হইতে কীর্ত্তিধর পর্য্যন্ত সকলেই সগৌরবে স্বাধীনতা সম্পদ সম্ভোগ করিয়াছেন। এই ত্রৈপুর নৃপতিবর্গ শ্রীহট্টের একটি খণ্ড রাজ্যের অধিপতি ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের গরীয়সী গৌরবগাথা শ্রীহট্টের ইতিহাসের অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে। অতঃপর এই সুপ্রাচীন রাজবংশীয়দের মহতী কীর্ত্তিকথা বর্ণনের সুবিধা আমাদের ঘটিবে না। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ত্রৈপুর রাজবংশের ইতিহাস শ্রীহট্ট ইতিবৃত্তের অঙ্গ। অতএব আমরা কীর্ত্তিধরের কীর্ত্তির সহিত এই গৌরবাত্মক প্রথম খণ্ড পরিসমাপ্ত করিলাম।

দ্বিতীয় খণ্ড

মোসলমান প্রভাব গৌড়

প্রথম অধ্যায়

রাজা গোবিন্দ

শ্রীহট্টে তিনটি ভিন্ন রাজ্য

পূর্ব্বকাল হইতে শ্রীহট্টে কয়েকটি খণ্ড রাজ্য ছিল বলিয়াছি। বলা গিয়াছে যে, ত্রৈপুর রাজ বংশের অধ্যুষিত স্থান ত্রিপুরা রাজ্য বলিয়াই সাধারণতঃ কথিত হয়। এই রাজবংশের অধিকার এক সময় বরবক্রের সমস্ত বাম তীর পর্য্যন্ত পরিব্যপ্ত ছিল। তাঁহাদের অধিকার ব্যতীত শ্রীহট্ট তিনটি প্রধান খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল; ঐ তিন ভাগই তিন পৃথক নৃপতি কর্তৃক শাসিত হইত।[১] এই তিনটি স্বতন্ত্র নৃপতির অধীনে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যাধিকারী ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। পশ্চিমের প্রসিদ্ধ মগধ রাজ্যের নামানুকরণে শ্রীহট্টে যেমন এক ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যের নাম মগধ ছিল, তেমনি স্বনাম প্রসিদ্ধ গৌড় নগরের সাদৃশ্যে শ্রীহট্টেও এক গৌড় রাজ্য ছিল। যথাঃ–

১. গৌড়–বর্ত্তমান শ্রীহট্ট সহরাদি সহ উত্তর শ্রীহট্ট[২] এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণে অনেক দূর ব্যাপিয়া গৌড় রাজ্য ছিল। গৌড়ের রাজা প্রায়শঃ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেন।

২. লাউড়–গৌড়ের পশ্চিমে অর্থাৎ শ্রীহট্ট জিলার পশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া লাউড় রাজ্য ছিল। এক সময় লাউড় রাজ্য ময়মনসিংহ জিলার কিয়দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে হবিগঞ্জের কিয়দংশ ও প্রায় সমুদয় সুনামগঞ্জ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩. জয়ন্তীয়া–এই রাজ্য শ্রীহট্টের উত্তর ও পূর্ব্বাংশ পরিব্যাপী ছিল। দক্ষিণে সুরমা নদী এই রাজ্যের সীমা রক্ষা করিত; ইহার সীমা-রেখা দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে ত্রিপুরা রাজ্য স্পর্শ করিয়াছিল। এই সমতলাংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র পার্ব্বত্য জয়ন্তীয়া জিলা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

৪. তরফ–শ্রীহট্ট ভাগত্রয়ে বিভক্ত হইলেও, তরফ প্রাচীন কাল হইতেই পৃথক ভাবে শাসিত হইত। ইহা অধিকাংশ সময় ত্রিপুরার আধিপত্য স্বীকার করিলেও, গৌড় রাজ্যের অংশ বিশেষ বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হইত। এবং মোসলমান বিজয়ের পরে গৌড়ের অংশরূপে গণ্য হয়।

তরফের ন্যায় ইটা এবং প্রতাপগড় রাজ্যও মোসলমান বিজয়ের পর হইতে গৌড়ের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

রাজা গৌড়গোবিন্দ

যে সময়ের কথা কথিত হইতেছে, সেই সময় শ্রীহট্টের গৌড় রাজ্য প্রসিদ্ধনামা গোবিন্দের শাসনাধীনে ছিল। গোবিন্দ গৌড় রাজ্যের অধিপতি বলিয়া সাধারণতঃ "গৌড়-গোবিন্দ" নামে

---

১. "There were at this time three divisions of the present District Gor (Sylhet), Laur, and Jaintia." Hunter's Statistical Accounts of Assam vol. II (Sylhet)

2. "Gaur was the old name of northern Sylhet."
-Blochmann's Geography and History of Bengal.

কথিত হন। গৌড়-গোবিন্দ নামটি বিশুদ্ধ ভাবে বলিতে দিয়া কেহ কেহ "গৌর গোবিন্দ" এবং অশিক্ষিত লোকেরা "গরুড় গোবিন্দ" বলিতেও শুনা যায়।[৩]

গোবিন্দের পিতার নাম কি ছিল, জানা যায় না। কিম্বদন্তী মতে তিনি সমুদ্রের তনয়।[৪] কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে ত্রৈপুর রাজবংশীয় কোন রাজার শত শত মহিষী ছিলেন। সমুদ্রদেব (বরুণদেব) তন্মধ্যে কোন এক মহিষীর সহিত মনুষ্যাকারে সম্মিলিত হন; তাঁহার কৃপাতেই রাণী গর্ভধারণ করেন। এই গর্ভের কথা প্রকাশিত হইলে রাজা সেই রাণীকে নির্ব্বাসিত করেন। তদবস্থায় রাণী এক সুলক্ষণান্বিত পুত্র প্রসব করেন। সমুদ্র তখন আবির্ভূত হইয়া রাণীকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, তাঁহার অভিপ্রায়ে সমুদ্রের জল সরিয়া যতদূর চড়া পড়িবে, নবজাত শিশু ততদূর পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকার করিতে পারিবে। এই নির্ব্বাসিতা মহিষীপুত্রই গোবিন্দ।

এই ঔপন্যাসিক কিম্বদন্তী-মূলে কয়েকটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছেঃ—

১. এক সময় শ্রীহট্টের অনেকাংশ সমুদ্রের (হ্রদের) কুক্ষিগত ছিল, সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায়, (ভরট হওয়ায়) অনেক স্থান প্রাচীন গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

২. গোবিন্দ কোন নির্ব্বাসিতা ত্রৈপুর-রাজমহিষীর সন্তান।

৩. তাহা না হইলে, গোবিন্দ শ্রীহট্ট জিলার কোন হাওরের পরপার হইতে গৌড়ে আসিয়া ভাগ্যবশে রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ইঁহার পরিচয় কেহ জ্ঞাত নহে।

কিন্তু তাঁহাকে খাসিয়া জাতীয় কোন রাজকুমার অনুমান করা সঙ্গত হয় না। তাঁহার কীর্ত্তি ও জনশ্রুতি তাঁহাকে সভ্য হিন্দু নৃপতি বলিয়া প্রচারিত করিতেছে। তাঁহার নামানুক্রমে "গৌড়গোবিন্দ" বলিয়া ক্ষুদ্র এক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আছে।[৫] খাসিয়া জাতীয় কোন রাজ্যার নামে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পরিচিত হওয়া সম্ভাবনীয় নহে। এই সম্প্রদায় রাজা গোবিন্দের সময়ে কোন ঘটনা বিশেষ তন্নামে অভিহিত হইয়া থাকিবেক।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যিনি রাজত্ব করেন, শ্রীহট্টের সেই শেষ হিন্দু নৃপতি গৌড়-গোবিন্দ বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি দূর হইতে শব্দ মাত্র শুনিতে পাইয়া, অন্তরাল হইতে লক্ষ্যভেদ

---

৩. কেহ কেহ বলেন, গোবিন্দ কোন নির্দ্দিষ্ট রাজার নাম ছিল না; শ্রীহট্টের গৌড় রাজ্যের রাজগণ "গোবিন্দ" এই বিশেষ উপাধিতে পরিচিত হইতেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় (১৩১১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের) প্রদীপ পত্রিকায় লিখিয়াছেন,– "গৌড় গোবিন্দ (বা গৌর গোবিন্দ বা গুরু গোবিন্দ বা গরুড় গোবিন্দ) যে কে ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মধ্য ভারতের ভোজ বা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় একাধিক রাজার এই নাম ছিল কিনা, তাহাও সমস্যার বিষয়।

"সুহেল-ই-এমন" নামক প্রাচীন পারস্য গ্রন্থের মতে গোবিন্দ নামক ব্যক্তি পশ্চিম গৌড় হইতে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া এই নামে কথিত হইয়াছিলেন।

৪. "সমুদ্র তনয় গৌড় গোবিন্দ নামেতে।
শ্রীহট্ট দেশের রাজা ছিলেন পর্ব্বতে।"–ভবানী প্রসাদ দত্তের লিপি।

৫. আসামের বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধে (এন্‌থলজীর সুপারিনটেনডেন্ট্ সাহেবের জন্য) শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা চরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি নোট প্রস্তুত করেন, তাহাতে বর্ণব্রাহ্মণ বিষয়ক প্রস্তাবে তিনি বলেন যে,–"গড়ের গোবিন্দী" ব্রাহ্মণ রাজা গৌড়গোবিন্দের দ্বারা সৃষ্ট। ইঁহারা সম্ভবতঃ বল্লাল-পীড়িত ব্রাহ্মণ। রাজকর্ত্তৃক উপকৃত হওয়ায়, অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ "গড়ের গোবিন্দী" বলিয়া পরিচয় দিতেন। পশ্চাদাগত রাঢ়ী প্রভৃতি হইতে বর্ত্তমানে ইঁহাদের পৃথকত্ব বাহির করা দুর্ঘট। আবার প্রদীপের এক প্রবন্ধে (১৩১১ বাংলা কার্ত্তিক) লিখিত আছে–"শ্রীহট্ট সহর হইতে ৬/৭ মাইল ব্যবহিত স্থান হইতে পাতর সংজ্ঞক যে সকল ব্যক্তি সহরে পাতা, কাঠ, কয়লা প্রভৃতি বিক্রয় করে, তাহাদিগকে 'গুরু গোবিন্দ' বলিয়া পরিচয় দিতে শুনা যায়।" ইহারাও গৌড়গোবিন্দ সংসৃষ্ট কোন ঘটনা হইতে এ নাম ধারণ করা বিচিত্র নহে।

করিতে পারিতেন।[৬] এইরূপ তাঁহার নানাবিধ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল,[৭] এই জন্য মোসলমানগণ তাঁহাকে যাদুবিদ্যা বিশারদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কুসংস্কার বর্জিত ছিলেন না, ইহা দেশের পক্ষে অশুভ জনক হইয়াছিল।

শহরের উত্তরাংশে (বর্ত্তমান মজুমদারির মধ্যে) "গড়দুয়ার" মহল্লা বলিয়া যে একটি স্থান আছে, তথায় এখনও অনেক ইষ্টক দৃষ্ট হয়, ঐ ইষ্টক রাশি রাজবাটিকার ভগ্নাবশেষের নিদর্শন। গড়দুয়ার মহল্লায় গৌড় গোবিন্দ রাজার "গড়" অর্থাৎ দুর্গ ছিল।[৮] সহরের উত্তরে—টীলাগড়ে, জয়ন্তীয়াবাসী অসভ্য জাতীয়ের আক্রমণ রোধার্থে আর একটি গড় বা দুর্গ ছিল; তাহাও ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। একটি টিলার উপরে দুর্গ থাকায় ঐ স্থান টীলাগড় বলিয়া খ্যাত হয়।

উচ্চ স্তম্ভকে মিনার বলে। বর্ত্তমান সহরের উত্তরে এক উচ্চ শৈলখণ্ড দৃষ্ট হয়, ইহাকে মিনারের টীলা বলিত। (সাধারণ লোকে মনারায়ের টীলা বলে।) এই টীলাতেও রাজার এক বাড়ী ছিল। তৎপার্শ্ববর্ত্তী (বর্ত্তমান) কাজি-টোলা ও দরগা মহল্লায়ও গৌড় গোবিন্দ রাজার বাড়ী ও দেবালয় ছিল বলিয়া কথিত আছে মিনারের টীলাস্থিত বাটীতে রাজা কোন কোন সময় সাধু সন্ন্যাসী সহ সুখে বাস করিতেন।

পূর্ব্বে এই স্থানে যে সন্ন্যাসী সমাগম ঘটিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।[৯] হাটকেশ্বর নামে যে প্রসিদ্ধ শিবের জন্য শ্রীহট্ট গৌরবান্বিত, যাঁহার মহিমা তন্ত্র শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে,[১০] এই স্থানেই তিনি রাজ কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইতেন। গৌড় গোবিন্দ রাজার সময়ে এদেশে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আগমন করেন, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ চক্রপাণি দত্তের পুত্র মহীপতি দত্তের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য।[১১]

---

৬. "জানিহ শ্রীহট্ট নামে আছে পূর্ব্ব দেশ।
ব্রহ্মপত্রের পূর্ব্ব স্থান আছে সবিশেষ।
গৌড় গোবিন্দ নাম তাহার নৃপতি।
শব্দভেদী বাণ যাঁর আছিল অধীতি।
নানা সুখে রাজ্য করে গোবিন্দ নরবর।" ইত্যাদি—দত্তবংশাবলী। (মুদ্রিত)

৭. See Hunter's History and sttistics of the Dacca Division Sylhet Section. P. 291.

৮. "গড় দুয়ারে গোবিন্দের ছিলো যে থাকান।'
কেল্লা এক ছিল তাতে পর্ব্বত প্রমাণ॥"
পুনঃ—"গড় দুয়ার নামে এক মহল্লার নাম।
সেখানে ছিলেক তার সরদারি সামান।"—তোয়ারিখে জলালি

৯. বিগত ভূকম্পের পর (১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে) মিনারের টিলায় জজ সাহেবের বাসের জন্য "বাঙ্গালা" প্রস্তুত হইতেছিল, তৎকালে ৫/৬ ফিট মাটির নীচে সন্ন্যাসীদের ব্যবহারোপযোগী "ভাং" প্রস্তুত করিবার দুইটি "খলপাত্র" প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার একটি ইগ্‌নাস্ ষ্টোন নির্ম্মিত,—উহা ১৩ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১ ফুট প্রস্থ ও ৫ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট। দ্বিতীয় খলপাত্রটি ছেণ্ডষ্টোন নির্ম্মিত এবং এক ফুট মাত্র দীর্ঘ। এই দ্বিবিধ প্রস্তরই ব্রহ্মপুত্র কি সুরমা উপত্যকায় মিলে না। ইহা দেবালয়বাসী ভিন্নদেশাগত সন্ন্যাসীদের দ্বারা আনীত হইয়াছিল। পরিদর্শক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ।

১০. "নকুলেশঃ কালীপীঠে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ।"
—মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্র।
হাটকেশ্বরের বিস্তৃত বিবরণ ১ম ভাগের ৯ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১১. রাসায়ণের ইতিহাস প্রণেতার মতে চক্রপাণি দত্ত খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক। জাতিতত্ত্বারিধি প্রণেতা শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র গুপ্ত উক্ত গ্রন্থে (১ম ভাগ ২২৫ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি আবির্ভূত হন। যদি ইহাই যথার্থ হয়, তবে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গৌড় গোবিন্দ কিরূপে চক্রপাণি দত্তকে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন? তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত মতই যথার্থ বোধ করা সঙ্গত; অর্থাৎ গোবিন্দ সংজ্ঞারূপ বিশেষণে নির্দ্দেষিত ঐ বংশেরই পূর্ব্বতন কোন নৃপতিই চক্রপাণি দত্তের আনয়নকারী।

চক্রপাণিদত্ত ও মহীপতির কথা

চক্রপাণি দত্তের শ্রীহট্টাগমন কাল সন্দেহাত্মক হইলেও গল্পাংশটি বেশ। কথিত আছে, গৌড় গোবিন্দের পেটের ভিতর কঠিন ব্যাধি হইয়াছিল। দেশের যত চিকিৎসক, বহু চেষ্টা করিয়াও রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে সুশ্রুতের টীকাকার ও "চক্রদত্ত" প্রণেতা চক্রপাণি দত্তের সুখ্যাতিতে দেশে পরিপূরিত; প্রত্যেক শিক্ষিত ও সভ্য ব্যক্তিই তাঁহার সুখ্যাতি শ্রুত ছিলেন।[১২] গৌড় গোবিন্দ যখন দেখিলেন যে, দেশীয় বহুতর বিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহাকে নিরাময় করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি চক্রপাণি দত্তকে আনয়নের জন্য তৎসকাশে জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন। ভিষগ্‌শ্রেষ্ঠ বৈদ্যপ্রবর তখন জরাগ্রস্ত—অতি বৃদ্ধ, তখন তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু সেই ভিষগ্রাজের ভয়ে সেই জরাজীর্ণ অবস্থায়ও রোগ যেন তাঁহার কাছে আসিতে অসম্মত হইতে ছিল, মৃত্যু যেন তদীয় সম্ভ্রম রক্ষার্থে দূরে দাঁড়াইয়াই অপেক্ষা করিতেছিল, তদবস্থায় তাঁহার বিদেশ গমনের সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতঃ তৎকালে গঙ্গাতীর ত্যাগ করতঃ একপদ অন্যত্র গমনেও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কাজেই তিনি বলিয়া দিলেন যে, ঘাটে নৌকা বাঁধা, এ বয়সে তিনি কামরূপের অন্তর্গত গঙ্গাহীন শ্রীহট্টে যাইতে পারিবেন না।[১৩]

রাজা গোবিন্দ দূতমুখে এতৎ সংবাদ শ্রবণে নিরাশ হইলেন। রাণী ম্রিয়মানা হইলেন এবং বৈদ্যশ্রেষ্ঠকে আনাইয়া স্বামীর চিকিৎসা করাইতে দৃঢ় সংকল্প করিলেন। তিনি নিজ অঙ্গের অলঙ্কার উন্মোচনপূর্ব্বক এক পেটিকাতে ভরিয়া সেই দূত হস্তে অর্পণ করতঃ কহিলেন, "দূত! পুনর্ব্বার তুমি সেই বৃদ্ধ বৈদ্যের নিকট গমন কর। এই অলঙ্কার তাহার হাতে দিবে, বলিবে যে তিনি যখন আগমন করিবেন না, তখন আর মহারাজের আরোগ্যের আশা কোথায়? তবে আর এ অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? বলিবে—হতভাগিনী রাণী—তাঁহার দুঃখিনী কন্যা রাজার অনুগামী হইবে, এ অলঙ্কার আর ধারণ করিবে না।" দূত যথাকালে চক্রপাণি দত্তের সমীপে পুনর্ব্বার

পক্ষান্তরে শ্রীহট্টের লাখাই ও সপ্তগ্রামের দত্তবংশীয়গণ আপনাদিগকে চক্রপাণি তনয় মহীপতির সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। মহীপতি হইতে লাখাই দত্ত বংশে বর্ত্তমানে ১৪/১৫ পুরুষ এবং সপ্তগ্রামের দত্ত বংশে ২১/২২ পুরুষ চলিতেছে। এতদ্বারা মহীপতিকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলা সঙ্গত হয় না। (এইপুরুষ সংখ্যা শাহজলালের অনুচরগণের বংশাবলীর সহিত ঐক্য হয়।) চক্রপাণি দত্ত দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইলে বংশাবলী গুলিকে বিশুদ্ধ বলিতে সাহস হইবে না।

১২. "দুর্গা উপাসনা করি সেই মহামতি।
সিদ্ধ বৈদ্য হইয়া জগতে হৈলা খ্যাতি।"–ভাবনী প্রসাদ দত্তের লিপি।

১৩. "নানা সুখে রাজ্য করে গোবিন্দ নরবর।
দৈব্য যোগে ব্যাধিহৈল উদর ভিতর॥
বৈদ্য হীন দেশ তাক না যায় চিনন।
বড় কষ্ট পায় প্রায় হাল মৃত্যুপন্ন॥
শুনিলা রাজায় চক্রদত্তবৈদ্য নাম।
মনেকৈল তাহান আসিলে পাব পরিত্রাণ॥
অতি সবিনয় করি পাঠাইলা দূত।
আসিয়া চিকিৎসা মোর করিতে উচিত॥
দূত গিয়া কহিলেক সকল কথন।
প্রত্যুত্তর দিলা তবেবৈদ্য মহাজন॥
কামদেশে প্রভু আমি চাই না যাইমু।
বিশেষতঃ গঙ্গাছাড়ি অন্তর না হইমু॥
এই প্রত্যুত্তর দিলা যদি চক্রদত্ত।" ইত্যাদি।–দত্তবংশাবলী। (মুদ্রিত)

উপস্থিত হইয়া রাণীর অলঙ্কার প্রদান করতঃ তাঁহার কথা জানাইল। তখন জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ বড় চিন্তিত হইলেন,—যদি রাজার মৃত্যু হয়, তবে আমিই নারী বধের কারণ হইব।" দত্তবরের দয়া ও ধর্ম্মভয় তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া দিল, তিনি যাইতে সত্বর প্রস্তুত হইলেন।[১৪] এবং প্রাণাধিক পুত্রগণ সহ শ্রীহট্টে আসিলেন।[১৫]

যাঁহার দর্শনেই রোগ পলায়নকরে, তাঁহার সুচিকিৎসা গুণে রাজা যে সত্বরেই আরোগ্য লাভ করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? রাজা আরোগ্য লাভ করিলে তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া গঙ্গাতীরে প্রত্যাগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। রাজা তাঁহাকে এক বিশাল জনপদ প্রদান করিয়া সকাতরে তথায় বাসের জন্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। ধর্ম্মভীরু দত্তরাজ গঙ্গাতীর ব্যতীত অন্যত্র দেহত্যাগ করিবেন, কিছুতেই এ কল্পনা মনে স্থান দিতে পারিলেন না। তবে রাজার নিতান্ত নিৰ্ব্বন্ধাতিশয়ে নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রমদীশ্বরকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন; মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র মহীপতি ও মুকুন্দ এদেশে রহিলেন। রাজা ইঁহাদিগকেই মহাসম্মানে সেই ভূসম্পত্তি দান করিয়া স্থাপন করিলেন। ইঁহারাই সাতগাও, লাখাই প্রভৃতি স্থানের দত্তবংশের আদি পুরুষ, তাঁহাদের বংশ বিবরণ পশ্চাৎ বক্তব্য।

রাজা গৌড় গোবিন্দ আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিক দিন শান্তিতে রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই, ইহার পরেই তাঁহাকে ভীষণ মোসলমান বিগ্রহে বিব্রত হইতে হয়।

শামস্‌উদ্দীন ও প্রতাপমাণিক্য

মোহাম্মদ তোগলক নামক কৃতবিদ্য সম্রাট যখন পারস্য ও চীনদেশ বিজয়ের দুরাশায় পরিচালিত হইয়া আপনার শক্তি ক্ষয় করিতেছিলেন, যখন করমণ্ডল, কর্ণাট প্রভৃতি করতলগত

---

১৪. "শুনিয়া রাজার রাণী বিস্মিত হইলা।
কিমতে আসিবা বৈদ্য ভাবিতে লাগিল॥
আপনার অলঙ্কার সকল খসাইয়া।
পুন দূত স্থানে দিলা ঝাপাতে ভরিয়া॥
বলে দূত কহিবা বচন আমার।
আসিয়া চিকিৎসা যেন করেন রাজার॥
তবে এই অলঙ্কার সকল পরিমু।
না আসিলে রাজা মরে সঙ্গে আমি যাইমু॥
শুনি দূত গিয়া যদি এইমত কহিল।
শুন চক্রদত্ত মনে ভয় বড় পাইল॥
যদি না যাই তথা রাজা যদি মরে।
তবে নারী বধ দিব আমার উপরে॥
সর্ব্ব পাপ হৈতে নারী বধ পাপ অতি।
এতেকে শ্রীহট্ট আমি যাইমু সম্প্রতি॥"–দত্ত বংশাবলী। (মুদ্রিত।)
ভবানীপ্রসাদ দত্তের লিপিতেও এ প্রসঙ্গ আছে, এস্থলে আর উদ্ধৃত করার আবশ্যকতা নাই।

১৫. মুদ্রিত দত্তবংশাবলী বিবরণীতে চক্রপানি দত্তের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের নাম মহীপতি ও মুকুন্দ বলিয়া লিখিত আছে; প্রথম পুত্রের নামোল্লেখ নাই। জাতিতত্ত্ব-বারিধিতে চক্রপাণিতনয়ের নাম ক্রমদীশ্বর বলিয়া লিখিত আছে, সুতরাং তাঁহাকেই জ্যেষ্ঠপুত্র বলা যাইতে পারে। ভবানীপ্রসাদ দত্ত শ্রীহট্টে, অবস্থিত পুত্রেরই মাত্র নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা–
"মহীপতি নামে পুত্র এদেশে রাখিলা।
জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্গে করি নিজ দেশে গেলা॥"

প্রদেশে দিল্লীর অধীনতা ছেদন করিতেছিল, তখন বঙ্গদেশে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুলতান শামস্‌উদ্দীন ইলিয়াস খাজে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অবস্থিত ছিলেন।

শামস্‌উদ্দীনই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার স্বাধীন অধিপতি ছিলেন। তিনি রাজ্য লাভের চারিবৎসর পরে (১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে) জাজিনগর (কসবা) আক্রমণ করেন। তখন প্রতাপমাণিক্য ত্রৈপুর রাজ-সিংহাসনে ছিলেন। ঐ সময় সমস্ত বঙ্গদেশ মোসলমানের কুক্ষিগত হয় এবং তাঁহারা সুবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। এ স্থান হইতে পূর্ব্বাঞ্চল আক্রমণ করা সহজ হইয়াছিল। তিনি জাজিনগর (কসবা) আক্রমণ ও যুদ্ধে প্রতাপমাণিক্যকে পরাস্ত করতঃ অনেক অর্থ ও হস্তী প্রাপ্ত হন।[১৬] এই আক্রমণের পর জাজিনগর (কসবা) পরিত্যক্ত হয় ও রাজধানী উদয়পুরে নীতহয় বলিয়া কথিত আছে। শামস্‌উদ্দীনের এই আক্রমণ ও প্রভাব এতদঞ্চলীয় তাবৎ নৃপতিরই আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল।

রাজা গৌড় গোবিন্দ এই শামস্‌উদ্দীনের সমসাময়িক ছিলেন। শামস্‌উদ্দীন শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার মৃত্যুর পরই এদেশে মোসলমান রাজ্য স্থাপিত হয়।

শাহজলাল নামে বিভিন্ন ব্যক্তি

শাহজলাল নামক জনৈক পশ্চিম দেশীয় দরবেশ শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু নৃপতি গোবিন্দকে পরাভূত করেন। শাহজলালের সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে মতবৈষম্য রহিয়াছে। তোয়ারিখে জলালিতে যে হিজরী অব্দ সংখ্যা[১৭] লিখিত আছে, তাহা ঠিক নহে। প্রসিদ্ধ মুরভ্রমণকারী ইবন বাতোতা (আবু আব্দুল্লা ইবনে) বর্ণনা করিয়াছেন যে, কামরুপের পার্ব্বত্য প্রদেশে ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি এক শাহজলালকে দেখিয়াছিলেন, সেই শাহজলাল খানবালিক (পিকিন) বাসী বুরহান উদ্দীন নামক আর এক পীরকে উপহার দিবার জন্য তাঁহার নিকট এক খিলকা প্রদান করিয়াছিলেন। ইবন বাতোতা দৃষ্ট সেই শাহজলালের জন্মস্থান তাব্রিজদেশ।[১৮] শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় ইঁহাকে শ্রীহট্টের শাহজলাল মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; ইনি আমাদের উদ্দিষ্ট শাহজলাল হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।[১৯] তাব্রিজি শাহজলাল-উদ্দীন ১৫০ বর্ষ বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীহট্টাগত শাহজলাল ৬২ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন সুতরাং ইঁহারা ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন।[২০]

---

১৬. "As soon as iyas found himself established in his authority, he invaded the dominions of the Raja of Jagenagur (Tippera), and compelled that prince to pay a great sum of money, and to give him a number of Valuable elephants, with which he returned in triumph to his Capital."
-Stewart's History of Bengal. Seet. IV. p. 95.

১৭. হিজরী ৫৬১=১১৬৫ খৃষ্টাব্দ। এই সময়টা বিখ্যাত থানেশ্বর যুদ্ধের প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। তখনও দিল্লী মোসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় নাই।

১৮. "Tradition says that Shaha Jalal came from Yeman and he is called Yemani to distinguish him from other saints of the same name such a shaha Jalal Tabrizi who lived at panduah."-Annual Report of the Areheological Survey, Bengal circle.-By T. Bloch.-1903 p. 24.

১৯. 'It is difficult to say of Jalal-ud-din Tabrizi is the same as Shaha Jalal of Sylhet. The location of the latter might agree with Ibn Batutah, and it is singular that both accounts should mention a Burhan-un-din.'
-Jaurnal of the Asiatie Society of Bengal. VoL LXIV. PT. Z. No. 3. P. 230.

২০. তোয়ারিখে-জলালি মতে ১ম শাহজলালের জন্মস্থান বোখারা, দ্বিতীয়ের তাব্রিজ দেশ, তৃতীয়ের এমন এবং চতুর্থের গঞ্জেরয়া দেশ।

বিভিন্ন বুরহানউদ্দীন ও তদীয় পুত্র হত্যা

যখন শাহজলাল শ্রীহট্টে আগমন করেন, তখন এদেশে মোসলমান সংখ্যা ছিল না বলিলেই হয়। তরফে তখন নুরউদ্দীন নামক এক মোসলমান সপরিবারে বাস করিতেন। ঐ নুরউদ্দীন পরিবার ব্যতীত বুরহানউদ্দীন নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীহট্টের টুলটিকর নামক স্থানে সপরিবারে ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই বুরহানউদ্দীন পূর্ব্বোক্ত বুরহানউদ্দীন পীর হইতে পৃথক ব্যক্তি। যা হোক, ইঁহারা দূরবর্ত্তী হিন্দু রাজত্বে (সম্ভবতঃ ধর্ম্ম বিস্তারের গূঢ় উদ্দেশ্য) ভয়ে ভয়ে বাস করিতেন।

শ্রীহট্টের টুলটিকরবাসী উক্ত বুরহানউদ্দীন একদা নিজ পুত্রের জন্মোপলক্ষে একটি গোহত্যা করেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা চিল এক খণ্ড মাংস আনিয়া জনৈক ব্রাহ্মণ গৃহে (মতান্তরে রাজগৃহে) নিক্ষেপ করে। এই বিষয় রাজার গোচরীভূত হইলে, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া, বুরহানউদ্দীনের হস্ত ছেদন ও তদীয় শিশুপুত্রকে নিহত করেন।[২১] সেই মোসলমান প্রভাবের কালে এই ঘটনাটি সমস্ত মোসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অপমান সূচক হইয়াছিল।[২২] সুহেল-ই-এমন গ্রন্থে অনুবাদ তোয়ারিখে-জলালিতে লিখিত হইয়াছে যে, বুরহানউদ্দীন স্বীয় অত্যাচারীর প্রতিহিংসা সাধনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে মোসলমান সম্প্রদায়ের রাজধানী দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হন। তিনি সম্রাট সদনে নিজ দুঃখ কাহিনী জ্ঞাপন করিলে সম্রাট "আলাউদ্দীন" নিজ ভাগিনেয় সিকান্দর শাহকে শ্রীহট্ট জয়ার্থে প্রেরণ করেন।[২৩]

---

২১. [অনুরূপ ঘটনা।]–শাহজলাল, বুরহান উদ্দীন ও সিকান্দর শাহ প্রভৃতি নামগুলি মাত্রই যে পশ্চিম (পাণ্ডুয়া), ও পূর্ব্ব (শ্রীহট্ট) প্রদেশীয় "গৌড়ের" ঐতিহাসিক বিবরণের সহিত সমভাবে সংজড়িত, তাহা নহে,–উভয় গৌড়ের বৃত্তান্ত ঘটিত ঘটনাংশেও অনেক সাদৃশ্য আছে। বিক্রমপুরে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, দ্বিতীয় বল্লালসেনের সময়ে বাবা আদম নামক দরবেশ একদল সৈন্যসহ রামপাল আক্রমণার্থ আগমন করেন। মহারাজ দ্বিতীয় বল্লালসেনের রাজত্বে একটি মোসলমান বাস করিত, সে নিজ পুত্রের জন্মোপলক্ষে একটি গোহত্যা করে। একটা চিল একখণ্ড মাংস মুখে করিয়া রাজপ্রসাদোপরি উপস্থিত হয়। উহা রাজার দৃষ্টি পথে পতিত হইল; তদ্দৃষ্টে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং গোহত্যার কারণ মূলক সেই শিশুকে আনিয়া তৎক্ষণাৎ হতভাগ্য পিতার সম্মুখে নিহত করিলেন। এই পুত্রশোকাতুর মোসলমান প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বাবা আদমের সহায়তা গ্রহণ করে। বাবা আদম রামপাল উপস্থিত হইলে তৎসহ মহারাজ দ্বিতীয় বল্লালসেনের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু বাবা আদম অচিরেই বল্লাল হস্তে নিহত হন। এই গল্পটি ডাঃ ওয়াইজ সাহেব আসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণলে বর্ণন করিয়াছেন। এদুটি প্রায় একরূপ, কোনটি যে কাহার নকল, তাহা বলা যায় না। তবে শ্রীহট্টের ঘটনাটির ঐতিহাসিক ভিত্তি অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর এবং উহা বহুল প্রচারিত।

-Vide Asiatic S. J. VoL. XIII. Part I. P. 285.

২২. "Gaur of North Sylhet, was originally ruled by a line of Hindu Kings. Nothing is Known either of their dynasty or fortunes, and they were probably petty local princes with less power and influence than that employed by a big Zamindar of Bengal at the present day. The downfall of the last Raja, Gaur Gobind, is said to have been due to his severity to-wards a follower of the Prophet. This man had sacrificed a cow to celebrate the brith of a son. As the animal was being dismembered a kite swooped down, caught up a piece of flesh, and dropped it in the house of a Holy Brahman. On the matter being reported to the king, he ordered the unforunate infant to be killed and cut off the father's hand."

-B, C, Alen's Assam District Gazetteers vol. II. (Sylhet) p. 23.

২৩. বুরহান উদ্দীন ও শাহজলালের সময় নির্ণয় নিয়া নিতান্ত গোলযোগ। আলাউদ্দীনের রাজত্ব কাল ১২৯৬-১৩১৬ খৃষ্টাব্দ। শাহজলালের অনুচর নসিরউদ্দীন, ইউসুফ, ইত্যাদির বংশাবলী আলোচনায় তাঁহাকে আলাউদ্দীনের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে না। মহামতি হাণ্টার সাহেবের মতে শাহজলালের শ্রীহট্ট বিজয় ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে,

সুলতান সিকান্দর শাহ

শাহজলালের বিবরণের সহিত বঙ্গাধিপতি শামস্‌উদ্দীন, সিকান্দর শাহ ও আদিনা মসজিদ ইত্যাদি বহু পরিবিদিত কথায় সংস্রব থাকায় আমাদের বোধ হয়, সুহেল-ই-এমন রচয়িতা এস্থলেও ভ্রম করিয়াছেন। প্রতিহিংসা পরায়ণ বুরহানউদ্দীন, প্রথম উদ্যমেই বোধ হয়, দিল্লী নগরে দৌড় না দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সুবর্ণগ্রামেই গিয়াছিলেন। তখন সুবর্ণগ্রামে প্রবল প্রতাপান্বিত শামস্‌উদ্দীন ইলিয়াস খাজে শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, তিনিই বুরহানউদ্দীনের নির্যাতন বার্ত্তা শ্রবণে গৃহপার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুদের ঈদৃশ প্রভাব দমন করা আবশ্যক বোধে নিজ তনয় সুলতান সিকান্দর শাহকে গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।[২৪] ইহাই সম্ভবপর ও সুসঙ্গত। যাহাহউক সিকান্দর সসৈন্যে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই; রাজ গোবিন্দের কৌশলে যুদ্ধে পরাজিত ও অপমানিত হইয়া শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।[২৫]

পিতার মৃত্যুর পর, ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান সিকান্দর শাহ সিংহাসনারোহণ করেন, কিন্তু সম্রাটের সহিত আহবে লিপ্ত থাকায় তিনি শ্রীহট্টের প্রতি আর মন দিতে পারেন নাই।

সুচতুর গৌড় গোবিন্দ সম্ভবতঃ ঐ সময় তাঁহার সহিত কোন প্রকারে সন্ধি স্থাপন করিয়া থাকিবেন। ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে সুলতান সিকান্দর শাহ বিখ্যাত আদিনা মসজিদ প্রস্তুত করেন।[২৬] তোয়ারিখে-জলালিতে লিখিত আছে যে, অন্য এক আদিনা মসজিদ প্রস্তুত করিতে গৌড় গোবিন্দ অনেক মাল মসাল্লা প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, ঐ শেষোক্ত আদিনা মসজিদ শ্রীহট্টে ছিল।[২৭]

শ্রীহট্টের দ্বিতীয় আদিনা মসজিদ

শ্রীহট্টের পীরমহল্লা নামক স্থানে ঐ সময়ে শাহ সিকান্দরের মনস্তুষ্টির আশায় তদীয় বিখ্যাত আদিনা মসজিদের নামানুক্রমে দ্বিতীয় আদিনা মসজিদ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা যে তাঁহারই অভিমতে হইয়া থাকিবে, তাহা সহজেই বোধ হয়। সুতরাং সিকান্দর শাহকে শ্রীহট্ট বিজেতা বলিয়া তোয়ারিখে—জলালিতে উল্লেখ না থাকিলেও, শ্রীহট্টে যে তাঁহার কতক প্রভাব ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ

বঙ্গাধিপতি শামস্‌উদ্দীনের সময়ে ঘটে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় (প্রদীপ-১৩১১ বাংলা কার্ত্তিক) লিখিয়াছেন, যথা–"বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সুহেল-ই-এমনের লিখিত এই সন তারিখ, বয়ক্রম, অবস্থানের কাল, সমস্তই অবিশ্বাস করিতে হইল। যদি শাহজলাল আলাউদ্দীনের মৃত্যুর বৎসরও শ্রীহট্টে পৌছিয়া থাকেন, তথাপি ৩০ বৎসরে ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দ মাত্র হয়।" তিনি আরও লিখিয়াছেন, "এই শাহজলাল বিবরণের সঙ্গে জনৈক শামসৃউদ্দীনের নাম শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু মোসলমান রাজত্বের প্রথমাংশে বঙ্গের সিংহাসনে শামসৃউদ্দীন নামক একাধিক ব্যক্তি অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩৪৩-১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে যিনি বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া ছিলেন, তাঁহার নাম সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস খাজে ছিল। ১৩৮৩-১২৮৫ খৃষ্টাব্দে যিনি বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন তিনিও শামসৃউদ্দীন নামে অভিহিত ছিলেন। +++ হাণ্টার সাহেব কৃত বিবরণীতে দ্বিতীয় শামসৃউদ্দীনকেই শাহজলালের সমসাময়িক বলা হইয়াছে।"–প্রদীপ ২৫৫ পৃষ্ঠা।

২৪. বালক-পাঠ্য নিম্নপ্রাথমিক পাঠ পুস্তক ১ম ভাগের ১২৩ পৃষ্ঠায়ও এই কথাটি লিখিত হইয়াছে।

২৫. 'The man applied to his co-religiouists for help. and all army was despatched under Sikander Shah, but met with no success.'
-Allen's Assam District Gazetteers vol. II. (Sylhet) p. 23.

২৬. "In 1361, Sekunder erected the great Adina mosque, near peruya."
-Marshman's out line History of Bengal. p. 15

২৭. "আদিনা মহজেদ বলি ছিল তার নাম।
জুম্মার নামাজ তাহাতে পড়িত তামাম।"–তোয়ারিখে জলালি

নাই। খুব সম্ভব গোবিন্দ তাঁহার সহিত কোনরূপ সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সন্ধির সর্ত্তানুসারেই সিকান্দরের প্রভুতা জ্ঞাপক দ্বিতীয় আদিনা মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

উক্ত আদিনা মসজিদ সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, ইহা ইস্‌পেন্দিয়ার কর্ত্তৃক, গড়দুয়ারের পার্শ্ববর্ত্তী পীরমহল্লার চৌকিদীঘী নামক স্থানে নির্ম্মিত হয়।[২৮] কিন্তু সুগঠিত না হওয়ায় ইস্‌পেন্দিয়ারের মনোমত হয় নাই বলিয়া পরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

ইস্‌পেন্দিয়ারকে শ্রীহট্টের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা বলিয়া অনুমান করা হয়, কেহ কেহ বা তাঁহাকে শামসুদ্দীন মনে করেন; কিন্তু ইস্‌পেন্দিয়ার ও শামস্‌উদ্দীন দুই ভিন্ন ব্যক্তি। ইস্‌পেন্দিয়ার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, সন্দেহ নাই; এবং তিনি এই আদিনা মসজিদ নির্ম্মাণের ভার প্রাপ্তে এতদুপলক্ষেই বিশেষভাবে প্রেরিত হইয়া থাকিবেন।[২৯]

যাহা হউক, শ্রীহট্ট শামস্‌উদ্দীন ও তৎপুত্র সিকান্দর শাহের করাল কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। সিকান্দর শাহ রাজ্য প্রাপ্তির নয় বৎসর পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যদিও এই সকল প্রত্যবায়ে শ্রীহট্ট পাঠানগ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল।, তথাপি ইহার কিঞ্চিৎ পরেই যে মোসলমানগণ শ্রীহট্টে প্রবিষ্ট হইয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে সমর্থ হয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অনুরূপ ঘটনাবলী ও সম্রাটসদনে অভিযোগ

যে সময়ে রাজা গোবিন্দ শ্রীহট্টের গৌড়ভাগ শাসন করিতেছিলেন, তখন তরফে একজন হিন্দু নৃপতি ছিলেন, ইঁহার রাজ্যাধিকার মধ্যে কাজি নুরউদ্দীন নামে এক জনৈক মোসলমান ভদ্রলোক বাস করিতেন, তিনি নিজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে একটি গোবধ করায়, রাজকর্ত্তৃক স্বয়ং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই নুরউদ্দীনের ভ্রাতা কিছুদিন দিল্লীতে ছিলেন, উক্ত ঘটনার পর তিনি পুনরায় তথায় গমন করিয়া নিজ দুঃখ কাহিনী সম্রাটের গোচর করিবার চেষ্টায় ছিলেন।[৩০]

ইতিপূর্ব্বে বুরহানউদ্দীনের বিপদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি পুত্রহত্যাকারীর প্রতিশোধ নিতে সমর্থ হইতে পারেন নাই। ঘটনাচক্রে বঙ্গাধিপতি গৌড় গোবিন্দকে দমন করিতে না পারায়, তাঁহার প্রতিহিংসানল তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই; কাজেই তিনি উপায়ন্তর বিহীন হইয়া মোসলমানদের একমাত্র আশ্রয় দিল্লী নগরে উপস্থিত হন ও শেষ চেষ্টায় বৃত হন। তথায় কিছুদিন বাস করিয়া, সম্ভবতঃ কোন কোন আমীর ওমরাহের নিকট তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন ও তাঁহাদের যোগে নিজ দুঃখ কাহিনী সম্রাটের গোচর করেন।

বুরহানউদ্দীন ও নুরউদ্দীন ঘটিত বিবরণ একরূপ, অভিযোগ একরূপ এবং প্রার্থনাও একরূপ। যাহাহউক, সম্রাট তাঁহাদের কর্ণপাত করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় এই সম্রাট খিলিজী বংশীয় আলাউদ্দীন নহেন। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, খিলিজী বংশীয় আলাউদ্দীন এই

২৮. "শ্রীহট্টে শাহজলাল" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শাহজলালের উপদেশানুসারে ইহা নির্ম্মিত হয়। একথা সত্য হইলে মসজিদটি পীরমহল্লায় না হইয়া দরগা মহল্লার সন্নিকটে কোন স্থানে নির্ম্মিত হইত; বস্তুতঃ সে কথা ঠিক বোধ হয় না।

২৯. Maulvi Ablul Hafez, the present sarkum of the shah Jalal's temple writes:- "The Adina masjid is said to have stood at pirmohala a place north of Mazumdar's house, Ispendiar being displesed with the custdian of the Adina masjid ordered its removal in its present site as stated above. Ispendiar is supposed to have been governed this district. ** where as sultan shams-uddin was an independent king of Bengal. They are two persons."

৩০. সৈয়দ আব্দুল আগফর কৃত তরফের ইতিহাস–৩২, ৩৩ পৃষ্ঠা।

সময়ের পূর্ব্বকার। এই সময়ে তোগল বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীন ফেরোজ শাহ দিল্লীসিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন।[৩১] তিনি এই অভিযোগ শ্রবণে পূর্ব্বাঞ্চলে মোসলমান প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য আপন ভাগিনেয় সিকান্দর শাহ গাজীর[৩২] অধীনে একদল সৈন্য দিয়া তাঁহাকে শ্রীহট্টে প্রেরণ করেন।

সিকান্দরের পরাজয়

বুরহানউদ্দীনের অপমানকারী গৌড় গোবিন্দকে অগ্রে পরাভূত করাই সাব্যস্থ হইল। তদনুসারে সিকান্দর সসৈন্যে শ্রীহট্টে উপস্থিত হইলেন। তখন বর্ষা সমগত হওয়ায় হিন্দুস্থানের সৈন্য সকল রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু কুসংস্কার সম্পন্ন সৈন্য সমূহ ইহা সেই রাজার যাদুবিদ্যার প্রভাব জনিত উপদ্রব জ্ঞান করিয়া, নিতান্ত ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। ঈদৃশ ভীত ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ সৈন্যের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া সিকান্দর নূতন আর একদল সৈন্য আনাইলেন। কিন্তু কুসংস্কার রোগ পূর্ব্বদল হইতে এই নূতন দলেও সংক্রামিত হইল, তাহারা সহযোগী সৈনিকদের মুখে যাদুবিদ্যার প্রভাবের সমাচার পাইয়া দ্বিগুণ ভীত ও একবারে হতোদ্যম হইল। সুতরাং সম্রাট ভাগিনেয় এই সিকান্দরের ভাগ্যে শ্রীহট্ট বিজয়ের যশোলাভ ঘটিল না।[৩৩] তিনি ব্রহ্মপুত্র তীরে শিবির উঠাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনায় বুরহানউদ্দীন যৎপরনাস্তি দুঃখিত হইলেন; এমন কি, তিনি ভগ্নমনে দেশ ত্যাগ করতঃ মদিনা তীর্থে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি মদিনা গমনোন্মুখ হইয়া যখন দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন, ঘটনাক্রমে তখন প্রসিদ্ধ দরবেশ, হজরত শাহজলালের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তিনি পূর্ব্বাঞ্চলে মোসলমান ধর্ম্মের দুরবস্থা, নিজের দুর্দ্দশা ও মদিনা যাওয়ার সঙ্কল্প তাঁহাকে জানাইলেন। বুরহানউদ্দীনের প্রমুখাৎ এতদ্বিবরণ শ্রবণে হজরত শাহজলাল ইহার প্রতীকার করিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন। তখন বুরহানউদ্দীন নবোৎসাহে পথ প্রদর্শক রূপে তাঁহাকে লইয়া শ্রীহট্টাভিমুখে পুনর্ব্বার চলিলেন।

---

৩১. তরফের ইতিহাস প্রণেতা সৈয়দ আব্দুল আগফর সাহেবও এই সম্রাটকে আলাউদ্দীন ফেরোজ শাহ বলিয়া স্বীয়গ্রন্থে লিখিয়াছেন।
–তরফের ইতিহাস, পৃষ্ঠা–৩৪

৩২. মোসলমান শাস্ত্রমতে ধর্ম্মযুদ্ধে জেতার গাজী আখ্যা হইয়া থাকে। গাজী উপাধি থাকায় সিকান্দরের রণনৈপুণ্যের বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। তোয়ারিখে জলালিতে সম্রাট ভাগিনেয় এই সিকান্দরের নাম আছে। শামসুউদ্দীন তনয় হইতে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। যথা তোয়ারিখে জলালিতেঃ–
"আপন ভাগিনা ছিলা সিকান্দর শাহা।
ডাকিয়া বলিলা তারে শুনিলেন যাহা॥
লড়াই করিতে তারে করিল ফরমান।
তৈয়ার করিতে কহে লস্কর ও সামান॥
হাতি ঘোড়া উট আদি সমান লস্কর।
সঙ্গে লইয়া যাইতে হবে ছিলট নগর॥
গৌড় গোবিন্দ নামে এক কাফের সরদার।
মারিয়া মুল্লুক হৈতে করিবে বাহার॥"

৩৩. "কিছুকাল পরে শাহা খাতেরজমা হইল।
উত্তম লস্কর আনি লড়িতে চাহিল॥
কোমর বান্দিয়া যবে হইল তৈয়ার।
হইল সাবেকি দশা সিকন্দর শাহার॥"
–তোয়ারিখে জলালি

দ্বিতীয় অধ্যায়

দরবেশ শাহজলাল

দরবেশ শাহজলাল এমনি

শাহজলালের জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক। ১৩১২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের প্রদীপ পত্রিকায় শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় "ফকির শাহজলাল" শীর্ষক একটি সুলিখিত প্রবন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এস্থলে সেই প্রবন্ধ হইতে অধিকাংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"[জন্মস্থান]"—পুণ্যভূমি আবের হেজাজ পবিত্রতম স্থান। ঐ স্থানে গিয়া, মক্কা মদিনা প্রভৃতি মহাপুরুষ মোহাম্মদের লীলাভূমি সন্দর্শন পূর্ব্বক হজ উদযাপন করিয়া "হাজি" নামে পরিচিত হইতে ধর্ম্মপ্রাণ মোসলমান মাত্রেরই প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সেই হেজাজ ক্ষেত্রের সংলগ্ন দক্ষিণ ভূভাগই এমন এবং উহাই শাহজলালের জন্মভূমি।

"[জন্ম সময়]"—পূর্ব্বপ্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় (চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) শাহজলাল জন্ম পরিগ্রহ করেন।

"[পিতামাতা]"—হজরত মোহাম্মদ যে বংশে জন্মিয়াছিলেন, সেই কুরেষিবংশীয় এব্রাহিমের পুত্র মাহমুদই শাহ জলালের জনক ছিলেন। শাহজলালের তিনমাস বয়ঃক্রম কালে মাতা স্বর্গগামিনী হন। পিতা মাহমুদও কাফেরের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জন করেন।

"[ধর্ম্ম গুরু]"—এই অনাথ শিশুর প্রতিপালন ভার তদীয় মাতুল সৈয়দ আহমদ কবীর নামক মহাত্মা গ্রহণ করিলেন। তিনিই আবার শাহজলালের বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের গুরু ভার গ্রহণ করিয়া তদীয় দীক্ষা গুরুর পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। গুরু পরম্পরায় শাহজলাল, মোসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ হইতে অষ্টাদশ স্থানীয় ছিলেন।'[১]

---

১. মোহাম্মদ (৫৭০-৬৩২ খৃষ্টাব্দ)
|
আলী
|
হাসন বসরী
|
হবিব আজমী
|
শেখ দায়ুদ তায়ী
|
শেখ মারুফ্ করখী
|
শেখ সরিস খতি
|
মমসাদ দিনুরী
|
শেখ মোহাম্মদ
|
শেখ আহমদ দিনুরী
|
শেখ ওজিউদ্দীন
|
আবু নসর জিয়াউদ্দীন
|
মকদ্দম বাহাউদ্দীন
|
আবুল ফজল সদর উদ্দীন
|
রুকুন উদ্দীন আবু ফতাহ
|
সৈয়দ জলাল উদ্দীন বোখারী
|
সৈয়দ আহমদ কবীর
|
শাহজলাল মজঃরদ—(প্রদীপ)

"[মৃগ কাহিনী]"—পবিত্র মক্কাধাম সৈয়দ আহমদ কবীরের বাসস্থান বা সাধনা স্থান ছিল। শিষ্য ভাগিনেয় শাহজলালও তৎসঙ্গে অবস্থান করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে ছিলেন।'—একদা এক হরিণ সহসা সন্ত্রাসিতভাবে কবীরের কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল; এক দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। শাহজলাল তদৃষ্টে শরণাপন্ন ও আতঙ্কিত হরিণকে আশ্রয় দিলেন এবং চপটাঘাত পূর্ব্বক ব্যাঘ্রকে বিতাড়িত করিলেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ সেরশাহের ন্যায় শারীরিক বলে হউক, কি দৈব শক্তিতে হউক, তিনি ব্যাঘ্রকে তাড়াইয়া শরণাগতের প্রাণ রক্ষা করিলেন।

"[সিদ্ধিলাভ]"—এই কার্য্যে গুরু তাঁহার প্রিয় শিষ্যের সিদ্ধির পরিমাণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক শাহজলালকে বলিলেন "বৎস, তোমার অদ্যকার কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া বিশ্বাস হইল যে, তোমার ও আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা একই প্রকার হইয়া গিয়াছে। আর ঐ স্থানে তোমার প্রয়োজন নাই, হিন্দুস্থানের দিকে প্রস্থান কর।" তৎপর স্বীয় সাধনার স্থান হইতে এক মুষ্টি মৃত্তিকা আনিয়া শাহজলালের হস্তে দিয়া বলিলেন, "তোমার হাতে যে মৃত্তিকা দিলাম, তাহা অতি যত্নে রাখিবে,—যেন ইহার বর্ণ গন্ধ বা স্বাদ বিকৃত না হয়। ঈদৃশ মৃত্তিকা যে স্থানে পাইবে, সেইখানেই সতত অবস্থান করিবে। এই মৃত্তিকা মুষ্টি যে স্থানে পরিত্যাগ করিবে, সেই স্থানের মাহাত্ম্যের আর তুলনা থাকিবে না।"[২]

"[চাষনি পীর]"—শাহজলাল পাথেয় স্বরূপ গুরুর নিকট হইতে এই মৃত্তিকা-প্রসাদ লইয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে প্রথমতঃ বারজন চেলা জুটিলেন, তন্মধ্যে একজন সেই মৃত্তিকার তহবিলদার হইলেন। তাঁহার উপর এই ভার থাকিল যে তিনি পথিমধ্যে যত জনপদ দেখিতে পাইবেন, সমস্তেরই মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া (চাখিয়া) দেখিবেন; যদি কুত্রাপি বর্ণ গন্ধ ও স্বাদে এই মাটির সমকক্ষ মাটি মিলে, তবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা শাহজলালের নিকট জানাইতে হইবে। এই ব্যক্তির নাম চাষনি পীর।"

"[জন্মস্থান সন্দর্শন]"—পরিব্রাজক ব্রতে দীক্ষিত হইয়া প্রথমতঃই শাহজলাল জন্মস্থান দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। আপন গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে তাঁহার তপঃসিদ্ধির কাহিনী প্রচারিত হইতে লাগিল, এমন কি এমন প্রদেশের বাদশাহের কর্ণেও তদীয় সুখ্যাতি পৌঁছিতে সমধিক বিলম্ব হইল না।"

"[পরীক্ষা]"—বাদশাহ চতুর রাজনীতিক ছিলেন। শাহজলালের বৃত্তান্ত শ্রবণে তিনি তদীয় পাত্র মিত্রকে কহিলেন, "বহুদিন হইতে আমার এই অভিলাষ যে কোন সিদ্ধ দরবেশ পাইলে তাঁহার মুরিদ (শিষ্য) হইয়া ভক্তিভরে তদীয় সেবা শুশ্রূষা করিব। তবে প্রথমতঃ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব তিনি ঠিক সাধু কিনা, নচেৎ তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ হইবে না।" শাহজলালকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সুতরাং বাদশাহ এক কৌশল করিলেন। শরবতের পাত্রে বিষ মিশাইয়া জনৈক ভৃত্য দ্বারা উহা শাহজলালের নিকট প্রেরণ করিলেন। হজরতের অন্তঃকরণ দর্পণের ন্যায় ছিল, উহাতে অন্যের ভাল মন্দ সমস্ত ভাব প্রতিফলিত হইত। তিনি বাদশাহের কূটনীতি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ভাল মন্দ সমস্তই নিজের অদৃষ্টফলকে লিখিত, যে যাহা মনে করে সে সেইরূপই ফল পাইবে। ফকিরের জন্য ইহা অমৃত, কিন্তু দাতার পক্ষে এই শরবত প্রাণান্তকারী হলাহল।" এই বলিয়া তিনি শরবৎ পান করিলেন, এদিকে বাদশাহ হঠাৎ গতাসু হইলেন। এই আকস্মিক মৃত্যু ঘটনায় তাঁহার কপট কৌশল কাহিনী প্রকটিত হইয়া পড়িল।"

২. "শাহজলালের জীবনী (সুহল-ই-এমন) লেখক নসির উদ্দীন হায়দর ঢাকা নিবাসী ছিলেন। পরিশেষে শ্রীহট্টের এই মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করিয়া এই সহরেই অবস্থান করেন।"-(প্রদীপ)

"[এমনের প্রহলাদ]—বাদশাহের পুত্র শেখ আলী এই সমাচার অবগত হইয়া পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক শাহজলালের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে অবস্থান করিয়া সতত সেবা শুশ্রূয়া করিবার নিমিত্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শাহজলাল ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং রাজ কুমারকে দেশে থাকিয়া দয়াবান ও ন্যায় পরায়ণ হইয়া রাজ্যশাসন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

"[রাজপুত্রের বৈরাগ্য]—শাহজলাল জন্মভূমি হইতে চিরবিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক হিন্দুস্থান অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে রাজপুত্রের দেশে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল; রাজ্যধন প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহার আসক্তি রহিল না, নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতিও তিনি দৃষ্টি করিলেন না। সাধু শাহজলালের পবিত্র সঙ্গসুখ তাঁহার প্রবল বাসনার বিষয়ীভূত হইল। তিনি অমাত্য স্বজন সমস্তের চক্ষু এড়াইয়া শাহজলালের অন্বেষণে উন্মত্তের ন্যায় ধাবমান হইলেন এবং চতুর্দ্দশ দিবসের পথে অতিক্রম করিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন, প্রবল অনুরাগের নিদর্শন পাইয়া শাহজলাল রাজকুমারকে আপনার সহচর ভাবে গ্রহণ করিলেন।"

শাহজলাল দ্বাদশ জন সহচর সহ যাত্রা করিয়াছিলেন; পথে আসিতে আসিতে,—তদীয় প্রভাব শ্রবণে ও ভগবদ্ভক্তি দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া বহুলোক শিষ্যত্ব গ্রহণ করায়, অনুচর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বোগদাদ নগর নিবাসী নেজামউদ্দীন; আরবের জকরিয়া ও দাউদ প্রভৃতি বহুতর ব্যক্তি সেই দেশেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সঙ্গী হন। তৎপর গজনী নগর হইতে মোকদুম জাফর ও সৈয়দ মোহাম্মদ প্রভৃতি এবং মুলতান সহর হইতে আরেফ ও আজমীর হইতে সরিফ প্রভৃতি তাঁহার অনুসঙ্গী হইলেন।

"[ভারতবর্ষে আগমন]—শাহজলাল দলবল সহ দিল্লী নগরীতে আসিলেন। সেইখানে তখন নেজাম উদ্দীন নামক একজন অতি প্রসিদ্ধ পীর থাকিতেন।[৩] তাঁহার নিকট তদীয় এক শিষ্য আসিয়া শাহজলালের বিষয় কহিল, 'আরব হইতে এক দরবেশ আসিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র অতি অদ্ভুত। এই সাধু স্ত্রী সঙ্গ বর্জিত। তিনি চাদর দিয়া মুখ ঢাকিয়া পথ চলেন। আবাস গৃহে তিনি একটি বালককে নিজের সাক্ষাতে রাখেন এবং তাহাকে প্রাণাধিক প্রেমাস্পদের ন্যায় দেখিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর কোনও কর্ম্ম দেখা যায় না।"

"[নেজামউদ্দীন ও শাহজলাল]—পীর নেজাম উদ্দীনের মনে একটু খট্‌কা বাঁধিল। তিনি শাহজলালকে তাঁহার নিকটে আসিতে আহ্বান করিয়া একজন শিষ্য প্রেরণ করিলেন। শিষ্য শাহজলাল সমীপে উপস্থিত হইয়া মাত্র তিনি উহার মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, এবং কিছু না বলিয়া একটা কৌটায় কিছু তুলা এবং আগুন রাখিয়া বন্ধ করিয়া শিষ্যের হাতে উহা নেজাম উদ্দীনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নেজামউদ্দীন কৌটা খুলিয়া অগ্নি ও তুলা দেখিয়া শাহজলাল তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন। বাস্তবিক তপস্বী নেজাম উদ্দীনের তুলা সদৃশ সাদা ও কোমল ধর্ম্মিষ্ঠ অন্তঃকরণে যে শাহজলালের প্রতি সন্দেহ বহ্নির স্থান পাইয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, যোগসিদ্ধ শাহজলালের উহা বুঝিতে পারা তেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।"

"[জালালী কবুতর]—নেজামউদ্দীন নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া স্বয়ং শাহজলালকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। দেবালয়, রাজা ও সাধুর নিকটে রিক্ত হস্তে কেহ যায় না। নেজামউদ্দীনের দুই জোড়া কাজলা রং এর কবুতর ছিল, তাহাই নিয়া সাধু শাহজলালকে

৩. নেজাম উদ্দীন আউলিয়ার সময় লইয়াও গোলযোগ দৃষ্ট হয়; তত্তাবতের উল্লেখ করা অনাবশ্যক; মোট কথা–তৎসহ শাহজলালের দেখা হইয়াছিল।

উপহার প্রদান করিলেন এবং নিজের ত্রুটির নিমিত্ত বহু সাধ্য সাধনা করিলেন। বোধ হয় শাহজলালের এই কপোত চতুষ্টয়ই এই পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে জালালী কবুতরের প্রাদুর্ভাবের নিদান। পারাবত মাংস এই অঞ্চলে ভক্ষ্য হইলেও জালালী কবুতর কেহই হিংসা করে না।"

অতঃপর দিল্লী নগরে যেরূপে হজরত শাহজলালের সহিত বুরহান উদ্দীনের মিলন হয় এবং যেরূপে তিনি বুরহান উদ্দীনকে আশ্বাস দিয়া শ্রীহট্টাভিমুখে রওয়ানা হন, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এদিকে সিকান্দর গাজী বার বার পরাজিত হইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন। তিনি সম্রাটকে মুখ দেখাইতে অনিচ্ছুক হইয়া, নিজ পরাজয় বার্ত্তা দূতমুখে জ্ঞাপন করিয়া আরও সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট সৈন্য সমূহের ভীত ও গৌড়গোবিন্দের যাদুবিদ্যার গল্প শ্রবণ করিয়া এই পরাজয়ের মূল নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন, এবং সেই অবোধ সৈন্য প্রবোদার্থ তিনিও জনৈক পীরকে সেনাপতিরূপে প্রেরণ করিতে সংকল্প করিলেন।

শাহজলাল ও নসিরউদ্দীন সিপা-ই-সালার

ঐ সময়ে বোগদাদবাসী সৈয়দবংশীয় নসিরউদ্দীন নামক এক সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি দিল্লীতে আগমন পূর্ব্বক কর্ম্মানুসন্ধান করিতে ছিলেন। তাঁহার কুটুম্ব সৈয়দ মওকুফ নামক এক ব্যক্তির সহিত তদীয় বৈরতা ছিল, মওসুফের অসদ্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া তিনি দেশত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লী আগমন করেন। দরবেশ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল এবং লোকে বলিত যে প্রবল বায়ুবেগেও তাঁহার তাঁবুর দ্বীপ নির্ব্বাপিত হইত না।

উচ্চকুলোদ্ভব এই নসিরউদ্দীন সম্বন্ধে এইরূপ কথা শুনিতে পাইয়া সম্রাট ইঁহাকেই শ্রীহট্ট প্রেরণের উপযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞান করিলেন ও সিপা-ই-সালার অর্থাৎ সাধারণ সেনাপতি এই উপাধি[৪] দান করতঃ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে এক সহস্র অশ্বারোহী ও তিন সহস্র পদাতিক সৈন্য দিয়া শ্রীহট্ট প্রেরণ করিলেন।

ইঁহারা দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া যখন এলাহাবাদে (আল্লা হো বাদ) আসিয়া পৌঁছিলেন, —একই উদ্দেশ্যে প্রধাবিত গঙ্গাযমুনা সম্মিলনের ন্যায় হজরত শাহজলালের সহিত তথায় তাঁহাদের মিলন হইল। শাহজলাল বহুতর অনুসঙ্গী শিষ্য ও বুরহান উদ্দীন সহ তৎপূর্ব্বেই এস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

উভয় দলে এইরূপে সম্মিলিত হইলে, যখন তাঁহারা পরস্পরের উদ্দেশ্য অবগত হইলেন, তখন পরাজিত সিকান্দর গাজী তথায় অবস্থিতি করিতে ছিলেন, একত্র প্রথমে সেইস্থানে যাওয়াই স্থির হইল। এই সময়ে নসিরউদ্দীন সিপা-ই-সালার, হজরত শাহজলালের মহিমা অবগত হইয়া তদীয় শিষ্য মধ্যে গণ্য হন। পথে পথে হজরতের শিষ্য সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; বেহার প্রদেশে উপস্থিত হইলে হেসমউদ্দীন ও মজঃফর প্রভৃতি মান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক তদনুগামী হয়েন।

শাহজলাল ও সিকান্দর গাজী

অনতিবিলম্বেই শাহজলাল অনুচর ও সৈন্যগণ সহ সিকান্দর শাহের শিবিরে সমাগত হইলেন। সিকান্দর শাহ গাজী হজরতকে বহু সম্মান করিয়া, নিজ দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিলে,

৪. আইন-ই-আকবরিতে এই পদের ব্যাখ্যা আছে। রাজ্যের সকল স্থানের সকল সেনার উপর ইহার আধিপত্য চলিত। কাজেই সিকান্দরের সৈন্যদিগকেও নসির উদ্দীনের আধিপত্য স্বীকার করিতে হয়।

তিনি আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি রাজ্য সম্পত্তির লালসা রাখি না, শ্রীহট্টে এসলামধর্ম্ম প্রচার করিব, ইহাই উদ্দেশ্য। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, তথাকার ভূপতি তুমিই থাকিবে।" সিকান্দর ও হজরতের শিষ্য মধ্যে পরিগণিত হইলেন। এইরূপে শ্রীহট্ট সহরে পৌছার পূর্ব্বে হজরত শাহজলালের শিষ্য সংখ্যা ৩৬০ জন হইয়াছিল।

গৌড়গোবিন্দ কর্ত্তৃক খেওয়া বন্ধ করা ও ভয় প্রদর্শনাদি

অতঃপর হজরত সমস্ত দলবল সহ ব্রহ্মপুত্রপারে পৌঁছিলেন। গৌড়গোবিন্দ চরদ্বারা সর্ব্বদাই সিকান্দরের শিবিরের সংবাদ সংগ্রহ করিতেন; শাহজলাল সমাগম সংবাদও তিনি যথাকালে পাইয়াছিলেন, এবং এই নূতন দল যাহাতে ব্রহ্মপুত্র পার হইতে না পারে, তজন্য নৌকার চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন শাহজলাল স্বীয় প্রভাবে (উপাসনার্থ ব্যবহার্য্য নিজ নিজ চর্ম্মাসন জলে ভাসাইয়া তদবলম্বনে) নদী পার হইলেন। গৌড়গোবিন্দ বুঝিতেও পারিলেন না যে কি উপায়ে তাঁহারা নদী পার হইলেন। তৎপর তিনি শ্রীহট্ট সীমাদেশে চৌকি নামক স্থানে (দিনারপুর পরগণায়) উপস্থিত হইলেন; তৎকালে এস্থানই শ্রীহট্টের গৌড় রাজ্যের সীমাভূমি ছিল।[৫] এই স্থানে উপস্থিত হইলে সীমান্ত রক্ষী দ্বারা গৌড়গোবিন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হন ও অগ্নিবাণ প্রয়োগ প্রভৃতি কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক সেই স্থানেই তাঁহাকে পরাজয় করিত ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু যখন তাঁহার সমস্ত কৌশল ও চেষ্টাই বৃথা হইল, তখন গোবিন্দ উপায়ন্তর রহিত হইয়া, সেই স্থানের পূর্ব্বোত্তরে বরাক নদীতে খেওয়া নৌকা বা অপর কোন নৌকা চলাচল করা নিষেধ করিয়া দিলেন; উদ্দেশ্য শত্রুসৈন্যগণ যেন নদী পার হইতে না পারে। হজরত তথা হইতে সসৈন্যে সতরসতী উপস্থিত হন ও তদন্তর্গত বাহাদুরপুরের মধ্যস্থিত ফতেপুর নামক স্থানে সে রাত্রি অতিবাহিত করেন। তদবধি তথায় একটি মোকাম স্থাপিত হয়। এই বাহাদুরপুরের নিকটে বেগবান বরবক্র নদ প্রবাহিত; শাহজলাল তথাও পারের জন্য নৌকাদি কিছুই পাইলেন না; রাজা গৌড়গোবিন্দের আদেশে লোকের চলাচল ও নৌকার যাতায়াত পূর্ব্ব হইতে বন্ধ হইয়াছিল। শাহজলাল নদীপার হইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া পূর্ব্বনুরূপ স্বীয় প্রভাবে বরবক্র নদও পার হইলেন।[৬] শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—

"[লৌহধনুতে গুণ যোজনা]—গোবিন্দ তখন এক ফিকির উদ্ভাবিত করিলেন। লৌহ দ্বারা এক ধনু নির্ম্মান করাইয়া শাহজলালের নিকট পাঠাইয়া জানাইলেন যে, ইহাতে গুণ আরোপ করা হইলে তিনি শ্রীহট্ট ছাড়িয়া যাইবেন। তাঁহার নিকটে লৌহধনু পৌছিলে, তিনি স্বয়ং গুণ যোজনা না করিয়া সৈন্য মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যে, যাহার আসরের নামাজ কোনও দিন কাজা হয় নাই, তাহাকে তাঁহার নিকটে আনিয়া হাজির করিতে হইবে। সমস্ত শিবির অনুসন্ধান

৫. "চৌকি নামে ছিল যেই পরগণা জাহার।
ছিলটের হর্দ্দ ছিল সাবেক মসুর॥
সেখানে আসিয়া তিনি পৌছিলা যখন।
খবর পাইলা তবে গোবিন্দ তখন॥–তোয়ারিখে-জলালি

৬. "এপারে হজরত তার লস্কর সহিতে।
আসিয়া পৌছিলা এক নদীর পারেতে॥
বরাক নামেতে নদী ছিল যে মসুর।
যাহার নিকটে আছে জান বাহাদুরপুর॥
যখনে পৌছিলা তিনি নদীর কেনার।
নৌকা বিনা সে নদীও হইলেন পার॥"-তোয়ারিখে-জলালি

ক্রমে সেপা-ই-সালার নসিরউদ্দীনকে মাত্র ঈদৃশ নিয়মনিষ্ঠ পাওয়া গেল। শাহজলাল তাঁহাকেই ধনুতে গুণ যোজনা করিতে আদেশ করিলেন। নসিরউদ্দীন ভগ্নবন্নাম স্মরণ পূর্ব্বক অনায়াসে লৌহ ধনুতে গুণ আরোপ করিয়া দিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক হইল। ধনু গোবিন্দের নিকট নীত হইলে তিনি জয়ের আশা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেন।"

প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শন ও পলায়ন

অতঃপর গোবিন্দ পলায়ন করাই সঙ্গত বোধ করিলেন। শিশুরা জুজুর ভয়ে স্বভাবতঃ ভীত হইলেও যেমন কোন কোন দুরন্ত শিশু জুজু কেমন দেখিতে ইচ্ছা করে, কথিত আছে, পলায়নের পূর্ব্বে তেমনই গোবিন্দের মনে একটা কৌতূহলের উদয় হয়। এবং তিনি সেই কৌতূহল তৃপ্তির জন্য সর্পক্রীড়নকের পেটিকাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া শাহজলালকে দেখিতে গমন করেন। শাহজলাল তাঁহার এ চাতুর্য্য ধরিয়া ফেলিলেন, তখন তিনি লজ্জিত হইয়া অবনত মস্তকে শাহজলালের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত হন।

গোবিন্দ বিমর্ষমনে প্রত্যাগমন করিলেন। পলায়নই স্থির হইল, কিন্তু কই? পলায়ন জন্যও ত একটা সময় চাই, এই জন্য গোবিন্দ তাঁহার শেষ উপায় সুরমা নদীতেও নৌকা চলাচল বন্ধ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই সাধু ও উদ্যোগী পুরুষকে বাধা দিতে পারিল না, তাঁহারা পূর্ব্বরূপ চর্ম্মাসন জলে ভাসাইয়া তদবলম্বনে সুরমা নদীও অবহেলে পার হইলেন। যে স্থান দিয়া শাহজাদা শেখ আলী প্রমুখ পীরগণ সুরমা নদীর পার হইয়াছিলেন, তাহা শেখঘাট নামে পরিচিত হইল।

শাহজলালের নদী পার হওয়ার সংবাদ গৌড়গোবিন্দ অবগত হইয়া অতিমাত্র ভীত হইলেন,—যুদ্ধ করা কিছুতেই সঙ্গত মনে করিলেন না, এবং অনতিবিলম্বেই গড়দুয়ারস্থিত রাজবাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পেঁচাগড় পর্ব্বতস্থ গুপ্ত গিরিদুর্গে পলাইয়া গেলেন।[৭] এই পেঁচাগড় দুর্গ শামস্উদ্দীনপুত্র সিকান্দর শাহের আক্রমণের পরেই (সহর হইতে ৬/৭ মাইল পূর্ব্বে) নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রাজা গৌড়গোবিন্দের অর্চ্চিত শিব বিগ্রহাদি তৎপূর্ব্বেই স্থানান্তরিত হইয়াছিল, রাজবাটীসমূহ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছিল, কিন্তু এ সংবাদ হজরতকে দিবার জন্য একটি লোকও তথায় ছিল না। যাহা হউক, হজরত তিন দিন ঈশ্বরোপাসনা করিয়া সর্ব্ব প্রথম মিনারের টিলাস্থিত রাজবাটী আক্রমণের আদেশ দিলেন; আদেশ তখনই রক্ষিত হইল ও মিনারের অত্যুচ্চ টিলার গগনস্পর্শী মন্দিরে বিধ্বস্ত হইল! এই জন্য এযাবৎ সর্ব্বসাধারণে এইরূপ একটা কথা প্রচলিত আছে যে, "মিনারের টিলা সাত তাল উচ্চ ছিল, শাহজলালের ও তাঁহার শিষ্য নূরের আজান ধ্বনির প্রতিঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়।"

এথা হইতে গড়দুয়ার আক্রান্ত ও কেল্লা ভগ্নীকৃত হইল; রাজবাটী শূন্য, বাধা দিতে এক ব্যক্তিও ছিল না; সহজেই রাজভাণ্ডার বিলুণ্ঠিত হইল; বহুতর হস্তীদন্ত, দন্ত নির্ম্মিত পাটী, উৎকৃষ্ট

---

৭. "সিংহাসন ছাড়ি গেলা পর্ব্বত ভিতর।
এপারে কি হৈল তার না জানি খবর॥
পেঁচাগড় নামে এক ছিল যে পর্ব্বত।
বহুলোকে বলে তথা করিল বসত॥
প্রহকের তফাওত সহর হইতে।
বসত করিল গিয়া সেই পাহাড়েতে॥"–তোয়ারিখে–জলালি

ঢাল, আগর কাষ্ঠ ইত্যাদি মূল্যবান বহুদ্রব্য ভাণ্ডারে পাওয়া গেল, এবং অনেক হস্তী ও ঘোড়া প্রভৃতিও প্রাপ্ত হওয়া গেল।[৮]

এইরূপে বিনা রক্তপাতে শ্রীহট্ট বিজিত হইল,[৯] বহুতর সৈন্য সামন্ত থাকাসত্ত্বেও যে পথে গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেন গমন করেন, সেই পথে এই পূর্ব্বাঞ্চলীয় গৌড়াধিপতি গোবিন্দও গমন করিলেন। বিনাযুদ্ধে বঙ্গাধিপতি দ্বিতীয় শামস্উদ্দীনের সময়ে (ইংরেজ ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব প্রভৃতির মতে ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে) শ্রীহট্টে মোসলমানের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল।[১০] বহুকাল পরে বুরহানউদ্দীন ও নুরউদ্দীনের ভ্রাতৃদ্বয়ের মনবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

শাসনকর্ত্তা নিয়োগ

শ্রীহট্ট বিজিত হইলে, শাহজলাল স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই; এমন রাজকুমার ও ধর্ম্মচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাপালন ও শাসন, সুখকর বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। তখন সম্রাট ভাগিনেয় সিকান্দর গাজীর উপর, এমনের রাজপুত্রের নামে শ্রীহট্টের শাসনভার অর্পিত হইল।

মৃৎ পরীক্ষা

অতঃপর চাস্‌নি পীর যখন শ্রীহট্টের ভূমি পরীক্ষা করিলেন, তখন দৃষ্ট হইল যে হজরতের গুরু পীর আহমদ কবির প্রদত্ত মাটির সহিত এথাকার মাটির বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ মিলিয়া গেল। হজরতকে ইহা জানাইলে, এস্থানই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বুঝিতে পারিয়া তিনি একটি মনোরম স্থানের উপর নিজ উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

৮. "হাতী ঘোড়া পাতরাদি সামান দালান।
আগর আতর আদি মিহিন চাউল।
হাতীদন্ত পাটি মধু কমলা নিতুল॥
লড়াইর সামান মধ্যে পায় গেঁড়া ঢাল।
পৃথিবীর উপরে নাই যাহার মেসাল॥"–তোয়ারিখে-জলালি

৯. উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহার মর্ম্ম সরকারী ইতিহাসে এইরূপ লিখিত হইয়াছেঃ–
"Shah Jalal crossed the Brahmaputra and the Surma on a moehalla or praying seat and proceeded to reduce Gaur Gobind by methods which no ordinary man could be expected to resist. The Hindu Raja had built himself a magical seven-storied tower, to which he retreated on the approach of the invaders. Shah Jalal each day offered up a solemn prayer, at the conclusion of which one of the stories of the tower collapsed. Gour Gobind endured this mysterious destruction of his fortress "for four days and then surrendered."
-Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) p. 24.
-Vide also the accounts of Shah Jalal by Dr. Wise in the J. A. s. Bengal vo. 42. pt. 1.

১০. "Sylhet appeares to have been conquared by a small band of Muhammadans in the reigu of Bengal King Shamsuddin in 1384 A. D. The supernatural powers of the Fakir Shah Jalal, who was the real leader of the invaders."
-Hunter's Statistical Accounts of Assam vol. II (Sylhet)
শাহজলালের সময়টা আরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। তবে তদীয় শ্রীহট্ট বিজয় সংবাদ বহু লেখক কর্ত্তৃকই এইরূপ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদিগকে উপযুক্ত প্রমাণের সহিত কেহ জানাইয়াছেন যে ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট বিজিত হয়। এই সকল প্রমাণাবলী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধকলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক এবং তাহা পাঠকের পক্ষেও রুচিকর হইবে না।

দেবতা সংগোপন

কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ নষ্ট করতঃ শাহজলাল তৎস্থলে দরগা প্রস্তুত করেন। ইহা নিতান্ত অমূলক কথা। শাহজলাল হিন্দুতীর্থ বিনষ্ট করিলে, মোসলমান লেখকগণ—বিশেষতঃ সুহেল-ই-এমনের গ্রন্থকার তদীয় জীবন চরিতে তাহা সগৌরবে ঘোষণা করিতেন। শাহজলালের আক্রমণ একটা হঠাৎ ঘটনা নহে। বাঙ্গালার নবাব সিকান্দর শাহের সময় হইতে শ্রীহট্ট বিজয়ের চেষ্টা হইতেছিল, কাজেই এ সময়ের মধ্যে পীঠরক্ষক ব্রাহ্মণগণ পীঠ রক্ষার ভাল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেবতাগণকে বিশেষ ভাবে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি কোন হিন্দু দেবতার উপর অত্যাচার করিতে পারেন নাই,—করেনও নাই; এই জন্যই বুঝি হিন্দুগণও তাঁহার সম্মাননা করিয়া থাকেন। যাহাহউক, ঐ সময় গৌড় গোবিন্দের অর্চ্চিত হাটকেশ্বর বিগ্রহও স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন; তবে রাজা গৌড় গোবিন্দ দেবদ্বিজ ভক্ত ছিলেন, মিনারের টিলা ব্যতীত, বর্ত্তমানে যথায় শাহ জলালের দরগা বিরাজিত সেস্থানেও তৎপ্রতিষ্ঠিত কোন দেবমন্দির থাকা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তখন কোনও কিছু যে ছিল তাহার অণুমাত্রও প্রমাণ নাই।

স্ত্রীলোক বিলোকন

শাহজলাল শাহ সিকান্দর গাজীর[১১] উপর রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ পূর্ব্বক নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে স্থানে তাঁহার উপাসনালয় নির্ম্মিত হইল, তাহার পশ্চিমপার্শ্বে একটি কূপ খনন করাইলেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রাকৃতিক একটা উৎস, ইহা হইতে সর্ব্বদাই জল প্রবাহিত হইতেছে। শাহজলাল হিন্দুর পুষ্করিণীতে হস্তমুখ প্রক্ষালণ করিতেন না। হজরত কখনও স্ত্রীলোক দর্শন করেন নাই। তদীয় উপাসনাগৃহের উত্তর পার্শ্বে এক পুষ্করিণী ছিল, একদা হঠাৎ ঐ পুষ্করিণীঘাটে এক রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; আর কখনও রমণীর কমণীয় কান্তি তাঁহার নেত্রপথে পতিত হয় নাই, যখন তিনি উহা স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া বুঝিলেন, তখন বড় বিমর্ষ হইলেন ও ঐ পুকুরের অস্তিত্ব বিলোপ হইতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা তখনই কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। ঐ স্থানটি নিম্নভূমি প্রায় পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর অনতিবিলম্বে সেই স্ত্রীলোকটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাঁহার বস্ত্রাদি যে স্থানে প্রোথিত করা হয়, শ্রীহট্টে তাহা "বিবির মোকাম" নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

চিরকুমার শাহজলাল ও রমণীবিষয়ক আর একটা কাহিনী আছে, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ কৃত প্রদীপের সুলিখিত প্রবন্ধ হইতেই তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"[সিকান্দরের ভ্রম]—গ্রীষ্ম প্রধান স্থান হইতে আসা হেতু শাহজলালের সহচরবর্গ

---

১১. "সিকান্দর শাহ যেই ছিলেন সঙ্গেতে।
মুল্লুকের ভার দিলা তাঁহার জিম্বাতে॥"–তোয়ারিখে–জলালি
এই সিকান্দর শাহকে অনেকেই বঙ্গাধিপতি (শামস্‌উদ্দীন-পুত্র) সিকান্দরশাহ বলিয়া ভ্রমে পতিত হন। গেইট সাহেবও সেই ভ্রম হইতে উত্তীর্ণ হন নাই। (তৎপ্রণীত আসামের ইতিহাস ২৭০ পৃষ্ঠা।) বঙ্গাধিপতি সিকান্দর শাহ শ্রীহট্টে আসিয়া পরাজিত হন, এবং দিল্লী হইতে আগত সম্রাটভাগিনেয় সিকান্দরও পরাজিত হন। উভয়ের একরূপ নাম ও ঘটনা হওয়াতে এই ভ্রম উপজাত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু ঐ সময়ে বঙ্গাধিপতি জীবিত ছিলেন না, এইজন্যই ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব ইঁহাকে গাজী উপাধিতে বিশেষিত ফলতঃ বিভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা–"He subsequently made over the active management of secular affairs to the nominal lceader Sekunder Gazi."-S. A. A. vol. II

শিশিরাগমে শ্রীহট্টে শীতে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা শীতবস্ত্রের জন্য সাধুকে ধরিলেন। শাহজলাল একদা সিকান্দর শাহকে কহিলেন, দেখ দারুণ শীতের সময় আসিয়াছে, যাহাতে শীত নিবারণ হয়, জরুরী এমন উপায় করিবে। সিকান্দর বিষয়ী লোক, তিনি এই সামান্য কথার বিপরীত অর্থ করিলেন। শীত নিবারক কন্থা কম্বলের আয়োজন না করিয়া শাহজলালের নিমিত্ত শীতহারিনী বণিতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।"

"[সিকান্দরের পরিণাম]—অনেক চেষ্টায় পরম সুন্দরী এক রমণী যোগাড় করিয়া সিকান্দর শিবিকায় তাহাকে শাহজলাল সমীপে পাঠাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া সাধু পরিতাপ করিয়া বলিলেন, 'হায়, সিকান্দর নিজে যেরূপ ডুবিয়াছ, আমাকেও কি সেইরূপে ডুবাইবে? আমি দীনহীন ফকির, মজঃরদ, আমার জন্য কি এই ব্যবস্থা?' ইহার কিছু পরেই, সংবাদ আসিল, সিকান্দর শাহ সুরমা নদী পার হইতে গিয়া নৌকা ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।[১২] আরও আশ্চর্য্যেব বিষয় যে, তখন কোনওরূপ তুফান বা তরঙ্গ কিছুই ছিল না। বহু অনুসন্ধানেও সিকান্দরের মৃতদেহ পাওয়া গেল না।"

"[রমণীর পরিণয়]—শাহজলালের সঙ্গে তদীয় প্রিয়তম যে সকল শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে হাজি ইউসুফের প্রতি আদেশ হইল যে. তিনি সিকান্দরের প্রেরিত রমণীর যথারীতি পাণি গ্রহণ করেন। হাজিও সংসারবিরক্ত ছিলেন, তাই ধন দৌলতের অভাব এবং সাংসারিক ধর্ম্ম বীতস্পৃহতা জানাইয়া পরিহার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু শাহজলাল তাঁহাকে নানা যুক্তি ও নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনশ্চ আদেশ করাতে তিনি অগত্যা স্বীকার করিলেন। এই পরিণয়জাত সন্তানগণের বংশধরেরাই এক্ষণে সাধুর সমাধির তত্ত্বাবধায়ক এবং ইঁহাদের সরদার সর্কুমও এই বংশজাত।"

পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা—সিকান্দর গাজীর মৃত্যু হইলে শাহজলাল শ্রীহট্টের শাসনভার তাঁহার এক প্রধান অনুসঙ্গীকে প্রদান করেন,[১৩] শ্রীহট্ট-দর্পণ নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, শ্রীহট্ট বিজয়ান্তে শাহজলাল, হায়দর গাজীর উপর শ্রীহট্টের শাসনভার অর্পণ করেন; কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না। সিকান্দরের মৃত্যুর পর যাঁহার উপর শাসনভার সংন্যস্ত হয়, তাঁহারই নাম হায়দর গাজী ছিল, এরূপ নির্দ্দেশ করাই সত্যমূলক বোধ হয়।[১৪]

এসলামধর্ম্ম প্রচার ও মৃত্যু

হজরত শাহজলাল শ্রীহট্ট দেশের নানা অংশে অনুসঙ্গী সাধুগণকে প্রেরণ পূর্ব্বক মোসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। কেবল শ্রীহট্ট নহে, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, রংপুর প্রভৃতি স্থানেও তিনি প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা যে একবারে বিফল

---

১২. শাহ সিকান্দর সুশাসক ছিলেন; কিন্তু তিনি অধিকাংশকাল বন্যজন্তু পক্ষী এবং মৎস্য শিকারের আমোদরত থাকিতেন। এই জন্য তাঁহাকে নৌকাযোগে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে হয় বলিয়া কথিত আছে। এ অঞ্চলে মৎস্য শিকারী বালকগণ বরশী শিকার করিতে গিয়া প্রথমে সিকান্দর শাহ গাজীকে বন্দনা করিয়া থাকে; যথা–"শাহ সিকান্দর গাজী, মাছ পাইলে আধাআধি; তুই খাইবে মাছখান, মোরে দিবে গছা খান।' ইত্যাদি। এই বন্দনা হইতে সিকান্দরের মৎস্য শিকাব প্রিয়তার প্রমাণ হয়।–(আমাদের যোজিত টীকা।)

১৩. "তখনে মরিল সেই শাহ সিকান্দর।
বেসরদার হৈল তবে ছিলট নগর॥"
"এজন্যে হজরত শাহজলাল এমনি।
নিযুক্ত করিল এক সরদার তখ[illegible]॥"–তোয়ারিখে-জলালি

১৪. হায়দর গাজীর নানকার ভূম বলিয়া শ্রীহট্ট সহর ছিল। এজন্য অদ্যাপি শ্রীহট্ট সহর সিদ্ধ [illegible]ক্কর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হইয়াছিল, এমত নহে। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের অনেক ব্যক্তিই তাঁহাদের আহ্বানে আকৃষ্ট হয়। রাজার জাতি সমাজে হীনদশাপন্ন থাকার সম্ভাবনা নাই। সমাজে হীনদশাপন্ন শ্রীহট্টের বহুতর মোসলমান কৃষক যে এক সময়ে হিন্দু সমাজ হইতে জাতিচ্যুত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বোধ হয়। শাহজলাল, তরফ বিজয়ে নসিরউদ্দীন সিপা-ই-সালারকে প্রেরণ করেন। কাণিহাটীতে শাহ হেলিমউদ্দীন প্রেরিত হন, এবং জিয়াউদ্দীনকে বুন্দাশিল পাঠাইয়া দেন। বুন্দাশিল তৎকালে গৌড় রাজ্যের পূর্ব্বসীমা ছিল। জিয়াউদ্দীন হজরতকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, দেওরাই নামে এক দুরন্ত রাত্রিচর তথায় এরূপ উৎপাত করিয়া থাকে যে, প্রজাগণের বাস করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সুহেল-ই-এমনের গ্রন্থকার এই দেওরাইকে "দেও" বা ভূত শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। হজরত এই সংবাদ প্রাপ্ত অতিমাত্র দয়াবশতঃ অনতিবিলম্বে তথায় গমন করেন এবং দুরন্ত দেওরাইকে প্রাণে বধ করিয়া সেই প্রদেশে শান্তি স্থাপন করেন। "দেওরাই দেওয়ের" অধিকৃত স্থানই পরে দেওরালি পরগণায় পরিণত হইয়াছে।

কথিত আছে যে, তৎকালে সুরমা নদীর জল সুপেয় ছিল না; দেওরালি অবস্থান কালে শাহজলাল স্বীয় প্রভাবে সুরমার জল সুপেয় করেন।

ঐ স্থানের নিকট হইতেই বরাক নদী সুরমা ও কুশিয়ারা বা বরাক এই দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বরবক্রের প্রধান স্রোত এক সময় প্রশস্তরক্ষা সুরমার খাতে প্রবাহিত হইত, কুশিয়ারা তখন ক্ষীণ কলেবরা ছিল। বোধ হয়, এই সময় হইতে প্রধান স্রোতটি কুশিয়ার দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হওয়ায় সুরমা স্বচ্ছ সলিলা হয়। জলের বেগ অধিক হওয়ায় কুশিয়ার জল সুরমার জলের ন্যায় সুনীল স্বচ্ছ নহে।

এইরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম ও দেশহিতকর কার্য্যে হজরত দেশের মধ্যে যথার্থই দেবতার মত পূজিত হইতে লাগিলেন। তিনি শ্রীহট্ট আগমনের পর ত্রিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, তৎপর দ্বিষষ্টি বর্ষ বয়সে শুক্রবারে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার নিজকৃত উপাসনাগৃহের পার্শ্বে তদীয় দেহের সমাধি দেওয়া হয়। এই পবিত্র সমাধিস্থল এখনও তথায় বিরাজিত আছে, এবং ইহার বিদ্যমানতা জন্যই শ্রীহট্ট সহর এক প্রধান মোসলমান তীর্থে পরিণত হইয়াছে। শাহজলালের দরগা হিন্দু, মোসলমান, সকলেরই নিকট মান্য। গবর্ণমেন্ট এই দরগার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক একশত টাকা প্রদান করেন।

মসজিদ প্রস্তুত

পূর্ব্বে ইসপেন্দিয়ারের আদিনা মসজিদের প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। দরগার পূর্ব্বাংশে পথ-পার্শ্বে যে প্রাচীন মসজিদ দৃষ্ট হয়, কথিত আছে যে, ইসপেন্দিয়ার পূর্ব্বোক্ত আদিনা মসজিদ এই মাহাত্মজনক স্থানে স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, তাহার "মালমোসলা" আনাইয়া ঐ মসজিদ পরে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এক ঈদ পর্ব্বের পূর্ব্বে ইহার কার্য্য শেষ হইবার কথা ছিল, কিন্তু স্থপতি অসমর্থ হওয়ায়, সেই মসজিদ গৃহেই বৃদ্ধ ইসপেন্দিয়ার তাহাকে বধ করেন। এই হত্যা জনিত দোষে মসজিদটি পরিত্যক্ত হয়। অদ্যাপি অপূর্ণাবস্থায় ইহা পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।[১৫]

শাহজলারের দরগায় কয়েকটি প্রস্তরলিপি দৃষ্ট হয়। মসজিদের অভ্যন্তরস্থিত একখানি

১৫. Maulvi abdul Hafez the present Sarkum of the Shah jalal's Temple writes:- "The mason promissed to complete it before the Ede-day, but as the mason failed, he was beheaded and mixed with materials. The ulamas thereon gave Fatwa that the masjid was unfit for prayer and hence it remains incomplete to this day."

প্রস্তর লিপিতে লিখিত আছে যে, শামস্উদ্দীন ইউসুফ শাহের সময়ে ইহা নির্ম্মিত হয়।[১৬] ইউসুফ শাহের শাসন কাল খৃঃ ১৪৭৪ হইতে ১৪৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।[১৭] ইউসুফ শাহ পূর্ব্বকথিত দুইজন শামস্উদ্দীন হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি। তিনি শাহজলালের প্রতি ভক্তিমান হইলেও তাঁহার পরবর্ত্তী ছিলেন। ইউসুফের নামাঙ্কিত শিলালিপি বোধ হয় শাহজলালের দরগায় নির্ম্মিত আদি মসজিদের প্রস্তর লিপি।

একটি মসজিদের দ্বারলিপিতে (৯১১ হিজরী) ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ অঙ্কিত আছে, সুতরাং ইহা সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দ হুসেন শাহের সময়ে খোদিত হইয়াছিল।

দরগার বৃহৎ মসজিদটি সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, প্রস্তরলিপিতে (১০৮৮ হিজরী) ১৬৭১ খৃষ্টাব্দ অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। দরগার একটি মসজিদের দেওয়ালে যে প্রস্তরলিপি দৃষ্ট হয়, তাহাও উক্ত সম্রাটের সমকালীন সন্দেহ নাই, তাহাতে (১০৭৪ হিজরী) ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ খোদিত আছে। কিন্তু ইহা অন্য কোনও স্থান হইতে সংগ্রহ ক্রমে তথায় যোজনা করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

দরগার দ্রব্যাদি

শাহজলালের দরগা একটি সুন্দর স্থানে মনোরম শৈলখণ্ডের উপর অবস্থিত। গুম্বজ মিনারাদি শোভিত মসজিদ, পার্শ্বপ্রবাহি প্রস্রবণ ইত্যাদিতে ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। দরগার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুল্য। দরগা-পার্শ্বে উপনীত হইলে কি জানি কি কুহকে মন সহরের তীব্র কোলাহল হইতে দূরে নিভৃতে যেন চলিয়া যায়। এই মনোরম বাহ্যসৌন্দর্য্য ব্যতীত দরগায় আরও দর্শনীয় দ্রব্য আছে।

হজরত শাহজলাল এদেশে আগমন কালে উট পক্ষির দুইটি ডিম্ব আনয়ন করিয়াছিলেন; ইহার একটি অদ্যাপি দরগাতে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত হজরত শাহজলালের ব্যবহার্য্য "জুলফুকার" নামক তরবারি, তদীয় নমাজের "মোসল্লা" (মৃগ চর্ম্মের আসন), এবং কাষ্ঠপাদুকা এখনও আছে।[১৮]

হজরত শাহজলালের ব্যবহার্য্য দুইটি তাম্র নির্ম্মিত পেয়ালা পাত্র আছে, উহার চতুষ্পার্শ্বে আরবি অক্ষরে কোরাণের "কলমা" বা মন্ত্র লিখিত; এই পেয়ালা পাত্রদ্বয় বর্ত্তমান সরকুম সাহেবের জিম্বায় এখনও আছে। এই সকল দ্রব্য মোসলমানগণ অতি পবিত্র জ্ঞান করেন এবং তদ্ধৌত জল পানে অনেকের উপকার হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে।

শাহজলালের দরগার একটি "ডেগ" উল্লেখযোগ্য। এই তাম্র নির্ম্মিত অতি বৃহৎ স্থালীতে প্রায় ১০/১২ মন চাইলের অন্ন অনায়াসে পাক করা যাইতে পারে। ইহার কিনারায় যে পারস্য কবিতা লিখিত আছে, তাহাতে ১১১৫ হিজরী অর্থাৎ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ খোদিত আছে। এই সুবৃহৎ

---

১৬. এই প্রস্তর লিপির যে অংশ পাঠ করা যায় তাহার অনুবাদ এইরূপ ঃ–
"Abdul Muzafiar Yusuff Shah, son of Barbak Shah, the king, son of mahmud Shah, the king. May God prospetuate his rule and kingdom! and the builder is the great and exalted Majlis the wazir, who exerts himself in good deeds and pious acts; the Majlis-I-A'ls may God preserve him against the evils and***"

১৭. "The oldest historical record is an inscription on a stone inside the famous shrine of Shah Jalal at Sylhet. This was prepaed in the time of Shamsuddin Yusuf Shah, who recited in Bengal from 1474 to 1481, but unfortunately only part of it is decipherable in its present position."
-Gait's History of Assam. Chap. XIII. P. 271.

১৮. এই দ্রব্যগুলি মুফ্‌তি শ্রীযুক্ত নসীরউদ্দিন সাহেবের জিম্বায় সংরক্ষিত আছে।

পাত্র সম্রাট আরঙ্গজেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

শাহজলালের দরগাতে অনেকটি সমাধি দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব বৃহৎ সমাধিটি হজরত মজঃরদ শাহজলালের। তৎপূর্ব্ববর্ত্তীটি এমনের রাজকুমার শাহজাদা শেখ আলির। পশ্চিমেরটি গৌড়ের উজিরপুত্র মকবুল খাঁর সমাধি। প্রাচীরের বহির্ভাগে তদীয় অনুসঙ্গী হাজি ইউসুফ, হাজিদায়রা ও হাজি খলিলের কবর আছে। হজরতের অনুসঙ্গী অনেক প্রধান ব্যক্তি কবর সহরের নানাস্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী টিকাধ্যায়ে তাহার বিবরণ দৃষ্টব্য।

প্রধানতঃ হজরত শাহজলালের অনুসঙ্গী ৩৬০ জন আউলিয়া বা ধর্ম্মবীর কর্ত্তৃক শ্রীহট্ট বিজিত হইয়াছিল বলিয়া বিদেশীয় মোসলমানগণ শ্রীহট্টকে "তিনশ ষাট আউলিয়ার মুলুক" বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকা

আউলিয়াদের নাম—শাহজলারের অনুসঙ্গে যে সকল শিষ্য শ্রীহট্টে আগমন করেন, তাঁহাদের অনেকেরই অনেক অসাধারণ কীর্ত্তি কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহারা অনেকেই উচ্চবংশসদ্ভূত ছিলেন, এবং তন্মধ্যে কাহার কাহারও বংশ অদ্যাপি শ্রীহট্ট জিলার নানা স্থানে আছে। তদ্বিবরণ বংশ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ হইবে, এস্থলে কাহার কাহারও সংক্ষেপ পরিচয় সহ নামের একটা তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

অ

অজিউদ্দীন

আ

আজিজ (সহিদ)*
আজিমউদ্দীন কাজি।
আজিবান (সৈয়দ)*
আতাউল্লা হাফেজ।
আদম খাকি।
আমানউল্লাহ (শেখ)
আমীর (সৈয়দ)
আরেজ আসকরি।
আরেফ মূলতানী
আলিম (সৈয়দ)
আলী এমনি শাহজাদা (শেখ)১
আলী এমনি (দ্বিতীয়)
আবু (সাইদ)
আবু তুরাব।২
আবু বক্কর (সৈয়দ)৩
আবুল আজেজ।
আবুল ফজল (শেখ)
আবুল হাসন।
আবুল খয়ের।
আবু বক্কর ছানি (সৈয়দ)
আবুল আজিজ।
আব্দুল আলী (শেখ)
আব্দুল জলিল।
আব্দুল করিম (শেখ)
আব্দুল মালেক।
আব্দুল শুকুর।
আব্দুল হাকিম।
আব্দুল্লা সাহেব।
আব্দুল্লা (শেখ)
আব্দুর রহিম।
আব্দুর সকর।
আব্বাস (সৈয়দ)
আহমদ আব্বাসি।
আহমদ নেসার বরদার।
আহমদ সাহেব (শেখ)
আহমদ কবির (সৈয়দ)
আহমদ (সৈয়দ)
আহমদ (সৈয়দ)২

ই

ইউসুফ (সৈয়দ)
ইয়াকুব (সৈয়দ)
ইলরাস (শৈখ)
ইসমাইল উমরি।
ইসা (শেখ)
ইসা (সৈয়দ)

উ
উমর (শেখ)
উমর দরয়ায়ী।
উমর (কাজি)
উমর সমরকান্দী (সহিদ)৪
উসমান উদ্দীন।
উসমান (শেখ)

এ
এতিম শাহ।৫
এমামউদ্দীন।
এমাম শুকুরউল্লা।
এহিয়া কারি।

ও
ওমর চিস্‌তি।
ওমর (শেখ)
ওসমান সাহেব।
ওসমান (সৈয়দ)
ওসমান উদ্দীন।

ক
কবির (সৈয়দ)
করিম দাদরুমি।
কামালউদ্দীন।৬
কামাল এমনি।
কালামিয়া।
কাশেম (সৈয়দ)
কাশেম দক্ষিনী (সৈয়দ)
কুতব উদ্দিন (শেখ)
কুতব আলম।
কুতব উদ্দীন (সৈয়দ)

খ
খলিল উল্লা (সহিদ)
খলিল দেওয়ানা।
খাজা আজিউদ্দীন।
খাজা ইসা চিস্‌তি।
খাজা আজিজ চিস্‌তি।
খাজা আদ।
খাজা আদেনা।
খাজা আমীর উদ্দীন।
খাজা আলী।
খাজা ইসা।
খাজা একবাল।
খাজা এখতিয়ার।
খাজা ওমর জাঁহা।
খাজা ওমর চিস্‌তি।২
খাজা তৈয়ব।
খাজা দাউদ।
খাজা নসিরউদ্দীন।
খাজা নসিরউদ্দীন।২
খাজা পীরর।
খাজা বাহাউদ্দীন।
খাজা মালেক
খাজা শিরাজ।
খাজা সলিম।
খাজা সুফিয়ানা।
খেজর খাস্তদবির (শেখ)৭
খেজির সুফি।৮

গ
গণি (পীর)
গরীব খাকি।
গরীব (শেখ)
গাজী মণেক।

চাস্‌নি পীর।৯
চান্দ শাহ।১০
চেট বা চট শাহ।১১

জ
জওহর (সাহিদ)
জকরিয়া হাফেজ।
জকরিয়া আরবি।
জকাই (শেখ)১২
জয়ন উদ্দীন।
জয়ন উদ্দীন আব্বাসি।
জলালউদ্দীন (কাজি)১৩
জলিল (সৈয়দ)
জামালউদ্দীন।১৪
জামাল (শেখ)
জাহাগির (সহিদ)
জিয়াউদ্দীনমোহাম্মদ (শেখ)
জিয়াউদ্দিন (শেখ)১৪-খ
জিয়াউল্লা।
জিন্দাপীর।১৫
জিয়াউদ্দীন।
জিয়াউদ্দীন (দ্বিতীয়)১৬
জোনেদ গুজরাতি।

ঝ
ঝকমক (খাণ্ডা)

ত
তাজউদ্দীন শাহ (সহিদ)১৭
তাজউদ্দীন (দ্বিতীয়)
তাজ মলেক।
তাহের (শেখ)
তৈয়ফ সালামি। ১৭-খ

দ
দাওর বখষ খতিব।
দাউদ কুরেষি।১৮
দাদা পীর।১৯
দুদ মলেক।
দেলাওর খতিব।
দৌলত গণি।
দৌলত গাজী।
দৌলত নীরি।
দৌলত (সৈয়দ)
দৌলত (সহিদ)

ন
নসর উল্লা
নসিরউদ্দীন সিপা-ই-সালার (সৈয়দ)
নার নওলী।
নুরুল হুদা (দ্বিতীয়)
নেজাম উদ্দীন বোগদাদি।
নেজাম উদ্দিন ক্রোমানি।
নেয়ামতউল্লা (শেখ)
নুসরত (শেখ)
নুরুল হুদা।
নূর আলী
নূর উল্লা।
নূর মালেক।

প
পরবত জাঁহা সাহেব।
পীর আমীন সাহেব।
পীর ছোট। (অনুসঙ্গী)
পীর দরিয়া।২০
পীর মানেক।২১
পীর পঞ্চাতন।২১-খ।

ফ
ফকর উদ্দীন (সৈয়দ)
ফজুলা (কাজি)
ফরিদ সাহেব (সৈয়দ)
ফরিদ আনসরী (শেখ)
ফতে গাজী সাহেব।২২
ফয়াজ উদ্দীন (শেখ)
ফরিদ রওসন বেরাগ।
ফিরোজ আতায়ী।
ফিরোজ (কাজি)
ফৈকর উদ্দীন (কাজি)

ব

ব-আবু দৌলত ।২৩
বদর (সহিদ)
বদর উদ্দীন (সৈয়দ)
বদর মালেক ।
বাগদার আলী শাহ ।২৪
বাজ (শেখ)
বাজিদ (সৈয়দ)
বাহা উদ্দীন (শেখ)
বাহার আস্‌করী ।
বুরহান উদ্দীন কেতান (খাজা)

র

রুকণ উদ্দীন আনসারী ।৩০
রুকণ উদ্দীন (সৈয়দ)
বুরহান উদ্দীন বুরহানা ।
বোজ বর্‌গ (সৈয়দ)

ম

মকদ্দুম সাহেব ।২৫
মকদ্দুম (সঙ্গী দুইজন)২৫
মকদ্দুম জাফর গজ্‌নবি ।
মকদ্দুম নেজাম উদ্দীন উস্‌মানি ।
মকদ্দুম রহিম উদ্দীন ।২৬
মকদ্দুম হবিব ।
মদসুদ্দীন ।২৭
মনয়িম (সৈয়দ)
মসুদ মালেক ।
মহবত (সৈয়দ)২৮
মহি উদ্দীন ।
মহেব আলী ।
মারুফ হেলাদার ।
মালেক মোহাম্মদ ।
মুসা (শেখ)
মু-আব্দুল আলী (সহিদ)
মোওদ্দুর
মোক্তার (সহিদ)২৯
মোজাফর বেহারী ।
মোস্তাফা (সহিদ)
মোহাম্মদ আনসরী (শেখ)
মোহাম্মদ আয়ুব এমাম ।
মোহাম্মদ আমীন ।
মোহাম্মদ আশেখ ।
মোহাম্মদ ইয়াসিন ।
মোহাম্মদ কেরাবি (শেখ)
মোহাম্মদ গজ্‌নবি (সৈয়দ)
মোহাম্মদ ছালেহ
মোহাম্মদ ছেলাহ্‌দার
মোহাম্মদ ছেলাহ্‌দার ।২
মোহাম্মদ জানেদী ।
মোহাম্মদ জাঁহা ।
মোহাম্মদ তকি ।
মোহাম্মদ দানা (শেখ)
মোহাম্মদ নূর ।
মোহাম্মদ রওশন (সৈয়দ)
মোহাম্মদ লতিফ ।
মোহাম্মদ বেহারী ।
মোহাম্মদ সাহাবানি ।
সুলতান শাহা (সহিদ)
মৌলানা কেয়াম উদ্দীন ।

শ

শাহ কামাল ।৩১
শাহ দেওয়ান (কাজি)
শাহ নূর ।৩২
শাহ পরাণ ।৩৩
শাহ ফরঙ্গ ।৩৪
শাহ মদন ।৩৫
শাহ মালুম ।৩৬
শাহ রফিউদ্দীন ।৩৭
শাহ শামসউদ্দিন ।৩৮
শাহ সজ্জর ।৩৯
শাহ সদর উদ্দীন ।৪০
শাহ সিকান্দর মোহাম্মদ ।৪১
শাহ সিকান্দর গাজী সুলতান ।৪২
শাহ সুনদার ।৪৩

শেখ কালু।

স

সদর (শেখ)
সয়েফ উদ্দীন (সৈয়দ)
সমস (শেখ)
সরফ উদ্দীন (শেখ)
সরিফ আজমিরী।
সাদ-হা (শেখ)
সাবু (শেখ)
সালিম (শেখ)
সালেহ মালেক।
সাহাবাজ আন্‌সরী।
সিকান্দর তবলবাজ।
সিকান্দর (শেখ)
সিকান্দর মোহাম্মদ।
সিরাজউদ্দীন (শেখ)
সোণাগাজী (শেখ)
সোহাবউদ্দীন।

হ

হজরত আবুফজল।
হজরত করমমোহাম্মদ (শেখ)
হজরত কালু শাহ।৪৪
হজরত গোলাম।৪৫
হজরত জলালউদ্দীন (সহিদ)
হজরত জাঁহা (সৈয়দ)৪৬
হজরত জেহান (কাজি)
হজরত দেওয়ান ফতেহ্ মাহমুদ।৪৭
হজরত লাল।৪৮
হজরত লাল (সৈয়দ)৪৯
হজরত মোহাম্মদ সহিয়াল।
হজরত উল্লা খতিব।
হবিব গাজী।
হাজি ইউসুফ।৫০
হাজি আহম্মদ
হাজি আহম্মদ (দ্বিতীয়)
হাজি উমর চিস্‌তি।
হাজি ওস্‌মান দাওরি।
হাজি কাশেম।
হাজি খলিল।৫১
হাজি খেজের।
হাজি গাজী।৫২
হাজি মোহাম্মদ।
হাজি মোহাম্মদ জাকরিয়া।
হাজি মোহাম্মদ আম্‌সেদ।
হাজি মোহাম্মদ দরইয়া।
হাজি মোহাম্মদ শরিফ।
হাজি লতিফ।
হাফেজ ফসি।
হাম্‌জা (সহিদ)৫৩
হাফেজ মোহাম্মদ।
হামিদ উদ্দীন নুরনারী।
হামিদ ফারুকি।৫৪
হায়দর গাজী।৫৫
হাসেম চিস্‌তি।
হেলিম উদ্দীন বেহারী।
হেলিম উদ্দীন বেহারী (শেখ)৫৬
হেসাম উদ্দীন বেহারী।
হজ্জত মালেক।
হুমান উদ্দীন।
হুসেন (সহিদ)
হুসেন (শেখ)
হুসেন (সহিদ) (দ্বিতীয়)৫৭
হুসেন সুফি।

(*) সহিদ ও সৈয়দ দুই বিভিন্ন শব্দ। সহিদ শব্দে বিধর্ম্মীর সহিত কোনরূপ সংঘর্ষে নিহত। হজরত মোহাম্মদের জামাতা আলীর সন্তানবর্গই সৈয়দ বলিয়া খ্যাত।

হজরত শাহজলালের অনুচরবর্গ প্রত্যেকেই সাধু ও দৈবশক্তি সম্পন্ন ছিলেন এবং সকলেই "হজরত" উপাধির অধিকারী। প্রায় ষষ্টি সংখ্যক অনুচরের নাম সংগ্রহ করিতে না পারাতে উপরোক্ত তালিকাতে সন্নিবেশিত করিতে পারা যায় নাই। হজরত শাহজলালের অনুজ্ঞায় ইঁহারা শ্রীহট্ট জিলায় নানা অংশে ও পার্শ্ববর্ত্তী জিলা সমূহে ধর্ম্মপ্রচার করেন, তন্মধ্যে কাহার কাহারও প্রচাব স্থানের পরিচয ও সমাধি স্থানের নাম লিখিত হইতেছে। যে যে আউলিয়ার নামের পার্শ্বে এক, দুই ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কেবল তাঁহাদের বিষয়েই এখানে লিখিত হইলঃ—

১. আলী এমনি (শেখ)—এমন দেশের রাজপুত্র, ইঁহার কবর শাহজলালের সমাধিপার্শ্বে অবস্থিত।

২. আবু তুরাব—ইঁহার কবর শ্রীহট্ট সহরের বন্দর বাজারের উত্তরাংশে অবস্থিত। তত্রত্য মসজিদ, কুপ ও পুষ্করিণী তাঁহারই নির্ম্মিত। ইহা অদ্যাপি ভগ্ন হয় নাই, কিন্তু পুষ্করিণীর অবস্থা ভাল নহে।

৩. আবু বক্কর (সৈয়দ)—ধর্ম্ম প্রচারার্থে তিনি পূর্ব্ব দিকে গিয়াছিলেন; করিমগঞ্জের অন্তর্গত ছোটলিখা পরগণায় তাঁহার কবর অবস্থিত।

৪. উমর সমরকান্দী (সহিদ)—শ্রীহট্ট সদরস্থিত বর্ত্তমান ধোপা দীঘীর পারের পূর্ব্বনাম "মহলে উমর সমরকান্দী।" এই স্থানে উক্ত মহাত্মা বাস করিতেন; তথায় তাঁহার কবর অবস্থিত। তিনি সমরকন্দের অধিবাসী ছিলেন।

৫. এতিম শাহ—সহরের বাদুরলট্কা নামক স্থানে ইঁহার কবর অবস্থিত।

৬. কামাল উদ্দীন—ইঁহার প্রচার ক্ষেত্র ও বাসস্থান চৌয়ালিশ পরগণান্তর্গত কামালপুর। তাঁহার কবব তথায় অবস্থিত। তত্রত্য চৌধুরী বংশীয়গণ তাঁহার বংশ বলিয়া প্রকাশ করেন।

৭. খেজর খাস্ত্দবির (শেখ)—তাঁহাদের বাস জন্য শ্রীহট্ট সহরের একাংশ "মহলে খাস্ত্দবি" নামে খ্যাত হয়; তথায় তাঁহার কবর অবস্থিত।

৮. খেজির সুফি—শ্রীহট্ট সহরান্তর্গত বারুতখানা মহল্লায় তাঁহার কবর অবস্থিত।

৯. চাস্নি পীর—সহরান্তর্গত "গোয়াইপাড়ায়" ইঁহার কবর অবস্থিত।

১০. চান্দ শাহ—ইঁহার বাসস্থান "চান্দভরাং" নামে খ্যাত। ইঁহার বংশে সুহেলউদ্দীন চৌধুরী খ্যাতনামা।

১১. চেট বা চটশাহ—অনিকেতন ও চিরকুমার ছিলেন। সুরমা নদীর তীরে তিনি বাস করিতেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেন্ট স্কুলের দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার সমাধি অবস্থিত।

১২. জকাই (শেখ)—সহরের কাজিটোলা মহল্লায় ইঁহার কবর অবস্থিত।

১৩. জলালউদ্দীন (কাজি)—শ্রীহট্ট সহরে ইহার বাসস্থানই কাজিটোলা মহল্লা নামে খ্যাত হয়, তথায় তাঁহার কবর অবস্থিত।

১৪. জামালউদ্দীন—জিলা নয়াখালির অন্তর্গত নন্দনপুরে ইঁহার সমাধি আছে।

১৪-খ. জিয়াউদ্দীন (শেখ)—ইনি দেওরালি পরগণায় [illegible]ন করেন; তত্রত্য চৌধুরীগণ ইঁহার বংশোদ্ভব বলিয়া প্রকাশ করেন। (ঐ বংশে বর্ত্তমানে মৌলবী মহিবুর রজা

চৌধুরী জীবিত আছেন।

১৫. জিন্দাপীর—শ্রীহট্টের জিন্দাবাজার ইঁহারই নামে স্থাপিত। উক্ত বাজারের উত্তরাংশে পথিপার্শ্বে তাঁহার কবর অবস্থিত। এ স্থলে পাঁচটি কবর একত্র থাকায় পাঁচ পীরের মোকাম বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

১৬. তাজউদ্দীন (সহিদ)—ইনি অরঙ্গপুর গমন করিয়াছিলেন। (তথাকার আব্দুল গফুর সাহেব তদ্বংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন।)

১৭. তৈয়ক সালামি—তৈয়ফ সালামি সাহেবের সমাধি পরগণা গোধরালির "সালাম" নামক স্থানে (প্রকাশিত চকের বাজার) অবস্থিত।

১৮. দাউদ কুরেষি—ইনি শাহজলালের এক বংশে (কুরেষি) জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি রেঙ্গা পরগণায় গমন করেন। তদীয় বসতি স্থান দাউদপুর নামে খ্যাত। তত্রত্য চৌধুরীগণ তদ্বংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন।

১৯. দাদা পীর—শ্রীহট্টের রায়নগরান্তর্গত মোক্তারখাকী মহল্লায় ইঁহার সমাধি অবস্থিত।

২০. পীর দরিয়া—ইঁহার কবর শাহজলালের উপাসনা গৃহের উত্তরস্থিত সর্ব্ব পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত। সম্ভবতঃ শাহজলাল বর্ত্তমান থাকিতেই ইনি পরলোকগত হন।

২১. পীর মালেক—ইনি এবং ইঁহার অনুসঙ্গী ছোট পীর যে টিলায় বাস করিতেন, তাহাকে মানেকপীরের টিলা বলে। ঐ স্থানে তাঁহার কবর অবস্থিত। শ্রীহট্ট মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক ঐ স্থানই সহরের মোসলমান অধিবাসীদের কবরের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

২১-খ. পীর পঞ্জাতন—নাম নহে, পাঁচজন পীর, পীর জিয়াউদ্দীন সহ একত্র বাস করিতেন বলিয়া এই নামে উক্ত হন। শ্রীহট্ট সহরে তাঁহাদের কবর স্থান "পাঁচ পীরের মোকাম" বলিয়া খ্যাত। (১৬ নং বিবরণ দেখ।)

২২. ফতে গাজী সাহেব—ইনি তরফ গমন করেন। তাঁহার বাসস্থান ফতেপুর নামে খ্যাত, তাঁহার কবর তথায় অবস্থিত। তাঁহার স্মরণার্থ প্রতিবৎসর ফতেপুরে এক মেলা হয়।

২৩. ব-আবুদৌলত—পরগণা ছনখাউড়স্থিত বিবিদৌলত মৌজায় তাঁহার বাস ছিল, তথায় তাঁহার কবর অবস্থিত।

২৪. বাগদার আলী শাহ—শ্রীহট্ট সহরে বারুতখানা মহল্লায় তাঁহার কবর অবস্থিত।

২৫. মকদ্দুম সাহেব ও তদীয় সঙ্গীদ্বয়—সঙ্গীদ্বয় সহ এই তিন পীরের কবর সহরের অন্তর্গত দফ্‌তরি পাড়ায় অবস্থিত। পরগণা কাণিহাটী মৌজে কাউকাপনের চৌধুরীগণ মকদ্দুম—বংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন। এই নামে আরও তিনজন পীর শাহজলালের অনুসঙ্গী ছিলেন।

২৬. মকদ্দুম রহিম উদ্দীন—জলালপুর পরগণায় ইঁহার কবর অবস্থিত।

২৭. মদ্‌সুদ্দীন—শ্রীহট্ট সহরের উপকণ্ঠে রেকাবি বাজারের পশ্চিমে ইঁহার কবর অবস্থিত। শ্রীহট্ট-নূর পুস্তকে ইঁহার নাম "মদুসুদন" বলিয়া লিখিত আছে।

২৮. মহবত (সৈয়দ)—ইঁহার কবর পরগণা মহুরাপুরে অবস্থিত। তত্রত্য শ্রীযুক্ত সিকান্দর মিয়া প্রভৃতি তদ্বংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন।

২৯. মোক্‌তার (সহিদ) —শ্রীহট্ট সহরের "মোক্‌তার সহিদ" মহল্লায় তাঁহার বাস ছিল,

তথায় তদীয় সমাধি বিদ্যমান আছে।

৩০. রুকণ উদ্দীন আন্‌সারী—সরাইল পরগণার (জিলা ত্রিপুরা) সাজাদপুরে ইঁহার কবর অবস্থিত।

৩১. শাহ কামাল—শাহারপাড়া নামক স্থানে ইঁহার কবর অবস্থিত। শ্রীহট্ট দরগামহল্লায় কেহ কেহ তদ্বংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন।

৩২. শাহনূর—শ্রীহট্ট বন্দরবাজারের দক্ষিণ-পূর্ব্বে তাঁহার কবর অবস্থিত। এই পীরের আজান ধ্বনিতে মিনারের টিলা ভূতলশায়ী হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

৩৩. শাহ পরাণ—ইনি অসাধারণ দৈবশক্তি সমন্বিত ছিলেন,। কথিত আছে যে, তিনি কয়েকটা জালালী কবুতর ভক্ষণ করিয়াছিলেন; এবং শাহজলাল কবুতরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বিনষ্ট কবুতরের "পর" বা পালক দ্বারা সমরূপ কবুতর সৃষ্টি করিয়া বিনষ্ট কবুতর সংখ্যা পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই "পর" শব্দ হইতেই তিনি "পরাণ" নামে খ্যাত হন। পরে তিনি দক্ষিণকাছ পরগণায় গমন করেন। তদীয় বসতি স্থানের নাম "শাহপরাণ" গ্রাম। তথায় তাঁহার কবর অবস্থিত। তত্রত্য চৌধুরীগণ এই পীরের মোকামের খাদিম বলিয়া খ্যাত।

৩৪. শাহ ফরঙ্গ—মৌলবী বাজারের অন্তর্গত "মনুমুখ" নামক স্থানে ইঁহার কবর অবস্থিত। মতান্তরে ইহার নাম দরঙ্গ। দরঙ্গের বংশে শ্রীযুক্ত আজাদ বখ্‌ত খ্যাতনামা ব্যক্তি।

৩৫. শাহ মদন—শ্রীহট্টের অন্তর্গত টিলাগড় নামক স্থানে ইঁহার কবর অবস্থিত।

৩৬. শাহ মালুম—মহুরাপুর পরগণার ইঁহার কবর অবস্থিত।

৩৭. শাহ রফিউদ্দীন—তদীয় বাস্থান "শাহরফিং" নামক স্থানে তাঁহার কবর অবস্থিত।

৩৮. শামস্‌উদ্দীন শাহ—সৈয়দপুর মৌজায় ইঁহার কবর অবস্থিত। তত্রত্য চৌধুরীগণ ইঁহার বংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন।

৩৯. শাহ সজ্জর—শ্রীহট্টের বারুতখানা মহল্লায় ইঁহার কবর অবস্থিত।

৪০. শাহ সদরউদ্দীন—বাদে সতরসতী পরগণার পর্ব্বতপুরে ইঁহার কবর অবস্থিত; তত্রত্য চৌধুরীগণ তাঁহার বংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন।

৪১. শাহ সিকান্দর মোহাম্মদ—ছনখাইড় পরগণার "শাহ সিকান্দর" মৌজায় তাঁহার বাসস্থান ছিল; তথায় তদীয় কবর অবস্থিত; তত্রত্য চৌধুরীগণ তদ্বংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন।

৪২. শাহ সিকান্দর গাজী সুলতান-ইনি সম্রাট ভাগিনেয় ছিলেন। ইঁহার হস্তেই শ্রীহট্ট শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছিল।

৪৩. শাহ সুনদার—দক্ষিণ কাছ পরগণায় ইঁহার কবর অবস্থিত।

৪৪. কালু শাহ পীর—"পীরেরগ্রাম" নামক স্থানে এই পীরের কবর অবস্থিত।

৪৫. হজরত গোলাম—ইঁহার কবরও জল্লারপারে অবস্থিত।

৪৬. দেওয়ান ফতেহ মাহমুদ—শাহজলাল শ্রীহট্ট আসিলে পর ইনি এস্থানে আসিয়া তদীয় শিষ্যভুক্ত হন। তাঁহার আগমন কালে তরফে বিগ্রহ চলিতেছিল এবং তিনি তথায় প্রেরিত হন; সুতরাং ইনি ৩৬০ আউলিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহেন। তরফে তাঁহার সমাধি

অবস্থিত।

৪৭. লাল সাহেব—ইঁহার কবর শ্রীহট্টস্থ "সওদাগর টোলা" নামক স্থানে অবস্থিত।

৪৮. সৈয়দ লাল—ইঁহার কবর শ্রীহট্টস্থ "কুয়ারপার" নামক স্থানে অবস্থিত।

৪৯. হাজি ইউসুফ—শাহজলালের দরগাতে প্রাচীরের বহির্ভাগে ইঁহার কবর দৃষ্ট হয়। দরগায় বর্ত্তমান "সরকুম" বংশীয়গণ তাঁহারই সন্ধান।

৫০. হাজি খলিল—শাহজলালের দরগায় তদীয় উপাসনা গৃহের উত্তরে যে তিনটি কবর দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে পশ্চিমের কবরটি হাজি খলিলের, পূর্ব্বেরটি হাজি ইউসুফের এবং মধ্যেরটি দরিয়া পীরের।

৫১. হাজি গাজী—শ্রীহট্টস্থ প্রসিদ্ধ ঈদগার ময়দানের পূর্ব্বে ইঁহার কবর অবস্থিত। মোসলমানদের মধ্যে এক প্রবাদ আছে যে, ঐ পীর এখনও হঠাৎ কাহাকে কাহাকেও দর্শন দিয়া থাকেন।

৫২. হাম্‌জা (সহিদ)—বনের বাঘও এই পীরের বশীভূত ছিল বলিয়া শুনা যায়। তিনি ব্যাঘ্যারোহণে শ্রীহট্ট আগমন করিয়াছিলেন। (শ্রীহট্টদর্পণ গ্রন্থ দেখ।)

৫৩. হামিদ ফারুকি—প্রথমে তিনি মহুরাপুর গমন করেন, তথা হইতে কাণিহাটী কাউকাপনে গিয়া বাস করেন; কাণিহাটীতে তদীয় বংশধরগণ বিদ্যমান আছেন।

৫৪. হায়দর গাজী—ইনি শ্রীহট্টের দ্বিতীয় শাসনকর্ত্তা, ইঁহার নানকার বলিয়াই শ্রীহট্ট সহর (অদ্যাপি) নিষ্কর মহালরূপে পরিগণিত রহিয়াছে।

৫৫. হেলিমউদ্দীন (শেখ)—ইঁহার সমাধি কাণিহাটী পরগণায় বিদ্যমান ছিল, তত্রত্য চৌধুরীগণ ইঁহার বংশজাত। (স্থানান্তরে এই বংশের বিবরণ কথিত হইবে)।

৫৬. হুসেন সহিদ—ইঁহার বাসস্থানও তদীয় নামানুসারে "হুসেন সহিদ" মহল্লা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মহল্লা শ্রীহট্ট সহরেই অবস্থিত, তথায় তাঁহার সমাধি আছে। শাহজলালের অনুসঙ্গী পীরগণের সমাধিস্থান নির্ণায়ক একটি প্রবন্ধ "শ্রীহট্ট-নূর" নামক পুস্তকে আছে, তাহা হইতে আমরা অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। 'শ্রীহট্টে শাহজলাল' পুস্তকের অতিরিক্ত পত্রের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছেঃ—"আনওয়ারুল আউলিয়া নামক উর্দ্দু ভাষায় লিখিত একখানি গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয় লিখা আছে। হজরত শাহজলালের সঙ্গীয় ৩৬০ জন অনুচর ইত্যাদির শ্রীহট্ট, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা প্রভৃতি জিলায় নানাস্থানে মাজার বা সমাধি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু শ্রীহট্ট জিলায়ই বেশীর ভাগ, এই জিলা আউলিয়াদের মাজারে প্রায় পরিপূর্ণ বলা যাইতে পারে।" এই "শ্রীহট্টে শাহজলাল" পুস্তকের অতিরিক্ত পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রচয়িতা ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের পীরগণের নামাবলী দিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ৫৫ জন; এবং তরফের নানাস্থানের ১৫ জন পীরের নামও ঐ পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। তরফের এই পীরদের মধ্যে অনেকেরই নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে। ফলতঃ ভিন্ন জিলাগামী ও তরফগামী পীরদের মধ্যে শাহজলালের অনুসঙ্গী ৬১ সংখ্যক পীর ছিলেন,—যাঁহাদের নাম আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই ৬১ সংখ্যক পীরের সহিত আমাদের পরিজ্ঞাত নাম পূর্ব্বোক্ত পীরদের সংখ্যা যোগ করিলেই ৩৬০ সংখ্যা পূর্ণ হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
নবাবি আমল

শ্রীহট্টের শাসনকর্তৃগণ সাধারণতঃ নবাব বলিয়া পরিকথিত হইতেন, তাঁহাদের শাসন সময়ের যে কয়েকটা ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাই এ অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়।

নবাব ইস্‌পেন্দিয়ার

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, সিকান্দর গাজীর মৃত্যুর পর শাহজলালের অপর অনুচর হায়দর গাজী শ্রীহট্টের শাসনভার প্রাপ্ত হন। হায়দর গাজীর শাসনাবসানে কাহার দ্বারা শ্রীহট্ট শাসিত হয়, জানা যায় না। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব বলেন যে, শাহজলালের পর শ্রীহট্ট বঙ্গসাম্রাজ্য সংভুক্ত হইয়া নবাব পদাভিষিক্ত শাসনকর্ত্তাদের শাসনাধীন হয়।[১]

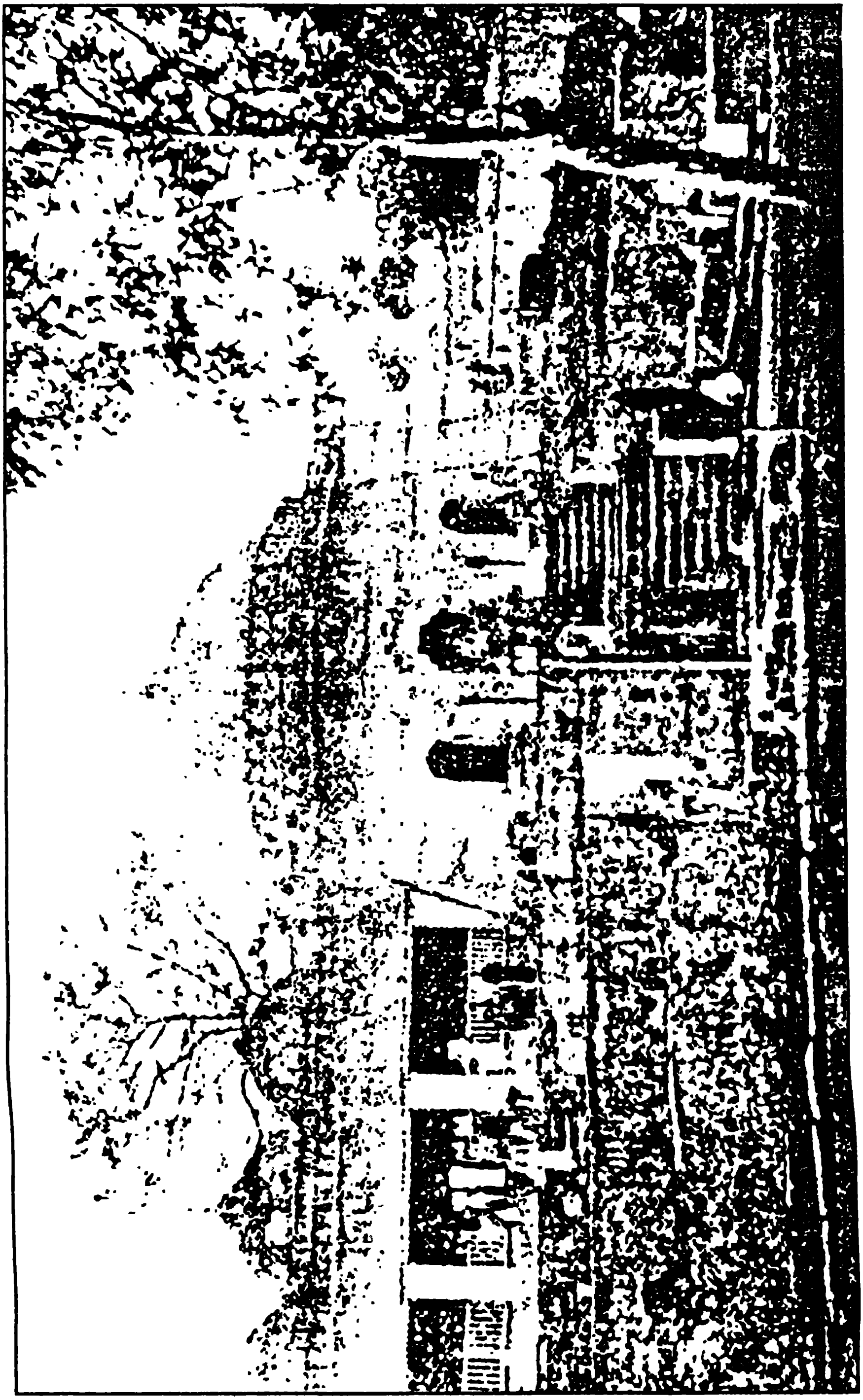
যে সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে, এ সময় তোগল বংশীয় সম্রাটগণ দিল্লী সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। সিকান্দর ও হায়দর গাজী, শাহজলাল জীবিত থাকা কালেই গৌড় (শ্রীহট্ট) শাসন করেন। কাহার কাহারও মতে তদনন্তর ইসপেন্দিয়ার শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইস্‌পেন্দিয়ার সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। ইস্‌পেন্দিয়ার বঙ্গাধিপতি সিকান্দর শাহের সময়ে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া, তত্রস্থ পীরমহল্লাস্থিত আদিনা মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। হায়দর গাজীর মৃত্যুর পরে তাঁহার জীবিত থাকা অসম্ভব নহে, এবং সেই সময়েই তিনি শ্রীহট্টের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকিবেন।

হজরত শাহজলালের দরগা অল্পকাল মধ্যেই মোসলমানগণের প্রধান তীর্থরূপে পরিণত হয়, তখন ইস্‌পেন্দিয়ার আদিনা মসজিদের মাল মসল্লা আনিয়া দরগা সম্মুখবর্ত্তী (অপূর্ণ) মসজিদটি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। হজরত শাহজলাল ৩০ বর্ষকাল শ্রীহট্ট ছিলেন, তদীয় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হায়দর গাজীর শাসনকাল অনুমান করিলে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি শ্রীহট্টে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। তৎপর শ্রীহট্টের শাসন কার্য কিভাবে চলিয়াছিল, জ্ঞাত হওয়া যায় না।

খৃঃ ১৩৮৫-১৪৯৫ পর্য্যন্ত গৌড় রাজ্য

যখন শ্রীহট্ট শাহজলাল কর্তৃক বিজিত হয়, প্রায় সেই সময়ই দিনাজপুরের রাজা গণেশ (মতান্তরে কংস), গৌড়াধিপতি শামস্‌ উদ্দীনকে নিহত করিয়া (১৩৮৫ খৃষ্টাব্দ) গৌড়ের রাজা হন। রাজা গণেশের পর তাঁহার পুত্র ও পৌত্র মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও হিন্দুদের অনুকূলই ছিলেন, তাঁহাদের সময় (খৃঃ ১৪২৬) পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে মোসলমান প্রভাব প্রবল হইতে পারে নাই। গণেশের পৌত্র আহমদ শাহের সহিত এই স্বপ্লোত্থিত হিন্দু রাজবংশের বিলোপ

১. After the death of Shah Jalal, the district was included in the kingdom of Bengal and put in charge of a Nabab.
-Principal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division, P. 291



শাহজালালের দরগা

ঘটে।[২] আহমদ শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার একটি ভৃত্য সিংহাসনাধিকার করে, কিন্তু অচিরেই ইলিয়াস বংশীয় জনৈক যুবকের হস্তে নিহত হয়। গণেশ-পৌত্র আহমদ শাহের পর ইলিয়াস বংশীয় নাদীর শাহ, তৎপর বরবক শাহ, তাহার পর ইউসুফ শাহ রাজত্ব করেন। এই ইউসুফের নামাঙ্কিত একটি প্রস্তরলিপি শাহজলালের দরগার দ্বারদেশে গ্রথিত থাকায় ইঁহাব নামের সহিত শ্রীহট্টের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, তৎপর হাবসী বংশীয় পাঁচ জন নৃপতির ক্ষীণহস্তে বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালিত হয়; ইঁহারা শ্রীহট্টেব প্রতি মনোনিবেশ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই। ইঁহাদের শেষ রাজা মুজঃফর শাহ। তাঁহাব সময় পর্য্যন্ত (১৪৯৫ খৃঃ) শাহজলালের দরগার প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষগণ কতিপয় সৈন্য রাখিয়া শ্রীহট্ট শাসন করিতেন বলিয়াই অনুমিত হয়। তাঁহাদের ক্ষমতা শ্রীহট্ট সহরের বাহিরে অল্পদূরেই বিস্তারিত ছিল, এবং সেই সুযোগে পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণ মস্তকোত্তলনপূর্ব্বক স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

এই সময়ের মধ্যে দিল্লীর রাজসিংহাসন তোগলক বংশীয়দের হস্ত হইতে লোদী বংশীয়ের অধিকারে আসে। বেহলুল লোদী পঞ্জাব জয়ান্তে ছাব্বিশ বৎসর কাল যুদ্ধের পর জোয়ানপুর অধিকার করেন (১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ; জোয়ানপুরের অধিপতি হুসেনশাহ সুরকি (মতান্তরে হুসাঙ্গ) তখন পলায়নপূর্ব্বক বঙ্গদেশে আগমন করেন।

সৈয়দ হুসেন শাহ ও হুসেন শাহ সুরকির সময়ে শ্রীহট্ট

যখন বঙ্গদেশে এবিসিনিয়ান ও খোঁজা দাস গণের হস্ত হইতে হস্তান্তরে যাইতেছিল, তখন সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি হজরত মোহাম্মদের বংশীয় ছিলেন। তাঁহার পিতা মক্কার শেরিফ ছিলেন বলিয়া তিনিও উক্ত উপাধি ধারণ করিতেন। সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ পূর্ব্বোক্ত মুজঃফর শাহকে পরাভূত করতঃ গৌড় সিংহাসন করায়ত্ত করেন। তিনি অসাধারণ বীর, কর্ম্মকুশল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। পূর্ব্বাঞ্চলে তিনি ত্রিপুরাধিপতি ধন্য মাণিক্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িষ্যা বিজয়েই তাঁহার সমধিক যত্ন ছিল; তিনি কামরূপ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। এমন কি, দিল্লীশ্বর অনুকূল সর্ত্তে তৎসহ সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন।

জোয়ান পুরের হুসেন শাহ (হুসাঙ্গ) দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, অবশেষে পরাস্ত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন পূর্ব্বক সৈয়দ হুসেন শাহের আশ্রয় প্রার্থী হইলে পরম আদরে গৃহীত হইলেন। তাঁহাকে রাজোচিত বৃত্তি দেওয়া হইল ও তদীয় অনুসঙ্গী কর্ম্মচারি ও ভৃত্যবর্গকেও যথাযোগ্য কার্য্যে নিয়োজিত করা হইল। হুসেন শাহ সুরকি আমরণ তাঁহার আশ্রয়ে ছিলেন।

সৈয়দ হুসেন শাহের সময়ে (অধুনালুপ্ত মুয়াজ্জমাবাদের সহিত) শ্রীহট্টেও তাঁহার শাসনাধীন হয়। তাঁহার সময়েই শ্রীহট্ট ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে গৌড় হইতে নিয়োজিত কানুনগোগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। তৎপূর্ব্বে শ্রীহট্টে বিদেশাগত কোনও শাসনকর্ত্তার সমাচার পাওয়া যায় না; শাহজলালের অনুচর বংশীয়গণ দ্বারাই শাসিত হইত বলিয়া কিংবদন্তী আছে; তাঁহারাই নবাব নামে কথিত হইতেন।

সৈয়দ হুসেন শাহের রাজত্বকাল চব্বিশ বৎসর (খৃঃ ১৪৯৬-১৫২০)। হুসেন শাহের সময়ে মন্ত্রী রুকণ খাঁ শ্রীহট্টের শাসন জন্য প্রেরিত হন। রুকণ খাঁর মৃত্যুর পর গহর খাঁ আসোয়ারি তাঁহার

২. 'Ahmed died in 1426 leaving no son, with him this Hindus dynasty came to an end."
Marshman's out line of the History of Bengal. Sect. III. P 17.

পদে নিযুক্ত হন। ইঁহারও কানুনগো উপাধি ছিল; সর্ব্বোচ্চ শাসনভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীই তৎকালে কানুনগো উপাধির অধিকারী ছিলেন। গহর খাঁর নামেই শ্রীহট্টের গহরপুর পরগণার নামকরণ হয়। ইঁহার প্রধান কর্ম্মচারীর নাম সুবিদ রাম ও রামদাস ছিল। গহর খাঁর পর মোহাম্মদ খাঁ শ্রহিট্টের কানুনগো বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।[৩] পরগণা মোহাম্মাদাবাদ, ইঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে।

প্রাচীন বরশালা গ্রাম ও সর্ব্বানন্দ (সরওয়ার খাঁ)

আধুনিক শ্রীহট্ট সহরের তিন চারি মাইল উত্তরে শ্রীহট্ট গৌড়ের প্রাচীন রাজধানী “গড়দুয়ার” অবস্থিত। ইহার সন্নিকটেই প্রাচীন বরশালা বস্তি। বরশালাতে রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের বাসভবন থাকায় ইহা এক সৌষ্টবশালী গ্রামে পরিণত হয়। শাহজলালের আগমনে গড়দুয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বরশালারও অধঃপতন ঘটে। ঐ সময় সহর আরও দক্ষিণে সরিয়া আসে। মোসলমান শাসনকর্ত্তাদের সময়ে, পশ্চিমে আখালিয়া ও শেখঘাট হইতে পূর্ব্বে রায়নগরের উচ্চতর স্থান সমূহ লইয়া শ্রীহট্ট সহর ছিল।[৪] বরশালা প্রভৃতি স্থান হইতে ভদ্রলোক সমূহ উঠিয়া যাওয়ায় উহা ক্রমশঃ জঙ্গলপূর্ণ হইতে থাকে।

জোয়ানপুরে যখন হুসেনশাহ সুরকি রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন শ্রীহট্টস্থ বরশালাবাসী সর্ব্বানন্দ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, জোয়ানপুরস্থ রাজকুমারগণের শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, একদা তিনি মোসলমানের আহারীয় দ্রব্যের আঘ্রাণ পাওয়ায় আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করেন; ইহাই তাঁহার জাতিনাশের কারণ হয়। তিনি অতি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন; অচিরেই তিনি হুসেনশাহ বা হুসাঙ্গের সহকারী মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। এই সর্ব্বানন্দ শ্রীহট্টের দস্তিদার পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন।[৫]

এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে সর্ব্বানন্দ সরওয়ার খাঁ নাম প্রাপ্ত হন। প্রভুর রাজ্যচ্যুতিতে সরওয়ার খাঁ তাঁহার সহিত গৌড়াধিপতির আশ্রয়ে আসিলে, তাঁহারই নিয়োগানুসারে তিনি শ্রীহট্টে প্রেরিত হন। কথিত আছে যে, তিনি তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং লজ্জাবশতঃ নিজ পত্নির সহিত দেখা না করিয়া, গড়দুয়ারে (বর্ত্তমান মজুমদারিতে) পৃথক এক বাটী প্রস্তুত ক্রমে তথায় বাস করেন। তাঁহার স্ত্রী অতি ধর্ম্মিষ্ঠা ছিলেন, তিনি স্বামীর অভিপ্রায় ও আদেশে ব্রক্ষ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক পবিত্রভাবে কালাতিবাহিত করেন।

পূর্ব্বোক্ত মোহাম্মদ খাঁ শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তারূপে আগমন করিতে আদিষ্ট হইরে, শ্রীহট্টের অবস্থা পরিজ্ঞাত বলিয়া সরওয়ার খাঁকেও তৎসহ শ্রীহট্টে প্রেরণ করা হয়। ঐ সময় শ্রীহট্টের কোন কোন ভূমধ্যধিকারী বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব কানুনগো গহর খাঁর কর্ম্মচারী সুবিদ রাম ও রামদাস বহু অর্থ আত্মসাৎ ক্রমে প্রতাপগড়ের অধিকারী বাজিদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইটার জমিদার শ্রী শিকদার, কাণিহাটীর জমিদার ইসলাম রায় প্রভৃতি একযোগে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন; ইঁহাদের সহিত জঙ্গলবাড়ীর জমিদার প্রভৃতি যোগ দেওয়ায় বিষয়টি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সরওয়ার খাঁ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য বিশেষ ভাবে আদিষ্ট হন। সরওয়ার খাঁ শ্রীহট্টে আগমন পূর্ব্বক কিছুকাল মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি দক্ষতার সহিত আদেশ পালন করতঃ হুসেন শাহের সমীপে সমুপস্থিত হইলে, হুসেন শাহ তৎপ্রতি অতি তুষ্ট হইলেন। ঐ সময় মোহাম্মদ খাঁর মৃত্যু হওয়ায় শ্রীহট্টে শাসনকর্ত্তা

---

৩. Mazumder Family-P. 2

৪. The Lives of the Lindsays. Vol. III. P. 167.

৫. Mazumder Family-P. 13. and শ্রীহট্ট-দর্পণ–৭১ পৃষ্ঠা।

নিয়োগ আবশ্যক হয়। হুসেন শাহ সরওয়ারের কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তদীয় পুত্র মীর খাঁকে শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা (কানুনগো) নিযুক্ত করেন। মীর খাঁও অতি দক্ষতার সহিত শ্রীহট্ট শাসন করেন। তিনি স্বীয় কৃতকার্য্যতার জন্য "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হন। মজুমদার পারস্য শব্দ, ইহার অর্থ "সর্ব্বাধিকারী"। শাসন বিষয়ে তিনিই সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। মীর খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ইউসুফ খাঁ ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের কানুনগো নিযুক্ত হন। হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিচার ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীগণ "দেওয়ান" নামে অভিহিত হইতেন; শ্রীহট্টে তৎকালে আনন্দ নারায়ণ গুপ্ত নামীয় এক ব্যক্তি দেওয়ান ছিলেন।

শের শাহের সময়ে শ্রীহট্ট

খৃষ্টীয় ১৫৩৮ অব্দে হুসেনী সৈয়দ বংশ বিলুপ্ত হয়। তৎকালে ফরিদ নামে জনৈক আফগান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইহার পিতামহ বেকার অবস্থায় দিল্লীতে আগমন করেন এবং পিতা বহু চেষ্টায় বেহার প্রদেশে শশিরামের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ফরিদ বাহুযুদ্ধে এক শের (সিংহ) নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া বেহারপতি মাহমুদ কর্ত্তৃক শের শাহ নামে আখ্যাত হন। এই সময় লোদীবংশীয় সম্রাটগণের পতন ও মোগলদের আগমন উপলক্ষে শের শাহ সহজেই নিজ পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে সমর্থ হন। তিনি বেহার প্রদেশে যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। হুমায়ুন এই অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক আগমন করেন; কান্যকুব্জের নিকট শের শাহের সৈন্যসহ তাঁহার যুদ্ধ হয়; সেই যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন এবং শের শাহ ভারতবর্ষের সম্রাট হন।

শের শাহের রাজত্ব সময় (খৃঃ ১৫৪০-১৫৪৫) বঙ্গদেশ প্রকৃতরূপে শাসিত হয়; দূরবর্ত্তী প্রদেশেও বিদ্রোহ বহ্নি প্রধূমিত হইতে পারে নাই। তাঁহার ও হুমায়ুনের বিগ্রহকালে দেশের স্থানে স্থানে জমিদারবর্গ স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের অনেকটি জমিদার ঐ সময়ে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে খোয়াজ ওসমান খাঁ, খোয়াজ আলী, ফিতে খাঁ এবং ময়মনসিংহের রিয়াসত আলী খাঁ, মসনদ আলী ও পূর্ব্ববঙ্গের জমিদার সোণাগাজী, কেদার রায় প্রভৃতি প্রধান।

বিদ্রোহ দমন

খোয়াজ ওসমান আফগান জাতীয় ছিলেন, তিনি রাজ্য পরিদর্শক ছিলেন এবং কোন কারণে শ্রীহট্টস্থ ইটা পরগণায় গৃহ, গড় ও দীর্ঘিকাদি প্রস্তুত ক্রমে বাস করিতেছিলেন।[৬] তৎপূর্ব্বে তিনি দেওয়ান আনন্দনারায়ণের সহায়তায় ইটার রাজা সুবিদনারায়ণকে পরাভূত

৬. খোয়াজ ওসমান খাঁর একটি দীঘী শ্রীসূর্য্য মৌজায় অদ্য পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে; খোয়াজের গড়ের চিহ্নও দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার কৃত "ময়মনসিংহের ইতিহাস" ৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, –"হুসেনশাহ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বদিক জয় করিয়া ত্রিপুরা পর্য্যন্ত অধিকার করেন ও খোয়াজ খাঁকে শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ প্রদান করেন, খোয়াজ খাঁ পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত মুয়াজ্জামাবাদে থাকিয়া এই যুক্ত প্রদেশে শাসন করেন।" খোয়াজ তথায় এক মসজিদ প্রস্তুত করেন, তাহার প্রস্তরলিপিতে যে তারিখ পাওয়া যায়, তাহাতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ হয়। মুয়াজ্জমাবাদের নাম অধুনা বিলুপ্ত। ঐ খোয়াজ ও শ্রীহট্টের খোয়াজ অভিন্ন বলিয়া অনুমিত। তদনুসারে বলা যাইতে পারে যে, তিনি রাজ্য পরিদর্শকরূপে এদেশে আগমন করেন ও ইটার রাজা তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হন; তৎপর (শের শাহের সময়) শাসন কর্ত্তৃত্ব হইতে অপসৃত হইয়া বিদ্রোহীভাবে ইটারদুর্গে অবস্থিতি করেন।

(পরবর্ত্তী ৮ম অধ্যায় দেখ)

করিয়া গর্ব্বিত হইয়া উঠেন ও পরে এই বিদ্রোহী দলের নায়কস্বরূপ একদল আফগান অশ্বারোহীসহ তরফ ও ইটা অধিকার করেন।[৭] পরে শ্রীহট্টের (গৌড়-রাজধানীর) শাসনকর্ত্তা ইউসুফ খাঁকে পরাভূত করিয়া দৃঢ়ভাবে তথায় অবস্থিতি করেন। সৈয়দ হুসেন শাহের সমকালীন কানুনগো গহর খাঁ আসোয়ারির কর্ম্মচারী সুবিদ রামের ভ্রাতুষ্পুত্র যদু রাম তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন।

কানুনগো লোদী খাঁ

শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা ইউসুফ খাঁ বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে, তদীয় ভ্রাতা লোদী খাঁ সম্রাট সদনে উপস্থিত হন ও শ্রীহট্টের রাজনৈতিক অবস্থা বিশদভাবে বর্ণনা করেন। শের শাহ, লোদী খাঁ বর্ণিত বিদ্রোহবার্ত্তা শ্রবণে, বিদ্রোহীদিগকে দমনের জন্য লোদী খাঁকেই নিয়োজিত করেন। তাঁহার সহায়তার জন্য বাঙ্গালার নাজিম ইসলাম খাঁ সসৈন্যে শ্রীহট্টে উপস্থিত হইয়া কয়েকটি যুদ্ধের পর "রাজবিদ্রোহী খাজা বা খোয়াজ ওসমান প্রভৃতিকে দমন করতঃ পরে রাজসদনে গমন করিলেন খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন।"[৮]

সম্রাটই লোদীকে "খাঁ" উপাধির সহতি শ্রীহট্টের কানুনগো পদের সনন্দ প্রদান করেন। পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট হতে তিনি অনেক নানকার ও মদতমাস ভূমি প্রাপ্ত হন। কেবল তাহাই নহে, সম্রাট তাঁহার প্রতি এত তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, শ্রীহট্টের আদায়ী রাজস্বের টাকা প্রতি পাঁচ পাই লোদী খাঁর প্রাপ্য নির্দ্ধারিত হয়।[৯]

লোদী খাঁ পূর্ণ ক্ষমতার সহিত শ্রীহট্ট শাসন করেন; তাঁহার পরে তদীয় পুত্র জাহান খাঁ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন; কিন্তু তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকায়, পূর্ব্বোক্ত বাজিদের তহশীলদার রাজেন্দ্র ও বসুদাস, রুদ্রদাস এবং তরফের দস্তিদার সুবিদরাম তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জাহান খাঁ নিজ নামে "জাহানপুর" গ্রাম স্থাপন করেন।

আকবর শাহের সময়ে শ্রীহট্ট

এই সময় মধ্যে দিল্লীতে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এই সময় মধ্যে শের শাহের মৃত্যু ঘটে, তাঁহার পুত্র সালিম শাহ তখন সম্রাট হন; তৎপর আদিল শাহ সিংহাসন লাভ করেন। ইহার পর হুমায়ুন পুনশ্চ সিংহাসনারূঢ় হন কিন্তু সত্বরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তৎপর মোগল-কুল-তিলক আকবর শাহ সম্রাট হন। আকবরের গৌরবময় রাজত্বে (খৃঃ ১৫৫৬-১৬০৫) কানুনগোদিগের ক্ষমতা নিতান্ত হ্রাস করা হয়। আইন-ই-আকবরিতে লিখিত আছে যে, যখন মজঃফর খাঁ ও রাজা তোডরমল্ল আকবরের রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন, সেই সময় কানুনগোদের জিলা শাসনের ক্ষমতা রহিত করা হয় এবং তাঁহাদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।[১০]

---

৭. মৌলবী মোহাম্মদ আহমদ কৃত "শ্রীহট্ট-দর্পণ" এবং "Mazumder Family" গ্রন্থে এই বিদ্রোহবার্ত্তা বিবৃত আছে; কিন্তু তারিখ গুলি নির্ভরযোগ্য নহে।

৮. মৌলবী মোহাম্মদ আহমদ কৃত "শ্রীহট্ট-দর্পণ"।

৯. "Lodi Khan was allowed by the Emperor Shere Shahg to receive tribute at the rate of 5 pies in rupee."-The Mazumder Family-P. 3.

১০. When, however, this high post was offered to Mozaffur Khan, and Raja Todurmal in the 15th year of the Emperor's reign the Canongoes were not allowed to govern the country and a fixed revenue was substituted for the arbitrary assessment hitherto maintained by them-Ayn-i-Akbari. Vol II. P I.

ইহার পর যদিও কানুনগো পদ ছিল, কিন্তু তাঁহাদের উপর দেশের সম্পূর্ণ শাসনভার ছিল না। দীর্ঘজীবী জাহান খাঁ সুদীর্ঘ কাল কানুনগো পদে অধিরূঢ় ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর কেশওয়ার খাঁ কানুনগো পদের সনন্দ লাভ করেন, তাঁহার উপর শাসন ক্ষমতা ছিল না। কানুনগোদের বিবরণ পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

সম্রাট আকবরের সময়ে সুবা বাঙ্গালার ১৯টি "সরকার" মধ্যে শ্রীহট্ট একতম সরকার (জিলা) রূপে গণ্য হয়। তোডরমল্ল শ্রীহট্টকে আটটি "মহলে" বিভক্ত ক্রমে প্রতি মহলের রাজস্ব নির্দ্ধারিত করেন। তদনুসারে শ্রীহট্টের রাজস্ব ১৬৭০৪০ টাকা নিরূপিত হয়। আটটি মহলের নাম ও রাজস্বাদির বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের প্রথমভাগ দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে সুবার জমা প্রকরণে লিখিত আছে যে, শ্রীহট্টে অনেক খোজা ও ক্রীতদাস পাওয়া যায়। আইন-ই-আকবরিতে শ্রীহট্টের কাষ্ঠ, কমলালেবু; শেরগঞ্জ ও বিহঙ্গরাজ পক্ষীর বিবরণও লিখিত হইয়াছে।[১১]

সম্রাট আকবরের সময় হইতে শ্রীহট্ট শাসনের ভার আমিল উপাধিধারী কর্ম্মচারীগণের উপর ন্যস্ত হয়। ইঁহারাই পরে ফৌজদার বলিয়া অভিহিত হইতেন। সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগকে নবাব বলিয়া জানিত. নবাব নামেই তাঁহারা সর্ব্বত্র কথিত হইতেন; এই জন্য তাঁহাদের প্রদত্ত সনদ ইত্যাদিতেও তাঁহাদের নবাব খ্যাতি লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টে আমিল পদে যাঁহারা নিযুক্ত হইতেন, সীমান্ত প্রদেশ বলিয়া তাঁহাদের রাজনীতিজ্ঞতা, শৌর্য্য, ও আভিজাত্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা যাইত। ইঁহারা ঢাকার নবাবের অধীনরূপে গণ্য হইতেন।[১২] ঢাকাতেই তাঁহাদিগকে আদায়ী রাজস্ব প্রেরণ করিতে হইত, কিন্তু শাসনবিষয়ে পরে তাঁহাদিগকে মুর্শিদাবাদের অধীনে কার্য্য করিতে হইত। ইঁহাদের সহকারীও থাকিত, তাঁহারা নায়েব ফৌজদার নামে কথিত হইতেন।

শ্রীহট্টের আমিল সংখ্যা

ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে, শ্রীহট্টের আমিলগণের শিলমোহর হইতে প্রায় চল্লিশ জন আমিলের নাম সংগ্রহ করা যাইতে পারে।[১৩] আমিলদের বিষয় পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে, অধিকাংশ আমিলের শাসনকাল অতি অল্প ছিল; এই জন্য এই সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান কাল পর্য্যন্ত কয়েকটি সম্রাটের সময় মধ্যেই বহু সংখ্যক আমিল শ্রীহট্টে প্রেরিত হন। অনেক জনের নাম তাঁহাদের প্রদত্ত সনদ ইত্যাদি হইতে সংগ্রহ করা যায়। আমরা শ্রীহট্ট কালেক্টরীর মহাফেজখানা অনুসন্ধানে ষষ্টি সংখ্যক আমিলের নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সম্ভবতঃ আরও ১০/১৫ জন আমিলের নাম অনুসন্ধানে বাহির হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁহাদের সময় নির্দ্ধারণ করার পক্ষে কোনরূপ সুবিধা পাওয়া যায় না। আমরা ৪৩ জন আমিলের কাল, তাঁহাদের প্রদত্ত সনদের তারিখ হইতে একরূপ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, বাকী ১৭ জনের সময় বিশুদ্ধরূপে নিরূপিত হয় নাই।

---

১১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ১ম ভাগ ৩য় অধ্যায় "ফলমূল" ও "বৃক্ষাদি" এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায় "পক্ষী" বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১২. In the reign of Akber, it (Sylhet) passed with the rest of Bengal into the hands of the Mughul Emperors, and from that time, was ruled by an amil (localy known as Nowab), subordinate to the Nowabs of Dacca.
-Hunter's Statistical Accounts of Assam Vol. II. (Sylhet) P. 92

13. The names of about forty amils can still be gathered from there.
-Hunter's Statistical Accounts of Assam Vol. II. (Sylhet) P. 92.

আরও দুঃখের বিষয়, যিনি আমিল পদের স্রষ্টা, সেই মোগল-কুল-রবি আকবরের সময়ে যিনি শ্রীহট্টের আমিল পদে প্রথম নিয়োজিত হন, তাঁহার নাম জানা যায় না। তিনি একজন উচ্চপদস্থ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়।

নরনারায়ণের শ্রীহট্ট বিজয়

কামরূপের কোচবংশীয় নৃপতি নারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৩৫ হইতে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তিনি অতি ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ (চিলারায়) তদীয় সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। চিলারায়ের বাহুবলে নরনারায়ণের রাজ্যসীমা অনেক বর্দ্ধিত হয়; তিনি কাছাড়, মণিপুর জয়ান্তে জয়ন্তীয়াপতিকে পরাস্ত করেন, তৎপরে শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তাকে পরাজয় করিতে সৈন্য চালনা করা হয়। প্রথমতঃ তিনি এক দূত পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, শ্রীহট্টপতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে কি না। কামরূপ সেনাপতির এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা আদৌ গ্রাহ্য করিলেন না। তখন চিলারায় তাঁহার উৎকৃষ্ট সৈন্যগণ সহ শ্রীহট্টাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তাও অপ্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষেই অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল, দুই দিবস মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ চলিল, কোন পক্ষেই জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হইল না। দুই দিবসের যুদ্ধের পর চিলারায়ের পক্ষে একটু শুভ লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, স্বসৈন্যের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া অমনি তিনি নিষ্কোষিত অসি হস্তে শত্রুসৈন্য সাগরে ঝাপ দিয়া শত্রু নিপাত করিতে লাগিলেন। চিলারায়ের এই অসম সাহসে বিপক্ষগণ বিস্মিত ও ভীত হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা দেখিতে পাইল যে কামরূপ সেনাপতির অসি আঘাতে, তাহাদের অধিপতির মস্তক ভুলুণ্ঠিত হইল! এই ভয়াবহ দৃশ্যে শ্রীহট্টের সৈন্যগণ তখন রণক্ষেত্রে তিষ্টিতে সাহস পাইল, ছত্রভঙ্গে মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

যুদ্ধের অবসান হইল, শ্রীহট্টপতির ভ্রাতা বন্দী অবস্থায় নরনারায়ণ সদনে নীত হইলেন ও ২০০ ঘোটক, ১০০ হস্তী, ৩০০,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ মোহর কর স্বরূপ প্রদানের অঙ্গীকারে আত্মমোচন করেন।[১৪] এই ব্যক্তির নামও জ্ঞাত হওয়া যায় না। শ্রীহট্টপতির ভ্রাতা হইলেও ইনি সম্ভবতঃ অকর্ম্মণ্য বলিয়া আমিল পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, চিলারায়ের অভিযানের পর যিনি শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাহাকেও ত্রিপুরাধিপতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

অমর মাণিক্যের শ্রীহট্ট বিজয়

ত্রিপুরার অধিপতি প্রবল প্রতাপ বিজয় মাণিক্যের ভ্রাতা অমর মাণিক্য ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়াই ত্রিপুরার সামন্ত নৃপতিগণকে, একটা দীর্ঘিকা খননের জন্য মজুর দিতে আদেশ দেন। অনেকেই ইহাতে মজুর প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তাহাদের দ্বারাই সুবিস্তৃত "অমরসাগর" দীর্ঘিকা খণিত হয়। এই সময় শ্রীহট্টের তরফ ত্রিপুরার প্রভাবাধীন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। অমর মাণিক্য তরফ-পতির উপর মজুর প্রেরণের আদেশ করেন। কিন্তু তরফপতি সে আদেশ গ্রাহ্য করেন নাই। ইহাতে ত্রিপুরাধিপতি তাঁহার বিরুদ্ধে দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহারা প্রস্তুত ছিলেন না, তাই পলাইয়া শ্রীহট্টের আমিলের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই সংবাদ যখন অমর মাণিক্য প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিল না, তিনি

১৪. শ্রীযুত পদ্মনাথ বরুয়া কৃত "সংক্ষিপ্ত আসামর বুরঞ্জী" গ্রন্থের ৫ম অধ্যায় ২৮/২৯ পৃষ্ঠা।

কাল বিলম্ব না করিয়া শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তার প্রতিকূলে সসৈন্যে ধাবিত হইলেন। শ্রীযুতকৈলাস চন্দ্র সিংহ তদীয় ত্রিপুরার ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—"মহারাজ অমর মাণিক্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া গরুড়ব্যুহ রচনা করেন, সৈন্যগণের সমষ্টি তাহার দেহ, সম্মুখস্থ দুইজন প্রধান সৈনিক পুরুষ চঞ্চু, এবং উভয় পার্শ্বস্থিত সেনানীগণকে পক্ষ বলিয়া বোধ হইল। অমর মাণিক্য গজারূঢ় হইয়া ব্যূহের পৃষ্ঠদেশে ছিলেন। সূর্য্যোদয় কালে উভয় দলের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সায়ংকালে মোসলমানেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। সম্ভবতঃ ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে (খৃঃ ১৫৯৯) এই ঘটনা হইয়াছিল। এই ঘটনার পর মোসলমানেরা যাবৎ শ্রীহট্টের পুনরুদ্ধার সাধন না করিয়াছিল, তাবৎ উহা ত্রিপুররাজের করপ্রদ ছিল।"

শ্রীহট্টের আমিলের পরাজয় বার্ত্তা দিল্লীতে পৌঁছিলে, আর এক নূতন ব্যক্তি আমিল পদে নিযুক্ত হইয়া শ্রীহট্ট আগমন করেন। তিনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন এবং বিশেষ কৌশলে শ্রীহট্টে মোসলমান গৌরব পুনঃস্থাপনে সমর্থন হন। ফলতঃ শ্রীহট্টের আমিলগণের কোনরূপ ক্রুটী প্রকাশ পাইলেই তাঁহারা পদচ্যুত হইতেন। এইজন্য এক এক সম্রাটের সময় অনেকটি আমিল প্রেরিত হইতেন।

অনির্দ্দিষ্ট কালীয় আমিলদের নাম

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমকালীন আমিলগণের নাম সম্যক জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। যে সপ্তদশ সংখ্যক আমিলের সময়ের নির্দ্দেশ পাওয়া হয় নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই সময়ের এবং তৎপরবর্ত্তী সম্রাট শাহজাহানের স'য়ে বর্ত্তমান ছিলেন কি না, ঠিক বলা যায় না। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই যে নিতান্ত পরবর্ত্তী ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী কালেই আমিল পরিবর্ত্তনের অধিক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সপ্তদশ সংখ্যক আমিলের নাম এস্থলেই লিখিত হইলঃ—

১. নবাব আবু হুসেন বাহাদুর।
২. " আব্দুরহেম বাহাদুর।
৩. " আহমদ মজিদ বাহাদুর।
৪. " ইনাত উল্লা খাঁ বাহাদুর।
৫. " কাজিম বেগ বাহাদুর।
৬. " জয়েন উল্লা আবিদি বাহাদুর।
৭. " জাফর আলী খাঁ বাহাদুর।
৮. " নসরত জঙ্গ বাহাদুর।
৯. " নজম উদ্দীন বাহাদুর।
১০. " মনওর খাঁ বাহাদুর।
১১. " মুরিদ খাঁ বাহাদুর।
১২. " মীর আলী খাঁ বাহাদুর।
১৩. " মোহাম্মদ জান বাহাদুর।
১৪. " রিফাত খাঁ বাহাদুর।
১৫. " বাখর খাঁ বাহাদুর।
১৬. " সজীব আলী খাঁ বাহাদুর।
১৭. " সৈয়দ কু'বউদ্দীন বাহাদুর।

নবাব ইনাত উল্লা খাঁর নামে প্রসিদ্ধ ইনাতগঞ্জ স্থাপিত হয়;

চতুর্থ অধ্যায়
নবাবি আমল

সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সমকালবর্ত্তী নবাব জামন ও সৈয়দ ইব্রাহিম খাঁ

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ সময়ে মোহাম্মদ জামন নামক এক ব্যক্তি শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তারূপে ছিলেন; তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরেও, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম গৌরবের সহিত শ্রীহট্ট শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার "তুয়লদার" উপাধি ছিল, "তুয়লদার" উপাধি আর শুনা যায় নাই।

শাহজাহানের রাজত্বের তৃতীয় বৎসর (খৃঃ ১৬২৯) বঙ্গের সুবাদার ইসলাম খাঁ আসাম আক্রমণ করিয়া হাজো অধিকার করিয়াছিলেন। এই অভিযানে শ্রীহট্টের ফৌজদার, শ্রীহট্ট হইতে একদল সমরনিপুণ সৈন্যসহ তৎসঙ্গে যোগদান করেন। তিনি যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় যুদ্ধাবসানে সম্মানার্হ হন। বাদশাহ তাঁহাকে দ্বি সহস্রের (তন্মধ্যে ১৮০০ অশ্বারোহী) অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।[১]

সম্রাট আরঙ্গজেবের সমকালবর্ত্তী আমিলগণ

সম্রাট শাহজাহানের সমকালবর্ত্তী, সৈয়দ ইব্রাহিম খাঁ নামক, শ্রীহট্টের আর একজন আমিলের নাম পাওয়া গিয়াছে। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে (হিঃ ১০৭৫) তিনি শ্রীহট্টান্তর্গত টেংরা নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় মহেশ ভট্টাচার্য্যকে ইটা (ও আলীনগর) পরগণা হইতে সোয়া এগার হাল ভূমি দান করেন। সম্রাট আরঙ্গজেবের সমকালবর্ত্তী আমিলগণ মোগল সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্বে (খৃঃ ১৬৫৮-১৭০৭) মোগল সাম্রাজ্যের যেমন বহু বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তেমনই আবার অবনতির সূত্রপাতও আরম্ভ হয়। ইঁহার সমকালে শ্রীহট্টের পশ্চাদুল্লিখিত আমিলগণ আগমন করেন।

১. নবাব লুৎফ উল্লা খাঁ বাহাদুর—ইঁহার প্রদত্ত একখানি সনদে লিখিত আছে যে, ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে (বাং ১০৭০) তিনি সমসেরনগর নিবাসী রঘুনাথ বিশারদকে সাড়ে তিন হাল ভূমি দান করেন। ইঁহার পুত্র রতিকান্তও গুণী পুরুষ ছিলেন, এবং তিনিও নবাব হইতে দান প্রাপ্ত হন।

২. নবাব জান মোহাম্মদ বাহাদুর—ইঁহার প্রদত্ত এই সময়কার (১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ) একখানি সনদ পাওয়া গিয়াছে। ইনি সম্ভবতঃ নায়েব ফৌজদার ছিলেন।

৩. নবাব ফরহাদ খাঁ বাহাদুরকে তৎপরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা বলিয়াই বোধ হয়। ফরহাদ খাঁর সময়ে শ্রীহট্টে অনেক মসজিদ, সেতু, ইমারত প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ফরহাদ খাঁর কীর্ত্তি শ্রীহট্টে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীহট্টের পূর্ব্বপ্রান্ত বাহী

---

১. Islam Khan, in the 3rd year of the reign of Shah Jehan invaded Assam, penetrating as far as Hajo Muhammad Zaman, who was Faujdar and Tuyuldar of Sylhet was also ordered to join the detachment. Muhammad Zaman played the important active part in the war which was highly successful and was the result (along with the distinctio.. received by Islam Khan) he was made commander of 2000, 1800 horse.

-Journal of the Assiatic society of Bengal-1872, No 1. PP. 57, 62

গোয়ালিছড়ার সেতু[২] ইহারই কীর্ত্তি। শাহজলালের দরগাস্থিত বড় মসজিদ, তৎকর্ত্তৃক ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।[৩] শ্রীহট্টের রায়হুসেন মহল্লাস্থিত আর একটি মসজিদ তিনি ইহার সপ্তম বর্ষে নির্ম্মাণ করেন।[৪] দরগা মহল্লার দক্ষিণ পশ্চিম (লেনের পশ্চিমে) তাঁহার নির্ম্মিত আর একটা মসজিদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

ফরহাদ খাঁ গুণীর আদর করিতেন, তিনি অনেক ব্যক্তিকেই ভূমি দান করিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট সহরবাসী মোহাম্মদ নজাত নামক ব্যক্তিকে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে (হিঃ ১০৮০) তিনি পরগণা কৌড়িয়া ও আতুয়াজান হইতে সোয়া সাতাইশ হাল ভূমি দান করেন। লংলা নিবাসী রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সনদে দৃষ্ট হয় যে, ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে (বাং ১০৮৫) তিনি ফরহাদ খাঁ হইতে পৌণে ছয় হাল ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন।

৪. নবাব মহাফতা খাঁ বাহাদুব—ইটা পরগণাবাসী রঘুনাথ বিশারদের (সার্দ্ধ ত্রিহল ভূপ্রাপ্তির) সনদ পত্রে নবাব মহাফতা খাঁ বাহাদুরের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাকে ঐ সময়কার নায়েব ফৌজদার বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

৫. নবাব নূর উল্লা খাঁ বাহাদুর—১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে (হিঃ ১০৯৩) পরগণা চৌয়ালিশ নিবাসী রাজপণ্ডিত রামগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য তাঁহার নিকট হইতে কতক ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন।

৬. নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ আলী খাঁ কাইমজঙ্গ বাহাদুর—ইনি বহুতর ব্যক্তিকে ভূমি দান করতঃ যশস্বী হইয়াছিলেন। ইঁহাকে সেই সময়কার ফৌজদার বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহার প্রদত্ত সনদগুলিতে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ (বাং ১০৮৭) পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা ইঁহার নিকট হইতে ভূদান প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম এইঃ—

জমা বখশ ফকির	সাং	চৌয়ালিশ।
রাম শঙ্কর ভট্টাচার্য্য	সাং	সমসেরনগর।
কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী	সাং	পঞ্চখণ্ড।
গঙ্গাধর শর্ম্মা	সাং	বাণিয়াচঙ্গ।
রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	সাং	পাথারিয়ায়। প্রভৃতি

৭. নবাব আব্দুরহেম খাঁন বাহাদুর—একখানা পাট্টা পত্রে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি শ্রীহট্টের নবাব ছিলেন, জানা যায়।

৮. নবাব সাদক বাহাদুর—ইঁহার প্রদত্ত ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের (১০৯৮ পং[৫]) একখানি সনদ কালেক্টরীতে পাওয়া গিয়াছে।

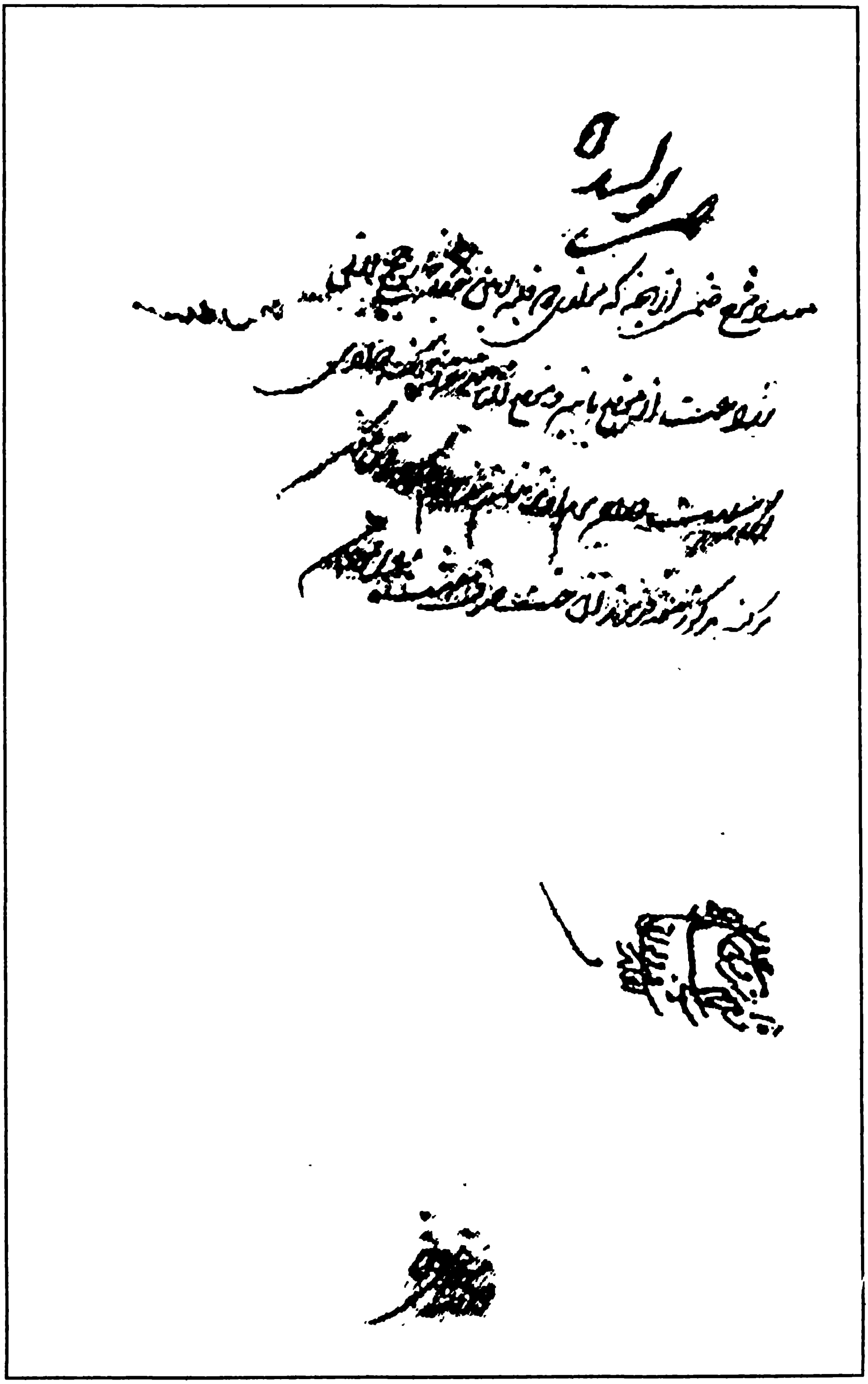
---

২. গেইট সাহেব ভ্রমতঃ ইহার নাম ফসাদ খাঁ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আলমগীর বাদশাহের সময় শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা ফসাদ খাঁ কর্ত্তৃক ১০৮৫ হিঃ (খৃঃ ১৬৬৭) অব্দে উক্ত সেতু নির্ম্মিত হয়। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব নামটি শুদ্ধরূপে লিখিলেও, ফরহাদ খাঁকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আনিয়া, গেইট সাহেব হইতে কম ভুল করেন নাই; তিনি লিখিয়াছেন:- "Furad Khan, Who was amil at the beginning of the 18th century, constructed nnmerous bridges."-S A. A. II 92.

৩. "Another inscription on the mosque on the above shrine (of Shah Jalal Mazerrad at Durga Mahalla), written in Persian, recites that the mosque was built during the reign of Emperor Aurangzeb through the exertions of Farad Khan in 1088 Hijira"

৪. "An inscription on the mosque at Mahalla Ray-Hussain recites that the mosque was built in the reign of Emperor Aurangzeb in 1094 Hijira "
-Report on the Progress of the Historical Research in Assam-1897 P. 9.

৫ "পং"-শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রাচীনকালে প্রচলিত "পরগণাতীত" নামীয় অব্দ।



নবাবি সনন্দের পৃষ্ঠা লিপি

৯. নবাব ককতলব খাঁ বাহাদুর—তাঁহার প্রদত্ত সনদ হইতে জানা যায় যে, ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি শ্রীহট্টে আগমন করেন।

১০. নবাব আহমদ মজিদ বাহাদুর—পরগণা দুলালী নিবাসী ভারত দাস বৈষ্ণবের ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে (বাং ১১০৬ প্রাপ্ত একখানি ভূমিদানের সনদে ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

১১. নবাব কারগুজার খাঁ বাহাদুর—ইঁহার প্রদত্ত সনদ হইতে জানা যায় যে, ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে (বাং ১১১০) তিনি শ্রীহট্টে অবস্থিতি করেন।

এই সকল নবাবের মধ্যে অনেকেই নায়েব ফৌজদার পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাহার কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

সম্রাট বাহাদুরশাহের সমকালবর্ত্তী আমিল

আরঙ্গজেবের পরবর্ত্তী সম্রাট বাহাদুরশাহের রাজত্ব সময়ে (খৃঃ ১৭০৭-১৭১২) শ্রীহট্টে (১২) নবাব মতি উল্লা বাহাদুর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইঁহার পিতা নাথুল খাঁ শিরাজী কোচবিহার ও রাঙ্গামাটির ফৌজদার ছিলেন। মতি উল্লার সহিত আহোমরাজ রুদ্র সিংহের সন্ধি ছিল। গৌহাটীস্থ তদীয় প্রতিনিধির সহিত, মতি উল্লার চিঠি পত্রের আদান প্রদান ছিল। রুদ্র সিংহের প্রতিনিধি সীমান্তভাগের অনেক রাজনৈতিক ব্যাপার মতি উল্লাকে জ্ঞাপন করিতেন, এবং উভয়ের মধ্যে উপরেরও আদান প্রদান চলিত।[৬]

সম্রাট ফরকশিয়ার ও মোহাম্মদ শাহের পরবর্ত্তী আমিল

বাহাদুর শাহের পরবর্ত্তী সম্রাট ফরকশিয়ারের সময়ে (খৃঃ ১৭১৩-১৭১৯) শ্রীহট্টে (১৩) নবাব তানিব আলী খাঁ বাহাদুর ফৌজদার ছিলেন বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। ফরকশিয়ারের পরে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ দিল্লীসংহাসন প্রাপ্ত হন; ইঁহার রাজত্বকাল (খৃঃ ১৭১৯-১৭৪৫) অনেক জন আমিল শ্রীহট্টের আগমন করেন। ঐ সময় (১৪) নবাব শুকুর উল্লা খাঁ বাহাদুর শ্রীহট্টের ফৌজদার ছিলেন, তিনি ঢাকার নায়েব নাজিমের নিকট সম্পর্কিত লোক ছিলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তপক্ষের নিকট সুখ্যাতিভাজন হইতে পারেন নাই, এবং শ্রীঘ্রই পদচ্যুত হন। তাঁহার স্থলে এক জন হিন্দু এই উচ্চতম পদে আরোহণ করেন, তিনিই শ্রীহট্টের মুখোজ্জলকারী (১৫) নবাব হরকৃষ্ণ দাস (হর কিষুণ দাস) মন্‌সুর-উল্‌-মুল্‌ক বাহাদুর।

হরকৃষ্ণ দাসের বংশ পরিচয়

ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বানন্দের উল্লেখ করা গিয়াছে, যে বংশে সর্ব্বানন্দের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই বংশে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিবল্লভ নামে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন; ইনি পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট ইঁহার গুণে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে "রায়" উপাধি প্রদান করেন, তিনি শ্রীহট্টের কানুনগো ও দস্তিদার পদে নিযুক্ত হন।[৭] কোনও সনদ বা সরকারী দলিল পত্রাদি বহাল সাব্যস্থে রাজকীয় মোহর করার জন্য উপস্থিত করা হইলে, পরীক্ষাতে তাহাতে মোহর করার অনুমতি দেওয়া দস্তিদারের কার্য্য ছিল। পারস্য "দস্ত" শব্দের

৬. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৪র্থ খণ্ডে ৩য় অধ্যায়ে এই রাজনীতিক চিঠি উদ্ধৃত হইবে।

৭. Kabi ballabh Rai, the progenitor of this family, was highly distingished for his learning. -The Modern History the Indian Chiefs, Rajas &c. Part II. By L N. Ghose.

কিন্তু ঐই গ্রন্থে উক্ত তারিখটা নির্ভরযোগ্য নহে।

অর্থ হস্ত; আজ পর্য্যন্ত শ্রীহট্টে দস্তিদারী নলে, ভূমি মাপের রীতি প্রচলিত আছে। ১৮ ইঞ্চি হাতের ১৪ দস্তিদারী এক নহল হয়।

কবি বল্লভের পুত্রের নাম সুবিদ রায় ও শ্যাম দাস। সুবিদ রাম পিতৃপদ প্রাপ্ত হন; তাঁহার বাসস্থান[৮] "সুবিদ রায়ের গৃধা" নামে কথিত হয়। সুবিদ রায়ের পুত্রের নাম সম্পদ রায় এবং তাঁহার পুত্র যাদব রায়। ইঁহারাও শ্রীহট্টের কানুনগো ও দস্তিদার ছিলেন। নিঃসন্তানাবস্থায় যাদব রায়ের মৃত্যু হয়। শ্যাম দাসের পুত্রের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ, তৎপুত্র কৃষ্ণ রায় ও হরকৃষ্ণ। এই হরকৃষ্ণই শ্রীহট্টের আমিল পদ প্রাপ্ত হইয়া, নবাব হরকিষণ দাস মনসুর-উল-মুলক বাহাদুর নামে খ্যাত হন।

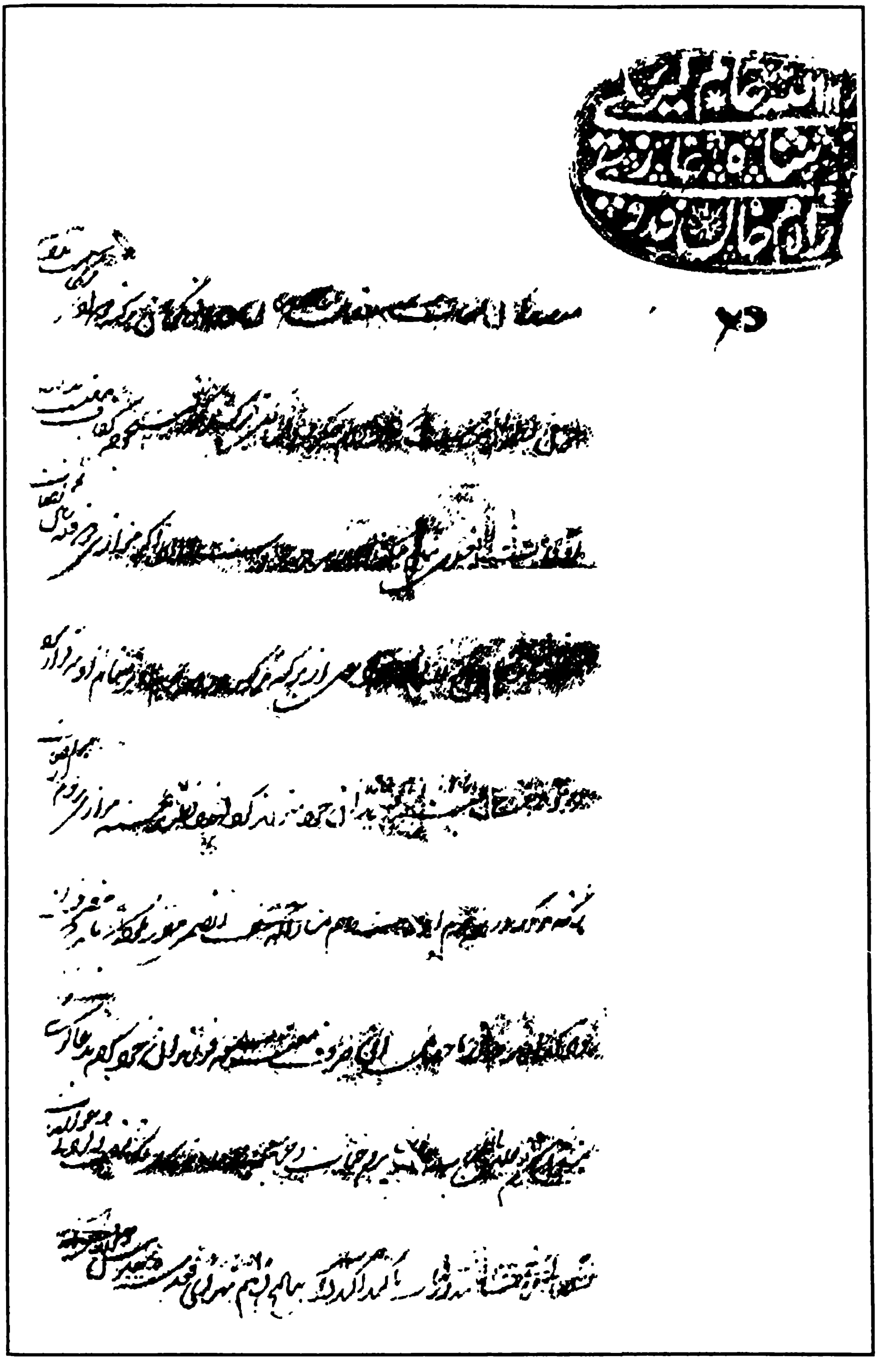
হর কৃষ্ণের নবাবি প্রাপ্তি

কথিত আছে, হরকৃষ্ণের জননী কোন কারণে এক ফকিরের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, শিশুতে তৎকরে সমর্পণ করিবেন; তদনুসারে তিনি শিশুকালেই ফকিরের করে সমর্পিত হন। ফকির তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া যান এবং পারস্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় নিয়োজিত করেন। হরকৃষ্ণ পারস্যে সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় সকলেই বিস্মিত হইল। অতঃপর কোন সুযোগে ঢাকার নবাব নোয়াজিস মোহাম্মদের ডিপুটী রাজা রাজ বল্লভের নিকট তিনি পরিচিত হন ও পূর্ব্ববঙ্গের রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত কালে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। রাজ বল্লভ, হর কৃষ্ণের কার্য্য তৎপরতায় অতিশয় সন্তুষ্ট হন ও মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। পূর্ব্ববঙ্গের হিসাব প্রস্তুত সূত্রে নবাব তাঁহাকে দশ সহস্র টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। হরকৃষ্ণ এই টাকা ফকিরকে দিয়া আত্মস্বাধীনতা অর্জ্জন করেন। অতঃপর হরকৃষ্ণ কিছুকাল মুর্শিদাবাদে কার্য্য করেন এবং পরে নবাবের অনুগ্রহে শ্রীহট্টের আমিল পদে নিযুক্ত হন।[৯]

হরকৃষ্ণের নবাবি প্রাপ্তি সম্বন্ধে অন্যরূপ জনশ্রুতিও শুনা যায়। কথিত আছে, ঐ সময় মুর্শিদাবাদে ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ সওদাগর হুকমত রায় এই দুর্ভিক্ষ সংবাদ প্রাপ্তে ১৩ খানা বৃহৎ "পলওয়ার" নৌকায় তণ্ডুল বোঝাই করিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। এই সংবাদ পাইয়া লক্ষলোক ঘাটে উপস্থিত হইল। হুকমত রায় লোকভয়ে তণ্ডুল তীরে তুলিলেন না; নবাবকে জানাইলেন যে, জন সমূহের কাতর আর্ত্তনাদে তিনি ব্যথিত

৮. তরফে দস্তিদার বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত পরিবার আছেন, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উক্ত বংশীয় এক ব্যক্তি শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা জাহান খাঁর সহকারী ছিলেন, তাঁহার নামও সুবিদ ছিল। যাহাহউক, তরফ ও শ্রীহট্ট উভয় স্থানের দস্তিদার বংশ এক মূলোৎপন্ন বলিয়া কথিত আছে। ১৩১৩ বাং মাঘমাসের বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় ঐরূপ লিখিত হয়। শুনা যায় যে, তরফের চকরামপুরে একটি তালুকে উভয় পরিবারেরই সমান অংশ ছিল, কিছু কাল হইল, শ্রীহট্টের দস্তিদার স্বর্গীয় নবকৃষ্ণ বাবু তাহা বিক্রয় করিয়া আসেন। সত্য হইলে ইহাতে উভয় পরিবারের সম্বন্ধ থাকা সূচিত হইতেছে।

৯. While Har Karishna was an infant, his mother on account of vow, offered him to Fakir, who carried him to Murshidabad and gave him liberal education in Sanskrit and persian language. Har Krishna assisted Raja Bullabh, the then Deputy to Nawajish Mahammad, the Nawab of Dacca, in preparing an account of the revenue of Eastren Bengal. For this service, Har Krisna was introduced by Raja Raj Ballabh to the Nawab of Murshidabad, who gave Harkrishna a reward of Rs. 10,000 with this amount Harkrisena brought his freedom from the Fakir and went to serve at the court of Mushidabad.
-The Modern History of the Indian chiefs, Rajas, &c. Part II.



জায়গীর ভোগের নবাবি সনন্দ

হইয়াছেন, যদি নবাব বাহাদুর সৈন্য দিয়া সহায়তা করেন, তবে তিনি তণ্ডুলগুলি বিলাইয়া দিবেন। নবাব সওদাগরের প্রার্থনায় সৈন্য পাঠাইলেন, তণ্ডুল বিতরিত হইল এবং সপ্তাহ মধ্যে দুর্ভিক্ষ দূর হইয়া গেল। সওদাগর বিনামূল্যেই তণ্ডুলরাশি বিতরণ করিয়াছিলেন।

নবাব, সওদাগরের এই সদাশয়তায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তখন শ্রীহট্টের আমিল শুকুরুল্লা কর্ম্মচ্যুত হওয়ায় ঐ পদ শূন্য ছিল। নবাব এই সদাশয় ধনবান ব্যক্তিকে উক্তপদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু সওদাগর শাসন সংক্রান্ত দায়িত্বজনক পদটি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করিয়া, দেশস্থ সম্ভ্রান্ত কুলজাত হরকৃষ্ণকেই এই পদে নিযুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করেন। হরকৃষ্ণ তখন মুর্শিদাবাদেই কার্য্য করিতেন, তাঁহার ন্যায়-নিষ্ঠা ও কার্য্যতৎপরতার কথা নবাবেরও অবিদিত ছিল না; কাজেই সওদাগরের প্রস্তাবে নবাব সম্মত হইলেন, শ্রীহট্টের আমিল পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল।

ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ইটা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরকিঙ্কর দাস মহাশয় ইটার শ্যামরায়ের দেওয়ানী পদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে ও হুকমত রায়ের কৃতিত্বের কথা লিখিয়াছেন।

পূর্ব্ব নবাবের প্রতিকূলতা ও হরকৃষ্ণের হত্যা

১৩১৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ হইতে এস্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছেঃ—"হরকৃষ্ণ নবাবি পদ পাইয়া শুভক্ষণে শ্রীহট্টে পদার্পণ করেন নাই। তখন ঢাকার নবাবের আত্মীয় শুকুরুল্লা খাঁ শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এ জগতে যেমন সৎ অসৎ উভয়বিধ কর্ম্মের প্রাধান্যে লোকে সুখ্যাত ও কুখ্যাত হইয়া থাকে, সেইরূপ হরকৃষ্ণের নামের সঙ্গে কাপুরুষ শুকুরুল্লাহর নাম বিজড়িত ও বংশানুক্রমে লোক পরম্পরায় প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। হরকৃষ্ণের নবাবি প্রাপ্তিতে শুকুরুল্লা ক্রুদ্ধ হইয়া নানা অছিলায় শ্রীহট্টে থাকিয়া গুপ্তভাবে হরকৃষ্ণের সর্ব্বনাশের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক গোলমালের পর শুকুরুল্লা তাঁহাকে শাসনভার প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত যে রাজস্ব তহবিলে ছিল, তাহা ছাড়িয়া দিলেন না। মোগল অধিকার কাল হইতে ইংরেজ আমলের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের রাজস্ব ঢাকাতে প্রেরিত হইত। মুর্শিদাবাদের নবাবগণের রাজকোষ যেমন সুপ্রসিদ্ধ জগৎশেঠগণের জিম্বায় থাকিত, তদ্রূপ মহল্লা সুবিদরায়ের গৃধাবাসী সুপ্রাচীন "সাহা" বংশীয়গণ শ্রীহট্টের রাজকোষের অধ্যক্ষ ছিলেন। শুকুরুল্লা, হরকৃষ্ণের বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র বিস্তার করিতে লাগিলেন, স্থানীয় কর্ম্মচারীবৃন্দের অনেককেই তিনি টানিয়া লইতে পারিলেন। প্রোক্ত রাজকোষাধ্যক্ষ সাহা তাহাদের অন্যতম।"

"পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, শুকুরুল্লা তাঁহার সময়ে সংগৃহীত রাজস্ব হরকৃষ্ণকে বুঝাইয়া দেন নাই, অথচ ষড়যন্ত্র ও স্থানীয় বিশৃঙ্খলার ফলে নূতন রাজস্ব রীতিমত আদায় করাও হরকৃষ্ণের পক্ষে সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইল, তাহাতে ঢাকাতে বাজস্ব প্রেরণের সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল; সুযোগ বুঝিয়া শুকুরুল্লা ঢাকার দরবারে মিথ্যা রটাইয়া দিলেন, হরকৃষ্ণ রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া নিজে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে শুকুরুল্লা গোপনে ঢাকার নবাবকেও হাত করিয়া লইয়াছিলেন ও সর্ব্বত্র হরকৃষ্ণের মোসলমান বিদ্বেষের ও হিন্দু স্বাতন্ত্র্য স্থাপনের প্রয়াসের কথাও প্রচারিত করিয়া দিলেন। শুকুরুল্লার প্রদত্ত বিষবটিকা ঢাকার নবাব হইতে মুর্শিদাবাদের নবাবও গ্রহণ করিলেন; ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল; প্রধূমিত অগ্নি আর কতক্ষণ প্রচ্ছন্ন থাকে? শ্রীহট্টে হিন্দু মোসলমানে বিবাদের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। শুকুরুল্লা দেখিলেন, মহাপ্রতিভাশালী পরাক্রান্ত হরকৃষ্ণ বাঁচিয়া থাকিতে চরম জয়ের আশা তাহার পক্ষে

একরূপ দুরাশা, তাই হরকৃষ্ণের গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রও সংগোপনে আঁটিলেন। হরকৃষ্ণের দেহরক্ষক সৈনিকগণের এক ব্যক্তি শুকুরুল্লার নিকটে গোপনে স্বধর্ম্ম বিক্রয় করিয়া তাঁহার গুপ্ত হত্যার ভার লইল। তখন হিন্দু মোসলমানের প্রধূমিত বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিয়া রীতিমত যুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে। শুনা যায়, কাজলসারের নিকটবর্ত্তী মালিনীর তীরবর্ত্তী প্রান্তরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যুদ্ধের দিনও যথাসময়ে স্নানাদি করিয়া হরকৃষ্ণ ঠাকুর ঘরে ইষ্ট পূজাতে বসিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায়, বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্রানভিজ্ঞ, আত্মরক্ষার অপ্রস্তুত, ধ্যাননিমগ্ন হরকৃষ্ণকে দুরাত্মা দেহরক্ষক তরবারির গুপ্তাঘাতে হত্যা করিল! এবং তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড শূলাগ্রে উত্তোলন করতঃ উন্মত্তোল্লাসে শেখঘাটের একাংশে অবস্থিত শুকুরুল্লার বাটীর দিকে ছুটিল!![১০]

পথি পার্শ্বেই যুদ্ধক্ষেত্র। হরকৃষ্ণের বিশ্বস্ত অন্যতম সেনাপতি রাধানাথ তখন মোসলমান সৈন্যদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে ছিলেন, মোসলমান পক্ষে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় রাধানাথ পূর্ব্বোক্ত ভয়াবহ দৃশ্য—প্রভুর রক্তাক্ত মুণ্ড শূলাগ্রে নিরীক্ষণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রভুভক্ত রাধানাথ নিমেষ মধ্যে সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, সংসার তাঁহার চক্ষে আঁধার বোধ হইল, তিনি যাহা করিলেন, জনৈক অজ্ঞাতনামা কবি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাহা লিখিয়া গিয়াছেনঃ—

"বাঙ্গালীর শেষবীর্য্য স্বাধীন শোণিত,
শ্রীহট্টে সরমাতটে হইল পতিত,
সেনাপতি রাধানাথ, করিয়া অরাতি পাত,
অগন্য-যবন-সৈন্য-বেগ নিবারিল,
যবন-বিজয়ী-লক্ষ্মী টলিতে লাগিল।
অবশেষে অবিশ্বাস-নিহত-জীবন
প্রভুর রক্তাক্ত শির শূলাগ্রে নিরখি—
নিহত প্রভু আমার! কার তরে যুদ্ধ আর?
যথা কৃষ্ণ তথা রাধা বলিয়া অমনি
বক্ষে নিমজ্জিয়া অসি পড়িলা ধরণী!'
(আর্য্য-দর্শন পত্রিকা—১২৮৮ বাং আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা)

প্রভুভক্ত রাধানাথ অনন্ত শয্যায় শায়িত হইলেন, হিন্দু মোসলমানের যুদ্ধ অন্ত হইল, শুকুরুল্লার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। আনন্দ বাজারের লেখক লিখিয়াছেন,—"শুকুরুল্লার আদেশে হরকৃষ্ণের ছিন্ন মুণ্ড তদীয় বাটীতে এক উচ্চ বংশদণ্ডে ঝুলাইয়া রাখা হইল; উদ্দেশ্য—যেন আর কোন হিন্দু বিপক্ষতাচরণের উদ্যম না করে। শুনা যায়, জনৈক উচিত বক্ত পাগলা ফকির ঐ উচ্চস্থিত মুণ্ড দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া চীৎকার করিয়া ছুটিতে লাগিল—'আরে বাঃ জী লালা হরকিষণ! জীতে সব্‌কো সেরা মরণেবি সব্‌কো উপরওয়ালা!' জিগীষু শুকুরুল্লার কাণে এ কথা পৌঁছিলে জন সাধারণের উত্তেজনার ভয়ে ঐ মুণ্ড অবনমিত হইল। পরে শুনা যায়, উহা হস্তিপদে বন্ধ হইয়া নগর প্রদক্ষিণে ফিরিতে লাগিল!"

১০. Har Krishna pc-essed a geneous heart, but wa. unfortunately murdered by h.s own body-guards, who were instigated by Sukurullah, the late Nawab of Sylhet.
The Modern History of the Indian Chiefs and Rajas &c. Part II. By L. N. Ghose.

হরকৃষ্ণো কর্ম্মচারীদের কথা

এইরূপে শ্রীহট্টের শেষ হিন্দুগৌরব-রবি অস্তমিত হয়। হরকৃষ্ণের শাসনকাল অতি অল্প হইলেও এই সময় মধ্যে তিনি প্রভূত দান শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। শ্রীহট্ট কালেক্টরীতে নবাবী আমলের যে সকল দান-পত্র রক্ষিত আছে, তন্মধ্যে অর্দ্ধেকই "নবাব হরকিষণ" প্রদত্ত! এই সকল সনদে, তারিখ স্থলে দুই হইতে চারি জলুস পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।[১১] "জলুস" অর্থে রাজ্যাভিষেক কাল। প্রত্যেক দিল্লী সম্রাটের রাজ্যাভিষেক কাল হইলে "জলুস" গণনা আরম্ভ হয়। অতএব সম্রাট মোহাম্মদ শাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষ পর্য্যন্ত হরকৃষ্ণের শাসন সময়।

হরকৃষ্ণের প্রভুভক্তি পরায়ণ সেনাপতি রাধানাথ ব্যতীত, মাধব খাঁ (ওরফে মহতাব খাঁ) নামে অন্য এক সেনাপতির নাম শুনা যায়। তদ্ভিন্ন হরদয়াল নামে ঐ সময় এক বিচক্ষণ ব্যক্তি ফৌজদারী সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। হরকৃষ্ণ নবাবের মীর মোনশীর নাম বিশ্বনাথ ছিল, তাঁহার বংশধরগণ এখনও আছেন।[১২] সাহোপাধিক তদীয় কোষাধ্যক্ষের কথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, আনন্দ বাজারের প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, "সাহা" জাতি নহে, উহা প্রাচীন কালে নবাব কর্ত্তৃক ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রদেয় ধনশালিত্বের গৌরবসূচক উপাধি মাত্র। সাহা হইতে অধিকতর ধনীগণ "শেঠ" ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীরা "জগৎশেঠ" উপাধির অধিকারী ছিলেন। এই সাহাগণ কায়স্থ জাতীয় ছিলেন। ইঁহারা শ্রীহট্টের আমিলগণের খাজাঞ্চি বা কোষাধ্যক্ষ, ইঁহাদের ধনের কথা প্রবাদ জনক; জনশ্রুতি আছে, ঢাকার কোন নবাব রাজকার্য্য ব্যপদেশে শ্রীহট্ট আগমন করিলে, তৎকালিক কোষাধ্যক্ষ 'সাহাজী' আমন্ত্রণ করিয়া, সুবর্ণ মোহরমণ্ডিত পথে নবাবকে স্বীয় বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন, ইঁহাদের শেষ বংশধর গোকুল চাঁদ ধ্বংসাবশিষ্ট সম্পত্তি অপব্যয়ে নষ্ট করিয়া নিতান্ত হীনদশাগ্রস্ত হইয়া, প্রায় ৪০ বৎসর হইল, কুষ্ঠরোগে প্রাণ ত্যাগ করেন।"

হরকৃষ্ণ নবাবি পাওয়ার পর মালিনী নামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তীরে এক বিস্তৃত দীর্ঘিকা খনন করাইয়া, তাহার তীরে ১০৮টি কালী পূজা করাইয়াছিলেন। তাঁহার পূজিত ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি তথায় দৃষ্ট হয়।

হরকৃষ্ণের পরবর্ত্তীদের কথা

নবাব হরকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ রায়ের পুত্র জয়কৃষ্ণ এই আকস্মিক বিপৎপাতে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন, তিনি পিতৃব্যের গুপ্ত-হত্যা ভূমি অপবিত্র জ্ঞানে ঐ বাটী ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ ব্যবহিত উত্তরে নূতন এক বাটী প্রস্তুত ক্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

১১. নবাব হরকৃষ্ণ প্রদত্ত অসংখ্য সনদের উল্লেখ অসম্ভব।
তৎপ্রদত্ত
১. এক সনদ প্রাপকের নাম রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, নিবাসনর্ত্তন (পরগণা লংলা); ইহাতে চারি হাল ভূমি দানের উল্লেখ আছে। কেবল হিন্দু নহে, তিনি মোসলমানদিগকেও গুণানুসারে অনেক মদতমাস ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে আরও পাঁচ খানা সনদের বিষয় উল্লেখ করা গেলঃ–
২. রাম রাম ভট্টাচার্য্য সাং পাথারিয়া, তাং ২ জলুস, ভূমি সোয়া একুশ হাল।
৩. গোলাম জাফর আলী পং চাপঘাট ২ সফর, ভূমি সোয়াপঁচিশ হাল।
৪. জয় গোপাল চক্রবর্ত্তী সাং সাতগাও, তাং ৩ জলুস ৭ রমজান, ভূমি আড়াই হাল।
৫. সহিদ আছি ফকির শাহ সাং বালাউট, তাং ঐ ৫ রমজান, ভূমি সোয়া হাল।
৬. হরি শঙ্কর বিদ্যালঙ্কার, সাং কশবে শ্রীহট্ট, তাং ঐ ঐ ভূমি তেইশ হাল। ইত্যাদি।

১২. এই বংশীয় মোন্‌শী শ্রীযুক্ত বারদা চরণ ধর মহাশয় আমাদিগকে এতদ্বিবরণ সহ শ্রীহট্টের অপর অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছেন।

নবাবের মীর মোন্‌শী বিশ্বনাথ প্রভু হত্যায় অত্যন্ত ব্যথিত হন ও ঢাকায় গমন করতঃ এই অবৈধ হত্যার প্রতীকার চেষ্টা করেন, হরকৃষ্ণের ভ্রাতৃষ্পুত্র জয়কৃষ্ণকে শ্রীহট্টের কানুনগো ও দস্তিদার পদ প্রদান করায় কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন; (১৭০৫ খৃষ্টাব্দ।[১৩]

জয়কৃষ্ণের এক পুত্র, তাঁহার নাম জীবনকৃষ্ণ। জীবনকৃষ্ণ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে বহুবিধ গল্প প্রচলিত আছে। ইঁহার দুই পুত্র, দয়ালকৃষ্ণ ও গোপালকৃষ্ণ। জ্যেষ্ঠ দয়ালকৃষ্ণ সাহিত্য ও জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনায় দিবস অতিবাহিত করিতেন, বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতেন না। দুই ভ্রাতার অবশেষে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় বহু আয়ের ভূসম্পত্তি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। কনিষ্ট গোপালকৃষ্ণের পুত্রের নাম নবকৃষ্ণ, ইহার শ্রীযুত নলিনীকান্ত ও একষ্ট্রা এসিষ্টেন্ট্ কমিশনার শ্রীযুত রজনীকান্ত দস্তিদার প্রভৃতি পাঁচ পুত্র বর্ত্তমান আছে।

সাদেকুল হরমাণিক

নবাব হরকৃষ্ণের সময়ে শ্রীহট্টে (১৬) নবাব সাদেক উল্লা খাঁ বাহাদুর ও (১৭) নবাব আবু আলী খাঁ বাহাদুর নায়েব ফৌজদার ছিলেন। দেওয়ানী বিভাগে দেওয়ান মাণিক চাঁদ রায় নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীহট্টে পূর্ব্বাবধি একদল সৈন্য রক্ষিত হইত।[১৪] হরদয়াল নামক জনৈক ব্যক্তি এই সময়কার সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। শুকুরুল্লা কর্ত্তৃক নবাব হরকৃষ্ণ নিহত হইলেও, শুকুরুল্লাকে হরকৃষ্ণের পদে তৎক্ষণাৎ নিয়োজিত করা হয় নাই। দিল্লী হইতে নূতন ফরমান আনাইতে তাঁহার এক বৎসর লাগিয়াছিল, এই এক বৎসর কাল শ্রীহট্টের শাসনভার নায়েব ফৌজদার, সেনাধ্যক্ষ ও দেওয়ানের উপর সমভাবে অর্পিত হয়। ইঁহারা তিনজনে একযোগে কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের যুক্তনামের মোহরাঙ্কিত সনদ এখনও শ্রীহট্টের কালেক্টরীতে দেখিতে পাওয়া যায়; সেই মোহরে "সাদেকুল হরমাণিক" লিখিত আছে। (১৭) সাদেকউল্লা, হয়দয়াল, মাণিকচাঁদ, এই তিন নামের আদি শব্দ উক্ত মোহরে গ্রথিত হইয়াছে। দেওয়ান মাণিকচাঁদই শ্রীহট্টের স্বনাম প্রসিদ্ধ সদ্ব্যয়ী রাজা গিরিশচন্দ্র রায়ের পূর্ব্বপুরুষ।

নবাব শমশের খাঁ বাহাদুর

অতঃপর পুনর্ব্বার শুকুরুল্লা নিজপদ অধিকার করেন। তৎপর (১৮) নবাব শমশের খাঁ বাহাদুর শ্রীহট্টের আমিল পদে নিযুক্ত হন। তৎপ্রদত্ত ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের (বাং ১১৪২) সম্পাদিত

১৩. দস্তিদারী সনন্দের উদাহরণ স্বরূপ জয়কৃষ্ণ দাসের সনদ খানা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেলঃ–"বৈকুণ্ঠতুল্য সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি শ্রীহট্ট চাকলার কানুনগো, চৌধুরী, ভদ্রলোক, জমিদার ও প্রজাবর্গ জানিবা–জানা গেল যে সুবিদ রায়ের পুত্র সম্পদ রায়ের পুত্র যাদব রায় উক্ত চাকলার কানুনগো ও দস্তিদার নিঃসন্তান মরিয়াছেন। সুবিদ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মীদাসের পুত্র শ্রীকৃষ্ণদাসের বেটা জয়কৃষ্ণ দাস সরকারের উপকারের জন্য এই কার্য্যের প্রার্থুক। অতএব উপরোক্ত যাদব রায়ের মরণ তারিখ অবধি কানুনগো দস্তখৎ ও দস্তিদারী পদে উপরোক্ত জয়কৃষ্ণ দাসকে নিযুক্ত করা গেল। তোমাদিগের উচিত যে জয়কৃষ্ণ দাসকে উক্ত চাকলার কানুনগো ও দস্তিদারী কর্ম্মে স্থিরতর জানিবা, বাহাল তারিখ অবধি তাহার সদুপদেশ ও আদেশ মতে কার্য্য করা ও তাহা অমান্য না করা। কাগজাতে উহার দস্তখৎ ও জরিপে উহার হাতের মাপ সদর ও মহালাৎ ও অন্যান্য কার্য্যালয়ে সকলে উহার দস্তখৎ বলবৎ জানিবা। এই সম্বন্ধে খুব তাগিদ জানিবা তাহার হুকুম মত কার্য্য করিবা।" তাং ২২ রজব ১৮ জলুস।
(মোহর-মোহাম্মদ খাঁ বাদশাহ গাজী। ১১৪২ জলুস। ফিদ্দরি। সমসের খাঁ বাহাদুর।)

১৪. During the Mughul Government a considerable military force was kept at Sylhet for its defence. -Hunter's Statistical accounts of Assam. VOL II (Sylhet) P. 107.

ভূমিদানের সনদ পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার সময়েই পূর্ব্বকথিত জয়কৃষ্ণ দাস শ্রীহট্টের দস্তিদার পদে নিযুক্ত হন (১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ।)

নবাব শমশের খাঁর অধীনে চারিজন নায়েব ফৌজদার ছিলেন। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে লিখিত আছে, শিলহাটের ফৌজদারীতে এই সময়ে শমশের খাঁ ও তাঁহার অধীনে আরও চারিজন সীমান্ত প্রদেশ রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন।[১৫] তিনি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের আমিল পদে ছিলেন, প্রসিদ্ধ গিরিয়ার যুদ্ধে তিনি নবাব সরফরাজ খাঁর পক্ষে সসৈন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অতুল সাহসের পরিচয় প্রদান করেন। সেই ভীষণ যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ অনেক প্রধান ব্যক্তির সহিত নিহত হন। আলীবর্দ্দি খাঁ জয়োল্লাসে মসনদে অধিষ্ঠিত হন।

জমা কামেল তোমার

এই সময়ের পূর্ব্বে (খৃঃ ১৭২২) মুর্শিদকুল খাঁ "জমা কামেল তোমার" নামে রাজস্বের এক নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন। তাহাতে "সরকার শিলহাট ও তাহার নিকটস্থ আরও কতক ভূভাগ লইয়া চাকলা শিলহাটের উৎপত্তি হয়। চাকলা শিলহাটের মধ্যে সরাইল, জোয়ানশাহী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণা অবস্থিত ছিল।" "শিলহাট চাকলায় ১৪৮ পরগণায় ৫৩১৪৫৫ টাকা রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখা যায়।"[১৬] তৎকালে সুবেবাঙ্গালার "১৩ চাকলার মধ্যে শিলহাট দ্বাদশ স্থানীয় ছিল।"

এই বন্দোবস্তই "পরবর্ত্তী নবাব সুজাউদ্দীনের সময়ে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে পাকা হইয়া সুমার বা গোসোয়ারা প্রস্তুত হইয়াছিল।[১৭] তিনি বঙ্গরাজ্যকে ২৫টি জমিদারীতে বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে শ্রীহট্ট ২১ স্থানীয়, ঐ সময় বিবিধ নামীয় ভিন্ন ভিন্ন জায়গীর ভূমি বাদে শ্রীহট্টে খালসা ভূমি ৩৬টি পরগণাভুক্ত ছিল ও ৭০,০১৬ টাকা জমায় বন্দোবস্ত হয়।[১৮]

নিম্নলিখিত জায়গীরগুলি বাদে উক্ত জম ধার্য্য হইয়াছিলঃ—

১. "জায়গীর আমির-উল-উমরা"। (বাদশাহের প্রধান সেনাপতির জন্য) শ্রীহট্টকেও এই বাবতে অর্থ প্রদান করিতে হইত। এই জন্য ঢাকা, শ্রীহট্ট ও আসাম হইতে (২২৫,০০০) টাকা সংগৃহীত হইত।

২. "মনসব দারান"। (সেনানীদের জন্য জায়গীর) প্রান্তদেশ রক্ষার্থ এই জায়গীরের ব্যবস্থা। ঢাকা, হিজলী, রাজমহল ও শ্রীহট্টে ইহা স্থাপিত ছিল। টাকার পরিমাণ ১১,০৮৫; শ্রীহট্টকেই ইহার অধিক অংশ বহন করিতে হইত।

৩. "শালিয়ানা দারান্"। (বাৎসরিক বৃত্তি) শ্রীহট্টের কয়েক জন তালুকদার প্রভৃতির জন্য। শ্রীহট্টের নয়টি পরগণা হইতে এই টাকা আদায় হইত; টাকার পরিমাণ—২৫,৬৬৫ টাকা।

৪. "আমলে নাওরা"। (নৌসৈন্য বিভাগ ও তাহার জায়গীর) মগ ও পর্টুগীজ জলদস্যু দমন জন্য ইহা স্থাপিত হয়। এই বিভাগে অনেক ফিরিঙ্গী সৈন্য ও ৭৬৮ খানি সমর-তরণী ছিল,

---

১৫. শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় প্রণীত "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস" ১ম খণ্ড ৫১৬ পৃষ্ঠা।

১৬. Dacca blue Book P. 291 এবং মুর্শিদাবাদের ১ম খণ্ড ৪৩৫ পৃষ্ঠা

১৭. শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাস" ৬ষ্ঠ খণ্ড ১০১ পৃষ্ঠা।

১৮. The land revenue actually paid to Government seems to have been Rs 70,016 in 1720 A D- Dacca Blue Book P 291

ইহার ব্যয় ঢাকা ও শ্রীহট্টকে বহন করিতে হইত।

শ্রীহট্টের সরাইল (অধুনা ত্রিপুরায়) হইতে—	১১০ টাকা
" জোয়ানশাহী (অধুনা ময়মনসিংহ)"—	৩৩৮২০ "
" তরফ (শ্রীহট্টেই আছে)" —	১১৮৩০ "
	মোট ৪৬৭৬৬ টাকা

শ্রীহট্ট হইতে আদায় করা হইত এবং প্রোক্ত পরগণাত্রয় খারিজ হইয়া ঢাকার নাওরা বিভাগ ভূক্ত হয়। তদ্ব্যতীত, ইহার পরে আলীবর্দ্দি খাঁর সময়ে বাণিয়াচঙ্গের রাজস্ব হইতে ৬১,৯৪১ টাকা নাওরা উল্লেখে বাদ দেওয়া হইত।

৫. "আমলে আসাম।" (পূর্ব্ব ভাগের বিশেষতঃ আসামের সীমান্ত রক্ষার্থ তোপ এবং ৮,১১২ জন সৈনিক রক্ষার ব্যয়) ঢাকা, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টকে এই ব্যয় বহন করিতে হইত। ব্যয়ের পরিমাণ--৩৫৯,১৮০ টাকা নিরূপিত ছিল।

৬. "খেদা-আ-ফিল"। (হস্তী ধরিবার জন্য) কেবল ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট হইতে এতদ্বিষয়ক ব্যয় যাইত। জায়গীরের আয়ের পরিমাণ—৪০,১০১ টাকা। তন্মধ্যে শ্রীহট্টের এগারসতী প্রভৃতি পরগণা হইতে যাইত—২৮,৯৮৮ টাকা এবং হস্তীর খোরাকি বাবতে ৩০টি পরগণা হইতে—১৮০৪৪ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত ছিল।

৭. "শিলহাট ফৌজদারান"। [শ্রীহট্টের ফৌজদার শমশের খাঁ ও সীমান্ত রক্ষকের (নায়েব ফৌজদারের) জায়গীর] রেকমী জমা—৪৩,০০০ টাকা। ৪৮ পরগণা—১৭৯,১৬৬ টাকা।'[১৯]

নবাব শমশের খাঁ বাহাদুরের অধীনে ৪ জন নায়েব ফৌজদার বা সীমান্ত রক্ষকের উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ সময়ে যাঁহারা শ্রীহট্টে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহাদের নাম লিখিত হইলঃ—

১৯. নবাব সুজাউদ্দীন খাঁ বাহাদুর--১৭২৯ খৃষ্টাব্দে পাথারিয়াবাসী রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্যকে তিনি ভূমি দান করেন।

২০. নবাব বশারত খাঁ বাহাদুর—১৭৩১ খৃষ্টাব্দের তারিখযুক্ত তাঁহার নামীয় একখানা সনদ দৃষ্ট হয়।

২১. নবাব সৈয়দ রফিউল্লা হাসনি বাহাদুর--১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত তাঁহার মোহরাঙ্কিত সনদ পাওয়া যায়। ইহার নামানুক্রমে পরগণা রফিনগরের নাম হয়।

২২. নবাব মোহাম্মদ হাসনা বা মোহাম্মদ আবুল হাসন বাহাদুর—তাঁহার নামীয় ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের একখানি সনদ পাওয়া গিয়াছে।

২৩. নবাব মীর আলিওর খাঁ বাহাদুর—১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কতক ভূমি দান করেন বলিয়া জানা যায়।

সমসাময়িক পাঁচ ব্যক্তির নাম উল্লেখিত হইল, ইহাদের মধ্যে একজন সম্ভবতঃ অল্পকাল শ্রীহট্টে ছিলেন, তাঁহার স্থানে পরে অপর একজন আসিয়া থাকিবেন। নবাব শমশের খাঁর সময়ে তাঁহার অধীনে চারিজনের অধিক নায়েব ফৌজদার ছিলেন না।

---

১৯. শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় কৃত "বাঙ্গালার ইতিহাস" ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২০. The latter (mosque) was built in 1744 A. D during the foujdari of Bahan Kham.
-Anual Report of the Archoeological survey, Bengal circle, of the year ending April,-1903, T. Bloch P 24

নবাব বহরম খাঁ ও পরবর্ত্তী নবাব

শমশের খাঁ গিরিয়ার যুদ্ধে নিহত হইলে, (২৪.— নবাব বহরম খাঁ বাহাদুর শ্রীহট্টের ফৌজদার নিযুক্ত হন। তিনি ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে শাহজলালের দরগাস্থিত গুম্বজত্রয়যুক্ত মসজিদটি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।[২০] অতঃপর (২৫.) নবাব আলাকুলিবেগ বাহাদুরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে একখানি সনদে তাঁহার নামের মোহর আছে।

(২৬.) নবাব তানিব ইয়ার খাঁর বাহাদুর, (২৭.) তানিব আলী ও (২৮.) আবু তানিব খাঁ বাহাদুর, এই তিন নামের মোহরযুক্ত সনদ প্রায় একই সময়েই দৃষ্ট হয়। ইহারা বিভিন্ন ব্যক্তি, কি এক ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন নাম বলা যায় না। প্রত্যেক নামে "তানিব" শব্দ থাকায়, সম্ভবতঃ একই ব্যক্তিই বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে। ভিন্ন ব্যক্তি হইরে ইঁহারা ঐ সময়কার ফৌজদার ছিলেন সন্দেহ নাই।

সম্রাট আহমদ শাহের সমকালবর্ত্তী ফৌজদার

যখন বঙ্গের মসনদে নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় আহাম্মদ শাহ বাহাদুর "তকত তাউসের" নামে কোন রূপে বিকাইতে ছিলেন (খৃঃ ১৭৪৮-১৬৫৭); ইঁহার সময়ে—আলাকুলি বেগের কিঞ্চিৎ পরে, যিনি শ্রীহট্টের ফৌজদার নিযুক্ত হন, তাঁহার নাম (২৯) নবাব নজীব আলী খাঁ বাহাদুর। ইঁহার নামীয় মোহরাঙ্কিত ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে একখানি সনদ পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ের অল্প পূর্ব্বে বা পরে যাঁহারা আমীল পদে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের অনেকের নামই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে নাই; প্রথমে যে সপ্তদশ জন আমীলের নাম মাত্র লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই এই সময়কার লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই।

বদরপুরের কেল্লা

এই সময়ে শ্রীহট্টের পূর্ব্বাঞ্চলে পার্ব্বত্য লোক কর্ত্তৃক নানারূপ উৎপাত ঘটিত, তন্নিবারণ কল্পে এই সময়ে একজন নূতন নায়েব ফৌজদার নিযুক্ত হন; সেই নবনিয়োজিত নবাব মিরাট হইতে আগমন কালে একদল মোসলমান ও খৃষ্টীয়ান গোলন্দাজ সৈন্য সীমান্ত রক্ষার জন্য আনয়ন করেন। শ্রীহট্টের সীমান্তবর্ত্তী বুন্দাশিল নামক স্থানে তিনি একটি দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; সেই দুর্গই বদরপুরের কেল্লা বলিয়া খ্যাত।[২১] এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়। বুন্দাশিলের এই দুর্গ ইংরেজ আমলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য ছিল।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে আগা মোহম্মদ রেজা নামক জনৈক মোগল কতকটি লোক সংগ্রহ করতঃ কাছাড়িধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে[২২] পরাভূত করিয়া ইমাম মাধী নাম ধারণ করতঃ প্রায় দ্বাদশ শত অনুচর সহ মহোৎসাহে বিজয়গর্ব্বে এই কেল্লা আক্রমণ করে, পরে শ্রীহট্ট হইতে

---

২১. At the begining of the 18th century, a Muhammadan Nawab, who came from Meerut with a Party of Muslmans and Native Christians; the latter, according to the village traditions, being employed to serve his guns. Where the Nawab recruited these men, history does not relate, but they are said to have built a fort in Bandasil and to have settled round to it.
-Allen's Assam District Gazetteers (Sylhet) VOL. II. Chap. II. P. 91.
নবাব নির্ম্মিত এই প্রাচীন দুর্গ পুনর্ব্বার মেরামত হইবার প্রস্তাব চলিতেছে। সম্প্রতি ইহার জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিবার আদেশ হইয়াছে।

২২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৫ম খণ্ড উপসংহার বা কাছাড় অধ্যায়ে এতদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কল্যাণসিংহ সুবেদার[২৩] নূতন সৈন্য সহ আগমন করিয়া, আক্রমণকারী এই মোগলকে পরাজিত করেন। ইহার পাঁচটি কামান তাঁহার হস্তগত হয় ও ৯০ জন লোক বন্দী হয়; মোগল পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে ধৃত ও বন্দী হয়।[২৪]

বুন্দাশিলের রোমান কাথলিক খৃষ্টীয়ানগণই, নবাব আনীত পূর্ব্বোক্ত গোলন্দাজদের বংশধর।

সম্রাট আলমগীর দ্বিতীয়ের সমকালবর্ত্তী ফৌজদারগণ

যখন সৌভাগ্যবঞ্চিত সিরাজউদ্দৌল্লা বঙ্গের সিংহাসনে আরূঢ়, যে সময়ে দ্বিতীয় আলমগীর দিল্লীতে নামে মাত্র সম্রাট (খৃঃ ১৭৫৭-১৭৫৯), তখন (৩০.) নবাব শাহ মতজঙ্গ নোয়াজিস মোহাম্মদ খাঁ বাহাদুর শ্রীহট্টের ফৌজদারের পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার নায়েব (৩১.) আচল সিংহ নামে জনৈক হিন্দু ছিলেন। ইঁহাকে পশ্চিমাঞ্চলীয় লোক বলিয়াই বোধ হয়। বেজোড়া বাসী রামকান্ত চক্রবর্ত্তীকে তিনি, (১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে) কতক ভূমি দান করেন। শ্রীহট্ট কালেক্টরীর কাগজ পত্রে "নোয়াজিস মোহাম্মদের নায়েব" বলিয়া তাঁহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

পরবর্ত্তী ফৌজদারগণ ও বঙ্গীয় সন্ধি পত্রে শ্রীহট্টের চূণার কথা

পলাশী ক্ষেত্রে বঙ্গীয় নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয়ে অতঃপর যখন বঙ্গদেশ ইংরাজ গবর্ণমেন্টের আয়ত্ত হইয়াছে, যখন দিল্লীর ভগ্নসিংহাসনে শাহ আলম দ্বিতীয় উপবেশন করতঃ মোগল বাদশাহের নামের স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন, সেই সময়ে বা তাঁহার কিঞ্চিৎ পরেও (খৃঃ ১৭৬০-১৭৭১) শ্রীহট্টের কয়েক জন আমিলের নাম তাঁহাদের প্রদত্ত সনদে পাওয়া যায়; ইঁহাদের মধ্যেঃ—(৩২.) নবাব মোহাম্মদ আলী খাঁ বাহাদুর (দ্বিতীয়), (৩৩.) নবাব এক্রাম উল্লা খাঁ বাহাদুর, (৩৪.) নবাব হাজি হুসেন খাঁ বাহাদুর (খৃঃ ১৭৬৪) ও (৩৫.) নবাব আজদা খাঁ বাহাদুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সিরাজের পতনে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর বাঙ্গালার সুবাদার বলিয়া স্বীকৃত হন। কোন কারণে তাঁহার উপর ইংরেজগণ অসন্তুষ্ট হইয়া তদীয় জামাতা মীর মোহাম্মদ কাশেমকে তাঁহার স্থলবর্ত্তী করেন। মীর কাশেমের সাপক্ষে এই বিষয়ে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজদের এক সন্ধি হয়, তাহাতে শ্রীহট্টের চূণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তদনুসারে নবাব কোম্পানীকে চূণ সরবরাহ করার কথা হয়। তৎকালে বাণিজ্য ব্যপদেশে কোম্পানীর লোক প্রজাবর্গের উপর দৌরাত্ম্য করিতেন। শ্রীহট্টে এইরূপ অত্যাচার যাহাতে না হয়, তাহাও উক্ত সন্ধিপত্রে লিখিত ছিল।[২৫] ইহার পর মীর কাশেম ইংরেজের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন, ইংরেজ উপায়ান্তর রহিত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও মীরজাফরকে বঙ্গের সিংহাসনে পুনস্থাপন বদ্ধ পরিকর হইয়া ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে দ্বিতীয় সন্ধি করেন, ইহাতেও চূণার উল্লেখ আছে, কিন্তু তখন ইংরেজরা অর্দ্ধেকের মালিক হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ সন্ধিপত্রের ৫ম দফার মর্ম্ম এইঃ—বঙ্গীয় ১১৭০ সাল হইতে শ্রীহট্টে পাঁচ বৎসর ধরিয়া কোম্পানীর গোমস্তা ও ফৌজদার

২৩. কল্যাণসিংহের অকল্যাণ বার্ত্তা এই গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ২য় অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

২৪. See Assam District Gazetteers (Sylhet) Vol II. Chap. II. P. 39.

২৫. "One half of the chunum produced at Sylhet for three years t be purchsaed by the gomasstahs of the company from the people the Government at the customary rate of that place. The Temants and nabitants of that district shall receive no injury."



বদরপুর কেল্লা (সম্মুখ ভাগ)

উভয় পক্ষের সমব্যয়ে চূণা প্রস্তুত হইবে, কোম্পানী অর্দ্ধেক লইবেন, অপরার্দ্ধ সরকারের ব্যবহারে আসিবে।[২৬]

ইংরেজামলের নবাবগণ

খৃষ্টীয় ১৭৬৫ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। শ্রীহট্টও ইংরেজ করায়ত্ত হয়, কিন্তু ইংরেজগণ শাসন সম্বন্ধে তখন হস্তার্পণ করেন নাই; তাঁহারা দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের ভারই গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র, পূর্ব্ব প্রথামত মোসলমান ফৌজদারই শ্রীহট্টের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের ফৌজদারদের মধ্যেঃ—(৩৬.) নবাব বিকু খাঁ বাহাদুর (খৃঃ ১৭৭৩), (৩৭.) নবাব হায়দর আলী খাঁ বাহাদুর (খৃঃ ১৭৭৮) ও (৩৮.) নবাব এতেসাম খাঁর প্রদত্ত ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের একখানি সনদ মিলিয়াছে; করিমগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত এতেসাম নগর পরগণা তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছে। তৎপর (৩৯.) নবাব মীর মোহাম্মদ হাদী বাহাদুর (খৃঃ ১৮০২) ও (৪০.) নবাব সদাকত আলী খাঁ বাহাদুরের নাম পাওয়া যায়। ইঁহার প্রদত্ত সনদে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দুই তিন জন নবাবের প্রদত্ত সনদে তাঁহাদের নামের সহিত "কোম্পানী ইংরেজ বাহাদুর" এই কয়েকটি কথাও পাওয়া যায়।

ইহার পরেও শ্রীহট্টে দুই এক জন নবাবের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ—(৪১.) নবাব আবু তুরাব খাঁ বাহাদুর ও (৪২.) নবাব কাশেম খাঁ বাহাদুর এবং (৪৩.) নবাব গণর খাঁ বাহাদুর। নবাব গণর বৃত্তিভোগী মাত্র ছিলেন, ইঁহার প্রদত্ত কোনও সনদ শ্রীহট্টের কালেক্টরীতে দৃষ্ট হয় না, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শ্রীহট্ট থাকার কথা জানা যায় মাত্র।

নবাবি আমলে দেশের অবস্থা

উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী

নবাবি আমলের শাসন প্রণালী নানা গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশ যেরূপ শাসিত হয়, নবাবি আমলে শ্রীহট্ট অঞ্চল শাসনেও তাঁহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আমিল বা ফৌজদারগণ পূর্ব্বে দিল্লীর অধীনে ছিলেন, পরে রাজস্ব বিষয়ে ঢাকার ও শাসন বিষয়ে মুর্শিদাবাদের অধীনে তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হইত। ইঁহারা সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও সুশিক্ষিত ছিলেন, প্রধানতঃ সীমান্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অধীনে একাধিক "নায়েব" থাকিতেন। ফৌজদার পরিবর্ত্তন সময়ে কখন কখন সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইত। (নবাব শুকুরুল্লা ও হরকৃষ্ণের যুদ্ধ বিবরণ তাহার উদাহরণ।) তদ্ব্যতীত দিল্লী হইতে রাজস্ব বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী "দেওয়ান" নিযুক্ত হইতেন। সম্রাট শের শাহের সময়ে শ্রীহট্টে আনন্দ নারায়ণ নামে এক দেওয়ান ছিলেন। বলা গিয়াছে, ঐ বংশে দেওয়ান মুক্তরাম, দেওয়ান মাণিক চাঁদ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন, ইহাতে বোধ হয় যে, ঐ পদ উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে প্রদত্ত হইত। কালেক্টরীর কাগজ পত্রে দেওয়ান গোলাব রাম বলিয়া এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, (ইনি বাহাদুরপুর পরগণাস্থ গোবিন্দরাম পণ্ডিতকে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে শাহবাজপুর হইতে সাড়ে পাঁচ হাল ভূমি ব্রহ্মত্র দেন। এই দেওয়ান ভিন্ন বংশীয় ছিলেন। দেওয়ানী পদের ন্যায় কানুনগো পদও উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে প্রদত্ত হইত, ইহার উদাহরণ আছে। আমিল পদ সৃষ্টির পূর্ব্বে কানুনগোগণই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, পরে তাঁহাদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। তখন রাজস্ব ও জমিদার বন্দোবস্তের জন্য স্থানে স্থানে কানুনগো কার্য্যালয়

২৬. Aitchinson's Treaties Engagement and Sanads Vol. I. P. 49

স্থাপিত হয়; সদর শ্রীহট্ট, ইটা, লংলা, তরফ, প্রভৃতি স্থানে কানুনগো কার্য্যালয় ছিল। পরবর্ত্তীকালে কানুনগো পদই রাজস্ব বিভাগে শ্রেষ্ঠ পদ ছিল। পাটওরিগণ ইঁহাদের সাহায্যকারী ছিলেন। দস্তিদারদের ক্ষমতাও অল্প ছিল না, রাজকীয় দলিল ও দান পত্রাদি মোহরাঙ্কিত করিয়া তাঁহারাই বাহাল করিয়া দিতেন, ভূ-পরিমাপে তাঁহাদের নকল ব্যবহৃত হওয়ার বিধান ছিল,—আজিও আছে। কাজিগণ শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, ইঁহাদের অধীনে কিছু কিছু সৈন্যও থাকিত, তরফ প্রভৃতি স্থানে কাজির কার্য্যালয় ছিল। তদ্ব্যতীত বিচার নির্দ্ধারণার্থে জনৈক মোহাম্মদীয় আইনের ব্যাখ্যা করিতেন এবং হিন্দু ব্যবস্থা বিধি ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট পণ্ডিতগণ দিতেন। ইঁহারা রাজপণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন, নবাব কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ভরণপোষণার্থ ভূমিদান পাইতেন। নবাব এক্রাম উল্লা খাঁর প্রদত্ত এইরূপ সনদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।[২৭]

সামরিক বিভাগে বক্সী, জমাদর, হাজারী প্রভৃতি পদ ছিল। দেওয়ানী সেরেস্তায় মুস্তোফী বা সেরেস্তাদার, আমীন, পেস্কার, মোন্‌শী প্রভৃতি বহুবিধ কর্ম্মচারী ছিল। খাজাঞ্জির উপর তহবিলের ভার ছিল, ফোতাদার বা পোদ্দার মুদ্রা পরীক্ষা করিতেন। সেনানায়কগণ বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর ভোগ করিতেন; হিম্মত খাঁ, হাতিম খাঁ, বক্তারসিংহ সেনাপতির জায়গীর আজও "ছেগা" নামে পরিচিত।

রাজস্ব সংগ্রহে বৈকুণ্ঠ বাস

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর পূর্ব্বে প্রধানতঃ ইজারাদারগণই দেশের বড়লোক ছিলেন, মুর্শিদকুলি ইজারা প্রথা রহিত করিয়া জমিদার সৃষ্টি করেন, জমিদারগণ রাজস্বের টাকা কিস্তিবন্দীক্রমে দেওয়ানখানায় প্রদান করিতেন। রাজস্ব বাকি পড়িলে, স্থানীয় কর্ম্মচারীর রিপোর্ট মতে জমিদারদিগকে কখন কখন ঢাকা বা মুর্শিদাবাদে আহ্বান করা হইত, নিমন্ত্রিতগণ ভাগ্যানুসারে তথায় বিবিধরূপ যন্ত্রণার আস্বাদ প্রাপ্ত হইতেন। এই অকথ্য অত্যাচার মুর্শিদকুলি ও তদীয় দৌহিত্রপতি দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খাঁর নামের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিয়াছে। কাহাকে বা শিঙ্গী মৎস্যপূর্ণ বিষ্ঠাগর্ত্তে নামাইয়া দেওয়া হইত, কাহারও ঢিলা পায়জমার ভিতর বৃশ্চিক বা বিড়াল ছাড়িয়া দেওয়া হইত, কাহাকেও লবণমিশ্রিত মহিষ-দুগ্ধ পান করাইয়া উদরাময়ে ভোগাইবার ব্যবস্থা হইত। হিন্দুর প্রতি বিদ্রূপচ্ছলেই যেন এই অত্যাচার "বৈকুণ্ঠবাস" বলিয়া কথিত হইত। কিন্তু "বৈকুণ্ঠে" দর্শন করিতে হইয়াছিল বলিয়া

২৭. মূল পারস্য দান পত্রের মর্ম্ম এই যেঃ–ডৌয়াদিগ নিবাসী নন্দরামের ভরণপোষণ সংক্রান্ত দরখাস্থ অনুসারে পরগণা মজুকুর দোয়ারিভাগা হইতে ২ কুবলা ভূমি তাহাকে দেওয়া হয়, উচিত যে, তিনি উহা ভোগ ক্রমে দুয়া (আশীর্ব্বাদ) করেন। ৫ জলুষ।
মোহরে–"বাদশাহে আলমগীর ফিদ্দরি গাজী এক্রাম খাঁ ১১৭২"
রাজপণ্ডিতি পদের সনন্দের অনুবাদঃ–
মোহদিয়ান চৌধুরিয়ান ও কানুনগোইয়াণ পরগণে ডৌয়াদি ও গয়রহ সরকার শ্রীহট্ট জ্ঞাত হইবা যেহেতু সাবেকি দস্তুর মতে রাজপণ্ডিতি বিষয় উপরি উক্ত পরগণাজাতের মোকবার আছে, অদ্য দরখাস্ত হয় সাবেক দস্তুর মতে বিষয় মজকুর মোকবর হয়, অতএব দরখাস্ত মত রাজপণ্ডিতি পণ্ডিতি বিষয় পরগণাজাত মজকুরের উহার নামে পৃষ্ঠের লিখিতমত বাহাল করা গেল, উচিত যে উহারার তছরূপ দেওন যে শ্রাদ্ধ ও গয়রহ কার্য্যে পরগণাজাত নিবাসীর পূর্ব্বে দস্তুর মত অন্নদান ও জলদান ও বৎসতরি লওন আর জরুরি কর্ম্ম শাস্ত্র মত পরগণাজাত নিবাসীর পত্র দেওন, এহাতে তাগিদ তাগিদ জানিয়া লিখামতে আচরণ করিবা। তারিখ ৬ সহারছক সন ৪ জলুষ।

কথিত আছে। যাঁহাদের সৌভাগ্য বিদেশ গমন না ঘটিত, তাঁহারাও সহজে অব্যাহতি পাইতেন না, স্থানীয় কর্ম্মচারীদের কাছে তাঁহারা বিশেষ ভাবে নির্য্যাতিত হইতেন। এই নির্য্যাতন ভয়ে জমি জমা গ্রহণে লোকে প্রায়ই নারাজ হইত।

রায় ও রায়বাহাদুর খেতাব

নবাবী আমলেই সম্ভ্রান্ত ভূমধ্যধিকারীগণ "চৌধুরী" খেতাব পাইতেন। খেতাবের মধ্যে "রায়" খেতাব খুব উচ্চ ছিল। মুর্শিদাবাদ কাহিনী রচয়িতা লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তৎকালে রায় ও রায়বাহাদুর উপাধি পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাইত না। সে সময়ে রায়দিগকে সহস্র সৈন্যের (তন্মধ্যে ৫০০ অশ্বারোহী) অধিপতির ও রায়বাহাদুরকে তিন সহস্র সৈন্যের (তন্মধ্যে ২০০০ অশ্বারোহী) অধিপতির পদমর্য্যাদা দেওয়া হইত।" চৌধুরীদের খেতাব তদ্রূপ না হইলেও ইঁহারাই দেশের শক্তিস্বরূপ বিবেচিত হইতেন।

চৌধুরী খেতাব

হিন্দুরাজত্বে প্রজার নিকট হইতে করস্বরূপ উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ গৃহীত হইত। সম্রাট আকবরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তৎপরিবর্ত্তে কর স্বরূপ আয়ের চতুর্থাংশ সংগৃহীত হইত, যাহারা এই সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, তাহারাই "চৌধুরী" (সংস্কৃত চতুর্ধারী বা চতুর্ধরীণ) উপাধি পাইতেন। কিন্তু তৎকালে এ উপাধি কচিৎ কাহাকেও দেওয়া হইত; পরবর্ত্তী সময়েই "চৌধুরী" খেতাবের ছড়াছড়ি হয়। পূর্ব্বে ইহা রাজস্ব আদায়ী কর্ম্মচারীর উপাধি ছিল, পরে ভূমধ্যধিকারীদের স্থায়ী উপাধিরূপে পরিণত হয়। কিন্তু নূতন জমিদারগণ এই খেতাব পাইতেন না, কেননা জমিদার ও চৌধুরী একার্থ বোধক নহে। জমিদারী পূর্ব্বে একটি পদ স্বরূপ ছিল,[২৮] জমিদারগণ আদায়কারী "মারফতদার" স্বরূপ নিয়োজিত হইতেন।[২৯] ইহাদিগকে এক সময় রাজস্ব আদায়ের হিসাব দিতে হইত। পক্ষান্তরে "চৌধুরী" বংশানুক্রমিক উপাধি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। জমির স্বত্বচ্যুতির সহিত জমিদারিত্ব ঘুচিয়া যায়, কিন্তু চৌধুরী উপাধি তদ্রূপ নহে। বস্তুতঃ জমিদার ও চৌধুরী অথবা ক্রোড়ী ভিন্নার্থ বোধক শব্দ।[৩০] "চৌধুরী" উপাধি স্থায়ী ও উত্তরাধিকারী প্রযোজ্য হইলেও, পূর্ব্বে দশসনা বন্দোবস্তকালে কোন কোন নূতন জমিদারকে ঐ প্রাচীন উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৩১] তদ্ব্যতীত তৎকালে চৌধুরী খেতাব ও "ইজ্জত" ও "রিয়াসত" ইত্যাদি বিক্রয় করারও উদাহরণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমানে কোন কোন স্থলে স্বয়মুদ্ভূত চৌধুরী দৃষ্ট হইলেও, প্রকৃতপক্ষে নূতন চৌধুরী হইবার আর উপায় নাই।

দ্রব্যের মূল্যাদি

নবাবি আমলে অপরাধীদিগকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হইত, কিন্তু দূরতর স্থানে অপরাধীগণকে ধৃত করার সুবন্দোবস্ত ছিল না; এইজন্য দেশে চুরী, ডাকাতি অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। দোষী নির্দ্ধারণ স্থলে নানারূপ পরীক্ষা ও শপথ ছিল। তখন প্রজাগণের অবস্থা অনেক

২৮. Philip's Lan Tenure PP. 34, 35, 59, 101, 170.

২৯. Wheeler's Tales from Indian History. chap. XIV. PP. 202. 203.

৩০. The fifth Report from the Select committee on the Affairs of the East India company. Vol. I. PP. 257. 258.

৩১. Harrington's Analysis of the Finances of Bengal Vol. III. P. 327.

ভাল ছিল বলিয়া লোকে সহজে কুপথে যাইত না, জিনিসপত্র সস্তাদরে পাওয়া যাইত; চাউলের মণ তৎকালে চারি আনা ছয় আনায় বিক্রয় হইত, একথা এখন কে বিশ্বাস করিবে? অধিক দিন নহে, শতাব্দী পূর্ব্বে এদেশে ধানের কাঠার মূল্য দুই টাকা আড়াই টাকার অধিক ছিল না।—আট মণে এক কাঠা হয়। তখন ঘৃতের সের চারি আনা ছয় আনা বিকাইত। মজুরের বেতনও অধিক ছিল না, বার্ষিক এক টাকা কি বার আনা হইলে বলবান কর্ম্মক্ষম চাকর পাওয়া যাইত, ইহা নবাবি আমলের শেষ সময়ের কথা। ঐ সময়ের প্রথমে ও মধ্যভাগে দেশের অবস্থা আরও ভাল ছিল।

খোজা

এই সময়কার শ্রীহট্টের একটি প্রথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থোক্ত দ্বাদশ সুবার ইতিহাস প্রকরণে লিখিত হইয়াছে যে, "শ্রীহট্টে অনেক খোজা ও ক্রীত দাস দাসী পাওয়া যায়।" কৃত্রিম উপায়ে মোসলমান বালকদের পুরুষত্ব নষ্ট করা হইত, বলে বালকদিগকে ধরিয়া খোজা করিত।[৩২] এই খোজাগণ দিল্লী প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইত। ইহারা কখন কখন প্রভূত ধন উপার্জ্জন পূর্ব্বক দেশে আসিয়া সৎকীর্ত্তি করিত। চুড়খাইর সন্নিকটবর্ত্তী খোজার দীঘী প্রভৃতি ইহার প্রমাণ। করিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ জায়গীরদার বংশের প্রসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি তাঁহাদের বংশের জনৈক খোজা হইতেই এই সময়ে হইয়াছিল।[৩৩] তখন লোকে বেতন দিয়া চাকর রাখিতে বিশেষ চেষ্টা পাইত না। তখন অতি মাত্রায় দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন পণ্য দ্রব্যের ন্যায় বাজারে দাসদাসী বিক্রয় হইত, তবে ইহাদের ক্রয়-বিক্রয়ে লিখিত দলিলের ব্যবহার ছিল।[৩৪]

৩২. এই নৃশংস প্রথা গৌরবাত্মক নহে। কিন্তু গেইট সাহেব তদীয় আসামের ইতিহাসে শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ কেবল এইটিই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তদুত্তরে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেনৎ-"We are told only that in early time Sylhet district supplied India with eunuchs (page 272) and nothing more as to its products, human beings or other things. Sylhet claims as its own the great Raghuath Siromani, the subtlest logician that Bengal has ever produced; the greater Sri Chaitanya who has passed as an Avatar of Vishnu; Adwaita, one of the Vaishnavite trinity who represented God Siva, if Chaitanya was Vishnu; Maheswar Nyayalanker who, like Raghunandan (who wrote 28 books on new Sriti, called Tattwas), worte 28 books on old Sriti, called Pradipas; Baninath Bidyasagar whose commentary is one of the best ever written on Sanskrit Grammar, and many other men of learning and religion +++ But nothing counted so much with the author as the manufacture of eunuchs for insertion in his history. এতদুল্লিখিত মহাত্মাদের বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে।

৩৩. শ্রীহট্ট ইতিবৃত্তের ৩য় ভাগে (বংশবৃত্তান্তে) এই বংশকথা কথিত হইবে।

৩৪. ইটা নিবাসী রাঘবেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ১৮১১ খৃষ্টাব্দের লিখিত এইরূপ একখানি দলিলের অবিকল নকল এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল, ইহাতে তখনকার ভাষায় নমুনাও পাওয়া যাইবে;-"ইআদিকীর্দ্দ শ্রীরাঘাবেন্দ্র চক্রবর্ত্তি সদাসয়েসু লিখিতং শ্রীরত্নবল্লভ শর্ম্মণঃ কস্য বিক্রয় পত্রমিদং কার্জ্যঞ্চ আগে তুমার পাশ হনে মবলগ ৩ তিন রূপাইয়া পাইলাম পাইয়া আমার পৈত্রিক নফর শ্রীচান্দ সুদ্রর বেটী শ্রীমতি আদরু দাসিরে তোমার পাশ বিক্রয় পত্র করিয়া দিলাম তোমার পৈত্রিক নফর গুনা সুদ্রর পুত্র শ্রীকটা সুদ্রর পাশ বিবাহ দেও ইহার দিগে যে সন্তান অ[illegible] হৈব এহার দান বিক্রি অদিকার তুমার এহাতে আমার সত্ত নাই এতদর্থে বিক্রয় পত্র লেখিয়া দিলাম ই[illegible] সন ১২১২ সাল বাঙ্গালা মাহে ৯ কার্ত্তিক।"
(পার্শ্বের সাক্ষী–শ্রীবিজয়কৃষ্ণ শর্ম্মা, শ্রীবিষ্ণুরাম শর্ম্মা। উপরে শ্রীরত্নবল্লভ শর্ম্মণঃ।)

সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার

শ্রীহট্টে পূর্ব্ব হইতে মৈথিল দ্বিজবর্গের প্রাধান্য থাকায় সংস্কৃতের বহুল চর্চ্চা ছিল। শাহজলালের সময় হইতে এদেশের কথাবার্ত্তায় উর্দ্দু ভাষার অনেক শব্দ মিশ্রিত হইলেও সংস্কৃতের প্রভাব হিন্দু সমাজ হইতে দূরীভূত হয় নাই, নবাবি আমলেও অধিকাংশ স্থলে দলিল পত্র সংস্কৃতেই লিপিবদ্ধ হইত।[৩৫] পণ্ডিতগণ সংস্কৃতেই গ্রন্থাদি লিখিতে যত্ন করিতেন। পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গালা মিশ্রিত সংস্কৃতেই দলিলাদি লিখিত হইত।[৩৬] শ্রীহট্টের কথ্য ভাষায় অনেক অবিমিশ্র সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যায়।

সাধারণ অবস্থা

নবাবি আমলে দেশের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। বিচার কার্য্য সূক্ষ্মভাবে সম্পাদিত না হইলেও, দেশের লোক অনেক পরিমাণে সুখস্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, অহরহঃ অন্নকষ্ট ছিল না, লোকের ধর্ম্ম ভয় প্রবল ছিল, সত্য কথা বই তাহারা মিথ্যা বলিত না। অন্যায়াচরণে সহজে লোক যাইত না বলিয়া ফৌজদারী মোকদ্দমার এত ছড়াছড়ি ছিল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরাই মীমাংসা করিয়া দিতেন, বয়োজ্যেষ্ঠ ও উর্দ্ধ সম্পর্কিত ব্যক্তিদের প্রচুর সম্মান ছিল, তখন উৎকট সাম্যনীতির স্রোতে হিন্দু সমাজের প্রাচীন সুনীতি ভাসাইয়া দিতে পারে নাই। ঐ সময়েই দেশে, দেশে মুখোজ্জ্বলকারী অনেক মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়।

---

৩৫. শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় তদীয় শ্রীহট্টের ভূগোলের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,–"অনেকস্থলে সংস্কৃতে লিখিত ভূমি বিক্রয়পত্রাদিও দেখা গিয়াছে (যথা ধর্ম্মপুর নিবাসী) সনৎকুমার চৌধুরীর বাড়ীতে প্রাপ্ত বহু প্রাচীন সংস্কৃত কবলা), এ দেশে যে আর্য্য ভাষায় ভূরি প্রচলন ছিল, তদ্বিষয়ে দ্বৈধ জন্মিবার কারণ নাই।"

৩৬. এইরূপ একখানা দলিলের নিম্নে দেওয়া গেলঃ–

"শ্রীনকল পাট্টা অজ করার মাহে ২৫ আসাড় সন ১০৯২ সাল স্বস্তি দ্বিনবত্যুত্তর সহস্রতমাব্দে আসাড়স্য পঞ্চবিংসতি দিবসে শ্রীশ্রীমতাং সুলতান আরঙ্গসাহ পাদপদ্মা নামভ্যুদয়িনি রাজ্যে বঙ্গানামধীশ্বরেষু শ্রীযুত সাহাইস্থ খাঁন মহোগ্রপ্রতাপেষু শ্রীহট্টাধিকারিণি শ্রীযুত আবদুল রহেম খাঁন মহাসয়ে শ্রীযুত হাজি সাহাবাজ কস্য পঞ্চখণ্ডাধিকারিত্বে বিলসতি সাহস্রির পঞ্চখণ্ডচত্তরকান্তর্গত খাসাপাটকস্থ শ্রীসুদাম দাস শ্রীগোবিন্দদাস সকাসাত সপ্ত মুদ্রাং গৃহীত্বা শ্রীমধুসুদন পাল শ্রীকৃষ্ণবল্লভ পালাভ্যাং দক্ষিণে শ্রীবংসিকায়ার্ব্বাটিকা পশ্চিমে পূর্ব্ব রাজমার্গ চ উত্তরে পুষ্করিণ্যুত্তরপারং পূর্ব্ব ইসানকোনাবধিক প্রমাণেন গোলক আর ফলাইর বাড়ি গোলে চ জুরিআর ত্রিসিমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্না শ্রীমনিপত্তন বটিকা মৌজে খেসর সম্বন্ধিনী বিক্রীতেতি তনমূল্যং ৭ সাততঙ্কা দ্রব্য একবাড়ী চতুঃসীমাএ সন-তারিখ-সদর-এই দলিলের শীর্ষদেশে একপার্শ্বে একটি পারস্য মোহর এবং অপর পাশ্বদেশে "শ্রীমধুসুদন পাল সম্মত শ্রীকৃষ্ণবল্লভ পাল সম্মত" এবং তনিম্নে "উভয়ানুমত্যা শ্রীমধুসুদন ভট্টাচার্য্য' এইরূপ লিখিত আছে। দলিলে নিম্নদেশে "তত্রার্থে সাক্ষিণ শ্রীহরিরাম পাল" এইরূপ লিখিত। ইহাতে বোধ হয় যে, মধুসুদন ভট্টাচার্য্যই দলিল লেখক ছিলেন। তদ্ব্যতীত দলিলে নিপার্শ্বেই "ইসাদি" বা সাক্ষী ১৫ জনের নাম আছে, যথা–ঘুরামপাল, রতিরামপাল, বারাণসী দাস, পিতাম্বর পাল, রামনারায়ণ দেব, রামচন্দ্র দত্ত, ফরিদ খাঁ ইত্যাদি।

এই দলিল সম্পাদনের কাল সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ই ছিল, তখন বঙ্গাধিপতি শায়েস্থা খাঁ এবং শ্রীহট্টে আব্দুল রহেম খাঁ ফৌজদার ছিলেন। ইঁহার নাম শ্রীহট্টের কালেক্টরীর কাগজপত্রে আছে কিন্তু তদ্বারা তাঁহার সময় নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে নাই। হাজি শাহবাজ তৎকালে পঞ্চখণ্ডের ভূস্বামী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়।

দলিল সংস্কৃতে লিখিত হইলেও লেখক বানান শুদ্ধির প্রতি মনোযোগ করেন নাই। বানানের ভুল প্রদর্শন করা [illegible]ল্য মাসম্মত" এবং তনিম্নে "উ[illegible]নুমত্য শ্রীমধুসুদন ভট্টাচার্য্য" [illegible]রূপ লিখিত আছে। দলিলের [illegible]ম "নকল" শব্দ লিখিত। আরও কয়েকটি মূল দলিলে এই শব্দ পাওয়া গিয়াছে, ইহা বোধ হয় তৎকালের রীতি ছিল।

মহাপুরুষ ও গ্রন্থকার

যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নামে বঙ্গদেশের নাম চিরউজ্জ্বল হইয়াছে, শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণে এই সময়েই তাঁহার পিতামহ উপেন্দ্র ও পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম হয়। যে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বঙ্গবিখ্যাত ছিলেন, শ্রীচৈতন্যের মাতামহ সেই বিখ্যাত পণ্ডিত তরপের জয়পুরে এই সময়েই জন্ম পরিগ্রহ করেন, জয়পুরে জাত ইহারই তনয়া শচীদেবী শ্রীচৈতন্যের জননী। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন শ্রীহট্ট এক ভীষণ অনাবৃষ্টি জনিত দুর্ভিক্ষাদিতে প্রপীড়িত হয়,[৩৭] যখন তজ্জন্য বহুব্যক্তি শ্রীহট্ট ত্যাগ করতঃ ভিন্নদেশে গমন করেন, সেই সময়েই নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সপরিবারে জয়পুর হইতে নদীয়ায় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বদ শ্রীবাসাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য লীলার আদি লেখক পার্শ্বদকবি মুরারি গুপ্ত, প্রাচীন পদকর্ত্তা যদুনাথ, প্রসিদ্ধ পাঠক রত্নগর্ভাচার্য্য, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন, ইঁহারা এই নবাবি আমলেই শ্রীহট্টে এককালে উদিত হইয়াছিলেন, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় ভাগে তাঁহাদের বিষয় বিবৃত করা যাইবে।

এই সময় কত প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীহট্টের নাম চিরগৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ বঙ্গগৌরব রঘুনাথ শিরোমণি, সময়প্রদীপ প্রণেতা জ্যোতির্ব্বিদ হরিহরাচার্য্য, দীপিকাপ্রভা রচয়িতা গোবিন্দাচার্য্য, পারস্য গ্রন্থকার রেয়াজউদ্দীন "বুলবুলেবাঙ্গালা" ও পীর বাদশাহের কথা এই ভাগেই কথিত হইবে, তদ্ব্যতীত শ্রীহট্টের অন্যতম পারস্য কবি মৌলবী মোহাম্মদ আরসদ্ প্রায় দ্বিশতবর্ষ পূর্ব্বে "জরুর উল মোকল্লাফ" নামক গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন।

ইটাবাসী পদ্মপুরাণের প্রসিদ্ধ কবি ষষ্ঠীবর প্রভৃতি, বিখ্যাত অষ্টাবিংশতি প্রদীপ প্রণেতা পঞ্চখণ্ডবাসী মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, ত্রৈপুর রাজবংশের ইতিহাস "রাজমালা" কার শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর প্রভৃতি এই সময়েই আবির্ভূত হইয়া শ্রীহট্টের মুখোজ্জ্বল করেন। শ্রীহট্টে যেমন মনসা পূজার বাহুল্য লক্ষিত হয়, তেমনি চারি পাঁচজন পদ্মপুরাণ রচয়িতা এদেশে এই সময়েই জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত আছি।

নবাবি আমলেই শ্রীচৈতন্যের এই পিতৃভূমিতে নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক রামকৃষ্ণ গোসাইর উদ্ভব হয়; ঠাকুর বাণী, পাগল শঙ্কর, বঞ্চিত ঘোষ, ঠাকুর জীবন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক মহাত্মাগণ এই সময়েই শ্রীহট্টের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন। বংশবৃত্তান্ত ও জীবন বৃত্তান্ত ভাগে পাঠ ইঁহাদের কথা দেখিতে পাইবেন।

---

৩৭. "শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল।
ডাকা চুরি অনাবৃষ্টি মড়ক পড়িল॥
উচ্ছিন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিয়া।
নানা দেশে সর্ব্বলোক গেল পলাইয়া॥
–কবি জয়ানন্দ কৃত চৈতন্যমঙ্গল।

পঞ্চম অধ্যায়

তরফের কথা

রাজা আচাক নারায়ণ

গৌড়, লাউড় ও জয়ন্তীয়ার ন্যায় তরফও শ্রীহট্টের অন্যতম প্রাচীন রাজ্য। কিন্তু তরফ মোসলমানাধিকৃত হওয়ার সময় হইতেই শ্রীহট্টের গৌড় রাজ্যের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ডের ১ম অধ্যায়ে তরফের শেষ হিন্দু রাজার উল্লেখ করা গিয়াছে, ইঁহার নাম আচাক নারায়ণ।

কিংবদন্তী যে, তিনি হঠাৎ রাজপদ লাভ করায় "আচাক" বা "আচান্বিত" নামে খ্যাত হন।[১] কথিত আছে,—উত্তরে বরাক নদী, পূর্ব্বে ভানুগাছের পাহাড়, দক্ষিণে বেজোড়া পরগণা, পশ্চিমে উত্তর লাখাই, এই চতুঃসীমান্তর্গত (আঠার মোড়ার) রাজপুর নামক স্থানে ইঁহার রাজধানী ছিল। আচাক নারায়ণ ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রিত নৃপতি ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।[২] যাহা হউক তৎকালীন অন্যান্য স্বাধীন নৃপতি অপেক্ষা তাঁহার প্রভাব কোন অংশেই অল্প ছিল না।

রাজা আচাক নারায়ণ সম্বন্ধে তরফ অঞ্চলে এখনও অনেক গল্প শ্রুত হওয়া যায়। কথিত আছে যে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পুণ্যপ্রদ বরবক্র (বরাক) নদ তাঁহার রাজধানী হইতে অনেক দূরে থাকিলেও তিনি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সেই নদে স্নান করিতে যাইতেন। যে স্থানে তিনি স্নান করিতেন, তাহা অদ্যাপি স্নানঘাট নামে কথিত হয়।[৩] যে পথ দিয়া স্নানে যাইতেন, তাহা "ত্রিপুরার জাঙ্গাল" নামে অভিহিত হয়। রাজধানী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক নির্জ্জন টিলার উপরে তিনি ঈশ্বরোপাসনা করিতেন, ঐ টিলাকে লোকে "কীর্ত্তনীয়া টিলা" বলিয়া থাকে।

---

১. কোনও পণ্ডিত দেশভাষায় কথিত আচাক শব্দটি শুদ্ধ কতে গিয়া "আচক্র" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; কাজেই রাজার নামকে তিনি আচক্র নারায়ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। সৈয়দ আব্দুল আগফর কৃত তরফের ইতিহাসের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে–"অকস্মাৎ এবং বিস্ময়কর এই উভয় শব্দের যৌগিক অর্থ স্থলে এদেশের সাধারণ লোকেরা আচাক (বা আচানক) শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। অজ্ঞাত কুলশীল এক এক ব্যক্তি অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া দেশ অধিকার করায় এবং অকস্মাৎ ব্যাপর সম্পাদন হেতু তিনি আচাক নারায়ণ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।" এই কথার সহিত গৌড়গোবিন্দ রাজার আবির্ভাবের সাদৃশ্য পাঠক স্মরণ করিয়া দেখিবেন।

২. আচাক নারায়ণ ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রিত রাজা ছিলেন, সন্দেহ নাই। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে লিখিত আছে–"ভাটী প্রদেশে সন্নিকটে 'তিপ্রা' নামে এক স্বাধীন রাজ্য আছে। যিনি রাজা হন, তাহার উপাধি মাণিক। সেই রাজ্যের আমীর ওমরাহগণ 'নারায়ণ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"–(বসুমতীর প্রকাশিত অনুবাদিত পুস্তক।)

তরফের মুদ্রিত ইতিহাসের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ–"আচাক নারায়ণ যে ত্রিপুরাধিপতির করদ কি সংসৃষ্ট ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তৎকালে যিনি যে দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন, তিনি সেই দেশের রাজা বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত এবং খ্যাত হইতেন।"

৩. পৌরাণিক ভগদত্ত রাজা রাজ্যশাসন ব্যপদেশে শ্রীহট্টে আগমন করিলে এই স্থানে স্নান করিতেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। রাজা আচাক নারায়ণও সেই স্নান ঘাটে গিয়াই প্রত্যহ স্নান করিতেন।

রাজবাটীতে দেবতা স্থাপিত ছিলেন, প্রত্যহ দেবতার সেবা হইত। দেবতার "ভোগ" আরম্ভ হইলে এক বৃহৎ ঢক্কা বাজান হইত, তাহার মেঘ গর্জ্জনবৎ গভীর ধ্বনি তিন ক্রোশ দূর হইতে শ্রুতিগোচর হইত; তাহা শুনিয়াই রাজা কীর্ত্তনীয়া টিলা প্রত্যাগমন করতঃ প্রসাদ পাইতেন। এই ঢক্কা পরে মোসলমানগণ ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

রাজা আচাক নারায়ণের বংশ পরিচয়াদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না; তিনি ত্রৈপুর বংশীয় নৃপতি হইলেও হইতে পারেন; তন্নির্ম্মিত পথ "ত্রিপুরার জাঙ্গাল" নামে অভিহিত হওয়ার ইহাই কারণ বলিয়া বোধ হয়।

আচাক নারায়ণ প্রসিদ্ধ রাজা গৌড়গোবিন্দের সমসাময়িক ছিলেন, এই সময় এ অঞ্চলে মোসলমানগণের আগমন হয় নাই। আচাক নারায়ণের অধিকারে তখন কাজি নুরউদ্দীন নিজ পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে গোহত্যা করায় রাজাদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার ভ্রাতা হেলিম উদ্দীন[৪] ইহাতে জিঘাংসা পরবশ হইয়া দিল্লী গমন করতঃ সম্রাটসদনে অভিযোগ উপস্থিত করেন। তখন, শ্রীহট্টে মোসলমান প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার্থ দিল্লী হইতে যেরূপে সৈয়দ নসিরউদ্দন সিপা-ই-সালার সসৈন্যে প্রেরিত হন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

আচাক নারায়ণের পলায়ন ও তরফ জয়

শ্রীহট্ট জয়ের পর শাহজলালের নির্দ্দেশানুসারে সেনাপতি নসিরউদ্দীন রাজা আচাক নারায়ণকে পরাভূত করিতে ধাবিত হন। শাহজলাল নিজ অনুচর আউলিয়াগণ[৫] সহ শ্রীহট্টেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নসিরউদ্দীনের অধীন সৈন্যগণ ব্যতীত দ্বাদশজন আউলিয়া, তাঁহার সহিত তরফ যাত্রা করেন। তরফ বিজিত হইলে, তথায় ধর্ম্মপ্রচার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

আচাক নারায়ণ, রাজা গৌড়গোবিন্দের পরাভব সংবাদে ভীত হইয়া ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার অশিক্ষিত সৈন্যগণ সুশিক্ষিত পাঠান সৈন্যের সহিত পারিয়া উঠিবে না—প্রাণিক্ষয় মাত্র হইবে। এমতাবস্থায় সন্ধি স্থাপনই কর্ত্তব্য মনে করিয়া, তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

সুফল হইল না,—"কাজি নুরউদ্দীনের রক্ত বিনিময়ে, মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ অথবা যুদ্ধ করিতে হইবে।" এই প্রত্যুত্তর প্রাপ্তে নিরাশচিত্তে রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি পরিবারবর্গসহ ত্রিপুরাধিপতির আশ্রয়ে গমন করিলেন। ত্রিপুরেশ্বর বিপনন আচাক নারায়ণকে আশ্রয় দান করিলেও, তাঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক যবন সৈন্যের সহিত আহবে লিপ্ত হইলেন না।

জনশ্রুতিও আছে যে, ত্রিপুরায় অবস্থান করা নিরাপদ হইবে না ভাবিয়া তিনি তথা হইতে মথুরা গমন করেন; সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

নানা স্থানের নামকরণ

যে সময়ে সৈয়দ নসিরউদ্দীন তরফ জয়ে যাত্রা করেন তখন শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশ বর্ত্তমান কালাপেক্ষা অনেক নিম্ন ছিল, বৎসরের অধিকাংশ কাল অনেক ভূমি জলের নীচে থাকিত, এই জন্য তরফ জয়ার্থীদিগকে জলপথে যাত্রা করিতে হয়। শ্রীহট্ট হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমতঃ যে স্থানে তাঁহারা উচ্চভূমি দর্শন করেন, উচ্চ আইল[৬] বলিয়া সেই স্থানের নাম "উচাইল" রাখা হয়,

---

৪. ইঁহার বংশীয়গণ এখন সাটিয়াজুরীতে বাস করিতেছেন।

৫. "ওলী" অর্থে সাধক। "ওলী" একবচর, "আউলিয়া" বহুবচন।

অধুনা তাহাই উচাইল পরগণা বলিয়া খ্যাত। এই স্থানে উপস্থিত হইতে তাঁহারা রাজার পলায়ন বার্ত্তা জানিতে পারিয়া সগর্ব্বে রাজধানী প্রবিষ্ট হন ও সসৈন্যে তথায় বাস করেন। কিন্তু তত্রত্য জলবায়ু পাঠান সৈনিকদের পক্ষে বিষতুল্য হইল, বহুতর সৈন্য রোগে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, তখন বিচক্ষণ সেনানায়ক তৎক্ষণাৎ সেই বিষবৎ স্থান পরিত্যাগ করিলেন ও সসৈন্যে ইহার প্রায় কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী এক স্বাস্থ্যকর স্থানে চলিয়া গেলেন। লস্কর বা সৈন্যের অবস্থানের জন্য ঐ স্থান লস্করপুর নামে খ্যাত হয়। বিষবৎ প্রাণনাশক সেই অস্বাস্থ্যকর ও পরিত্যক্ত রাজধানী তদবধি বিষগ্রাম বা বিষগাও নাম প্রাপ্ত হয়।

সে যাহাহউক, এই বিজয় সংবাদ যথাকালে দিল্লী নগরে পৌঁছিলে, সম্রাট আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ সন্তুষ্ট হইয়া সেনাপতি নসিরউদ্দীনকে তরফ রাজ্যের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন।

ঐ স্থানের নাম তৎপূর্ব্বে তরফ ছিল না। আঠার মুড়ার রাজপুর বিজিগীষু দ্বাদশ আউলিয়ার আগমন সময়ে শাহগাজী আচাক নারায়ণের রাজ্যের প্রতি আঙ্গুলি-নির্দ্দেশ ক্রমে বলিয়াছিলেন, "ইস্ তরফ যাওগে"। ইহাতেই ঐ দেশ তরফ নামে খ্যাত হয় বলিয়া কথিত আছে।

তরফ তখন একটি বিস্তৃত রাজ্য ছিল; সরাইল—সতর খণ্ডল ও জোয়ানশাহী প্রভৃতি পরগণা তখন তরফের সামিল ছিল। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রথম মোসলমান শাসনকর্ত্তা সৈয়দ নসিরউদ্দীন সিপা-ই-সালার। তরফ জয়ের কয়েক বর্ষ পরে তিনি তোগলক বংশীয় শেষ নৃপতি মহমুদ শাহের সময়ে ১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে এক সনদ প্রাপ্ত হন, সেই সনন্দের বলেই তাঁহার রাজ্যসীমা বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

দ্বাদশ আউলিয়ার দরগা

নসিরউদ্দীনের সহিত যে দ্বাদশ আউলিয়া তরফে আগমন করেন; তাঁহাদের প্রভাবে তরফ বিজিত হওয়ায়, মোসলমান সমাজে উহা "বার আউলিয়ার মুলুক" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। তরফে মোসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই বার আউলিয়া ধর্ম্ম প্রচারার্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধ্যুষিত স্থানে এক একটি দরগা স্থাপিত হয়।

১. শাহগাজী—ইনি বিষগ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যান নাই; বিষগ্রামের সন্নিকটেই বাস করিতেন। তাঁহার বাসস্থান "গাজীপুর" বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। মৃত্যুর পর রাজার মণ্ডপ গৃহেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। ইহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আছে।

২. শাহ মজলিশ আমীন—ইনি উচাইল গমন করিয়াছিলেন; তথায় তাঁহার দরগা আছে। তত্রত্য সুবৃহৎ মসজিদ ও দীর্ঘিকা ইঁহারই প্রস্তুত।

৩. শাহ ফতেগাজী—তাঁহার বাসস্থান ফতেপুর বলিয়া খ্যাত। তৎসহ আহমদ গাজী ও মসউদ গাজী এই স্থানে একত্র বাস করিতেন। তাঁহার দরগায় তৎকৃত একটি মসজিদ আছে। ফতেগাজীর মৃত্যুর পর রঘুনন্দন পাহাড়ে তদীয় দেহ কবর দেওয়া হয়; সে স্থান জঙ্গলাকীর্ণ। আহমদ গাজীর কবর পাহাড়ের পার্শ্বে দৃষ্ট হয়। এই দরগা সাহাজী-বাজার ষ্টেশনের দেড় মাইল মাত্র দূরে; অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিনে গাজীর স্মরণার্থ এখানে একটি মেলা হয়।

৪. সৈয়দ শাহ সয়েফ মিন্নতউদ্দীন—লস্করপুরে বাস করেন; তথায় তাঁহার দরগা অবস্থিত। তাঁহার প্রপৌত্রই প্রসিদ্ধ শাহ দাউদ। দাউদের নামে তাঁহার বাসস্থান দাউদ নগর নাম প্রাপ্ত

৬. ক্ষেত্রের জল আটকাইবার জন্য যে বাঁধ দেওয়া হয়, তাহাই "আইল।" আল বা আইল আলবাস শব্দের অপভ্রংশ। আইলের প্রকৃত অর্থ এদেশস্থ সকলেই পরিজ্ঞাত। আইন-ই-আকবরি মতে, বঙ্গদেশের ভূমিতে "আল" থাকায় ইহা বাঙ্গালা দেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

হইয়াছে। ইহা পরে তরফ হইতে খারিজ হইয়া এক বিভিন্ন পরগণা বলিয়া খ্যাত হয়। দাউদ নগরের দরগায় একটি প্রাচীন পুষ্করিণীতে বহুতর গজার মাছ সর্ব্বদাই ভাসিয়া ফিরে। ইহা শায়েস্তাগঞ্জ ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। ধর্ম্মাত্মা দাউদের পুত্রের নাম সৈয়দ মহিব উল্লা ছিল। গুরুতা এই বংশের ব্যবসায়; তরফের সাত আনির ভূস্বামীগণ এই বংশের শিষ্য।

৫. শাহ তাজ উদ্দীন কুরেষি— চৌকি পরগণায় ইনি গমন করেন।

৬. শাহ আরফিন—ইনি লাউড়ে গমন করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। শাহ আরফিনের দরগা উত্তর অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

৭. শাহ রুকন উদ্দীন আসোয়ারি—ইনি সরাইল গমন করিয়াছিলেন, তত্রত্য শাহজাদপুরে তাঁহার দরগা আছে।

৮. শাহ মাহমুদ—লস্করপুরের নিকট উর্দ্দুবাজারের কাছে তাঁহার দরগা আছে।

৯. শাহ বদর—ইঁহার বাসস্থান বদরপুর। বদরপুর জংশনের অতি নিকটেই ইঁহার দরগা অবস্থিত।

১০. শাহ সুলতন—ইঁহার দরগা ময়মনসিংহের মদনপুরে অবস্থিত।

১১. শাহ বদর উদ্দীন—চট্টগ্রামে ইঁহার প্রসিদ্ধ দরগা আছে।

১২. নাম অজ্ঞাত—কুমিল্লার খড়মপুরে ইঁহার দরগা বর্ত্তমান।

লস্করপুর

তরফ জয়ের পর সৈয়দ নসিরউদ্দীন তরফের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি সৈন্যগণ সহ যে স্থানে বাস করিয়া রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হন, সে স্থান লস্করপুর নামে খ্যাত হয়, তাঁহার বৈদেশিক সৈন্যগণ উর্দ্দু ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, প্রধানতঃ সৈন্যদের দ্বারা লস্করপুরের সন্নিকটে যে বাজার বসিয়াছিল, তাহা উর্দ্দুবাজার নামে খ্যাত হয়। সৈয়দ নসিরউদ্দীনের শাসনে সত্বরেই তরফে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল; তিনি পূর্ব্ব কথিত কাজি নুরউদ্দীনের কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়া সেই বিষাদগ্রস্ত নিরাশ্রয় পরিবারকে সান্ত্বনা দান করেন।

নসিরউদ্দীনের কবর

নসিরউদ্দীন মধ্যে মধ্যে শ্রীহট্টে গিয়া শাহজলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। একদা তিনি এক স্বপ্ন দর্শন করেন, তাহাতে তাঁহার ধারণা জন্মে যে তিনি আর বাঁচিবেন না। স্বপ্ন দর্শনের পর তিনি শ্রীহট্টে গমন করেন ও হজরত শাহজলালকে এই অনুরোধ করেন, যেন মৃত্যুর পর তদীয় দেহ পীরমহল্লাস্থিত আদিনা মসজিদে রক্ষিত হয়। অতঃপর কিছুকাল রাজ্যভোগান্তে নসিরউদ্দীন পরলোক গমন করেন। তদীয় দেহ আদিনা মসজিদে রক্ষিত হইল, কিন্তু একটু পরেই তাঁহার শব আর পাওয়া গেল না। তখন শবের অভাবে শবাধারটির সমাধি দেওয়া হইল, সেই সমাধির চিহ্ন অদ্যাপি পীরমহল্লায় দৃষ্ট হয়।

নসিরউদ্দীনের পুত্র সিরাজউদ্দীন পিতৃবিয়োগের পর পিতৃপদের উত্তরাধিকারী হন। ইঁহার মুসাফীর ও ফকির নামে দুই পুত্র হয়। মুসাফীর পিতৃরাজ্য ভোগ করেন। তাঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সৈয়দ শাহ খোদাবন্দ রাজ্যলাভ করেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ইব্রাহিম খ্যাতনামা ব্যক্তি, তিনি বিদ্যার্জ্জন করিয়া দিল্লী হইতে "মালেক-উলমা" উপাধি প্রাপ্ত হন। কথিত আছে যে, ইনি বঙ্গাধিপতির দ্বিতীয় জেলাল উদ্দীনের প্রথমা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইব্রাহিম ও কালিদাস

অযোধ্যবাসী কালিদাস গজদানী নামক এক ব্যক্তি বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করেন ও মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বনে স্বীয় ভাগ্য পরিবর্ত্তনের চেষ্টা পান। এই কালিদাস, ইব্রাহিম খাঁ মালেক-উল-উলমা হইতে মোসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সোলেমান নাম ধারণ করিয়াছিল।[৭] ইঁহার পুত্রই বঙ্গীয় বারভূঞার অন্যতম প্রসিদ্ধ ঈশা খাঁ। ঈশা খাঁ সম্রাটের ফরমান প্রাপ্ত হইয়া সুবর্ণগ্রামের আধিপত্য লাভ করেন। ঈশা খাঁ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে রাজা মানসিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। ইহার বংশীয়গণ অদ্যাপি জঙ্গলবাড়ী ও হয়বৎ নগর প্রভৃতি স্থানে সসম্মানে বাস করিতেছেন।[৮]

"মুল্‌ক-উল-উলামা"

খোদাবন্দের পাঁচ পুত্র; তন্মধ্যে সৈয়দ শাহ ইস্রাইল অতি বিদ্বান ছিলেন; বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি "মূল্‌ক-উল-উলামা" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সুপ্রাঞ্জল পারস্য ভাষায় তিনি ৯৪১ হিজরীতে (খৃঃ ১৫২৩) "মদানেল ফওয়ায়েদ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।[৯] শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকার কর্ত্তৃক তৎপূর্ব্বে পারস্য ভাষায় অন্য কোন গ্রন্থ রচিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে খোদাবন্দ এই পুত্ররত্নকে রাজ্য প্রদান করেন, কিন্তু তিনি বিষয়-ভোগ অপেক্ষা বিদ্যাচর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনাই সমধিক ভালবাসিতেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ও অতি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এই তিন ভ্রাতা "আউলিয়া" হওয়ায়, চতুর্থ সৈয়দ মিকায়েল প্রকৃত পক্ষে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। এই জন্যই কনিষ্ঠ হইলেও, সাধারণ প্রজার কাছে তিনি "বড়মিয়া" উপনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে জ্যেষ্ঠানুক্রমিক সম্পত্তি

---

৭. মসনদ আলীর ইতিহাস ও শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় কৃত "সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস" (৫ম অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

৮. এই বংশীয়গণের একটি বংশ-শাখা এস্থলে দেওয়া গেলঃ–
কালিদাস গজদানী ওরফে সোলেমান।

- ঈশা খাঁ (মসনদ আলী)
  - আদাম খাঁ
  - বিরাম খাঁ
  - আবদুল্লা খাঁ
    - লতিফ খাঁ (হয়বৎ নগর)
      - খোদাদাদ খাঁ
    - মোহাম্মদ খাঁ (জঙ্গলবাড়ী)
      - ওলী, আলী এবং নেওয়াজ খাঁ
    - মনোহর খাঁ (দেওয়ান বাগ)
      - বুলবন খাঁ
        - আলীমর্দ্দন খাঁ
          - করমআলী খাঁ
            - ওমেদআলী খাঁ
              - হাসনআলী খাঁ
                - উমেদআলী খাঁ
    - শরিফ খাঁ

৯. এই গ্রন্থখানা তরফ–পৈল নিবাসী শ্রীযুত সৈয়দ এমদাদ-উল-হক সাহেব মহাশয়ের নিকট আছে। তিনি উহা মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।
তরফের বিবরণ সংগ্রহ বিষয়ে এই সদাশয় সৈয়দ সাহেব আমাদিগকে প্রচুর সহায়ত করিয়াছেন।

কনিষ্ঠ বংশগত[১০] হয়।

বেজোড়ায় ভ্রাতৃ হত্যা

মিকায়েলের চারি পুত্র,—নাজির খাঁ, আব্বাস বা দরওয়া খাঁ, মুসা, মিনা বা সুলতান। সৈয়দ আব্বাস একজন প্রকৃত বীরপুরুষ ছিলেন; তিনি স্বগুণে দিল্লীতে পরিচিত ও খ্যাতিমান হন এবং তত্রত্য জনৈক ওমরাহ তনয়ার পাণিগ্রহণ করিতে সক্ষম হন। তিনি রাজপ্রসাদ স্বরূপ সম্রাট হইতে শ্রীহট্টে প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া দেশে আগমন করেন। পূর্ব্বেই তাঁহার আগমন বার্ত্তা দেশে প্রচারিত হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাজির ঈর্ষা পরবশ হইয়া, তাঁহাকে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; এবং বাড়ী পৌঁছার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে তাঁহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া হত্যা করিলেন।

এই ব্যাপারে ওমরাহতনয়া অতিশয় মর্ম্মপীড়িতা হইলেন, তিনি আর স্বামী গৃহে গেলেন না; তথা হইতেই পুনঃ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। যে স্থানে এই ঘটনা সংঘটিত হয়,—স্বামী হইতে স্ত্রী চিরতরে বিযুক্ত হইয়া পড়েন, সেই স্থান তদবধি "বেজোড়া" নামে খ্যাত হয়। বেজোড়া বর্ত্তমানে এক বৃহৎ পরগণা।

সৈয়দ আব্বাস বা দরওয়াখাঁ দিল্লী গমনের পূর্ব্বে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তরফের গোগাওরা গ্রামে "দরওয়া খাঁর দীঘী" নামে এখনও তাহা বর্ত্তমান আছে। নরপতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা নাজির খাঁর দীঘী বর্ত্তমান, উহা অতি বিস্তৃত ও স্বচ্ছ সলিল সমন্বিত।

মিকায়েল পুত্রগণের উপর তুষ্ট ছিলেন না। সৈয়দ মুসা পিতার কথঞ্চিৎ প্রিয় ছিলেন বলিয়া, ইহাকেই তিনি সমস্ত অধিকার প্রদান করিয়া যান। মুসা সগৌরবে তরফ শাসন করিতে আরম্ভ করেন; এই সময়ে তাঁহার আদম নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

মহারাজ অমর মাণিক্যের তরফাক্রমণ

তরফের অধিপতিগণ দিল্লীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলেও সাক্ষাৎভাবে তাঁহারা ত্রিপুরাধিপতির প্রভাবাধীন ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় অধ্যায়ে অমর মাণিক্যের কথা বলা হইয়াছে, তিনি রাজ্যপ্রাপ্তির পর এক দীঘী খনন করাইতে ইচ্ছা করিয়া অধীন সামন্ত নৃপতি ও জমিদারবর্গকে মজুর পাঠাইতে আদেশ করেন; তরফের অধিপতিকেও মজুর পাঠাইতে বলা হয়, তরফের অধিপতি তাঁহার এ আদেশ গ্রাহ্য করেন নাই। মহারাজ অমর মাণিক্য ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিবার নিমিত্ত দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ত্রিপুর সৈন্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে তরফপতি পলায়ন করিলেন, সৈন্যগণ তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। তরফপতি স্বয়ং শ্রীহট্টের মোসলমান শাসনকর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।[১১] এই সূত্রে শ্রীহট্টের আমিল সহ অমর মাণিক্যের ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রথমতঃ ত্রিপুরাধিপতিই জয় লাভ করেন। মহারাজ অমর মাণিক্য তরফের উত্তরাধিকারীর মুক্তিদান করিয়া স্বীয় উদারতা প্রদর্শন করেন। এই উত্তরাধিকারীই মুসা তনয় সৈয়দ আদম।

সুলতান-শি

মুসা পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির অধিকার লাভ করিলে, তাঁহার ভ্রাতা মিনা ক্ষুব্ধ হইয়া তদুদ্ধারের জন্য দিল্লী গমন করেন। বহুদিন দিল্লী অবস্থিতি করিয়া বিবিধ কৌশলজাল বিস্তার ক্রমে তিনি

১০. এই প্রাচীন বংশাবলী খাঁ-পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। (২য় ভাগ ২য় খণ্ড)

১১. শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস ২য় ভাগ ৬ষ্ঠ খণ্ড ৬৯ পৃষ্ঠা দেখ।

কয়েকজন প্রধান আমীরকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের সাহায্যে তিনি সম্রাটকে জানাইলেন যে, মুসা অপুত্রকাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই তরফ রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

এইরূপে মিনা প্রবঞ্চনা ক্রমে দিল্লী-দরবার হইতে রাজ্যাধিকারের এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। মিনার রাজ্য লালসায় তরফের স্বাধীনতা এইরূপে সঙ্কোচিত করিয়া ফেলে। ইহার পূর্ব্বে যদিও তাঁহারা সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতেন, তথাপি রাজ্যের উত্তরাধীকারী নিয়োগ সময়ে কদাপি কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করিতেন না, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন।

মিনা ওরফে সুলতান দিল্লী হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আর পৈতৃক বাসভবনে গমন করেন নাই; তথা হইতে তিন মাইল দূরে এক নূতন আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। সুলতান দত্ত বলিয়াই হউক, কি তাঁহার "সুলতান" নাম হইতেই হউক, উক্ত স্থান তদবধি "সুলতান-শি" নামে পরিচিত হয়।

আরাকান-পতি সহ পরিচয়

দিল্লী হইতে আগমনের পর মিনা ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময় আরাকানের মগরাজের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ায়, মগরাজ তাঁহাকে এক মূল্যবান তরবারি উপহার দেন। সৈয়দ মুসাও আরাকান পতির পরিচিত হইয়াছিলেন। আরাকান পতির সহিত ইঁহাদের বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল; ইঁহারা প্রায়ই আরাকান রাজসভায় যাইতেন।

আরাকানের মন্ত্রী মাগণ ঠাকুর কাব্যামোদী ছিলেন, তাঁহার উৎসাহে মোসলমান বঙ্গীয় কবি আলাওল সাহেব "পদ্মাবতী" নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; এই গ্রন্থ ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে (হিঃ ১০৪৫) রচিত হয়। এই কবি সৈয়দ মুসার উপরোধে "সয়ফল মুলুক ও বদিউজ্জমাল" নামক পারস্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন। উহা মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পর সমাপ্ত হয়।[১২] মুসা সুদীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন এবং ত্রিশ বর্ষ কাল তরফ শাসন করেন।

মিনা বহু চেষ্টা করিয়াও পৈতৃক রাজ্য সর্ব্বাংশে অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। কখন নিজ প্রবঞ্চনা প্রকাশ পায়, এই ভয়ে তিনি সদা সতর্ক থাকিতেন। এই জন্য তিনি চর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং এই ভয়েই তিনি দিল্লী হইতেও সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারেন নাই। অচিরেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, উভয় ভ্রাতার সম্মিলনে, বিবাদ ভঞ্জন হইতে পারে নাই।

রাজ্য বিভাগ

তরফের অধিপতিদের ক্ষমতা পার্শ্ববর্ত্তী কোনও রাজা অপেক্ষা অল্প ছিল না, সুতরাং তরফের সম্পত্তিকে "রাজ্য" বলিতে আপত্তি নাই। মুসা ও মিনার পুত্রদের সময়ে এই সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বে মুসাপুত্র সৈয়দ আদমের নামোল্লেখ করা গিয়াছে। মিনা ইউনস ও ক্রিঞ্জিয়া নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতাই সুশিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের শাসন ক্ষমতা অধিক ছিল না। ইঁহারা (আদম ও ইউনস প্রভৃতি) পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, দেশ শাসনে মনোযোগ দিতে পারেন নাই; দেশে নানারূপ অশান্তি বিরাজ করিতেছিল; অরাজকতায় চৌর্য্য ও দস্যুতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

মিনার স্বীকৃত অর্থ দিল্লীতে প্রেরিত হইতে পারে নাই; এজন্য এ সময়ে দিল্লী হইতে জনৈক কর্ম্মচারী সসৈন্যে তরফ আগমন করেন।

১২. শ্রীযুত শিব রতন মিত্র সঙ্কলিত "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" (১৭ পৃষ্ঠা) দেখ।

মুসাপুত্র আদম উক্ত রাজ কর্ম্মচারীকে বিপক্ষ-পক্ষ সমর্থক জ্ঞানে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারী ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন, তিনি যথাযথো সংবাদ দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন; অনুষঙ্গে ইহাও জ্ঞাপন করিলেন যে, মিনার পুত্রগণই সুশিক্ষিত ও লোকানুরাগভাজন।

অতঃপর সম্রাট উভয় পক্ষকে দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া আদম ও মিনার তনয়দ্বয়, প্রত্যেকেই আপনাদিগকে প্রকৃত অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করতঃ অধিকার প্রাপ্তির আবেদন করিলেন।

মিনার পরিচিত কোন কোন ব্যক্তি তখনও সম্রাট দরবারে ছিলেন, প্রধানতঃ ইহাদের চেষ্টাতেই বিষয়টি আপোষে মীমাংসিত হইবার চেষ্টা হয়। তদনুসারে মুসাপুত্র আদম তরফের নয় আনা এবং মিনার তনয়দ্বয় সাত আনা অংশ ও প্রথম "রিয়াসত" (কর্তৃত্ব) প্রাপ্ত হন।[১৩]

রিয়াসত প্রাপ্তি সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। কে রিয়াসত পাইবে, ইহার মীমাংসার জন্য একটি পরীক্ষার আয়োজন হয়, একটি দীর্ঘ লৌহ শলাকা প্রোথিত করতঃ বলা হয় যে, উভয় পক্ষের মধ্যে যিনি লম্ফ প্রদানে উহা উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই প্রথম রিয়াসত পাইবার উপযোগী হইবেন। এতদশ্রবণে প্রাণের মমতায় আদম পশ্চাৎপদ হইলেন; কিন্তু মনা-পুত্র ইউনস সোৎসাহে অগ্রসর হইলে, সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরণ করতঃ প্রথম রিয়াসত প্রদান করিলেন। তদ্ব্যতীত মিনা-তনয়ের উপর দেশের দেওয়ানী বিচার ভার এবং আদমকে ফৌজদারী বিচারাধিকার প্রদত্ত হয়। এইরূপ মীমাংসায় মীনা তনয়দ্বয় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা সকলেই তরফ প্রত্যাগমন করেন।

মিনার পুত্রদ্বয় সুশিক্ষিত ও মিষ্টভাষী ছিলেন; তন্মধ্যে ক্রিঞ্জিয়া অতি ধীর প্রকৃতি ও পরোপকারী ছিলেন; তাঁহার মধুর ব্যবহার ও আলাপে মুহূর্ত্ত মধ্যে যে কোনও লোক তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িত। তাঁহাদের সদ্ব্যবহারে অনতিবিলম্বেই আদমের মনোমালিন্য দূর হইয়া উভয় পক্ষে সৌহৃদ্য সংস্থাপিত হয়। ইহাতে দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়ায়, দেশবাসী পরম সুখে কালযাপন করে। এই সময় ইউনসের মৃত্যু হওয়ায় ক্রিঞ্জিয়া অতিশয় বিষাদিত হন; কিন্তু আদম সহোদর-প্রেমের স্থলবর্ত্তী হওয়ায়, সেই দারুণ শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। তরফের তখন নামে মাত্র দুইটি বিভাগ ছিল।

আদম ও ক্রিঞ্জিয়া যথাক্রমে আহমদ ও মোহাম্মদ কুদ্দুস নামে এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। আহমদ নিতান্ত বিলাসপরায়ণ ছিলেন। মোহাম্মদের সে দোষ না থাকিলেও অযথা দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতেন। আহমদ, ফতা ও হেদায়েত উল্লা নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন; মোহাম্মদের একমাত্র পুত্রের নাম মোহাম্মদ আলাউদ্দীন।

আহমদের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে ফতা অতি বুদ্ধিমান ও চতুর ছিলেন, তিনি কনিষ্ঠ বৈমাত্রের ভ্রাতা হেদায়েত উল্লাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না।

---

১৩. সৈয়দ আবদুল আগফর কৃত তরফের ইতিহাস গ্রন্থের মতানুসারে এস্থলে বিরোধ মীমাংসার কথা লিখিত হইল; সৈয়দ এমদাদুল হক সাহেব আমাদিগকে যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা স্বয়ং "আপোষ মীমাংসা" করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। মুদ্রিত তরফের ইতিহাসে যে সকল তারিখের উল্লেখ আছে, তাহাও সবটি নির্ভুল নহে। সৈয়দগণের বংশাবলীর সহিত তাহার সামঞ্জস্য হয় না (খ-পরিশিষ্টে বংশপত্র দেখ)। এই ঘটনাটিকে রচয়িতা বহুপূর্ব্বে নিয়া ফেলিয়াছেন!

সৈয়দ নসিরউদ্দীন সিপা-ই-সালার শাহজলালের সমসাময়িক; তরফের ইতিহাসেও লিখিত যে ১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সনন্দ প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয়তঃ সৈয়দ ইস্রাইল ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে (৯৪১ হিঃ) গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহাদের সময় হইতে হিসাব করিলে (নসিরউদ্দীন হইতে ৬ষ্ঠ ও ইস্রাইল হইতে ৩য় স্থানীয়) আদম ও ইউনস প্রভৃতির সময়, মোগল সম্রাট আকবরের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না।

"তরফদার"

জ্যেষ্ঠতাত তনয় আলাউদ্দীনের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল না। কিন্তু আলাউদ্দীন নয় আনির মালীক, তিনি হেদায়েত উল্লার সহায় হইলে হেদায়েতকে তাঁহার ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না, এই দুরভিসন্ধি ও স্বার্থানুরোধে তিনি মনোভাব গোপন রাখিয়া আলাউদ্দীনের আনুগত্য স্বীকার করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে আলাউদ্দীন তাঁহার একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িলেন; কৌশলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। তখন ফতা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, বিবিধ ষড়যন্ত্রে, নানা কৌশলজাল বিস্তার করিয়া, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, অপরিণত বয়স্ক বালক হেদায়েত উল্লাকে পৈতৃক বাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিলেন! যে সম্পত্তি কেহ সঙ্গে আনে না, সঙ্গেও নিতে পারেন না; সেই সম্পত্তি ভোগের মোহ-মদিরা মানুষকে এইরূপই কুটিল, কৌশলী ও নরপশুতে পরিণত করে।

হেদায়েত উল্লা নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। পরে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্তির জন্য দিল্লীতে অভিযোগ করেন ও স্বীয় অংশ প্রাপ্ত হন। সুচতুর ফতা অধিকৃত সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইবার লক্ষণ দৃষ্টে আপোষ করিবার প্রস্তাব করেন। হেদায়েত উল্লা প্রমাদভীরু লোক ছিলেন, তিনি এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। ফতা হেদায়েত উল্লাকে সম্পত্তির "এক তরফ" বা একাংশ ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করিলে, নির্ব্বিবাদে তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন। অতঃপর এক বাটীতে বাস করা অনুচিত মনে করিয়া তিনি পৃথক বাটী প্রস্তুত করতঃ তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সম্পত্তির "এক তরফ" প্রাপ্ত হওয়ায় হেদায়েতের বংশীয়গণ "তরফদার" নামে কথিত হইয়া থাকেন।[১৪]

নরপতি নিবাসী "কুতুব-উল-আউলিয়া"

ইতিপূর্ব্বে বড়মিয়া বা মিকায়েলের কথা বলা গিয়াছে, তাঁহার ভ্রাতা মুলক-উল-উলামা উপাধিক ইস্রাইলের বিষয়ও বর্ণন করা হইয়াছে; ইঁহার এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম শাহ ইলিয়াস কুদ্দুস; ইনি মোসলমান শাস্ত্রে পারদর্শী ও মোসলমান ধার্ম্মিকগণের মুকুটমণি স্বরূপ ছিলেন। শ্রেষ্ঠতম সাধককে মোসলমানগণ "কুতুব" বলিয়া থাকেন, ইনি "কুতুব—উল-আউলিয়া" এই উচ্চতম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কুতুব-উল-আউলিয়ার নাম তরফ মোসলমান সমাজে গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে। খোয়াই নদীর তীরে এক নির্জ্জন কুটীরে তিনি সাধনা করিতেন। কথিত আছে, একদা রাত্রিকালে, আকাশ প্রান্ত উজ্জ্বল করিয়া চন্দ্রকিরণের ন্যায় এক জ্যোতিরেখা তাঁহার কুটীরে প্রবেশ করিয়াছিল, তদবধি তিনি "কুতুব-উল-আউলিয়া" নামে আখ্যাত হন এবং তাঁহার বাসস্থান "চন্দ্রচুরি" নামে খ্যাত হয়।

কুতুবের দরগা

কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেব পরলোক গমন করিলে, নরপতির নিকটবর্ত্তী মুড়ারবন্দ নামক স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়; তাহাতে ঐ স্থান "কুতুবের দরগা" নামে খ্যাত হয়; কেহ 'মুড়ারবন্দের দরগা" ও বলিয়া থাকে।

দরগাটি খোয়াই নদীর তীরদেশে অবস্থিত এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় পোয়া মাইল দীর্ঘ; এই স্থানে নসিরউদ্দীন সাহেবের পুত্র পৌত্রাদি ও অপর বহুতর সাধু মহাত্মার প্রায় শতাধিক "কবর"

---

১৪. বিশ্বকোষের ৫৬৮ পৃষ্ঠায় চট্টগ্রামস্থ তরফ ও তরফদারগণের বিষয়প্রসঙ্গে শ্রীহট্টের তরফদারের উল্লেখ আছে। তরফদার শব্দের প্রকৃত অর্থ ইহাই বোধ হয়। হুমায়ুনের সময়ে যাহারা গৌড় হইতে আগমন করতঃ চট্টগ্রামে ভূরি এক এক অংশ অধিকার করিয়াছিল, তাহারাই তথায় তরফদার বলিয়া কথিত হয়।

আছে।[১৫] দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও ধর্ম্মানুরাগী মোসলমানগণ "জেয়ারত" উপলক্ষে এ স্থানে সমাগত হইয়া থাকেন। কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের কবরের উপরস্থ প্রস্তর স্তম্ভে আরবি অক্ষরে কয়েক পংক্তি অঙ্কিত আছে, তাহা পাঠ করা যায় না।

গদাহাসন

কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের বংশধরগণ নরপতি নিবাসী। কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের পাঁচ পুত্র; জ্যেষ্ঠ শাহ খোন্দকার সমধিক প্রসিদ্ধ।[১৬] ইহার জুল্লুন, মোহাম্মদ, ও মুসা নামে তিন পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে মোহাম্মদের আট জন পুত্র হয়, ইঁহাদের মধ্যে গদাহাসন ও গিয়াস খ্যাতনামা। গদাহাসন একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন, তিনি প্রপিতামহের ন্যায় অনেক অসাধারণ কার্য্য করিয়া লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হন।[১৭] তাঁহারই নামে গদাহাসন নগর পরগণার নামকরণ হয়। তাঁহার নিকট হইতে একখানি তরবারি ও একটা অশ্ব উপহার পাইয়া, ত্রিপুরাবাসী সমসেরগাজী বিশেষ উৎসাহিত হন, ও তৎপ্রসাদে রোশানাবাদের অধিকার লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।[১৮]

সাধুলোকের কবরের পার্শ্বে মৃত্যুর পর দেহ রক্ষিত হওয়া মোসলমান সমাজে বাঞ্ছনীয়। কথিত আছে, কুতুব-উল-আউলিয়ার কবর পার্শ্বে কাহার শব সমাহিত হইবে, গদাহাসন ও তদীয় পিতৃব্যের (মুসার) পুত্র শাহনুরির মধ্যে এই বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়, বহু বাদ বিতণ্ডার পর এ প্রশ্নের মীমাংসা জন্য উভয়ে দিল্লী নগরে গমন করেন।

গদাহাসন সম্রাটকে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন পূর্ব্বক গদাহাসন নগর পরগণা তরফ হইতে খারিজ করিয়া লন; কিন্তু বিচারে শাহ নুরিরই জয় হয়। গদাহাসনের ভ্রাতাও এই সময়ে গিয়াস নগর পরগণা নিজ নামে তরফ হইতে খারিজ করেন।

এ বংশে অনেকেই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, ইঁহাদের প্রভাবে লস্করপুর ও সুলতানশির সৈয়দগণ তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তদ্ব্যতীত বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান বংশ প্রভৃতি ইঁহাদের শিষ্য। পরবর্ত্তী কালে এই বংশে শাহ সদর-উল-হাসন খ্যাতনামা ছিলেন। সদর-উল-হাসনের মাতা উচ্চবংশীয়া ছিলেন না বলিয়া স্ববংশীয়গণ তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি বিদেশে গিয়া বিদ্যার্জ্জন পূর্ব্বক সদর আমীনি পদ প্রাপ্ত হন। দশসনা বন্দোবস্তের সময় গদাহাসন নগর পরগণায় ইঁহার নামে "২নং তালুক সদর-উল-হাসনের" সৃষ্টি হয়।[১৯]

পৈল-বংশ

গদাহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী পিতৃব্য পুত্র সৈয়দ শাহ নুরি যে একজন উচ্চ শ্রেণীর সাধক ছিলেন, কুতুব-উল-আউলিয়ার কবর পার্শ্বে, মৃত্যুর পর সমাহিত হইবার অধিকার পাওয়ায়, মোসলমান

১৫. গ-পরিশিষ্টে দরগার নক্সা দ্রষ্টব্য। (২য় ভাগ ২য় খণ্ড)

১৬. দ্বিতীয় মুজলা খোন্দকার ময়মনসিংহের সিকান্দর নগর গমন করিয়া বাস করেন, এবং তৃতীয় মিয়া খোন্দকার ত্রিপুরার চান্দুড়ায় গমন করেন; ইঁহাদের বংশীয়গণ তত্তৎ স্থানে বাস করিতেছেন।

১৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৪র্থ ভাগে গদাহাসন ও শাহনুরির কথা কথিত হইবে।

১৮. শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাসের ২য় ভাগ ১০ম অধ্যায় ২২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই তরবারি আরাকানপতি, স্বীয় বন্ধু মিনাকে দিয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে তাহা গদাহাসনের হস্তগত হয়। এই তরবারি দৈবশক্তি বিশিষ্ট ছিল বলিয়া কথিত আছে।

১৯. বর্ত্তমানে এ বংশে সৈয়দ আলীকুল হাসন, সৈয়দ আব্দুল খয়ের ও ইসমাইল উদ্দীন প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন।

সমাজে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। শাহ নুরি দিল্লী হইতে নিজ নামে "নুরুল হাসন নগর" পরগণা খারিজ করিয়া, পৈলে আপনার বাসস্থান প্রস্তুত করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী পীরবাদশাহ তদ্বংশে একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন; পীরবাদশাহের প্রকৃত নাম জ্ঞাত হওয়া যায় না, তৎকৃত "গঞ্জেতরাজ" নামক পারস্য ভাষায় লিখিত তত্ত্ববিষয়ক একখানি গ্রন্থ আছে। পৈলে পীরবাদশাহের প্রাচীর বেষ্টিত দরগা মোসলমান সমাজে বিশেষ মান্য। লোকের বিশ্বাস যে, পীরবাদশাহের কবরের উপর তদ্বংশীহ কেহ একোত্তর শত কলস জল ঢালিলে অনাবৃষ্টি কালেও বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। পীরবাদশাহের দরগাতে তৎকৃত দুইটি পাকা মসজিদ আছে; ইহার সন্নিকটে (গ্রামের মধ্যে) প্রায় তিনপোয়া মাইল দীর্ঘ এক দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়, কথিত আছে, জনৈক ফকির উহা খনন করাইয়াছিলেন।

বুলবুলে বাঙ্গালা

এই বংশে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন; এই বংশীয় অনেকেই দিল্লীর সম্রাটকুমারদের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। শাহ আমানউদ্দীন নামক জনৈক কৃতবিদ্য ব্যক্তি দিল্লী হইতে এদেশে আগমন করেন, তিনি এই বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশে শাহ রেহানউদ্দীনের জন্ম হয়, তিনি পারস্য ভাষায় মনোহর কবিতা রচনা করিতেন, তাঁহার কবিত্ব শ্রবণে দিল্লীশ্বর তাঁহাকে "বুলবুলে বাঙ্গালা" উপাধি দিয়াছিলেন। পৈলের সৈয়দগণ সম্পত্তি অপেক্ষা বিদ্যারই সমধিক অনুরাগী ছিলেন; পীরবাদশাহের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র পারস্য ভাষায় স্বপ্নফল বিষয়ক এক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

দশসনা বন্দোবস্তের সময় এই বংশীয় রিয়াজউদ্দীন ও জয়েন-উল-আবেদীন বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের নামে যথাক্রমে ২০২ নং ও ২০৩ নং তালুকের সৃষ্টি হয়।

ক্ষমতার হ্রাসতা

প্রসঙ্গতঃ আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, অবান্তর ভাবে নরপতি ও পৈলের সৈয়দগণের বৃত্তান্তও কথিত হইয়াছে। মূল বিষয়ে মোহাম্মদ আলাউদ্দীন ও ফতার কথা কথিত হইয়াছে, ইঁহাদের সময় পর্য্যন্ত তরফের স্বাধীনতা একরূপ অব্যাহত ছিল, তখনও তাঁহারা দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, তখনও তাঁহারা জমিদার শ্রেণীতে গণ্য হন নাই, তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা সাধারণের নিকট "দুনিয়ার মালীক" বলিয়া বিবেচিত হইতেন; সুতরাং তরফের স্বাধীনতার ইতিহাস সেই সময় পর্য্যন্তই বিবেচিত হইতে পারে।

আলাউদ্দীনের পুত্র মোহাম্মদ হাসন ও ফতা-তনয়ের নাম নাসির। ইঁহাদের সময়ে কানুনগোদের উপরে তরফের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পিত হওয়ায়, তাঁহাদের ক্ষমতা বিশেষরূপ হ্রাসতা প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের পুত্রগণ সাধারণ ভূম্যধিকারীর ন্যায় "চৌধুরী" উপাধি ধারণ করতঃ ম্লানভাবে প্রতিপত্তি বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাঁহাদের বংশবৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে ৩য় ভাগে বর্ণিত হইবে।

হাসনের এক মাত্র পুত্রের নাম মোহাম্মদ মুসিম; এবং মোহাম্মদ নাসিরের পুত্রদ্বয়ের নাম মোহাম্মদ বাসির ও মোহাম্মদ আসির ছিল। তন্মধ্যে অপুত্রকাবস্থায় বাসিরের মৃত্যু হওয়ায় আসিরই সাত আনির সর্ব্বময় মালীক হন।

আসির বিদ্বান ও দয়াবান ব্যক্তি ছিলেন, হিন্দু মোসলমানকে তিনি সমভাবে দর্শন করিতেন,

তিনি মোসলমানদিগকে যেমন "চেরাগী" "শিণি" ইত্যাদি বিষয়ে বিবিধ ভূমিদান করিয়াছেন, হিন্দু সাধু বৈষ্ণবদিগকেও তেমনি দেবত্র, ব্রহ্মত্র ইত্যাদি প্রদান করিয়া সমদর্শিতা ও উদারতার উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন।[২০]

পক্ষান্তরে নয় আনির মালীক মোহাম্মদ মুসিম মিথ্যা জাঁকজমক প্রিয় ও অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন, তাঁহার অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বহু ভদ্রলোক লস্করপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে স্থাপন করেন। এই সময়ে সুলতানশি ও লস্করপুরের এজমালী সম্পত্তি বিভাগ করা হয়। কিন্তু বণ্টন কার্য্য নির্দ্দোষরূপে সম্পাদিত হয় নাই, সুলতানশি বা সাত আনির অংশে বহুতর বিল, ঝিল ও পাহাড়াদি পতিত হয়, সুতরাং উপযুক্ত আয় হইত না। নয় আনির অংশে ভাল ভূমির বাহুল্যে আয়ের পরিমাণ অধিক হইলেও, মুসিম বৃথা ব্যয়ে তাহা উড়াইয়া দিতেন। কাজেই সরকারী রাজস্ব বাকী পড়িতে আরম্ভ হয়। "তরফের ইতিহাসে" লিখিত হইয়াছে যে এই সময় "রাজস্ব পরিশোধ করিতে না পারিয়া উভয় হিস্যার জমিদারেরা কিছু কিছু দিন শ্রীমন্দিরে বাস করিয়াছিলেন।" দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় তরফ হইতে ফয়জাবাদ,[২১] পুটিজুরী প্রভৃতি আরও চারিটি পরগণা খারিজ হইয়া যায়।

অধঃপতনে অধিক দম্ভ

মুসিমের সৈয়দ মুসারজা, মোহাম্মদ রজা প্রভৃতি পাঁচ পুত্র হয়, তন্মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ বংশহীন। সুলতানশি বাসী আসিরের মোহাম্মদ নাজির ও মোহাম্মদ হাজির নামে দুই পুত্র ছিলেন। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহৃদ্য ছিল না। সম্পত্তি হ্রাস হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহাদিগকে অভিমানী করিয়া তুলিয়াছিল, প্রত্যেকেই আপনাদিগকে "প্রভু" বলিয়া বোধ করিতেন। কার্য্যকরী শক্তির অভাবে একদিকে তাঁহারা যেমন অলস, বিলাসরত ও আমোদপ্রিয় ছিলেন, অপর দিকে তেমনই দাম্ভিক, ক্রোধী ও পরস্পর বিবাদশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ঘরে যখন অলক্ষ্মী প্রবেশ করে; যখন উদ্যোগী কর্ম্ম তৎপর ব্যক্তিগণের পরিবর্ত্তে অলস ব্যক্তিগণ জন্মিতে থাকে, তখন শূন্য পাত্রের গভীর শব্দের ন্যায় তাঁহাদেরও বৃথা গর্ব্ব প্রকাশই সার মাত্র থাকে। ইঁহাদের গর্ব্বাতিশয্য অন্তঃপুরেও সংক্রমিত হইয়াছিল, কথিত আছে যে কোন প্রতিবেশী রমণী মুক্তাগ্রথিত নথ নাকে অন্তঃপুরে গিয়াছিলেন বলিয়া, নয় আনির বিবি অপমান করিয়াছিলেন!! কিন্তু সেই অধঃপতিত অবস্থায়ও সৈয়দগণের দাতৃত্বের অভাব দৃষ্ট হয় নাই।[২২]

মুসারজার মদনরজা ও আলীরজা নামে দুই পুত্র হয়; এবং তাঁহার ভ্রাতা মোহাম্মদ রজার আহমদ রজা, হামিদ রজা প্রভৃতি চারি পুত্র ছিলেন। নয় আনির অংশে এই ছয় ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আহমদ রজা ও হামিদ রজা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, তাঁহাদের প্রতাপে নিকটবর্ত্তী জমিদারগণ কম্পিত কলেবর হইতেন। হামিদ রজা লেখাপড়া জানিতেন না, অন্যান্য সকলেই পারস্য ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন, বিশেষতঃ আলী রেজার হস্তাক্ষর অতি মনোহর ছিল। সাত আনির অংশাধিকারী সৈয়দ নাজিরের মোহাম্মদ বাতির ও মোহাম্মদ নাতির নামে দুই পুত্র হইয়াছিল।

---

২০. মাছুলিয়ার রামকৃষ্ণ গোসাঞির আখড়া, চকহায়দরের আখড়া, ভাদৈব আখড়া ও কুমড়ার দেবালয় প্রভৃতি তাঁহার দাতৃত্বে বিশেষ আনুকূল্য লাভ করে।

২১. ভাদেশ্বরবাসী সাকির আলী খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাবের শিক্ষক ছিলেন, তিনি ফয়জাবাদে সৈয়দদের দৌরাত্মের কথা নবাবের গোচর করেন; ইঁহার আবেদন মূলেই ফয়জাবাদ সৈয়দদের হস্তচ্যুত হয়।

২২. গোপীনাথের আখড়া, বড়চরের আখড়া, বালিয়াড়ীর জায়গীর ও আলাপুরের জায়গীর প্রভৃতির নামই যথেষ্ট। তদ্ভিন্ন আরও অনেক দান করিয়া কথঞ্চিৎ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তরফের অবশিষ্ট কথা

রামশ্রীর খোন্দকারদের বিবরণ

তরফের রামশ্রীবাসী সৈয়দগণ ভিন্ন বংশীয় হইলেও ইঁহাদেরও দেশে যথেষ্ট সম্মান আছে। সৈয়দ সিরাজউদ্দীন নামক জনৈক সাধু তরফ হইতে উচাইলে গমন করতঃ তথায় বিবাহ করেন ও কতক ভূসম্পত্তি লাভ করেন; ইঁহার বংশে মোতিওর রহমান খোন্দকারের জন্ম হয়। মোতিওর রহমান অতি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার গুণে ত্রিপুরেশ্বর মোহিত ছিলেন ও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তরফের সাত আনির জমিদার মোহাম্মদ বাতির ও নাতির তাঁহার উপরে কতক দিন জমিদারির সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহার গুণগ্রামে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন, মুর্শিদাবাদ হইতে সত্বরেই তাঁহার উপর রাজকীয় তহশীল কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। এই পদ লাভ করিলে তাঁহাকে সাত আনির কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন রাজকীয় তহশীল কার্য্যালয় তরফেই ছিল, এবং তাঁহাকে তরফেই থাকিতে হইত। তরফের জমিদারের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, এই জন্যই রামশ্রীর খোন্দকারদের কথা এ স্থলেই লিপিবদ্ধ হইল।

মোতিওর রহমানের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ তোতিওর রহমান পিতার সঙ্গে তরফেই থাকিতেন। মধ্যম রিয়াজুর রহমান ১০ জলুস ১৭ই শফর তারিখে (সম্রাট শাহ আলম দ্বিতীয়ের রাজত্বের দশম বর্ষে—১৭৭০ খৃষ্টাব্দে) বালিশিয়ার চৌধুরাই প্রাপ্ত হন, এবং কনিষ্ঠ নেয়াজুর রহমান তত্রত্য কানুনগো নিযুক্ত হন। ফলতঃ বিদ্যাগৌরবে ইহারা সকলেই খ্যাতনামা হইয়াছিলেন। ইঁহারা বিনীত ও মিষ্টভাষী ছিলেন এবং অচিরাৎ প্রভূত ধন উপার্জ্জন ক্রমে বালিশিরা, বামৈ ও বেজোড়া প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত জমিদারী অর্জ্জন করেন।

মোতিওর রহমানের নামানুসারে বালিশিরার মোতিগঞ্জের বাজার স্থাপিত হয়; রিয়াজুর রহমানের নামে রিয়াজপুর পরগণা ও রিয়াজ নগরের নামকরণ হয়। কনিষ্ঠ নেয়াজুর রহমানের নামানুক্রমে নেয়াজপুরের নাম হয়। তদ্ব্যতীত বালিশিরার ২নং এবং উচাইলের ১নং তালুক মোতিওর রহমানের নাম ঘোষণা করিতেছে। রিয়াজুর রহমানের নামে বালিশিরার ৩নং এবং গদাহাসন নগরের ৩০নং, ৩১নং তালুকের নামকরণ হইয়াছে।

তরফে গৃহ-বিবাদ ও মোতিওর রহমান

সে যাহা হউক, লস্করপুরের জমিদার পূর্ব্বোক্ত মদনরজার বৈমাত্র ভ্রাতা আলীরজার মাতা মোগল বংশীয়া ছিলেন বলিয়া, আলীরজা জ্ঞাতিগণের নিকট নিন্দিত ও ঘৃণাস্পদ ছিলেন; আলীরজা এই কারণে ভ্রাতৃবর্গ কর্ত্তৃক পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত হন। আলীরজা সহায় সম্পদ হীন হইয়া খোন্দকাব মোতিওর রহমানের শরণাপন্ন হন।

মোতিওর রহমান আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিলেন না; তিনি আলী রজার পক্ষাবলম্বন করিয়া

মদন রজা প্রভৃতি সকলেরই বিরাগ ভাজন হইলেন। যে আহমদ রজার বিরাট বপু ও বিকট বদন দর্শনে লোক ভয়ে বিকম্পিত হইত, যিনি অসামান্য দৈহিক বলে অত্যুচ্চ প্রাচীর সলম্ফে উলজ্ঘন করিতে পারিতেন, যাঁহার প্রতাপে সুলতানশি, জোয়ান শাহী, ভাগলপুর, ঔরঙ্গপুর প্রভৃতির জমিদারবর্গ ত্রাসিত রহিতেন, কোন কারণে একদা যিনি ঐধঙ্গপুরের জমিদারকে ধৃত করিয়া আনিতে অনুমাত্র ইতস্তত করেন নাই, ন্যায়ের অনুরোধে,—আশ্রিত ও প্রপীড়িতকে রক্ষার জন্য মোতিওর রহমান সেই দুর্দ্ধর্ষ আহমদ রজা ও তাঁহার সহোদর হামিদরজা এবং অপর ভ্রাতৃবর্গের প্রতিকূলে একাকী উত্থিত হইলেন। তাঁহার উদ্যোগে আলীরজা দিল্লী হইতে চৌধুরাই সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, মোতিওর রহমান অতঃপর আলীরজার প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ উদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিকার করিতে লাগিলেন।

মোতিওর রহমানের এই কার্য্যে ভীষণ বিপদ ডাকিয়া আনিল, নয় আনির জমিদারগণ তাঁহার কার্য্যে বিজাতীয় ক্রোধে জ্বলিত লাগিলেন; ক্রোধের দারুণ দংশনে অস্থির হইয়া সপুত্র মোতিওর রহমানকে তাঁহারা সংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

যুদ্ধোদ্যোগ

তখন যুদ্ধের আসুরিক আয়োজন হইতে লাগিল। খোন্দকার এই সময় নিজ বাটীতে গিয়াছিলেন, তিনি তরফের নবাবি কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলেই হত্যা করা হইবে, স্থির হইল। মোতিওর রহমান এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন, কিন্তু বিশ্বাস করিলেন না। নবাবি কাছারী আক্রমণ করিয়া, কর্ম্মচারীকে লাঞ্ছিত করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও নাই; এই ভাবিয়া তিনি তরফে গমন করিলেন। এদিকে পূর্ব্ব পরামর্শনুসারে জমিদারগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন; আহমদরজা স্বয়ং ধনুর্ব্বান ধারণ করিলেন, হামিদরজার দুই হাতে দুখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি জ্বলিতে লাগিল এবং পৃষ্ঠদেশে সচন্দ্র বৃহৎ ঢাল শোভা পাইল। এইরূপে আহমদ রজা স্বয়ং সেনাপতি বেশে বহুলোক লইয়া যাত্রা করিলেন।

ভাবানীদের ও সাহেবরাম নামক দুই ব্যক্তি কতক খাসিয়া সৈন্যের অধিনায়ক রূপে তাঁহাদের সহিত চলিল। লাখু ও বাখর মোহাম্মদ বরকন্দাজ সৈন্যের ভার পাইয়া সমর সাজে ধাবিত হইল। শফরউদ্দীন কাড়াদার রণবাদ্য (কাড়া ও ঢাক প্রভৃতি) বাজাইয়া অগ্রে অগ্রে সদলে চলিল। এইরূপে তাহারা নবাবি কাছারীর সন্নিকটবর্ত্তী হইল।

লস্করপুরের যে স্থানে মুনসেফী কাছারী ছিল, পূর্ব্বে সেই স্থানেই নবাবি তহশীল কার্য্যালয় ছিল। খোন্দকার, শিকদার, কাজি প্রভৃতি রাজকীয় কর্ম্মচারীবর্গ ঐ স্থানে বাস করিতেন। কাজি বিচার বিভাগে কর্ম্ম করিতেন, শিকদার গ্রাম্য হাকিমের উপাধি ছিল। তৎকালে কৃষ্ণ শিকদার নামক এক ব্যক্তি তরফে থাকিতেন। ঐ একই স্থানেই লস্করপুর ও সুলতানশির জমিদারদের কাছারী থাকায় ঐ স্থান সহর তুল্য ছিল ও লোকারণ্যের কোলাহলময় থাকিত।

আহমদ রজা প্রভৃতি কাছারীর সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন, খোন্দকারের চর চান্দখাঁ তাঁহার কাছে তখন এই সংবাদ প্রদান করিল; খোন্দকার ভাবিলেন, ইহারা ভয় প্রদর্শন মাত্র করিতেছে, দলবল সহ নিজ কাছারীতেই উঠিবে; সুতরাং নির্ভীকচিত্তে বলিলেন "কাছারীতে উৎপাত করে, কাহার সাধ্য। যদি আসে, প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিবে।" এতদ্ব্যতীত কোন পাইক বরকন্দাজকে তিনি বিশেষ ভাবে কোনও আদেশ দিলেন না,—কাছারী রক্ষার কোনরূপ বন্দোবস্ত হইল না।

যুদ্ধ

পরক্ষণেই অগ্রগামী আক্রমণকারীগণের আস্ফালন ও চিৎকার ধ্বনি শুনা গেল, কাড়ার কর্কশধ্বনি চতুর্দ্দিকে শব্দিত হইতে লাগিল; কাছারী যথারীতি আক্রান্ত হইল। কিন্তু মোতিওর রহমান তখনও ভীত হইলেন না, তিনি শান্তভাবে সময়োপযোগী বাক্য বলিয়া দূত পাঠাইলেন, বলিলেনঃ—"আহমদ রজা ও হামিদ রজা দেশের কর্ত্তা, যাহা অভিপ্রায় এইক্ষণে করিতে পারেন, অতএব আমার প্রাণবধ না করিয়া সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করুন। প্রাণবধ করিলে পশ্চাৎফল শুভ হইবে না, সরকারী কর্ম্মচারীর অস্থিখণ্ড ও প্রতীকার পরায়ণ হয়।"

তখন কাহার কথা কে শুনে? ক্রোধের প্রবল উত্তেজনাকালে লোকের যদি ভবিষ্যৎ জ্ঞান বিলুপ্ত না হইত, তবে পৃথিবীর অনেক পাপ কমিয়া যাইত। খোন্দকারের সত্য কথা তখন কে বিচার করে? তখন কেবল হিংসার কঠোর তাড়না, জিগীষা বৃত্তির প্রবল উত্তেজনা।

শিকদারও দূতমুখে আক্রমণকারীদিগকে জানাইলেন যে, নবাবি কাছারী আক্রমণ করা অকর্ত্তব্য। তদুত্তরে হামিদরজা বলিয়া দিলেন—"রাজকীয় কার্য্যালয় নষ্ট করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, শিকদারের সহিত তাঁহাদের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, আত্মহিত কামনা করিলে শিকদারের উচিত যে কাছারী হইতে স্থানান্তরে গমন করেন।"

এই সময় মধ্যে আক্রমণকারীগণ কাছারী প্রবেশের পন্থা করিয়া লইল। খোন্দকারের অধীনে তখন কাছারীতে ৪০০ শত মাত্র সৈন্য উপস্থিত ছিল, তাঁহার 'রায় বাঁশিয়া'গণ মুহূর্ত্তে বিলম্ব না করিয়া আক্রমণকারীদের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল; কিন্তু প্রতিপক্ষীয় বরকন্দাজ সৈন্যচালক বাখর মোহাম্মদের গুলিবর্ষণে আহত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তদৃষ্টে কতকজন বরকন্দাজ সিংহদ্বার উদঘাটন পূর্ব্বক আক্রমণকারীদের প্রতি গুলি ছুড়িতে লাগিল। অবশিষ্ট লোকেরা গুলি বর্ষণ করতঃ আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইল।

একটি গুলি লাগিয়া স্বয়ং হামিদরজা আহত হইলেন, আর একটা অগ্নিগোলক খাসিয়া সৈন্য-নায়ক সাহেব রামের গলদেশে পতিত হইলে সে তৎক্ষণাৎ পতিত হইল, আরও কেহ কেহ আহত হইল। আহমদ রজা ইহাতে অনুমাত্র ভীত হইলেন না, ভ্রাতার অবস্থাদৃষ্টে তাঁহার ক্রোধ—বহ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিল, তিনি ঝড়ের ন্যায় ধাবিত হইয়া নিমেষ মধ্যে কাছারীতে প্রবিষ্ট হইলেন।

জিঘাংসা-পরায়ণ উন্মত্ত সৈনিকদের গুলিবর্ষণে, শরাঘাতে ও যষ্ঠি প্রহারে খোন্দকারের রক্ষকগণ তিষ্ঠিতে পারিল না, পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। খোন্দকারের রক্ষার আর উপায় থাকিল না।

কে কাহাকে মারে স্থির নাই; কেবল মার মার কাট কাট ধ্বনি,— কেবল গুলি গুম গুম ও কড়ার কড় কড় শব্দ, কেবল সৈন্যগণের তুমুল কোলাহল। রণের ভীষণতায় ত্রাসিত হইয়া সাত আনির নায়েব গোলাম নবি, নয় আনির নায়েব শেখ বুরহান উল্লা এই সময়ে পলায়ন করিলেন। লাখু সর্দ্দারের রায়বাঁশ প্রহারে সৈয়দ মোহাম্মদ আদম চৌধুরী নামক জনৈক কর্ম্মচারী নিহত হইলেন। এই সময়ে বিবাদের মূল কারণ সৈয়দ আলীরজা ভীত হইয়া এক নির্জ্জন গৃহে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, দুই জন খাসিয়া সৈনিক তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে ধৃত করতঃ হত্যা করিল। নিরস্ত্র নির্ভীক খোন্দকার সাহেব তখনও নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন!! তখনও তাঁহার মুখমণ্ডলে ভয়ের চিহ্ন নাই! এই অতুল্য সাহসী পুরুষকে সাহেবউদ্দীন ও বীরখাঁ নামক দুইটি আফগান বধ করিতে গিয়া তাঁহার ধৈর্য্য দৃষ্টে মুহূর্ত্ত জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, বুঝি বা অস্ত্রাঘাত করিতে ইচ্ছা হইল না, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল ও প্রশান্তমূর্ত্তি

খোন্দকার সাহেবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল!! তোতিওর রহমান পলাইতে ছিলেন, লাখু সর্দ্দার তাঁহাকে ধরিয়া হত্যা করিল। রাজকীয় অন্যান্য কর্ম্মচারীদের মধ্যে কাজি ও শিকদার ধৃত ও বন্দী হইয়া লস্করপুরে নীত হইলেন।

খোন্দকারের পক্ষীয় ৩৫ ব্যক্তি নিহত ও অনেক লোক আহত হয়।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে স্বয়ং খোন্দকার ও তাঁহার পুত্র; যাঁহার জন্য এই বিভ্রাট উপস্থিত হয়, সৈয়দ বংশীয় সেই আলীরজা; সৈয়দ মোহাম্মদ আদম চৌধুরী নামক জনৈক কর্ম্মচারী এবং স্বপক্ষীয় ও সহায়তাকারী মোহাম্মদ আজগর, মির্জ্জা জুলফক্কার ও সুরত সিংহ (ওরফে মাণিক বাবু) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন।

আক্রমণকারীদের মধ্যে সাহেব রাম সর্দ্দার প্রমুখ তিন ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে এবং স্বয়ং হামিদরজা সাহেব ও কয়েকজন সৈনিক আহত হয়।

রণজয়ের পর আহমদরজা, বিপক্ষীয় হতাহত সকলকে লইয়া বাড়ী আসিলেন। অনতি বিলম্বেই অন্দর মহলের উত্তর দিকে দুইটি গর্ত্ত খনন করা হইল; তাহার একটিতে খোন্দকার সাহেব, তাঁহার পুত্র ও আলীরজার দেহ এবং অপরটিতে অবশিষ্ট হত ব্যক্তিবর্গের শব প্রোথিত করাইলেন। মুমূর্ষ যে সকল কাফ্রি চাকরাদি আহত অবস্থায় লস্করপুরে নীত হয়, এই সময় তাঁহাদিগকেও বধ করিয়া ঐ একই গর্ত্তে প্রোথিত করা হয়! হায়, যে মানুষ দেব প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, স্বার্থ সাধন ও হিংসা পরায়ণতা তাহাদিগকে এইরূপ পশু মধ্যে পরিগণিত করে, এইরূপেই তাঁহারা ভ্রাতৃশোণিত পানে আত্ম-তর্পণ করে।

বিলুণ্ঠন

হতভাগ্য হতাহতের এই ব্যবস্থা করিয়া আহমদ রজা ও হামিদরজা ১২৫ জন বলবান সৈন্য সহ ভবানী দেবকে খোন্দকারের বাড়ী লুণ্ঠন জন্য রামশ্রী প্রেরণ করিলেন। আলীরজার জমিদারী উদ্ধারের অস্ত্র,—চৌধুরাইর সনন্দ রামশ্রীতে রক্ষিত ছিল, সর্ব্বাগ্রে তাহা সংগ্রহের প্রয়োজন; এই জন্য ভবানীদের প্রতি বিশেষ আদেশ ছিল।

বার্ত্তাবাহক মুখে রিয়াজুর রহমান এই যুদ্ধ বার্ত্তা এবং পিতা ও ভ্রাতার নিধন সংবাদ প্রাপ্তে অন্তঃপুর মধ্যে বিষাদিত চিত্তে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন। লালা সাহেব, মীর কিয়ামউদ্দীন ও হাশিম ঠাকুর নামক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্রয় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন; খোন্দকারদের সরকার মতিরামও সেখানে উপস্থিত ছিল।

বিজয়ী বিপক্ষগণ কখন কি করিবে বলা যায় না, অতএব সত্বর অর্থাদি রক্ষার সদ্ব্যবস্থা করা সঙ্গত, বুদ্ধিমান মতিরাম এই কথা বলিলে, রিয়াজুর রহমান বহির্ব্বাটী হইতে তৎসমস্ত তাঁহার কাছে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

মতিরাম বহির্ব্বাটীতে গিয়া অনন্তরাম তহবিলদার সহ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বহুতর থলিয়া এবং মূল্যবান বস্ত্রাদি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল; তাহারা পুনঃ পুনঃ করাঘাত করাতেও কেহ ভিতর বাটীর দ্বারোদঘাটন না করায়, পুনশ্চ বহির্ব্বাটীয় গিয়া তাহারা তৎসমস্ত যথাস্থানে রাখিয়া দিল। ইহার পরক্ষণেই লাখু প্রভৃতি বিপক্ষ সৈন্যগণ আসিয়া বহির্ব্বাটী বেষ্টন করে ও দ্বার উন্মোচন করিতে বলে।

অনন্তরাম দ্বার খুলিয়া দিয়াই পলায়ন করিল। লাখু গৃহে প্রবিষ্ট হইল এবং মতিরামের পাগড়ী, কুর্ত্তা ইত্যাদি ছিন্ন করিয়া, তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। ভবানীদের লাখুকে বারণ

করিয়া, মতিরামকে ছাড়িয়া দিবার কালে, তাহার বস্ত্র মধ্যে ষোলভরি স্বর্ণ ও এক মোহর প্রাপ্ত হইল। ইহার পর সিন্ধুকের সমস্ত দ্রব্যই লুণ্ঠিত হইল।

লুণ্ঠনকারীরা তৎপর সিংহদ্বার ভগ্ন করিয়া খোন্দকার মহলে প্রবিষ্ট হইল ও অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের জিগীষাবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইল না। যখন মানুষের মনে পশুভাব প্রবল হয়, তখন হিতাহিত জ্ঞান ত থাকেই না, পরন্তু ইহার শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে অভিলাষ জন্মে; লুণ্ঠনকারীরা অতঃপর অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিতে লাগিল। খোন্দকার-পুত্র প্রভৃতি সকলেই তখন অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা যখন অন্দর রক্ষার উপায় দেখিলেন না, তখন শাহজলাল সাহেব নামক তাঁহাদের জনৈক কুটুম্ব পূর্ব্বোক্ত সনন্দ সহ মূল্যবান বহুদ্রব্য পূর্ণ এক সিন্দুক প্রাচীরের উপর দিয়া প্রেরণ করিলেন; ভবানীদের ঐ সমস্ত দ্রব্য ও বন্দী মতিরাম সরকারকে পাঁচজন দেশওয়ালীর সংরক্ষণে লস্করপুরে পাঠাইয়া দিল।

লস্করপুর গিয়া মতিরামের লাঞ্ছনার শেষ হইল না, খোন্দকারের গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান অথবা দশ সহস্র টাকা নজর দানের জন্য প্যাদাগণ তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল; মতিরাম নিঃশব্দে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিল, অবশেষে হামিদরজার দয়াবতী মাতা, মাত্র দশ মুদ্রা নজরে তাহাকে মুক্তি দেওয়াইলেন।

সাত আনির সৈয়দ নাজির চৌধুরীকে আহমদ রজা প্রভৃতির মনোরক্ষা করিয়া চলিতে হইত। হামিদরজার অনুরোধে তিনি ও জিকুরাবাসী সোণাউল্লা লস্কর তালুকদার খোন্দকারের পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করিতে লস্করপুর হইতে রামশ্রী প্রেরিত হইলেন, এবং 'বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, শোক করা বৃথা" ইত্যাদি সময়োচিত বাক্যে, আহমদ রজা প্রভৃতির পক্ষে প্রবোধ দিলেন! তরফে ভদ্র পরিবারগুলি মধ্যে পরস্পরের বিপদে সমবেদনা প্রকাশ করা চিরন্তন রীতি ছিল, সেই রীতি রক্ষা করিয়া এইরূপ প্রবোধ দান করা ভদ্রতার অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন,— বিদ্রূপ জন্য নহে।

যে সময়ের কথা বর্ণিত হইল; তখন মোসলমান রাজত্বের ভগ্নাবস্থা; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন দেশে নিজ ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন। শাসন ক্ষমতা নবাবের হাতে ছিল বটে, কিন্তু কোন গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হইলে, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্ম্মচারীও তাহাতে যোগ দিতেন।

অভিযোগ

খোন্দকার পরিবারের উপর যে নৃশংস অত্যাচার হয়, তাহার প্রতিকারার্থে রিয়াজুর রহমান, আহমদ রজা প্রভৃতির উপর অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। মুর্শিদাবাদের ফৌজদারী আদালতের "বৈঠকে" ১১৮১ বাঙ্গালার (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ) ১৭ই পৌষ তারিখে তিনি নিজ জবানবন্দি লিখিত ভাবে দাখিল করেন। এই বৈঠকে ইংরেজ কর্ম্মচারী সার কলুবর সাহেব, এবং কাজি মোহাম্মদ জরিপ, কাজি হোসেন উদ্দীন, মুফতী আবুল মুজঃফর, মৌলবী আব্দুল্লা ও আলিমউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। খোন্দকার রাজকীয় কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া ইহা একটি গুরুতর ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এই বৈঠকে উপস্থিত সার কলুবরের নাম করা গিয়াছে, কোন বিশেষ বিষয়ের বিচার কার্য্যে কোম্পানীর পক্ষেও এক এক জন বিচারক উপস্থিত থাকিতেন, ইনি সেই ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অভিযোগ উপস্থিত হইলে সরেজমিন (ঘটনাস্থল) তদন্তক্রমে আসামী ধৃত করার জন্য দেলওয়ার খাঁ সেনাপতি, সদর কানুনগো, রাম শরণ আমীন ও শিব প্রসাদ গোমস্তা মফঃস্বলে প্রেরিত হন।

রাজকীয় সৈন্য গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছে শুনিয়া হামিদ রজা ও তাঁহার অপর ভ্রাতা হাসন রজা পলায়ন করিলেন। লালচান্দ পর্ব্বতের উপর গড় বেষ্টিত একটি গুপ্ত বাটী প্রস্তুত হইয়াছিল. তাঁহারা সেই নিরাপদ স্থানেই চলিয়া গেলেন। বীরবর আহমদরজা পলায়ন করেন নাই, তিনি ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হন। এই সময় মধ্যে সার কলুবর ঢাকায় বদলি হন, ঢাকাতে গিয়াও তিনি পলাইত আসামীদিগকে ধৃত করার জন্য পুনঃ দেলওয়ার খাঁ সেনাপতি ও সার্জ্জনকে প্রেরণ করেন; ইঁহারাও হামিদ রজা ও হাসন রজা প্রভৃতির সন্ধান পান নাই।

আসামীর প্রত্যুত্তর

মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, আহমদ রজা প্রত্যুত্তর দেন যে, "শারীরিক অস্বাস্থ্য হেতু হাঙ্গামার সময় তিনি লস্করপুরের কাছারীতে উপস্থিত ছিলেন না। জমিদারী শাসন ও হুজুরী খাজানা প্রেরণের জন্য হামিদ রজা কাছারীতে উপস্থিত ছিলেন। বাদীর পিতা একজন দাম্ভিক ও ঈর্ষাপরতন্ত্র লোক ছিলেন, তিনি নিজ বন্ধু কৃষ্ণচান্দ শিকদারের সহিত পরামর্শ ক্রমে হামিদ রজাকে অপমানিত করিতে গালি দেন। এই সূত্রে বিবাদ উপস্থিত হয়। মোতিওর রহমানই ইচ্ছা পূর্ব্বক বিবাদ বাঁধান, এই উদ্দেশ্য বশতঃই তিনি প্রায় ৪০০ সৈন্য জমা রাখিয়াছিলেন। তিনিই জমিদারপক্ষ আক্রমণ করার জন্য প্রথমে স্বীয় পুত্রকে আদেশ দেন। তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হামিদ রজা বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার্থ রণে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে উভয় পক্ষেই হতাহত হইয়াছে। কৃষ্ণ শিকদার ও কাজিকে ধৃত করিয়া কয়েদ করা হয় নাই। কৃষ্ণ শিকদার খোন্দকারের রায় বাঁশিয়া কর্ত্তৃকই প্রহৃত হইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় নেয়।

খোন্দকারের বাড়ীতে জমিদারী সংক্রান্ত অনেক কাগজ পত্র ছিল, রিয়াজুর রহমান ক্রোধভরে পাছে তত্তাবৎ নষ্ট করেন, এই ভয়ে তদুদ্ধারের জন্য লোক পাঠান গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা কোনও কাগজ পত্রাদি আনে নাই। খোন্দকারের ভৃত্যগণই দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিতেছে দেখিয়া তাহারা চলিয়া আসে। খোন্দকার-বণিতা স্বয়ং নিজের দুইটি ভৃত্যদ্বারা কাগজপত্র লস্করপুরের হাবিলিতে পাঠাইয়া দেন।"

তিনি আরও বলেন যে, দেলওয়ার খাঁ সেনাপতি, রাম শরণ আমীন ও সদর কানুনগো তাঁহাদিগকে ধৃত করিতে তরফে যান নাই। তিনি স্বয়ংই ইচ্ছা পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন।

আপোষ করণ

এই মোকদ্দমায় মৌলবী আব্দুল বাসিতের সাক্ষাতে রাম নারায়ণ মোনশী ২৬ জন সাক্ষির জবানবন্দি গ্রহণ করেন।[১] সাক্ষিগণের জবানবন্দি পর্য্যালোচনা বিচারকের প্রতীতি জন্মে যে, হামিদ রজা ও আহমদ রজার উদ্যোগ ও আক্রমণেই এই অনর্থপাত ঘটিয়াছে।

বেগতিক দেখিয়া সুচতুর হামিদ রজা রিয়াজুর রহমানের নিকট আপন কন্যার বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করেন ও বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ফেলেন। তখন রিয়াজুরের

১. মতিরাম তহবিলদার সাং ছিলিম নগর; ভবানীদেব সরবরাহকার, নয় আনি কাছারী; চান্দ খাঁ বার্ত্তাবাহক সাং মির্জ্জাটোলা; ভিকা বেলদার, দুলাল বেলদার সাং লস্করপুর ইত্যাদি দর্শক ও ঘটনা সংসৃষ্ট বহু ব্যক্তি সাক্ষিগণের মধ্যে ছিল।

মত ফিরিয়া গেল, তিনি পিতৃ ও ভ্রাতৃহন্তাদিগকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইলেন। পরামর্শানুসারে তখন নূতন সাক্ষিগণ উপস্থিত করা হইল, এবং ইতিপূর্ব্বে রাম শরণ মোনশী কর্ত্তৃক যে সাক্ষিগণের জবানবন্দি গৃহীত হয়, তাহার প্রকৃত কাগজ গোপন করিয়া কৃত্রিম নকল উপস্থিত করা হইল। ইহাতে মোকদ্দমার ফল অন্যরূপ দাঁড়াইল। দেখা গেল যে, দর্শক সাক্ষী একটিও নাই; মোসলমান শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে শুনা কথায় বিশ্বাস করিয়া মোকর্দ্দমার রায় দেওয়া যায় না; কাজেই মোকদ্দমা "ডিসমিস" হইল। আহমদ রজা ও হামিদ রজা প্রভৃতি অব্যাহতি লাভ করিলেন।

এই মোকদ্দমার বিবরণ হইতে তখনকার বিচার প্রণালী কতকটা অবগত হওয়া যায়, তখনও ইংরেজগণ শাসন কার্য্যে সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপ করেন নাই; বিচার কার্য্য সূক্ষ্মভাবে হইত না, আদালতের কাগজপত্র গোপন করা যাইতে পারিত।

হামিদ রজা নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইলে অনতিবিলম্বে রিয়াজুর রহমানের সহিত মহা আড়ম্বরে আপন দুহিতার বিবাহ দিলেন। ত্রিপুরাধিপতি এই সময় নিজ অনুগ্রহ ভাজন মোতিওর রহমানের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তে, রিযাজুর রহমানকে সান্ত্বনা বাক্য প্রেরণ করেন; এবং পূর্ব্ব অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ খোন্দকার পুত্রকে কয়েকটি গ্রাম দান করেন ও খোয়াই নদীতে তাঁহার ৪০ খানা নৌকায় মহারাজ কোনরূপ কর আদায় করিবেন না, এই অনুমতি দেন। তদ্ব্যতীত উপস্থিত বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার অভিপ্রায়ে মহারাজ দুই দল সৈন্য রামশ্রীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকার "আহমদ আলী"

যে বিবাদের বর্ণনা করা গেল, ইহার পূর্ব্বে নয় আনির জমিদারী কাগজপত্রে "আহমদ আলী" এই যুক্ত নামাত্মক "দস্তখত" ব্যবহৃত হইত। আহমদ রজা নামের "আহমদ" ও আলীরজা নামের "আলী", এই যুগ্ম নামে "আহমদআলী" দস্তখতের প্রচলন চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গোলযোগের সময় হইতে এই যুক্ত নামাত্মক দস্তখত উঠিয়া যাওয়ায়, আলীরজার ভ্রাতা মদন রজা ও কায়েম রজার গোমস্তা গোলাব রাম দেব ঢাকাস্থ বড় সাহেব মিঃ রাটন ওলিয়রের নিকট আবেদন করেন যে, জমিদার আহমদ রজার নামের সহিত আলীরজার নাম সংযুক্তে, কাগজ পত্রে উভয় নামের যুক্ত দস্তখত ব্যবহৃত হইত, বিনা কারণে তাহা উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে, অতএব তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবার আদেশ হউক। ফলকথা, আলীরজার উত্তরাধিকারীগণ নূতন কল্পে চৌধুরাই সনন্দ প্রাপ্তির প্রার্থনা করিলেন। এই প্রার্থনার ফল স্বরূপ তাঁহারা মিষ্টার রাটন ওলিয়রের দস্তখত যুক্ত এবং খাদের সরা কাজি ইব্রাহিম আলী

---

২. এই পারস্য মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেলঃ-

"এতদ্দ্বারা চাকলে জাহাঙ্গির নগরের অন্তর্গত তরফ পরগণার চৌধুরীয়ান, কানুনগোয়ান, তালুকদারান, রায়তান, জিরাতানকে জানান যাইতেছে যে, এতকাল যাবৎ উক্ত পরগণার নয় আনা অংশের মধ্যগত পাঁচ আনা সাত গণ্ডা অংশে সৈয়দ আহমদ আলীর দস্তখত হইয়া আসিতেছিল। তন্মধ্যে আহমদ রজা আলীরজার প্রাণবধ ক্রমে মোকদ্দমায় আবদ্ধ থাকায় চৌধুরাই হিস্যা হইতে বঞ্চিত হন। আলীরজার ভ্রাতা মদন রজা ও কায়েম রজা তখন উপস্থিত না থাকায় তাঁহাদের নাম জারি হয় নাই, সম্প্রতি গোমস্তা গোলাব রামের দরখাস্তে ইহা জানা গেল। অতএব আহমদ রজার স্থলে আলীরজার দস্তখত প্রচলিত হইল; আর সৈয়দ মদন রজা ও কায়েম রজাকে চৌধুরাইতে নিযুক্ত করা গেল। এক্ষণে তাহাদের উচিত যে তাহারা চৌধুরাইতে বাহাল থাকিয়া রায়তান জিরাতানকে বশে রাখিয়া দিন দিন ভূমির উন্নতি সাধন, আবাদি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে থাকেন এবং তাহারা উপদেশের উপর দৃঢ় থাকেন। উক্ত পরগণা সকলের চৌধুরীয়ান, কানুগোয়ান, তালুকদারান, রায়তান, জিরাতান এবং কর্ম্মচারীয়ান ইহাদিগকে চৌধুরাই পদে বাহাল জানিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা না করেন। ইহা তাগিদ তাগিদ জানিয়া সনদের নিয়ম পালন করেন।"

ও নায়েব আব্দুল আলীর মোহর যুক্ত এক নূতন সনন্দ[২] ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রাপ্ত হন। ইহার বলে নয় আনি জমিদারীর পাঁচ আনা সাত গণ্ডা অংশে মদন রজা ও কায়েম রজা অধিকার প্রাপ্ত হন। এই সময়ের অত্যল্প পরেই প্রসিদ্ধ দশসনা বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়।

তরফের পূর্ব্ব আয়তন

দশসনা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে রাজস্ব হিসাবের সুবিধার জন্য, নাওরা মহাল উল্লেখে তরফ ঢাকার অন্তর্ভুক্তরূপে "চাকলে জাহাঙ্গির নগর, জিলা লস্করপুর" বলিয়া লিখিত হইত। মোহাম্মদ রেজা খাঁর চকবন্দি মতে ইহার সদরজমা ১৬,২১৭ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তখন পর্য্যন্ত তরফ একটি অখণ্ড জায়গীর ছিল ও ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের তৌজিতে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হয় না। অতঃপর বিবিধ তালুকের সৃষ্টি হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের দশসনা বন্দোবস্তের সময় তরফ শ্রীহট্টের কালেক্টরী ভুক্ত হয়, এবং খারিজা দশটি পরগণা ব্যতীত ইহার সদরজমা ৪৪,০০০ টাকা নিরূপিত হয়। তরফ হইতে বিভিন্ন সময়ে নিম্ন লিখিত পরগণাগুলি খারিজ বা বহির্ভূত হইয়াছেঃ—

১.	পরগণা	আনন্দপুর	সদরজাম	৯৭	টাকা
২.	”	উসাইনগর	”	১৮৩	”
৩.	”	গদাহাসন নগর	”	৬৬৯৯	”
৪.	”	গিয়াস নগর	”	৩৭৩	”
৫.	”	দাউদ নগর	”	৫৭৫	”
৬.	”	নুরুলহাসন নগর	”	২৭৮৪	”
৭.	”	পুটিজুরী	”	১৭৫৪	”
৮.	”	ফয়জাবাদ	”	৫৫৮	”
৯.	”	রঘুনন্দন	”	১৫৭	”
১০.	”	রিয়াজপুর	”	৪৩	”

এতদ্ব্যতীত আদি তরফ, তপে বিষগ্রাম, এবং বালিশিরা ও সপ্তগ্রামও তরফ হইতে খারিজ বলিয়া উল্লেখিত আছে। এই সকল পরগণা সামিলে তরফের আয়তন কত প্রকাণ্ড ছিল, বুঝা যাইতে পারে।

দশসনা বন্দোবস্তের সময় প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব অধিকারস্থ ভূমি নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ সময় তরফের নয় আনি অংশে, আহমদ রজার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা কলিম রজা বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বিলাস পরায়ণ, দাম্ভিক ও তোষামোদ প্রিয় ছিলেন। কথিত আছে যে, এক সওদাগরের তোষামোদে তিনি সহস্র টাকার সূচি ক্রয় করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইনি অতি বলবান ছিলেন, সাঁড়াসি দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠের চর্ম্ম তোলা যাইতে পারিত না। সাত আনি জমিদারদের সহ তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ছিল না; কোন রাজকর্ম্মচারীর সহিত দেখা করা তিনি অগৌরব মনে করিতেন। কাজেই বন্দোবস্তের কর্ম্মচারীর সহিত তিনি দেখা কবা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

সাত আনির জমিদারগণ এইরূপ ছিলেন না, যশোলিপ্সা তাঁহাদের মধ্যে প্রবল ছিল,

তাঁহারা অপেক্ষাকৃত বিচক্ষণ ও উন্নতি প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহারা কাগজ পত্র সহ রাজকর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও যথা বিহিতরূপে জমিদারী নূতন রূপে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। সৈয়দ নাজিরের নামে তরফে ১নং তালুকের উৎপত্তি হইল।

সাত আনির কার্য্যতৎপরতা দৃষ্টে নয় আনির জমিদার স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, কাগজপত্র সহ রাজকর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ ক্রমে নিজ ত্রুটি স্বীকার করেন। তখন নয় আনির জমিদার সৈয়দ আহমদ জীবিত না থাকিলেও তদীয় নামানুসারে ২নং তালুকের উৎপত্তি হয়। সৈয়দ এনায়েতউল্লা নামে নয় আনির অপর এক অংশীর নামে ৩নং তালুকের নামকরণ হয়।[৩] তরফের তুঙ্গেশ্বর, জয়পুর ও সুঘরবাসী হিন্দু মজুমদারগণও নিজ নিজ অধিকারস্থ ভূমি পৃথকরূপে বন্দোবস্ত করিয়া লন।[৪]

এই সময়ে সৈয়দগণের অকর্ম্মণ্যতা প্রযুক্ত সঙ্গতিপন্ন প্রজারাও নিজ নিজ নামে ভূবন্দোবস্ত ক্রমে তালুকের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল। সৈয়দগণের যাহা কিছু ক্ষমতা ছিল, বন্দোবস্তের পর হইতে তাহা তিরোহিত হয়; ফলতঃ তাঁহারা সমগ্র পরগণার জমিদার হইতে পারেন নাই। তখনও যদি আত্মকলহ, অলসতা, দম্ভ প্রভৃতি ত্যাগ করিতে পারিতেন, তখনও যদি বিশ্বাসগণের উপর অযথা বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া নিজেরা কাজ কর্ম্ম দেখিতেন, তাহা হইলে এত শীঘ্র দারিদ্রের চরমসীমায় উপস্থিত হইতেন না। বিশ্বাস উপাধি বিশিষ্ট কর্ম্মচারীরা[৫] তখন সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিল; এবং তাহাদেরই সৌভাগ্য বশতঃ এই সময় জমি বিক্রয় সৈয়দদের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পরবর্ত্তী কথা

ক্রেতাগণ জমি ক্রয়ের জন্য উপস্থিত হইলে সৈয়দগণের দেখা প্রায়ই পাইত না। বিশ্বাসদের সহিতই মূল্যাদির কথা হইত। উৎকোচ সঙ্কোচ নাশক,—উৎকোচ বলে স্বার্থপর বিশ্বাসগণকে তাহারা বশীকৃত করিত ও তাহাদের পরামর্শে পরিচালিত সৈয়দগণের নিকট হইতে সহস্র টাকা মূল্যের সম্পত্তি স্বচ্ছন্দে দুই তিন শত মুদ্রায় ক্রয় করিতে সক্ষম হইত। কেবল তাহাই নহে,—ক্রীত এক হাল ভূমির স্থলে নিরাপত্তিতে দশ হাল করায়ত্ত করিয়া লইত।

মুদি ও বস্ত্র বিক্রেতা প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ ধারে ক্রমাগত দ্রব্যাদি যোগাইত, এবং বৎসরান্তে মূল্য ও তাহার অত্যধিক সুদ ধরিয়া, তৎপরিমাণে ভূমি গ্রহণ করিত। উদাহরণ স্বরূপ নুরপুর নিবাসী কাজী এনায়েত উল্লার নাম করা যাইতে পারে। এই ব্যক্তি ইতঃপূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ হইতে ছুরি, কাঁচি, তরবারি, বাক্স প্রভৃতি আনয়ন করতঃ সৈয়দগণকে উপহার দিয়া যে প্রভূত ভূসম্পত্তি লাভ করে, দশসনা বন্দোবস্তের সময় তাহা পৃথক তালুকরূপে পরিগণিত হয়।

তরফের উত্তরদিগ্বর্ত্তী ঘুঙ্গিয়াজুরি হাওরটি সমস্তই সাত আনির অধিকারে ছিল। এই সময়ে উক্ত হাওরে একটা মৃতদেহ প্রাপ্তে, পুলিশ কর্ম্মচারী তদন্তে আসিয়া জমিদার মোহাম্মদ নাতির ও

৩. ফরিদপুরের সৈয়দগণ ইঁহার বংশধর।

৪. ইঁহাদের কীর্ত্তিকথা পরগণায় ইতিহাসের সহিত অনেকটা জড়িত থাকিলেও বংশবৃত্তান্ত ভাগের গৌরবার্থে সেই খণ্ডেই বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে।

৫. শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যে খণ্ডের ১৬ পরিচ্ছেদের ব্যাখ্যায় পণ্ডিতবর রাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন "বিশ্বাস" শব্দের অর্থ পরিদর্শক কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন। তরফ, বাণিয়াচঙ্গ প্রভৃতি স্থানের বিবরণে বিশ্বাসদের কার্য্যপটুতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিদর্শন ব্যতীত তাঁহাদের আরও অনেক বিষয়ে ক্ষমতা ছিল। ইঁহারা অনেক সময় মন্ত্রীর ন্যায় মন্ত্রণা দিতেন ও আয় ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

বাতির সাহেবকে প্রথমতঃ তলব ক্রমে বৃত্তান্ত-ঘটিত বিষয় করেন, পাছে কোন ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হয়, এই ভয়ে জমিদারগণ ঘুঙ্গিয়াজুরিতে তাঁহাদের অধিকার থাকার কথা স্পষ্টতঃ অস্বীকার করিলেন। সুচতুর হিন্দু মজুমদারেরা অগ্রবর্ত্তী হইয়া তখন বলিলেন যে, এই হাওর তাঁহাদের অধিকার ভুক্ত। সৈয়দ একবার যে কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা পরিবর্ত্তন ক্রমে মহত্বচ্যুত হইতে পারেন নাই! কাজেই সুবিস্তৃত হাওর তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িল।

কথিত আছে, সৈয়দগণের মধ্যে কেহ শৃগালের চীৎকার শ্রবণে কারণ জিজ্ঞাসিলে, বিশ্বাস বুঝাইয়া দিলেন যে, শীতে শৃগালেরা ক্রন্দন করিতেছে। সৈয়দ তখন শৃগালকে বস্ত্রদানের সহকারে স্বয়ংই গ্রহণ করিয়াছিলেন! এইরূপ অবস্থায় কুবেরও লক্ষ্মী শূন্য হইয়া পড়েন, তাঁহাদের আর কথা কি? এই বস্ত্রদাতার নাম উল্লেখে চিরতরে তাঁহার সঙ্গে নির্ব্বোধতার কালিমা লেপন করা অনাবশ্যক।[৬] নিম্নে পরবর্ত্তী সৈয়দগণের নামোল্লেখে তাঁহাদের সম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিত হইতেছেঃ—

সৈয়দ ঈশারজা—ইনি মদন রজার পুত্র, পারস্য ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

সৈয়দ শায়েস্তা মিয়া—ইনি হামিদ রজার পুত্র, নিজ নামে তিনি শায়েস্তগঞ্জ বাজার স্থাপন করেন ও বাজারের নিকট এক কাছারী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্রাদি ছিল না মৃত্যুর পর স্ত্রী সম্পত্তির অধিকারিণী হন। ঐ সময় শায়েস্তাগঞ্জের কাছারী নিলাম হইয়া যাওয়ায়, দেওয়ান হরগোবিন্দ রায় নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহা ক্রয় করেন। তরফে সর্ব্ব প্রথম তিনিই "বাবু" উপাধিতে আখ্যাত হন। নিলামের পর হইতে উক্ত কাছারী "নিলামের কাছারী" নামে কথিত হয়।

সৈয়দ খাতির—ইনি সাত আনির বাতিরের পুত্র; দয়ালু ও বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। ঈশা খাঁ বংশীয় হয়বৎ নগরের খোদা নেওয়াজ খাঁর নিকট তিনি নিজ তনয়ার বিবাহ দেন। হয়বৎ নগরের অধিকাংশ জমিদারী কাবিনে আবদ্ধ ছিল। কন্যার মৃত্যু হইলে তিনি স্বহস্তে কাবিন ছিন্ন করিয়া সেই বৃহৎ সম্পত্তি দাবি ত্যাগ করেন। এরূপ অবস্থায় লোভ ত্যাগ করা কম কথা নহে। এই কন্যাটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, ইহার বিবাহে তিনি প্রভূত ব্যয় করিয়া, অনেক সম্পত্তি নষ্ট করেন। খাতির বড়ই সৌখিন পুরুষ ছিলেন, সখের খাতিরেও বহু ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। পালিত বাঘ বাঘিনীর বিবাহ-ব্যয়ের কথা শুনিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। তদ্ব্যতীত বড় বড় "লালভঙ্গী" নৌকা, মনোহারী হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ ইত্যাদিতে অনেক ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

সৈয়দ নাতির—সৈয়দ নাতির খাতিরেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি পারস্যে পণ্ডিত ছিলেন, হস্তাক্ষরও উত্তম ছিল, কিন্তু ভূ-বিক্রয়ে ইঁহার অত্যধিক উৎসাহ ছিল; ইনিই ত্রিপুরাধিপতির নিকট বালিশিরা বিক্রয় করেন।

বিষগাও ও বালিশিরা

বিষগাও ও বালিশিরা অদ্যাপি ত্রিপুরাধিপতির জমিদারী ভুক্ত আছে। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য রাজ্যচ্যুত হন। এই সময় তাঁহার বক্সী উপাধিক বিশ্বস্থ কর্ম্মচারী ও সহচর রামহরি ঘোষ বিশ্বাস বিষগাও মধ্যে এক জমিদারী ক্রয় করতঃ বাটী নির্ম্মাণ করেন। তিনি প্রভুর দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া, প্রভু-ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ বাটী সহ উক্ত জমিদারী রাজ্যচ্যুত মহারাজকে অর্পণ করেন এবং বাণিয়াচঙ্গে অন্য এক জমিদারী ক্রয় করতঃ স্বয়ং তথায় গিয়া বাস করেন। মহারাজ রামগঙ্গা, বিশ্বাসের ভক্তি উপহার প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন

৬. *এই গল্প বাণিয়াচঙ্গের জমিদার দেওয়ান সাহেবদের সম্বন্ধেই সর্ব্ব প্রথমে শুনা গিয়াছিল। তরফে উহার প্রতিধ্বনি মাত্রই হইয়া থাকিবে।*

নাই। নিরাশ্রয় রামগঙ্গার রাজ্য প্রাপ্তির আশা একরূপ দূর হইয়া গিয়াছিল; কাজেই তিনি অনুচরবর্গ সহিত এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এ স্থানে অবস্থান কালে তিনি বালিশিরার আরও অনেক অংশ ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পর রামগঙ্গা মাণিক্য পুনর্ব্বার ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ করেন। বিষগাও ও বালিশিরার জমিদারী তদবধিই ত্রিপুরাধিপতির অধিকার ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই জমিদারীর আয়তন ১১৩ বর্গমাইল এবং আয় ৬৭,০০০ টাকা; লাহারপুরে ইহার সদর কাছারী অবস্থিত।[৭]

সৈয়দ মফজ্জল হাসন—হাসন রজার পৌত্র ও নয়েম রজার পুত্র; ইনি পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজস্ব বাকিতে 'হিস্যা হাসন রজা' অংশ নিলাম হইয়া যাওয়ায় তিনি বড়ই দুরবস্থায় পতিত হন; পরে নরপতি নিবাসী সদর-উল-হাসন সাহেবের প্রযত্নে গবর্ণমেন্টের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এক সময় তিনি "হিস্যা হামিদ রজা" তালুক ক্রয় করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার "বিশ্বাস" এই পরামর্শ দেন যে, ভবিষ্যতে সর্ব্বত্রই জমিদারী প্রথা রহিত হইয়া গবর্ণমেন্টের "খাস" হইয়া যাইবে, হস্ত স্থিত অর্থ নষ্ট করা সঙ্গত নহে। এই পরামর্শে তিনি নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। ইনি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, ইঁহার স্বহস্ত লিখিত বহুতর পারস্য পুথি অদ্যাপি আছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সৈয়দ আহসন রজা—ইনি নয়েম রজার ভ্রাতষ্পুত্র ও হোসন রজার পুত্র; কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুতের দুরাশায় পতিত হইয়া ইনি অনেক সম্পত্তি বিনষ্ট করেন। ইহার নিকট হইতে রাম রামায়ণ সাহা নামক এক ব্যক্তি "হিস্যা হামিদ রজা" তালুক ক্রয় করেন।

সৈয়দ মোহাম্মদ নাসির—খাতিরের পুত্র; অতিশয় সাহসী ও পরোপকারী ছিলেন; বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে তিনি কথঞ্চিৎ প্রতিপত্তি ও খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন।

সৈয়দ আবদুস সবুর ও আবদুস রহুফ—নাসিরের পুত্রদ্বয়; ইঁহাদের শৈশবাবস্থায় খাজানা বাকিতে অনেক ভূসম্পত্তি নিলাম হইয়া যায়।

এইরূপে সৈয়দ বংশীয়গণ হীনাবস্থায় পতিত হন। যাঁহারা এক সময়ে তরফ রাজ্যে একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, ত্রিপুরাধিপতি এক সময় যাঁহাদের বিরুদ্ধে দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিয়াও নিশ্চিন্ত হন নাই—স্বয়ং আগমন করিয়াছিলেন, বহু দিন যাঁহারা স্বাধীনতা সম্পদ সম্ভোগ করিয়াছিলেন, কালের দুরতিক্রম্য আবর্ত্তে নিষ্পিষ্ট হইয়া তাঁহাদের বংশধরগণ আজ দীন হীন! সম্পত্তি নাই, ক্ষমতা নাই, আছে শুধু সামাজিক সম্মান—হজরত সৈয়দ নসিরউদ্দীন সিপা-ই-সালারের শোণিতগত সম্মান,—তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের আচরিত ধার্ম্মিকতার অক্ষয় উচ্চ সম্মান।

এই সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ সম্পত্তিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বংশগত ধর্ম্ম-ভাবচ্যুত হন নাই; যে পবিত্র শোণিত তাঁহাদের ধমনীতে প্রবাহিত, তাহার তেজ ক্ষীণতর হইয়া আসিলেও এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। নয় আনির অংশে বর্ত্তমানে সৈয়দ এবাদুর রজা, ইউসুফ রজা প্রভৃতি এবং সাত আনির অংশে সৈয়দ আব্দুস সবুর ও আব্দুল হেলিম ওরফে তারামিয়া বর্ত্তমান আছেন।

শ্রীযুক্ত তারা মিয়া অতি উদার প্রকৃতির লোক। তিনি ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ, তাঁহার ধর্ম্মমত অতি উদার। হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ অনেকাংশে তিনি মান্য করেন ও প্রশংসা করেন। তিনি অতি বিনীত ও সকল ধর্ম্মের সাধু ব্যক্তিকেই শ্রদ্ধা করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, তিনি কতিপয় অনুগত শিষ্য লইয়া খোল করতাল যোগে বৈষ্ণবের ন্যায় প্রতিদিন সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বলিতে গেলে তিনি এক অভিনব ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠন করিতেছেন; এই নব সম্প্রদায়ে অসম্প্রদায়িক ভাবে হিন্দু দেব দেবীরও নাম গৃহীত হইয়া থাকে।

---

৭. স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বার্ষিক বিবরণী-১৩১৭ ত্রিপুরাব্দ, ৩০ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়

ইটার রাজা

পূর্ব্বকথা

শ্রীহট্টের ইটা অঞ্চলে পূর্ব্বে ত্রিপুরাধিপতির যথেষ্ট প্রভাব ছিল, পরে ইটা গৌড়ের অধীন হয়। প্রথম খণ্ডে আমরা নিধিপতির আগমন বিবরণ বর্ণন করিয়াছি। নিধিপতি ইটায় এক ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করিয়া, "ভূমিউড়া—এওলাতলি" গ্রামে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন এবং অল্পকাল মধ্যে সুবৃহৎ দীর্ঘিকাদি খনন করাইয়া সে স্থানকে সুশোভিত করিয়া তুলেন। নিধিপতির "সপ্তপার দীঘী" ও "নিধিপতির খামার" নামে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের ধ্বংশাবশেষ এখনও তথায় বর্ত্তমান আছে। নিধিপতির[১] পুত্র ভূধর ও পৌত্র কন্দর্পাদি কি ভাবে দেশ শাসন করিতেন, জানা যায় না। কন্দর্পের পুত্র বৃহস্পতি, তৎপুত্র লক্ষ্মীনাথ, তাঁহার পুত্র দেবচন্দ্র; দেবচন্দ্রের ভাস্কর, পুষ্কর ও প্রভাকর নামে তিন পুত্র হয়। তন্মধ্যে ভাস্করের পুত্র কেশব, কেশব হইতে কামদেবের পুত্র মহাদেব। মহাদেব স্থানান্তরে গমন করেন, তাঁহার বাসস্থান "মহাদেবী বড়কাপন" নামে খ্যাত। তত্রত্য শিকদারেরা তদ্বংশোদ্ভব।

প্রভাকরের পুত্রের নাম শুভরাজ ও শ্রীকৃষ্ণ। শুভরাজ পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; তিনি দীর্ঘিকা প্রস্তুত প্রভৃতি অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়া, নিজ গুণে দিল্লী হইতে "খান" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ইটার পঞ্চগ্রামের (পাঁচগাও) দক্ষিণে ও এওলাতলির পূর্ব্ব দিকে এক বাটী প্রস্তুত করেন, এখন সেস্থান "রাজখলা" বলিয়া পরিচিত এবং তথাকার তৎপ্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা শুভরাজ বা "সুরাজ খাঁর দীঘী" নামে আখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের নাম শ্রীপতি; ইটার অন্তর্গত শ্রীপাড়া তাঁহার নামানুসারেই খ্যাত।

শুভরাজ খাঁর পুত্র বিখ্যাত ভানু নারায়ণ ও ইন্দ্র নারায়ণ। ভানু নারায়ণ বল বিক্রমে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইঁহার সময়ে ত্রিপুরাধিপতির অধীন সামন্ত-সর্দ্দার রাজা চন্দ্রসিংহ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন; ভানু নারায়ণ যুদ্ধে ইঁহাকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া ত্রিপুরাধিপতির নিকট প্রেরণ করেন। ভানু নারায়ণের এই কার্য্যে মহারাজ তাঁহার উপর অতিশয় পরিতুষ্ট হন এবং পুরস্কার স্বরূপ চন্দ্রসিংহের অধিকৃত ভূমির কিয়দংশের শাসনাধিকার তাঁহাকে প্রদান করেন। ত্রিপুরাধিপতি ভানু নারায়ণকে মনুকুল প্রদেশের অধীশ্বর বলিয়া এই সময়ে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। চন্দ্রসিংহের অধিকৃত স্থান ইঁহারই নামে তদবধি (ভানুকচ্ছ বা ভানুকাছ অধুনা) ভানুগাছ নামে খ্যাত হয়। ভানুবিলও ভানু নারায়ণের নাম ঘোষণা করিতেছে। ভানুগাছ পরগণার রামেশ্বর গ্রামে চন্দ্রসিংহের গড়ের চিহ্ন অদ্যাপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ভানু নারায়ণ রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া, এওলাতলির অল্পদূরে দীর্ঘিকাদি শোভিত নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন ও তাহার নাম "রাজনগর" রাখেন। ইন্দ্র নারায়ণ

১. ঘ-পরিশিষ্টে (২য় ভাগ ২য় খণ্ড) বংশ-পত্র দেখ। নিধিপতি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তদ্বংশে ২৩/২৪ পুরুষ চলিতেছে। এই ২৪ পুরুষ সহ পূর্ব্বগামী ১৫ পুরুষের যোগ করিলে ৩৯ পুরুষ হয়। পরাশর গোত্রীয় ও অন্যান্য গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকদের আগমন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক বংশে ঈষৎ ন্যূনাধিক ঐরূপ পুরুষ সংখ্যা সমন্বিত বংশ তালিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

এওলাতলি বাটীতে বাস করিতে থাকেন। তথায় তদবংশধরগণ এখনও বাস করিতেছেন। ভানু নারায়ণই প্রকৃত পক্ষে ইটার প্রথম রাজা। ইঁহার পাঁচ পুত্র, যথা—সুবুদ্ধি নারায়ণ (সুবিদ নারায়ণ), রামচন্দ্র নারায়ণ (নামান্তর ব্রহ্ম নারায়ণ), ধর্ম্ম নারায়ণ, বীরচন্দ্র নারায়ণ। রূপচন্দ্র নারায়ণ ইহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন, কারণবশতঃ ইনি বনভাগ চলিয়া যান।[২] জ্যেষ্ঠ সুবুদ্ধি বা সুবিদ নারায়ণ সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

রাজা সুবিদ নারায়ণ

যখন দিল্লী সিংহাসনে বেহলুল লোদী অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ পরাক্রমে দিল্লীর প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতেছিলেন, সুবিদ নারায়ণ সেই সময় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ত্রিপুরাধিপতির আশ্রিত হইলেও, তাঁহাকে অনেকাংশে দিল্লী সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করিয়া চলিতে হইত। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিতে পারে, তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন ভূস্বামী তখন এ অঞ্চলে ছিল না।

তৎকালে সুবে বাঙ্গালার দূরবর্ত্তী প্রদেশে স্থানে স্থানে দেওয়ান উপাধি বিশিষ্ট হিন্দু কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইতেন; রাজস্ব বিভাগে ইঁহাদের পদ সর্ব্বোচ্চ ছিল।[৩] রাজস্ব বিষয়ে ভূস্বামীদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে এই দেওয়ানগণের প্রভাবাধীন হইয়া থাকিতে হইলেও, শাসনকর্ত্তাদের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল না। নিজ অধিকার মধ্যে তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল, তাঁহারা অপরাধীর বধদণ্ড পর্য্যন্ত বিধান করিতেন। কাজি, শিকদার প্রভৃতি শাসন সংক্রান্ত নিম্নপদস্থ রাজকীয় কর্ম্মচারীগণও ইঁহাদিগকে বিশেষ সম্ভ্রম করিত। রাজা সুবিদ নারায়ণ এইরূপ প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। সুবিদ নারায়ণের সময়ে "রায়" উপাধি[৪] বৈদ্য বংশীয় জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীহট্টের দেওয়ান নিযুক্ত হন। এই দেওয়ানের পূর্ব্বনিবাস রাঢ় দেশে ছিল। তরফের অধিস্বামীগণ, লাউড়ের অধিপতিবর্গ ও আর রাজা সুবিদ নারায়ণ প্রভৃতিকে কিয়ৎ পরিমাণে ইঁহার বাধ্য থাকিতে হইত, ইঁহার সহিত তাঁহাদের রাজস্ব বিষয়ে কতকটা সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু ইটা ত্রিপুরার আশ্রিয়ত রাজ্য বলিয়া, কখন কখন সুবিদ নারায়ণ স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না।

ইটার পূর্ব্বে বাড়ুয়া পাহাড়, ইহার প্রধান শৃঙ্গ পাগড়ীয়া টিলায় সুবিদ নাবায়ণের নির্ম্মিত সুদৃঢ় গড় ছিল। তাঁহার প্রধান দুর্গ পর্ব্বতপুর নামক স্থানে ছিল, তথায় সুশিক্ষিত বহু সৈন্য অবস্থিতি করিত; দুর্গের চিহ্ন এখনও সেই স্থানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

রাজার সমাজসংস্কারাদি কার্য্য

রাজা সুবিদ নারায়ণ ধর্ম্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও দাতা ছিলেন। তাঁহার রাজকোষ যেমন ধনপূর্ণ ছিল, তেমনই তিনি সদ্ব্যয় করিতেন, প্রত্যহ সভাভঙ্গের পর তিনি প্রার্থীকে ধন দানে তুষ্ট করিতেন।[৫] তিনি শিষ্টকে যেমন প্রতিপালন করিতেন, দুষ্টদিগের তেমনি যম স্বরূপ

২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় ভাগে তদ্বিবরণ বর্ণিত হইবে।

৩. স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস-৮৯, ১৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪. পূর্ব্ববর্ত্তী ৩য় অধ্যায়ে এই উপাধির বিষয় বলা হইয়াছে।

৫. "মহাগুণমন্ত রাজা ধনী যে অশেষ।
তান গুণে পূর্ণ হইলেক সর্ব্বদেশ॥
প্রতিদিন মহারাজা রাজ সভা যান।
রাজসভা ভাঙ্গিয়া করেন ধনদান॥" ইত্যাদি।–কুলাঞ্জলী গ্রন্থ

ছিলেন।[৬] এই জন্য তাঁহার রাজ্যে সকলেই পরম সুখে বাস করিতেছিল।

এক সময় রাজা সমাজসংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। তৎকালে দেশের রাজা বা ভূস্বামীবর্গই সমাজপতিরূপে গণ্য হইতেন। সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে বৎস, কৃষ্ণাত্রেয়, ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় দ্বিজ-দলপতিদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য ঘটে; পরে তাহা একরূপ বিবাদে পরিণত হয়, রাজা বিরক্ত হইয়া বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন।

ব্রাহ্মণগণ কি করিবেন? রাজাকে অভিসম্পাত করিয়া ক্ষুণ্ন মনে ইটা পরিত্যাগ করিলেন।[৭] বিতাড়িত বিৎস গোত্রীয়গণ ঢাকাদক্ষিণ, লংলা ও তরফে চলিয়া যান, এবং ভরদ্বাজ গোত্রীগণ লংলা ও বালিশিরাবাসী হন।

রাজার সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইটা হইতে বহু ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। রাজা ইহাতে নিরুৎসাহিত হইলেন না, দ্বিগুণ উৎসাহে পঞ্চখণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে দশ গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণদিগকে যত্ন পূর্ব্বক আনিয়া ইটায় স্থাপিত করিলেন।[৮] তদ্ব্যতীত বাশিষ্ট, আত্রেয় প্রভৃতি বিভিন্ন গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণদিগকেও তিনি ভিন্ন দেশ হইতে আনয়ন করিলেন।[৯] পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ব হইতেই ইটায় বাস করিতেছিলেন।

মাহারা জাতি

রাজা সুবিদ নারায়ণ "মাহারা" নামে এক নূতন জাতির সৃষ্টি করেন। জাতিমালাদি গ্রন্থে মাহারা জাতির নাম দৃষ্ট হইবে না। রাজা সুবিদ নারায়ণ শিবিকারোহণে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করতঃ স্বয়ং প্রজার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ব্রাহ্মণোচিত পবিত্রতা রক্ষার জন্য নীচ জাতীয় লোক দ্বারা শিবিকা বহন না করাইয়া শূদ্র জাতীয় মাহারা দ্বারা নিজ শিবিকা বহন করাইতে আরম্ভ করেন। মাহারাদের উৎপত্তি বিষয়ে রাজার তাম্বুল ও তাম্রকূট সেবনের প্রসঙ্গ কথিত হইয়া থাকে।

তৎকালে রাজা ও রাজকল্প ব্যক্তিগণ ভ্রমণ কালেও তাম্বুল ও তাম্রকূট সেবন করিবার রীতি দেখা যাইত; বাহক তাম্বুল—করঙ্ক এবং আলবালা বা হুঁকা হাতে সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইত, শিবিকারোহী শিবিকায় থাকিয়াই ধূমপান করিতেন বা তাম্বুল ভক্ষণ করিতেন।[১০] শিবিকা

৬. "জাতঃ সুবুদ্ধিঃ শুদ্ধশ্চ রাজা পরম ধার্ম্মিকঃ।
দুষ্টানাং দমকশ্চৈব শিষ্টানাং পরিপালকঃ॥"–বৈদিক নির্ণয় গ্রন্থ
বৈদিক সংবাদিনী গ্রন্থের টীকা স্বরূপ পণ্ডিতবর কাশীচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

৭. "বৎস, কৃষ্ণাত্রেয় ভরদ্বাজ গোত্রীয়ৈঃ কৈরপি সহ সুবিদ্য নারায়ণভিধেয়স্য রাজ্ঞ একো মহান বিবাদোভূৎ। তস্মিংশ্চ বৎসাদি গোত্রীয়াঃ পরাভূতাঃ সন্তুঃ রাজ্ঞোহভিশাপং দত্তা তদ্দেশ পরিজহু।"–বৈদিক সংবাদিণী

৮. "অন্য দেশাৎ সামানীয় গতাংশ্চ বহু গোত্রজান্।
সর্ব্বানদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য সমাজ সন্ধনং কৃতং॥"–বৈদিক নির্ণয় গ্রন্থ

৯. "Some say that they came from Kanouj at later time, on invitation of Aditya Subbadhi Narayana, a Rajah of Sylhet."
-J. A. G. Barton's Bengal chap. Vi. p. 137.

১০. রাজতরঙ্গিণীতে কাশ্মীর রাজ সুম্মলের "তাম্বুলদায়িক" ভৃত্য অজ্জকের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারত বিখ্যাত মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী শিবিকারোহণে ভ্রমণকালীন তাম্রকূট সেবন করিতেন। জয়ন্তীয়া রাজদরবারে "ডাবাধরণী" বলিয়া একটি সম্মানিত পদ ছিল; "ডাবাধরণী" ডাবা (হুঁকা) ধারণ করিতেন, এবং "বাটাধরণী" বাটা (তাম্বুলকরঙ্ক বা পাণের ডিবা) ধারণ করিতেন।

বাহকগণ যদি জল আচরণীয় জাতীয় হয়, তবে তাম্বুল অথবা জল-পূর্ণ হুঁকা ব্যবহারে বাধা থাকে না; কথিত আছে, এই জন্য রাজা নিম্নশ্রেণীর দেবোপাধি শূদ্র দ্বারা শিবিকা বহন করাইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।[১১] যাহাই হউক, এই নব সম্প্রদায়টি কালক্রমে চিহ্নিত হইয়া পড়ে ও মাহারা বা মালা বলিয়া পরিচিত হয়। রাজধানীর পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী গ্রামে ইহারা বাস করিত; যদিও এই গ্রামের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন মহাসহস্র হইয়াছে, তথাপি আজ পর্য্যন্ত সাধারণে এই গ্রামকে "মালা" বলিয়া থাকে।[১২]

রাজা সুবিদ নারায়ণের কমলা সুন্দরী নামে মহিষী, চারি পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা রত্নাবতী খঞ্জা ছিলেন। কাত্যায়ন গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুপতির সহিত রত্নাবতীর বিবাহ হয়। রাজা যৌতুক স্বরূপ তাঁহাকে পাঁচগাও, ভূমিউড়া, শ্রীপাড়া, সুরানন্দ ও পশ্চিম ভাগ এই পাঁচ গ্রাম দান করেন।[১৩] ইহাতে রঘুপতি ধনবান বলিয়া পরিগণিত হন।

রঘুনাথ শিরোমণি

মাতৃ ও ভ্রাতৃ পরিচয়

রঘুপতির মাতা অতি তেজস্বিণী রমণী ছিলেন। একটি সুন্দরী বধূ আনিয়া ঘরকন্না করিবেন, এ তাঁহার বহু দিনে সাধ ছিল। রঘুপতির বিবাহ জন্য একটি পাত্রীও একরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। রঘুপতি তাঁহার একান্ত অনভিমতে রাজার খঞ্জা কন্যা বিবাহ করায় তিনি অতীব দুঃখিতা হন। এই দুঃখে সেই তেজস্বিণী বিধবা, কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথকে লইয়া দেশত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বীপে গমন করেন। এই রঘুনাথই ভূবন বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি।

প্রসিদ্ধ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পাণ্ডিত্য প্রতিভা প্রবাদের ন্যায় শুনা যায়, শুদ্ধি দীপিকার "দীপিকা প্রভা" নাম্নী টীকা যাঁহার কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে, কুশাগ্রবুদ্ধি শিরোমণি সেই বংশ—খণিরই অমূল্য মণি।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে "ভারত-গৌরব রঘুনাথ শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম সীতাদেবী।'[১৪] তিনি নিজ পুত্র রঘুপতির ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া

---

১১. ইয়ুল ও বার্ণেসেল কৃত দেশীয় শব্দের ইতিহাসে বর্ণিত আসাদবেগের ১৬০৪ খৃষ্টাব্দের লিখিত বিবরণে জ্ঞাত হওয়া যায়, সম্রাট আকবরের সময়ে ভারতবর্ষে প্রথম তামাকের প্রচলন হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত সারাবলী নামক বৈদ্যক গ্রন্থোক্ত "কলঞ্জ" শব্দের অর্থ তামাক, এবং "কলঞ্জ সংবেষ্টন" অর্থে চুরুট বলিয়াই অনুমতি। অতএব রাজা সুবিদ নারায়ণের সময়ে তামাকের বিদ্যামানতা স্বীকার করিলেও হুঁকার প্রচলন ছিল কি না বলা যায় না। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে তামাকের এত অধিক প্রচলন ঘটে যে, ইহা নিবারণ কল্পে তাঁহাকে আইন করিতে হইয়াছিল এবং ধুমপানাপরাধীর প্রতি "তশীর" (উল্টা গাধায় আরোহণ) নামক দণ্ড অবধারিত হইয়াছিল। (বিশ্বকোষ ৭ম ভাগ ৬৬৭ পৃষ্ঠা দেখ) ইহা হইতে সহজেই বোধ হয় যে, পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে তামাকের ব্যবহার ছিল। কিন্তু আকবরেরও পূর্ব্বে শের শাহের সময়ে রাজা সুবিদ নারায়ণের রাজ্য বিলোপ ঘটে; সুতরাং এই গল্প অকাল্পনিক জ্ঞান করিলে আকবরের পূর্ব্বেই এদেশে তামাকের ও হুঁকারও প্রচলন ছিল বলিতে হয়। কিন্তু হুঁকার ব্যবহারাপেক্ষা এস্থলে তাম্বুল ভক্ষণের হেতুই মাহারা জাতির উৎপত্তি বিষয়ে অধিক সঙ্গত। অথবা শুদ্ধচেতা রাজ কর্ত্তৃক মাহারা জাতির সৃষ্টি হইলে,–বিনা কারণে যখন কিছুই হয় না, পরবর্ত্তীকালে তাম্বুল ও হুঁকা ব্যবহারে শুদ্ধাচার রক্ষাই এই জাতির উৎপত্তির কারণ বলিয়া প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

১২. সেন্সাসের সময় মাহারাগণ, ভাণ্ডারীদের মত কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।

১৩. "কাত্যায়ন গোত্রজায় রঘুপতি দ্বিজন্মনে।
রাজখলাং সম্প্রাপ্য যৌতুকত্বেন দত্তবান॥"–বৈদিক নির্ণয় গ্রন্থ।
কেহ কেহ বলেন, পঞ্চগ্রাম ব্যতীত আরও ১৪ গ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন।

"রঘুপতির সংশ্রব, এমন কি স্বীয় জন্মভূমি পর্য্যন্ত ত্যাগে কৃত সংকল্প হইয়া কনিষ্ঠ পুত্র সহ নবদ্বীপাভিমুখে গমন করেন। এখানে আসিয়া আশ্রয়াভাবে উভয়কেই প্রথমে বিড়ম্বনা ও অনুতাপগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। পরে দৈবানুকূলতা প্রযুক্তি তত্রত্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি সদয় হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ বাসস্থানেই আশ্রয় দিলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিলে, সার্ব্বভৌম মহাশয় কয়েকটি কার্য্যে রঘুনাথের অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মৃতি শক্তি প্রাখর্য্য এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের[১৫] পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ন্যায় শাস্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করেন।"[১৬]

এই চতুষ্পাঠী রত্ন প্রসবিত্রী; রঘুনাথ ব্যতীত স্মৃতিতত্ত্বকার রঘুনন্দন, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভবানন্দ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এই টোলেই অধ্যয়ন করেন; সর্ব্বশেষে এই টোলে অপর একজন ছাত্র কিয়ৎকাল অধ্যয়ন জন্য প্রবিষ্ট হন, যাঁহার নিকট ক্ষুরধার বুদ্ধি রঘুনাথের প্রতিভাও মলিন হইয়া পড়িত, এই অল্প বয়স্ক ছাত্র ভুবন বিখ্যাত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ইঁহার সম্পর্কে এস্থলে দুই একটি কথা লিখিয়া লেখনী পবিত্র করিতেছি।

শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ

শ্রীহট্ট ভূমি বৈষ্ণব প্রসূতি। শ্রীহট্টের ইহা পরম সৌভাগ্য যে, বঙ্গ দেশের গৌরবস্তম্ভ স্বরূপ মহাপুরুষগণ এই শ্রীহট্ট ভূমেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীহট্টের মধ্যে ঢাকাদক্ষিণকে পুণ্যভূমি বলিতে আপত্তি নাই; এক সময় কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত এবং শ্রীহট্ট হইতে গুজরাটি পর্য্যন্ত যাঁহার প্রেমহিল্লোলে প্রকম্পিত হইয়াছিল, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এই ঢাকাদক্ষিণের শ্রীবিগ্রহ বলিয়া গৌরব করিতে আমাদিগকে কেহ বারণ করিতে পারিবে না।

আমরা বংশ ও জীবন বৃত্তান্ত ভাগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পবিত্র গুণগাঁথা গান করিব বলিয়া স্থির করিলেও এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, এই শ্রীহট্ট তাঁহার পিতৃ ও মাতৃভূমি। পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণে এবং মাতা শচীদেবী জয়পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।

---

১৪. রঘুনাথ শিরোমণির কাহিনী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে" ২য় ভাগের ৩য় অংশে ১৮৭-১৯০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে; উদ্ধৃত অংশ উক্ত ইতিহাস হইতেই গৃহীত হইল।
বঙ্গীয় ১৩১১ সনের ১ম সংখ্যা "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়" রঘুনাথ শিরোমণি প্রবন্ধ আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা হইতেও কোন কোন স্থল উদ্ধৃত হইবে।

১৫. "–প্রসিদ্ধ আছে, পঞ্চখণ্ডে অবস্থান কালে পঞ্চম বর্ষে নিজ গ্রামস্থ শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের টোলে অধ্যয়নার্থ প্রেরিত হইয়া দুই দিবসে স্বরবর্ণের পরিচয় ও অভ্যাস হওয়ার পর ব্যঞ্জন বর্ণ পরিচয় কালে রঘুনাথ অধ্যাপককে প্রশ্ন করেন যে, "ক" "খ" ইত্যাদি ক্রমে না পড়িয়া "খ" "ক" "জ" "ট" ইত্যাদি ক্রমে পড়িলে কি দোষ হয়? আর দুইটি "ন" তিনটি "শ" ও দুইটি "ব" কেন?'
"দ্বিতীয়তঃ রঘুনাথ মাতার আদেশে একটি টোল হইতে আগুণ আনিতে গিয়া একটি ছাত্রকে বারম্বার বিরক্ত করায় ছাত্রটি এক হাতা জ্বলিত অঙ্গার লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল, বালক রঘুনাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া এক অঞ্জলি বালুকা হাতে লইয়া অগ্নি লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঐ সময় সার্ব্বভৌম মহাশয়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন, 'কালক্রমে এই ছেলেটি এক রত্ন হইবে।' প্রসঙ্গ ক্রমে তৎকালে তথায় রঘুনাথ সম্বন্ধে মহাশয়ের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।"–টীকা,–বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।

১৬. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।
"রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তার নাম।

শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত॥
ভবরোগ নাম বৈদ্য মুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥"—চৈতন্য ভাগবত।

এই উদ্ধৃত পদ্যে যে সকল মহাত্মার নাম দৃষ্ট হইতেছে, তন্মধ্যে এক মুরারি গুপ্ত ব্যতীত আর সকলই ঢাকাদক্ষিণবাসী ছিলেন; কেবল ইঁহারাই নহেন, চৈতন্য ভাগবতেই লিখিত রহিয়াছেঃ—

প্রভুর পিতার সঙ্গে জন্ম এক গ্রাম॥
তিন পুত্র তার কৃষ্ণ-পদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র॥"

এই রত্নগর্ভ শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপক ছিলেন। মফঃস্বলের উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ প্রতিভা স্ফূরণের ক্ষেত্র বলিয়া যেমন বর্ত্তমানে কলিকাতায় গমন করেন, তৎকালে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তদ্রূপ নবদ্বীপে চলিয়া যাইতেন; রত্নগর্ভ আচার্য্যও পুত্রপরিবার সহ তাই নবদ্বীপে গিয়া ভাগবতের টোল খুলিয়াছিলেন। রত্নগর্ভের পুত্রগণও পরে পরম পণ্ডিত ও ভক্তরূপে প্রখ্যাত হন; তন্মধ্যে পদকর্ত্তা যদুনাথ কবিচন্দ্রের নাম করা যাইতে পারে। যে সকল মহাত্মা পদাবলী প্রণয়নে বঙ্গভাষা শিশুকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যদুনাথ একজন। যদুনাথের সুললিত পদাবলীর মাধুর্য্য পদকল্পতরু নামক প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থের পাঠক বিদিত আছেন।

মুরারি গুপ্তের বাড়ী ঢাকাদক্ষিণ হইতে বহুদূরে ছিল না, এবং খুব সম্ভব যে, ব্রাহ্মণভূমি ঢাকাদক্ষিণের টোলেই বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন; পরে নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। এই মুরারি গুপ্ত যে কেবল শ্রীচৈতন্যের এক প্রধান ভক্ত ছিলেন, তাহা নহে, তদ্ব্যতীত ইনি সর্ব্ব প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত গাঁথা রচনা করেন এবং কয়েকটি প্রাঞ্জল পদ প্রণয়নে শিশু বঙ্গভাষাকে চির গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছেন।

তৎকালীন ঢাকাদক্ষিণ কিরূপ ছিল? সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গের আদি ভূমি পঞ্চখণ্ড এই ঢাকাদক্ষিণেরই সংলগ্ন; উভয় স্থানের টোল সমূহে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিত। অধ্যাপকের পূজার পুষ্পচয়নে দলে দলে সকলে সকালে যখন বাহির হইত এবং পুণ্য নদী বরবক্রের ঘাটে দলে দলে যখন স্নানার্থ যাইত, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যাইত। পরস্পরে দেখা হইলেই বিদ্যাচর্চ্চা চলিত। টোলে টোলে ছাত্র মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাইত। তৎকালে ছাত্র প্রকৃতির এই চিত্র নবদ্বীপে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। এই গৌরবান্বিত ঢাকাদক্ষিণে শ্রীমহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র বাস করিতেন,[১৭] শ্রীজগন্নাথ মিশ্র তাঁহারই অন্যতম পুত্র।

শ্রীচৈতন্যের পিতা-মাতা

জগন্নাথ মিশ্র বাল্যবধিই প্রতিভাশালী ছিলেন, পিতা তাঁহার বিদ্যাবৈভব বিবর্দ্ধিত করিতে, তাঁহার উদীয়মান প্রতিভাকে আরও প্রভান্বিত করিয়া তুলিতে, প্রতিভার স্ফূরণ ক্ষেত্র নবদ্বীপে প্রেরণ করেন। জগন্নাথ মিশ্র অত্যল্প কাল মধ্যেই তথায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতঃ পুরন্দর পদবি প্রাপ্ত হন।

তৎকালে সমগ্র বঙ্গদেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাঁহার তুল্য পণ্ডিত কেহ ছিল না, সেই অমিত-ধী

১৭. "শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
পণ্ডিত সদগুণধনী বৈষ্ণব প্রধান॥'
–শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীহট্টের তরফ পরগণাস্থিত জয়পুরবাসী ছিলেন। ঢাকাদক্ষিণ, পঞ্চখণ্ডের ন্যায় জয়পুরও বৈদিক ব্রাহ্মণ ভূমি। জয়পুর তৎকালে এক প্রধান নগর ছিল; এক ভীষণ দুর্ভিক্ষে জয়পুরের ভয়ানক ক্ষতি হয়, স্থানান্তরে তাহা উক্ত হইবে। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সেই দুঃসময়ে জয়পুর হইতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা লইয়া নবদ্বীপে গমন করেন। তথায় কিছুকাল বাস করার পর স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহযোগ্য হইলে, তিনি একটি বরের অন্বেষণ করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রীহট্টের বৈদিক কূল-ভূষণ জগন্নাথ মিশ্র "পুরন্দর" পদবি লাভে নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলীতে খ্যাতাপন্ন হইয়াছেন; নীলাম্বর পরম পরিতোষ পূর্ব্বক এই সুপাত্র পুরন্দরের করেই স্বীয় কন্যা শচীদেবীকে সমর্পণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই শচী পুরন্দরের পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া ধরা পবিত্র করেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীহট্টবাসীগণ তাহাদের নিজের বলিয়া গৌরব করিতে কেহই বারণ করিতে পারিবে না।

ইতিপূর্ব্বে রত্নগর্ভ আচার্য্যের নাম করিয়াছি, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একদা নদীয়ার পথ দিয়া যাইতে যাইতে ইঁহার ভাগবৎ ব্যাখ্যা শুনিতে পাইয়া হঠাৎ ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল হইয়া রাস্তায় পতিত হইয়াছিলেন। শ্রীহট্টবাসীর হরি কথা শ্রবণে সেই সর্ব্ব প্রথম তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের পরিস্ফূরণ। রঙ্গ করিয়া শ্রীহট্টবাসী শ্রীবাস পণ্ডিতকেই তিনি বলিয়াছিলেন—"কালে আমি এমত বৈষ্ণব হইব যে আজ ভব আদি আমার দ্বারস্থ হইবেন।" শুনিয়া শ্রীবাস ইহাকে নিমাইর চাঞ্চল্য ভাবিয়া "বিষ্ণু বিষ্ণু" বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

তৎকালে বহুতর শ্রীহট্টবাসী নবদ্বীপে থাকিতেন, 'উদ্ধতের শিরোমণি' নিমাই পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণের পর নবদ্বীপে গিয়া, ইঁহাদিগকে তাঁহাদের কথ্য ভাষার অনুকরণ করিয়া বিদ্রূপ করিতেন। মহাপ্রভুর বিদ্রূপের তীব্রতায় শ্রীহট্টবাসীরা বাহ্যে যেন চটিয়া উঠিতেন ও বলিতেনঃ—"বল দেখি নিমাই, তুমি কোন দেশীয়? তোমার মা এবং বাপ, তোমার মেসো চন্দ্রশেখর, তোমার সতীর্থ মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি সকলই শ্রীহট্টবাসী; তুমি শ্রীহট্টবাসীর সন্তান হইয়া শ্রীহট্টের ভাষা লইয়া বিদ্রূপ করা কি শোভা পায়?"

এ সব ঘটনা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী হইলেও এস্থলে বলিতেছি তাহার কারণ, তদীয় যত কিছু দৌরাত্ম্য, তাহা আপন দেশীয় ও আপনজনের প্রতিই প্রকৃত পক্ষে যাঁহারা তজ্জন্যে মর্ম্মান্তিক পীড়া অনুভব না করিত, তাঁহাদের প্রতিই প্রযোজ্য হইত।

এই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যাকরণাদির অধ্যয়ন সমাপন করিয়া কিছুদিন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীহট্টবাসী কুশাগ্রবুদ্ধি রঘুনাথ সহ তাঁহার যে রঙ্গ হইত, তাহারই একটা চিত্র এস্থলে উল্লেখ করিব।

রঘুনাথ ও শ্রীচৈতন্য

"একদিন সার্ব্বভৌম রঘুনাথকে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন রঘুনাথ কোন ক্রমেই উত্তর স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। নির্জ্জনে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া তিনি উত্তর চিন্তা করিতে করিতে একবারে ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়েন। সূর্য্যদেব অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন, শাখাস্থিত পক্ষীরা অঙ্গে বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াছে, এ সকল তিনি জানেন না,—উত্তর চিন্তায় তিনি বিভোর! শ্রীচৈতন্যদেব এমন সময় তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে তদবস্থ দৃষ্টে গাত্রে ঝারিস্থিত জলের ছিটা দিলেন। জলের শীতলতায় রঘুনাথের চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইল, তিনি শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া হাসিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন—'তপস্বীর ন্যায় বসিয়া কি ভাবিতেছ?' 'তুমি তাহার কি বুঝিবে?'—রঘুনাথ উত্তর করিলেন। শ্রীচৈতন্য দেব প্রশ্নটি শুনতে বিশেষ জেদ করাতে রঘুনাথ

অগত্যা তাহা বলিলেন। প্রশ্নটি শ্রবনমাত্র শ্রীচৈতন্য তাহার উপযুক্ত উত্তর দিয়া বলিলেন,—"এরই জন্য এত চিন্তা?" রঘুনাথ বিস্মিতভাবে বলিলেন—"নিমাই! তুমি কি দেবতা?"

"ইহার পর আর একটা ঘটনায় রঘুনাথ শ্রীচৈতন্য দেবও ঐ সময় ন্যায়ের টীকা লিখিতেছিলেন; রঘুনাথ কোনক্রমে জানিতে পারিয়া, এই গ্রন্থখানা তাঁহাকে দেখাইতে অনুরোধ করেন। নিমাই স্বীকৃত হইয়া একদিন জাহ্নবী সন্নিধানে রঘুনাথকে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইতে আরম্ভ করেন।"

"রঘুনাথের মনে বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার কৃত গ্রন্থখানা অদ্বিতীয় হইবে, ইহার দ্বারা তিনি খ্যাত হইবেন। কিন্তু নিমাই কৃত গ্রন্থে অদ্ভুত বিচার পদ্ধতি, অচিন্তিত সিদ্ধান্ত শ্রবণে তাঁহার সে ভরসা চালিয়া গেল। চিরপোষিত আশা মিলাইয়া গেল, তাঁহার ধৈর্য্য বিদূরিত হইল এবং চক্ষু ছল ছল করিতে রাগিল। এতদ্দৃষ্টে করুণ-হৃদয় নিমাই বড় ব্যথিত হইলেন এবং বলিলেন,—"ভাই! তুমি কাঁদিতেছ কেন?" রঘুনাথ বলিলেন—"আমার আশা ছিল, ন্যায়ের গ্রন্থ দ্বারা জগতে বিখ্যাত হইব, কিন্তু তোমার এ গ্রন্থ থাকিতে আমার লেখায় কেহ দৃকপাত করিবে না।" তজ্জন্য এত ভাবনা কেন? এই অফল শাস্ত্রের আবার ভাল মন্দ কি?" সহাস্যে ইহা বলিয়াই নিমাই স্বরচিত টীকা খানা জাহ্নবী জলে বিসর্জ্জন করিলেন।[১৮] এইরূপে জগৎ এক মহামূল্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। এই সময় হইতে নিমাই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নও ত্যাগ করিলেন। রঘুনাথের সেই গ্রন্থই পরে পূর্ণ হইয়া 'দীধিতি' নামে খ্যাত হয়।"

"রঘুনাথ প্রতিভাবলে বাসুদেবকে চমকিত করিয়াছিলেন, তিনি সার্ব্বভৌম কৃত টীকায় বহু দোষ বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, নিজ পাঠ্যগ্রন্থ গাঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত "চিন্তামণি" গ্রন্থেও দোষ প্রদর্শন করেন। নবদ্বীপে তখন ন্যায়ের উপাধি-পরীক্ষা ছিল না। রঘুনাথ নবদ্বীপে পাঠ সমাপন পূর্ব্বক মিথিলায় মহাপণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের নিকট অধ্যয়নার্থে গমন করেন।"[১৯]

রঘুনাথ মিথিলায়

রঘুনাথের একটি চক্ষু ছিল না। পক্ষধরের টোলে তিনি উপস্থিত হইলে একটি ছাত্র জিজ্ঞাসাচ্ছলে ব্যঙ্গ করিয়া বলিলঃ—"সহস্রাক্ষ ইন্দ্র ও ত্রিনেত্র বিরূপাক্ষকে সকলেই জানে, এক লোচন তুমি কে হে?"[২০]

রঘুনাথ ছাত্রের বিদ্রূপে ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিলেন,—"ইন্দ্র সহস্রাক্ষ, শিব ত্রিনয়ন, ইহা সত্য; কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে তোমরা অন্ধ; ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি আমারই মাত্র একদৃষ্টি।"[২১]

রঘুনাথ টোলে প্রবিষ্ট হইলেন। অনতিবিলম্বেই তৎপ্রতি পক্ষধরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; নানাদেশীয় ছাত্রগণ তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা দর্শনে বিস্মিত হইল। মিথিলায় অবস্থানকালে তাঁহার

---

১৮. "সেইক্ষণে দয়ানিধির দয়া উপজিল।
নিজ কৃত টীকা গঙ্গামাঝে ডারি দিল॥"
—অদ্বৈতপ্রকাশ।

১৯. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধ।

২০. "আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরুপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবানেকোলোচনঃ॥"

২১. "আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।'
য়ুয়ৎ বিলোচনাঃ শাস্ত্রে ন্যায়েহমেক লোচনঃ॥"

মাতৃবিয়োগ হয়।

এই সময় পক্ষধর মিশ্র "সামান্য লক্ষণা" নামে গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, রঘুনাথ এই গ্রন্থে একদা দোষ ধরেন। ইহাতে মিশ্র রঘুনাথকে বলিলেন,—"কাণা, তুমি কি বিশেষ হেতুতে 'সামান্য লক্ষণা' অস্বীকার কর?"[২২] কাণা বলিলে রঘুনাথের মনঃপীড়া জন্মিত, তিনি অধ্যাপকের কথায় উত্তর করিলেন,—"যিনি অন্ধকে চক্ষুষ্মান করেন, শিশুরও জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করেন, তিনিই যথার্থ অধ্যাপক, তদ্ব্যতীত (অন্যায় তর্কপ্রিয়) অন্যে অধ্যাপক নামধারী মাত্র।"[২৩]

এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইল। রঘুনাথ 'অল্পকাল পরেই শাস্ত্রীয় বিচারে পক্ষধরকে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন এবং ভবিষ্যতে ছাত্রগণকে ন্যায় শিক্ষা ও উপাধি লাভের জন্য আর মিথিলায় যাইতে না হয়, সেই উদ্দেশ্য সম্যক সাধন করিয়া[২৪] মিথিলা হইতে ফিরিয়া আসেন। তিনি অধ্যয়নচ্ছলে প্রশ্ন করিয়া অধ্যাপক পক্ষধরকে অনেকবার বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে অধ্যাপক তাঁহার উপর পরম সন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহাকে ছাত্রগণ মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করেন; কেননা পণ্ডিতেরা পুত্র ও শিষ্যের নিকটেই পরাজয় প্রার্থনা করেন,—"সর্ব্বত্র জয়মিচ্ছন্তি পুত্রাং শিষ্যাৎ পরাজয়ম্"[২৫]

রঘুনাথ মিথিলা হইতে "শিরোমণি" উপাধি লাভ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হরিঘোষ নামক জনৈক সম্পন্ন ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। এই সময়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌম, (উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া) উড়িষ্যা দেশে সপরিবারে গমন করেন। কিন্তু রঘুনাথের আবির্ভাবে তাহাতে নবদ্বীপের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। দেখিতে দেখিতে রঘুনাথের টোল ছাত্র সংখ্যায় পরিপূর্ণ হইল। তখন হইতেই মিথিলা-বিজয়ী শিরোমণি নবদ্বীপে পরীক্ষা গ্রহণ ও উপাধি দানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন।

রঘুনাথের গ্রন্থ

কেহ কেহ বলেন যে, রঘুনাথ উত্তর দিয়াছিলেনঃ–

"নলদ্বীপ কুশদ্বীপ নবদ্বীপ নিবাসিনঃ।
তর্ক সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত শিরোমণি মনীষিণঃ।

এই শ্লোকটিতে পূর্ব্বোক্ত ব্যঙ্গের যথার্থ উত্তর হয় না; অপিচ ইহাতে নলদ্বীপ ও কুশদ্বীপবাসী তর্কসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তোপাধি দুইজন পণ্ডিতের নাম অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক রূপে উক্ত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ রঘুনাথ মিথিলায় যাওয়া মাত্রই উপাধি প্রাপ্ত হন নাই; শ্লোকটিতে শিরোমণি উপাধির উল্লেখও আছে। রঘুনাথের জন্ম শ্রীহট্টে হইলেও, তাঁহাকে নবদ্বীপ প্রবাসী বা নিবাসী বলা অসঙ্গত নহে। কিন্তু এই শ্লোকটি রঘুনাথের এই সময়কার প্রত্যুত্তর নহে।

২২. "বক্ষোজপানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটম।
সামান্য-লক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥"

২৩. "যোহন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নাম ধারিণঃ॥"

২৪. "মিথিলার প্রাধান্য রক্ষার্থে পণ্ডিতগণ কোন ছাত্রকে ন্যায়ের গ্রন্থ নিজদেশে নিতে দিতেন না। রঘুনাথ দেশে আসিবার সময় অধ্যাপক বলিলেন–"এ দেশ হইতে পুস্তক লইয়া যাইবার রীতি নাই।" রঘুনাথ বলিলেন–"আমার নাম রঘুনাথ, বাঁচিয়া থাকিলে আর বঙ্গদেশীয়কে মিথিলায় ন্যায় পড়িতে আসিতে হইবে না।" ইহার কারণ, রঘুনাথের অনেক ন্যায় গ্রন্থই কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। এই উপায়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌমও বঙ্গদেশের ন্যায় লইয়া যান। রঘুনাথের দ্বারা গ্রন্থের অভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়।"–সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

২৫. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস–২য় ভাগ।

রঘুনাথের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার বিষয় যে কেবল শ্রুতি পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহা নহে,—গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত "চিন্তামণি" গ্রন্থের "দীধিতি" নাম্নী টীকা, উদয়নাচার্য্যের "গুণ-কিরণাবলী"র ও বল্লভাচার্য্য কৃত "লীলাবতী'র টীকা, "প্রামাণ্যবাদ", "নানার্থ বাদ", "ক্ষণভঙ্গুর বাদ", "আখ্যাত বাদ", "পদার্থ খণ্ডন", "আত্মতত্ত্ব বিবেক", প্রভৃতি তৎপ্রণীত গ্রন্থগুলি তাঁহার অসামান্য বিদ্যাবত্তা ও ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

রঘুনাথের কাব্য শাস্ত্রেও অধিকার ছিল; প্রবাদ আছে যে, একদা চতুষ্পাঠীতে কয়েকজন অধ্যাপক আসিলে পক্ষধর রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করেন, "ন্যায় শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোনও শাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে?" রঘুনাথ বলিয়াছিলেন—"তর্কে আমার বুদ্ধি কর্কশ হইলেও, কাব্যশাস্ত্রালোচনা কালে আমার মতি সুকোমল, তন্ত্রশাস্ত্রে সদা যন্ত্রিত এবং কৃষ্ণতত্ত্বালোচনা কালে সংযত বলিয়া জানিবেন।"[২৬]

এতদশ্রবণে পক্ষধর বলিলেন,—"তুমি নৈয়ায়িক হইয়া কিরূপে কবিতা রচনা করিতে শিক্ষা করিলে?" পক্ষধরের প্রশ্নের উত্তরে রঘুনাথ উত্তর দিলেন,—যিনি "চিন্তামণি"র চিন্তায় বিব্রত, কবিত্ব তাঁহার নিকট তুচ্ছ বই নহে; কালকুটপায়ী নীলকণ্ঠের সাপ খেলাইতে কি ভয়?'[২৭]

বস্তুতঃ রঘুনাথের কবিত্ব প্রতিভাও ছিল, কিন্তু ন্যায়ের চর্চ্চায় ব্রতী থাকায় তিনি কবিতা রচনার অবসর পান নাই; এই জন্যই "নমঃ প্রামাণ্য বাদায় মৎকবিত্বাপহ্যরিণে" ইত্যাদি শ্লোকে প্রামাণ্যবাদকে নমস্কার করিয়াছেন।

রঘুনাথের একটি চক্ষু ছিল না বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে কাণা শিরোমণি বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার উপাধি শিরোমণি, শুধু এই "শিরোমণি" বলিলেই পণ্ডিত সমাজ রঘুনাথ শিরোমণিকেই বুঝিয়া থাকেন। "ভাষাপরিচ্ছেদ", "সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী" প্রভৃতি প্রণেতা বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন "ন্যায়সূত্র বৃত্তির" সমাপ্তিতে "শ্রীমচ্ছিরোমণিবর" বলিয়া, গদাধর ভট্টাচার্য্য "অনুমান খণ্ড দীধিতি"র টীকা প্রারম্ভে[২৮] "শিরোমণি" বলিয়া ইঁহারই নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও গ্রন্থ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং রঘুনাথও "আত্মতত্ত্ববিবেক" দীধিতিতে সগর্ব্বে আপনাকে "তার্কিক শিরোমণি" বলিয়া দিয়াছেন।[২৯] ক্ষণভঙ্গুরবাদের "দীধিতি প্রকাশ" ন'মীয় টীকা প্রারম্ভে তাঁহাকে "কাত্যায়ন খণিজমণি" বলিয়াছেন।[৩০]

শক্তিবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ আদি বহু গ্রন্থপ্রণেতা দীধিতির টীকাকার গদাধর, 'শব্দশক্তি

---

২৬. "কাব্যেহপিকোমল ধিয়ো বয়মের নান্যে
তর্কেহপি কর্কশ ধিয়ো বয়মের নান্যে।
তন্ত্রেহপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মের নান্যে
কৃষ্ণেহপি সংযত ধিয়ো বয়মের নান্যে॥"

২৭. "কবিত্বং কিয়দৌন্নত্যং চিন্তামণি মনীষিণঃ।
নিপীত কালকুটস্য হরস্যোবাহিখেলনম্॥"

২৮. অভিবন্দ্য মুহুঃ সমাদরাৎ পদপঙ্কজযুগৎ পুরদ্বিষঃ।
বিবৃণোতি গদাধরঃ সুধী রতিদুর্ব্বোধগিরঃ শিরোমণেঃ॥'

২৯. "নির্ণীয় সারং শাস্ত্রাণাং তার্কিকাণাং শিরোমণি।
আত্মতত্ত্ব বিবেকস্য ভাবমুদ্ভাবয় ত্যসৌ॥"

৩০. "কাত্যায়ন খনিস্ত মণেঃ ক্ষণভঙ্গুরবাদ-রহস্য শিরোমণে।
প্রকাশমধি দীধিতি তনুতে সুধীবর শ্রীল গদাধরঃ॥"

প্রকাশিকা' ও "তর্কার্ণব" প্রণেতা জগদীশ, এবং "কারকচক্র" প্রণেতা ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলী এই শিরোমণির দীধিতির টীকা লিখিয়া কীর্ত্তিমান হইয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতবর্গও শিরোমণির যথেষ্ট গুণগান করিয়া থাকেন। এতাদৃশ জগদ্বিখ্যাত শিরোমণি শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

"রঘুনাথের ছাত্রগণের মধ্যে মথুরা নাথ ও রামভদ্র প্রধান। কেহ কেহ রামভদ্রকে রঘুনাথের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। রঘুনাথ আদৌ বিবাহ করেন নাই, তাঁহাকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিতেন, পুত্র কন্যার জন্যই বিবাহের প্রয়োজন, ব্যুৎপত্তিবাদ আমার পুত্র এবং লীলাবতী আমার কন্যা, অতএব বিনা বিবাহেই আমার বিবাহের আশা ফলবতী হইয়াছে। আবার বিবাহের প্রয়োজন কি? রঘুনাথ আজীবন শাস্ত্রালোচনাতেই কাটাইয়া খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলেবর পরিত্যাগ করেন।"[৩১]

রাজার পুত্রকন্যাদি

আমরা রাজ-জামাতা রঘুপতির প্রসঙ্গে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সে যাহাহউক, রাজা সুবিদ নারায়ণ দ্বিতীয় কন্যা বরদা সুন্দরীকেও একটি সৎপাত্রে সমর্পণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পকাল মধ্যেই তিনি বাল বিধবা হন ও পিতৃগৃহে আসিয়া অবস্থিতি করেন। বরদা সুন্দরী একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন দ্বারা নিজ নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। ঐ দীর্ঘিকাকে লোকে "বলদা সাগর" (বরদা সাগর) বলিয়া থাকে। রাজার তৃতীয় কন্যা ভানুমতি, পদ্মিনী লক্ষণান্বিতা পরমা সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার সযত্ন নির্ম্মিত একটি দীর্ঘিকা আছে, তাহা "পদ্মদীঘী" (পদ্মিনীর দীঘী) বলিয়া খ্যাত। রাজা সুবিদ নারায়ণের পুত্রগণের নাম যথাক্রমে সূর্য্য নারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ, শিবনারায়ণ ও কৃষ্ণ নারায়ণ।

রাজা বৃদ্ধকালে রাজবাটীর অল্প দূরে আর একটি নূতন বাটী প্রস্তুত করেন, সেই বাটীতে উঠিয়া গিয়া যথা সম্ভব রাজ্যের ভবিষ্যৎ শৃঙ্খলা করিয়া যাইবেন, তাঁহার এ বাসনা ছিল, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে তাহা পরিপূরিত হয় নাই।

নব নির্ম্মিত বাটী একটি দুর্গরূপে পরিণত হইতে পারে, সে উদ্দেশ্যে বাড়ীর চতুর্দ্দিকে "গড়খাই" কাটাইয়া মৃন্ময় বড় (প্রাচীর প্রস্তুত) করিয়াছিলেন। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি এইজন্য "গড়গাও" নামে খ্যাত হইয়াছে। তিনি নূতন বাড়ীর সম্মুখে (পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে) এক বৃহত্তর দীর্ঘিকা খনন করেন, ইহা "সাগর দীঘী" নামে খ্যাত হয়।[৩২] এতত্তুল্য বৃহৎ দীঘী শ্রীহট্ট জিলার অধিক নাই। বাটিকার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে রাজা বহুস্থান ব্যাপী এক পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করেন, পরে ঐ স্থানে একটি গ্রাম বসিয়া যায়, সেই গ্রামের নাম "ফুলবাড়ী।" সে পুষ্পোদ্যানের ফুল ব্যবহারে লাগে নাই সে বাটিকায় রাজা যাইতে পারেন নাই, কালচক্রে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়।

রাজকর্ম্মচারীগণ

যৎসামান্য ঘটনা হইতে কিরূপে বৃহৎ কাণ্ড সংঘটিত হইয়া থাকে, সর্ষপ প্রমাণ বীজ হইতে কিরূপে মহামহীরুহের উদ্ভব হয়, সুবিদ নারায়ণের রাজ্যবিনাশ-ঘটনা তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। বৈদ্য-কুলতিলক উমানন্দ রাজা সুবিদ নারায়ণের মন্ত্রী ছিলেন। ইটার অন্তর্গত ডলাগ্রামে তাঁহার

৩১. শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ি প্রণীত "নবদ্বীপ মহিমা" ৬০ পৃষ্ঠা। রঘুনাথের বংশ নাই, তাঁহার ভ্রাতার বংশাবলী "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে" মুদ্রিত হইয়াছে; স্থানান্তরে তাহা উদ্ধৃত হইবে।

৩২. এই দীর্ঘিকাতে সহস্রদল পদ্ম আছে।

আবাস ভবন ছিল। বৈদ্যবংশোদ্ভব "পাত্র" দেবানন্দ তৎসন্নিহিত কোন স্থানে বাস করিতেন।[৩৩] রাজ্যের প্রধান শান্তিরক্ষক পূর্ব্বে "পাত্র" বা "টলাপাত্র" উপাধি পাইতেন। রাজার তহশীল কর্ম্মচারীর "মণ্ডল" উপাধি ছিল। 'মণ্ডল ভূমি পরিমাপ করিতেন, গ্রামস্থ লোকদিগের মধ্যে বিচার করিতেন, সকল প্রজার কর একত্র করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন; ব্যবসায়ের উপর দৃষ্টি রাখিতেন, পথ সংস্কার করিতেন এবং সীমা স্থির করিতেন।[৩৪] নারায়ণ নামে কায়স্থ কুলোদ্ভব এক ব্যক্তি সুবিদ নারায়ণের মণ্ডল ছিলেন।[৩৫] রাজার প্রধান লেখকের "পুরকায়স্থ" পদবি ছিল; কায়স্থ বংশজাত গোবিন্দ এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। শেষোক্ত দুইজনের বাসস্থান "মনুকূল" প্রদেশান্তর্গত স্থানে (-ইন্দানগরে) ছিল। রাজকীয় কার্য্য সম্পাদনার্থে তাঁহারা মন্ত্রীভবনের সন্নিকটে সাময়িকভাবে বাস করিতেন। রাজপণ্ডিত পরাশর গোত্রীয়[৩৬] ব্রহ্মানন্দ কাছাড়ি গ্রামবাসী ছিলেন। তদ্ব্যতীত রাজার আরও অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, তদীয় "ভাণ্ডার" রক্ষকের "বিশ্বাস" উপাধি ছিল; পঞ্চেশ্বরবাসী রাজার বিশ্বাস বংশীয়গণ সসম্মানে উক্ত উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। রাজার নাগ বংশীয় জনৈক কর্ম্মচারীর প্রাপ্ত জায়গীর অধুনা "নাগের গাও" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

কর্ম্মচারীদের কর্ম্মচ্যুতি

কুলাঞ্জলী নামক প্রাচীন গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, একদা এক মহালয়া তিথিতে উমানন্দ প্রভৃতি কর্ম্মচারী চতুষ্টয় সাগর দীঘীর তীরদেশ দিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সভাপণ্ডিত সমভিব্যবহারে রাজবাটী অভিমুখে যাইতেছিলেন, দীর্ঘিকা পার্শ্বে উপনীত হইলে, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, বহুব্যক্তি একত্র তথায় স্নান তর্পণ করিতেছে। একজন মাত্র ব্রাহ্মণ ঐ বহু ব্যক্তিকে তর্পণ করাইতেছেন; ফলতঃ তাহাতে কোনরূপ শৃঙ্খলা ছিল না।[৩৭] যাহারা তর্পণ করিতেছিল, তাহারা "সাহা বণিক" জাতীয় লোক। তর্পণার্থী বহুব্যক্তি একত্রিত হইলেও, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের অল্পতা প্রযুক্ত পূর্বোক্ত রীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

এই কাণ্ড দর্শনে মন্ত্রী প্রভৃতির কৌতূহল জন্মিল, কিন্তু অশুদ্ধ মন্ত্রে অবিধি অপ্রণালীতে শাস্ত্রীয় ব্যাপার চলিতেছে দেখিয়া সভাপণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ ক্ষুব্ধ হইলেন। সেইক্ষণে তিনি কৌতুকাবিষ্ট মন্ত্রী প্রভৃতির অভিপ্রায়ানুসারে, সেই অজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তর্পণের সুপ্রণালী বলিয়া দিলেন। যদিও এই ঘটনাটি যৎসামান্য, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহা রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন।

৩৩. কেহ কেহ বলেন, দেবানন্দ টলা গ্রামে বাস করিতেন। বর্ত্তমানে ইটার টলা বলিয়া কোন গ্রাম পাওয়া যায় না! ইটার শ্রীযুক্ত রাম কমল শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, 'টলার বাড়ী' বলিয়া একখণ্ড ভূমি মাত্র আছে।

৩৪. স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত কৃত "ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" ২৬ পৃষ্ঠা।

৩৫. নারায়ণ মণ্ডলের বংশীয়গণ এখনও আছেন, ইঁহাদের বংশপত্র শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় ভাগের পরিশিষ্টে সংযোজিত হইবে।

৩৬. কথিত আছে যে, অপর গোত্রীয় দ্বিজবর্গের সহিত সমাজ সংস্কার লইয়া রাজার মতানৈক্য হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজকার্য্য করিতেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন; পরাশর গোত্রীয় দ্বিজবর্গের সহিত রাজার বিরোধ ছিল না।

৩৭. "এক দ্বিজ অতি উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র কহে।
যে যেমন পারে তাহা শুনিয়া ফুকারে॥
শ্রদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান নাহি নাহি বিধি তন্ত্র।
যে যেমন পারে সেই উচ্চারিছে মন্ত্র॥"
—কুলাঞ্জলী।

পক্ষাপক্ষ সর্ব্বত্রই আছে। মন্ত্রী প্রভৃতির ছিদ্রান্বেষী বিপক্ষগণ এই বিষয়ে প্রতিবাদী হইলে, রাজা সামাজিক বিচারে তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করিলেন। রাজার ন্যায়পরতা সর্ব্বজন বিদিত ছিল, তৎকালে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেও, সামাজিক রীতি নীতি রক্ষার প্রতি, উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল, তিনি মন্ত্রী প্রভৃতির অনুরোধেও ন্যায় ভ্রষ্ট হন নাই।

কি সূত্রে কি হয় বলা যায় না; মন্ত্রী প্রভৃতি দুর্দ্দৈব বশতঃই দোষ স্বীকার করিলেন না, অথবা রাজার কৃপাপ্রার্থী হইলেন না। অল্পদোষে গুরুদণ্ড ব্যবস্থিত হইয়াছে বলিয়া, আদিষ্ট সামাজিক দণ্ডও অগ্রাহ্য করিলেন। রাজা ইহাতে অতিমাত্র কোপাবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত ও কর্ম্মচ্যুত করিলেন। এইরূপে মন্ত্রী প্রভৃতি স্ব স্ব সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মানন্দ দ্বিজই তাঁহাদের সাময়িক "ক্রিয়াদি" (শাস্ত্রোক্ত ব্যাপারাদি) সম্পাদনার্থ পুরোহিত বৃত হইলেন।

ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ইটা নিবাসী শ্রীযুক্ত হর কিঙ্কর দাস মহাশয় বিষয়ে আমাদিগকে লিখিয়াছেন—"রাজা সুবিদ নারায়ণের সময়ে তাঁহার কর্ম্মচারী একজন ব্রাহ্মণ সহ একদিন সাগর দীঘীর পারে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, এই সময়ে ঐ দীঘীর অপর পারে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার যজমান(গণ)কে তর্পণ করাইতেছিলেন। কায়স্থ ভদ্র কর্ম্মচারী সঙ্গীয় ব্রাহ্মণকে শুদ্ধরূপে মন্ত্র উচ্চারণের উপদেশ দিয়া তর্পণের কার্য্য করাইয়া দেওয়ার বিষয় অনুরোধ করেন এবং তদনুসারে ব্রাহ্মণটি এই কার্য্য করাইয়া দেন। এই বিষয় পরে মহারাজের কর্ণগোচর হওয়াতে কর্ম্মচারীগণকে জাতিচ্যুত করেন। এই হইতে মুষ্টিমেয় সাহু জাতির উৎপত্তি হয়।" বস্তুতঃ বৈশ্য জাতীয় সাহা-বণিকদের সহিত সংসৃষ্ট হওয়ায় বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজ হইতে শ্রীহট্টে এই "মুষ্টিমেয়" সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

শ্রীহট্টের দেওয়ান

এই ঘটনার তিন বৎসর পরে আর একটা ঘটনা উপস্থিত হইয়া রাজমন্ত্রীর বিবাদ চিরস্থায়ী করিয়া তুলিল। শ্রীহট্টের বৈদ্য বংশোদ্ভব দেওয়ান আনন্দ নারায়ণ রায়[৩৮] শিবিকা রোহনে কার্য্যস্থানে যাইতেছিলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এক গৃহস্থ বাটিকার সম্মুখে-দর্শনার্থী জনগণের মধ্যে একটি সুলক্ষণ সম্পন্না পরমা সুন্দরী বালিকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অল্প বয়স্কা হইলেও দেওয়ান সুলক্ষণান্বিতা বালিকার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইলেন,[৩৯] এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন। দেওয়ান বাহাদুর অবশেষে অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলেন যে, উক্ত বালিকা সেন বংশোদ্ভবা—বৈদ্য জাতীয়া, সুতরাং তদীয় সঙ্কল্প সিদ্ধির পক্ষে কোন প্রতিবন্ধকই থাকিল না।

এই যে বালিকা, ইঁহার পিতা রাজা সুবিদ নারায়ণ কর্ত্তৃক, উমানন্দ ও সাহা-বণিক সংসৃষ্ট ঘটনায় পরিত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। ইনিও একজন রাজকর্ম্মচারী ও মন্ত্রী পক্ষীয় লোক ছিলেন।

দেওয়ানের সেন-তনয়ার বিবাহ প্রস্তাবের সংবাদ সুবিদ নারায়ণ শুনিতে পাইয়া, যাহাতে এর বিবাহ না হয়, মন্ত্রী প্রভৃতি দেওয়ানের সহানুভূতি লাভ করিতে না পারেন, তজ্জন্য দেওয়ানকে ক্ষান্ত থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ ঘটিত ঘটনা মূলতঃ যৎসামান্য ভাবিয়া দেওয়ান তাহাতে প্রতিনিবৃত হইলেন না,—নারী কুলোত্তমা লক্ষ্মীরূপিনী সেন-তনয়ার পাণি গ্রহণ

---

৩৮. ইঁহার রায় উপাধি হইতেই শ্রীহট্টের রায়নগরের নাম হয়। রায় উপাধির বিষয় পূর্ব্বে (৩য় অধ্যায়ে) কথিত হইয়াছে।

৩৯. প্রবাদ এই যে, উক্ত বালিকা শাস্ত্রোক্ত পদ্মিনী কন্যা ছিলেন। কেবল আঙ্গিক লক্ষণ নহে, প্রবাদানুসারে ইঁহার মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ভ্রমরবৃন্দ উড়িয়া বেড়াইতেছিল এবং বালিকা তাহা নিবারণ করিতেছিল; এইরূপ অবস্থায় [illegible] দেখিয়াছিলেন।

করিলেন। ইহাতে উমানন্দ প্রভৃতি আনন্দিত ও রাজা আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিলেন।

রাজার জিগীষা প্রবর্দ্ধিত হইল, তিনি স্বীয় মত প্রবল রাখিবার ও দেওয়ানকে অপদস্থ করিবার মানসে, পুষ্প পল্লবে শোভিত করিয়া দেওয়ানের বাসগ্রামে (রাঢ় দেশে) এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

তখন পবিত্রতার প্রতি লোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল—সমাজের বন্ধন কঠিনতর ছিল। রাজ প্রেরিত সংবাদে তত্রত্য সমাজপতি, সত্যাসত্য অবগতির জন্য পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন ভদ্র সন্তানকে শ্রীহট্টে পাঠাইলেন। ইঁহারা শ্রীহট্টে আসিয়া সহরের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোক লইয়া এক সভা করেন, এবং দেওয়ানকে নির্দ্দোষ জানিয়া স্বদেশে গমন করেন।

এই কীর্ত্তির মূলে রাজা সুবিদ নারায়ণের কার্য্য-তৎপরতা বিদ্যমান, রাঢ় দেশীয় ব্যক্তিবর্গের মুখে দেওয়ান ইহা জানিতে পারিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। সুবিদ নারায়ণ বুঝিলেন যে, দেওয়ান ইহার প্রতিশোধ লইতে যত্নের ক্রুটী করিবেন না। অতঃপর যখন বিবাদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন তিনিও সাহসের সহিত প্রকাশ্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন দিল্লীর সিংহাসন লইয়া হুমায়ুন ও শের শাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, সেই সময় শ্রীহট্টের বৃদ্ধ রাজা সুবিদ নারায়ণ ও যুবক দেওয়ান আনন্দ নারায়ণ পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন। যাঁহারা রাঢ় দেশীয় প্রতিনিধিগণের সভায় আহূত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ঘটিত ব্যাপার অমূলক বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও এই সময় তিনি সমাজচ্যুত করেন।

এই পরিত্যক্ত ব্যক্তিগণ তখন সুচতুর উমানন্দ কর্ত্তৃক সাদরে পরিগৃহীত হওয়ায়, তাহাদের জনসংখ্যা বিশেষরূপে পরিপুষ্ট হয়। সমাজভ্রষ্ট এই ব্যক্তিগণ কালক্রমে পৃথক হইয়া পড়ে ও প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক সাহু নামে সংজ্ঞিত হয়। এই সব কারণ বশতঃই পূর্ব্ব শ্রীহট্টে সাহু সমাজ ভুক্ত ব্যক্তিদের অদ্যাপি কথঞ্চিৎ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, ইহা তাহাদের পূর্ব্ব প্রভাবের পরিশেষ মাত্র। এই সম্প্রদায়ের বিষয় পরে কথিত হইবে।

রাজার ভ্রাতৃ-বংশীয় শ্রীহট্ট বৈদিক সমাজের সম্পাদক ব্রহ্মচালবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কিশোর চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—"সাহা জাতীয় কোন ব্যক্তিকে তর্পণের মন্ত্র বলিয়া দেওয়ার অপরাধে রাজা সুবিদ নারায়ণ কর্ত্তৃক সমাজচ্যুত মন্ত্রী উমানন্দ প্রভৃতিকে উত্তর শ্রীহট্টের দেওয়ান আশ্রয় দেন। ইহাতে রাজা সুবিদ নারায়ণ সেই দেওয়ানকেও সমাজচ্যুত প্রচার করেন। সেই কারণে তাঁহার সহিত মনোবিবাদ হওয়ায়, উক্ত দেওয়ানের প্ররোচনায় দিল্লীশ্বরের আদেশে "রাজ্য পরিদর্শক" পাঠান বংশোদ্ভব খোয়াজ ওসমান "রাজনগরের রাজাকে" দমন করিতে প্রস্তুত হন। রাজনগরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে শ্রীসূর্য্য মৌজায় খোয়াজের গড়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। রাজার তিন কন্যা ছিলেন, সেই সময়ে কনিষ্ঠা কন্যা ভানুমতীর রূপ লাবণ্যের কথা খোয়াজের শ্রুতি গোচর হইলে, তিনি দিল্লীশ্বরের জন্য উক্ত কন্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন। এতৎ শ্রবণে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, তাহাতেই অবিলম্বে যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হয়।'[৪০]

রাজনগরের যুদ্ধ

সুবিদ নারায়ণের সহিত দেওয়ানের বিবাদ উপস্থিত হইলে, দেওয়ান দিল্লীতে এই

৪০. উপরি কথিত বিবরণ সহ বিদ্যালয় পাঠ্য "আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ" পুস্তিকা ও কুলাঞ্জলী গ্রন্থের ঐক্য আছে। উদ্ধৃত বিবরণে তর্পণের মন্ত্র বলিয়া দেওয়ার কথা লিখিত আছে, উমানন্দের অভিপ্রায়ানুসারে ব্রহ্মানন্দই মন্ত্র বলিয়া দেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বৈদিক সংবাদিনী গ্রন্থে "রাজ্য পরিদর্শক" বলিয়া খোয়াজ ওসমানের কথা ও রাজকন্যা হরণের বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু গ্রন্থকার মুর্শিদাবাদের উল্লেখ করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে এইরূপ অনবধানতার আরও উদাহরণ আছে।

অভিযোগ করেন যে, রাজা রাজস্ব আদায় ক্রমে সমস্তই আত্মসাৎ করিতেছেন, দুর্গ সংস্কার ও সৈন্য বৃদ্ধি করিতেছেন ও বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই অভিযোগ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে দমনের জন্য দেওয়ান আদিষ্ট হন। "রাজ্য পরিদর্শক" খোয়াজ ওসমান সহসা রাজাকে আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। দেওয়ানের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় তিনি অবশেষে রাজবাটী আক্রমণে উদ্যত হন।

রাজা সুবিদ নারায়ণ গুপ্তচর মুখে সমস্ত জ্ঞাত ছিলেন এবং তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। দেওয়ানের বিশেষ উদ্যোগে খোয়াজ ওসমান যুদ্ধার্থে ধাবিত হইলে অনতিবিলম্বেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

দুই দিন যুদ্ধ হইয়া গেল, উভয় পক্ষেরই সৈন্যগণ হতাহত হইল, কিন্তু মোসলমান সৈন্য দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইল না। তৃতীয় দিবসে মহাবিক্রমে তাহারা পুনর্ব্বার দুর্গ আক্রমণ করিল, রাজার প্রধান সেনাপতি জয়সিংহ পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইলেন, সৈন্যগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন ও অদৃশ্য হইয়া গেল। দুর্দ্দান্ত পাঠানগণ তখন জয়োল্লাসে রাজবাটী আক্রমণার্থে ধাবিত হইল, কিন্তু রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে সমর্থ না হইয়া অবরোধ করিয়া রহিল।

পঞ্চম দিবসে উভয় পক্ষে পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল, রাজা স্বয়ং সেনাপতি রূপে সৈন্য পরিচালন করিয়া অতুল্য সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যের উৎকট আস্ফালন, রণমাতঙ্গের গভীর বৃংহন ও অশ্বারোহী সৈন্যের তুরঙ্গগণের কর্কশ হ্রেষারব ইত্যাদিতে রণস্থল তুমুল কোলাহল পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিজয়ভেরী বাজিতে লাগিল, উৎসাহে উল্লাসে সৈন্যগণ নাচিতে লাগিল, বিপক্ষ বিদ্রাবিত করিতে সকলেই উৎসুক হইল। তীরে তীরে রণক্ষেত্র কণ্টকাকীর্ণ হইল, অসি, শূল ও গুলির আঘাতে উভয় পক্ষের সৈন্য ও তুরঙ্গ-মাতঙ্গাদি ছিন্ন ভিন্নাঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল, রণক্ষেত্রের অবস্থা দুর্ণিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। রাজার অগ্নিময় উৎসাহ বাক্যে, অতুলনীয় শৌর্য্য বিকাশের জ্বলন্ত উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া সৈন্যগণ প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল; কিন্তু হায়, সে অতুল উদ্যম ব্যর্থ হইল, প্রখর দাবাগ্নিকে প্রবল বর্ষা প্রবাহ নির্ব্বাপিত করিয়া দিল, রাজার সৈন্যসংখ্যা প্রতিক্ষণে ক্ষয় পাইতে লাগিল, কিন্তু এক প্রাণীও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল না। ইটার উদীয়মান তপন অস্তমিত হইল, রাজা সেই যুদ্ধে নিহত হইলেন! সেনাগণ একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইল, যুদ্ধ আর কে করিবে? পথ আর কে অবরোধ করিবে? দেখিতে দেখিতে পাঠান সেনা রাজবাটি প্রবিষ্ট হইল!!

পৌরজনকে যেন কেহ অপমানিত না করে, এ জন্য খোয়াজ সৈন্য মধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন। তিনি রাণী কমলা সুন্দরীকেও জানাইলেন যে, কন্যা ও পুত্রগণের সহিত স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তিনি আত্মসমর্পণ তাঁহার পক্ষে ভাল হইবে। তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইবে না এবং অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ সম্রাটের জন্য কেবল কন্যাকে গ্রহণ করা যাইবে।

হিন্দু-কুল-কামিনী কমলারূপিনী কমলা সুন্দরী কিছুতেই এই ঘৃণ্য প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; হিন্দু মহিলা মরিতে জানে, কমলার চরম সঙ্কল্প তাহাই। খোয়াজ বিবেচনার জন্য রাণীকে দুই দিন সময় দিয়া আমোদাহলাদে বৃত হইলেন। দুই দিনের অবসর পাইয়া রাণী পরমানন্দিতা হইলেন এবং স্বামীর চিতা প্রস্তুত করিয়া, হিন্দু সতীর পরম ব্রত "সহমরণ" অবলম্বনে সকল জ্বালা নিবাইলেন। ভানুমতীও বিষ ভক্ষণে কুল রক্ষা করিলেন। দুর্ব্বৃত্ত দুরাকাঙ্খের দুর্ব্বাসনার আহুতি স্বরূপ অতুলনীয় রূপগৌরব চকিতে বিলীন হইয়া গেল!

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র পাঠান খোগাজ ওসমান শিবির[৪১] উঠ'ইয়া, স্বয়ং রাজবাটী প্রবেশ করতঃ রাজপুত্র চতুষ্ঠয়কে ধৃত করিয়া লইলেন।

রাজ ভ্রাতাগণের পলায়ন

এই গোলযোগের সময় রাজার ধর্ম্ম নারায়ণ, রামচন্দ্র নারায়ণ ও বীরচন্দ্র নারায়ণ নামক ভ্রাতৃত্রয় ও অন্যান্য কাজ বংশীয়গণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পলায়ন করেন। ধর্ম্ম নারায়ণ চৈত্র ঘাট নামক স্থানে গমন করতঃ এক বাটিকা প্রস্তুত ক্রমে বাস করেন, তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থান "ধর্ম্মপুর" বলিয়া খ্যাত হয়। ধর্ম্মপুর পরে ছয়চিরি পরগণায় খারিজ হয়, ছয়চিরি নিবাসী চৌধুরী বংশীয়গণ ইঁহারই বংশ জাত।

রামচন্দ্র নারায়ণ (ওরফে ব্রহ্ম নারায়ণ) পলাইত অবস্থায় পাগড়িয়া দুর্গ আশ্রয় করেন, পরে পাঠান ভয়ে তথা হইতে পাগড়িয়া নামক পথ দিয়া বরমচাল গমন করেন। গুড়াভই, হরিনগর, সিঙ্গূর, নন্দনগর প্রভৃতি স্থানে তাঁহার বংশীয়গণ অদ্যাপি সসম্মানে বাস করিতেছেন।

বীরচন্দ্র নারায়ণ লংলা পরগণায় গমন করিয়া তথায় বাস করেন, সকি সালামত নামক জনৈক পারস্যাগত মোসলমান '৯০৬ বঙ্গাব্দে'[৪২] দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বহুস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বহুকালে বহুক্লেশে দিল্লীতে লোদী বংশীয় সম্রাটের সময় আগমন করেন। সম্রাট হইতে তিনি শ্রীহট্টে কতক জায়গীর ভূমি প্রাপ্ত হন এবং শ্রীহট্টে আসিয়া বীরচন্দ্র নারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করেন, লংলার প্রসিদ্ধ জমিদার বংশীয় গণ ইঁহারই পরবর্ত্তী।[৪৩] রাজভ্রাত্রাগণের বংশ বিবরণ অতি বিস্তৃত, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় ভাগে সবিস্তারে তাহা বিবৃত হইবে।

সে যাহা হউক, দেওয়ানের পরামর্শে রাজপুত্রদিগকে দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়। দিল্লীতে রাজপুত্রগণ বাধ্য হইয়া মোসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাঁহাদিগকে "খান" উপাধিতে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে জামাল খাঁ, কামাল খাঁ, হাজি খাঁ ও ঈশা খাঁ।

---

৪১. রাজ বাটীর অব্যবহিত দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে "পাঠানটোলা" নামে এক পল্লী আছে, এই স্থানে খোয়াজের শিবির ছিল বলিয়া উহা উক্ত নামে খ্যাত হইয়াছে।

৪২. "মৌলবী আলী আমজদ খাঁর জীবনী" পুস্তিকা দেখ।

৪৩. ১২৬১ বাংলার লিখিত "রাজবংশাবলী তালিকা" কাগজে (শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কিশোর চৌধুরী হইতে প্রাপ্ত) এই কথাটিও লিখিত আছে। লংলার জমিদার বংশীয়গণের কীর্ত্তিকথা বংশ বৃত্তান্ত ভাগে কথিত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

ইটার পরবর্ত্তী কথা

খোয়াজ ওসমানের বিদ্রোহ

খোয়াজ ওসমানের দুর্গের কথা বলা হইয়াছে, খোয়াজের দীঘী প্রভৃতি দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তিনি এদেশে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছিলেন। 'আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ" নামক বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকে ইঁহাকে "জমিদার" বলিয়াই উল্লেখ করা গিয়াছে।[১] যাহা হউক খোয়াজ ওসমান যুদ্ধে রাজা সুবিদ নারায়ণকে পরাভূত করিয়া রাজবাটী লুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হন।

রাজার পুরুষানুক্রমে সংরক্ষিত প্রভূত বিত্ত প্রাপ্ত হইয়া ও নিজ অধীন আফগান সৈন্যের কার্য্য কুশলতায় বিশ্বাস করিয়া খোয়াজ অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া উঠেন; এমন কি, তিনি স্বয়ং "খান" (শাসনকর্ত্তা) উপাধি ধারণ পূর্ব্বক স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

শ্রীযুত কেদারনাথ মজুমদার কৃত "ময়মনসিংহের ইতিহাসে" যে এক খোয়াজ খাঁর বৃত্তান্ত লিখিত আছে, সেই খোয়াজ ও এই খোয়াজ ওসমান এক ব্যক্তি বলিয়া অনেকেই স্থির করেন। খোয়াজের কৃত একটা মসজিদের প্রস্তর-লিপি হইতে জানা যায় যে তিনি অধুনা—লুপ্ত মুয়াজ্জমাবাদে থাকিয়া হুসেন সাহেব অধীনে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব তীরস্থ তদীয় বিজিত যুক্ত-রাজ্য শাসন করিতেন। মুয়াজ্জমাবাদে তিনি ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে এক মসজিদ প্রস্তুত করেন। দক্ষিণ শ্রীহট্টের অধীন ভূজবল গ্রামেও একটি "খোয়াজের মসজিদ" আছে, উর্দ্দুভাষায় তাহাতে কিছু লিখিত আছে, কিন্তু তাহা পাঠ করা যায় না।

ইহা অসম্ভব নহে যে, হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের সহিত তদীয় বংশ বিলুপ্ত হইলে, যখন শের শাহ রাজ্যধিকার করেন, তখন খোয়াজ মুয়াজ্জমাবাদ হইতে ইটায় আগমন করেন। এই স্থানে তিনি শান্তভাবে অবস্থিতি করায় প্রথমতঃ রাজানুগ্রহ লাভে সমর্থ হইলেও, পরে শের শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন করেন।[২] মুয়াজ্জমাবাদের সীমা লাউড় রাজ্য স্পর্শ করিয়াছিল।

খোয়াজের প্ররোচনায় ইতিপূর্ব্বে প্রতাপগড়ের জমিদার বাজিদ, ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গল বাড়ীর জমিদার রায়েসত আলী ও মসনদ আলী প্রভৃতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেদার রায় প্রমুখ পূর্ব্ববঙ্গের আরও ভূম্যধিকারীরা তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। তাঁহারা পরস্পর সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া একদল আফগান অশ্বারোহী সহ সম্রাট শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, তরফ অধিকার করতঃ ইটা, কাণিহাটী ও শ্রীহট্ট সহরে সসৈন্যে সুদৃঢ় ভাবে অবস্থিত করেন।[৩]

যে সময় এই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন লোদী খাঁ নামক এক যুদ্ধ বিশারদ ব্যক্তি

---

১. "নিধিপতির বংশে রাজা সুবিদ নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত শ্রীহট্টের দেওয়ানের মনান্তর হওয়ায় দেওয়ানের প্রার্থনায় দিল্লীশ্বর জমিদার খাজা (খেয়াজ) ওসমান খাঁকে তাঁহার দমনের জন্য আদেশ করেন। ওসমান দেওয়ানের সাহায্যে অনায়াসে সুবিদ নারায়ণকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন।"
—আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ,—২৫ পৃষ্ঠা।

২. On a new King of Bengal. (J. A. S. B.-1872).

৩. The Mazumder Family of Sylhet, P. 3.

শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।[৪] সম্রাট বিদ্রোহ দমনের সম্পূর্ণ ভার ইঁহার উপর অর্পণ করেন।

সম্রাটের আদেশ প্রাপ্ত লোদী খাঁ বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করেন, ক্রমাগত কয়েকটি যুদ্ধে বিদ্রোহীদের বল বহুল পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অবশেষে এক ভীষণ যুদ্ধে খোয়াজ ওসমান খাঁ নিহত হন। মৌলবী মোহাম্মদ আহমদ প্রণীত "শ্রীহট্ট-দর্পণে" লিখিত আছে যে, ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে খোয়াজ ওসমান নিহত হন। ওসমান নিহত হইলে তাঁহার সহকারী অনেকেই ধৃত ও কারারুদ্ধ হওয়ায় বিদ্রোহ দমিত হয়।[৫]

শ্রীসূর্য্য মৌজায় খোয়াজের গড়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে, "খোয়াজ ওসমানের দীঘী" বলিয়া তথায় অধ্যাপি এক বৃহৎ দীঘিকা দেখিতে পাওয়া যায়। খোয়াজ ওসমান মনু নদীর বক্রতা হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে পাহাড়ের মধ্য ভেদ করিয়া এক বৃহৎ খাল কাটাইয়া ছিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই।

রাজপুত্রগণ

"তজকিয়া চৌধুরাই" নামক বাঙ্গালা কাগজে দৃষ্ট হয় যে, পরবর্ত্তীকালে ইটা দেশ উয়াসা, পালপুর, ইন্দেশ্বর ও ইটা এই চারি ভাগে বিভক্ত হয়। তাহাতে ৪৭৫ খানা গ্রাম ছিল এবং ইহার রাজস্ব ১০,৯০,০০০ নিস্তান (শের শাহী মুদ্রা) ধার্য্য হয়।[৬]

রাজা সুবিদ নারায়ণের রাজ্যচ্যুতির পর তাঁহার পুত্রগণ দেশে প্রত্যাগমন করিয়া সম্পূর্ণ রাজ্য করায়ত্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের অধিকৃত ভূভাগই সম্ভবতঃ পরে চারি ভাগে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, রাজপুত্রগণ প্রথমতঃ দেশে আসিয়া একত্রই বাস করেন, পরে বিভিন্ন স্থানে গমন করেন।

জামাল খাঁ ও কামাল খাঁ আজীবন প্রাচীন রাজবাটীতেই বাস করিয়াছিলেন, রাজবাটীর সম্মুখদিগ্বর্ত্তী দীঘী "জামাল খাঁর দীঘী" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। রাজনগরের থানা প্রভৃতি এই দীঘীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। জামাল খাঁ ও কামাল খাঁর পুত্রাদি হয় নাই।

হাজি খাঁ ও ঈশা খাঁ গড়গায়ের নিকট পৃথক বাটী প্রস্তুত ও এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করেন। নীচে বালুকা ছিল বলিয়া এই দীর্ঘিকা "বালিদীঘী" এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম "বালিদীঘীর পার" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

---

৪. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায়েও ইঁহার প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে।

৫. "একবাল নামে জাহাঙ্গীর" নামক প্রাচীন পারস্য গ্রন্থে, সম্রাট জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমকালীয় এক বিদ্রোহী ওসমান খাঁর বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাদশাহের সেনাপতি সুজাত খাঁ কর্ত্তৃক তিনি পরাভূত হন। লোদী কর্ত্তৃক পরাজিত খোয়াজ ওসমানকে ভ্রমতঃ কেহ কেহ শেষোক্ত ওসমান খাঁ হইতে অভিন্ন মনে করেন। ভ্রমবশতঃই শ্রীহট্ট অঞ্চলের খোয়াজ ওসমানকে সুজাত খাঁ কর্ত্তৃক বিজিত বলিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু "একবাল নামে জাহাঙ্গিরী" বিশেষ রূপে আলোচনা করিলে সুজাত পরাজিত ওসমান খাঁকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরবর্ত্তী ব্যক্তি বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

৬. "তজকিরা চৌধুরাই" নামে সন ১০৩৫ তারিখ যুক্ত বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত কাগজের এক প্রস্থ বেজাবেতা নকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তজকিরা অর্থে স্মারকলিপি। এই কাগজ নির্ভরে কেহ কেহ রাজকুমারদের সময় নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু এতদ্বারা রাজপুত্রদের সময় নির্ণয় পক্ষে নানা অসুবিধা আছে। সমালোচনায় ইহা প্রকৃত দলিল বলিয়া গণ্য হয় না। পরবর্ত্তী বংশীয়গণের মধ্যে দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, সেই মোকদ্দমায় "তজকিরা চৌধুরাই" প্রমাণ্য দলিল নহে বলিয়া নথিভুক্ত হয় নাই। ফলতঃ ইহা রাজপুত্রগণের অধিকৃত ভূমি সম্পর্কীয় পরবর্ত্তী কালের লিখিত একটা স্মারকলিপি মাত্র। তবে এই কাগজের দ্বারা ইহা জানা যাইতেছে সে সন ১০৩৫ তারিখের পূর্ব্ব হইতেই "চৌধুরাই" সনন্দ প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। আর একটা কথা–সোয়া দুই নিস্তানে শের শাহী এক টাকা হয়, এই কাগজেও নিস্তানের উল্লেখ আছে, ইহাতে রাজপুত্রগণের সময় বহু পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়াই পড়িতেছে।

অধস্তন রাজ-বংশীয়গণ

হাজি খাঁ ও ঈশা খাঁর পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের নাম জ্ঞাত হওয়া যায় নাই,[৭] হাজি খাঁর বৃদ্ধ প্রপৌত্র দুইজন ছিলেন, তাঁহাদের নাম শাহ মোহাম্মদ ও আব্দুল মজিদ। আব্দুল মজিদ বালিদীঘীর পারে এক মসজিদ প্রস্তুত করিয়া খ্যাতনামা হইয়াছেন, তদ্বংশীয়গণ ও তথাকার অধিবাসীবর্গ অদ্যাপি উক্ত মসজিদে উপাসনা করিয়া থাকেন।

ইঁহার সাত পুত্র, তন্মধ্যে আব্দুল মনসুর জ্যেষ্ঠ, তিনি বালিদীঘীর পার হইতে ভিন্ন স্থানে গমন করতঃ "মনসুর নগর" গ্রাম স্থাপন ও তথায় এক বাটী প্রস্তুত ক্রমে বাস করেন।

মন্‌সুরের আব্দুল মজঃফর ও আব্দুল ফজল নামে দুই পুত্র হয়। ফজল, মন্‌সুর নগরের বাটীর উত্তরে মধিপুর গ্রামে গিয়া নূতন বাটী প্রস্তুত করিয়া বাস করেন। এই বাটী এখন জনশূন্য। বাটীর সম্মুখের পুষ্করিণী এখনও ফজলের নাম রক্ষা করিতেছে।

এই সময়ে ইটা হইতে আলীনগর প্রভৃতি স্থান খারিজ হইয়া যাওয়াতে তাঁহাদের সম্পত্তি বহু পরিমাণে হ্রাসতা প্রাপ্ত হয়,[৮] তখন স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারার্থ ইঁহারা পঞ্চগ্রাম নিবাসী রাজারাম দাস নামক জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দূত নিযুক্ত করিয়া দিল্লী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রাজারামের পরিচয়

রাজারামের প্রপিতামহ লক্ষ্মীকান্ত দাস চিকিৎসাজীবী ছিলেন। ত্রিপুরার নুরনগরস্থ্ কেন্দাই গ্রাম তাঁহার আদি বাসস্থান ছিল। ব্যবসায়ের অনুরোধে তিনি ইটার পঞ্চগ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার পুত্রের নাম সুন্দর রাম, তাঁহার পুত্র যাদব রাম; রাজারাম য্যাদব রামেরই প্রথম সন্তান। রাজারাম ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা প্রজাপতি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রজাপতি সংস্কৃত ভাষায় চণ্ডীর একখানা টীকা রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।[৯] রাজবংশীয় "দেওয়ানগণ" সুবিজ্ঞ বুদ্ধিমান রাজারামকে আপনাদের দূত নিযুক্ত করেন। রাজারাম দূত স্বরূপ

৭. বরমচালবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ চৌধুরী বি. এ আমাদিগের নিকট যে বংশপত্র প্রেরণ করেন তাহাতে এই তিন পুরুষের স্থলে "নাম অজ্ঞাত" লিখিত আছে। আরও দুই খানি বংশপত্রে এইরূপই লিখিত। কিন্তু শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চৌধুরী পরে আমাদিগকে যে বংশ-পত্রিকা প্রেরণ করেন, তাহাতে এই তিন পুরুষ, মধ্যে থাকার বিষয় স্বীকৃত হয় নাই। তাহা হইলেও রাজা সুবিদ নারায়ণকে জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমকালবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। রঘুনাথ শিরোমণির ভ্রাতা রাজজামাতা ছিলেন। শিরোমণির অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বংশাবলী (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম খণ্ড ২৯৫/২৯৬ পৃষ্ঠা এবং বিশ্বকোষ "কুলীন" শব্দ ৩৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।) এবং তদীয় ভ্রাতা রঘুপতির বংশাবলীর পুরুষ সংখ্যার সহিত রাজ বংশাবলীর পুরুষ সংখ্যার অনৈক্য হইবে না। তদ্ব্যতীত শিরোমণির সতীর্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃব্য পুরুষোত্তমের বংশাবলী, রাজার পরাভবকারী খোয়াজ ওসমান নিহন্তা লোদী খাঁর বংশাবলী, রাজকর্ম্মচারী নারায়ণ মণ্ডলের বংশাবলী ও রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রীয় পরিণেতা সকি সালামতের বংশের পুরুষ সংখ্যা সহিত রাজবংশাবলীর পুরুস সংখ্যার অবিসংবাদী ঐক্য দৃষ্ট হইবে। ঐ বংশপত্রগুলি আলোচনায় রাজাকে কোনরূপেই জাহাঙ্গীর বাদশাহের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী না বলিয়া পারা যায় না। উল্লিখিত বংশপত্রগুলি বংশবৃত্তান্ত ভাগে যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

৮. পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৯. চণ্ডী টীকার প্রথম শ্লোক এইঃ–

> "চণ্ড বিনাশিনীং চণ্ডীং নত্বা বিঘ্ন নিবারিণীং।
> চণ্ডীভাব বিবোধায় চণ্ডী টীকা প্রতন্যতে॥"

শেষ শ্লোক এইঃ–

> "শ্রীপ্রজাপতি দাসেন পঞ্চগ্রাম নিবাসিনা।
> চণ্ডীকা প্রীতয়ে তস্যাঃ পদের্পিতং কৃতং ময়া॥"

দিল্লী উপস্থিত হন, তাঁহার দৌত্য মঞ্জুর হইলে তিনি বাদশাহ হইতে এক সনন্দ প্রাপ্ত হন।[১০]

রাজারাম ধর্ম্ম পরায়ণ লোক ছিলেন, তিনি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ঠাকুর বাণীর[১১] শিষ্য হইলেও স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তে কাত্যায়ন গোত্রীয় জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশের নিকট শক্তি মন্ত্র গ্রহণ করেন। শ্রীহট্টের (সহরের) জঙ্গলবাসী জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহাকে একছড়া জপমালা ও এক শালগ্রাম শিলা দিয়া বলিয়াছিলেন যে, শিলার প্রভাবে তাঁহার কোনরূপ বিপদ ঘটিবে না এবং মালার প্রভাবে তিনি খ্যাতনামা লোক হইবেন। এই শিলা মালা লাভের পরই তিনি দূত নিয়োজিত হন।

রাজারাম, শ্রীধর নামে এক দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীধরপুর গ্রাম স্থাপন করেন। তিনি স্বপ্নাদেশে এক শাল্মলী বৃক্ষে কালীর অধিষ্ঠান জানিতে পারিয়া কালীর প্রকাশ করেন। রাজারামের এই কীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।[১২]

রাজারামের প্রসঙ্গে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। রাজারামের দৌত্যমূলে ইটার রাজবংশীয় জমিদারদের ভূসম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলেও পরে এই সম্পত্তি নিতান্ত হ্রাস হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত ফজলের পুত্র আব্দুল নওয়াজ রাজনগরে নিজ বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই বাটিকাও এখন মনুষ্য বাসশূন্য। নওয়াজের পুত্র মোহাম্মদ হাজির প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন, ইঁহার পুত্রাদি হয় নাই।

আব্দুল মজঃফরের পুত্র আব্দুল রহুপ, তৎপুত্র মোহাম্মদ আনিস, ইঁহার পুত্রের নাম মোহাম্মদ আফজল (ওরফে গাবুর মিয়া), তাঁহার পুত্রের নাম মোহাম্মদ ইয়াকুব; ইয়াকুবের আমীর উন্নেসা নামে এক কন্যা বর্ত্তমান আছেন। আফজল স্বয় পৌত্রী আমীর উন্নেসাকে ঈশা খাঁ বংশীয় আব্দুল খালেক চৌধুরীর সহিত বিবাহ দিয়া সমস্ত সম্পত্তি "অক্‌ফ" করিয়া দিয়াছেন।

ঈশা খাঁ বংশ

রাজা সুবিদ নারায়ণের চতুর্থ পুত্র ঈশা খাঁর বৃদ্ধ প্রপৌত্রগণের নাম ইলিয়াস, ইস্রাইল ও ইসমাইল খাঁ ছিল। জ্যেষ্ঠ ইলিয়াসের পুত্র মোহাম্মদ সফি, তৎপুত্র মোহাম্মদ তকি (ওরফে এবা) তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ সকি, সকির পুত্রের নাম মোহাম্মদ মনসুর (ওরফে কটু মিয়া)।

কটুমিয়া লংলা পরগণার কানাইটিকরবাসী নজম্বর আলী চৌধুরীর কন্যা করিমউন্নেসাকে বিবাহ করেন। এই রূপবতী রমণীর চরিত্র-দোষ ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে (১২৭৭ বাং শ্রাবণ মাসে) কটুমিয়া নিজ শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছিলেন। করিমউন্নেসা পিত্রালয়েই ছিলেন, তিনি

---

১০. এই পারস্য সনন্দ স্থানে স্থানে অপাঠ্য হইলেও মূল বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, সনন্দের মর্ম্ম এইঃ–"বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কর্ম্মচারী, চৌধুরী, পাঠওয়ারী ও কানুনগো সকল, সরকার শ্রীহট্ট জানিবা যে, যাদব রামের পুত্র পং ইটা সাং পাঁচগাও নিবাসী রাজারাম দাস উক্ত বিভাগের চৌধুরী আব্দুল মজঃফর প্রভৃতির পক্ষে দিল্লী রাজধানীতে উজ্জ্বল ও পবিত্র রাজ দরবারে হাজির হইয়া রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ত্তব্য বিষয় সকল রাজধানী সম্পর্কীয় কর্ম্মচারীর কর্ণগোচর করায় তাহা শ্রবণ ও গ্রাহ্য করা গেল এবং মহামান্য বাদশাহ অতি সম্মানিত সনন্দ প্রদত্ত হইল। ২২ যিসদা।"

মোহরে মুদ্রিত–"উমদ্ উল মুল্‌ক। আমিনুদোলনা আজিম খাঁ ফিদ্দরী আরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ গাজী।"

১১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৪র্থ ভাগে ইঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইবে।

১২. পাঁচগায়ের শ্রীযুত হরকিঙ্কর দাস মহাশয় এই বংশোদ্ভব, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৩য় ভাগে এই বংশ বিবরণ কথিত হইবে।

উপপতিগণের সহিত ষড়যন্ত্র ক্রমে তাঁহাকে হত্যা করিয়া, মৃতদেহ তদীয় বাটীতে প্রেরণ করেন। "কটুমিয়ার গ্রাম্য গীতি"তে এই বিষাদাত্মক কাহিনী এখনও শ্রুত হওয়া যায়।

এই বিষয়ে পরে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায়, (শ্রীহট্টের তদানীন্তন জজ কবার্ণ সাহেবের আদেশে) করিমউন্নেসা ও তাঁহার উপপতি ত্রয় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। শ্রীহট্টে ইহা এক ভয়াবহ অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা, এক সময়ে চারি ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কথা ইতিপূর্ব্বে শুনা যায় নাই।

পূর্ব্বোক্ত ইস্রাইল খাঁর পুত্রের নাম জাফর বা আলাওল খাঁ, তৎপুত্র মোহাম্মদ এতিম (মতান্তরে সকি), তাঁহার পুত্র আলী। আলীর পুত্রাদি হয় নাই।

সর্ব্ব কনিষ্ঠ ইসমাইল খাঁর ষষ্ঠ পুরুষে আব্দুল খালেক চৌধুরী (খ্যাত সিকান্দর মিয়া) জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। বর্ত্তমানে ইনিই তত্রত্য প্রধান জমিদার। ইহার পুত্রের নাম আব্দুল হামিদ চৌধুরী।

রাজা সুবিদ নারায়ণের বংশীয়গণ মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দু রীতি নীতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়া থাকেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দু গৃহে বিবাহাদি উৎসবে ইঁহারা যোগ দিয়া থাকেন; হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক বিরোধ উপস্থিত হইলেও ইঁহারাই মধ্যস্থ হইয়া বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দিয়া থাকেন। বলিতে গেলে তরফের ন্যায় ইটাও হিন্দু মোসলমান মধ্যে একরূপ সামাজিকতা ও বাধ্যবাধকতা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে টীকা

ইটার রাজা সুবিদ নারায়ণের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে মতান্তর দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাঁহার মতে রাজা সুবিদ নারায়ণ, জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ওসমান খাঁ কর্ত্তৃক পরাভূত হন। নিজ কথার প্রমাণ স্থলে তিনি "একবাল নামে জাহাঙ্গিরী" নামক পারস্য গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ জাহাঙ্গীর বাদশাহের বখ্‌শী মতমিদ খাঁর প্রণীত; ওসমান ও সুজাত খাঁর যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তৎকৃত "একবাল নামে জাহাঙ্গিরী" গ্রন্থ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কালীজয় প্রেসে মুদ্রিত হয়। তাহাতে ওসমান ও সুজাত খাঁর যে যুদ্ধ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

বিদ্রোহী ওসমান খাঁকে দমনের জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে সুজাত খাঁ প্রেরিত হন। কেশওয়ার খাঁ, এপ্তেখার খাঁর, সৈয়দ আদমবারা, শেখ আওজা ও মতবিদ খাঁ, এতেমাম খাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বীরপুরুষগণ তাঁহার সাহায্যে নিযুক্ত হন। সুজাত খাঁ সসৈন্যে বিদ্রোহীদের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে ওসমান খাঁ বিশাল বাদশাহী সেনাদলের আগমন সংবাদে বিশেষ সতর্ক হন ও এক নদী পার্শ্বস্থিত দমদমায় যুদ্ধ স্থান নির্ণয় পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হইলে ওসমান খাঁ একটি বৃহৎকায় হস্তী সম্মুখে রাখিয়া বাদশাহী সৈন্যের উপর পতিত হইয়াছিলেন। প্রথমেই বাদশাহ পক্ষে সৈয়দ আদমবারা ও এপ্তেখার খাঁ (বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বরক্ষক সেনাপতিদ্বয়) নিহত হন, তৎপর সুজাত খাঁর পুত্র ও ভ্রাতাগণও মৃত্যু শয্যায় শায়িত হন। অতঃপর ওসমান খাঁ সুজাত খাঁকে আক্রমণ করিলে, তদীয় আরদালী ওসমানের হস্তীর শুণ্ডে আঘাত করে, সেই প্রচণ্ড আঘাতে হস্তী পলায়ন পর হয়। ইহার পর এক গুলির আঘাতে আহত হইয়া ওসমান স্বীয় শিবিরে নীত হন ও মৃত্যু মুখে পতিত হন। ওসমানের ভ্রাতা আলী ও পুত্র মুম্‌রেজ শিবির ছাড়িয়া রাত্রেই পলায়ন করেন। অবশেষে মুম্‌রেজ দিল্লীশ্বরকে ৪৯টি হস্তী

উপঢৌকন দিয়া আত্মসমর্পণ করেন।

(একবাল নামে জাহাঙ্গিরী—৬৪ পৃষ্ঠা)

শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র চৌধুরীর মতে এই যুদ্ধ স্থল শ্রীহট্ট জিলায় অবস্থিত। তিনি বলেন, পূর্ব্ব বর্ণিত দমদমা অত্রত্য লাখাটা নদীর তীরবর্ত্তী করাইয়া হাওর বলিয়া বর্ত্তমানে খ্যাত। ইহার প্রায় তিন মাইল ব্যবধানে শ্রীসূর্য্য মৌজায় ওসমানের গড় বিদ্যমান। কেননা তাঁহার মতে সুজাত পরাজিত ওসমান খাঁই রাজা সুবিদ নারায়ণের পরাভবকারী।

এই কথার আনুষঙ্গিক প্রমাণ স্বরূপ তিনি "তজকিরা চৌধুরাই" নামক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত কাগজের উল্লেখ করিয়া বলেন যে শাহজাহান বাদশাহের সময় ইটা, রাজপুত্রদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। এই কাগজে সন ১০৩৫ তারিখের সহিত রাজপুত্রগণের নাম আছে। অতএব সুবিদ নারায়ণকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক বলাই সঙ্গত।

তিনি আরও বলেন যে, আকবরের "ওয়াসিল তোমার জমা" হিসাবে ইটার নাম নাই, যদি এই হিসাব প্রস্তুতের পূর্ব্বে ইটা বিজিত হইত, তবে অবশ্যই শ্রীহট্টের মহল সংখ্যায় ইটার নাম থাকিত।

কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির ভ্রাতা, রাজকন্যার স্বামী নির্দ্ধারিত হইলে এই সকল মতবাদের কিছু মাত্র মূল্য থাকে না, সুতরাং তাঁহার মতে "সম্ভবতঃ রঘুনাথ নামে রঘুপতির কোন ভ্রাতা ছিলেন না।" এ কথার পোষকার্থে "বৈদিক-পুরাবৃত্ত" নামক এক অজানা গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে।

বৈদিক পুরাবৃত্তে লিখিত আছে যে, "রঘুনাথ শিরোমণি শাহজলাল বিজিত প্রসিদ্ধ গৌড় গোবিন্দের সভাসদ অষ্টাবিংশ প্রদীপ প্রণেতা মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের ভ্রাতা ছিলেন;—রঘুপতির ভ্রাতা নহেন।"

শ্রীযুক্ত হরকিঙ্কর দাস ও শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য আনন্দবাজার পত্রিকায় এ সকল আপত্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

যথার্থ তত্ত্বপ্রচার করাই ইতিহাস লেখকের প্রধান কর্ত্তব্য। যখন দুই বিসংবাদী মত উপস্থিত হয়, সত্যের সূক্ষ্ম নিরপেক্ষ আলোকে, সমালোচনা সমার্জ্জনীর সহায়ে আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত করিয়া তখন প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিতে হয়। আমরা একতর অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র চৌধুরীর মত উপরে বলিয়াছি, স্বয়ং কোনরূপ সমালোচনার ভার গ্রহণ না করিয়া, দ্বিতীয় মতটাও এ স্থলে প্রকাশ করিতেছি। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই তিন মাসের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সার সংগ্রহ ক্রমে দ্বিতীয় মতটি লিপিবদ্ধ হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, এ মতটি পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বত্র বহুল প্রচলিত।

দ্বিতীয় মতের মর্ম্ম

রাজা সুবিদ নাবায়ণ যে আকবর বাদশাহের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা অনেকেই বলেন। ১২৯৩ সালে প্রকাশিত "শ্রীহট্ট-দর্পণ" পুস্তকের ৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, "সম্রাট শের শাহ কর্তৃক লোদী খাঁ ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজবিদ্রোহী খোয়াজ ওসমান প্রভৃতিকে দমনের জন্য শ্রীহট্ট প্রেরিত হন। এই খোয়াজ ওসমান তৎপূর্ব্বে ইটার সুবিদ নারায়ণের পুত্রগণকে জাতিভ্রংশ করিয়া মোসলমান করেন।"[১৩]

---

১৩. ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে শের শাহের মৃত্যু হয়, ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে শের শাহের পুত্র সলীম শাহ ভারত সম্রাট ছিলেন।

আলী আমজদ খাঁর জীবনী পুস্তিকায় লিখিত আছে যে, "সন ৯০৬ বঙ্গাব্দের শেষ ভাগে এমন রাজ বংশীয় সকি সালামত নামক জনৈক ব্যক্তি দিল্লী উপস্থিত হইলে, লোদী বংশীয় সম্রাট কর্তৃক শ্রীহট্টে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া পৃথিমপাশায় বাস করেন। তিনি রাজনগরের রাজকন্যার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।" ১২৬২ বঙ্গাব্দের হস্তলিখিত রাজবংশাবলী পত্রিকায় লিখিত আছে যে, "রাজভ্রাতা বীরচন্দ্র নারায়ণের কন্যাকে সকি সালামত বিবাহ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি।

অতএব—"বিহলোল লোদীর সময়ে রাজার প্রাদুর্ভূত হওয়া দৃষ্ট হয়, এবং শের শাহ দিল্লীর সিংহাসনে থাকা কালেই রাজা সুবিদ নারায়ণের রাজত্ব শেষ হইয়াছিল।"

—(আনন্দ বাজার পত্রিকা ৯-৪-১৩১৩ বাং)

যদি ইহাই হয়, তবে রাজা সুবিদ নারায়ণের পরাভবকারী খোয়াজ ওসমান কিরূপে জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমকালবর্ত্তী হইতে পারেন?

আনন্দ বাজার পত্রিকায় এই কথা আলোচিত হইয়াছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহের সেনানায়ক সুজাত খাঁ কর্ত্তৃক যে ওসমান খাঁ পরাভূত হন, তিনি সুবিদ নারায়ণকে পরাভবকারী খোয়াজ ওসমান হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। সুজাত খাঁ বিজিত মুম্‌রেজ—পিতা ওসমান খাঁকে রাজ-বিজেতা খোয়াজ ওসমান খাঁ মনে করা ভ্রান্তি বই নহে।

মুম্‌রেজ-পিতা বিদ্রোহী ওসমান খাঁ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি,[১৪] তাঁহার জন্য মোগল বাদশাহকে সন্ত্রাসিত হইতে হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে দমনের জন্য বিশাল মোগলবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। যথাঃ—

"The haughty Osman Khan, at the head of 20,000 Afghans, considered himsedf as a second Alexander, and breathed nothing but war, and independence."

"The Governor, having been thus failed in amicable over tures, lost not another moment in making preparations to subdue this haughty spirit: he fitted out a numerous and well-appointed army, the command of which he entrusted to Shujaet Khan, a brave and experienced officer, with orders to expel the whole of the turbulent Afghans from Orissa."

"Upon the approach of the royal army, Osman Khan advanced to the banks of the Subanreeka river, the neighbour hood of which abounded with swamps and quasmires, and was consequently unfavourable for the operations of the Moghul cavalry. The imperial general, however, advanced in battle array, and found the Afghans drawn out ready to receive him. Osman had placed his war-elephants in front of the colums destined for the attack; and, upon the signal being given these furions animals advanced, and bore down every thing before them. Syed Adam and Iftikhar khan, who com-

১৪. বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশ নন্দিনী"তে এই ওসমানের কথা উল্লেখিত হইয়া তাঁহাকে বঙ্গ সাহিত্য সেবীর নিকট চির প্রসিদ্ধ করিয়াছে।

manded the right and left wings of the imperial army, with a number of other Chiefs of note, were soon extended on the plain."

"Shujaet khan, percciving his intention spurred on his horse, and wounded the elephant with his spear; he then drew his sword, and inflicted four other wounds on the animal, but the furious beast only more irritated by his wounds, made a desperate charge, and overthrew the general's horse. Shujaet, however, extricated himself from his steed." **

"At this crisis, when a number of royal geénrals having been killed and many more desabled by wounds, a universal panic pervaded the army, by chance, a Moghul ball, from some unknown hand, struck Osman in the forehead." ***

"Osman reached his tent nearly exhausted, and expired during the night. Early the next morning. Voly and Mumriez, the brother and son of the deceased, fled with the body to their fortress."

"Shujaet Khan having strictly complied with these proposition, the next day Vely and Momriez, with a number of the deceased chief's relations, waited on the imperial general, and presented him forty-nine elephants and some jewels."

-History of Bengal, by Charles Stewart, Sect. VI. PP. 240, 241.

উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ দেওয়া অনাবশ্যক, "একবাল নামে জাহাঙ্গিরী" গ্রন্থ হইতে এই যুদ্ধ বিবরণের যে মর্ম্ম উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার বিশেষ পার্থক্য নাই।

যাঁহারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান যে, এই যুদ্ধ শ্রীহট্টে,—লাখাটা ছড়ার তীরদেশে ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের প্রয়াস বৃথা; সুজাত খাঁর সহিত ওসমান খাঁর ভীষণ যুদ্ধ উড়িষ্যা দেশে, সুবর্ণ রেখা নদীর তীরে সংঘটিত হয়। অতএব শ্রীহট্টের লোদী খাঁ পরাজিত খোয়াজ ওসমান এবং উড়িষ্যার সুজাত খাঁ কর্তৃক পরাভূত ওসমান খাঁ দুই পৃথক ব্যক্তি।

"তজকিয়া চৌধুরাই" কাগজ[১৫] সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দেওয়ানী মোকদ্দমায় ইহা প্রামাণ্য কাগজ বলিয়া গণ্য হয় নাই। এই কাগজ দ্বারা কিছুই প্রমাণ

১৫. তজকিরা চৌধুরাই কাগজ ১৬ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। এই কাগজে ২য় পৃষ্ঠা হইতে ১৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কেবল গ্রামের নামাবলী। প্রথম পৃষ্ঠায় যে সামান্য বিবরণ আছে, তাহা এইরূপঃ–

"শ্রীদুর্গা সন ১০৩৫

তজকিরা চৌধুরাই পরগণে ইটা মোকাম তরফ
আমল মৃজা মোহাম্মদ সরিফ মৃজামোহাম্মদ তকি ও
দেওয়ান ভাইয়া ভৈরব দাস সন ১০৩৫

মৌজা চিনস্তান

হিং জামাল খাঁ

(অপাঠ্য) (অপাঠ্য)

৩৭৫ ৯৩৯৬৪

শ্রীঈশা খাঁ, শ্রীহাজি খাঁ, শ্রীকামাল খাঁ শ্রীজামাল খাঁ, শ্রীরূপরাম শ্রীস, (অপাঠ্য) শ্রীরতিরাম শ্রীভবানন্দ রায়।"

করা যাইতে পারে না। ইহাতে রাজপুত্রগণের নাম আছে, আরও চারিজন ভদ্রলোকের নাম আছে, ইটার কয়েকটি গ্রামের নাম আছে ও ১০৩৫ সন লিখা আছে মাত্র। এতদ্বারা কোন বিষয়ই বর্ত্তমানে নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

যখন তজকিরা স্মারকলিপি লিখিত হয়, পূর্ব্বোক্ত তারিখটা সেই সময়কার। "তজকিরা" রাজপুত্রগণের বর্ত্তমান থাকা কালে লিখিত হওয়ার কোন প্রমাণ নাই; ইহা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদের কাহারও সময় লিখিত হইয়াছিল। "সম্রাট শাহজাহান চন্দ্র বৎসরের গণনার প্রবর্ত্তন করেন, ১০৩৫ হিঃ সনের বহু পরে তিনি সিংহাসনারূঢ় হন; সুতরাং রাজত্ব লাভ করার পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক রাজপুত্রগণকে বন্দোবস্ত দেওয়া অসম্ভব।' ফলতঃ "সম্রাট শাহজাহান হইতে রাজপুত্রগণ ইটার বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন" এ কথা বলা যাইতে পারে না।

তারপর "ওয়াশীর তোমার জমার" কথা। আকবর বাদশাহের ওয়াশীল তোমার জমার হিসাবে ইটার নাম দৃষ্ট হয় না বলিয়া, ইটার রাজা সুবিদ নারায়ণকে আকবরের পরবর্ত্তী বিবেচনা করা হাস্যকর ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নহে। আকবর-রাজত্বে সমগ্র শ্রীহট্ট আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। ইটা এই আট ভাগের একটির অন্তর্ভুক্ত ছিল,—ইটা প্রতাপগড়-পঞ্চখণ্ড মহলের অন্তর্গত ছিল; এই জন্য ইটার পৃথকরূপে নাম উল্লেখের প্রয়োজন হয় নাই। ওয়াসিল তোমার জমা হিসাবে শ্রীহট্টের তরফ, ঢাকাদক্ষিণ, দেওরালী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বহু স্থানের নাম উক্ত হয় নাই, ঐ অনুক্ত স্থানগুলি আকবর-সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত।

অতঃপর বৈদিক পুরাবৃত্তের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। পুরাবৃত্ত গ্রন্থ[১৬] সম্বন্ধে এই ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ ৫ম অধ্যায়ের টীকা-বিবরণীতে কতক বলা গিয়েছে, সুতরাং এ স্থলে বিশেষ আলোচনার আবশ্যক নাই।

রঘুনাথ শিরোমণি ভারত বিখ্যাত ব্যক্তি। বৈদিক পুরাবৃত্ত মতে "অষ্টাবিংশতি প্রদীপ প্রণেতা মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, শিরোমণির ভ্রাতা ছিলেন। রঘুনাথ (বিনা কারণেই?) নবদ্বীপবাসী হন এবং মহেশ্বর শ্রীহট্টাধিপতি গোবিন্দের সভাসদ হইয়াছিলেন। এই গোবিন্দ দিল্লীশ্বরের সেনা কর্ত্তৃক বিজিত হন।" কারণ—গোবিন্দের প্রতাপে দিল্লীশ্বর "সন্তপ্ত" হইয়াছিলেন (!!), এবং তাহাতেই গোবিন্দের রাজ্য-জয়ে "যবন-চমূ" প্রেরিত হয়, যথাঃ—

"তস্য প্রতাপ সন্তপ্ত দিল্লীরাট যবনেশ্বরঃ।
গোবিন্দ রাজ্য মাহর্ত্তুং প্রেরয়ামাস তাং চমূং॥" ইত্যাদি।

গৌড় গোবিন্দ রাজার সময় নির্দ্ধারণ বিষয়ে মতান্তর থাকিলেও ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দের পরে যে শ্রীহট্ট যবন সৈন্য কর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং গোবিন্দের

১৬. বৈদিক পুরাবৃত্তের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। কেহ কেহ বলেন, ইহা জগদানন্দ প্রণীত; ডলার কাশ্যপগণ বলেন যে ইহা তত্রত্য কৃষ্ণরাম ন্যায় বাগীশ প্রণীত। কেহ কেহ বলেন মূল গ্রন্থ রংপুরে ছিল; কিছুদিন হইল, তথা হইতে আনয়ন করা হয়। রংপুরে যাঁহার নিকট ছিল বলিয়া প্রকাশ, অনুসন্ধানে তাঁহারই ভ্রাতা (পোঃ ভিতরবন্দ, গ্রাম পরমালী বাসী শ্রীযুত আনন্দ মোহন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন–"আপনাদের প্রস্তাবিত 'বৈদিক পুরাবৃত্ত' বিশেষ রকম অনুসন্ধানে পাওয়া গেল না। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বুঝা যায় যে, এক সময় ঐ সম্বন্ধে কোন কাগজ আমাদের বাড়ীতে ছিল।' আবার কেহ কেহ বলেন যে একটা প্রাচীন ভুটি কাগজে বৈদিকদের সম্বন্ধে ৩০/৪০ পংক্তি নোট লিখা ছিল, অনেকেই (ভূমিড়াউবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি) তাহা রংপুরে দেখিয়াছেন; সম্প্রতি তাহাই বিবর্দ্ধিত করিয়া বৈদিক পুরাবৃত্তের আকারে পরিণত করা হইয়াছে।

সভাসদ যিনিই হন, এই সময় তাঁহার বিদ্যমানতার কথা বলা যাইতে পারে।

কিন্তু প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক, তাঁহার ভ্রাতা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কিরূপে জীবিত থাকিতে পারেন? বস্তুতঃ রঘুনাথ, মহেশ্বরের ভ্রাতা নহেন, বৈদিক পুরাবৃত্তের অসংলগ্ন অশ্রদ্ধেয় কথায় আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না।

অষ্টাবিংশতি প্রদীপ প্রণেতা শ্রীহট্টের গৌরব মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার যে শিরোমণির পরবর্ত্তী, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

"গোপাল ভট্টের জীবনী দৃষ্টে জানা যায় যে, গোপাল ভট ১৪৫৩ শকে বৃন্দাবন গমনের পর, "হরিভক্তি বিলাস" প্রণয়ন করেন। সনাতন গোস্বামী ১৪৭৬ শকে ঐ গ্রন্থের "দিকদর্শিনী" ও ভাগবতের "বৈষ্ণবতোষনী" টীকা লিখা শেষ করেন। যথাঃ—, "শাকে ষট সপ্ততি মনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনীশুভা।" এই গ্রন্থ বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত আনিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে ন্যূনকল্পে ১৫/১৬ বৎসর কাল অতীত হইয়াছিল।"

"স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তৎপ্রণীত আহ্নিক ও একাদশীতত্ত্বের বিষ্ণু পূজা প্রকরণে তদীয় মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্বারা পঞ্চদশ শত শকের শেষ ভাগে ঐ গ্রন্থ প্রণীত হওয়া দৃষ্ট হয়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য তাঁহার প্রণীত জ্যোতিস্তত্ত্বের সংক্রান্তি গণনায় বলিয়াছেন। যথাঃ—

"নবাষ্ট শক্রহীনেন শকাব্দাস্তেন পূরিতা।"

এতদ্বারাও ১৪৮৯ শতে জ্যোতিস্তত্ত্ব লিখিত হওয়া দৃষ্ট হয়। "মলমাস তত্ত্বে" স্বপ্রণীত গ্রন্থের ক্রমনির্দ্দেশে তিনি লিখিয়াছেন, যথাঃ—জ্যোতিষে বাস্ত যজ্ঞকে, দীক্ষায়াং আহ্নিকে কৃত্যে" ইত্যাদি। ইহাতে জ্যোতিস্তত্ত্বের পর আহ্নিক তত্ত্ব বিরচিত হওয়া দৃষ্ট হয়। রঘুনন্দনের গ্রন্থ লিখিত হওয়ার পর ২০/২৫ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব্বে যে তাহা সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়াছিল, এমন অনুমান করা যাইতে পারে না।"

"মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার স্বপ্রণীত "জ্যোতিঃপ্রদীপ" এবং "আহ্নিক প্রদীপে" রঘুনন্দনের মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টতঃই শকাব্দ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য বা শেষভাগে ঐ সকল গ্রন্থ প্রণীত হওয়ার অনুমান হয়। মহেশ্বরের পরবর্ত্তী তদ্বংশীয় তারানাথ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত বংশপত্রের সহ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমরা শকাব্দ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহেশ্বরকে দেখিতে পাই।"

"অতএব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত শিরোমনি ও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে প্রাদুর্ভূত মহেশ্বরের মধ্যে শতাধিক বৎসরের ব্যবধান দৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় তাঁহারা পরস্পর সহোদর ছিলেন, কোন প্রকৃতস্থ ব্যক্তি কি একথা বলিতে পারেন?"

"প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সমসাময়িক পণ্ডিতগণের মধ্যে একে অন্যের মত গ্রহণ পূর্ব্বক সমালোচনা করিবার রীতি থাকা দৃষ্ট হয় না। মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার শিরোমণির ভ্রাতা হইলে রঘুনন্দন ও শিরোমণি উভয়ই তাঁহার সমসাময়িক হন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনার কথা বলিয়াছি; তিনি স্বপ্রণীত সিদ্ধান্ত প্রদীপে 'অত্র শিরোমণি' 'লক্ষণং পরিষ্কৃত্যাহশিরোমণি' বলিয়া শিরোমণির মতও গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্বারা শিরোমণি, মহেশ্বরে সমসাময়িক না থাকা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।"

"ভারত প্রসিদ্ধ শিরোমণি, মহেশ্বরের জ্যেষ্ঠ সহোদর হইলে এই প্রণালীতে তাঁহার মত গ্রহণের কোনই কারণ ছিল না। সম্পর্কিত পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রাচীনকালে মত গ্রহণের যে রীতি ছিল, তাহার উদাহরণ স্বরূপ 'সাহিত্য-দর্পণ' হইতে নিম্নলিখিত পংক্তি নিচয় উদ্ধৃত করা গেল,

যথাঃ—'মম তাত পাদানাং মহাপাত্র চতুর্দ্দশ ভাষা বারবিলাসিনী ভুজঙ্গ মহাকবীশ্বর শ্রীচন্দশেখর সন্ধি বিগ্রাহিকলাং।' শ্রীরূপ গোস্বামী, তদীয় অগ্রজ সনাতন গোস্বামীর বাক্য এইরূপই সম্ভ্রম সূচক ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন।"

"এই সকল কারণ ও প্রমাণবলে নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে যে, শিরোমণি মহেশ্বরের সহোদর ছিলেন না, এবং তাঁহাদের মধ্যে এই প্রকার সম্বন্ধ কখনও সম্ভবপর নহে।" (—আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩-০৩-১৩১৪ বাং)।

মহেশ্বরের জীবনকাহিনী এই গ্রন্থের স্থানান্তরে কথিত হইবে, তিনি কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, মহেশ্বর হইতে তদ্বংশে বর্ত্তমানে সপ্তম পুরুষ চলিতেছে, ইহাতেও তাঁহাকে শিরোমণির ভ্রাতা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

রঘুনাথ শিরোমণি কাত্যায়ন গোত্রীয় ছিলেন বলা গিয়াছে; কাজেই শিরোমণির সহিত মহেশ্বরের সহোদর সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

১৩০৯ বঙ্গাব্দের "বান্ধব" পত্রিকার ২০৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে ও ১৩১০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যা বান্ধবের ২৭১ পৃষ্ঠায় শিরোমণিকে স্পষ্টতঃ পূর্ব্ববঙ্গের লোক বলা হইয়াছে। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগে তাঁহাকে শ্রীহট্টবাসী বলা গিয়াছে। ১৩১১ বঙ্গাব্দের "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার" প্রথম সংখ্যায় শিরোমণি সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর শিরোমণিকে নবদ্বীপের রত্নখনি উদ্ভূত মহামণি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। অল্পদিন হইল, উদ্ভট-সাগর মহাশয়ের সহিত কোনও শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুর এই বিষয়ে আলাপ কালে, শিরোমণির জন্ম স্থানের প্রকৃত পরিচয় তিনি জ্ঞাত নহেন বলিয়া প্রকাশ করেন। ফলতঃ "নবদ্বীপ নিবাসিনঃ" ইতি উদ্ভট শ্লোকের ভাবার্থেই তিনি শিরোমণিকে নবদ্বীপ-নিবাসী বলিয়া থাকিবেন।

পণ্ডিত প্রবর গদাধর তাঁহাকে "কাত্যায়ন খণিজমণি" বলিয়াছেন, কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশ মধ্যে শ্রীহট্ট ব্যতীত অন্যত্র কদাচিৎ মিলে, কাজেই "কাত্যায়ন খণিজ মণেঃ" রঘুনাথ শ্রীহট্টবাসী ছিলেন।[১৭]

আমরা উভয় মতটি উদ্ধৃত করিলাম, রাজার সময় নির্দ্দেশে অবশ্যই একতরের বিষম ভ্রম

---

১৭. পশ্চিম বঙ্গে আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে কাত্যায়ন গোত্র ছিল না, ইঁহাদের গোত্র, যথাঃ

"শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্যো ভরদ্বাজস্তথাপরঃ।
সাবর্ণঃ কথিকাঃ পূর্ব্বং পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

(কুলীন শব্দ-বিশ্বকোষ ৩১১ পৃষ্ঠা এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ ১০৩ পৃষ্ঠা) ইহার পরে রাজা শ্যামল বর্ম্মার আনীত পঞ্চব্রাহ্মণ মধ্যেও কাত্যায়ন গোত্র ছিল না, ইঁহাদের গোত্র, যথাঃ-

"আদৌ শুনক শাণ্ডিল্যৌ বশিষ্ঠশ্চ তত পরং।
সাবর্ণশ্চ ভরদ্বাজঃ পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

(বিশ্বকোষ ৩৩৮ পৃষ্ঠা, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ৫৭ পৃষ্ঠা)

ইঁহাদের পর বঙ্গদেশে যে ব্রাহ্মণগণ আগমন করেন, তাঁহারা ষষ্ঠ গোত্রীয় বলিয়া কীর্ত্তিত, তাঁহাদের মধ্যেও কাত্যায়ন গোত্র পাওয়া যায় না, ইঁহাদের গোত্র, যথাঃ-

বশিষ্ঠঃ কাশ্যপশ্চৈব কৃষ্ণাত্রেয়স্তথৈবচ।
গৌতমশ্চ ভরদ্বাজো বাৎস্যশ্চৈবরথীতরঃ।
পরাশরোহগ্নিশ্য ঘৃতকৌশিক কৌশিকৌ।
ষষ্ঠ গোত্রাস্ত বিজ্ঞেয়া ইত্যেকাদশ সংখ্যকা॥"

(বৈদিককুলদীপিকা বচং-বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ৫৯ পৃষ্ঠা)

হইয়াছে। সময় নির্দ্দেশ বিষয়ে আর একটা কথা বলিতে বাকি আছে। রাজার ভ্রাতৃবংশীয় বরমচালবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কিশোর চৌধুরী মহাশয় আমাদিগকে যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন, তাহাতে রাজবংশীয় মজঃফর রচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, এই কবিতাটির কোন কোন স্থল শ্রীযুক্ত সতিশ চন্দ্র চৌধুরীও উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন; এই কবিতার এক স্থলে লিখিত আছেঃ—

"সুবিদ নারাইনের পত্নী কমলা সুন্দরী।
তাহার গর্ভেতে জন্মে পুত্র জন চারি॥
দৈবযোগের হেতু রাজ্যে অঘটন হৈল।
শের শাহে হুমাউনে বিবাদ চলিল॥
সেই কালে সেনাপতি খোয়াজ উসমান।
বলবন্ত বুদ্ধিমন্ত লোহানী পাঠান॥
সে আসিয়া রাজবাড়ী কৈল আক্রমণ।
যুদ্ধ করি সুবিদ রাজা ত্যাজিল জীবন॥" ইত্যাদি।

অবস্থানুসারে এ কথাগুলি বৈদিক পুরাবৃত্তের বিবরণাপেক্ষা অল্প প্রামাণ্য বলা যাইতে পারে না। বৈদিক পুরাবৃত্তের অভিনব কাহিনীগুলির অপেক্ষা এ কবিতাও অল্প প্রাচীন নহে। সে যাহা হউক, রাজা সুবিদ নারায়ণকে আকবর বাদশাহের পরবর্ত্তী বিবেচনা করিবার কিছুমাত্র কারণ দৃষ্ট হয় না, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অতঃপর, দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মধ্যেও কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ নাই, ইঁহাদের গোত্র, যথাঃ–

"জাতূকর্ণশ্চ সাবর্ণঃ কাশ্যপো ঘৃত কৌশিকঃ।
বাৎস্যঃ কাণ্বায়নঃশ্চৈব কৌশিকো গৌতমস্তথা॥"

মতান্তরেঃ–'গৌতমঃ কাশ্যপোঃ বাৎস্যঃ কাণ্বায়ণ্ ঘৃত কৌশিকৌ।
কৃষ্ণাত্রেয়োভরদ্বাজৌ দৃশ্যতে ন চ কুত্রচিৎ॥'
(বিশ্বকোষ ৩৪১ পৃষ্ঠা, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ২০২ পৃষ্ঠা)

সপ্তসতী ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কাত্যায়ন গোত্র দৃষ্ট হয় না, ইহাদের গোত্র যথাঃ–

"শুনকঃ গৌতমঃ কাশ্যে কৌণ্ডিন্যশ্চ পরাশরঃ।
বশিষ্ঠো হারীতো কৌৎসশ্চাষ্টো গোত্রা প্রকীর্ত্তিতা॥"

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ ৮৮ পৃষ্ঠা)

রামদেবের পঞ্জী ও কুলানন্দের কারিকামতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ মধ্যে নিম্নলিখিত গোত্রগুলি দৃষ্ট হয়, যথাঃ–কাশ্যপ, মৌদগল্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, গৌতম, মৌঞ্জায়ন, গর্গ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, ঘৃত কৌশিক, জমদগ্নি ও আলম্যান এবং সাবর্ণ।
(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ–৯১, ৯২, ৯৩, ১০২, ১২৯ পৃষ্ঠা)

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের মধ্যে, কাত্যায়ন গোত্র পাওয়া যায় না। এই যে সকল গোত্রের উল্লেখ করা গেল, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ ইঁহাদের দ্বারাই গঠিত; ইঁহাদের মধ্যে যখন কাত্যায়ন গোত্র নাই এবং শ্রীহট্টে যখন কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়, "কাত্যায়ন খনিজ মণে" শিরোমণিকে তখন শ্রীহট্টবাসী বলিতে আপত্তির পথ কোথায়? বিশেষতঃ শিরোমনি শ্রীহট্টবাসী বলিতে আপত্তির পথ কোথায়? বিশেষতঃ শিরোমণি শ্রীহট্টবাসী বলিয়া পণ্ডিত সমাজের চির প্রচলিত।
(এই বিষয়ে "সম্বন্ধ-নির্ণয়" গ্রন্থের ৪০-৪৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য, ঐ গ্রন্থেও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের কাত্যায়ন গোত্রীয়ের অভাবের বিষয় লিখিত হইয়াছে।)

নবম অধ্যায়

ইটার বিবিধ কথা

মনুকুল প্রদেশের অধিকাংশই এক সময় ইটা নামে অভিহিত হইত। তৎপরে আলীনগর, সমসেরনগর, ভানুগাছ, ছয়চিরি, ইন্দেশ্বর ইটা-ভুক্ত ছিল; পরে খারিজ হইয়া পৃথক হয়। এখন কেবল আলীনগর, সমসেরনগর ও ইটা, এ তিন পরগণার সাধারণ নাম ইটা।

প্রাচীন সংবাদ

ইটায় ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অত্রত্য বড়শীযোড়া পাগাড়ে জনৈক হিন্দু রাজার বাড়ী ছিল বলিয়া কথিত আছে। ঐ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান বর্ত্তমানে লোকলোচনের একরূপ অগোচর হইয়া পড়িয়াছে।

বরমান গ্রামের সন্নিকটে একটি দীর্ঘিকার চিহ্ন আছে, উহা "হিন্দু রাজার দীঘী" নামে কথিত হয়। জনশ্রুতি যে, তত্রত্য রাজার রূপবতী নাম্নী এক কন্যা ছিলেন, তিনি এতদ্দেশ প্রচলিত "মাধব্রত" করিয়া এই দীঘীতে "দেউল" বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।[১] উহার নিকটেই "শাকনীয়া দীঘী" প্রবাদানুসারে রাজকন্যা উহাতে শঙ্খ বলয়াদি ধৌত করিয়াছিলেন। তথায় "মাছুনীর জাঙ্গাল" নামে এক প্রাচীন পথের চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, কোন মৎস্য বিক্রেত্রী "কাওয়া দীঘী" হাওরে মাছ ধরিয়া প্রত্যহ রাজবাড়ী মাছ যুগাইত। কদর্য্য পথে আসিতে অতিরিক্ত বিলম্ব হইত বলিয়া যথাকালে সে রাজবাটী পৌঁছিতে পারিত না। মাছ আসিতে যাহাতে বিলম্ব না হয়, সেই জন্য "মাছুনীর জাঙ্গাল" নির্ম্মিত হইয়াছিল।

হিন্দু রাজার দীঘীর সন্নিকটে "সুন্দর নাথের পুষ্করিণী"। বর্ত্তমানে ইহার পরিচিহ্ন মাত্র আছে। ঐ স্থানে নাথ জাতীয় সুন্দরের বাড়ী ছিল। প্রবাদানুসারে ইহার একটা বৃষ হইতে "ডেকার হাওরের" নামকরণ হয়, প্রথমভাগে তাহা উল্লেখিত হইয়াছে।

কাণিহাটীর আসম রায়

ইটার পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী কাণিহাটী খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জনৈক হিন্দু রাজার অধিকারে ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়; ইঁহার নাম আসম রায়। আসম রায় ত্রৈপুর রাজবংশের এক শাখা বংশীয় ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

আসম রায় একদা একস্থানে একটি বৃহৎ ব্যাঘ্রকে জালাবদ্ধ করেন, কিন্তু স্থানটি জঙ্গলে ঘন সমাচ্ছন্ন থাকায় বধোপায় নির্দ্ধারণে অসমর্থ হন। দৈবাৎ শাহ সেলিম উদ্দীন নামে জনৈক ফকির তথায় উপস্থিত হইলেন।

সেলিম উদ্দীন শ্রীহট্ট-বিজেতা মজঃরদ শাহজলালের অনুসঙ্গিগণের অন্যতম। শ্রীহট্ট-বিজিত হইলে, শাহজলাল কর্ত্তৃক তদীয় অনুসঙ্গিগণ ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারার্থ নানাস্থানে প্রেরিত হন। তন্মধ্যে তাজউদ্দীন ও সেলিম উদ্দীন ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে তাজ চৌকি পরগণায় গমন করেন

১. মাঘব্রত ও দেউল ইত্যাদির বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ১ম ভাগ ৯ম অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

এবং সেলিম উদ্দীন আসম রায়ের অধিকার মধ্যে উপস্থিত হন।

সেলিম উদ্দীন জালাবদ্ধ ব্যাঘ্র দৃষ্টে ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাঘ্র বধে এত যত্ন!-যত্নে নৈরাশ্য! আশ্চর্য্য বটে!" আসম রায় ফকিরের এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাহার প্রতিফল দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকেই ব্যাঘ্র বধের অনুমতি দিলেন। অনুমতি পাইয়া ফকির স্বীয় সাধন প্রভাবে সেই ভীষণ ব্যাঘ্রকে বিড়াল ছানার ন্যায় অনায়াসে ধৃত করিয়া আনিলেন ও "ওদিকে আর আসিও না" বলিয়া তথা হইতে দূর করিয়া দিলেন।

ফকিরের এই অদ্ভুত কার্য্যে রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তাঁহার দৈব প্রভাবে তৎপ্রতি শ্রদ্ধা জন্মিল; তিনি তাঁহাকে বহু ধন দান করিতে চাহিলেন।

সেলিম উদ্দীন ধন গ্রহণ করিলেন না; তবে ধর্ম্ম সাধনার জন্য এক তীরক্ষেপ পরিমিত ভূমি (ধনু হইতে ক্ষেপনে যথায় তীর পতিত হয়, তদন্তর্বর্ত্তী ভূমি) মাত্র চাহিয়া লইলেন, সেই স্থান তদবধি "তীরপাশা" নামে খ্যাত হইল, এবং ব্যাঘ্রকে যে স্থানে আবদ্ধ করা হয়, সেই স্থান "আসম রায়ের বেড়ী" নামে কথিত হইয়া থাকে।

ইহার পর, একদা আসম রায় রজনীযোগে নিদ্রা যাইতেছিলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার গৃহ-বর্ত্তিকা যেন জীবন্ত ভাবে গমন করিতেছে; যাইতে যাইতে সেই প্রদীপ সেলিম উদ্দীনের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এ কি স্বপ্ন? ইহা ত প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতেছে? আসম রায়ের মনে এক নব ভাবের উদয় হইল; তিনি তখনই গাত্রোত্থান করিয়া সেলিম উদ্দীনের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

"এত রাত্রে রাজা গৃহদ্বারে কেন?"—আসম রায় বলিলেন—"ফকির, দেখিলাম, আমার গৃহ-বর্ত্তিকা স্বয়ং তোমার গৃহে আগমন করিয়াছে! কথাটার মর্ম্ম কি,—বুঝিয়াছি!—আমার রাজ্যশ্রী তোমারই গৃহাগত—আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব। অতএব আমি আর এ রাজ্যে থাকিব না, ইহা তোমারই হইল।"

রাত্রি প্রভাতে আর কেহই আসম রায়কে দেখিতে পাইল না। প্রথমতঃ তিনি ত্রৈপুর রাজধানী গমনে ইচ্ছুক হন, কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাণিশালিতে নিজ মাতুলালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আসম রায় একাকী রাজ্যত্যাগে চলিয়া যান; তাঁহার স্ত্রী কণক রাণী, যুবরাজ কালী রায় এবং রাজকন্যা তাঁহার অনুগামী হইতে পারেন নাই।

আসম রায়ের প্রস্থান সংবাদ প্রচারিত হইলে যুবরাজ সিংহাসনাধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু সেলিম উদ্দীনই রাজ্যের অধিকারী হন। তবে কণক রাণীকে তিনি কতক পরিমাণে ভূমিদান করেন। কণক রাণী তথায় এক নূতন বাড়ী প্রস্তুত ক্রমে বাস করেন, কণক রাণীর নামানুসারে তাঁহার প্রাপ্ত স্থান "কাণিহাটী" (কনকহাটী) নামে খ্যাত হয়। কণক রাণীর বাড়ী ও দীঘী আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নামেই (কাণীরবাড়ী, কাণীর দীঘী বলিয়া) পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

সেলিম উদ্দীন স্বীয় পুত্র দৌলত মালিক সহ মনু নদীর পশ্চিম তটে বাড়ী প্রস্তুত ক্রমে বাস করেন, তথায় তাঁহার কবর ছিল, পরে মনুগর্ভে পতিত হয়।

শাহ সেলিম উদ্দীনের কয়েক পুত্র ছিলেন, এক পুত্রের বংশ কাণিহাটীর চৌধুরীগণ। লংলার কৌলা নিবাসী চৌধুরীগণ তাঁহার অপর পুত্রের বংশজাত। তাঁহাদের কথা পশ্চাৎ (বংশ-বৃত্তান্ত খণ্ডে) উক্ত হইবে।



ইটার রাজবাড়ী

ইটার দেওয়ান ও কানুনগোগণ

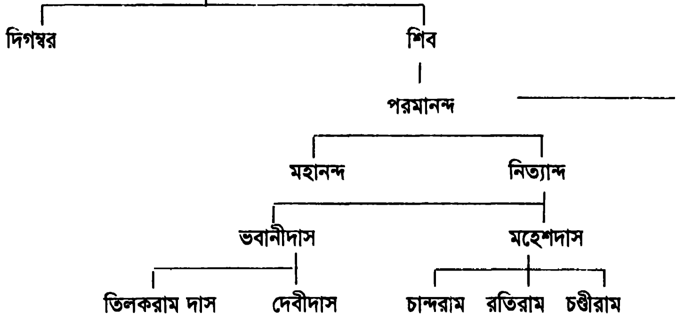
ইটার রাজা সুবিদ নারায়ণের যে বিবরণ বলা হইয়াছে, তাঁহার পরবর্ত্তী ঘটনার মধ্যে ইটার দেওয়ানগণের কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোসলমান আমলে গুণের আদর ছিল, উপযুক্ত হিন্দুগণও উচ্চপদে নিয়োজিত হইতেন। এমন কি, দেশের সর্ব্ব প্রধান শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতির পদও হিন্দুগণ লাভ করিতে পারিতেন। সীমান্ত দেশ শ্রীহট্টেও তাহার ব্যভিচার হয় নাই, নবাব হরকৃষ্ণ ও সেনাপতি হরদয়াল তাহার উদাহরণ। মোসলমান আমলে যে সকল শ্রীহট্টবাসী হিন্দু উচ্চপদে আরূঢ় ছিলেন, তন্মধ্যে ইটাবাসী অর্জ্জুন বংশীয় কানুনগোগণ ও সম্পদ সেন এবং শ্যাম রায় দেওয়ানেরও নাম করা যাইতে পারে।

ইটার কানুনগোদের মধ্যে রতিরাম খ্যাত নামা ব্যক্তি। রতিরাম নন্দীউড়া গ্রামবাসী অর্জ্জুন বংশীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের (২২ সাবান ১০৯৯ পরগণাতীত সনে[২]) লিখিত একখানি দলিলে দৃষ্ট হয় যে, যখন কানুনগো পদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয় নাই, সেই সময়ে রতিরামের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ ইটার কানুনগো ছিলেন, তৎপরে তাঁহার পুত্র দিগম্বর ঐ পদ লাভ করেন, দিগম্বরের মৃত্যুতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পরমানন্দ ঐ পদের উত্তরাধিকারী হন। পরমানন্দের পুত্র মহানন্দ তৎপর কানুনগো হন। ইঁহার পরেই কানুনগোদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।

তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভবানীদাস ঐ পদ পান। খোয়াজ ওসমানের দেওয়ান নরসিংহ দাসের সহিত তিনি নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। ভবানী দাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তিলক রাম শিশু থাকায়, নরসিংহের যত্নে রতিরাম ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত তজকিরা চৌধুরাই কাগজে এই রতিরামের নাম আছে। তিলক রাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পৈতৃক কানুনগো পদের জন্য আবেদন করিয়া ঐ পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের পরবর্ত্তী দুর্লভ রামের সময় (১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে) উপরোক্ত দলিল সম্পাদতি হয়।[৩] সুতরাং তজকিরা চৌধুরাই কাগজ রতিরাম জীবিত থাকা কালেই লিখিত হইয়াছিল বলিতে হইবে।

২. শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রাচীন কোন কোন দলিল পত্রে "পরগণাতীত" নামে এক অব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, এই অব্দ বঙ্গাব্দের তিন বৎসর মাত্র অগ্রগামী ছিল।

৩. এই প্রাচীন দলিলখানা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত, মূল দলিল আমাদের নিকট আছে, স্থানে স্থানে অপাঠ্য হওয়ায় এস্থলে উদ্বৃত করা গেল না। এই দলিল সাহায্যে রতিরাম পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতরূপ বংশপত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারেঃ-



রতিরামের পুত্র শ্যামরাম তৎপুত্র হরিচরণ, তাহার পুত্র খুশালরাম, তৎপুত্র জগন্নাথ, জগন্নাথের পুত্র তারানাথ, তাঁহার পুত্র দ্বারকানাথ, তৎপুত্র শ্রীযুত দীনেশ চরণ বর্ত্তমান। রতিরাম হইতে সপ্তম পুরুষ চলিতেছে।

সম্পদ সেন

ইটার দেওয়ান দ্বয়ের মধ্যে পঞ্চেশ্বরবাসী সম্পদ সেন ঢাকা-নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হন। এই বংশীয়গণ পূর্ব্বে চৌয়ালিশের সিদুরগ্রামে ছিলেন, তথা হইতে পঞ্চেশ্বর আগমণ করেন। সম্পদ সেনের সময়ে ইটার জমিদারবর্গ (আব্দুল ফজল ও আব্দুল হেকিম প্রভৃতি) সহ তত্রত্য তালুকদার ও তরফদারদের বিবাহ হওয়ায় তাঁহাদের অভিযোগ মূলে, দেওয়ানের যত্নে ইটা হইতে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে অনেক ভূমি খারিজ হইয়া যায়। ঐ সময়ে শ্রীহট্টে সমসের খাঁ ফৌজদার ছিলেন, এবং উক্ত খারিজা ভূমি তাঁহার নামানুক্রমে সমসেরনগর নামে আখ্যাত হয়।

এই সময় দেওয়ান নিজ পুত্র তিলক রামকে নূতন পরগণার (সমসের নগর) কানুনগো নিযুক্তের জন্য চেষ্টা করায়, দশ হাল ভূমি ও অতিরিক্ত ৭২ কাহন কৌড়ির নানকার সহ তাঁহাকে সমসেরনগরের কানুনগো পদে নিয়োজিত করা হয়। উক্ত সমসেরনগর পরগণায় আব্দুল ফজল, আব্দুল হেকিম প্রভৃতির চৌধুরাই পদ বহাল থাকে।[৪]

দেওয়ানের এক কন্যা ছিলেন, মহা আড়ম্বর সহকারে তিনি গয়গড়বাসী শিবরাম দত্তের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দেন। জামাতাকেও তিনি কানুনগো পদে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পান। দেওয়ান যৌতুক স্বরূপ জামাতাকে যে ভূমি দান করেন, শিবরাম তালুক বলিয়া খ্যাত উক্ত ভূমি এখনও তদ্বংশীয়গণের ভোগাধিকার আছে।

দেওয়ান কাওয়াদীঘী হাওর হইতে এক খাল কর্ত্তন করিয়া সাধারণের সুবিধা করিয়া দেন, তাহাই "সম্পদ খালি" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে।

শ্যামরায় দেওয়ান ও তৎপিতা হরবল্লভ

ইটার প্রসিদ্ধ দেওয়ান শ্যামরায় সম্পদ সেনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী। দেওয়ানের পূর্ব্ব পুরুষ চক্রধর দত্ত খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাঢ় দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক ইটায় বাস করেন, তাঁহার বাসস্থান দত্তগ্রাম নামে খ্যাত হয়। চক্রধরের ধরাধর ও মোদিনীধর নামে দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, নিজ ভাগ্য পরীক্ষার্থ ধরাধর ত্রিপুরায় এবং মোদিনীধর সন্নিকটবর্ত্তী গয়গড় গ্রামে গমন করিয়া বাস করেন।

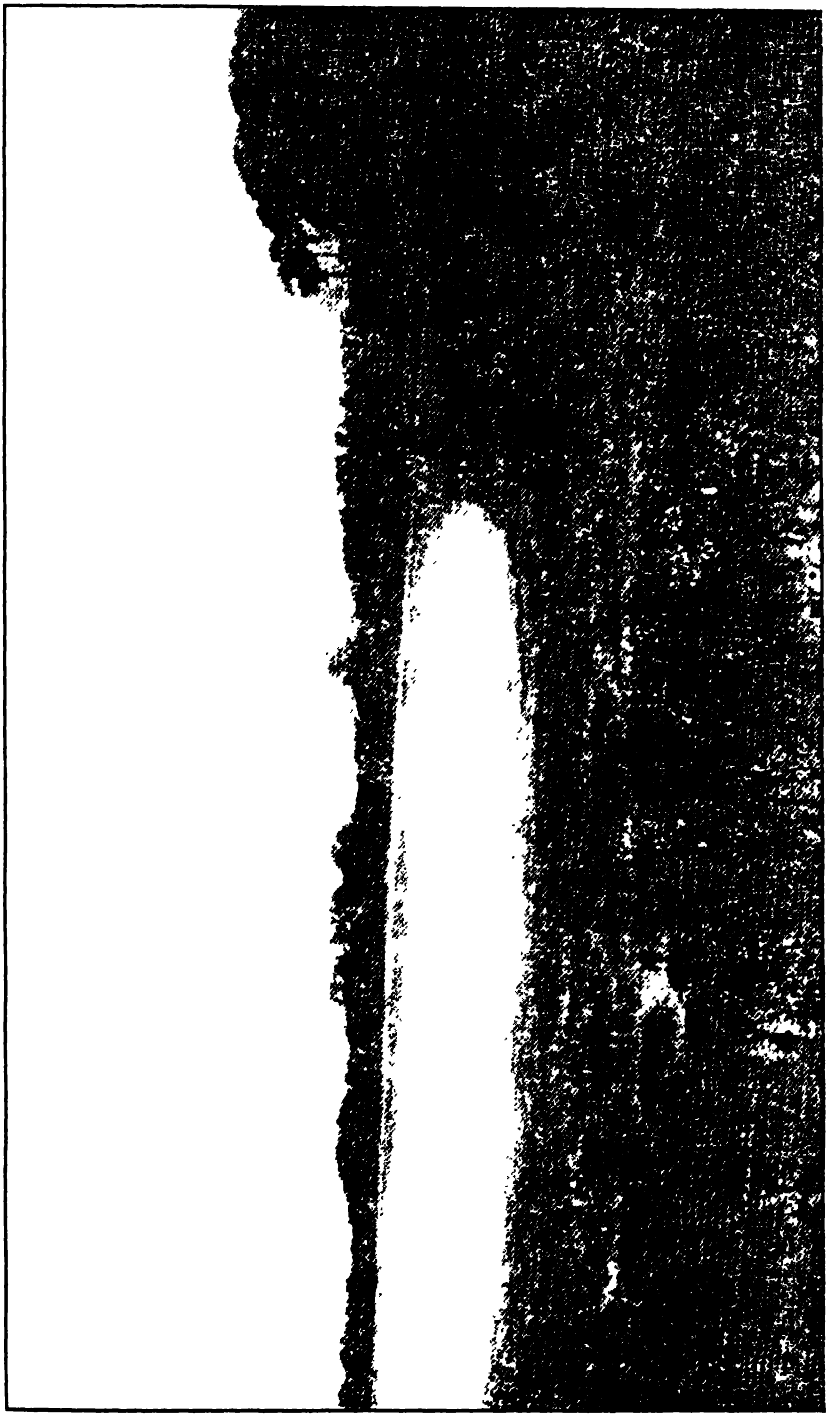
---

৪. এতদ্বিষয়ক পারস্য সনদের মর্ম্মানুবাদ এইঃ–

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালে রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ, চৌধুরী ও কানুনগোবর্গ, পুরকায়স্থ ও রায়ত সকল, পরগণা ইটা, সরকার শ্রীহট্ট জানিবেন যে,–আব্দুল ফজল, আব্দুল হেকিম, মোহাম্মদ নওয়াজ চৌধুরীগণ পরগণে ইটা ও গয়রহ তরফদার ও তালুকদারদের নালিশ এই যে, উহারা নিজ নিজ সরিকি চৌধুরী ও কানুনগোবর্গের সরিকি সনন্দের দৌরাত্মে নির্ব্বিঘ্নে সরকারী রাজস্ব শোধ করিতে অক্ষম; উভয় পক্ষে বিবাদ মূলে যথারীতি চাষ আবাদ চলিতেছে না। অতএব ভূমি আবাদ প্রভৃতি সাধারণের হিত ও সরকারী উপকার কল্পে এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উক্ত তালুকাতের জমা ইটা পরগণা হইতে খারিজ ক্রমে সমসেরনগর নাম করা গেল। এই পরগণার চৌধুরাই পদে উল্লিখিত আব্দুল ফজল ও আব্দুল হেকিম ও মোহাম্মদ নওয়াজকে; ও সম্পদ রায়ের পুত্র তিলক রায়কে শালিয়ানা ১০/০ দশ হাল ভূমি ও সাবেক ভিন্ন নূতন ৭২ কাহন কৌড়ির নানকার সহ কানুনগো পদে নিযুক্ত করা গেল। কর্ত্তব্য যে উল্লিখিত পরগণা সদর মফঃস্বল সেরেস্তায় ও সরকারী রাজস্ব উসলি দপ্তরে সন ১৪৪৬ বাঙ্গালা হইতে পৃথক গণ্য করা হয় তত্রত্য চৌধুরাই ও কানুনগো পদ উল্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রতি স্থিরতর জানিয়া তাহাদের মন্ত্রনা ও উপদেশে কার্য্য চলিবে ও তাহাদের দস্তখত গণ্য হইবে। তাহারাও সরকারী হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করে ও পরগণার আবাদ ও উপস্বত্ব বৃদ্ধির প্রতি যত্ন করে।

মোহরে মুদ্রিত-ফৌজদার সমসের খাঁ বাহাদুর ও আমিন মান্যবর সৈয়দ কুতব, ২২ জলুস মহরম মাসের ৫ তারিখ।

(এই সনদের পৃষ্ঠলিপিতে সমসেরনগরের খারিজ দাখিলের হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করা হইল না।)



ইটার সাগর দীঘী

চক্রধরের পুত্রের নাম জগন্নাথ। জগন্নাথের নবম পুরুষে হরবল্লভ রায়ের জন্ম হয়। হরবল্লভ বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি দেশের পাটওয়ারী পদে নিযুক্ত হন। পাটওয়ারী, কানুনগো হইতে নিম্ন পদস্থ রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারী; ইঁহারা বেতন পাইতেন না, তৎপরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেন।[৫] তাহাদিগকে এই সামান্য উপস্বত্বেরও কিয়দংশ সদরের কানুনগোকে নজর স্বরূপ দিতে হইত।

হরবল্লভ এইরূপ নজর দেওয়া অনুচিত মনে করিয়া, তাহা বন্ধ করিয়া দেন। এই জন্য সদরের প্রতাপান্বিত কানুনগোর সহিত তাঁহার বিবাদের সূত্রপাত হয়।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জয় সর্ব্বত্র; অন্যায় অত্যাচার কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। হরবল্লভ এই প্রথার উচ্ছেদ মানসে যত্ন করিতে লাগিলেন; তাঁহার উদ্যোগে লংলা, কাণিহাটী ও বরমচাল (ব্রহ্মচাল) পরগণার পাটওয়ারিগণ তৎসহ এতৎপ্রতিকারার্থ দিল্লী গমন করেন। হরবল্লভ বহু প্রয়াসে জনৈক ওমরাহের অনুগ্রহে দিল্লীশ্বরের নিকট নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। এই প্রার্থনার ফলে ইটা, কাণিহাটী, বরমচাল ও লংলায় স্বতন্ত্র কানুনগো পদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মফঃস্বল কানুনগোগণ সদরের প্রধান কানুনগোর অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন না। হরবল্লভ, পাটওয়ারী হইতে কানুনগো পদে উন্নীত হইলেন ও সগৌরবে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

সদর কানুনগো গণ

পূর্ব্বাধ্যায়ে সদর কানুনগো লোদী খাঁর বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, তৃতীয় অধ্যায়ে তদীয় কার্য্যকালের বিবরণ ও তৎপর জাহান খাঁর কথা বলা হইয়াছে। লোদী খাঁ ও জাহান খাঁ প্রভৃতি শ্রীহট্টের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন, পরে জাহান খাঁর সময়েই কানুনগোদের শাসন ক্ষমতা রহিত করা হয়। জাহান খাঁ আশৈশব—কানুনগো ও সুদীর্ঘজীবী ছিলেন, তিনি ষড়শীতি বৎসর ঐ পদে অধিরূঢ় ছিলেন; তৎপরে তদীয় পুত্র কেশওয়ার খাঁ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের কানুনগো নিযুক্ত হন, কেশওয়ারখালি নামে এক খাল কর্ত্তন করিয়া তিনি সাধারণে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তদীয় ভ্রাতা হায়ত খাঁ তাঁহার মৃত্যুর পর কানুনগো পদ প্রাপ্ত হন। হায়াতের মৃত্যু হইলে কেশওয়ারের পুত্র মহতাব খাঁ শাহজাদা আজম শাহের দস্তখত যুক্ত নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন।[৬]

হরবল্লভ এই মহতাব খাঁর অধীনতাচ্ছেদ করেন। পৃথক কানুনগো নিযুক্ত হইলে মহতাবের ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইয়া গেল। কাজেই মহতাব খাঁ হরবল্লভের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু তাঁহার কোন ছিদ্র না পাওয়াতে কোন অনিষ্টই করিতে পারিলেন না।

হরবল্লভের শ্যামরায়, বিনোদ রায় ও সম্পদ রায় নামে তিন পুত্র এবং মালতী ও শিব সুন্দরী নামে দুই কন্যা ছিলেন। মালতী অতি রূপবতী ছিলেন; বিবাহের পরই স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি পিত্রালয়ে বাস করিতেন।

হরবল্লভের বিপত্তি

মোসলমান আমলে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কেহ বৃহত্তর অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইত না। মহতাব খাঁ শুনিতে পাইলেন যে, হরবল্লভ এক ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিতেছেন। হরবল্লভকে অপদস্থ করিবার ইহাই সুযোগ মনে করিয়া তিনি শ্রীহট্টের তদানীন্তন নবাব

---

৫. "They were remunerated for their services by grant of a few hals of land revenue free -Hunter's Statistical Accounts of Assam. vol. II. (Sylhet)

৬. শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ মজুমদার পরিবার এই বংশীয়, এই বংশের অনেকেই কানুনগো ছিলেন, প্রসঙ্গানুসারে ক্রমে তাহা বর্ণিত হইবে।

শুকুরুল্লার নিকট হরবল্লভের বিষয়ে নানা কথা অতিরঞ্জিতভাবে বলিলেন। হরবল্লভ কুঅভিসন্ধিতেই সুদৃঢ় অট্টালিকা প্রস্তুত করিতেছেন, প্রতিপাদিত হইল। মহতাব খাঁ ইহাও জানাইলেন যে, এই হরবল্লভের অতি রূপবতী এক কন্যা আছে, সে কেবল নবাবেরই যোগ্য।

প্রকৃত পক্ষে হরবল্লভ ইষ্টকালয় প্রস্তুত করেন নাই। ইষ্টক দ্বারা ভিত্তি গাঁথিয়া তদপুরি এক সুরম্য কাষ্ঠময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। মহতাব খাঁর পরামর্শানুসারে নবাব, হরবল্লভকে শ্রীহট্টে আহ্বান করিলেন ও কোন ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিতেছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। হরবল্লভ প্রকৃত কথাই বলিলেন, কিন্তু নবাবের তাহা বিশ্বাস হইল না। হরবল্লভের অপরাধ সাব্যস্থ হইল; তবে তিনি রাজকীয় কর্ম্মচারী বলিয়া তৎপ্রতি অল্প দণ্ডই বিহিত হইল।—নবাব তাঁহার বিধবা কন্যার কথা উত্থাপন করিয়া সেই কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

হরবল্লভ এইবার প্রমাদ গণিলেন; বিধবা কন্যার কথা একবারে অস্বীকার করিলেন। দুরাত্মা শুকুরুল্লা তখন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল ও হরবল্লভের প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান করিল। তাঁহাকে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রৌদ্রে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত, তদবস্থায় চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার উপর কাষ্ঠখণ্ড বিক্ষিপ্ত হইত। হরবল্লভ কুলরক্ষার জন্য ঈদৃশ পাশব অত্যাচার সহ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। দেশবাসী বৃদ্ধগণ হরবল্লভের যশঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হরবল্লভ! তোমার দৃঢ়তা ধন্য, তোমার মানসিক প্রবল প্রশংসনীয়; বড় বড় রাজা রাজড়াদের ব্যবহার দেখিয়াছি; তাঁহাদের তুলনায় দিল্লী সম্রাট যেরূপ, শ্রীহট্টের নবাব তোমার তুলনায় তদপেক্ষা কম কিছুতেই নহেন, কিন্তু তাঁহারা যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তুমি তাহা করিয়াছ, তুমি ধন্য।

হরবল্লভের পুত্র শ্যামরায় ও বিনোদ রায়, এই কঠোর অত্যাচারের কথা শুনিলেন। অত্যাচারী শুকুরুল্লার প্রকৃতি তাঁহারা জানিতেন, সুতরাং কুল ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ভগ্নী মালতীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা এই অত্যাচারের প্রতিকারার্থে মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন। মুর্শিদাবাদে শ্যামরায় ও মালতী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। মালতী সে ভীষণ রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না,—অচিরেই প্রাণত্যাগ করিয়া মানসিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। শ্যামরায় বহু কষ্টে আরোগ্য লাভ করিয়া শুনিলেন যে, কঠোর অত্যাচারে পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণে শ্যামরায়ের মরণাধিক ক্লেশ হইল, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই অত্যাচারের প্রতিশোধের উপায় না করিয়া দেশে ফিরিবেন না।

শ্যামরায়ের দেওয়ানী প্রাপ্তি

শ্যামরায় বহুদিন মুর্শিদাবাদে রহিলেন, বহুদিনেও নবাব কৃত অত্যাচারের প্রতিকার কল্পে কিছুই করিতে পারিলেন না। এই সময় শ্রীহট্টের বড়লিখাবাসী শাহু জাতীয় দুর্লভদাস ও হুকমত রায় নামে দুই ধনী সওদাগর মুর্শিদাবাদে বাণিজ্যোপলক্ষে ছিলেন; তাঁহাদের লবণের একচেটিয়া কারবার ছিল।[৭] প্রভূত ধনশালী এই সওদাগরদের নবাব দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

৭. এই সওদাগরদ্বয় বৃহৎ পলওয়ার নৌকাযোগে বিদেশে বাণিজ্য করিতেন। "হুকমত রায়ের ছেগা" বলিয়া শ্রীহট্টে বহু মহালের নাম আছে, এগুলি হুকমত রায়ের নামে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরকিঙ্কর দাস মহাশয় লিখিয়াছেন যে এই হুকমত রায়ের কার্য্য স্বীকার করিয়াই, দেওয়ান স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন। হুকমত রায়ের যত্নেই তিনি মুর্শিদাবাদে পরিচিত হন; হুকমত রায়ের চেষ্টাতেই রাজ দরবারে কার্য্য প্রাপ্তি হন। শ্রীহট্টের নানাস্থানে লবণের খণি ছিল, ইহাকে "খুলির লবণ" বলিত। নবাবের আদেশে ইঁহারা পাথর চাপা দিয়া এই খণিগুলি নষ্ট করেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে বারপাড়া ও দাসগ্রামের খণি বন্ধ করা হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়।

শ্যামরায় নিরুপায় অবস্থায় ইঁহাদের "আড়তে" মোহরের নিযুক্ত হন। শ্যামরায় পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, এই হস্তাক্ষরই তাঁহার উন্নতির মূল।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ এই সময় মুর্শিদাবাদে ছিলেন। সওদাগরদের বাণিজ্য সম্পর্কীয় কাগজ পত্র সময় সময় নবাব দরবারে দাখিল করিতে হইত। একদা শ্যামরায়ের লিখিত একখণ্ড হিসাবের প্রতি রাজার মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায়, সওদাগরকে জিজ্ঞাসা ক্রমে লেখকের নাম ধামাদি জ্ঞাত হন।

এই অবকাশে দুর্লভদাস রাজাকে শ্যামরায়ের বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন ও স্বদেশী নিরূপায় ভদ্রসন্তানকে একটি পদ প্রদানের অনুরোধ করিলেন। অতঃপর শ্যামরায় রাজসন্নিধানে প্রেরিত হন, রাজা তাঁহার বিনীত ব্যবহার ও শিষ্টাচারে তুষ্ট হইলেন ও নিজের সেরেস্তায় এক নিম্নপদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন।

শ্যামরায় কার্য্যতৎপরতা ও নিজ বুদ্ধিবলে অত্যল্প কাল মধ্যেই রাজা রাজবল্লভকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হইলেন; তাঁহার প্রতি প্রত্যেক উচ্চ কর্ম্মচারীরই দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। সৌভাগ্য জোয়ারের ন্যায় আসিয়া থাকে; শ্যামরায় সেই সামান্য পদ হইতে ভাগলপুরের দেওয়ানের পদে উন্নীত হইলেন।

ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার চেষ্টায়, মুর্শিদাবাদের নবাবের আদেশে অত্যাচারী শুকুরুল্লা পদচ্যুত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীহট্টের একজন কার্য্যদক্ষ ফৌজদার প্রেরিত হইয়াছিলেন; তাহা অন্যত্র বলা গিয়াছে।

কথিত আছে, দিল্লী হইতে মুর্শিদাবাদে এক দুর্ব্বোধ্য পত্র আসিলে রাজকর্ম্মচারীবর্গ ইটার পাঠ ও অর্থ পরিগ্রহে অসমর্থন হন। শ্যামরায় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে বলিয়া সেই পত্রখানা দেখেন ও পাঠ করিয়া প্রকৃত অর্থ উদঘাটন করিতে সমর্থ হন। এই বৃত্তান্ত নবাবের কর্ণগোচর হইলে তিনি তুষ্ট হইয়া, পুরস্কার স্বরূপ শ্যামরায়কে ভাগলপুরের দেওয়ান নিযুক্ত করেন।

অবিচার অত্যাচার অনেক সময় মানুষকে উন্নতির পথে চালিত করে। অত্যাচার প্রপীড়িত ব্যক্তি যদি দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, বাধা প্রতিবন্ধকের প্রতি দৃকপাত না করিয়া সঙ্কল্পিত পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তবে বিধাতা স্বয়ং আলোক বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া তাহার পথ প্রদর্শক হন, সে কৃতকার্য্য হয়। শ্যামরায় অত্যাচারিত না হইলে বোধ হয় শ্রীহট্টের গৌরব রত্ন হইতে পারিতেন না।

শ্যামরায় বহুকাল সম্মানের সহিত এই উচ্চপদে আরূঢ় ছিলেন। তিনি ইটা হইতে আলীনগর পরগণা খারিজ করিয়া, আলীনগরের চৌধুরাই সনন্দ আনয়ন করেন। ইতিপূর্ব্বে সমসেরনগর খারিজ হওয়া ও তজকিরা চৌধুরাই কাগজের কথা বলা হইয়াছে। সমসেরনগর, আলীনগর প্রভৃতি খারিজ হওয়ায় দেওয়ান—বংশীয় জমিদারদের সহ ভূমির অংশ নির্ণায়ক এই কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে।

রাজা সুবিদ নারায়ণের পুত্র ঈশা খাঁ বংশীয় মোহাম্মদ সকি নিজ প্রদেয় রাজস্ব পরিশোধ করেন ও তদীয় সম্পত্তির অধিকাংশ হস্তগত করিয়া লন। শ্যামরায় রাজস্ব দাখিল ক্রমে এই সম্পত্তি অধিকার করিলে, সকি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার সহিত আপোষ ক্রমে উভয়ের অংশ নির্দ্ধারণ করতঃ নিজ সম্পত্তি পৃথক করিয়া লইয়াছিলেন।

দেওয়ান-দীঘী



দেওয়ান দীঘী মজদুরের প্রাপ্ত রসিদ

শ্যামরায় সম্মানের সহিত এই উচ্চ পদে আরূঢ় ছিলেন; তিনি আসিবার সময় স্বগ্রামে একটা দীঘী কাটাইবার জন্য নবাবের অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবাব তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া, তদীয় অভিপ্রেত দীঘী খননের মজুর দেওয়ার জন্য, তরফ, বাণিয়াচঙ্গ, ইটা, বালিশিরা, সমসেনগর, লংলা, ঢাকাদক্ষিণ এবং পঞ্চখণ্ড প্রভৃতি শ্রীহট্টের বহু স্থানের জমিদার ও কানুনগো প্রভৃতির উপর এক পরওয়ানা প্রেরণ করেন। নবাবের আদেশে উক্ত পরগণার জমিদারবর্গ নিজ নিজ মজুর পাঠাইয়া দিলে, দেওয়ানের ইচ্ছামত এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করা হয়; ইহা দেওয়ানের দীঘী নামে খ্যাত। এই দীঘীর কার্য্য ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল। জমিদারদের প্রেরিত লোক যথারীতি বেতন পাইয়াছিল ও বেতন সমঝিয়া দেওয়ানের কর্ম্মচারীকে রসিদ দিয়াছিল।[৮] এই দেওয়ানের দীঘী শ্যামরায় দেওয়ানের অসীম ক্ষমতার পরিচায়ক; প্রকারান্তরে শ্রীহট্টের তাবৎ জমিদারবর্গ হইতে দেওয়ানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছিল। "দেওয়ানের দীঘী" অদ্যাপি শ্যামরায় দেওয়ানের মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

দেওয়ানের ভাগিনেয়

শ্যামরায় দেওয়ান ভাগলপুর হইতে প্রত্যাগমন কালে কালী ও দুর্গার প্রস্তরমীয় প্রতিমূর্ত্তি আনয়ন করিয়া মহা আড়ম্বরে স্থাপন করেন। পূজার উৎসবে দেওয়ানের ভগ্নী শিবসুন্দরী দুইটি পুত্রসহ ভ্রাতৃগৃহে আগমন করেন। গয়গড়বাসী রামবল্লভ দত্তের শিবসুন্দরীর বিবাহ হইয়াছিল।

৮. দেওয়ানের দীঘী খনন করিয়া মজুরগণ বেতন পাওয়ার পর যে রসিদ দেয়, তাহার মধ্যে বাণিয়াচঙ্গ, ইটা, লংলা, হাওলী সতরসতী, ও ঢাকাদক্ষিণের জমিদার ও কানুনগোদের প্রেরিত মজুরগণকে প্রদত্ত মূল রসিদ আমরা পাইয়াছি। বাণিয়াচঙ্গাধিপতির প্রেরিত মজুরদিগকে প্রদত্ত রসিদ স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইবে, এস্থলে নমুনা স্বরূপ দুই খানা রসিদ উদ্ধৃত হইলঃ–

১. "লিখিতং শ্রীচৌধুরী ও কানুনগোবর্গ পরগণে লঙ্গলা মহাল খালিসা কস্য কবজ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমরা পরগণে ইটাত জিউর দিঘিতে মাটি কামলা বেগার দিছিলাম–এবার অজুরা সত্ব দিঘি মজকুর যে মাটি কাটিছিলা এর মবরগ ১৪৮৷/১০৷ একসত আটচল্লিস কাহন নও পণ সাড়ে দশ গণ্ডা কৌড়ী মোহাফিজ তপছিল জএল মবলগ মজকুর গৌরিবল্লভ ও গয়রহর তহবিল হনে তামাম কামাল সমঝিআ পাইলাম পাইয়া কবজ দিলাম ছালিন হনে দাওয়া করি ঝুটা বাতিল এতদর্শে কবজপত্র দিলাম ইতি সন ১১৫৬ সাল বতারিখ সাবান।

(দক্ষিণ পার্শ্বে শীর্ষে–"শ্রীজমীদারান পংলঙ্গলা সহি শ্রীখুসালরায়।" বাম পার্শ্বে সাক্ষীদের নাম অপাঠ্য, নীচে–'তপছিল মাটি কামলা' বিষয়ক বিবরণ অপাঠ্য।)

২. "লিখিতং শ্রীচৌধুরী ও পুরকায়স্থবর্গ পরগণে ঢাকাদক্ষিণ মহাল খালীসা কস্য কবজ পত্র মিদং কার্জ্জঞ্চ আগে আমরা মুকাম পরগণে ইটাতে জীউর দিঘীতে মাটি কামলা বেগার দিছিলাম এবার অজুরা সত্ত দিঘী যে মাটি কাটিছিলা এর মবলগ ২৫/১৪ পচিশ কাহন এক পণ চৌদ্দ গণ্ডা কৌড়ী মোং তপছিল জএল মজকুর পরগণে পাইয়া কবজপত্র দিলাম ছালীন হনে দাওয়া করি ঝুটা বাতিল এতদর্থে কবজপত্র দিলাম ইতি সন ১১৫৬ সাল সহরে সাবান।"

(দক্ষিণ পার্শ্বে শীর্ষে–"শ্রীপং ঢাকাদক্ষিণ নব জমীদারান ও পুরকায়স্থবর্গ। সহী শ্রীজয়কৃষ্ণ রায়।" নীচে ও পৃষ্ঠে 'তপছিল' বা মাটি কাজের হিসাব অপাঠ্য।)

আমাদের প্রাপ্ত তাবৎ রসিদপত্র এক ব্যক্তির লিখিত বোধ হয়,–অক্ষর ও পাঠ একরূপই। সহিগুলি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সুতরাং অক্ষরও বিভিন্ন। ইটার চৌধুরীবর্গের পক্ষে যে রসিদ দেওয়া হয়, তাহাতে দুইটি পারস্য দস্তখত আছে, তন্মধ্যে একটি দস্তখত জমিদার পক্ষীয় কর্ম্মচারীর বলিয়া স্পষ্টতঃই বোধ হয়। বাণিয়াচঙ্গের জমীদার পক্ষীয় রসিদে পাঁচটি পারস্য মোহর মুদ্রিত আছে ও একটি পারস্য দস্তখত আছে। বাহুল্য বিধায় প্রাপ্ত সকল রসিদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

ইদানীং দেওয়ানের দীঘীর পার্শ্ব দিয়া লোকেল বোর্ডের এক সড়ক গিয়াছে, ঐ সড়কের নাম "দেওয়ান দীঘী রোড" রাখা হইয়াছে।

দেওয়ান ভাগিনেয়দ্বয়কে দেখিয়া, দুইজনকে দুই গাছি স্বর্ণহার উপহার দেন। বুদ্ধিমতী শিবসুন্দরী তৎক্ষণাৎ হার প্রত্যর্পণপূর্ব্বক সহাস্যে বলিলেন যে, শিশুগণ দেশমান্য মাতুল হইতে এই অস্থায়ী দ্রব্য গ্রহণ করিলে তাহাদের মাতুলের গৌরব রক্ষা হয় না। দেওয়ান ভগ্নীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আলীনগর পরগণার কানুনগো পদ ও চৌধুরাইর অংশ পৃথক সনদের দ্বারা উভয় ভাগিনেয়কে দেওয়াইয়া ছিলেন। তদনুসারে শিশু জয়গোবিন্দ আলীনগরের চৌধুরী ও রত্নবল্লভ কানুনগো পদ প্রাপ্ত হন। জয়গোবিন্দের প্রাপ্তভূমিই দশসনা বন্দোবস্তের কালে "জয়গোবিন্দ তালুকে" পরিণত হয়।

দেওয়ানের দীঘীর কার্য্য সমাধা হইলে, শ্যামরায় পুনর্ব্বার মুর্শিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু আর তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই; ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে দুরন্ত বিসূচিকা রোগে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

লালা বিনোদ রায় ও দেওয়ান পত্নী

দেওয়ানের ভ্রাতা বিনোদ রায় অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন, তিনি লালা নামে খ্যাত হন। বৃদ্ধ বিনোদ রায় দশসনা বন্দোবস্তের সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি আলীনগরের ১ হইতে ১৬ নম্বর পর্য্যন্ত তালুক দেওয়ানের নামে তাঁহার পুত্রের পক্ষে বন্দোবস্ত করান ও ১৭, ১৮ নম্বর তালুক নিজপুত্রের নামে বন্দোবস্ত লন। তাঁহার এই কার্য্য আপাততঃ সঙ্গত বোধ হইলেও মূল তিনি বিশ্বাসঘাতকাপূর্ব্বক নিজ স্বার্থসাধন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। দেওয়ানের পুত্রের নামীয় তালকগুলির আয়তন, তাঁহার নিজপুত্রের নামীয় তালুক দুইটির তুলনায় যৎসামান্য ছিল।

অন্যায় কিছুতেই গোপন থাকে না। দেওয়ানের পত্নী দেবরের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিতে পারিয়া ক্রোধাবেগে তাঁহাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করেন এবং বধকারীকে পাঁচ শত মুদ্রা পুরস্কার দিবেন, ঘোষণা করেন। এতদ্‌শ্রবণে লালা ভীত হইয়া দত্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে গমন করেন, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

অধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ স্থায়ী হয় না, লালার মৃত্যুর পর রাজস্ব বাকিতে তাঁহার বৃহৎ ভূসম্পত্তি নিলাম হইয়া যায়। ভাগ্যলক্ষ্মীর হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে লালার পুত্রগণ একবারে হীনদশায় পতিত হন। লালার বংশীয়গণ হীনপ্রভলভাবে ভবানীনগরেই বাস করিতেছেন।

দশম অধ্যায়

প্রতাপগড়ের রাজবাড়ী

শ্রীহট্টের প্রাচীন খণ্ডরাজ্য সমূহের মধ্যে গৌড়ই সমধিক প্রসিদ্ধ, প্রতাপগড় প্রভৃতি পূর্ব্বে ত্রৈপুর-রাজবংশীয়ের শাসনাধীন ছিল, পরে গৌড়রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়।

প্রাচীনকালে প্রতাপগড়ের নাম প্রতাপগড় ছিল না, প্রবাদানুসারে সোণাই কাঞ্চনপুর ছিল তৎপরে প্রতাপসিংহ নামে জনৈক হিন্দুরাজা এ স্থানে রাজত্ব স্থাপন করেন, তাঁহারই নামানুসারে ইহা প্রতাপগড় বলিয়া খ্যাত হয়। আসাম ডিষ্ট্রিক্ট-গেজেটিয়ারে এইরূপই লিখিত রহিয়াছে।[১]

প্রতাপগড়ের পূর্ব্বাংশ চরগোলায় জগৎসিংহের গড় নামে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এক মৃন্ময় প্রাচীর আছে। প্রতাপগড় পরগণার উত্তরেও তদ্রূপ দুইটি মৃৎপ্রাচীর দৃষ্ট হয়। উভয় স্থানের অধিকার—প্রতাপসিংহ ও জগৎসিংহ, নিজ নিজ অধিকৃত স্থানের উত্তর সীমা সংরক্ষণ জন্য এক একটি মৃৎপ্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহাই অনুমান হয়; তাঁহাদের নামানুসারে তাহা প্রতাপগড় ও জগৎসিংহের গড় বলিয়া পরিচিত। জগৎসিংহের গড়ের অবস্থা অতি শোচনীয়; চরগোলার দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী জঙ্গলের অন্তরালে ইহার বিলুপ্তাবশেষ লক্ষিত হয়।

এই প্রতাপসিংহ এবং জগৎসিংহকে ছিলেন, জনশ্রুতি তদ্বিষয়ে নীরব। উভয়েরই সিংহাত্মক নামক হইতে তাঁহাদিগকে এক বংশীয় অনুমান করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ তাঁহার উভয়েই নিঃসন্তান ছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁহাদের উত্তরাধিকারী কেহই ছিল না। পরে আমীর আজফর নামক এক ব্যক্তি রাজবাড়ী নামে পরিকথিত, প্রতাপসিংহের বসত বাড়ীতে আপন আবাস স্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে তৎচতুষ্পার্শ্ব ভয়ানক অরণ্যে সমাচ্ছাদিত ছিল. যূথে যূথে বন্য মহিষ, বন্য গরু ও শূকরাদি তথায় বিচরণ করিত। কিন্তু প্রতাপগড় পরগণার নাম পরিকল্পনে প্রতাপসিংহের আখ্যানাপেক্ষা মালিক প্রতাবের কথা সুপরিজ্ঞাত ও সুপ্রচারিত। "হস্তবোধ" নামক প্রথম জরিপের কাগজ পত্রে "প্রতাপগড়" এবং "প্রতাগড়" এই দুই রূপ নামই লিখিত আছে। এই মালিক প্রতাবের পূর্ব্ব পুরুষগণ দেওরালিবাসী ছিলেন।

মালিক মোহাম্মদ ও পোড়া রাজা

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে মৃজা মালিখ মোহাম্মদ তোরাণী গৃহ বিবাদে উত্যক্ত হইয়া পারস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাগ্য পরীক্ষার্থ হিন্দুস্থানে আগমন করেন। দিল্লীতে তিনি কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া পূর্ব্ববঙ্গাভিমুখে আগমন পূর্ব্বক নববিজিত "তিন শ ষাট আউলিয়ার মুলুক" শ্রীহট্টের দেওরালি নামক স্থানে উপস্থিত হন।

তৎকালে দেওরালির অধিকাংশ স্থল পোড়ারাজা নামক ত্রিপুরা বংশীয় জনৈক ব্যক্তির অধিকারে ছিল; পোড়ারাজা ত্রৈপুর রাজগণের সামন্ত স্বরূপ ছিলেন।

মৃজা মালিক মোহাম্মদ নিজ অনুচরগণ সহ যখন তত্রত্য নদীর সন্নিকটে উপস্থিত হন.

---

১. "Two m‥es north-east of the Patharka‥a Police station, there are th‥ ‥emains of the Fort of Raja Pratap Sing, a patty local notable who has given his name to the Protapgarh pargana."
-Allen's Assam District Gaxetteers Vol. II. (Sylhet) chap. II. p. 62.

তখন দেখিতে পাইলেন যে, দাসীগণ পরিবৃতা এক রূপবতী যুবতী স্নানার্থ নদীতে আগমন করিয়াছেন। যুবক তোরাণী যুবতীর লাবণ্যে মোহিত হইলেন ও তাঁহাকে কোন বড় ঘরের মেয়ে বলিয়া বুঝতে পারিয়া বিবাহের ইচ্ছা করিলেন।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা জাতীয় হইলেও পোড়ারাজা বাঙ্গালীর সংস্রবে হিন্দু ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান হইয়াছিলেন, হিন্দু ব্যবহার দৃঢ়তার সহিত পালন করিতেন। তিনি স্বেচ্ছায় যবন করে কন্যাদান না করিয়া তাঁহাকে অপমানিত করিলেন। নির্ভীক মোসলমান যুবক ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না, সামান্য কয়েকটি অনুচর লইয়াই পোড়ারাজার বাড়ী আক্রমণ করিলেন। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ-যোগ্য মুষ্টিমেয় হইলে সেই কয়েকটি সুশিক্ষিত মোসলমান ত্রিপুরাদিগকে পরাভূত করিল। পোড়ারাজা নিরুপায় হইয়া মালিক মোহাম্মদের অনুগ্রহ ভিখারী হইলেন। পোড়ারাজার পুত্র সন্তান ছিল না, তিনি কন্যা উমার সহিত আগন্তুককে স্বরাজ্য প্রদান করিলেন। পোড়ারাজার সহিত ত্রৈপুর রাজবংশীয়ের রাজ্যস্মৃতি তথা হইতে বিলুপ্ত হইল। অদ্যাপি তথায় পোড়ারাজার বাড়ীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, অদ্যাপি তথায় "রাজার মার দীঘী" প্রভৃতি পোড়ারাজার অবস্থানের প্রমাণ দিতেছে।[২]

মালিক মোহাম্মদ দেওরালির অনেক উন্নতি বিধান করেন, পাশ্ববর্ত্তী জনপদ হইতে অনেক লোক আনয়ন করিয়া তিনি দেশে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্রের নাম সাদ মালিক; সাদ মালিকের দুই পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বড় মালিকের একটি পুত্র হয়, ইঁহার নাম মালিক কামাল উদ্দীন। ইঁহারা সকলেই দেওয়ালিবাসী। কামাল উদ্দীনের পুত্রের নাম মালিক প্রতাব।[৩]

মালিক প্রতাব ও রাজবাড়ী

মালিক প্রতাব মহিষ শিকার উপলক্ষে তথায় গিয়া, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দৃষ্টে মোহিত হন। সেই স্থান তখন বিরল বসতি ছিল, পূর্ব্ব কথিত আমীর আজফর নামীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় বাস করিতেন। মালিক প্রতাব তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন ও তদীয় কন্যার রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। মালিক প্রতাব দেওরালি না গিয়া এই স্থানেই বাস করিতে থাকেন। এই প্রতাবের নামের সহিত প্রতাবগড় বা প্রতাপগড় নামের সম্বন্ধ থাকার কথা অধিক শুনা যায়।

এই স্থান ভীষণ বন সমাচ্ছন্ন থাকিলেও, তৎপূর্ব্বে ইহা যে এক সুসমৃদ্ধ জনপদ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাল প্রভবে জনপদ জঙ্গলে পরিণত হয়, আবার সেই জঙ্গল কালে অপসারিত হইয়া জনপদের আকার ধারণ করিয়া থাকে। সুদূর প্রাচীনকালে এক সময় এই স্থানেই ত্রৈপুর রাজগণের রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। এই ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ (১ম

---

২. এই সকল স্থান কথঞ্চিৎ নিম্ন বলিয়া বোধ হয়। এগারসতী ও ডেওয়াদি পরগণার হাওরে মধ্যে মধ্যে অদ্যাপি অনেক প্রাচীন দীঘী পরিলক্ষিত হয়। বর্ষাকালে ঐ সকল স্থান আট, দশ কি ততোধিক হস্ত জলতলে নিমগ্ন থাকে। এইরূপে ডোবা ভূমে দীর্ঘিকা খননের কোন সার্থকতা নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে এক সময়ে ঐ সকল স্থানে জনবসতি ছিল এবং কালে তৎস্থানে জল উঠায় তাহা মনুষ্য বাস শূন্য হাওরে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে (২য় অধ্যায়ে) কথিত হইয়াছে যে, শাহজলাল দেওরালি অবস্থান কালে বরবক্রের প্রধান স্রোত কুশিয়ারার খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ সময় হইতেই তদ্দক্ষিণাঞ্চলবর্ত্তী ঐ সকল স্থানের জল পূর্ব্বানুরূপ নিঃসারিত না হইয়া ঐ সকল স্থান জলপূর্ণ থাকিত বলিয়া লোকালয় উঠিয়া যায়, এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ দীঘীগুলি, হাওরের মধ্যে মধ্যে এখনও পরিলক্ষিত হয়।

৩. ঙ-পরিশিষ্ট দেখ। (২য় ভাগ ২ খণ্ড)

খণ্ড) চতুর্থ অধ্যায়ের টীকা প্রসঙ্গে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে।[৪]

এই স্থান তখন পর্য্যন্ত ত্রৈপুর রাজগণের রাজ্যান্তর্গত ছিল; আমীর আজফর তাঁহাদেরই অধিকার মধ্যে বাস করিতেন। মালিক প্রতাব আমীর আজফরের অধিকৃত আবাস বাটীই সংস্কার ক্রমে বর্ত্তমান রাজবাটীতে পরিণত করেন এবং মসজিদ ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। সেই বাটীকার সম্মুখে তিনি যে এক বৃহৎ দীঘিকা প্রস্তুত করেন, তাহাই "রাজবাড়ীর দীঘী" বলিয়া অদ্যাপি খ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সেই বাটীর ভগ্নাবশেষই এখন "রাজবাড়ীর জঙ্গল" রূপে পরিণত।[৫] ঐ রাজবাটিস্থ্ অট্টালিকা সমূহে সুদৃশ্য কারুকার্য্য খচিত বহুতর প্রস্তর সংলগ্ন থাকিয়া শ্রীহট্টের প্রস্তর-শিল্পের মহিমা ঘোষণা করিত। এ স্থলে একটি চিত্রের প্রতিরূপ দেওয়া গেল।[৬]

মহারাজ প্রতাপ মাণিক্য ও মালিক প্রতাব

মালিক প্রতাব যখন প্রতাপগড়ের জঙ্গলে জনপদ স্থাপন করিতেছিলেন, তখন ত্রৈপুর রাজবংশীয় প্রতাপান্বিত নরপতি ধর্ম্ম মাণিক্যের পুত্র প্রতাপ মাণিক্য (দ্বিতীয়) সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম মাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র হইলেও সেনাপতির উদ্যোগে সিংহাসনারোহণ করিতে সমর্থ হন। মালিক প্রতাব এই মহারাজ প্রতাপ মাণিক্যের সময়, তাঁহার অধিকার মধ্যে নব রাজ্য করায় তিনি মহারাজের অসন্তোষ ভাজন হইলেন।

প্রবলপ্রতাপ প্রতাপ মাণিক্যের রোষ দৃষ্টিতে অবস্থান করিলে কুশল সম্ভাবনা নাই, মালিক প্রতাব ইহা জানিতেন।

এদিকে, প্রতাপ মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধন মাণিক্য, কনিষ্ঠকে সিংহাসনচ্যুত করিবার উদ্যোগে ছিলেন; প্রতাপ মাণিক্য সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর দমন ও সিংহাসন রক্ষার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়াছিলেন; এই জন্যই মালিক প্রতাবকে দমনের জন্য তিনি তখন সৈন্য প্রেরণ করিলেন না। মালিক প্রতাবের সুশিক্ষিত পাঠান সৈন্য হইতে কার্য্য কালে সহায়তা পাইতে পারেন, এরূপ

---

৪. বর্ত্তমান প্রতাপগড়ের দক্ষিণাংশ গবর্ণমেন্টের রিজার্ভ ফরেষ্টের অন্তর্ভূক্ত; তন্মধ্যে স্থানে স্থানে জনবসতির চিহ্ন এখনও পরিলক্ষিত হয়। তত্রত্য নাগরা ছড়ার তীরে একস্থানে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; ইহা কোন প্রাচীন রাজবাটীর তুল্য ও বহুস্থান বিস্তৃত। ঐ স্থান দিয়া এক সুদীর্ঘ পথ ছিল, ইহার উল্লেখ "হস্ত বোধ" জরিপের কাগজে এবং কোন কোন স্থানে ইহার নিদর্শনও অদ্যাপি আছে। "বাজারি" নামক এক স্থানে–সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে স্তূপাকারে কেশরাশি পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ হাটের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া লোকে ক্ষৌরি করিয়া থাকে। যখন সেই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে মনুষ্যাবাস ছিল, এই "বাজারি" নামক স্থানে তখন হাট বসিত। লোকে ক্ষৌরি করায় এক স্থানে যে কেশরাশি সঞ্চিত হয়, তাহাই অদ্যাপি তথায় রহিয়াছে।

৫. "মন চল যাইরে, প্রতাপগড়ের রাজবাড়ী দেখি আই রে।
পানিতে কান্দে পাণি খাউরি শুকনায় কান্দে ভেড়ী;
কাঁটার জঙ্গল লাগিয়া রৈছে আজফরের বাড়ী–মন চল যাইরে।"
ইত্যাদি গ্রাম্য গীতিতে এখনও উক্ত রাজবাড়ীর কথা শুনা যায়।

৬. প্রতাপগড়ের রাজবাটী প্রস্তরের কারুকার্য্য বিশোভিত ছিল। বড় বড় খণ্ডিত প্রস্তব সমূহে নানাবিধ সুদৃশ্য লতাপাতা ও পুষ্পের চিত্র অঙ্কিত ছিল। চিত্রগুলি দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। চিত্রগুলি এত পরিষ্কার, বোধ হয় যেন সুদক্ষ চিত্রকর তুলি ধরিয়া কাগজে আঁকিয়া দিয়াছে; অথবা যেন প্রস্তর কোনরূপে কর্দ্দমের মত নরম করিয়া তদুপরি ছাপা করিয়া লতাপাতা মুদ্রিত করা হইয়াছে। ঐ প্রস্তরের কয়েকটি মৈনার চৌধুরীগণের গৃহে সংরক্ষিত আছে। (গ্রন্থকাব একটি প্রস্তর-চিত্রের পার্শ্বে উপবেশিত তদবস্থায় যে চিত্র গৃহীত হয়, তাহার প্রতিকৃতি দ্রষ্টব্য।) রাজবাটী এখন জঙ্গলময় হইলেও দরবারগৃহ, অন্দর মহলাদির স্থান নিরূপিত আছে।

কল্পনাও এ সময় অসম্ভব ছিল না। ফলতঃ তিনি মালিক প্রতাবের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ না করিয়া, তাঁহাকে সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিলেন ও "রাজা" উপাধি দিলেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে মৈত্রী উপস্থিত হইল। মোসলমান হইলেও মালিক প্রতাব রাজা বলিয়া খ্যাত হইলেন।

অচিরেই ধন্য মাণিক্যের সহিত প্রতাপ মাণিক্যের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সুচতুর প্রতাব এই যুদ্ধের সাহায্যে সসৈন্যে পুত্রের সহ গমন করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ততা ও শৌর্য্য প্রদর্শনে তিনি প্রতাপ মাণিক্যের এরূপ প্রিয় হইয়া উঠেন যে, মহারাজ নিজ তনয়া রত্নাবতীকে তৎপুত্র বাজিদের সহিত বিবাহ দিয়া আত্ম-তুষ্টি চরিতার্থ করেন। কেবল তাহাই নহে, মহারাজ জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ প্রতাপগড় প্রদান করেন। সেই প্রথমে প্রতাপগড় মোসলমানের করায়ত্ত হইল।

সুলতান বাজিদ ও হৈড়ম্ব যুদ্ধ

১৪৯০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ প্রতাপ মাণিক্য নিহত হন। মালিক প্রতাব ইহার অল্পদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপর বাজিদ রাজা হন। কাছাড়ের প্রাচীন নাম হৈড়ম্ব দেশ; বাজিদের সহিত হৈড়ম্ব পতির বিবাদ উপস্থিত হয়। বাজিদের রাজা বৃদ্ধি লালসাই এই বিবাদ উপস্থিত হইবার কারণ, সন্দেহ নাই।

বাজিদের পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মারামত খাঁ একজন বীরপুরুষ ছিলেন, ইঁহার বিক্রম হৈড়ম্ব রাজের চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীর প্রাচীন ভূস্বামী বংশে মারামত খাঁর বিবাহ স্থির হয়, বিবাহ উপলক্ষে মারামত খাঁ সসৈন্যে তথায় গমন করেন।[৭] এই সংবাদ প্রাপ্তে হৈড়ম্ব রাজ প্রতাপগড় আক্রমণে প্রধাবিত হন।

প্রতাপগড়ের রাজবাটীতে বৃদ্ধ বাজিদ কয়েকটি পরিচায়ক ও রক্ষী লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিন এই আকস্মিক সংবাদ প্রাপ্তে চিন্তিত হইলেন। সৈন্য সমস্তই পুত্রের সহিত চলিয়া গিয়াছে, তখন কিরূপে গৃহরক্ষা হয়? তাঁহার রক্ষিবর্গের মধ্যে উদাই ও বুধাই নামে দুইটি মল্লভ্রাতা ছিল, বিশাল দেহী অমিত বলশালী এই মল্লযুগলকে আহ্বান পূর্ব্বক তিনি

---

৭. এই বিবাহ সম্বন্ধে অনেক কৌতুকবহ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কথিত আছে, জঙ্গলবাড়ীর প্রাচীন ভূস্বামী বলিয়াছিলেন যে, জামাতাকে জাকজমকে যাইতে হইবে, বৃদ্ধ লোক সঙ্গে থাকিবে না। তদনুসারে মারামত খাঁ সমস্ত সৈন্য ও প্রজা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ মন্ত্রীকে এক বৃহৎ নাগরা বা ঢাকের ভিতর পুরিয়া গোপন ভাবে সঙ্গে নিয়াছিলেন। তদবধি প্রাচীনত্বের উদাহরণচ্ছলে এতদঞ্চলে "নাগরার মাঝের বুড়া" বলিয়া একটা কথার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

এক পঙ্কিল ঝিলের ভিতর দিয়া বরযাত্রীদের পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। এই পঙ্কিল পথে গমন হেতু বরযাত্রীদের পথ কর্দ্দম লিপ্ত হইয়াছিল। ইহারা পৌছিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র এক এক ঘট জল দিয়া সেই জলে পদ প্রক্ষালন ও অজু (উপাসনার পূর্ব্বে হস্তমুখাদি ধৌত) করিতে বলা হয়। সেই অত্যল্প জলে এই অসম্ভব কার্য্য কিরূপে হইবে?—নাগরার ভিতর হইতে মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন, বাসের ছিলকা বা বৃক্ষপত্রাদিতে পায়ের কাঁদা মুছিয়া অতি সামান্য জলে পা পরিষ্কার করিবে। এইরূপ পরামর্শানুসারে কার্য্য করায় তাহারা সেই জলটুকুতেই পা ধুইয়া অবশিষ্ট জলে অক্লেশে অজু করিতে সমর্থ হইল;—কন্যাপক্ষ তাহাদের সহিত এই খেলায় পারিয়া উঠিল না। তৎপর কন্যা বিদায়ের পূর্ব্বে সমবয়াঃ ও সমবেশা সাতটি যুবতীর মধ্যে হইতে আপনার স্ত্রী পরিচয় করিয়া নেওয়ার জন্য মারামত খাঁকে বলা হইল। চিন্তিত মারামতকে মন্ত্রী নাগরার মধ্য হইতে বলিলেন,—স্ত্রীর মুখ দেখার অধিকার স্বামীর সর্ব্বত্রই আছে, সেই অধিকার বলে যুবতীদের অবগুণ্ঠন-বস্ত্র উত্তোলন করিয়া মুখ দেখিবার অনুমতি লইয়া মুখ দেখিতে হইবে। যে রমণী লজ্জাশীলা হইবেন—বিদেশ গমন প্রযুক্ত যিনি বিরস বদনা হইবেন, তিনিই বিবাহিতা কন্যা মারামত খাঁ ইহাতেও বিজয়ী হইয়াছিলেন।

আশুবিপদের নিরাকরণোপায় স্থির করিয়া কার্য্য করিতে বলিলেন।

রাজ্য রক্ষার অভিপ্রায়ে বিনির্নির্ম্মিত দুইটি মৃন্ময় প্রাচীর (গড়) মালিক প্রতাবের পূর্ব্ব হইতহেই অসম্পূর্ণ ভাবে পড়িয়া রহিয়াছিল। বাজিদের পরামর্শে উক্ত মল্ল যুগল পুররক্ষী দ্বাদশ জন খোজার[৮] সাহায্যে অত্যল্পকাল মধ্যে অতি বিস্ময়কর কার্য্য সাধন করিয়া লইল; তাহাদের তত্ত্বাবধানে প্রজাবর্গ এক দিবারাত্রির মধ্যে পূর্ব্বকার অসম্পূর্ণ গড় পূর্ণাঙ্গে গঠন করিয়া লইল। রাজবাটীর (প্রায় তিন মাইল) উত্তরে, পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত দুইটি ক্ষুদ্র পাহাড়বৎ মৃতপ্রাচীর পূর্ণাবয়বে দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইল;—একটির অল্প দূরে, ইহারই নাম গড়। তৎকালে ইহা দুরারোহ ও শত্রুর পক্ষে অলঙ্ঘনীয় ছিল। উত্তরের গড়টি প্রতাপগড় পরগণার উত্তর সীমা স্বরূপ হইয়াছে, ইহার স্থানে স্থানে প্রহরার জন্য লোক স্থাপনার্থে বক্রিমা ছিল, দক্ষিণের গড়টি পূর্ব্ব পশ্চিমে সোজা চলিয়া গিয়াছে। ইজারা গাও নামক স্থানে এই গড়ের সুকৌশলে গঠিত দ্বার ছিল, তথায় এখনও কয়েকটি ক্রম বিন্যস্ত মৃত্তিকাস্তূপ দৃষ্ট হয়। এই গড় দুটির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শত্রুসৈন্য যথাকালে রাজবাটী আক্রমণে অগ্রসর হইল, মল্লযুগল তখন দুইখানা বৃহৎ "লাখাই" নামক খড়গ[৯] হস্তে মৃন্ময় গড়ের নবনির্ম্মিত দ্বারে দাঁড়াইল; সাহায্যকারী খোজাগণ তাহাদের পশ্চাতে রহিল।

অতঃপর বিপক্ষ সৈন্য ক্রমশঃ সেই দ্বারপথে তির্য্যগভাবে যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি উদাই ও বুধাই ভ্রাতৃযুগলের ভীষণ খড়গাঘাতে ছিন্ন স্কন্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইতে লাগিল। পশ্চাতের বিপক্ষ সৈন্যগণ ভাবিতে লাগিল যে অগ্রবর্ত্তিগণ নির্ব্বিবাদে রক্ষিহীন রাজ-ভবনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ বহু বিপক্ষ সৈন্য অপসারিত করিতে করিতে সহকারী খোজাগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িল! নিহত শত্রু সরাইবার আর লোক নাই। সেই উন্মত্ত মল্লযুগল তখন স্তূপাকার শত্রু শবের উপর দাঁড়াইয়া আগত সৈন্য বধ করিতে লাগিল। অপ্রশস্ত পথ শবে শবে বন্ধ হইয়া গেল। এই সংবাদ যখন হৈড়ম্ব সৈন্যগণ জানিতে পারিল, তখন আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না, ভীত হইয়া পলায়ন করিল। এইরূপে দুইটি মাত্র বীরের অসম সাহস ও অমানুষিক বীরত্বে ও কৌশলে প্রতাপগড় রক্ষা পাইল।

যুদ্ধে যে সকল শত্রুসৈন্য নিহত হয়, রাজবাটীর দক্ষিণে একস্থানে তাহাদের মস্তক শ্রেণী চর্তুভুজ ক্ষেত্রের আকারে সারি করিয়া রাখিয়া, সেই মুণ্ড-মালার মধ্যস্থিত ভূখণ্ডে একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়, এই পুষ্করিণীর নাম "মুণ্ডমালা দীঘী।" পাথারকান্দি আউটপোষ্টের সন্নিকটে বিদ্যমান থাকিয়া অদ্যাপি ইহা সেই অতীত কীর্ত্তির স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিতেছে।

বাজিদের পরাজয়

এই সময় সৈয়দ হুসেন শাহ বাঙ্গালার অধিপতি। শ্রীহট্ট শাসনের ভার তখন কানুনগোর উপর ছিল। প্রতাপগড় তখনও কানুনগো গণের শাসিত ভূভাগের সম্পূর্ণ অন্তর্ভূক্ত ছিল না। কিয়ৎ পরিমাণে বাজিদ ত্রিপুরাপতির আশ্রিত ছিলেন। হৈড়ম্বরাজকে পরাভূত করিয়া ও স্বকীয় রাজ্যকে গড় এবং "গড়খালা" নামক পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া বাজিদ গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এই সময়ে তিনি স্বয়ং স্বাধীন নৃপতির পরিচায়ক সুলতান উপাধি ধারণ করেন।

৮. প্রতাপগড়ে বালিদীঘীর দক্ষিণে ইহাদের কবরের চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

৯. মালেরা যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃহৎ লাখাই-খড়গ কুরুম জাতীয় বৃহৎ প্রস্তরে ধার দিয়াছিল, একটি চিত্রাঙ্কিত প্রস্তরের সহ সেই প্রস্তর হাটখলার মসজিদে রক্ষিত আছে। ঐ প্রস্তরে দুইটা অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দৃষ্ট হয়; প্রবাদ যে, মালেরা প্রস্তরে আঘাত ক্রমে অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিয়াছিল।



শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী ও প্রতাপ গড়ের প্রস্তর চিত্র
গ্রন্থাকারের দক্ষিণে ভূগর্ভে প্রাপ্ত কয়লাখণ্ড ও বামপাশে এক খণ্ড পচনশীল বৃক্ষমূল চিত্রসহ

বাজিদের প্রভাব বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই সময় শ্রীহট্টের ভূতপূর্ব্ব কানুনগো গহর খাঁর সহকারী সুবিদ রাম ও রামদাস, সংগৃহীত রাজস্ব আত্মসাৎ করিয়া, সুলতান বাজিদের আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১০] ইহাদিগকে আশ্রয় দেওয়ায় হুসেন শাহের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সময় আরও দুই একটি বিদ্রোহী বাজিদের আশ্রয় পাইয়াছিল; সৈয়দ হুসেন সীমান্ত ভূমির বিদ্রোহ দমন করা আবশ্যক মনে করিয়া, মোহাম্মদ খাঁর সহিত জৌনপুরী কর্ম্মচারী সরওয়ার খাঁকে শ্রীহট্ট প্রেরণ করেন। সরওয়ার খাঁ (জাতিচ্যুত সর্ব্বানন্দ[১১]) শ্রীহট্টবাসী বলিয়া শ্রীহট্টে অবস্থা সম্যক জ্ঞাত ছিলেন।

সরওয়ার খাঁ প্রথমেই বিদ্রোহীদগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন কথা গ্রাহ্য করিল না; তখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে বাজিদ ও বিদ্রোহীদের পরাজয় হয়; অনেকেই ধৃত হন। বাজিদ উপায়ন্তর না দেখিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন ও আপন লাবণ্যবতী কন্যাকে সরওয়ার খাঁর সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহার অনুগ্রহ ক্রয় করেন।

সরওয়ার খাঁ বিদ্রোহী সুবিদ রাম ও রামদাসকে হুসেন শাহের সদনে প্রেরণ করেন, তথায় তাঁহারা কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। বাজিদের বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি হস্তী প্রেরিত হইয়াছিল। এবং বাজিদের সুলতান উপাধি রহিত করিয়া, নিরূপিত রাজস্ব প্রদানে তাঁহাকে বাধ্য করা হয়; এই সময় অবধি প্রতাপগড় বঙ্গের পাঠান রাজত্বের অঙ্গীভূত হইয়াছিল।[১২]

সরওয়ারের সহিত বাজিদের যে যুদ্ধ হয়, বাজিদের পুত্র মারামত খাঁ তাহাতে বিশেষ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজয়ের কিছুদিন পরেই বৃদ্ধ বাজিদ প্রাণত্যাগ করেন এবং মারামত খাঁই রাজ্য প্রাপ্ত হন। মারামতের চারি পুত্র ছিল, মৃত্যুর পর জ্যৈষ্ঠ শমসের খাঁ রাজ্যশাসন করেন।

কমলা রাণী ও প্রতাপগড় ধ্বংশ

জমসের খাঁর আট পুত্র, তন্মধ্যে আফতাব উদ্দীন খ্যাতনামা। ইঁহার সময়ে হৈড়ম্বের সহিত পুনর্ব্বার বিবাদ আরম্ভ হয়। এই বিবাদই রাজ্য ধ্বংশের কারণ। এই সময় সম্ভবতঃ তুলসীধ্বজ কাছাড়ের রাজা ছিলেন, কিন্তু রাজা অপেক্ষা রাণীই সমধিক বীর্য্যবতী ছিলেন; সেই রাণীর নাম কমলা।

কাছাড়া-রাজ সসৈন্যে প্রতাপগড় আক্রমণ করিলে আফতাব উদ্দীন স্বীয় সৈন্য সহ তাঁহাকে বাঁধা দিতে অগ্রসর হন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলেও তিনি ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। দৈব তাঁহার অনুকূলে ছিল, যুদ্ধের আরম্ভ মাত্রে কাছাড়পতি রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। কাছাড় সৈন্য ছত্রভঙ্গে পলায়ন করিল।

স্বামীর নিধন বার্ত্তা শ্রবণে রাণী কমলা বিহ্বলা হইলেন বটে, কিন্তু বীরনারী সত্বরেই শোক সম্বরণ পূর্ব্বক প্রতিশোধ গ্রহণার্থ রণবেশে সজ্জিতা হইলেন। তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহ বাক্যে প্রতি সৈন্য উত্তেজিত ও প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল, অচিরেই তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়া ক্ষুদ্র

১০. Mazumdar Family-P. 3.

১১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে দেখ।

১২. আইন-ই-আকবরিতে লিখিত আছে যে, শ্রীহট্টের আট মহল মধ্যে প্রথমটিই প্রতাপগড় এবং ইহার রাজস্ব ৩৭০,০০০ দাম। সম্রাট আকবরের "ওয়াসিল-তোমার জমা" শের শাহের রাজস্ব হিসাবে নকল মাত্র। বস্তুতঃ প্রতাপগড় মোসলমান সম্রাজ্যান্তর্গত বিবেচিত হইলেও, তখনও তত্রত্য অধিপতিরা স্বাধীন ভাবেই শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেন।

আফতাব উদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন।

আফতাব উদ্দীনও তেজস্বী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন; তাঁহার সৈন্যগণ সংখ্যায় সামান্য হইলেও সাহসে অতুলনীয় ছিল, তাহাদের বিশ্বস্ততায় নির্ভর করিয়া তিনি কমলা রাণীকে বাঁধা দিতে ধাবিত হইলেন। কিন্তু প্রবল বন্যা মুখে ভাসমান তৃণখণ্ডের ন্যায় তাঁহার সৈন্য মুহূর্ত্তে মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল! প্রতাপগড় কাছাড় রাজ্যের অন্তর্ণিবিষ্ট হইল।

বিজয়ী সৈন্যগণ রাণীর আদেশে রাজবাটী লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহারা রাজবাটী প্রবিষ্ট হইয়া একটি প্রাণীকেও তথায় দেখিতে পায় নাই। আফতাব উদ্দীন ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গের অনেকেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণপাত করিয়াছিলেন। অনেকেই বলেন যে, সেই যুদ্ধে প্রতাপগড়ের রাজবংশ নির্ম্মূল হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, মৃতাবশিষ্ট দুই একজন জঙ্গলের অন্তরালে লুক্কাইত ভাবে জঙ্গল বাড়ীর কুটুম্বালয়ে গমন করেন তথা হইতে আর তাঁহারা এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

একাদশ অধ্যায়

প্রতাপগড়ের হিন্দু নবাব

সংশয় সমাচার

পূর্ব্বাধ্যায়ে যে ঘটনা বর্ণনা করা গিয়াছে, তাহার কয়েক বৎসর পরে ত্রিপুরাধিপতি কাছাড় জয় করেন। কাছাড়ের সঙ্গে প্রতাপগড় সেইক্ষণে ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত হয়। কাছাড়াধিপতির যে কর্ম্মচারী প্রতাপগড়ে ছিল, সেই যুদ্ধে কাছাড়াধিপতির সহিত তাহারও মৃত্যু হয়। প্রতাপগড়ের জমিদার বংশীয়গণ বলেন যে, পূর্ব্ব বর্ণিত হৈড়ম্ব-রাজমহিষি কমলার যুদ্ধকালে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ জঙ্গলবাড়ী গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আফতাব উদ্দীনের সহোদর সাকির উদ্দীনের পুত্র সুলতান মোহাম্মদ ও সিরাজুদ্দীন মোহাম্মদ এবং ওজমন উদ্দীনের পুত্র আজফর মোহাম্মদ, পরে কাছাড়-পতির এই পরাজয় সংবাদে জঙ্গলবাড়ী হইতে স্বদেশে আগমন করেন।

এই সমাগত ব্যক্তিত্রয়ের মধ্যে আজফর বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাব উদ্ধত ছিল, ক্ষীপ্রকারিতা গুণে তিনিই প্রতাপগড় অধিকার করিয়া লন; ইহাতে আজফরের সহিত বয়োজ্যেষ্ঠ সুলতান মোহাম্মদের বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু রাজ্যের উত্তরাংশ গ্রহণ করিয়া পৃথক বাটী প্রস্তুত ক্রমে আজফর তথায় চলিয়া গেলে এই বিরোধ মিটিয়া যায়। আজফরের অধিকৃত স্থানই জফরগড় বলিয়া উক্ত হয়। পরগণা জফরগড়ের নামের সহিত এই আজফর নামের সম্বন্ধ থাকা যেন সঙ্গত বোধ হয় না। ইঁহাদের সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী শ্রুত হওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্ব বর্ণিত রণহতাবশিষ্ট পলায়িত রাজবংশীয়গণের মৃত্যু হইলে অপর এক বংশের ব্যক্তিগণ প্রতাপগড়ের রাজবংশীয় পরিচয়ে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। প্রতাপগড়ের মোসলমান জমিদারগণ তীব্রভাবে একথা অস্বীকার করেন ও তাঁহারাই প্রতাপগড়ের রাজবংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন। ফলতঃ প্রকৃত সত্য কি, তাহা এখন অতীতের তিমিরাবৃত গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

সে যাহা হউক, আফতাব উদ্দীন প্রভৃতির সহিত রাজবংশ ধ্বংশ হইয়া থাকিলেও, প্রতাপগড়ে আগত সুলতান মোহাম্মদ প্রভৃতি তাঁহাদেরই স্থলবর্ত্তী হওয়ায়, পরবর্ত্তী বিবরণ তৎসংসৃষ্টভাবেই একত্র লিখিত হইতেছে এবং বংশ-পত্রেও[১] ক্রমানুসারেই নামাবলী দেওয়া গিয়াছে।

জঙ্গলবাড়ী হইতে প্রত্যাগত আজফর এবং সুলতান ও সিরাজুদ্দীন আফতাব উদ্দীন প্রভৃতির উত্তরাধিকারী প্রচারে প্রতাপগড় করায়ত্ত করিলেও, প্রতাপগড়ের পূর্ব্ব বর্ণিত রাজগণের তুল্য রাজ ক্ষমতা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই; সাধারণ জমিদারদের ন্যায়ই চলিতে থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রতাপগড় ও জফরগড়ের মোসলমান জমিদারদের আদি পুরুষ বলিলে কিছুই অসঙ্গত হয় না।

সুলতান মোহাম্মদ

সুলতান মোহাম্মদ অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন, প্রজাবর্গ এই জন্য তাঁহাকে "রাঙ্গাঠাকুর" বলিত। তিনি প্রথমতঃ পরিত্যক্ত রাজবাটীর সংস্কার করিয়া বাসোপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন।

১. ঙ-পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য (২য় ভাগ ২য় খণ্ড)

লঙ্গাই নদীর গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া ইঁহারই কীর্ত্তি।

এই নদী পূর্ব্বে নানাস্থান ঘুরিয়া অতিশয় বক্রভাবে প্রবাহিত হইত, ইহাতে জল পথে প্রতাপগড় আসিতে বিলম্ব ঘটিত। তখনকার নদী রাজবাড়ীর পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। রাঙ্গাঠাকুর হেমন্তে নদীর একস্থানে বাঁধ বাঁধিয়া অন্যদিকে নদীর প্রবাহ প্রধাবিত করিয়া দেন। ইহাতে নদীর বক্রতা বহুক্রোশ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সে স্থানে বাঁধ দিয়া নদীর গতি পরিবর্ত্তন করা হয়, ঐ স্থান অদ্যাপি "রাঙ্গার ভাঙ্গা" নামে কথিত হইয়া থাকে।[২]

সিরাজউদ্দীন ইঁহারই ভ্রাতার নাম। জফরগড়ের অধিবাসী আজফর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সিরাজউদ্দীন তথায় গমন করেন। জফরগড়ের মোসলমান চৌধুরীগণ ইঁহারই বংশসম্ভূত।[৩]

পরবর্ত্তী চৌধুরীগণ

রাঙ্গাঠাকুরের পুত্র জান মোহাম্মদ। ইঁহার পুত্র বদরুদ্দীন মোহাম্মদের সময় সম্পত্তি বহু পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্ব গৌরব তিরোহিত হয়। সবিস্তৃত রাজবাটীর এককোণে পড়িয়া থাকা তিনি যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন নাই। তিনি রাজবাটীর কিছু দূরে উত্তর দিকে এক নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন।

বদরুদ্দীন মোহাম্মদের পুত্র গোলাম আলী চৌধুরী। ইহার সময়ে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে, রাধারাম (লালা) নামক জনৈক ব্যক্তি শ্রীহট্ট সহর হইতে আসিয়া তাঁহার সম্পত্তির অনেকাংশ গ্রাস করেন। এই সময় জফরগড়ের চৌধুরীবর্গ বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

গোলাম আলীর বৃদ্ধাবস্থায় দশসনা বন্দোবস্তের সূত্রপাত হয়। এই বন্দোবস্তের ভাবিফল সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সন্দিহান ছিলেন বলিয়া নিজ জ্ঞাতি ও আত্মীয় পাখারিয়াবাসী কর মোহাম্মদকে আনাইয়া, তাঁহাকে পরগণার ছয়পণ অংশ প্রদান করেন ও তাঁহার নামেই প্রথমে তালুক বন্দোবস্ত হইবে স্থির হয়। ইহাতেই পরে প্রতাপগড়ে ১নং কর মোহাম্মদ তালুকের উৎপত্তি হয়। দশসনা বন্দোবস্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে গোলাম আলীর মৃত্যু হইলেও তদীয় পুত্র গোলাম রজা, পিতার নামে ও নিজ নামে প্রতাপগড়ের ৩৩নং ও ৩৪নং তালুক বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। এই বন্দোবস্তের পূর্ব্বেই রাধারাম ইঁহাদের অধিকাংশ সম্পত্তি গ্রাস করিয়া প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

---

২. কথিত আছে যে সুলতান বণিতা স্বীয় প্রসাদাগ্র হইতে, কোন নাবিকের অশ্লীল "সারিগান" শুনিতে পাইয়া বিশেষ লজ্জিত হন ও স্বামীকে সন্নিকটবর্ত্তী নদী ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধেই এই হিতকর অনুষ্ঠান হয়। রাজবাটীর সন্নিহিত লুঙ্গাই নদীর পূর্ব্বখাতে এখন শিঙ্গিছড়া প্রবাহিত হইতেছে।

৩. জফরগড়ের অন্তর্গত আতানগর, আলীনগর, শমশেরনগর (শেরপুর), রসুল নগর (ধলছড়া), ও আচলনগর, এই পাঁচ স্থানে সিরাজউদ্দীন বংশীয় চৌধুরীগণ বাস করেন। এই জন্য জফরগড়ে "পাঁচ ঠাকুরের দোহাই" দেওয়ার কথা প্রচলিত আছে। এই পাঁচ বংশীয় মিরাশদারগণ ব্যতীত জফরগড় পরগণার মৈন্য নিবাসী হিন্দু মিরাশদারগণ প্রসিদ্ধ; কিন্তু এই হিন্দু চৌধুরী বংশ আতানগরের অন্তর্গত। আতানগরের মোসলমান চৌধুরী বংশ এখন বিলুপ্ত। দশসনা বন্দোবস্ত কালে ঐ বংশে ওলী মোহাম্মদ চৌধুরী জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র নবি নওয়াজ তৎপুত্র দেওয়ান রসুল চৌধুরী, তৎপুত্র নশা মিয়া চৌধুরী, ইঁহার একটি শিশু জাত হইয়াছিল। আলীনগর বংশে শ্রীযুত মুসব্বীর আলী চৌধুরী বর্ত্তমান আছে। শমশেরনগর বংশে শ্রীযুত মোহাম্মদ ইদ্রিস চৌধুরী খ্যাতনামা ব্যক্তি, আচলনগর বংশে শ্রীযুত মুসলিম আলী চৌধুরী প্রভৃতি বিদ্যমান আছেন।

নবাব রাধারাম

শ্রীহট্টের তালতলা বাসী দত্ত বংশীয় রাজারাম, শ্রীহট্টের পূর্ব্বাংশবর্ত্তী নব অভ্যুদিত সাহু বংশে বিবাহ করেন। ইঁহার এক গোধা পুত্র জন্মে তাঁহারই নাম রাধারাম। রাধারামের ভাগ্য বিপর্য্যয় কাহিনী আশ্চর্য্যজনক। রাধারামের বাড়ীতে একদা এক অতিথি সন্ন্যাসী আগমন করেন। রাধারাম তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অবধৌতিক প্রলেপ প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন, সেই প্রলেপের আশ্চর্য্য গুণে রাধারামের পা সহজ আকার ধারণ করে। ইহাতে রাধারাম সন্ন্যাসীর একান্ত অনুগত হইয়া পড়েন। উভয়ে তথা হইতে প্রতাপগড়ের পূর্ব্বাংশে চরগোলা নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রথম রাত্রি যে স্থানে অবস্থান করেন, ঐ স্থান অদ্যাপি "সন্ন্যাসীর পাট্টা" নামে খ্যাত আছে।

চরগোলা তখন ঘোর জঙ্গলাবৃত্ত; সেই স্থানে তখন মনুষ্যবাস ছিল না। ঐ অঞ্চলে "সহিজা বাদশাহ" নামে জঙ্গলের দেবতা সাধারণের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। সন্ন্যাসী রাধারামকে বলিলেন, "যাঁর আমল তাঁহার দোহাই" "তুমি সহিজাকে বিশেষ ভক্তি করিবে, তাহাতেই তোমার উন্নতি অনিবার্য্য।" এই উপদেশ দিয়া সন্ন্যাসী তপস্যার্থ ছত্রচূড়া শৃঙ্গে চলিয়া গেলেন।

রাধারাম সহিজার ভক্ত হইলেন এবং সেই স্থানে নিজ বাসার্থ বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু সেই জনশূন্য স্থানে আত্মোন্নতির কোন উপায় করিতে না পারিয়া, প্রতাপগড়ের জমিদার গোলাম আলীর বাড়ীর নিকটে এক দোকান স্থাপন করিলেন; সেই দোকানই তাঁহার উন্নতির সোপান স্বরূপ হইয়াছিল।

রাধারাম গোলাম আলীর বাড়ীতে নিত্য নানা দ্রব্য যোগান দিতে লাগিলেন। অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহার অনেক টাকা প্রাপ্য হইল। জমিদার টাকা দিতে পারিলেন না, তৎপরিবর্ত্তে ভূমি দান দিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর মধ্যেই গোলাম আলীর অধিকাংশ ভূসম্পত্তি রাধারামের করায়ত্ত হইল।

"গোলামরজা চৌধুরী দেখিলেন যে সুচতুর রাধারাম পিতা হইতে অধিকাংশ সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছেন। এই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি নিজ সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। আদালত উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া "তরমিম" ডিক্রি (সম অংশে ডিক্রি) দেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে গোলাম আলী হইতে কর মোহাম্মদ চৌধুরী প্রতাপগড়ের ছয়পণ অংশ লাভ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট দশপণ অংশ তাঁহার ছিল। সদর দেওয়ানীর নিষ্পত্তি অনুসারে কাজেই গোলামরজাকে প্রতাপগড়ের পাঁচপণ অংশের অধিকারী হইতে হইল।

রাধারামও প্রতাপগড়ের পাঁচপণ অংশ পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। গোলামরজা চৌধুরীকে তিনি পরম শত্রু জ্ঞান করিতে লাগিলেন ও চরগোলায় চলিয়া গিয়া নিজ আবাস বাটীর উত্তরে এক বৃহৎ বাটী প্রস্তুত করিলেন, অদ্যাপি সে বাটী "বড়বাড়ী" নামে কথিত হয়। এই সময় তিনি পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য কুকি সর্দ্দারের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকটি কুকি সর্দ্দারকে সুচতুর রাধারাম বশ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কুকি সর্দ্দারগণ তাঁহার বাধ্য হওয়ায় তিনি শ্রীহট্টের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে এক পরাক্রান্ত পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

তাঁহার মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; ইংরেজদের প্রতি ভীষণ বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রিই এই বিদ্বেষের কারণ বোধ হয়। তিনি কুকি প্রভৃতিকে

ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন, এবং স্বয়ং স্বাধীন নবাব বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি বাটীর পার্শ্বে বিচারালয়, কয়েদখানা, কেল্লা প্রভৃতি স্থাপন করিলেন। রাধারামের দুর্গ ভগ্ন ও জঙ্গলাবৃত্ত অবস্থায় অদ্যাপি "কেল্লাবাড়ী"নামে কথিত হইতেছে।

এই সময় রাধারাম ত্রিপুরায় গমন করিয়া মহারাজ দুর্গা মাণিক্যের সহিত দেখা করেন। দুর্গা মাণিক্য তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করতঃ সম্মানিত করেন এবং চরগোলা প্রভৃতি স্থানের মহারাজের যে ভূসম্পত্তি ছিল, তাহার শাসন ভার অর্পণ করেন। ইতিপূর্ব্বে মহারাজের জনৈক কর্ম্মচারী তথায় বাস করিতেন; এখনও লোকে তাঁহার বসতির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

রাধারাম কোম্পানীর রাজস্ব দিতেন না, মহারাজকেও কিছু দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন না। পক্ষান্তরে মহারাজের নামে কুকি সর্দ্দারদের উপর বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিলেন। তাঁহার পুত্র ও সেনাপতি রণমঙ্গল অনেক বিদ্রোহী কুকিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া পিতার বাধ্য করেন।[৪]

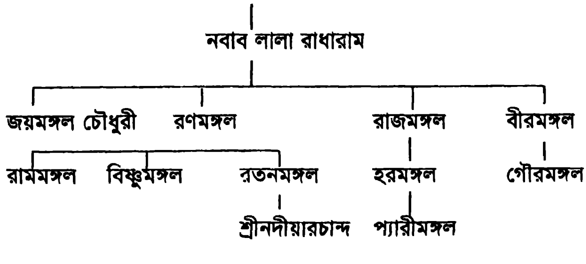
এই সময় রাধারাম চরগোলায় স্বজাতীয় লোক বসাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জঘন্য বন্য স্থান বলিয়া কেহই তথায় বাস করিতে যায় নাই। নিজ দফতরের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সরকার উপাধি জনৈক ব্যক্তিকে তিনি জমি বাড়ী দান করিয়া চরগোলায় আনিয়াছিলেন। ঐ বাড়ী "সরকারের বাড়ী" নামে কথিত হইয়া থাকে। তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে ভৃত্য শ্রেণীর বহু লোক সংগ্রহ করিয়া চরগোলায় আনয়ন করেন। তদ্ব্যতীত প্রতাপগড়ের পাঁচ পণের অধিকার লাভ করায়, চৌধুরীদের মোসলমান কিরাণ (ভৃত্য) দিগকেও তিনি অংশানুসারে বিভাগ ক্রমে চরগোলায় লইয়া গিয়াছিলেন। হিন্দু ও মোসলমান ভৃত্যগণ বিনা বেতনে তাঁহার কর্ম্ম করিত।

রাধারামের অত্যাচার

মৈনা নিবাসী কানুরাম চৌধুরীর সঙ্গে রাধারামের সখ্য ভাব ছিল, তদীয় উপদেশ ও পরামর্শে রাধারাম দ্রুতগতি চরগোলার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন। কানুরাম তাঁহাকে ইংরেজ বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন এবং সাধারণের প্রতি অত্যাচার না করিয়া দয়া প্রকাশের জন্য বলিতেন। এ সংসারে দয়া ও পরের প্রতি সমবেদনা বা সহানুভূতিই তাহাদিগকে বশীভূত করিবার একমাত্র মন্ত্রৌষধি, কঠোরতা নহে। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ রাধারাম যে দিন হইতে এই হিতৈষী বন্ধুহিত উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার অধঃপতনের সূত্রপাত হয়।

রাধারাম ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কথার বিরুদ্ধে যে চলিত তাহারই মাথা যাইত। ধন-জন-সম্পন্ন ব্যক্তিরও নিস্তার ছিল না, বন্য কুকির হস্তে অচিরেই মৃত্যু

৪. রাধারামের ক্ষুদ্র বংশাবলী এই স্থানেই প্রকাশ করা গেলঃ–



ঘটিত। রাধারাম নবাবের নাম তখন ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। বন্দুকের গুলিতে কতটি লোকের দেহ ভেদ হয়, লোকের সারি করিয়া ইহার পরীক্ষা দেখা হয়। স্ত্রীলোকের গর্ভে কয় মাসে কি অবস্থায় সন্তান থাকে, উদর বিদারণ পূর্ব্বক সে কৌতূহল তৃপ্ত করা হয়!

একদা শিকারপোলক্ষ্যে রাধারাম নৌকারোহণে শণবিলে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। একটি বৃহৎ মৎস্য হঠাৎ নৌকার নীচ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া মাঝি বড়শা-বিদ্ধ করে, ত্বরিত-গতি মৎস্যকে হঠাৎ বিদ্ধ করিতে গিয়া মাঝি অনুমতির অপেক্ষা করে নাই। ক্রূরমতি রাধারাম এই জন্য মাঝিকে মৎস্যের ন্যায় নৌকার নীচ দিয়ে যাইতে অনুমতি দেন; মাঝি আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে ঠিক মৎস্যের মত বড়শা-বিদ্ধ করেন!

একদা তাঁহাকে চরগোলার উত্তরদিগ্বর্ত্তী কালীগঞ্জ বাজারে রাত্রি যাপন করিতে হয়। তাঁহার অনুসঙ্গীরা যে চাটাইগুলোতে শয়ন করিয়াছিল, তাহা ক্ষুদ্রায়তনের ছিল বলিয়া উহাদের পা বাহিরে পড়িয়াছিল, এই অপরাধে রাধারাম তত্রত্য তাবৎ চাটাই প্রস্তুতকারীর পা কাটিয়া দেন ও তদ্রূপ ক্ষুদ্রকার চাটাই প্রস্তুত না করিতে উপদেশ দেন। রাধারামের বিচার প্রণালী অতি কঠোরতম ছিল।

দাসগ্রামের এক ব্যক্তি অপর প্রতিবাসীর স্ত্রীকে লইয়া কাছাড় চলিয়া যায়। স্বামী, স্ত্রী উদ্ধারের জন্য অভিযোগ করিলে, রাধারাম কাছাড়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ ও তদীয় সর্দ্দারগণের নিকট সেই পলাতক নারী-চোরকে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ পত্র প্রেরণ করেন; তৎফলে অচিরাৎ ধৃত হইয়া সে ব্যক্তি চরগোলা প্রেরিত হয়। রাধারাম সেই পরদারিকের অঙ্গচ্ছেদান্তে বধ দণ্ডে দণ্ডিত করেন; ও সেই ব্যভিচারিণী রমণীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাকে স্বামী পদে অর্পণ করেন।

রাধারামের অত্যাচারে লোকে ত্রাহি ত্রাহি করিত। তাহার কথায় কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না। একদা তিনি দীর্ঘিকা তীরে দাঁড়াইয়া, জলের একদিক উচ্চ দেখাইতেছে বলিলে, পার্শ্ববর্ত্তী অনুচর "নবাব বাহাদুরের কথা সত্য" বলিয়াই সায় দিয়াছিল, তদবধি এ অঞ্চলে তোষামোদকারীদের প্রতি "রাধারামের পানি মাপ" ইতি ব্যঙ্গোক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। রাধারামের এবম্বিধ "নবাবির" বহু আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে।

রাধারাম গোলামরজা চৌধুরীকে হিংসা করিতেন; হিংসাবশে কুকিদ্বারা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যোগ করেন। তদনুসারে একদা রাত্রিযোগে বহু সংখ্যক কুকি রণবেশে চৌধুরী বাড়ী আক্রমণ করিয়া বহু লোক বিনষ্ট করে, প্রতাপগড়ের ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হয়; গোলামরজা কানুরাম চৌধুরীর সহায়তায় পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে রাধারাম চরগোলার থানাদারকে আক্রমণ করিয়া প্রকাশ্যে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে উত্থিত হন। ইহা ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।[৫] উক্ত স্থান অদ্যাপি "থানার টিলা" নামে কথিত হয়।

রাধারাম স্বীয় বন্ধু কানুরামের নিকট কখন কখন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি এই বিষয়ে কানুরামের সম্মতি পান নাই। কানুরাম ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহাকে নিষেধ করেন। রাধারামের প্রতিবাদ শ্রবণের অভ্যাস ছিল না, বিশেষতঃ তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, কানুরাম যে প্রকারেই হউক, গোলামরজার পক্ষপাতি হইয়াছেন, সুতরাং কানুরামের হিতোপদেশ ফলপ্রদ হয় নাই।

---

৫. "Again in 1786, one Radha Ram, a Zaminder on the eastern frontier of the district, attacked the Char gola thana, with a following of Kakis, and killed and harried villagers."
-Allen's Assam District Gazetteers VOL. II (Sylhet) chap II P 41.

গোলাম রজা অতঃপর নীরব থাকা অসঙ্গত মনে করিলেন ও কোম্পানীর সহায়তায় দুর্দ্দান্ত রাধারামকে দমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি রাধারামের অকথ্য অত্যাচার, তাঁহার স্বাধীনতা ও ইংরেজ বিদ্বেষ প্রভৃতি গবর্ণমেন্টের গোচর করিলেন। রাধারাম কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া স্বয়ং নবাব উপাধি ধারণে লোকের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেন, রাজস্ব স্বয়ং আদায় করেন, বধদণ্ড পর্য্যন্ত বিধান করেন, ইত্যাদি জানাইলেন। চরগোলার থানায় আক্রমণ এই কথার পোষক প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল; তখন রাধারামকে দমন করা কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিলেন।

শ্রীহট্টের রেসিডেন্ট ও কালেক্টর লিণ্ডসে সাহেব এই সংবাদ প্রাপ্তে রাধারামকে দমনের জন্য একদল সৈন্য শণ—বিল দিয়া জল পথে প্রেরণ করেন। রাধারামের গ্রামাদি দগ্ধ করিয়া যে কোন প্রকারে তাঁহাকে বাধ্য করার জন্য সৈন্যের অধিনায়ক উপদেশ দেওয়া হয়।[৬]

রাধরাম এই সংবাদ পাইলেন এবং শণবিলের পার্শ্বে এক "খাটি" প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সৈন্য সমাবেশ করিলেন।

রাধারামের জয়

দুইটি পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী শণবিল শ্রীহট্ট জিলার মধ্যে ভয়ঙ্কর তরঙ্গ সঙ্কুল বিল। শিংলা নদীর কর্দ্দম দ্বারা ক্রমশঃ ইহা ভরিয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু রাধারামের সময় শণবিলে প্রাণ থাকিতে লোকে নৌকা ধরিত না। এই শণবিল দিয়া যখন ইংরেজ সৈন্য চরগোলা আক্রমণে আসিতে ছিল, তখন পার্শ্ববর্ত্তী খাটি হইতে গুলি চালাইয়া সৈন্য সহিত নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া রাধারামের পক্ষে কষ্টকর হয় নাই। তদ্ব্যতীত নৌকায় সৈন্য সমাবেশ ক্রমে রাধারাম জল যুদ্ধেও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

প্রথম যাত্রায় ইংরেজ সৈন্যের এইরূপ দুরবস্থা ঘটিলে অনতিবিলম্বে চরগোলাভিমুখে বৃহৎ আর একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। এবার প্রকৃতি রাধারামের অনুকূল হইল। ভীষণ বাত্যায় শণবিল রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল, ধবল ফেণরাশি বিকীর্ণ করিয়া, সাগরোর্ম্মির ন্যায় বিশাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া, গভীর গর্জ্জনে সৈন্য-কোলাহল ডুবাইয়া দিয়া, সৈন্যপূর্ণ নৌকাগুলি মুহূর্ত্ত মধ্যে কুক্ষিগত করিল! গবর্ণমেন্ট দেখিলেন যে রাধারামকে দমন করিতে একটু বিশেষ আয়োজনের আবশ্যক; যেমন ভাবিতেছিলেন, ব্যাপার তদ্রূপ সহজ নহে।

এই সময় রাধারাম একদা বলিয়াছিলেন যে "ঘরের ইন্দুর বান্ধ কাটিতেছে।" তাঁহার মনে মনে হইয়াছিল, স্বীয় বন্ধু কানুরাম চৌধুরীর ভরসা ও বুদ্ধি না পাইলে গোলামরজার ঈদৃশ সাহস হইত না—গোলামরজা কানুরামের নিষেধ অগ্রাহ্য করায়, ও তাঁহাকে অবিশ্বাস করায়, তিনি গোপনে গোলামরজাকে এই পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি বন্ধু কানুরামের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—"ঘরের ইন্দুর বান্ধ কাটিতেছে।" এবং এইরূপ মনে করিয়াই তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, কানুরামকে অচিরেই হত্যা করিবেন। রাধারামের এই ভীষণ সঙ্কল্পের কথা নির্দ্দোষ কানুরাম কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত ঘিলাছড়া পরগণায় মাছুরাম দে নামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ছিলেন, ইহার এক মাত্র পুত্রের নাম বিনদ রাম, বিনদ রামের সোনা ও হরি নামে দুই পুত্র হয়, ইঁহারা প্রাপ্ত বয়স্ক

৬. 'Mr Londsay promtly despat...ed some sepoys to the place ..h instructions to burn the vi' ..ges of Radha Ram's people, and lift his cattle."
-Allen's Assam District Gazetteers VOL. II. (Sylhet) chap II.

হইলে আত্মকলহ প্রযুক্ত একান্নবর্ত্তী থাকা অসুবিধাজনক বোধে পৃথক হন। ঐ সময় সোনা অনেক অস্থাবর সম্পত্তি গোপন করায় হরির মনে বিরক্তি জন্মে। হরি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, ভ্রাতার স্বার্থপরতায় বিরক্ত হইয়া প্রাপ্ত সম্পত্তি ত্যাগ করতঃ অভিমানে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

তিনি নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক জফরগড়ের দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। সে স্থান জফরগড়ের ভূম্যধিকারীদের অধিকারে ছিল। তাঁহারা হরিদাসকে সুদক্ষ ও শিক্ষিত দেখিয়া তাঁহার দ্বারাই সরকারী রাজস্ব দাখিল করাইতেন। তাঁহাদের নিকট হইতেই হরিদাস স্বীয় বাসস্থান "মৈনার টুক" প্রাপ্ত হন।

নদীর বক্রিমা মধ্যগত ভূখণ্ডকে "টুক" বলে। লঙ্গাই নদীর বর্ণিতব্য টুকে "মৈনামতি" নাম বংশনির্ম্মিত যন্ত্র যোগে লোকে মৎস্য ধরিত বলিয়া ইহা মৈনার টুক বলিয়া খ্যাত ছিল। পরে গতি পরিবর্ত্তন করিয়া নদী এ স্থান হইতে দূরে চলিয়া যায়।[৭] হরিদাস এই স্থানে লোক বসাইলে ঐ স্থানই মৈনা গ্রাম নাম প্রাপ্ত হয়।

হরিদাস অল্পকাল মধ্যে প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। হরিদাসের প্রথমা পত্নীর সহিত সদ্ভাব না থাকায় তিনি আর একটি বিবাহ করেন, সেই বিবাহে চারি পুত্র জন্মে; হরিদাসের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রই কানুরাম। কানুরাম ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিতে অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি যে কেবল রাধারামের বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন, তাহা নহে; জফরগড়ের জমিদার ওলী মোহাম্মদ তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তিনি নিজ ক্ষমতায় প্রভূত ভূসম্পত্তি আয়োজন করেন।[৮]

দশসনা বন্দোবস্তের কালে যখন মৌলিক সম্মান ও দস্তখতের নূতন ব্যবস্থা হয়, তখন ওলী মোহাম্মদের পুত্র নবিনওয়াজ চৌধুরীর নামে জফরগড়ের ৪০ নম্বর তালুকের নাম হয়, কানুরাম চৌধুরী নিজ নামে ৪১ নম্বর তালুক বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন।[৯]

---

৭. এই স্থান এক সময় লঙ্গাই গর্ভে ছিল, কাল সহকারে ভরট লইয়া জঙ্গলময় উচ্চ ভূমে পরিণত হয়। লঙ্গাই নদীর প্রাচীন খাত এখনও তথায় মরাগাঙ্গ নামে খ্যাত রহিয়াছে। মৈনাস্থ উক্ত মরাগাঙ্গের উত্তর-পূর্ব্ব কুল মৌজে ছায়াবাড়ী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম কুল মূলিবাড়ী নামে খ্যাত। কথিত আছে যে, এক সময় পশ্চিম ও দক্ষিণ কূলে মূলি নামক বংশবন ছিল, দিবাভাগে তাহারই ছায়া পূর্ব্ব ও উত্তর কুলে পড়িত বলিয়া ছায়াবাড়ী নামে খ্যাত হয় এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ কুল মূলিবাড়ী নাম প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, অত্রত্য একটা পুষ্করিণী পুনঃসংস্কার কালে (১৩১৫ বাং-চৈত্র মাস) ছয় ফিট নিম্নে নল নামক গুল্মের পত্রাবলী ও প্রায় একাদশ ফিট ভূনিম্নে একটি বৃক্ষমূল এবং এক খণ্ড অপরিণত কয়লা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃক্ষমূলটি কোমল হইয়া গিয়াছে। অপরিণত কয়লা খণ্ড কঠিন প্রস্তরে পরিণত নাহ হইলেও রংটা ঠিক কয়লার মতই গাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে কিন্তু পিণ্টো কথঞ্চিত নরম রহিয়াছে, কুদালির আঘাতে সহজেই কাটিয়া যায়। এ সকল স্থল পলি দ্বারা ক্রমশঃ যে ভরট হইয়াছে, ইহাতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। উক্ত বৃক্ষমূল এবং অপরিণত কয়লা খণ্ডের প্রতিরূপ প্রস্তর চিত্র সহ গ্রন্থকারের প্রতিকৃতির বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে যথাক্রমে পরিদৃষ্ট হইবে।

৮. কানুরাম চৌধুরীর অপর ভ্রাতৃত্রয়ও বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন, জফরগড় পরগণার কিয়দংশ ও সমগ্র প্রতাপগড় পরগণা মৈনার চৌধুরীদের অধিকারভুক্ত হয়, তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী তৃতীয়ভাগে (বংশবৃত্তান্তে) কথিত হইবে।

৯. দশসনা বন্দোবস্তের পাঁচ বৎসর পরে তিনি প্রতাপগড়ের মোসলমান জমিদার হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে (৫ই জ্যৈষ্ঠ) এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে (১৪ই বৈশাখ তারিখ যুক্ত) দুই খণ্ড কবালা দ্বারা ৩৩ এবং ৩৫ নং তালুকের নয় পণ অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন, এই কবালাদ্বয় এখনও আছে; ইহাতে প্রাচীন রীতি অনুসারে ভূমির স্বত্ব ত্যাগের সহিত "ইজ্জত" "রিয়াসত" ও "দস্তখত" বিক্রয় করা গেল বলিয়া লিখিত আছে। এই তালুকদ্বয়ের নয় পণের অতিরিক্ত অংশও চৌধুরী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন।

ঐ সময় শ্রীহট্টে প্রসিদ্ধ লালা আনন্দরাম বন্দোবস্তের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন, নিজ তালুকে অত্যধিক রাজস্ব ধার্য্য হওয়ায় কানুরাম শ্রীহট্টে গমন করতঃ আনন্দরামের স্ত্রীকে মাতৃ সম্বোধন করেন এবং ধর্ম্মমাতার যত্নে ঐ তালুকের রাজস্ব অনেকটা কমাইয়া আনিয়াছিলেন।

কানুরাম ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনিই ঠাকুর শান্তরাম নামক জনৈক বৈষ্ণব মহাত্মাকে এদেশে আনয়ন ক্রমে সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ বপন করেন। ইঁহার দুই পুত্র, তন্মধ্যে গৌরচন্দ চৌধুরী দেশ পূজিত ছিলেন, তাঁহার পুত্র উদার চরিত্র অদ্বৈত চরণ চৌধুরীই লেখকের জন্মদাতা।

কানুরামের বিপদ

যে যাহা হউক, গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে "নবাব" রাধারাম বিশেষ চিন্তিত হন, কিন্তু তাঁহার অত্যাচার কমে নাই। এই সময় কয়েকটি ব্যভিচার পরায়ণ অপরাধী স্ত্রী পুরুষকে জোড়ে জোড়ে একত্র বন্ধন করিয়া গুলি করেন। সর্ব্ব পশ্চাতে একটি স্ত্রীলোক ছিল, দৈবক্রমে সে বাঁচিয়া যায়। রাধারাম তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত হইলে সে সহিজা বাদশাহের দোহাই দেয়। রাধারাম রাগবশে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সেই স্ত্রীলোককে বধ করেন।

সহিজাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়া পরক্ষণেই তাঁহার অনুতাপ হয়। রাধারামের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সহিজার কৃপাই তাঁহার উন্নতির মূল। নিজ দোষে এই বিপদ কালে দৈববশে তিনি সহিজাকে অগ্রাহ্য করিয়া ভীত হইলেন। এখন উপায় কি? এ বিপদে আর কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? রাধারাম ভাবিলেন, মা ছেলেকে কদাপি ত্যাগ করেন, তিনি জগন্মাতা কালীর পূজা করিয়া, তাঁহারই প্রসাদে রণজয় করিলেন।

রাধারাম ১০৮ কালীপূজা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সমস্তই প্রস্তুত, কালী সন্নিধানে নরবলির ব্যবস্থা হইল। রাধারাম কল্পিত শত্রু—স্বীয় বন্ধু কানুরামকে বলি দিয়া কণ্টক শূন্য হইতে মনে করিলেন। তখনও কানুরাম চৌধুরীর সহিত প্রকাশ্য বিরোধ ঘটে নাই।

পূজার উপলক্ষে কানুরাম চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করা হইল। বিজয় নামক ক্রীতদাস ও দুইটি মোসলমান সর্দ্দার সঙ্গে কানুরাম চৌধুরী নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন করেন। রাধারাম পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন; কানুরাম রাধারামের অভিসন্ধি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার পর হইতেই বহুতর পাঠ্য যথাস্থানে আনয়ন করিয়া রাখা হইতে লাগিল। ঐ সময় বিজয় ভৃত্য কোন সূত্রে জানিতে পারিল যে, তাঁহার প্রভূকেই করাল-বদনার সদনে বলিদানের আয়োজন হইতেছে। বিজয়ের শরীর কম্পিত হইল, সে ছলক্রমে স্বীয় প্রভুকে কিছুকালের জন্য বাসায় লইয়া আসিল। কানুরাম বিজয়ের মুখে সেই ভীষণ সংবাদ শুনিলেন; তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, দেহ অবশ হইল, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন স্থলপথে চরগোলা যাওয়া যাইত না, দু-আলিয়া পাহাড় দিয়া লোক চলাচলের রাস্তা ছিল না। শতাব্দ পূর্ব্বে ঐ অঞ্চল যেরূপ ঘন বন সমাকীর্ণ ছিল, তথায় যেরূপ ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুকাদির ভয় ছিল, তাহাতে কোন মনুষ্যই জীবন জলাঞ্জলি দিয়া সে বনে প্রবেশ করিত না। বলশালী বিজয় উপায়ন্তর না দেখিয়া যুগীয়ানা গিলাপ বস্ত্রে প্রভুকে দৃঢ়রূপে পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিল এবং তখনই সেই শ্বাপদ সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যের গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। সে তখন উন্মত্ত, হাতে উলঙ্গ অসি, পৃষ্ঠে প্রভু; সে পশ্চিম মুখে দৌড়িতে দৌড়িতে প্রতাপগড়ের

জমিদার গৃহে আসিয়া পৌঁছিল।

এ দিকে চৌধুরীকে না দেখিয়া রাধারামের লোক তন্ন তন্ন করিয়া চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিল, কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া গেল না; রাধারাম প্রমাদ গণিলেন।

রাধারামের পরাজয়

রাধারামের প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হইয়াছিল; কাল পুরিয়া গিয়াছিল; নতুবা তিনি ইচ্ছা পূর্বক কেন মিত্রকে শত্রু জ্ঞান করিবেন, ও তাঁহাকে যথার্থ শত্রু রূপে পরিণত করিবেন? এই সময় গবর্ণমেণ্ট পক্ষেও রাধারামের দমন উদ্দেশ্যে বিবিধ তথ্য সংগৃহীত হইতেছিল; কানুরাম চৌধুরী পর দিবসেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও যেরূপ আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছেন, যেরূপে রাধারামকে অনায়াসে ধৃত করা যাইতে পারে, তাহা বলিয়া দিলেন। সেই প্রথম চরগোলা প্রবেশের স্থল পথের সন্ধান পাইয়া ইংরেজ সৈন্য রাধারামকে ধৃত করিতে ধাবিত হইল।

এবার রাধারামের সমস্ত গর্ব্ব খর্ব্ব হইল, সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হইল; বৃটিশ সৈন্যের বন্দুক বেওনেটের নিকট তীর বল্লমধারী কুকি সৈন্য তিষ্ঠিতে পারিল না। রাধারাম উপায়ান্তর বিহীন হইয়া সপরিবারে ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন।

জয়মঙ্গল সামান্য প্রজার বেশে তুতিপাখী শিকারের ভাণে ভ্রমিতে লাগিলেন, কিন্তু অধিক দিন আত্মগোপন করিতে পারিলেন না, ধৃত হইলেন। সেনাপতি রণমঙ্গল তখন জীবিত ছিলেন না। রাজমঙ্গল প্রতাপগড়ের মাঠে ডোমের বেশে বেড়াইতে ছিলেন, তদবস্থায় ধৃত হন। রাধারাম কিছুদিন ছিলেন, পরে সিদ্ধেশ্বরের বারুণীতে ধৃত হন। তাঁহাকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া শ্রীহট্টে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

রাধারাম পথে আত্মহত্যা করিয়া ইংরেজ রাজের দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। জয়মঙ্গলকে বহুদিন কারাগারে বাস করিতে হয়। জয়মঙ্গলের কারাবাসের সময় তদীয় তাবৎ ভূসম্পত্তি প্রতাপগড়ের মোসলমান চৌধুরী কারায়ত্ত করেন। জয়মঙ্গল কারাগারে থাকিয়া বলিয়াছিলেন,—"প্রতাপগড়ের মাটি প্রতাপগড়েই থাকিবে।" প্রতাপগড়ের জমিদারগণ জয়মঙ্গলের এই কথা শুনিয়া ভীত হন ও গৃহীত ভূমি ছাড়িয়া দেন।

রাধারাম অত্যাচারী হইলেও জয়মঙ্গরের সদাশয়তা ছিল, এই জন্য নিরক্ষর প্রজাবর্গ যে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল, এতদ্দেশে প্রচলিত গ্রাম্য গীত হইতে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়।[১০]

জয়মঙ্গল অনেক দিন কারাবাসের পর ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করেন ও মুক্তিলাভ করেন। জয়মঙ্গল তখন "চৌধুরী" খ্যাতি প্রাপ্ত হন। মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াই তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে নিজ সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই বন্দোবস্তের সময় রাধারাম জীবিত না থাকিলেও তাঁহার নামে প্রতাপগড়ের ৮১নং তালুকের নামকরণ হয়। জয়মঙ্গল ৭৯নং তালুক নিজ নামে বন্দোবস্ত করেন। অতঃপর তিনি কয়েকবার হস্তী খেদা করিয়া

১০. "কান্দেরে চরগোলার লোক দেশে দেশান্তর।
জয়মঙ্গল আসিবা যবে চরগোলার নগর,
ডোম চাড়াল মিলিয়ারে বানাইয়া দিমু ঘব।" ইত্যাদি।
ইংরেজ সৈন্য রাধারামের গৃহ ভূমিসাৎ করিয়াছিল, গ্রাম্য গীতিতে তাই গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিবার প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। লুণ্ঠন প্রারম্ভে রাধারামের ভৃত্য শ্রেণীর লোকেরাও অনেক অর্থ আত্মসাৎ করিয়া ধনী হইয়া উঠিয়াছিল, দুই এক জন ব্যতীত এক্ষণে অনেকেই পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের অনেক আয় কবিয়া দিয়াছিলেন। ৩ হাব পিতার সময়ে প্রজাগণ খাজনা দিত না, বৎসরে একদিন নানা সামগ্রী সমেত বৃহৎ সি ' (ভেট) দিত; জয়মঙ্গল ইহা রহিত করিয়া খাজানা লইতে আবম্ভ করেন।

জয়মঙ্গলের পুত্র বিষ্ণুমঙ্গল প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। কুকিরাজ লাল চুকলার অধীন কয়েকটি সর্দ্দার এক সময়ে প্রতাপগড়ের একস্থলে আপতিত হইয়া ১০৮টি নরমুণ্ড সংগ্রহ ক্রমে লইয়া যায়। বিষ্ণুমঙ্গল নরমুণ্ড সমেত ৫/৬টি কুকি সর্দ্দারকে ধবিযা আনিয়া গবর্ণমেণ্টের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কুকিরা যে স্থানেব প্রজাদিগকে কাটিয়াছিল, ঐ স্থান তদবধি "কাটাবাড়ী" নামে খ্যাত হয়।[১১]

ত্রিপুরার মহারাজ কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য মণিপুবেব রাজবংশে এক বিবাহ করিয়াছিলেন। ত্রৈপুর রাজবংশীয় রামচন্দ্র ঠাকুব মণিপুর হইতে আগরতলা প্রত্যাবর্ত্তন কালে বিষ্ণুমঙ্গল চৌধুরীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। চৌধুরীর আতিথে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহাকে পবামর্শ দেন। তদনুসাবে বিষ্ণুমঙ্গল লোকজন সহ আগরতলায় গমন করেন। মহারাজ তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রম সহকারে বাসের জন্য উত্তম স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার অনুসঙ্গী প্রত্যেক ব্যক্তিকে পঁচিশ টাকা করিয়া পুরস্কার এবং তাঁহার জন্য উপাদেয় দ্রব্য সমেত অশীতি মুদ্রা মূল্যের ভেট প্রেরণ করেন। ঐ সময় রাজধানীতে ভীষণ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ও তাঁহার অনুষঙ্গী কয়েকটি লোক ঐ ভয়ঙ্কর রোগে প্রাণত্যাগ করায় তিনি ভীত হইয়া প্রত্যাগমন করেন। মহারাজার সা২০ সাক্ষাৎ হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিত।

জয়মঙ্গল চৌধুরীর মৃত্যু পর গোলামরজা চৌধুরীও প্রাণত্যাগ করেন। গোলামরজার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আবিদরজা ও আদমরজা চৌধুরী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। ইঁহার অহিফেন সেবী ছিলেন। তাঁহারা যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, তাহার পরিমাণ কম ছিল না। কিন্তু তাঁহারা সেই সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই; একবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলেন। পরে আবিদরজা চৌধুরীর পুত্র আলীরজা চৌধুবী, মৈনার চৌধুরীগণের কর্ম্ম স্বীকার করিয়া, কথঞ্চিৎরূপে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আলীরজা চৌধুরী বুদ্ধিমান ও সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, তাঁহার পুত্রগণ জীবিত আছেন।

প্রতাপগড়ের কাপাড়ীবন্দবাসী সাহু বংশীযগণের পূর্ব্ব পুরুষ নারায়ণ দাস প্রতাপগড়ের "রাজার" সেনাপতি ছিলেন, এখনও "নারাইণের বাড়ী;" ও তাঁহার দীঘীর চিহ্নাদি বর্ত্তমান আছে। প্রতাপগড়ের বিবরণ এই স্থলেই সমাপ্ত করা হইল।

সমাপ্তি—

গৌড়বাজ্যের বিবরণ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল। "সংক্ষেপে"—কেননা গৌড়ের অনেক বিবরণই বংশ-বৃত্তান্তের অন্তর্ভূক্ত হইবে। গৌড় শ্রীহট্টের অন্তর্গত খণ্ডরাজ্য সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল; তরফ, ইটা, কানিহাটী, প্রতাপগড় প্রভৃতি স্থানের যে ভূস্বামী স্বতন্ত্রভাবে আধিপত্য করিতেন, তাঁহাদের অধিকৃত স্থানগুলিও এই গৌড়ের অন্তর্গত বিবেচিত হইত।

মোসলমান শাসনকর্ত্তাদের সময়ে গৌড়ের ক্ষমতায় অনেক সময় লাউড় ও জয়ন্তীয়ার অধিপতিদিগকে সন্ত্রাসিত থাকিতে হইত।

১১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায় দেখ।

কমলা, গজদন্ত, ঢাল ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্য দিল্লী প্রভৃতি স্থানেও সগৌরবে (শ্রীহট্টের) গৌড়ের নাম ঘোষণা করিত। গৌড়ের শেষ হিন্দু রাজা গোবিন্দ, গৌড়ের নামযোগেই পরিচিত হইতেন। বহুকাল হইল, শ্রীহট্টের গৌড় অস্তিত্বহীন হইয়াছে; গৌড় বলিয়া যে একটা স্থান শ্রীহট্টে ছিল, তাহা হয়তঃ এখন অনেকেই জ্ঞাত নহে, কিন্তু "গৌড় গোবিন্দ" বলিয়া এক পরাক্রান্ত রাজা শ্রীহট্টে ছিলেন, ইহা আজ পর্য্যন্ত শ্রীহট্টবাসী সকলেই জানে।

এই গৌড়ের প্রাচীনত্ব ও বিস্তৃত বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকাই শ্রুত হওয়া যায়। যখন আধুনিক ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জিলা গঠিত হয় নাই, যখন ত্রিপুরা প্রাচীন কমলাঙ্ক নামেই খ্যাত হইত এবং ময়মনসিংহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইত, সুবর্ণগ্রাম পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল, বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে যখন একমাত্র শ্রীহট্ট জিলাই সুনাম খ্যাত ছিল, সেই সময় গৌড়ের সীমারেখা কোন কোন স্থানে ঢাকার সীমা সংস্পর্শ করিয়াছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই গৌড়ে অনেক বিখ্যাত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীহট্টের নাম চিরগৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশের বিবরণই বংশ-বৃত্তান্ত ও জীবন-বৃত্তান্ত ভাগে কথিত হইবে। তরফের বিবরণে কয়েক জনের কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, ইটার বিবরণে প্রসঙ্গত তার্কিক-শিরোমণি শিরোমণির কথা কথিত হইয়াছে, বস্তুত এই গৌড় রতনপ্রসবিনী ছিল,—ইহার এক এক সন্তান গুণে অদ্বিতীয়, ধর্ম্মে-অতুলনীয়, জ্ঞানে প্রবীণ, উৎসাহে নবীন, কর্ম্মে কৃতী, বিক্রমে বীর, বিদ্যায় বিপুলযশাঃ ছিলেন। এ থাকার বিশেষত্ব বিশেষ খ্যাত, এই জন্যই বোধ হয়—

"সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকাঃ উত্তমাধম মধ্যমাঃ।
শ্রীহট্টে মধ্যমোনাস্তি চট্টলে নাস্তি চোত্তমা॥"
ইতি কথার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

প্রতাপগড়ের বিবরণের সহিত এতদূরে "গৌড়" নামক দ্বিতীয় খণ্ড পরিসমাপ্ত হইল।

তৃতীয় খণ্ড

মোসলমান প্রভাব

লাউড়

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ

প্রাচীন রাজ্য বিবরণ

প্রাচীন কালে শ্রীহট্ট জিলা তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে লাউড় অন্যতম। বর্ত্তমান লাউড় পরগণাতেই ইহার প্রধান নগর ছিল। লাউড় প্রকৃতির এক রম্য নিকেতন। অতি প্রাচীন কালে এই সুরম্য স্থান কামরূপের ভগদত্ত রাজার শাসনাধীন ছিল; তিনি কখন কখন লাউড়ের রাজধানীতে আগমন ও অবস্থিতি পূর্ব্বক এতদ্দেশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। লাউড়ের পাহাড়ে এক উচ্চ স্থান দেখাইয়া এখনও লোকে ভগদত্ত রাজার আবাস স্থানের নির্দ্দেশ করে।[১] দ্বিতীয়ভাগ ভগদত্ত বংশীয় ১৯ জন নৃপতি ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। সে যাহা হউক, অতঃপর বহুকাল যাবৎ লাউড়ের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে ইহা নিশ্চয়ই যে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট দেশ কামরূপের অধীন ছিল।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লাউড়ে বিজয় মাণিক্য নামে জনৈক হিন্দু নৃপতি রাজত্ব করিতেন। জনশ্রুতি ও প্রাচীন মুদ্রাদি হইতে তাঁহার বিবরণ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। জগন্নাথপুরে 'বিজয় রাজার বাড়ী' বলিয়া যে ভগ্নাবশেষ আছে, কিছুদিন হইল তথায় একটী প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এই মুদ্রায় বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে, 'রাজা বিজয় মাণিক্য শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেব্যা শক ১১১৩"।[২]

এই মুদ্রা হইতে বিজয় মাণিক্যের রাজত্ব কালটা মাত্র নিরূপিত হইতেছে। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি জগন্নাথপুর প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, ইহা নিঃসংশয়িত রূপে বলা যাইতে পারে। কিন্তু কয়েকটি পরম্পরা প্রচলিত জনশ্রুতি ব্যতীত তদ্বিষয়ে আর কিছুই শ্রুত হওয়া যায় না।

বিজয় মাণিক্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। জগন্নাথ নামক জনৈক বিপ্র বিজয় মাণিক্যের আশ্রয়ে এক বাসুদেব বিগ্রহ স্থাপন করেন। দ্বিজভক্ত রাজা সেই জগন্নাথের দেবসেবা নির্ব্বাহের জন্য যে ভূমিদান করেন, জগন্নাথ বিপ্রের নামানুসারে তাহাই জগন্নাথপুর বলিয়া আখ্যাত হয়।

রাজা বিজয় মাণিক্যের লক্ষ্মী ও শ্রী নামে দুই মহিষী ছিলেন, বাসুদেবের মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে যে দুটি পুষ্করিণী আছে, উক্ত মহিষীদ্বয় তাহার প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া কথিত আছে।

আরও কথিত আছে যে, উক্ত বিজয় মাণিক্য কুবাজপুরের নিকট মাগুরায় মৃগয়া উপলক্ষে গিয়াছিলেন। এই সময় বঙ্গের লহঝঙ্গ হইতে হরিহর রায় ও রামরায় নামক ভ্রাতৃদ্বয় এদেশে আগমন করিয়া, এক নদীতীরে অন্ন প্রস্তুত করিতে ছিলেন। রাজার নৌকা পরিচালকদের

---

১. স্বর্গীয় মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য কৃত শিকার কাহিনীতে লিখিত আছে যে মধুপুর জঙ্গলেও স্থান বিশেষ ভগদত্ত রাজার বাটীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই ভগদত্ত মহাভারতোক্ত ভগদত্ত হইতে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। মহাভারতের সময় ময়মনসিংহের পশ্চিমাংশ বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ময়মনসিংহের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার মহাশয়ও ইহা অনুমান করেন।

২ উক্ত মুদ্রা একটি সিক্কা ([illegible]) মুদ্রা। চৌধুরী বংশের একটি প্রজা উহা পাইয়াছিল, এক্ষণে উহা কুবাজপুরের শ্রীযুক্ত মদনমোহন চৌধুরীর নিকট আছে।

অসাবধানতায় তাঁহাদের পক্কান্ন পরিত্যক্ত হয়। এই বিষয় লইয়া নৌকাচালকদের সহিত তাহাদের কলহ উপস্থিত হয়। ইহা যে রাজা বিজয়ের নৌকা, ভ্রাতৃদ্বয় তাহা ভাবেন নাই। উভয় পক্ষে বচসা বাঁধিলে তাঁহাদের মুখে অশ্লীল বাক্য শ্রবণে রাজা রুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে ধৃত করিতে আদেশ দিলেন। তখন রাজার নৌকা জানিতে পারিয়া ও বিপদ দেখিয়া রামরায় তৎক্ষণাৎ পলায়নপর হইলেন, কিন্তু হরিরায় পলায়নে অক্ষম হওয়ায় ধৃত হইয়া রাজধানীতে নীত হইলেন।

রাজা দ্বিজভক্ত ছিলেন, তিনি হরিহরকে ব্রাহ্মণ জানিয়া, বিশেষতঃ তাঁহার কবিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। এবং অল্প দিনেই তাঁহার গুণগ্রামে এরূপ মোহিত হইলেন যে, হরিহরকে নিজ প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। এই হরিহরের লাখেরাজ ভূমিই (কুবাজপুরের অন্তর্গত) হরিপুর গ্রাম। হরিহর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তদ্বংশে ১৯/২০ পুরুষ চলিতেছে।[৩]

বিজয় মাণিক্যের পিতার নাম অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর কে তদীয় পরিত্যক্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তাঁহার সম্বন্ধে কেহই কিছু জানে না—এস্থলে জনশ্রুতিও নীরব। এই বিজয় রাজের বিবরণ দ্বারা লাউড়ের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়; এই রাজ্য যে অতি প্রাচীন প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের শেষে প্রসঙ্গত একথার উল্লেখ করা গিয়াছে।

বিজয় মাণিক্যের পরে তদ্বংশে কে কে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন, কতকালই তাঁহারা রাজত্ব করেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। বিজয় মাণিক্যের বহুকাল পরে এদেশে মোসলমানগণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহারাজ গণেশের মন্ত্রী নরসিংহ

সুপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লালসেন কুলীনদিগের মধ্যে মর্য্যাদা স্থাপন করেন। ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভাস্কর বৈদান্তিক বল্লালসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কুল মর্য্যাদা স্থাপন কালে ভাস্কর জীবিত ছিলেন না। তৎপুত্র আরুওঝা নাড়ুলী গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া তিনি "নাড়িয়াল" নামে পরিচিত হন, এবং সিদ্ধ শ্রোত্রিয় পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার বংশজাত শ্রীপতি শ্রীহট্টস্থ লাউড়াধিপতির সভাপণ্ডিত হইয়া লাউড়ে আসিয়া বাস করেন। শ্রীপতির অন্বয়জাত নরসিংহ নাড়িয়াল বিদ্যা শিক্ষার জন্য শ্রীহট্ট হইতে গৌড় রাজধানী সন্নিধানে রামকেলী গ্রামে গমন করেন ও তত্রত্য জটাধর সর্ব্বাধিকারীর নিকট সংস্কৃত ও পারস্য ভাষাদি শিক্ষা করেন।[৪]

নরসিংহের যশঃ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তাঁহার গুণগ্রাম জ্ঞাত হইয়া দিনাজপুরের রাজা গণেশ তাঁহাকে স্বীয় আমাত্য পদে বরিত করেন। ঐ সময় বঙ্গভূমে যোগ্যতর শাসনকর্ত্তা কেহ ছিল না; সেই সুযোগে রাজা গণেশের মনে অতি উচ্চাভিলাষ উপজাত হয়, মন্ত্রীর নিকট তাহা ব্যক্ত করিলে, তৎপরামর্শে তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে (১৩৮৫ খৃষ্টাব্দ) গেয়াস উদ্দীন বাদশাহের পৌত্র দ্বিতীয় শামসউদ্দীনকে নিহত করিয়া গৌড় অধিকার করেন। বঙ্গদেশ বহুকাল পরে বিদ্যুৎঝলকের ন্যায় হিন্দুর গৌরব ছটায় স্বল্পমাত্র প্রভাসিত হয়। মন্ত্রীবর স্বীয় বুদ্ধিবলে কেবল মোসলমানদিগকে দমন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—তিনি মহারাজ গণেশকে সুপরামর্শ দিয়া বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন।[৫] তাঁহারই পরামর্শে মহারাজ গণেশ বহুতর দেবমন্দির, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজত্বে হিন্দুধর্ম্ম কিয়ৎকালের জন্য পুনর্ব্বার মস্তক

৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় ভাগে বংশ-পত্রিকা সহ তদ্বংশীয় বিবরণ কথিত হইবে।

৪. অদ্বৈত বাল্যলীলা সূত্রম্।

৫. Marshman's History of Benal. Sect. II. P. 16

উত্তোলন করিয়াছিল।[৬]

রাজকার্য্য ব্যপদেশে নরসিংহকে প্রায়শঃ বিদেশে বাস করিতে হইত। সামাজিক বিষয়েও নরসিংহের কম আধিপত্য ছিল না; বারেন্দ্র সমাজে তিনি অগ্রণী ছিলেন। নরসিংহ মধুমৈত্রকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করায়, বারেন্দ্র সাজে "কাপ" নামে এক মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর উৎপত্তি হয়; ইহাতে তিনি ব্রাহ্মণ সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।[৭] নরসিংহ বিদেশ প্রবাসী হইলেও আমাদের শ্রীহট্টের অধিবাসী, অতএব ইহা শ্রীহট্ট বাসীরই একটি কীর্ত্তি।

রাজ্যদিব্যসিংহ ও কুবেরাচার্য্য

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লাউড় দেশ কাত্যায়ন গোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণ নৃপতি[৮] কর্ত্তৃক শাসিত হয়; ঐ রাজার নাম দিব্যসিংহ। দিব্যসিংহের রাজধানী লাউড়ের নবগ্রামে ছিল। নবগ্রামবাসী পূর্ব্বোক্ত নরসিংহ নাড়িয়ালের পুত্র কুবের তর্কপঞ্চানন রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন।[৯] ইটা-পাঁচ গাও নিবাসী কাত্যায়ন গোত্রীয় শ্রীযুক্ত রামকমল শাস্ত্রী মহাশয় সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের বিবরণে আমাদিগকে লিখিয়াছেন,—"কালক্রমে এই কাত্যায়ন বংশে লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ প্রাদুর্ভূত হন। সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা দত্তকে চন্দ্রিকা প্রণেতা কুবেরাচার্য্য তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন।"

রাজমন্ত্রী কুবেরাচার্য্য অতি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে লাউড় দেশ অচিরেই সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠে। মন্ত্রীর দক্ষতায় রাজা পরিতুষ্ট, জন-হিতৈষণায় প্রজাবর্গ প্রফুল্ল, এবং অমায়িকতায় প্রতিবাগীসবর্গ বাধ্য ছিল। কুবেরাচার্য্য রাজা প্রজা সকলেরই প্রীতিভাজন ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠা নবদ্বীপ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, পণ্ডিত সমাজে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য

যাঁহার আবাসস্থান বলিয়া শান্তিপুর একটি বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত হইয়াছে, যাঁহার ঐকান্তিক যত্নে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ বঙ্গভূমে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সমস্ত বঙ্গদেশে যাঁহার যশঃ প্রভা পরিব্যাপ্ত, যিনি প্রাচীনকালীয় তাপস কুলের উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন, ঋষিকল্প সেই অদ্বৈত, কুবেরাচার্য্য ও নাভাদেবী হইতে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দের মাঘমাসে নবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১০]

---

৬. Stewarts' History of Benal. Sect. II. P. 108.

৭. "সেই নরসিংহের যশঃ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাঁহারা মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈলা রাজা॥
যাঁর কন্যা বিবাহের সময় 'কাপের' উৎপত্তি।
লাউড় প্রদেশে হয় যাঁহার বসতি॥" ইত্যাদি।
—অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ

৮. "বঙ্গের জাতিয় ইতিহাস" ২য় ভাগ ৩য় অংশ ১৯১ পৃষ্ঠা।

৯. অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ

১০. "শাকে রস প্রাণ শুনেন্দু মান
শ্রীলাউড়ে পুণ্যময়েঙ্গি মাঘে;
শ্রীসপ্তমী পুণ্যতি[illegible]সিতেহভূ
দদ্বৈতচন্দ্রঃ কৃপয়াবতীর্ণঃ॥"

অতএব লাউড় কেবল শ্রীহট্টের নহে, সমস্ত বৈষ্ণব সমাজের ভক্তি ও গৌরবের স্থল।

অদ্বৈতের জন্মগ্রহণের পর রাজা দিব্যসিংহেরও একটি নবকুমার জাত হয়, নবগ্রামে এই রাজকুমারই অদ্বৈতের খেলার সঙ্গী ছিলেন। দুই জনে একত্র খেলা করিতেন, ভ্রমণ করিতেন ও অধ্যয়ন করিতেন।[১১] অদ্বৈতের পিতৃ নাম কমলা, তিনি বাল্যকালেই লাউড়ের পণাতীর্থের মহিমা প্রকাশ করিয়ছিলেন। এই ইতিবৃত্তের প্রথমভাগ নবম অধ্যায়ে 'পণাতীর্থ প্রকাশ' প্রসঙ্গে তাহা বলা গিয়াছে।

অদ্বৈত ভবিষ্যতে যে একজন মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত হইবেন, তখনই তাহার লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছিল; তখনই তাঁহার সর্ব্বভতে দয়া ও গুরুজনে একান্ত ভক্তি ইত্যাদি দর্শনে সকলেই প্রীত হইতেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন, যে কোন বিষয়, যত কেন কঠিন হউক, একবার মাত্র পাঠ করিলেই কদাপি তাহা ভুলতেন না। এই জন্য সকলে তাঁহাকে "শ্রুতিধর" বলিত। কাজেই অত্যল্প কাল মধ্যে বিবিধ শাস্ত্রে তিনি সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন।

কুবেরাচার্য্য পুত্রের কৃতিত্বে আনন্দিত হইয়া অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য, তাঁহাকে শান্তিপুরে প্রেরণ করিলেন। তত্রত্য পূর্ণবাটী গ্রামে[১২] অধ্যাপক শান্তদ্বিজের গৃহে অবস্থিত করিয়া, তাঁহার নিকট তিনি দর্শনাদি শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ইহার কিছুকাল পরে, অদ্বৈত-পিতা কুবেরাচার্য্য রাজকার্য্য পরিপূর্ব্বক গঙ্গাবাসের জন্য সপরিবারে শান্তিপুরে গমন করিয়াছিলেন। তাহার কিছুকাল পরে মাধবেন্দ্রপুরী নামক এক সাধু সন্ন্যাসী শান্তিপুর আগমন করেন লাউড়বাসী বিজয়পুর নামক এক সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রপুরীর সতীর্থ ছিলেন।[১৩] তাঁহার নিকট অদ্বৈতের বাল্যকালীন অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণে মাধবেন্দ্রপুরীর মনে এই ভাব জন্মে যে, এই বালকটি এক মহাপুরুষ হইবে; তাই তিনি ভ্রমণোপলক্ষে ইচ্ছা করিয়াই শান্তিপুরে আগমন করেন মাধবেন্দ্রপুরী অসাধারণ সাধুপুরুষ ছিলেন, ইহার শিষ্য ঈশ্বরপুরী হইতেই পরে শ্রীচৈতন্যদেব দীক্ষিত হন। মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে আগমন করিলে, অদ্বৈত তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ হইয়, সেই যতিশ্রেষ্ঠ হইতে দীক্ষা মন্ত্র (ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী) গ্রহণ করেন।

অতঃপর পিতার মৃত্যু হইলে, অদ্বৈত তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন ও নানাস্থানের সাধু মহাত্মাদের সহিত সম্মিলিত হন। তীর্থ দর্শনের পর তিনি শান্তিপুরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যে তরঙ্গ উত্থাপন করেন, তাহাতে দেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, সে আন্দোলন তরঙ্গে প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্ম সংস্কৃত হইবার সূত্রপাত হয়। এ সময় তিনি ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, এই সময় হইতেই তাঁহার বিশেষত্ব, এই সময হইতেই তিনি বৈষ্ণব সমাজের নেতা।

শতাব্দজীবী অদ্বৈতাচার্য্য দুইটি বিবাহ কবিয়াছিলেন। তাঁহাব পত্নীদ্বযের শ্রী ও সীতাদেবী।

---

১১. "তবে কমলাক্ষে শ্রীকুবের অতি রঙ্গে।
পড়িবারে দিলা রাজকুণ্ডরের সঙ্গে॥"–অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ

১২. এই গ্রাম অধুনা গঙ্গা গর্ভে পতিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। অদ্বৈতাচার্য্যের জীবনী পশ্চাৎ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা যাইবে।

১৩. "ছিলট্ট দেশেতে ছিল বনগ্রাম নাম।
বিমল নির্ম্মল হয় আত্মারাম ধাম॥
সেহি গ্রামে আমি ছিলাম পূর্ব্বাশ্রমে।" ইত্যাদি
–প্রাচীন অদ্বৈতমঙ্গল গ্রন্থ

তাঁহার পাঁচ পুত্র, যথা—অয্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, জগদীশ ও বলরাম মিশ্র। অদ্বৈতবংশীয়গণ এখন বঙ্গদেশের নানাস্থানে সম্মানে বাস করিতেছেন। বৈষ্ণব সমাজে তাঁহারাই শীর্ষস্থানীয় এবং "গোস্বামী" বলিয়া খ্যাত অদ্বৈতপ্রভু হইতে বর্ত্তমান বংশীয়গণ পর্য্যন্ত ১৩/১৪ পুরুষ, কোথাও বা ১৫/১৬ পুরুষ চলিতেছে।

কৃষ্ণদাস

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি বৈষ্ণগ্রন্থে অদ্বৈতাচার্য্যের অনুগত ভক্তগণের নামের তালিকায় কৃষ্ণদাস নামক ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। ইনি শ্রীহট্টবাসী।

যখন অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুর অবস্থিতি করিতেছিলেন, লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ তখন বৃদ্ধ হইযাছিলেন এবং রাজকুমারও তখন উপযুক্ত। বৃদ্ধ বয়সে রাজা সুশিক্ষিত কুমারের উপর রাজেব গুরুভার অর্পণ করিতে অভিলাষ করা অস্বাভাবিক নহে।

এদিকে মন্ত্রিতনয় অদ্বৈতের যশোভাতিতে চতুর্দ্দিক প্রভাসিত; বৈষ্ণব সমাজে তিনি তখন অসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া পূজিত। শক্তি উপাসক বৃদ্ধ রাজা এ সংবাদ শুনিয়াছেন। বৃদ্ধকালে তাঁহাব আর রাজ্যশাসনের উৎসাহ নাই। তাই তিনি উপযুক্ত পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক, শান্তি লাভের আশায় কাশী গমন ব্যপদেশে শান্তিপুরে গমন করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য মহামান্য বৃদ্ধ রাজাকে সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য রাজার ভাব লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে দিব্যসিংহ আর সে প্রতাপান্বিত নরপতি নহেন, মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। রাজা মন্ত্রিপুত্রের নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন; মন্ত্রিতনয়ের মহিমায় বিমোহিত হইলেন ও কাশী না গিয়া তিনি সেই স্থানেই কিছুকাল অবস্থিতি করিতে বাসনা করিলেন। এই রূপে অদ্বৈতের সংস্রবে থাকিয়া, অদ্বৈতের উপদেশে রাজা অবশেষে শক্তি উপাসনা ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।[১৪] রাজা দিব্যসিংহেরই বৈষ্ণবাবস্থার নাম কৃষ্ণদাস। সাধারণতঃ তিনি "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস" নামে খ্যাত ছিলেন।

অদ্বৈতের প্রভাব কতদূর ছিল, এই একটি ঘটনা আলোচনা করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ আরও অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি তাঁহার প্রভাবে পদানত ও পরম বৈষ্ণব হন। যাহাদের অত্যাচারে লোকে ত্রাসিত হইত, অদ্বৈতাচার্য্যের শিক্ষা প্রভাবে তাহারাও দীনস্বভাব সাধু হয় ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করে। উদাহরণ এই কৃষ্ণদাস।[১৫]

কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক শান্তিপুরের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে এক পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ ক্রমে তথায় বাস করিতে লাগিলেন; ঐ স্থান "ফুল্লবাটী" নামে খ্যাত হয়।

কৃষ্ণদাস (দিব্যসিংহ) অদ্বৈতাচার্য্যের বাল্যচরিত—যাহা নবগ্রামে (লাউড়ে) স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন, ফুল্লবাটী অবস্থান কালে তত্তাবৎ ঘটনা অবলম্বনে সংস্কৃত সংক্ষেপে এক গ্রন্থ রচনা করেন, এই গ্রন্থের নাম "বাল্যলীলা-সূত্র।" শ্রী চৈতন্যদেবও তদনুচরগণের চরিত্র ঘটিত অনেক

১৪. "শাক্ত মন্ত্র ছাড়ি গ্রহণ কৈলা বিষ্ণু মনু।
প্রভু কহে আজি তুয়া হৈলো বিষ্ণু তনু॥"—অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ

১৫. "শ্রীহট্ট দেশের রাজা বৈষ্ণব হইল।
এই রাজা বৈষ্ণবের দ্বেষী ছিল বড়।
বৈরাগী হৈএগ্রা প্রভুর কৃপা পাইল দৃঢ়॥"—অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ

প্রাচীন গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, বাল্যলীলা-সূত্র এ সকলের আদি। তৎপূর্ব্বে চরিত্রবর্ণনাত্মক এইরূপ গ্রন্থ বঙ্গদেশে হয় নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি সংস্কৃত "বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী" গ্রন্থের পয়ার ছন্দে অনুবাদ করেন।[১৬] শ্রীহট্টবাসী সম্ভ্রান্ত নৃপতি-কবি কর্ত্তৃক গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয় এবং তিনিই শিশু বঙ্গভাষার পরিপুষ্টী করিয়া ছিলেন, ইহা ভাবিতে আনন্দ।

ঈশান নাগর ও অদ্বৈত প্রকাশ

যে সমাজে যখন কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, সেই মহাপুরুষের প্রভাবে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, তথাকার সাহিত্যও উন্নতি লাভ করে,—সাহিত্য তাঁহারই কীর্ত্তিকলাপে পূর্ণ হয়, নবভাবে নববলে বলিয়ান হয়। আমাদের বঙ্গসাহিত্যেরও সে সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন বঙ্গভাষার শৈশব অবস্থা, তাই সে মহাশক্তি ভাষা শিশুকে বাঁচাইয়া তুলিতেই পর্য্যবসিত হয়।

এই লীলা লেখকগণের আদর্শ শ্রীহট্টবাসী মুরারি গুপ্ত। ইনি বাঙ্গালায় অনেক পদ এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রসিদ্ধ "চৈতন্যচরিত" রচনা করেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রধান অনুসঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর ন্যায় ইঁহাদের লীলা কথাও অল্প বিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। অদ্বৈত প্রভুর চরিত্রগ্রন্থের মধ্যে অদ্বৈতপ্রকাশ ও অদ্বৈতমঙ্গলই প্রধান। উভয় গ্রন্থই অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য প্রণীত ও প্রামাণ্য; তন্মধ্যে অদ্বৈতপ্রকাশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

ঈশান নাগর অদ্বৈতাচায্যের শিষ্য ও অনুচর ছিলেন। ঈশানের জন্ম স্থান লাউড়। ঈশানের পিতা দরিদ্র ব্যক্তি—আত্মীয় বন্ধু বিহীন ঈশানের যখন পিতৃ বিয়োগ ঘটে, তখন তাঁহার বয়ক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র; পাঁচ বৎসরের অপোগণ্ড শিশু লইয়া দুঃখিনী ঈশানজননী ভীষণ সংসার—সাগরে ভাসিলেন। ঘরে যৎসামান্য তৈজস পত্র ছিল, প্রতিবাসীদের পরামর্শ ও আদেশে তাহা বিক্রয় করিলেন এবং তদ্দ্বারা পতির উর্দ্ধদেহিক অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইল। ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা হইল বটে, কিন্তু ঈশানের প্রাণ রক্ষার উপায় থাকিল না। ঘরে থাকিলে না খাইয়া সপুত্রে মরেন, কাজেই অনাথা বিধবা গৃহের বাহির হইলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন? কে তাঁহার শিশুর মুখে দুটি অন্ন দিবে?

হঠাৎ অদ্বৈতপ্রভুর কথা বিধবার মনে পড়িল। অদ্বৈতের প্রভাব তখন সমস্ত বঙ্গে পরিব্যাপ্ত। সর্ব্বজীবে দয়া, অনাথ নিরাশ্রয়ের প্রতি তাঁহার অসীম সমবেদনা প্রভৃতি স্মরণ হওয়ায় বিধবার হৃদয়ে ভরসা হইল, মনে বল আসিল। বিধবা ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া শান্তি পুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

ঈশানের দুঃখিনী জননী যেদিন অদ্বৈতের শান্তি ভবনে উপস্থিত হইলেন, সেদিন অদ্বৈতগৃহে আনন্দোৎসব, সেইদিন অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ তনয় অচ্যুতানন্দের শুভ বিদ্যারম্ভ ছিল। দীর্ঘ পর্য্যটনে

১৬. শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন কৃত "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। প্রাচীন কালে জয়তীর্থ মুনির শিষ্য বিষ্ণুপুরী। বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। জয়তীর্থে একশিষ্যের নাম পুরুষোত্তম, ইঁহার শিষ্য ব্যাসতীর্থ, ব্যাসের শিষ্য লক্ষ্ণপতি। লক্ষীপতিই অদ্বৈতাচার্য্যের মন্ত্রদাতা বাধবেন্দ্রপুরীর গুরু। দিব্য সিংহ অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করায়, বিষ্ণুপুরীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। তিনি গুরু সম্পর্কীয়, বিষ্ণুপুরীর কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।–মৎসম্পাদিত শ্রীহট্টদর্পণ পত্রিকা

বহুক্লেশে বিধবা সেই উৎসব দিনে উপস্থিত হলেন। অদ্বৈতগৃহিনী সীতাদেবী আদর করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন; তাহার দুঃখের কাহিনী শ্রবণে সেই আনন্দবাসরেই সীতা দরদরিত ধারায় রোদন করিতে লাগিলেন। দুঃখিনীর নিরাশ্রয় তনয়কে সীতা কোলে লইলেন, তাহার মুখচুম্বন করিলেন। এরূপ দিগন্ত প্রসারিত দয়া, এরূপ অপার কৃপার চিত্রদর্শনে বিধবার নেত্রে কৃতজ্ঞতার উপহার, মুক্তাবিন্দুর ন্যায় ঝরিতে লাগিল।

অদ্বৈত বিধবাকে আশ্রয় দিলেন। সে ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের কথা। ঈশান তখন পঞ্চম বর্ষিয় বালক মাত্র। অদ্বৈত প্রভু ঈশানকে সে শুভদিনেই দীক্ষামন্ত্র দান করিলেন। ঈশান অদ্বৈতের শিষ্য মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

অদ্বৈতাচার্য্যের যত্নে ঈশান কালক্রমে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি মন্ত্র চর্চা না করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন।

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈত প্রভু অপ্রকট হন। গুরুর দেহত্যাগে ঈশান অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়েন। শোকদগ্ধ ঈশানের তখন জীবনভার বহনের একমাত্র উপায়, গুরুর চরিত্র চিন্তায় ছিল। ঈশানের মনে এই সময় একটা শুভ কল্পনা উপজাত হয়, যাহার জন্য বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট ঋণী। ঈশান স্বীয় গুরুর মধুর জীবন কাহিনী, যাহা স্বয়ং সঙ্গে থাকিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,—লিখিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু অদ্বৈতের বাল্যলীলা তিনি দেখেন নাই। শ্রীহট্টে যাহা ঘটিয়াছিল, এবং শান্তিপুরে তাঁহার স্মরণাতীত কালে যে হিল্লোল উঠিয়াছিল, তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু তজ্জন্য ঈশান পশ্চাৎপদ হইলেন না। লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের গ্রন্থে তিনি গুরুর শ্রীহট্টীয় লীলা প্রাপ্ত হইলেন এবং অদ্বৈতের আবাল্যসঙ্গী পদ্মনাভ ও শ্যামদাসের নিকট, শান্তিপুরে সংঘটিত তাঁহার স্মরণাতীত কালের ঘটনাবলী শুনিয়া লিখিয়া রাখিলেন।[১৭] অবশিষ্ট ঘটনাবলী নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; সুতরাং অদ্বৈতচরিত্র বর্ণন করিতে তাঁহার প্রতিবন্ধক থাকিল না।

এই শুভানুষ্ঠানের জন্য ঈশান অদ্বৈতের জন্মভূমি লাউড়ে যাইবেন মনে করিলেন। নবগ্রাম অদ্বৈতের জন্মভূমি ও তাঁহার প্রিয়স্থান।[১৮] অদ্বৈত একদা ঈশানকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার অবর্ত্তমানে ঈশান যেন লাউড়ে গিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন।[১৯] ঈশান এই সময় সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার উপযুক্ত কাল মনে করিলেন, এবং অনতিবিলম্বেই সীতাদেবীর অনুমতি লইয়া লাউড়ে আগমন করিলেন।

---

১৭. "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা সূত্র। যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র"॥
'যে পুড়িনু যে শুনিনু কৃষ্ণদাস মুখে। পদ্মনাথ শ্যামদাস যে কহিলা মোকে॥
পাপচক্ষে যে লীলা মুঞি করিনু দর্শন। প্রভু আজ্ঞামতে তাহা করিনু বর্ণন॥"
—অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ

১৮. "বঙ্গদেশ শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম।
সর্ব্বারাধ্য অদ্বৈতচন্দ্রের প্রিয়ধাম॥" ইত্যাদি।
—ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ

১৯. "তুমি মোর প্রিয় শিষ্য আত্মজ সমানে।
মোর অগোচরে দুঃখ না ভাবিও মনে।
গৌর নাম প্রচারিহ মোর জন্মস্থানে॥"
—অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ

শ্রীহট্টে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঈশান নিজ সঙ্কল্লানুযায়ী অদ্বৈতাচার্য্যের লীলা ঘটিত যে গ্রন্থ্ রচনা করেন, তাহারই নাম "অদ্বৈতপ্রকাশ"। অদ্বৈতপ্রকাশ যখন প্রণীত হয়, তখন ঈশানের বয়স ৭০ বৎসরের উর্দ্ধে। গ্রন্থখানি ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।[২০]

ঈশান শান্তিপুর হইতে আগমনের পর বিবাহ করিয়াছিলেন। সীতাদেবীর আদেশ ও অনুরোধে সেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী প্রবীনভক্তকে বাধ্য হইয়া বৃদ্ধকালে দার পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। ঈশান হইতে একান্ত আপত্য করিলেও তাহা গ্রাহ্য হয় নাই;[২১] কাজেই তিনি বিবাহ করেন। কবির বংশীয়গণ এখনও বর্ত্তমান আছেন।"[২২]

---

২০. "চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈলু শ্রীলাউড় ধামে॥"–ঐ

২১. "অরে ঈশানদাস তোরে করি বড় স্নেহ।
মোর তুষ্টি হয় তুঞি করিলে বিবাহ।
মুঞি কহিলাম মাতা বুঝি আজ্ঞা কর।
এই আজ্ঞা পালিতে নাহিক সাধ্য মোর॥"
–অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ

২২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৩ বাংলা মাঘমাস-মৎপ্রকাশিত "ঈশান নাগর" প্রবন্ধ

দ্বিতীয় অধ্যায়

জগন্নাথপুরের কথা

রামশঙ্কর বা রামকান্ত বা রমনাথ মিশ্র

পূর্ব্বাধ্যায়ে রাজা দিব্যসিংহের পুত্রের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে। তিনি কতকাল রাজ্যশাসন করেন এবং তাঁহার পুত্রাদি জন্মিয়াছিল কিনা ইত্যাদি কথা বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত হয় নাই। হয়ত তাঁহার সহিতই তদ্বংশের বিলোপ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ঠিক ঐ সময়ই লাউড়ে রমা বা রাম নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অবস্থিতির বিষয় জানা যায়। ইনি পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞাতনামা রাজকুমার কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। জগন্নাথ পুরের কাত্যায়ন গোত্রীয় বিজয়সিংহ রাজার বংশ বলিয়া পরিচিত ব্রাহ্মণগণ বলেন যে এই রমা বা রামই তাঁহাদের আদিপুরুষ। ইঁহাকে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলা যাইতে পারে। সেই এক সময় লাউড় দুই ভিন্ন বংশীয় রাজার শাসনাধীন ছিল, এমন প্রমাণ নাই। পুনশ্চ এই বংশে "সিংহ" উপাধি ধারণের প্রথাও দৃষ্ট হয়।[১] কিন্তু মৈথিল কাত্যায়ন গোত্রীয়দের সহ উঁহাদের প্রবরের মিল নাই। দিব্যসিংহ যদি মৈথিল বিপ্র হন তবে ইঁহাদিগকে তদ্বংশীয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না।[২]

পূর্ব্বোক্ত রাম বা রমার পুত্রের নাম কেশব ছিল; জগন্নাথপুরের কাত্যায়নগণ বলেন যে, এই কেশব হইতেই তাঁহাদের উদ্ভব।

এস্থলে বাণিয়াচঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্রের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। ইনি পূর্ব্বোক্ত রাম বা রমা-পুত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। এই কেশব মিশ্রের বংশীয়গণ তাঁহাকে কান্যকুব্জাগত বলেন। বাণিয়াচঙ্গ ও জগন্নাথ পুরের কাত্যায়ন মধ্যে প্রবরের পার্থক্য থাকায় এই কেশব মিশ্র নবাগত ও ভিন্ন বলিয়াই প্রমাণ হয়।

কেশব মিশ্র সম্বন্ধে কথা

বাণিয়াচঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্রের পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। বাণিয়াচঙ্গে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহাতে তাঁহাকে নবাগত বলিতে হয়। তিনি বাণিজ্য ব্যপদেশে এদেশে আগমন করেন। তাঁহার নৌকায় এক পাষাণ রূপিণী কালী ছিলেন। এদেশে আসিলে বহুক্রোশ সাগরকল্প হাওরে (জলমগ্ন প্রান্তরে) তিনি শুষ্কভূমি না পাইয়া, দেবীর দৈনিক পূজা কোথায় কিরূপে নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা ভাবিয়া চিন্তাকুলিত হইলেন। দৈবক্রমে সন্ধ্যার পূর্ব্বে একখণ্ড ভূভাগ প্রাপ্তে তথায় দেবীর সিংহাসন স্থাপন পূর্ব্বক পূজা সমাধা করেন।

---

১. মৈথিল বিপ্রগণের সাধারণ উপাধি মিশ্র। মিথিলার রাজবংশীয়গণের "সিংহ" উপাধি ধারণ করিবার উদাহরণ আছে, যথা-শিবসিংহ, বলভদ্র সিংহ প্রভৃতি। লাউড়ের রাজারও নাম দিব্যসিংহ এবং জগন্নাথপুরে ও বিজয়সিংহ, প্রতাপসিংহ প্রভৃতি সিংহাত্মক নাম দৃষ্ট হয়।

২. ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ইটা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরকিঙ্করদাস মহাশয় অনুমান করেন যে, শ্রীহট্টের সমস্ত কাত্যায়ন পূর্ব্বে এক ছিলেন, পরে তাঁহাদের মধ্যে নানাকারণে প্রবরের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু অনেকে এই কথা মানিয়া নিতে প্রস্তুত নহেন।

পরে দেবীকে তথা হইতে উত্তোলন করিতে পারিয়া, দৈবাভিপ্রায় মতে সেই স্থানেই তিনি অবস্থিতি করেন।[৩] কেশবের কর্ম্মচারী জনৈক বণিক বা বাণিয়া ছিল। সেই বাণিয়া ও নৌকা চালক চঙ্গ জাতীয় ব্যক্তির যুগ্ম নামানুসারে "বাণিয়াচঙ্গ" নামে সেই স্থান খ্যাত হয়।[৪]

কেহ কেহ বলেন যে, বাণিজ্য ব্যবসায়ী কেশব মিশ্র এই স্থানটি বাণিয়া অর্থাৎ ব্যবসায়ীর পক্ষে "চঙ্গ" অর্থাৎ সুন্দর বলিয়া বাণিয়াচঙ্গ নামে খ্যাত করেন। বাণিয়াচঙ্গের জনৈক দেওয়ানের মতে পারস্য "বানায় জঙ্গ" (যুদ্ধের স্থল) পদ হইতে এই নামের উদ্ভব; কিন্তু বণিক ও চঙ্গ বিষয়ক এই কিংবদন্তীর উল্লেখ সরকারী কাগজপত্রেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।[৫] কাত্যায়ন গোত্রীয় কেশব মিশ্র সেই স্থানে নিজ আধিপত্য বিস্তার করতঃ তথাকার প্রথম রাজা বলিয়া পরিগণিত হন। বাণিয়াচঙ্গের কাত্যায়নগণ বলেন যে কেশব মিশ্র কান্যকুব্জাগত এবং তিনি স্বদেশ হইতে নানা লোক আনিয়া বাণিয়াচঙ্গে বসতি স্থাপন করেন।[৬]

জল হইতে নবোত্থিত সেই বাণিয়াচঙ্গে বণিক ও চঙ্গকৃত প্রথম বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা কেশব মিশ্রের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল, ইহা অসঙ্গত ব্যাপার নহে।

জগন্নাথপুরের কেশব

জগন্নাথপুরের ইতিহাস নামক মুদ্রিত ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লিখিত আছে যে জগন্নাথপুর ও বাণিয়াচঙ্গের রাজবংশ এক মূলোৎপন্ন। রমাকান্ত বা রাম নামক জনৈক কাত্যায়ন গোত্রীয় বিপ্র লাউড়ে আগমন করত বাস করেন, ইহার এক পুত্রের নাম কেশব, তিনি লাউড় ত্যাগ করতঃ জগন্নাথপুরের গমন করেন ও তথায় বাস করেন। রমাকান্তের জ্যেষ্ঠ তনয় লাউড়েই অবস্থিতি করেন।

এস্থলে এক "কেশব" নাম থাকায় যে বাণিয়াচঙ্গ ও জগন্নাথপুরের বিভিন্ন প্রবর যুক্ত দুই ভিন্ন বংশকে "জগন্নাথপুরের ইতিহাস" পুস্তিকায় এক বংশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বস্তুত বাণিয়াচঙ্গের কেশব মিশ্রের সঙ্গে জগন্নাথপুরের কাত্যায়নগণের কোনরূপ সম্পর্ক থাকার বিষয় প্রমাণিত হয় না।

জগন্নাথপুরের কেশবের পুত্রের নাম শণি বা শনাই, শণির পুত্র প্রজাপতি। প্রজাপতির পুত্রের নাম দুর্ব্বার। দুর্ব্বার দিল্লী সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিয়া "খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হন। তখন হিন্দুদিগকেও "খাঁ" উপাধি প্রদত্ত হইত।[৭] দুর্ব্বার খাঁ জগন্নাথপুরে নিজ নামে এক বৃহৎ দীঘি খনন করাইয়াছিলেন। যাঁহারা দীর্ঘিকা খনন করাইতেন সাধারণতঃ তাঁহাদের সম্মানার্থ "খাঁ" উপাধি প্রদত্ত বলিয়া কথিত হয়।

---

৩. নব্যভারত–পৌষমাস–১৩১৪ বাংলা "পরমহংস শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দপুরী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ইহাতে কেশব মিশ্রের বংশধর শ্রীযুক্তপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক এইরূপ বিবরণ লেখা হইয়াছে।

৪. "A Merchant, who was travelling with a crew of chung of Namasudra boatmen, anchored in the haor over the site on which the village was subsequently built. An image of Coddess Kali was in the boat. * * * The water gradually disappeared, as they do at the present day on the Cassation of the rains, and a village was founded by the pous merchant. -Allen's Assam District Gazetteers vol. II. (Sylhet) Chap. II. p. 26.

৫. Paper No. 798 Dated 1st June 1883 and No. 1462 Dated 3-9-1884.

৬. Allen's Assam District Gazetteers. Vol. II, (Sylhet) Chap. II. p. 26.

৭. "কৃষ্ণবিজয়" প্রণেতা মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁ ও তদ্বংশীয় পুরন্দর খাঁর বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত।

দুর্ব্বার খাঁর পুত্র রাজ সিংহ বা পণ্ডিত খাঁ, ইঁহার পুত্র জয়, বিজয় ও পরমানন্দ। পরমানন্দ তদীয় কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভ সম্ভূত ছিলেন। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ জয়সিংহ, "গোবিন্দ সিংহ" এই উপনামেও পরিচিত ছিলেন। ইঁহার সময়ে লাউড়ে তাঁহাদের জ্ঞাতি যিনি ছিলেন, নিঃসন্তানাবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সম্পত্তি জয় ও বিজয়ের ন্যায্য প্রাপ্য হইলেও এক অচিন্তিত প্রতিবন্ধকে তাহা তাঁহারা অধিকার করিতে পারেন নাই।

কর্ণ খাঁ

ইতিপূর্ব্বে বাণিয়াচঙ্গ প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্রেব নাম উল্লেখিত হইয়াছে। এই উভয় কেশবই সমসাময়িক ছিলেন। বাণিয়াচঙ্গ প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্রের পুত্রের নাম দক্ষ, তৎপুত্র নন্দন, ইহার গণপতি ও কল্যাণ নামে দুই পুত্র হয়, তন্মোধ্যে কনিষ্ঠ কল্যাণের বাহুধর ও পদ্মনাভ নামে দুইপুত্র জন্মে। পদ্মনাভ কীর্ত্তিমান পুরুষ; তাঁহার চেষ্টায় তদীয় রাজ্যসীমা অতিশয় প্রবর্দ্ধিত হয়। তিনি বাণিয়াচঙ্গের সৌষ্টব বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করেন; বাণিয়াচঙ্গের সুবৃহৎ "সাগরদীঘী" তাঁহারই কীর্ত্তি। তিনি কর্ণের ন্যায় দাতা ছিলেন, তাঁহার "কর্ণ খাঁ" উপাধি ছিল। তিনি বিদ্যানুরাগী ও প্রজাবৎসল ছিলেন। বাণিয়াচঙ্গে তিনি অনেক ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা করেন ও সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনিই সুদূর কোটালিপাড় হইতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকে বাণিয়াচঙ্গে স্থাপন করেন। এই পদ্মনাভের একাদশ পুত্র হয়, তন্মধ্যে সুন্দরখাঁ[৮] জ্যেষ্ঠ ও গোবিন্দ খাঁ কনিষ্ঠ। গোবিন্দ খাঁ প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন এবং তিনিই রাজ্যাধিকার করেন। ইঁহার রাজ্যসীমা জগন্নাথপুরের রাজা জয় সিংহ (ওরফে গোবিন্দ সিংহ) ও বিজয় সিংহের অধিকৃত ভূমি স্পর্শ করিয়াছিল। গোবিন্দ খাঁ জয়সিংহ (বা গোবিন্দ সিংহ) ও বিজয় সিংহের পরস্পর সমসাময়িক ছিলেন। জয় ও বিজয় সিংহ গোবিন্দখাঁর ন্যায় প্রতাপশালী ছিলেন না; যুদ্ধবিদ্যাপেক্ষা শাস্ত্রালোচনাই তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ ছিল।[৯]

গোবিন্দ খাঁ ও গোবিন্দ সিংহ

লাউড়ের অধিপতির বংশ বিলোপ ঘটিলে লাউড়ের অরক্ষিত প্রজাগণের উপরে খাসিয়ারা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে; প্রজাগণ এই বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য নিজ ধন প্রাণ রক্ষার জন্য প্রতাপান্বিত বাণিয়াচঙ্গ পতির আশ্রয় প্রার্থনা করে। গোবিন্দ খাঁ তাহাদিগকে আশ্রয় দান করেন ও অনতিবিলম্বে সসৈন্যে লাউড়ে গমন পূর্ব্বক লাউড় অধিকার করেন। খাসিয়ারা পাহাড়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, গোবিন্দ খাঁ লাউড় রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন, সত্বরেই তথায় কতকগুলি সৈন্য রক্ষিত হয়।

জগন্নাথপুরের ইতিহাস পুস্তিকায় লিখিত আছে যে, লাউড় ও জগন্নাথপুরের রাজবংশীয়দের মধ্যে রাজ্য অবিভক্তভাবে ছিল। দিল্লীদরবারে লাউরপতিই পরিচিত ছিলেন, জগন্নাথপুরের নাম

৮. সুন্দরখাঁ জ্যেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ পৈতৃক রাজ্য অধিকার করায় তিনি বঞ্চিত হন। এই সময় তিনি বাণিয়াচঙ্গ ত্যাগ করিয়া সম্ভবতঃ বেতকান্দি নামক স্থানে গিয়া থাকিবেন। তাঁহার বংশীয়গণ এখন বেতকান্দিতে অবস্থিতি করিতেছেন। বাণিয়াচঙ্গের কাত্যায়ন গোত্রীয় সহ ইঁহাদের প্রবরের ঐক্য নাই। সম্ভবতঃ এই সময় ইঁহারা প্রবর পরিবর্ত্তন করিয়া, জগন্নাথপুরের সমপ্রবর হইয়া থাকিবেন। বিবাদমূলে এইরূপ সম্বন্ধচ্ছেদের উদাহরণ শ্রীহট্টে বিরল নহে।

৯. "গোবিন্দ ছিলেন শুধু জোরে বলবান।
জয়সিংহ বিদ্যাবুদ্ধি উভয়ে প্রধান।"

দিল্লীতে পরিজ্ঞাত ছিল না, লাউড় পতির নামেই "এজমালি" সম্পত্তির কর প্রদত্ত হইতে।[১০] বস্তুতঃ তৎকালে এজমালি সম্পত্তির উপর সামান্য কর নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, স্বাধীন লাউড় রাজ্যের উপর কোনরূপ কর অবধারিত ছিল না। তবে লাউড়াধিপতি মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষক রূপে পরিগণিত হইতেন।[১১]

যাহা হউক, গোবিন্দ খাঁ খাসিয়াদিগকে বিতাড়িত করিয়া লাউড়রাজ্য অধিকার ও ভোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু লাউড় সংসৃষ্ট এজমালি সম্পত্তির পূর্ব্ববৎ রাজস্ব জয়সিংহ (গোবিন্দ সিংহ) ও বিজয় সিংহকে বহন করিতে হইল। জয় ও বিজয় এইরূপে লাউড় রাজ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া মনে মনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। গোবিন্দ খাঁব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া তাহাদের সাহসে কুলাইল না। তাঁহারা তখন রাজদ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করাই মনে করিলেন এবং দিল্লী গমন করিয়া লাউড় রাজ্যের অধিকার প্রাপ্তির প্রার্থনা করিলেন।[১২]

সম্রাট, জয়সিংহের আবেদনে লাউড়ের আভ্যন্তরীন অবস্থা জ্ঞাত হইয়া গোবিন্দ খাঁর উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। তখন গোবিন্দকে আনয়নের জন্য আরিন্দা (দূত) প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দ সিংহের বক্তব্য না শুনা পর্য্যন্ত জয় সিংহকে দিল্লী অবস্থানের জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল; সুতরাং জয়সিংহও দেশে যাইতে পারিলেন না।

গোবিন্দ খাঁকে নেওয়ার জন্য দূত আসিল। কিন্তু গোবিন্দ খাঁ আরিন্দার কথা গ্রাহ্য করিলেন না; অপিতু তাহাকে পদাঘাত করিলেন। বলবান গোবিন্দখাঁর ভীম পদাঘাত সে ক্ষুদ্রপ্রাণ মোসলমান সহ্য করিতে পারিল না, ভূপতিত হইয়া মুর্চ্ছিত হইল। সেই মুর্ছা আর ভাঙ্গিল না!!

দৈববশতঃ গোবিন্দকে এইরূপে দিল্লী সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইল। এই সময় তিনি বাণিয়াচঙ্গের চতুর্দ্দিকে মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া নগর সুরক্ষিত করেন। তাহার কিছুকাল পরেই তাঁহাকে ধৃত করার জন্য দিল্লী হইতে সৈন্য প্রেরিত হয়। বলিতে আনন্দ হয় যে, বীরবর গোবিন্দের অতুল বিক্রম তাহারা সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই। সৈন্যাধ্যক্ষ গোবিন্দখাঁর সাহস ও শৌর্য্যে মোহিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে গোবিন্দকে কখনই জীবিতাবস্থায় দিল্লীতে নিতে সমর্থ হইবেন না। এদিকে তিনি তাঁহাকে ধৃত করিতেই আদিষ্ট–বধ করিতে নহে। উপায়ান্তর বিহীন হইয়া তখন তিনি চাতুর্য্য অবলম্বন করাই শ্রেয়বোধ করিলেন।

---

১০. জগন্নাথপুরের ইতিহাস পুস্তিকায় অনেক অসংলগ্ন কথার সমাবেশ আছে বলিয়া আমরা ঐ গ্রন্থের অনুসরণ করিতে পারি নাই; তাহাতে বাণিয়াচঙ্গের গোবিন্দ সহ জয় ও বিজয়ের সমস্ত সম্পত্তি এজমালি থাকার কথা লিখিত আছে; ইহা নিতান্তই অলীক। লাউড় ও জগন্নাথপুরের সম্পত্তি এজমালি ছিল বলিয়াও লিখিত আছে। বাণিয়াচঙ্গের গোবিন্দ খাঁ লাউড় অধিকার করায় উক্ত এজমালি সম্পত্তির কতক তাহার অধিকারে আসিতে পারে।

১১. Laur ceased to be independent. the Rajas submitted to mdertake the defence of the Frontier but did not pay revenue."
-Hunter's Statistical Accountes of Assam vol. II. (Sylhet) p. 92

১২. "বিরক্ত হইয়া তিনি করিলা নিশ্চিত।
সম্পত্তি হইতে তারে করিব বঞ্চিত॥
গোবিন্দের অনিষ্টেতে করি দৃঢ় পণ।
চলিলা যে হৃষ্ট মন নবাব ভবন॥
বলে এক নিবেদন করি তব কাছে।
আমি আর গোবিন্দের যত ভূমি আছে॥
সর্ব্বস্ব আমাকে দেও সনন্দ করিয়া।
আমি একা সব কর দিব পাঠাইয়া॥" ইত্যাদি–জগন্নাথপুরের ইতিহাস।

যুদ্ধ স্থগিত হইল, অধ্যক্ষ মণিব্যবসায়ী রূপে আজমীরগঞ্জে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ খাঁ মণিব্যবসায়ীর আহ্বানে মণি দেখিতে তাঁহার নৌকায় উঠিলেন। তদবস্থায় তাঁহাকে ধৃত করা হইল।

যথাকালে গোবিন্দ খাঁ দিল্লীতে পৌছিলেন। দূত হত্যা ও আদেশ অমান্যের জন্য গোবিন্দের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। বিধি নির্ব্বদ্ধ অখণ্ডনীয়। জয় সিংহ বিনা চেষ্টাতেই ঘটনাচক্রে কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু জয়োল্লাসে দেশে আসা তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। তিনি কুমুহূর্ত্তে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাই বিচারপ্রার্থী হইয়াও তাঁহাকে কিয়ংকালের জন্য দিল্লীতে নজরবন্দী স্বরূপ থাকিতে হইয়াছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃই দেশে যাওয়ার আদেশ পাইতে তাঁহার অযথা বিলম্ব হইয়াছিল।

অনেক দিন তিনি দিল্লীতে ছিলেন এবং লাউড়ের রাজা বলিয়া দিল্লীতে পরিচিত হন। দিল্লীতে তিনি "গোবিন্দ সিংহ" এই উপনামেই খ্যাত ছিলেন।[১৩] যাহাহউক গোবিন্দ খাঁর দণ্ডের অবধারিত দিন উপস্থিত হইল। ঘাতক পূর্ব পরিচিত গোবিন্দ সিংহকে (জয় সিংহকে) বধ্য বোধ করিয়া, তাঁহাকেই ধরিল। ইহাকেই বলে বিধিচক্র! জয়সিংহ অপরের অনিষ্ট করিতে গিয়া নিজের প্রাণ বিনষ্ট কবিলেন!

গোবিন্দ খাঁর সভা পণ্ডিত জাতুকর্ণ গোত্রীয় মুরারি বিশারদ।[১৪] স্বীয় পাণ্ডিত্য বলে হিন্দু মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারীদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া গোবিন্দ খাঁর প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতেছিলেন, এই আকস্মিক ঘটনায় তিনি বিশেষ ভরসা পাইলেন।

যাহা হউক, যথাকালে এই ভ্রান্তির কথা প্রচারিত হইল। ঈশ্বরেচ্ছা বশতঃ এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে, মন্ত্রী প্রভৃতি এইরূপ বুঝাইলে সম্রাট লাউড়াধিপতি গোবিন্দকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিলেন বটে কিন্তু হিন্দুর পক্ষে দণ্ড-অষ্ট প্রকার মৃত্যুর অন্যতম, জাতি ধ্বংস করিলেন![১৫] জাত্যন্তবিত হইলে গোবিন্দ খাঁর নাম হবিব খাঁ রাখা হয়।[১৬]

জয় সিংহ (ওরফে গোবিন্দ সিংহ) নিহত হইলে প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন হবিব খাঁ সমগ্র রাজ্যের সনন্দ লাভ করেন। এই সময় হইতেই বাণিয়াচঙ্গে ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজগণ মোসলমান হন।[১৭]

---

১৩. "জয়সিংহের দুইনাম ছিল প্রকাশিত।
গোবিন্দ বলিয়া তাকে অনেকে জানিত॥"–জগন্নাথপুরের ইতিহাস

১৪. বংশাবলী সহ সাময়িক বিবরণ পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

১৫. 'The last Hindu king of Laur, called Gobinda, was for some cause, summoned to Delhi and there become a Mahammadan."
-Hunter's Statistical Accounts of Assam vol. II. (Sylhet)

১৬. "একের তবে যব্ গিয়াছে এক প্রাণ।
অনুচিত বধ করা আর এক জান॥
অতএব গোবিন্দকে প্রাণে নামারিয়া।
জাতি নাশ কর তারে গোস্ত খাওয়াইয়া॥
নবাব বলিলা যব্ এমত বচন।
গোবিন্দের জাতি নাশ হইল তখন॥
জাতিচ্যুত হইলেন গোবিন্দ যখন।
হবিব খাঁ নাম তার হইল তখন॥"
–জগন্নাথপুরের ইতিহাস

১৭. এই কাহিনী জগন্নাথপুরের কাত্যায়ন গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত চৌধুরীদের বিরচিত জগন্নাথপুরের ইতিহাস হইতে লব্ধ। গোবিন্দ খাঁর জাতিনাশের কারণ এইরূপই; ইহা অনেকেই বলেন।

হবিব খাঁ ও বিজয়সিংহ

গোবিন্দ খাঁ মোসলমান হইয়া বাদশাহের সনন্দ লাভ করতঃ অক্ষতদেহে দেশে প্রত্যাগমন করায় সর্ব্বসাধারণের কাছে তাঁহার প্রতাপ সমধিক বর্দ্ধিত হইল। হবিব খাঁ দেশে আসিলে তদীয় আত্মীয় ও জ্ঞাতিগণ তাঁহার জাতিপাতে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি দুঃখে ও লজ্জায় প্রথমতঃ বাণিয়াচঙ্গে যান নাই। তাঁহার স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাণিয়াচঙ্গেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাছে রাজার দৃষ্টি পথে পতিত হন, এই কারণে তিনি রাজবাটী ত্যাগ করিয়া পৃথক এক বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। সেই বাটীর সম্মুখবর্ত্তী দীর্ঘিকা আজ পর্য্যন্ত "ঠাকুরাণীর দীঘী" নামে কথিত হয়।

হবিব খাঁ পুনশ্চ বিবাহ করিয়াছিলেন।[১৮] তিনি লাউড় ও বাণিয়াচঙ্গ উভয়ত্রই বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে, বিজয় সিংহ যখন ভ্রাতার পরিমাণ সংবাদ শুনিলেন, তখন তাঁহার বিষাদের সীমা থাকিল না। এই অভাবিত ঘটনা গোবিন্দ খাঁর চক্রান্তে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল। শত্রুকে অবসর অবস্থা অসঙ্গত এই নীতি পরিচালিত হইয়া হবিব খাঁ, ভ্রাতৃশোক সন্তপ্ত বিজয় সিংহকে তখন একেবারেই (সমস্ত সম্পত্তি হইতে) অধিকারচ্যুত করিলেন।[১৯] এই সময় তাঁহার আয় সপ্তক্ষ মুদ্রার ন্যূন ছিল না। তরফাধিপতির অধিকৃত ভূভাগ ব্যতীত শ্রীহট্টের অধিকাংশ পরগণায় তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল।[২০]

বিজয় সিংহ যখন দেখিলেন যে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের কোন উপায়ই নাই, তখন চরম উপায় দিল্লী গমন করিলেন এবং তিনিই জয়সিংহের (ওরফে গোবিন্দ সিংহের) ভ্রাতা ও প্রকৃত উত্তরাধিকারী পরিচয়ে সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আবেদন করিলেন। এই চেষ্টার ফলে তিনি লাউড় রাজ্যের অর্দ্ধভাগের সম্মান লাভ করিলেন।

বিজয় জয়োল্লাসে দেশ আসিয়া সনন্দের বলে লাউড়ে অধিকার লাভের চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু হবিব খাঁ তাঁহাকে কিছুতেই সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলেন না। উভয়পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল; কিন্তু বিজয়ের সৈন্যবল নিতান্ত অল্প থাকায় তিনি যুদ্ধে জয়ের আশা করিতে পারিলেন না। আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে দিল্লী গমনপূর্ব্বক প্রতিকার করিতে পরামর্শ দিতে লাগিল। তখন বিজয় প্রকৃত অবস্থা সম্রাটের গোচর করত রাজকীয় সৈন্য সাহায্যে নিজ সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

সম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ চলা সঙ্গত নহে; তাহা হইলে সমস্ত লাউড় রাজ্যের অধিকার হইতে হয়ত বঞ্চিত হইতে হইবে ইহা ভাবিয়া হবিব খাঁ বিজয়ের পুনঃ দিল্লী গমন সংবাদে চিন্তিত হইলেন।

এই সময়ে (খৃষ্টাব্দ ১৭শ শতাব্দী) শ্রীহট্টে কবি বল্লভ নামে এক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, ইনি দিল্লী সম্রাট কর্ত্তৃক শ্রীহট্টের দস্তিদার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[২১] ইঁহার ক্ষমতা সামান্য ছিল না।

---

১৮. কথিত আছে, হবিব খাঁ বাদশাহ পরিবারের জনৈক মহিলার পাণি গ্রহণ করতঃ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মোসলমান বাণিয়াচঙ্গে আইসেন।

১৯. "হবিব খাঁ আরম্ভিলা করিতে শাসন।
বিজয়কে অধিকার না দিলা তখন॥"–জগন্নাথপুরের ইতিহাস

২০. কথিত আছে, ইটা ঢাকাদক্ষিণ, পঞ্চখণ্ড প্রভৃতি পরগণাও হবিব খাঁর রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এখনও বাণিয়াচঙ্গ পরগণাকে "সাতলাখী" বলে এবং বাণিয়াচঙ্গের আমন ধান "লাখীধান" নামে খ্যাত।

২১. এতদ্বিবরণ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিজয় সিংহ ইঁহারই পরামর্শ ও সহায়তা পাইতেছেন শুনিয়া হবিব খাঁ অনেকাংশে হতোৎসাহ হইলেন। যাহা হউক, প্রধানতঃ ইঁহারই মধ্যস্থতায় বিজয় সিংহ ও হবিব খাঁর মধ্যে পরে আপোষ-মীমাংসা হয়। বিজয় সিংহ হবিব খাঁর অনুগত্য স্বীকার ক্রমে স্বীয় সম্পত্তির ছয়পণ অংশ গ্রহণেই তুষ্ট থাকিলেন, হবিব খাঁ দশপণ অংশের অধিকারী রহিলেন।

পরমানন্দ সিংহ ও দাস জাতি

যখন বিজয় সিংহ ও হবিব খাঁর মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল তখন বিজয় সিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পরমানন্দ সিংহ দেশে ছিলেন না, বিদ্যার্থীভাবে নবদ্বীপে ছিলেন। পরমানন্দের পত্নী পতিবিরহ সূচক একটি শ্লোক রচনা পূর্ব্বক নিজগৃহে যদৃচ্ছাক্রমে রাখিয়াছিলেন। একদা বিজয় সিংহ অন্তঃপুরে গিয়া বিশেষ কার্য্যনুরোধে ভ্রাতাগৃহে প্রবেশ করিলে এই শ্লোকটি কোনরূপে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়; তৎপাঠে তিনি অনুতপ্ত হন। তিনি তখন পরমানন্দকে আনয়নের জন্য "দাস" জাতীয় একব্যক্তিকে নবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন। ঐ ব্যক্তি যথাকালে নবদ্বীপে গিয়া পরমানন্দকে জ্যেষ্ঠের আদেশ জ্ঞাপন পূর্ব্বক দেশে লইয়া আসিল। রাজা ইহাতে অতিশয় তুষ্ট হইলেন এবং তাহার কার্য্যতৎপরতার পুরস্কার স্বরূপ সমাজে তাহাদের জল আচরণের বিশেষ সহায়তা করিলেন। কথিত আছে যে, জাতুকর্ণ গোত্রীয় মুরারি বিশারদ তৃষ্ণাতুর হইয়া দাসজাতীয় বলিয়া পরিচয় পান। তখন তিনি দাস জাতির জল ব্যবহার্য্য বলিয়া ব্যবস্থা দান করেন। পণ্ডিতের ব্যবস্থা রাজবিধির সহায়তায় সত্তরই ফলপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল।

পরমানন্দের সহিত একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এদেশে আগমন করেন, কেশবপুরের প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয়গণ তাঁহারই বংশসম্ভূত বলিয়া কথিত আছে। আবার ঐ বংশীয়গণ রাজা বিজয় সিংহের সময় সপ্তগ্রাম (সাতগাঁও) হইতে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়াও শুনা যায়। সে যাহা হউক, বিজয় সিংহের সময় দত্তবংশীয় প্রভাকর নামক একব্যক্তি আগমন করেন জানা যায়। প্রভাকরের পুত্র শম্ভুদাসের বুদ্ধি প্রাখর্য্যে তুষ্ট হইয়া বিজয় সিংহ তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। বিজয় সিংহের পরে, শম্ভুদাসের পুত্র বিজয় রায় জগন্নাথপুরের দেওয়ান হইয়াছিলেন।

পুনর্ব্বিবাদ

বিজয় সিংহের সময়ে রাঘব ভট্টাচার্য্য নামক ভরদ্বাজ গোত্রীয় জনৈক বিপ্র মিথিলা হইতে এদেশে আগমন করেন। ইঁহার গুণে মোহিত হইয়া বিজয় সিংহ তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই রাঘব পণ্ডিত বংশীয়গণ এখন শিক সোণাইতা পরগণার সাচায়নী গ্রামে বাস করিতেছেন। কবি বল্লভের যত্নে বিজয় সিংহ ও হবিব খাঁ বিরোধ ভঞ্জন হইয়া কিছুদিন শান্তিতে অতিবাহিত হইল বটে কিন্তু পরস্পরের মনোমালিন্য দূর হয় নাই। এইজন্যই কিছুদিন যাইতে না যাইতেই বিবাদানল পুনরুদ্দীপ্ত হইল। দুর্ভাগ্য ও দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলে, ভাল করিতে গিয়াও মন্দ ফল ভোগ করিতে হয়। বিবাদের চিরশান্তির জন্য উভয় রাজ্যের সীমা চিহ্নিত করিয়া লইতে বিজয় সিংহ সংকল্প করিলেন। এই (রাজ্য বিভাগ) প্রস্তাবে হবিব খাঁও অসম্মত হইলেন না। স্থিরীকৃত যাত্রা করিবেন এবং উভয়ে একত্রসম্মিলিত হইয়া রাজ্যসীমা নির্দ্ধারণ করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল, অঙ্গীকারানুসারে উভয়েই অনুরচরবর্গ সহ যাত্রা করিয়া, একস্থানে সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিজয় সিংহের নির্দ্দেশিত সীমা ন্যায়সঙ্গত না হওয়ায় হবিব খাঁ ক্রুদ্ধ হইলেন ও অবজ্ঞা সহকারে তাঁহার শিবিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। হবিব খাঁর ঈদৃশ আচরণে বিজয় সিংহ মর্ম্মাহত হইলেন ও এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে

প্রতিজ্ঞা করিলেন। যে স্থলে বিজয়ের পাল্কী ভগ্ন হইয়াছিলেন, অদ্যাপি ঐ স্থান "পাল্কী ভাঙ্গা" নামে কথিত হইয়া থাকে।

এইরূপে বিবাদের সৃষ্টি হইল। হবিব খাঁ বিজয় সিংহকে জাতিভ্রষ্ট করিতে কল্পনা করিলেন। প্রথমতঃ নিজপুত্রের সহিত বিজয় সিংহের কন্যার বিবাহ দেওয়ার কথা উপস্থিত করিলেন। বিজয় সিংহ হবিব খাঁর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া একবারে জ্বলিয়া উঠিলেন ও তদীয় সর্ব্বনাশ সাধনের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে হঠাৎ হবিব খাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না; (দুর্ব্বলের বল) কৌশল অবলম্বনে, চাতুর্য্যজাল বিস্তার করিয়া বীরবরের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন মধ্যেই তিনি মৌখিক ভালবাসা প্রদর্শনে হবিব খাকে তুষ্ট করিলেন। সরলতা বীরপুরুষদের এক লক্ষণ। হবিব খাঁ বিজয়ের কুটিলতা অনুধাবন করিতে পারিলেন না। কিয়দ্দিবসান্তে একদা বিজয় সিংহ পূর্ব্বোক্ত বিবাহ প্রসঙ্গ উল্লেখে হবিব খাঁর পুত্র (প্রস্তাবিত জামাতা) মজলিস আলমকে নিমন্ত্রণ করত নিজগৃহে আনয়ন করিলেন ও (নিজ সঙ্কল্পানুসারে) হবিব খাঁর বংশ বিলোপ করার মানসে তাঁহার গুপ্ত হত্যার উপায় করিতে লাগিলেন।

অনিন্দ সুন্দর আলমের রূপে দর্শক মাত্রেই মোহিত হইত, বিজয় তনয়াও তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। আলম নিশ্চিত নিহত হইতেন, যদি দয়াবতী বালিকা তাঁহাকে আশু বিপদ্বার্ত্তা না জানাইতেন, যদি রাত্রে তাঁহাকে পলাইবার পরামর্শ না পাঠাইতেন। নৌকাযোগে পলায়ন করাই স্থির হইল। যে খাল দিয়া তাঁহার অনুচর শুধু বৈঠাযোগে নৌকা চালাইয়া আলমকে লইয়া পলায়ন করে তাহাই উত্তরকালে "বৈঠাখালি" নামে খ্যাত হইয়াছে।

জগন্নাথপুরের পতন

পুভ্র প্রমুখাৎ হবিব খাঁ এই ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্ত প্রায় হইলেন। বিজয় সিংহও অতি সন্তর্পণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি হবিব খাঁর ভীষণ রোষবহ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না।

একদা বিজয়সিংহ সন্নিকটবর্ত্তী বনে স্বজন ও সৈন্য পরিবৃত হইয়া মৃগয়ায় বহির্গত হন। হবিবের গুপ্তচর সর্ব্বত্রই ফিরিত, সেই মৃগয়া-কাননে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে মৃগের পরিবর্ত্তে সেদিন এক শোকাবহ রাজহত্যা হইয়া গেল!

বিজয়সিংহ নিহত হইলেন। বিজয়-গৃহে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। সেই সময় হবিব খাঁর সৈন্যগণ জগন্নাথপুরে উপস্থিত হইয়া রাজবাটী লুণ্ঠন করিতে লাগিল। বিজয়ের পুত্র রাজবল্লভ সিংহ (নামান্তর প্রতাপসিংহ) ও গন্ধর্ব্বরায় বালকমাত্র ছিলেন; তাঁহারা পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। যখন চলিয়া গেল, বিজয়-তনয়দ্বয় বাটী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, বাড়ীতে লুণ্ঠিতাবশেষ অতি সামান্য দ্রব্যই তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য রহিয়াছে। এইরূপে পিতার অপরাধে রাজপুত্রদ্বয় হঠাৎ দারিদ্রদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিপদ বিপদকেই আহ্বান করে, দুর্ভাগ্যবশতঃ অতঃপর পিতৃব্য পরমান্দের পুত্র বিনোদচন্দ্রের (ওরফে রূপসিংহের) সহিত তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হইল ও নানা বাহুল্য খরচ জন্য ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন।[২২] এই সুযোগে কুবাজপুরের চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহাদের ভূসম্পত্তি হস্তগত করিয়া লইয়াছিলেন।[২৩] এইরূপে গৃহবিবাদে জগন্নাথপুরের রাজবংশীয়গণ দারিদ্র্যের চরম সীমায়

২২. ইঁহাদের বংশাবলী ছ-পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। (২য় ভাগ ৩য় খণ্ড)

২৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত বংশবৃত্তান্ত খণ্ডে এতদ্বিবরণ কথিত হইবে।

উপস্থিত হইলেন। যে পথে মহা বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, সে পথে ক্ষুদ্র জগন্নাথপুরের রাজ্য বিলোপ ঘটিবে, বড় কথা নহে। জগন্নাথপুরের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনই সেই আত্মকলহের নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান আছে।[২৪]

সাহিত্য-চর্চা

জগন্নাথপুরের অধঃপতন সংঘটন হইলে,-বিধি-চক্রে রাজবংশীয়গণ দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদের কর্ম্মচারী, কেশবপুরের দত্তবংশীয়গণ অন্য কাহারও দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা রাজআশ্রিত ছিলেন, রাজার অবস্থা বিপর্য্যয়ে অন্যের দ্বারস্থ হইতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই,-তাঁহারা অনন্যচিত্তে সাহিত্য-চর্চ্চায় মনঃনিবেশ করেন। এই সময়েই রাধামাধব দত্ত সংস্কৃত "ভাষায় গীত গোবিন্দের টীকা" "ভারত-সাবিত্রী" "ভ্রমরগীতা" রচনা করেন।[২৫] তিনি মাতৃভাষার সেবাতেও অমনোযোগী ছিলেন না, বাঙ্গালা "কৃষ্ণলীলা" গীতিকাব্য "পদ্মপুরাণ" ও "সূর্য্যব্রত পাঁচালী" তাহার পরিচালক। বর্ত্তমানেও তদ্বংশীয় ভক্ত রাধারমণ দত্ত মহাশয়ের কৃষ্ণলীলার পদাবলী বৈষ্ণব সমাজে আদৃত।

২৪. এইস্থলে একটা কথা উল্লেখ করিয়া রাখা ভাল। রাজা বিজয়সিংহ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, তাঁহার পুত্র সন্তানাদি ছিল না। এই কথায় যাঁহাদেব বিশ্বাস, তাঁহারা "জগন্নাথপুরের ইতিহাস" পুস্তিকাকে উপন্যাস মনে করেন। এই পুস্তিকার রচয়িতা স্বয়ং অবশ্যই বিজয়সিংহের বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

২৫. এই গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক, কেশবপুরে কবির স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আছে।

তৃতীয় অধ্যায়
বাণিয়াচঙ্গের কথা

বাণিয়াচঙ্গ নগর ও কেশব মিশ্র

বাণিয়াচঙ্গ নগরের নামোপত্তির কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। নগরের নাম হইতেই পশ্চাৎ পরগণার নামকরণ হয়। বাণিয়াচঙ্গের রাজাদের অধিকৃত ভূপরিমাণ নিতান্ত অল্প ছিল না। এক সময় শ্রীহট্টের উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণে ভেড়ামোহনা নদী পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপী তাঁহাদের রাজ্য ছিল। ইহা হইতে পারে বহু পরগণা খারিজ হইয়া যাওয়ায় পূর্ব্ব আয়তনের হ্রাসতা হইয়াছে; তথাপি ইহার ন্যায় বৃহৎ পরগণা শ্রীহট্টে অল্পই আছে। বর্ত্তমানে বাণিয়াচঙ্গ কসবা ও জোয়ার ভেদে দুইটী পরগণায় বিভক্ত হইয়াছে। কসবা বাণিয়াচঙ্গের মধ্যেই বাণিয়াচঙ্গ নগর। চতুর্দ্দিকে মৃৎপ্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত এই নগর অক্ষাংশ ২৪°৩৮ উঃ এবং দ্রাঘিমা ৯১°২৪ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই প্রাচীন নগরের আকার কিয়ৎপরিমাণে আয়তক্ষেত্রের ন্যায় এবং পরিমাণ প্রায় ৮ বর্গমাইল হইবে। চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত সম চতুরস্র বাণিয়াচঙ্গ গ্রামকে দূর হইতে প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় দেখা যায়। বিগত ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের গণানুসারে বাণিয়াচঙ্গের লোকসংখ্যা ২৮৮৮৩ জন। এত বড় গ্রাম সমস্ত বঙ্গদেশে আছে কিনা সন্দেহ।[১] প্রতি পাড়ার চতুঃপার্শ্বে আম ও বাঁশবাড়ী থাকায় বহুজনাকীর্ণ হইলেও ইহা ভাটী অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামের ন্যায় তেমন ঘেসাঘেসি দেখা যায় না। বাণিয়াচঙ্গ নগর বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেও তথায় প্রায় দুইশত দোকান, দুইটি বৃহৎ বাজার, ডিস্পেনসারি, হাইস্কুল ও তার অফিস প্রভৃতি আছে। অধিবাসীর অবস্থাও উন্নত।

কেশব মিশ্র হইতে রাজা পদ্মনাভ পর্য্যন্ত সকলেই বাণিয়াচঙ্গে অবস্থিতি করিয়া নগরের সৌষ্টব বৃদ্ধি করেন। পদ্মনাভ ইহার মধ্যদেশে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান ও রাজবাটী প্রস্তুত করেন। পদ্মনাভ ঐ বংশে দাতাকর্ণ ছিলেন, তিনি বাণিয়াচঙ্গে বহুতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে স্থাপন করেন। কাত্যায়ন ব্যতীত জাতুকর্ণ ভরদ্বাজ ও কাশ্যপ প্রভৃতি গোত্রীয় বহুতর প্রধান বংশীয়গণ বাণিয়াচঙ্গে আছেন। গৌতম গোত্রীয়দের শিষ্য সম্পদ ঢাকা জিলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহারা বলেন যে তাঁহারা রাজার গুরুবংশ। অনেকে অনুমান করেন তাহারা রাজার বৈদিক ক্রিয়া কলাপের ঋত্বিক ছিলেন, তাই আজিও শ্রাদ্ধকালে দর্ব্বী উপহার পান। ইঁহাদের মধ্যেই মহাদেব পঞ্চানন প্রাদুর্ভূত হন, তাহার নামে বাণিয়াচঙ্গের যশ দেশ-দেশান্তর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে। জাতুকর্ণ গোত্রীয় মুরারি বিশারদের নাম পূর্ব্বে করা গিয়াছে, সুসঙ্গ মহারাজের গুরু বাকলজোড়ের ভট্টাচার্য্যগণ বাণিয়াচঙ্গের এই জাতুকর্ণ বংশীয়। রাজার জামাতৃবংশ ভরদ্বাজ গোত্রীয় শতভুজ মিশ্রের সন্ততিগণও বিশেষ মান্যস্পদ। তদ্ব্যতীত কাশ্যপ গোত্রীয় দ্বিজগণ এবং রাজার সেনাপতি চুরঙ্গ বংশ ও বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। স্থনান্তরে ইঁহাদের বংশ বিবরণ বর্ণিত হইবে। প্রজাবর্গের জলকষ্ট নিবারণার্থে রাজা পদ্মনাভ সহস্রসংখ্যক দীর্ঘিকা খনন করায়াছিলেন বলিয়া কথিত

---

১. জনবহুল শান্তিপুরের লোকসংখ্যাও বানিচঙ্গ হইতে কম।

আছে।[২] এই জনহিতকর কার্য্যের জন্যই তিনি সর্ব্বপ্রথম 'খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

তৎপুত্র গোবিন্দ খাঁ, সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত নগরটিকে মোসলমান হইতে সুরক্ষিত করিবার জন্য ইহার চতুপার্শ্ব প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করেন। তিনি বীরপুরুষ ছিলেন, রাজ্যবৃদ্ধির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। গোবিন্দ মহিষী বাণিয়াচঙ্গে পৃথক বাটী প্রস্তুত করতঃ বাস করেন, বলা গিয়াছে জাত্যন্তরিত হওয়ার পর রাজা বাণিয়াচঙ্গে অবস্থিতি করিতে ভালবাসিতেন না; নিকটে থাকিয়া ধর্ম্ম পরায়ণা পত্নীর মনঃকষ্ট বৃদ্ধি করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইত না। তদবধি তিনি নবাধিকৃত লাউড়ের বাড়ীতেই অধিক সময় বাস করতেন; বিশেষ কার্য্য ব্যতীত বাণিয়াচঙ্গে আসিতেন না। পুত্র মজলিস পিতৃসন্নিধানেই বাস করিতেন, কাজেই তিনিও লাউড়বাসী ছিলেন।

খাসিয়া আক্রমণ ও লাউড় ধ্বংস

হবিব খাঁর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম মজলিস আলম খাঁ।[৩] আলমের পুত্র আনওয়ার খাঁ। ইহার সময়ে এক আকস্মিক উৎপাতে লাউড় নগর বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত হয়। খাসিয়াপর্ব্বতের কয়েকটি রাজা (সর্দ্দার) একত্র মিলিত হইয়া লাউড় আক্রমণ করে। পঙ্গপালের ন্যায় বন্য খাসিয়া সৈন্য পর্ব্বত হইতে আপতিত হইল, মুহূর্ত্তে পথ ঘাট ছাইয়া ফেলিল। যে অল্পসংখ্যক রাজসৈন্য ছিল, নিমেষের মধ্যে তাঁহাদের চিহ্ন লোপ পাইল। অধিবাসীদিগের যে যথায় পারিল, প্রাণ লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। তাহাদের পশুবৎ অত্যাচারে অবশিষ্ট বালবৃদ্ধ সকলেই নিহত হইল, লাউড় একরূপ জনশূন্য হইয়া পড়িল।[৪]

অদ্বৈতাচার্য্যের বিষয় বর্ণনা করা গিয়াছে। অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া গেলেও তাঁহার জন্মগৃহ তদীয় ভক্তগণ ধ্বংসমুখে পতিত হইতে দেন নাই।[৫] এই খাসিয়া বিপ্লবের কালে আচার্য্যের পীঠরক্ষক নাগরবংশীয়গণ পলাইয়া গোয়ালন্দের নিকটবর্ত্তী ঝাকপাল গ্রামে চলিয়া যান, অদ্যাপি ঐ বংশীয়গণ তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।[৬]

এইরূপে লাউড় একরূপ জনশূন্য হইয়া পড়িল-নবগ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল এবং পার্ব্বত্যভূমি বলিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই জঙ্গলাবৃত হইয়া উঠিল।[৭] যে স্থানে পূর্ব্বে দিব্যসিংহ রাজত্ব করিয়াছেন, ব্যাঘ্র ভল্লুক এখন তথাকার রাজা; নাগরিকগণ নবভূষায় সজ্জিত হইয়া সগর্ব্বে যথায় ভ্রমণ করিত, এখন তাহা মৃগমাতঙ্গের বিচরণ ক্ষেত্র। জনকোলাহলের পরিবর্ত্তে বিহঙ্গ

---

২. Mr. Luttmon Johnson, the Deputy commissioner Sylhet reported (vide letter No. 3385 Dated the 9th Agust, 1881) that the number of Talab in Baniyachang in estimated to be 1100.'

৩. ইঁহার নামে বাণিয়াচঙ্গের উপান্তস্থিত মজলিসপুর গ্রাম আজিও বর্ত্তমান আছে।

৪. "In 1744 A. D. Laur was burned by the Khasis, and many of the people moved to Baniyachang."
-Assam. District Gazetteers. Vol II. (Sylhet) chap II. P. 25.

৫. অদ্বৈতাচার্য্যের জন্মগৃহ উদ্ধার প্রসঙ্গ এই গ্রন্থের ১ম ভাগ ৯ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৬. ঈশান নাগরের বিস্তৃত বংশাবলী দেওয়া অনাবশ্যক, এস্থলে একটা শাখা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। ঈশান নাগরের তিন পুত্র-পুরুষোত্তম নাগর, হরিবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তমের পুত্র রমানাথ, তৎপুত্র কৃষ্ণচরণ, তৎপুত্র গোপালকৃষ্ণ, তাঁহার পুত্র স্বরূপচন্দ্র, ইঁহার পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র, তৎপুত্র যাদবচন্দ্র, যাদবের পুত্র যোগেশচন্দ্র ও এক শিশু জীবিত আছেন।

৭. ১২৯২ বাংলা-কার্ত্তিক সংখ্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় আমাদের কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে এতদ্বিবরণ প্রকাশিত হয়।

কলরবে সে স্থল এখন প্রতিধ্বনিত। জগতের বৈচিত্রই এই,–সে উত্তর কোশলও নাই, সে দ্বারাবতীও নাই।

বাণিয়াচঙ্গের হাবিলি

লাউড়ের জঙ্গলে এখন "বাণিয়াচঙ্গের হাবিলি" নামে এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই হাবিলি বহু প্রকোষ্ট বিশিষ্ট। অনুমানিক পাঁচশত সৈন্য তাহাতে অনায়াসে বাস করিতে পারে; প্রহরার জন্য স্থানে স্থানে উচ্চ মঞ্চাদি ছিল। রাজ্যের উত্তরাংশে খাসিয়া অত্যাচার নিবারণ কল্পে আনওয়ার খাঁ পরে ইহা নির্ম্মাণ করেন। এই জন্যই দুর্গটি "বাণিয়াচঙ্গের হাবিলি" নামে খ্যাত আছে। দুর্গের প্রকোষ্ট বিশেষের কারুকার্য্য দৃষ্টে অনুমতি হয় যে, তিনি কখন স্বয়ং তথায় গিয়াও অবস্থিতি করিতেন। কোন কোন প্রকোষ্ট নৃপবাস তিনি যোগ্য কারুকার্য্যে সুশোভিত ছিল কিন্তু বিগত ভূকম্পে অনেক অংশে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।[৮]

খালিসা ও মোজরাই

আনওয়ার খাঁ যখন বাণিয়াচঙ্গের অধিকার প্রাপ্ত হন, সেইসময় পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। বাঙ্গালার সুবেদার মুর্শিদকুলী খাঁ স্বীয় নামানুক্রমে প্রাচীন মকসুদা বাদের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া মুর্শিদাবাদ করেন। তিনি ১৭২২ খৃষ্টাব্দে রাজস্বের এক নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন, তৎকালে বাণিয়াচঙ্গের অধিপতি স্বাধীন লাউড় ও অষ্টাবিংশতি পরগণায় তাঁহাদের অধিকারেব নিদর্শন প্রদর্শন করেন। কিন্তু অনুসন্ধানে এই অষ্টাবিংশ পরগণার ভুক্তরূপে আরও অনেক অতিরিক্ত ভূমি বাহির হইয়া পড়িল। এই অতিরিক্ত ভূমির জন্য কর অবধারিত হয়, কিন্তু বাণিয়াচঙ্গপতি নির্দ্দিষ্ট কর দিয়া সেই ভূমি গ্রহণ না করায়, অন্য লোকের সহিত তাহা বন্দোবস্ত করা হয়। বন্দোবস্ত-কৃত এই ভূমিই "খালিসা" নামে খ্যাত এবং যে ভূমি পূর্ব্বাবধি বাণিয়াচঙ্গ-পতির অধিকারে ছিল। তাহা "মোজরাই" বলিয়া কথিত হয়।[৯] সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ সবডিভিশন ব্যতীত শ্রীহট্টের অন্যত্র এইরূপ বিভাগ দৃষ্ট হয় না।

---

৮. ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব ষ্টেটিষ্টিকেল একাউন্টস্ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "গোবিন্দ খাঁর আবিদরেজা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লাউড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাণিয়াচঙ্গ নগর নির্ম্মাণ করেন।" একথাটি যে নিতান্তই ভিত্তিবিহীন ও অলীক তাহা সহজেই দেখা যাইতেছে। মিঃ গেইট তদীয় History of Assam গ্রন্থে এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, তৎসমালোচনা স্থলে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন,–

The tradition current among the Hindu families of Baniyachang is that 'Kasava Misra, the Brahman anchestor of Gobinda, came from north west and settled at Baniyachang and that as his descendants grew in power they occupied Laur and built a residential fortress there to prevent Khasia raids
(Mr. Gait's History of Assam.-A Critical study. P. 20.)

গোবিন্দ খাঁর আবিদরেজা বলিয়া কোন পৌত্র ছিলেন না, পরিশিষ্টে উদ্ধৃত বংশপত্রে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। দ্বিতীয়তঃ বাণিয়াচঙ্গ নগর যে অতি প্রাচীন, এই সময়ের বহুপূর্বে যে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা তত্রত্য দীঘী প্রভৃতির প্রাচীনত্ব দৃষ্টে এবং এই সময়ের পূর্ব্বকার ব্যক্তিদের (গোবিন্দ খাঁর জ্ঞাতি ও সহোদর ভ্রাতাদের) নামীয় গ্রামের নাম হইতেই প্রমাণিত হয়। (চ-পরিশিষ্ট দেখ) খাসিয়াগণ কর্ত্তৃক লাউড় বিধ্বংস ও আনওয়ার কর্ত্তৃক "বাণিয়াচঙ্গের হাবিলি, নির্ম্মাণ ঘটনা হইতেই এই ভ্রমাত্মক মতের সৃষ্টি হইয়াছে। গেজিটিয়ারেও আনওয়ার খাঁ নামের স্থলে ভ্রমতঃ 'আবেদ' নাম লিখিত হইয়াছে।

৯. খালিসা অর্থে খালাস (পৃথক) করিয়া নেওয়া ভূমি এবং মোজরাই অর্থে যে ভূমির রাজস্ব মোজরা (উলসা) মিলিত।

কথিত ২৮ পরগণার নাম এস্থলে (উত্তরদিক হইতে) যথাক্রমে লিখিত হইল-প্রথমত-রাজকী বা স্বাধীন লাউড় পর্ব্বত।

দ্বিতীয়তঃ-১। পরগণা বংশীকুণ্ডা।

২। " রণদিঘা।

৩। " সেলবরষ।

৪। " সুখাইড়।

৫। " বেতাল।

৬। " পলাশ।

৭। " লক্ষণছিরি (লক্ষণশ্রী)

৮। " চামতলা।

৯। " পাগলা।

১০। " দুহালিয়া।

১১। " বাজুজাতুয়া।

১২। " সিংহচাপড়।

১৩। " সফাহার। (সফি নগর?)

১৪। " সিকসোণাইতা। (সোণাউতা)

১৫। " আতুয়াজান।

১৬। " আটগাও।

১৭। " কুবাজপুর।

১৮। " জোয়ার বাণিয়াচঙ্গ।

১৯। " কসবা বাণিয়াচঙ্গ।

২০। " জলসুখা।

২১। " বিথঙ্গল।

২২। জোয়ানশাহী।

২৩। " মুড়াকইড়। (মুড়াকড়ি)

২৪। " কুরশা।

২৫। " জনতরি (যন্ত্রী)।

২৬। " হাউলি সোণাইতা।

২৭। " সতর সতী।

২৮। " পাইকুড়া (?)[১০]

এই সময় আনওয়ার খাঁ দেওয়ান উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি বাণিয়াচঙ্গের অধিপতিগণ দেওয়ান উপাধি ধারণ করিতেছেন।

---

১০. ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ ২৪শে মে তারিখের ৫০৫ নং চিঠির উত্তরে হবিগঞ্জের সবডিভিশনেল অফিসারের নিকট, বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান শ্রীযুক্ত আজমান রজা সাহেব কর্ত্তৃক ২৮ পরগণার লিষ্টসহ যে বিবরণ প্রদত্ত হয়, তাহা হইতে উদ্ধৃত হইল।

নাওরা মহাল

আনওয়ার খাঁর তিন পুত্র, তন্মধ্যে আহমদ খাঁ খ্যাতনামা। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় মগ ও পর্তুগীজ জল দস্যুদিগের অত্যাচার দমন করার জন্য ঢাকায় "নাওরা বিভাগ" স্থাপিত হয়। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পূর্ব্ববঙ্গের অনেকটি মহাল খারিজ হইয়া ঢাকার নেজামত সেরেস্তায় ভুক্ত হয়। বাণিয়াচঙ্গ পরগণার কোনও মহাল ঐ জন্য খারিজ না হইলেও, নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর সময়ে বাণিয়াচঙ্গপতির উপরে এই কারণে ৪৮ খানা সুবৃহৎ কোষ নৌকা যোগাইবার ভার থাকে। তদনুসারে তিনি ৪৮ খানা বৃহৎ কোষনৌকা (রণতরি) যোগাইতেন ও তজ্জন্য "নাওরা জায়গীর" উল্লেখে মহালের ত্রি-চতুর্থাংশ রাজস্ব বাদ পাইতেন।[১১] এই বাদপ্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ৬১৯৪৮ টাকা ছিল।[১২] যে সকল মহালের রাজস্ব বাদ পাওয়া যাইত, তাহা "নাওরা মহাল" বলিয়া কথিত হয়।[১৩] তদ্ব্যতীত দিল্লী রাজদরবারের জন্য শীতল পাটি, তসর বস্ত্র ও হস্তী প্রেরণ জন্য আরও কয়েক সহস্র টাকা বাদ পাওয়া যাইত।[১৪]

পরবর্ত্তী কীর্ত্তি

রাজকীয় আদেশবলে এই সময় ইটাপরগণার শ্যামরায় দেওয়ান শ্রীহট্টের ভূম্যধিকারীর সাহায্যে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করেন।[১৫] বাণিয়াচঙ্গপতি তাহাতে মজুর দিতে হইয়াছিল। বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান সাহেব পক্ষে, মজুর সহ আতাউল্লা মৃধা নামক এক ব্যক্তি ইটা গিয়াছিল। মজুরদের বেতন প্রাপ্তে মৃধা যে রসিদ দেয় তাহাতে দেওয়ান আদমের[১৬] নামাঙ্কিত মোহর ও "১১৫৬ বাং" (১৭৪৯ খৃষ্টাব্দ) তারিখ আছে।[১৭]

---

১১. "In the time of Alibardi Khan, a tribute of 48 long boats was imposed on the Baniachang chief and subsequently three-forth of his eastates assessed."
The principal Heads of the History and Statistic of Dacca Division (Sylhet). P. 291.

12. "Nowarreh establishment in 1169, before the disbursement of Seryle and Zeinshahy, was here, in all 205373, suplied from 3 Pergunnahs, now reduced to the great wood zemindary pargunnah of Baniyachang in the fork of Soormah and Cossiary rivers assessed for 1948"
The fifth report from the select Commitee on the Affairs of the East India Company. Vol. I. (Bengal presidency.) P. 445.

১৩. বাণিয়াচঙ্গে এখনও ১৬ কোষা, ৩২ কোষা ইত্যাদি মহালের নাম শুনা যায়। যে যে মহালের আয় হইতে যত সংখ্যক নৌকা প্রেরিত হইত, সেই সংখ্যানুসারে মহালের নাম নির্দ্দিষ্ট হইত।

১৪. শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস ৩য় ভাগ ৩য় অধ্যায় ২৯৭ পৃষ্ঠা।

১৫. এতদ্বিবরণ ইতিপূর্ব্বে (২য় ভাগ ৯ম অধ্যায়ে) কথিত হইয়াছে।

১৬. বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ানদের যে বংশাবলী আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে ঐ সময়ে আহমদ খাঁ ও তাঁহার দুইভ্রাতা বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া দেখা যায়। ইঁহাদের নাম আমুদ ও হবিব ছিল বলিয়া কথিত আছে। আদম বলিয়া ঐ সময়ে বা ইহার কিছুপরে বাণিয়াচঙ্গ বংশে কেহ ছিলেন না। রসিদের লিখিত আদম, আহমদ খাঁর ভ্রাতাদের অন্যতমের নামের গোলযোগ হইতেও পারে, যথা আমুদ-আদম। আমুদ ও আদম নামে বিশেষ পার্থক্য না থাকাতে আমুদের ডাক নাম আদম হওয়াও বিচিত্র নহে। তাহা না হইলে এই আদমকে বাণিয়াচঙ্গাধিপতির দেওয়ান অভিধাযুক্ত কোন উচ্চ কর্ম্মচারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় সঙ্গত হইবে।

১৭. মূল রসিদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা এইরূপঃ–"লিখিতং শ্রীসেক আতাউল্লা মৃধা পং বাণিয়াচঙ্গ মহাল মজকুর কবজ পুত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমি মুকাম পরগণে--ইটাতে জিউর দিঘিতে পরগণা মজকুরের মাটী কামলা বেগার লৈয়া গিয়া মাটীকাম করিছিলাম আমবার অজুরা সত্ব দিঘি মজকুর যে মাটী কাটিছিলাম এর মলবগ ২০/১৪৷৷ বিস কাহন দুইপণ চৌদ্দগণ্ডা সাড়ে কৌড়ি মোং তপছিল মবলগ মজকুর গৌরিবল্লভ পৌতদারও গয়রহর তহবিলে হনে তামাম কামাল সমজিয়া পাইলাম পাইয়া কবজ দিলাম ছালিন হনে দাওয়া করিঝুটা বাতিল এতদর্থে কবজপত্র দিলাম। ইতি সন ১১৫৩ সাল বতারিখ সাবান।" (রসিদের দক্ষিণপার্শ্বশীর্ষে পাঁচটি পারস্য মোহর এবং আতাউল্লা মৃধার নাম দস্তখত আছে।

দেওয়ান আহমদ খাঁর তিন পুত্র জামাল, কামাল[১৮] ও কেশর। তন্মধ্যে জামালের পুত্রের নাম আবিদুর রজা (আবিদ রজা)। ইনি অতি শিষ্ট ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। নিতান্ত বাল্য কালে ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। স্ত্রীর সন্তান হওয়ার উপযুক্ত কাল চলিয়া যাওয়ায় তিনি সদা চিন্তিত থাকিতেন। এক পত্নী থাকা সত্বে দ্বিতীয় দার গ্রহণে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এই বংশীয়েরা মোসলমান হইলেও, হিন্দু রীতি নীতির বিশেষ পক্ষপাতী। যাহা হউক, অবশেষে বিবিসাহেবার গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্ত্রীর সন্তান হইবার "উমেদ" (সম্ভাবনা) হওয়ায়, আনন্দিত হইয়া তিনি দানাদি অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। সেই গর্ভে একটি সুন্দর পুত্র সন্তান জাত হয়, ইঁহার নাম উমেদরজা রাখেন।

উমেদরজার সময় পর্য্যন্ত বাণিয়াচঙ্গের সম্পত্তি একবারে নষ্ট হয় নাই। তৎকালে তিনিই শ্রীহট্টের সর্ব্বপ্রধান ভূম্যধিকারী ও এক মাত্র রাজকর ব্যক্তি ছিলেন।[১৯] দেওয়ান উমেদরজা বড়ই ধর্ম্মাত্মা ও লোকহিতৈসী ছিলেন। কৃষকেরা এখন পর্য্যন্ত বিপদকালে দেওয়ান উমেদরজার "দোহাই" দিয়া থাকে। কতকাল যাবৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার জন্য হিতৈষণা আজও সাধারণের স্মৃতিপটে তাঁহাকে জাগ্রত রাখিয়াছে। দেওয়ান উমেদরজার সময় গবর্ণমেন্ট লাউড় প্রভৃতি সম্পত্তি হইতে তাঁহাদিগকে অধিকারচ্যুত করেন। উমেদরজা অনেক ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহট্টের সরকারী মহাফেজ খানায় উমেদরজার প্রদত্ত ভূদানের অনেকগুলি সনন্দ রক্ষিত আছে, এই সনন্দ গুলিতে ১৭৬৪-১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তারিখ পাওয়া যায়।[২০] ঐ সময়ের পরেও তিনি কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন।

দেওয়ান উমেদরজার চারি পুত্র, দেওয়ান আদমরজা, কুরবানরজা, আলমরজা ও আসাদর রজা। ইঁহারাও বহুব্যক্তিকে ভূদান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন; শ্রীহট্ট কালেক্টরীর রেকর্ডে ঐ সনন্দগুলির প্রতিলিপিও আছে।[২১] এই ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের নামে অনেক বৃহৎ বৃহৎ তালুকের

১৮. ইঁহাদের নামে দুইটি দিঘী বর্ত্তমান রহিয়াছে।

১৯. "The proprietor of Baniachang, Umeder Reza, who is the only Zeminder of the district (Sylhet) is a respectable old man."
Extract from the letter written by Mr. John Willis, the Collector, to the Board of Revenue-Dated 15th January, 1790.
-Vide Statistical Accounts of Assam Vol. II. (Sylhet).

২০. পরগণা বাণিয়াচঙ্গে দেওয়ানরা যে সমস্ত ভূমিদান করেন, তন্মধ্যে কয়েকটি সনদের প্রাপকের নাম নিম্নে দেওয়া গেল, ইঁহারা সকলই বাণিয়াচঙ্গবাসী ছিলেন।

	প্রাপকের নাম	বঙ্গাব্দ	ভূপরিমাণ	দাতার নাম ও ঠিকানা
	সদানন্দ তর্কালঙ্কার	১১৭১	৪/০	উমেদরজা সাং বাণিয়াচঙ্গ
	নন্দরাম শর্ম্মা	১১৭১	৪/০	উমেদরজা সাং বাণিয়াচঙ্গ
	রাজগীর সন্ন্যাসী (ক)	১১৮০	১৪৷৷২	উমেদরজা সাং বাণিয়াচঙ্গ
	হৃদয়রাম শর্ম্মা	১১৮১	৫/০	উমেদরজা সাং বাণিয়াচঙ্গ
	মিয়াকাম উল্লা	১১৮৯	৪/০	উমেদরজা সাং বাণিয়াচঙ্গ
	সৈয়দএওজ উল্লা	১১৮৯	১৫।০	উমেদরজা সাং বাণিয়াচঙ্গ
	বিক্রমরাম শর্ম্মা	১১৯০	৪/০	উমেদরজা সাং বাণিয়াচঙ্গ
	শ্যামরাম শর্ম্মা	১১৯২	৬/০	উমেদরজা সাং বাণিয়াচঙ্গ
২১.	রাজকৃষ্ণ শর্ম্মা	১১৯৮	৬/০	উমেদরজা সাং বাণিয়াচঙ্গ
	কীর্ত্তিরাম সন্ন্যাসী	১১৯৪	১/০	আলমরজা সাং বাণিয়াচঙ্গ
	নবশঙ্কর সন্যাসী	১২০০	৬/০	আলমরজা সাং বাণিয়াচঙ্গ
	বিক্রমরাম শর্ম্মা	১১৯৬	৪/০	আসাদররজা সাং বাণিয়াচঙ্গ

(ক) গিরি উপাধিধারী সন্ন্যাসীগণ বাণিয়াচঙ্গের কালীর নিত্য পূজাদি নির্ব্বাহ করিতেন; কেশবমিশ্র বংশীয় কাত্যায়নগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে ইঁহাদের শিষ্য ছিলেন। এখনও তত্রত্য সন্ন্যাসীর মন্ত্রশিষ্য অনেক আছেন।

নামকরণ হইয়াছে।

আলমরজা সরল ও সদয় হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে নির্ব্বোধ মনে করিত। তিনি অনর্থক অনেক ব্যয় করিতেন, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। অনুচিত অপব্যয় করার জন্য আজ পর্য্যন্ত লোকে "আলম বেঢপা" বলিয়া বোকা লোককে সংজ্ঞিত করে। দেওয়ান আলমরজার পুত্র নসরতরজা এবং কুরবানরজা এবং কুরবানরজার পুত্র আমন রজা ও জামন রজা। পিতৃবিয়োগের কিয়ৎকাল পর অল্প বয়সে জামনরজা জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হন। সেই সময় সরকার বাহাদুর বাদী ও দেওয়ান জামন রজা গয়রহ বিবাদী নামীয় ১৮৪২ ইং ৪৪৯৬ নং মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ প্রদত্ত ভূমি সূত্রে "ব্রাহ্মণান" "ভালে আদমিয়ান" "খুসবাসান" নামে কতক ভূমি কসবা বাণিয়াচঙ্গ হইতে গবর্ণমেন্ট খাস করতঃ নুতন বন্দোবস্ত করেন।

জামন রজার পুত্র মামন রজা, মামনরজার পুত্র দেওয়ান আজমান রজা বর্ত্তমান আছেন।

সাধারণ দুটাকথা

বাণিয়াচঙ্গ–কর্ম্মচারীদের মধ্যে "লস্কর" "জমাদার" "সরদার" উপাধি ধারী কর্ম্মচারীবর্গ শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই কালক্রমে জমিদার শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছেন। যাহারা হিসাব পত্র রক্ষিত ও আয় ব্যয় সংক্রান্ত দায়িত্ব জনক কার্য্য করিতেন, তাঁহারা বিশ্বাস খ্যাতি প্রাপ্ত হইতেন।[২২] অদ্যাপি তদ্বংশীয়গণ ঐ উপাধি ধারণ করিতেছেন। "মণ্ডল" উপাধিধারী কর্ম্মচারিগণ রাজস্ব আদায়ের কর্ম্ম করিতেন[২৩] ও আদায়ী রাজস্বের নির্দ্দিষ্ট অংশ পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। অবৈধাচরণ করিলে ইঁহারা কঠোর দণ্ড পাইতেন। অনেক মণ্ডল বংশীয় ব্যক্তি পরে জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন। দেওয়ানদের অনুগ্রহে দেশে অনেকেই সম্মানিত ও পরে জমিদার শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ পাইলগাওর জমিদার বংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বংশীয় হুলাস রাম চৌধুরী দেওয়ান উমেদ রজার এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। প্রভুর অনুগ্রহে তিনি অনেক ভূমি দান প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, তাঁহার আয়ত্তাধীন ভূমি তখন চাষযোগ্য ছিল না, পরে তাহাই আয়কর হইয়া এক জমিদারী রূপে পরিণত হয়। হুলাস রাম চৌধুরী হইতেই পাইলগাঁর জমিদারী; ইহা বর্ত্তমান বংশীয়গণও স্বীকার করেন।

দেওয়ান সাহেবেরা দেশের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন; ইঁহাদের হুকুম অগ্রাহ্য করিবার লোক এদেশে ছিল না। দৃষ্টান্তস্থলে চান্দভরাঙ্গ মৌজার কোন সম্ভ্রান্ত মোসলমান ভদ্রলোকের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেই সম্ভ্রান্ত মোসলমান পরিবার বংশ মর্য্যাদায় সুনামগঞ্জে অতি সম্মানিত ছিল। এক সময় এই পরিবারের কেহ কোন অবৈধাচরণ করায়, দেওয়ান সাহেবের আদেশে বাণিয়াচঙ্গে আনীত ও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। পরে হোসেন আলম নামক জনৈক পীর (সাধু) দেওয়ান সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করিলে ইহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই ঘটনা সামান্য হইলেও, যখন বাণিয়াচুঙ্গের অধিকাংশ সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়াছে. সেই অধঃপতিত অবস্থায়ও তাঁহাদের ক্ষমতা কতদূর ছিল, তাহার পরিচায়ক। এই দেওয়ানবংশের অনেক কীর্ত্তি প্রবাদের ন্যায় এদেশে প্রচারিত; এখনও ইঁহাদের সম্মান দেশে অত্যন্ত অধিক। প্রকৃতপক্ষে বাণিয়াচঙ্গের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি দেওয়ান বংশ হইতেই হইয়াছে।

২২. দ্বিতীয়ভাগ দ্বিতীয়খণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের টীকায় ইতিপূর্ব্বে "বিশ্বাস" শব্দের অর্থ আলোচিত হইয়াছে

২৩. ঐ ষষ্ঠ অধ্যায়ে মণ্ডলদের অধিকারের কথা লিখিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে বাণিয়াচঙ্গের কয়েকটি প্রধান ব্রাহ্মণবংশের উল্লেখ করা হইয়াছে; তদ্ব্যতীত নাগ, নন্দী, দত্ত ও সেন, বাণিয়াচঙ্গে এই কয়েকটি মৌলিক ভদ্রবংশ। দত্তবংশ এখন নির্ব্বংশ। নবাগত মধ্যে জগদীশপুরের দত্ত, চুন্টার সেন, সুঘরের মজুমদার বংশীয়েরা পূর্ব্বগৌরবে সম্মানিত। যথাস্থানে ইঁহাদের বংশ বিবরণ কথিত হইবে। সেন বংশীয় শিবচরণ সেনের দান শক্তিতে লোক মুগ্ধ হইয়াছিল ও তাঁহাকে "দাতা শিবচরণ" বলিত। "দাতা শিবচরণ" নাম লোকে অদ্যাপি ভুলে নাই।

ভট্টদের দ্বারাও বাণিয়াচঙ্গ দূর দূরান্তের পরিচিত হইয়াছে। মকরন্দ রায় ও নবানরায়ণভট্ট অতি বিখ্যাত কবিতা রচয়িতা ছিলেন। আজিও তাঁহাদের বিরচিত কবিতা শুনিবার জন্য লোক ব্যাকুল। ইঁহারা ব্রজবুলিতে মনোহারি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

যে স্থানের অধিপতি মোসলমান, তথায় মোসলমানের সংখ্যা বাহুল্য হইবে বলা বাহুল্য। বাণিয়াচঙ্গে ভদ্রবংশীয় মোসলমান অনেক আছেন; তন্মধ্য প্রসিদ্ধ "মৌলবী বাড়ীই" এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মৌলবী ওবেদুল হোসেন হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের পুত্রদ্বয়ের শিক্ষক ও রেসিডেন্টের মোনশী ছিলেন। কথিত আছে, নিজামের পরলোক গমনের পর রেসিডেন্টের সহায়তায় ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া নিজামের তোষাখানা "বখশিশ" পান। ইহা হইতে কিছু জহরাৎ লইয়া এবং অবশিষ্ট বিক্রয় করিয়া প্রচুর ধন সম্পত্তি লাভ করতঃ বাড়ী প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার সম্মানের চূড়ান্ত হইয়াছিল, কিন্তু নিলামে গাগলাযোড় পরগণা ক্রয় করায় গৌরীপুরের জমিদারসহ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতেই তাঁহাদিগকে দীন দশায় উপস্থিত হইতে হইয়াছে। কিন্তু এসকল কাহিনীর এখানে উল্লেখ মাত্রই থাকিল, স্থলান্তরে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে।

যে লাউড় রাজ্য (পং লাউড় ও বাণিয়াচঙ্গে) পৌরাণিকযুগে ভগদত্ত নৃপতি কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে যে দেশে বিজয়মাণিক্যের সিংহাসন স্থাপিত ছিল, দ্বিজ জগন্নাথের মহিমায় যে রাজ্যের একাংশ আজও তন্নামে পরিচিত, যে দেশের সুসন্তানের বুদ্ধিবলে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গভূমে হিন্দুশৌর্য্যের ঈষৎ মাত্র বিকাশ লক্ষিত হইয়াছিল, সে দেশের কাহিনী কম গৌরবাত্মক নহে। যে দেশে বৈষ্ণব মান্য সন্ন্যাসীবর মাধবেন্দ্রের সতীর্থ বিজয়পুরীর পূর্ব্বাশ্রম, যে দেশ সুবিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য অদ্বৈতপ্রভুর জন্মভূমি, তাঁহারই মহিমায় যথায় পুণ্যতীর্থ "পণা" অবস্থিত যে স্থানে কবি বর ঈশানের কবিতা কদম্ব বিকশিত হইয়াছিল, নারায়ণ দেবের সংগীতধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল,[২৪] এবং রাধামাধবের সরল সংস্কৃতের মধুর ঝঙ্কার উচ্চারিত হইয়াছিল, ইদানীং যে দেশে ভট্টকবি মকরন্দের সুধাস্রোত ছুটিয়াছিল, সাহিত্য ক্ষেত্রেও সে স্থান পরিচিত থাকার যোগ্য। যে স্থানে কর্ণখাঁ দানে ও জনহিতৈষণায়, গোবিন্দ খাঁ সাহস ও শৌর্য্য, জয়সিংহ সারল্যে এবং বিজয়সিংহ কৌটিল্যে খ্যাত, সে স্থানের কাহিনী আলোচনায় লাভ আছে। সেই লাউড় রাজ্যের (পং লাউড় ও বাণিয়াচঙ্গ) বিবরণ এস্থলে সংক্ষেপে সমাপন করা গেল।

২৪. ময়মনসিংহ যে কবিকে লইয়া গৌরব করিতে প্রয়াশী, জলসুখা পরগণার নগর গ্রামে সেই নারায়ণদেব জন্মগ্রহণ করেন ও তথা হইতেই সন্নিকটবর্ত্তী গৌড় গ্রামে গমন করেন, ইহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, অতএব নারায়ণদেব প্রকৃতপক্ষে শ্রীহট্টের লোক।

চতুর্থ খণ্ড

মোসলমান প্রভাব

জয়ন্তীয়া

প্রথম অধ্যায়
আদি নৃপতিগণ

মহল জয়ন্তীয়া

জয়ন্তীয়া উত্তর-শ্রীহট্ট সবডিভিশনের উত্তর-পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। জয়ন্তীয়া পরগণাগুলি প্রাচীন জয়ন্তীয়া রাজ্যের একাংশ মাত্র। জয়ন্তীয়া রাজ্য অতি, প্রাচীন। জয়ন্তীয়ার বাউরভাগ পরগণায় একটি মহাপীঠ বর্ত্তমান। পীঠাধিষ্ঠাত্রী ভৈরবীর নাম জয়ন্তী;[১] জয়ন্তীদেবীর অধিষ্ঠিত স্থানই জয়ন্তীপুর। জয়ন্তীদেবীর নামানুসারেই এই জনপদ জয়ন্তীয়া রাজ্য ও তদুত্তরবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী জয়ন্তীয়া পর্ব্বত নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। জয়ন্তীয়ার অধিপতিগণ যেরূপ দীর্ঘকাল স্বাধীনতা সম্পদ উপভোগ করিয়াছেন, বহুস্থানের রাজাদের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই।

আকবরের রাজস্ব-সচিব রাজা তোদরমল্ল জয়ন্তীয়াকে "সরকার শ্রীহট্টের" একটি "মহল" রূপে নির্দ্ধারণ করতঃ ইহার রাজস্ব (২৭২০০ দাম) ৬৮০ টাকা স্থির করেন; আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে ইহা লিখিত আছে। ত্রিপুরা যুদ্ধেও এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। আইন-ই-আকবরির এ নির্দ্দেশ কত যথার্থ তাহা বলা যায় না। আকবরের রাজত্বসময়ে জয়ন্তীয়া কি ত্রিপুরা মোসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই বলিয়াই ব্লকমেন সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[২]

যে বৎসর রাজা তোদরমল্ল "ওয়াশীল তোমার জমা" নামক রাজস্ব হিসাব প্রস্তুত করেন সেই বৎসর রলফ ফিচ (Ralph Fitch) নামক জনৈক ইংরেজ ভ্রমণকারী ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্য দিয়া চট্টগ্রামে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত আলোচনা করিলেও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। আবার জয়ন্তীয়াবাসীগণ শ্রীহট্টের অপরাংশকে "মোগলান" শব্দে অদ্যাপি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। মোগলদের অধিকৃত জনপদ মোগলান শব্দের বাচ্য। ইহাতেও মোগল সম্রাটগণের শাসনকালে জয়ন্তীয়া স্বাধীন ছিল বলিয়াই নিরূপিত হয়। সুতরাং আইন-ই-আকবরির বর্ণনা নিরর্থক হইয়া পড়িতেছে। তবে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, আকবরের রাজত্ব সময়ে জয়ন্তীয়ার কিছুটা অংশ মোগল সাম্রাজ্যের করদ হইয়া থাকিবে। "সরকার শ্রীহট্টের" আটটি "মহল" মধ্যে জয়ন্তীয়ার রাজস্ব সর্ব্বাপেক্ষা অল্প থাকা[৩] দৃষ্ট হওয়ায়, সেই অংশের আয়তনের ক্ষুদ্রতাই উপলব্ধি হয়।

জয়ন্তীয়া রাজ্য সমতল ও পর্ব্বত ভেদে দুইভাগে বিভক্ত। শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্ভুক্ত অষ্টাদশ পরগণা সমন্বিত সমতল জয়ন্তীয়া বর্ত্তমান রাজবংশের স্থাপয়িতা পর্ব্বত রায়ের রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই জয়ন্তীয়া রাজ্যের অংশরূপে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছিল। এই অংশেই জয়ন্তীদেবীর পীঠস্থান অবস্থিত। জয়ন্তীয়ার স্বাধীন অবস্থায় এই সমতল ও পার্ব্বত্য জয়ন্তীয়ার মধ্যে কোনরূপ রাজনৈতিক ভেদ ছিল না।

১. "জয়ন্ত্যাং রামজঙ্ঘা চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ।"–তন্ত্রচূড়ামণি।

২. Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. XLII. part. I. PP. 214, 234.

৩. এই পুস্তকের প্রথম ভাগ ১০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
সুরমা নদীর সমস্ত উত্তর দিক এক সময় জয়ন্তীয়ারাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্ত্তমান ১৮ পরগণার অতিরিক্ত উক্ত অংশই আইন-ই-আকবরির উদ্দিষ্ট "জয়ন্তীয়া" হইতে পারে।

জয়ন্তীয়ার হিন্দুরাজ্য

পবিত্র জয়ন্তী-ক্ষেত্র পুরাকালে এক সমৃদ্ধ হিন্দুরাজ্য ছিল। জৈমিনি ভারতে যে নারীরাজ্যের উল্লেখ আছে,[৪] এই জয়ন্তীই সেই নারীরাজ্য। মহাভারতের বর্ণিত সময়ে এদেশের অধীশ্বরী প্রমীলা ছিলেন। এই বীর-নারীর সহিত বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল। তথা হইতে অর্জ্জুন মণিপুরে গমন করিয়াছিলেন, প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহার পরও সুদীর্ঘকাল এস্থান হিন্দুনৃপতিদের শাসনাধীনে ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জয়ন্তীপুরে কামদেব নামক জনৈক হিন্দু নরপতি রাজত্ব করিতেন।

মোলব দেশের অন্তর্গত ধারানগরাধিপতি মুঞ্জরাজের কিঞ্চিৎ পরে কামদেবের সময় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মুঞ্জুরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ভোজরাজ। ইনি "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" গ্রন্থের রচয়িতা এবং ইনিও কামদেবের সম-সাময়িক। ইঁহার রাজত্বকাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনুমান করা যাইতে পারে।[৫]

কবিরাজ নামক কবিকৃত প্রসিদ্ধ "রাধব পাণ্ডবীয়" গ্রন্থের প্রথমে কবিরাজের নামোল্লেখ আছে; ইহাতে মুঞ্জরাজের সহিত কবিরাজের পরিচয় থাকা সূচিত হইতেছে। "রাঘব পাণ্ডবীয়" গ্রন্থের প্রথম সর্গে লিখিত আছে যে, কবিরাজ জয়ন্তীপুর-পতি কামদেবের সভায় ছিলেন, এবং তৎকর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া তিনি "রাঘব পাণ্ডবীয়" গ্রন্থ রচনা করেন।[৬] ইহাতে এই অনুমিত হয় যে, জয়ন্তীপুর-পতির আগ্রহে কবিরাজ ধারানগরী হইতে জয়ন্তীয়াতে আগমন করিয়াছিলেন। অতএব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জয়ন্তীয়া দেশ কামদেব নামক হিন্দু নৃপতি কর্ত্তৃক শাসিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই নৃপতি মধ্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখিত আছে। একখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য পূর্ব্বাঞ্চলীয় জয়ন্তীয়াপুর-পতির প্রোৎসাহে প্রণীত হয়, ইহা তদ্দেশবাসীর গৌরবময় সন্দেহ নাই।

ইহার পরেও জয়ন্তীপুরে হিন্দুরাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কহলন রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থের চতুর্থ তরঙ্গে লিখিত আছে যে, কাশ্মীর-রাজ জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বদেশীয় রাজা ভীম সেনকে পরাভূত করত নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করেন, তৎপর তিনি বিশাল "স্ত্রীরাজ্য জয় করেন।" (লৌকিক ৮৯ অব্দের) ১২১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা ঘটে। বস্তুতঃ বামজঙ্ঘ পীঠক বহুকাল হিন্দু নৃপতি কর্ত্তৃক পরিলক্ষিত হইয়া আসিয়াছিল, বহুকাল জয়ন্তীয়ায় হিন্দু রাজত্ব ছিল। জনশ্রুতি মুখে এখনও জয়ন্তীয়ার শেষ হিন্দু নৃপতি চতুষ্টয়ের নাম শ্রুত হওয়া যায়। কথিত

৪. জৈমিনি ভারত ২১।২২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫. (১) বাসব দত্তার মুখবন্ধ লেখক ফিড্জ এডওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, মুঞ্জরাজ ভোজরাজ খৃষ্টীয় ১০০০ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

(২) উজ্জয়িনী দেশের জ্যোতির্ব্বেত্তৃদের মতানুসারে হাণ্টার সাহেব, খৃষ্টীয় ১০৪২ অব্দে ভোজরাজ বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

(৩) কহলন রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, কাশ্মীর-রাজ অনন্তদেবের সময়ে (১০৩৬ খৃষ্টাব্দের পর), মালব দেশে ভোজরাজ রাজত্ব করেন।

(৪) ভোজরাজের প্রাদুর্ভাব কাল ১১০০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উইলসন্ সাহেব লিখিয়াছেন, কিন্তু ফিড্জ এড্ওয়ার্ড সাহেবের মতে উহা ভ্রমাত্মক।

যাহাহউক, অধিকাংশ মতেই ভোজরাজ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক।

৬. "আনেতা মধ্যদেশাৎ প্রবচনবিদুষাং সোমপাং ব্রাহ্মণানা–
মারোঢ়া মর্ত্ত্যমূর্ত্ত্যা সুরপতিসদসো মণ্ডলং মালবত্যাঃ।
জেতা ভূমের্জয়ন্তীপুর-পুরমথন-শ্রীপদাম্ভোজ ভৃঙ্গঃ
সোহপি ক্ষ্মামপালনেতুঃ স্বকুলকুলগিরিং যোহনুলেভে তপোভিঃ॥"
–রাঘব পাণ্ডবীয় ১ম সর্গ ২৫ শ্লোক।

আছে যে ইঁহারা ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন, ইঁহাদের নাম যথাক্রমেঃ-

১. কেদারেশ্বর রায়। ২. ধনেশ্বর রায়।

৩. কন্দর্প রায়। ৪. জয়ন্ত রায়।[৭]

হিন্দু রাজত্বের বিলোপ

আসামের প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কুণ্ডিল রাজ্য যেরূপ বিলুপ্ত হয়, জয়ন্তীয়ার হিন্দু রাজত্ব তদ্রুপই বিনষ্ট হইয়া যায়। অসভ্য খস ও সিন্টেঙ্গ (Synteng) জাতীয়দের উৎপাতে প্রাচীন রাজ্যের বিলোপ ঘটে। কিন্তু ইহাও যে কত পুরাতন ঘটনা তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। সেই অনিশ্চিত অতি পুরাতন কালে, এই পার্ব্বত্য জাতীয়েরা জয়ন্তী ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, তাহাদের দলপতিই রাজপদাভিষিক্ত হইয়াছিল, সেই বিবরণ এখন অতীতের তিমিরাবৃত গর্ভে নিহিত হইয়াছে। জনশ্রুতি অনুসারে জয়ন্তীয়া পর্ব্বতের সুতঙ্গন নামক স্থান[৮] হইতেই রাজবংশীয় আদি পুরুষের অভ্যুদয় ঘটে। কথিত আছে, তিনি শৈশবাবস্থায় তরুমূলস্থ প্রস্তরতলে নিদ্রা যাইতেছিলেন, তদবস্থায় একটা কৃষ্ণ সর্প তাহার শিরদেশে ফণা বিস্তার করিয়া রৌদ্রতাপ বারণ করিতেছিল। কোন পার্ব্বত্য সর্দ্দার এই অদ্ভুত ঘটনা দৃষ্টে নিদ্রিত বালককে দৈবক্ষমতা বিশিষ্ট প্রদান করিয়া তাহাকেই আপনাদের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করে ও নিজ বক্ষে আচড় দিয়া, বক্ষঃক্ষরিত শোণিত বিন্দু দ্বারা বালককে রাজটীকা প্রদান করে। সেই বালকের পর কতজন জয়ন্তীয়ার রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, জানা যায় না। প্রাচীন মুদ্রা ও তাম্রফলকাদি হইতে বিংশতি জন স্বাধীন নৃপতির নাম সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাঁহাদের মধ্যে পর্ব্বত রায়ই প্রথম, পর্ব্বত রায় অবধি রাজগণের নামগুলি বঙ্গভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, পর্ব্বত রায়ই সর্ব্বপ্রথম পর্ব্বত হইতে জয়ন্তীয়ার সমতল ক্ষেত্রে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। এবং সমতলের প্রজাগণ কর্ত্তৃকই তিনি পর্ব্বত রায় বা পর্ব্বতের রাজা এই উপনাম প্রাপ্ত হন। আসামের ইতিহাস প্রণেতা গেইট সাহেবও এইরূপ অনুমান করিয়াছেন।[৯]

পর্ব্বত রায়ের কাল নির্ণয়

পর্ব্বত রায় হইতে পরবর্ত্তী যে সকল নৃপতির নাম পাওয়া যায়, জয়ন্তীয়ার সেই নৃপতিবর্গের মধ্যে সপ্তম রাজা ধন মাণিকের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর অন্তভাগ; তাঁহার সময় হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিজনের রাজত্বকাল ষোলবৎসর করিয়া ধরিলে[১০] পর্ব্বত রায়ের শাসনকাল ১৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

৭. "Prior to its conquest by these hillmen, the Jaintia parganas were ruled by a line of Brahman kings, of whom the last four were Kedaresvar Ray, Dhanesvar Ray, Kandarpa Ray, and Jayanta Ray."
-Gait's History of Assam. Chap. XI, P. 266.

৮. এই সুতঙ্গন হইতেই সিন্টেঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে। অথবা ইহা জয়ন্তী শব্দের খাসি সংরক্ষরণও হইতে পারে।

৯. It may also perhaps be conjectured that it was he who extended he away of the Jaintia Kings into the plains tract at the foot of his ancestral kingdom in the hills. His name Parbat Ray 'the Lord of the hills' seems to confirm this supposition."
-Gait's History of Assam. Chap. XI, P. 255.

১০. আসামের ইতিহাস প্রণেতা গেইট সাহেব এইরূপ হিসাব ধরিয়াছেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ বলিয়া বোধ করা যায় না।

মাঝ গোসাঞি ও বুড়াপর্ব্বতরায়

গোস্বামী বা গোসাঞি উপাধি বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর সভ্রান্ত ব্যক্তিরা পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করেন। আসাম অঞ্চলে "গোহাই" বা গৌসাঞি শব্দ রাজপরিবার ও রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে ব্যবহৃত। পর্ব্বত রায়ের পরবর্ত্তী রাজার নাম মাঝ গোসাঞি। আসাম অঞ্চলের প্রথানুসারে তিনি এই উপাধি ধারণ করিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বোক্ত হিসাবানুসারে তাঁহার শাসনকাল ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলিতে হইবে। মাঝ গোসাঞি ও তৎপরবর্ত্তী রাজা বুড়াপর্ব্বতরায়ের বিষয় কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না; ইহার শাসনকাল গেইট সাহেবের অনুমান মতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

বড় গোসাঞি ও মহাপীঠ

ইঁহাদের পরবর্ত্তী বড় গোসাঞি ধর্ম্মানুরাগী রাজা ছিলেন; তিনি সম্ভবত ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জয়ন্তীয়া রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন।

যে মহাপীঠের জন্য জয়ন্তীয়া জন-সাধারণের নিকট পবিত্র তীর্থরূপে পূজিত, পূর্ব্বতন হিন্দুরাজত্বের সহিত যাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; এই ধর্ম্মানুরাগী রাজার রাজত্বকালে সেই মহাপীঠ পুনঃপ্রকাশিত হয়। পীঠপ্রকাশ প্রসঙ্গে সে বিষয় স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে।[১১] কয়েকটি বালকের ক্রীড়ামূলে জঙ্ঘাকৃতি এক প্রস্তরখণ্ডে ভৈরবীর অধিষ্ঠান প্রকটিত হয়। রাজা নিজ গুরু জনৈক তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষসহ সেই স্থানে উপনীত হইয়া, দেবীকে রাজধানীতে আনয়ন করিতে সচেষ্ট হন। রাজাদেশে খনকেরা খনন করিতে আরম্ভ করিলে পার্শ্বখিত ভূরি পরিমাণ বালুকায় গর্ত্তটি পূরিয়া যাইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন, তাহা দৈব অভিপ্রায়ে সংঘটিত হইতেছে ভাবিয়া, রাজা সেই উদ্যমে ক্ষান্ত হইলেন ও সেই স্থান সুচারুরূপে বাঁধাইয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত হইল এবং প্রাচীরের গায় সহস্র প্রদীপ প্রজ্বালনের ব্যবস্থা থাকিল ও নিয়তির পূজা পরিচালনের সুবন্দোবস্ত হইল। পরে ভৈরবের অনুসন্ধানে এ স্থানের উত্তরে এক শিব আবিষ্কৃত হন, প্রকাশক রাজগুরু সেই সিদ্ধ ব্রাহ্মণের নামানুসারে তৎপূজিত সেই শিব "রূপনাথ" বলিয়া খ্যাত হইলেন। অনেকের মতে এই রূপনাথই বামজঙ্ঘা পীঠের ভৈরব। আবার কেহ কেহ বামজঙ্ঘাপীঠকে আঁকড়িয়া ধরা যে একটি মূর্ত্তি দেখা যায়, উহাকেই ক্রমদীশ্বর ভৈরব বলেন।

সে যাহা হউক, রূপনাথ আবিষ্কৃত হইলে মহারাজ রূপনাথের দক্ষিণদিকে এক পাকা মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলেন। কথিত আছে, স্বপ্নাদেশ হওয়ায় মহাদেবকে আর মন্দিরতলে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা হইল না। মন্দির শূন্য পড়িয়া রহিল; তদবধি রূপনাথ তৃণকুটীরেই অবস্থিতি করিতেছেন। রূপনাথের এই কুটীর খাসিয়া রমণীগণ প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকে, পুরুষদের নির্ম্মাণাধিকার নাই।

জয়ন্তীয়াধিষ্ঠাত্রীর মহিমা অত্যল্প কালেই চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল: দলে দলে সাধু সন্যাসীগণ দেবী দর্শনে আসিতে লাগিলেন। মহারাজ দেবস্থানের সুশৃঙ্খলা করিয়া দেওয়ায় সর্ব্ববিষয়েই সুব্যবস্থা হইল। মহারাজ দেবীর সেবায় সমস্ত জয়ন্তীয়া রাজ্য উৎসর্গ করিলেন, দেবীর নিয়মিত সেবা নির্ব্বাহার্থ কোনরূপ দেবত্র দিলেন না, বলিলেন–"মায়ের চরণাঙ্কিত ও স্বনামীয় এই রাজ্যই তাঁহার,–ভিন্ন বন্দোবস্তের আবশ্যক কি"? সুতরাং রাজভাণ্ডার হইতে সাক্ষাৎভাবে দেবীর সেবার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। ধর্ম্মাত্মা বড়

১১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে ১ম ভাগ ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

গোসাঞ্রির এ অনুজ্ঞায় পরবর্ত্তী রাজগণও অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই। জয়ন্তীয়ায় বহুতর দেবতার জন্য দেবত্রদানের ব্যবস্থা হইলেও, শাস্ত্রোক্ত এই প্রাচীন মহাপীঠের জন্য কোনরূপ দেবত্র প্রদত্ত হয় নাই।

জয়ন্তীয়াপতি ও ত্রৈপুর-নৃপতি

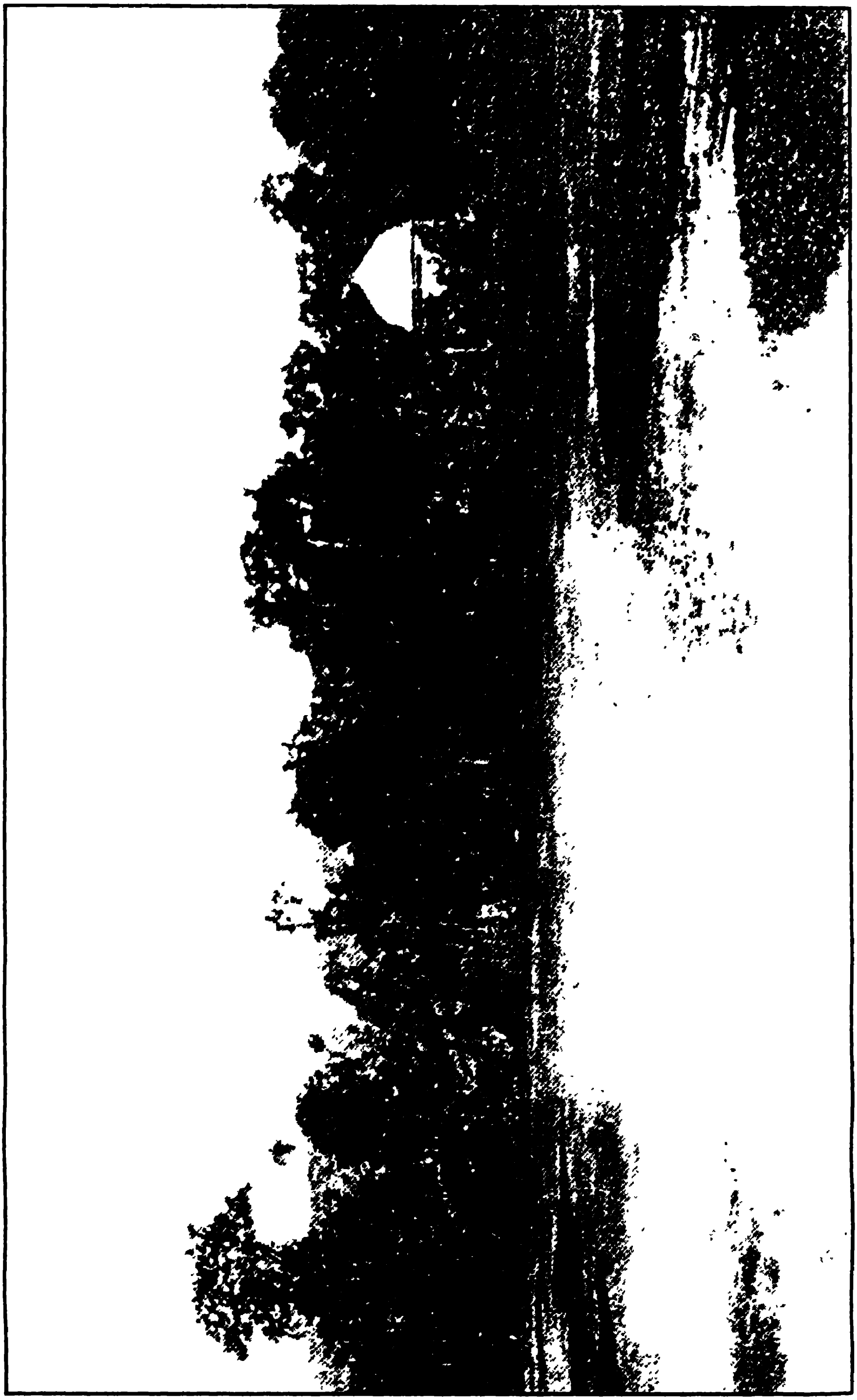
বড় গোসাঞ্রির পর বিজয় মাণিক (সম্ভবত) ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার সময়ে ত্রৈপুর- রাজবংশেও বিজয় মাণিক্য নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক রাজা রাজত্ব করিতেন। এই বিজয়মাণিক্য প্রখ্যাতকীর্ত্তি রত্নমাণিক্যের ষষ্টপুরুষ স্থানীয়। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ সিংহাসনে আরূঢ় হন, ইঁহার পরাক্রমের সংবাদ শ্রবণে জয়ন্তিয়াপতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তৎসহ মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার 'ইতিহাস রচয়িতা বর্ণনা করিয়াছেন,-"জয়ন্তীয়াপতি নানাপ্রকার উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক ত্রিপুরেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করেন। জয়ন্তীয়ারাজের বিনয় ও ভক্তিতে বাধ্য হইয়া মহারাজ বিজয়মাণিক্য প্রসাদস্বরূপ তাঁহাকে একটি হস্তী প্রদান করেন। মহারাজ বিজয়মাণিক্য রাজধানীতে পদার্পণ করিয়া শ্রুত হইলেন যে, জয়ন্তীয়াপতি প্রচার করিয়াছেন, "বিজয় মাণিক্য ভয়াতুর হইয়া আমাকে একটি হস্তী উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন, এই কাব্য শ্রবণমাত্র জয়ন্তীয়াপতিকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য তিনি বৃহৎ একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জয়ন্তীয়ারাজ ত্রৈপুর সৈন্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে ভয়ে কাতর হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করেন, এবং হৈড়ম্বপতির দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ত্রিপুরেশ্বরের নিকট পত্র পাঠাইলে, মহারাজ বিজয়মাণিক্য জয়ন্তীয়াপতিকে ক্ষমা করিয়া ত্রৈপুর সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন"।[১২] ইহার পর উভয় বিজয়ের মৈত্রীভঙ্গের কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই এবং বিজয়মাণিক নিরুদ্বেগেই জয়ন্তীয়া শাসন করিতেছিলেন; কিন্তু অবশেষে এক বিষম অনর্থ উপস্থিত হয়।

নরনারায়ণের জয়ন্তীয়া জয়

কামরূপের কোচবংশীয় রাজা নারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তিনি অতি প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন। নারায়ণের ভ্রাতা যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ শুক্লধ্বজ (চিলারায়) তদীয় সেনাপতি ছিলেন। চিলারায়ের বাহুবলে নরনারায়ণের রাজ্যসীমা বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্ববিভাগে তিনি কাছাড় ও মণিপুর জয় করণান্তর নিজ বিজয়বাহিনী জয়ন্তীয়া-পতির বিরুদ্ধে চালিত করেন। বিজয় মাণিক ঝটিতি সসৈন্যে চিলারায়ের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিজয় মাণিক হঠাৎ নিহত হওয়ায় চিলারায়েরই জয় হইল। এই বিজয়বার্ত্তা প্রাপ্তে নরনারায়ণ, বিজয়মাণিকের পুত্র প্রতাপরায়কে করদ রাজারূপে জয়ন্তীয়ার সিংহাসন প্রদান করেন।[১৩] রাজা প্রতাপ রায় সিংহাসনারোহণ করিলেন বটে, কিন্তু কোচ নৃপতির অনুজ্ঞায় নিজনামে মুদ্রা প্রচারের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। জয়ন্তীয়া হইতে যে কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় বড় গোসাঞ্জির পূর্ব্ববর্ত্তী মুদ্রাগুলিতে রাজাদের নামের পরিবর্ত্তে

১২. শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস ২য় ভাগ ৪র্থ অধ্যায় ৫৯ পৃষ্ঠা। আসামের ইতিহাস প্রণেতা গেইট সাহেব নিজ ইতিহাসেও এই বিষয়ের অভাসমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

১৩. "চিলারায় জয়ন্তীয়া রাজ্য আক্রমণ করি তার রজাক নিক হাতেরে বধ করে, নর নারায়ণে সেই রজার পুতেকক পিতৃ-সিংহাসন ত বহাই তেওঁক করতলীয়া রজা পাতিলে।"
-শ্রীযুক্ত পদ্মনাশ বরুয়া কৃত 'আসামর বুরঞ্জী' ৫ম অধ্যায় ২৮ পৃষ্ঠা।



ঘারচিত্র জৈন্তীয়ার রাজবাটীর দীর্ঘীকা

শুধু "জয়ন্তীয়ার মহারাজ" মাত্র মুদ্রিত আছে।[১৪] প্রতাপরায়ের শাসনকাল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবধারিত হইয়াছে।

ধনমাণিক ও শত্রুদমন

প্রতাপ রায়ের মৃত্যুর পর ধনমাণিক রাজসিংহাসন লাভ করেন। তিনি প্রতিভাবান নৃপতি ছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি দিমারুয়ার রাজা প্রভাকরকে ঘোরতর যুদ্ধে পরাজয় করতঃ ধৃত করেন। প্রভাকর উপয়ান্তর রহিত হইয়া নিজ সংরক্ষক ব্রহ্মপুর (হৈড়ম্ব) পতি শত্রুদমনের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তদনুসারে প্রভাকরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য শত্রুদমন প্রথমতঃ জয়ন্তীয়া-পতির নিকট পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না; তখন তিনি ধনমাণিকের বিরুদ্ধে রণনিপুণ একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জয়ন্তীয়া পতিও তাঁহাদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু সসৈন্য কাছাড়ী সৈন্যের সহ্য করিতে পারিল না, ধন মাণিক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন এবং সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

উভয়ের মধ্যে সন্ধির সর্ত্ত অবধারিত হইল, ধন মাণিক শত্রুদমনকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন ও নিজ দুহিতৃদ্বয়কে তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। কেবল তাহাই নহে, নিজ ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী যশোমাণিককে প্রতিভূস্বরূপ ব্রহ্মপুরে প্রেরণ করিতে হইল।

বলা আবশ্যক যে, জয়ন্তীয়া রাজ-পরিবারের মধ্যে বিবাহ প্রথার প্রচলন যাই, এজন্য ভাগিনেয়ই রাজ সিংহাসনের অধিকারী হইতেন। জয়ন্তীয়া-পতিগণ হিন্দু ধর্ম্মাশ্রিত হইলেও, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষাচরিত এই পার্ব্বত্য রীতি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। অতএব ধন মাণিক মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৬১২ খৃষ্টাব্দ)।

যশোমানিক ও প্রতাপ সিংহ

ধনমাণিকের মৃত্যুর পর "শত্রুদমন" যশোমাণিককে মুক্তি প্রদান করিলে, তিনি জয়ন্তীয়াপুরে আগমনপূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করেন ও পূর্ব্ব অপমানে প্রতিশোধ লইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি ইহার এক সহজ উপায় বাহির করিলেন। তাঁহার কন্যা অতি সুন্দরী ছিলেন, সেই কন্যা তিনি তদানীন্তন আহোমরাজ প্রতাপ সিংহকে (বুড়া রাজা বা সুসেংফা) প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কথা রহিল যে, হৈড়ম্বরাজ্যের ভিতর দিয়া সেই কন্যাকে লইতে হইবে। গ্রন্থান্তরে[১৫] বর্ণিত হইয়াছে যে, যশোমাণিক এই কন্যাকে তৎপূর্ব্বে ব্রহ্মপুর (হৈড়ম্ব) পতিকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, প্রতাপসিংহ যশোমাণিকের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজা শত্রুদমনের নিকট দূত প্রেরণপূর্বক, তাঁহার রাজ্যাভ্যন্তর দিয়া জয়ন্তীয়া রাজকুমারীকে সসৈন্যে লইয়া যাইতে চাহিলেন।

প্রতাপসিংহের পরাজয়

শত্রুদমন ইহাতে সম্মত হইলেন না, তখন উভয়ে যুদ্ধ বাঁধিল (১৬১৮ খৃষ্টাব্দ)। প্রথম উদ্যমে ধরম টীকানামক স্থানে হৈড়ম্ব-সৈন্য পরাভূত হয়; বহুতর বল্লম, বন্দুক ও তরবারি

১৪. "It is said that one of the Conditons imposed on him was that he should not in future strike coins in his own name"
-Gait's History of Assam. Chap. IV, P. 51.

১৫. Report on the progress of the Historical Researches in Assam-1897. P. 18.

প্রভৃতি অস্ত্রাদি আহোম সেনাপতি হস্তগত করেন। জয়ান্তে সুন্দর গোসাঞি নামক সেনাপতিকে রহা দুর্গে রাখিয়া আহোমপতি নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন। প্রতাপসিংহ অধিকাংশ সৈন্য লইয়া চলিয়া গেলে, একদা রাত্রিযোগে শত্রুদমনের ভ্রাতা তদীয় সেনাপতি ভীমদর্প বা ভীমবল ভীমবেগে রহা দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এই অতর্কিত প্রবল আক্রমণ আহোম-সৈন্য রোধ করিতে পারিল না, অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হইল ও অবশিষ্টেরা পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ বাঁচাইল। এই কীর্ত্তি স্থায়ী করণোদ্দেশে শত্রুদমন নিজ রাজধানী মাইবঙ্গের নাম কীর্ত্তিপুর রাখেন, এবং প্রতাপসিংহের পরাভবকারী বলিয়া নিজে প্রতাপনারায়ণ নাম করেন।[১৬] বার্ষিক বিংশতি সংখ্যক দাস ও নয়টি অশ্ব করস্বরূপ আহোমরাজকে দেওয়ার যে নিয়ম ছিল, এই সময় হইতে তাহা রহিত হয়।[১৭]

কথিত আছে, যশোমাণিক শত্রুদমনের এই বিজয়ের পর কোচবিহার করিয়াছিলেন, এবং পশ্চিম কোচরাজ্যের অধীশ্বর লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার পানি গ্রহণ করতঃ, ইহার সেবা পরিচালনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়েছিলেন।[১৮]

জয়ন্তেশ্বরী মূর্ত্তি

শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড পরগণায় জয়ন্তেশ্বরী সম্বন্ধে কিন্তু অন্যরূপ প্রবাদ শুনা যায়। সুরমানদীর উত্তর তীরবর্ত্তী ভূভাগ প্রায়ই জয়ন্তীয়াপতির অধিকারে ছিল, এমন কি ইংরেজাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও দক্ষিণকাছ পরগণা জয়ন্তীয়া রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ গণ্য হইত; জয়ন্তীয়ার সীমা কখন কখন আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইত। পঞ্চখণ্ড পবগণা পর্য্যন্ত কোন সময় জয়ন্তীয়ার সীমা বিস্তৃতি হইয়াছিল কি না বলা যায় না; কিন্তু তত্রত্য সুপাতলা গ্রামে দুর্গাদলই নামে জয়ন্তীয়ার জনৈক কর্ম্মচারী বাস করিতেন বলিয়া জানা যায়। দুর্গাদলইর দীঘী এখনও উক্ত গ্রামে জঙ্গলাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। কথিত আছে, এই দীর্ঘ খননকালে দু'খানা মূর্ত্তি পাওয়া যায়; একখানা বিষ্ণুমূর্ত্তি, ইহাই পঞ্চখণ্ডের বাসুদেব। দ্বিতীয়খানা দুর্গামূর্ত্তি। তাহা দলই কর্ত্তৃক জয়ন্তীয়ায় প্রেরিত হয়। কিন্তু এই মূর্ত্তি জয়ন্তেশ্বরীর মূর্ত্তি না হইয়া গৌরীশঙ্কর বা অন্য কোন প্রস্তরমূর্ত্তি হওয়াই সম্ভব। ধাতুমূর্ত্তি বহুকাল মাটীর নীচে অবিকৃত অবস্থায় থাকা সম্ভাবনীয় নহে।

সুন্দর রায় ও ছোটপর্ব্বত রায়

যশোমাণিকের মৃত্যুর পর (১৬২৫ খৃষ্টাব্দ) সুন্দর রায় জয়ন্তীয়ার সিংহাসনে উপবেশন করেন; তিনি ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জয়ন্তীয়া শাসন করেন বলিয়া কথিত হয়। ইঁহার মৃত্যুর পর ছোটপর্ব্বত রায় রাজা হন; তাঁহার রাজত্বকাল ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই দুই রাজার বিবরণ কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ তাঁহাদের রাজত্ব সময়ে কোনরূপ বিগ্রহাদি স্মরণীয় ঘটনা উপস্থিত হয় নাই।

১৬. -Gait's History of Assam. Chap. IV, and X. P. P. 104, 248.

১৭. "From that date, the Kacharis ceased to pay the tribute of Nine ponies and twenty slaves which they had formerly given to the Ahoms.
-Report on the Progress of the Historical Researches in Assam.-1897. P. 18.

১৮. It is said that he brought back with him the image of Jaintesvari, which was thenceforth worshipped with great assiduity at Jaintiapur"
-Gait's History of Assam. Chap. XI, P. 51.

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহোম বিজয়

যশোমন্ত রায়

পূর্ব্বাধ্যয়ে বর্ণিত ছোট পর্ব্বতরায়ের মৃত্যুর পরে তদীয় উত্তরাধিকারী যশোমন্তরায় ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। আহোমদের অধিপতি নরিয়া রাজা (সুতিনফা) ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে (রাজ্যাধিকারের পরেই) তৎসন্নিধানে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক তৎসহ মিত্রতা স্থাপন করেন। দুঃখের বিষয় রাজনৈতিক মৈত্রী অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না।

একটী আহেমপ্রজা জয়ন্তীয়ায় বাণিজ্যের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে জয়ন্তীয়া রাজ্যে প্রবেশ করিলে,–কি কারণে বলা যায় না, ধৃত ও বন্দীকৃত হয় এবং তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। নরিয়া রাজা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, রাজা যশোমন্ত রায়কে ইহা জানাইলে, যদিও সে ব্যবসায়ীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা যায় নাই। এই ঘটনায় উভয়রাজ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, উভয়রাজ্যের পার্ব্বত্য পথ গুলি বন্ধ করা হয়, এবং জয়ন্তীয়ার কতিপয় ব্যবসায়ীকে যুবরাজ জয়ধ্বজ (সুতামলা) ধৃত করতঃ কারারুদ্ধ করেন। এই বিরোধ আট বৎসর কাল চলিয়াছিল; তৎপর উভয় রাজ্যে পুনরায় মৈত্রী স্থাপিত হয়।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজা যশোমন্তের পৌত্র প্রথম রায় বিদ্রোহ উত্থাপন করেন; কিন্তু তাহাতে কিছুই হয় নাই। ইহার দুই বৎসর পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাণসিংহ ও জয়ন্তীমুদ্রা

যশোমন্তরায়ের মৃত্যুর পর বাণসিংহ (১৬৬০ খৃষ্টাব্দে) রাজা হন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে যখন আহোম নৃপতি চক্রব্বজ (সুপাং মাং) সিংহাসনারোহণ করেন, সেই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া বাণসিংহ তৎসহ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। জয়ন্তীয়ায় প্রাচীনকাল হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হইত, কোচরাজ নরনারায়ণের অনুজ্ঞানুসারে জয়ন্তীমুদ্রাতে রাজগণের নাম মুদ্রণের প্রথা রহিত হয়, বলা গিয়াছে। জয়ন্তীয়ারাজ বাণসিংহের রাজত্বকালের যে একটা মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, তাহাই ইহার প্রমাণ। জয়ন্তীয়ার স্থানীয় ভাষায় এই মুদ্রাকে "কাটরা টাকা" বলে। টাকার একদিকে তরবারি (কাটারি) চিহ্ন অঙ্কিত থাকায় ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। যে কথা বলা যাইতেছে, উহার সম্মুখভাগে "শ্রীশ্রীজয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য ১৫৯১" এবং বিপরীতদিকে "শ্রীশ্রীরঘুনাথ পাদপদ্ম পরায়ণস্য" মুদ্রিত আছে। এই মুদ্রা হইতে রাজার ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিচয়ও পাওয়া যায়। তিনি রাম উপাসক না হইতে মুদ্রায় রঘুনাথের নাম মুদ্রিত হত না।[১] ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

---

১. অথবা রঘুনাথ নামক কেহ রাজগুরু ছিলেন, এবং তাহার নামই "কাটরা টাকায়" মুদ্রিত হয়, ইহাও কল্পনা করা যাইতে পারে। জয়ন্তীপুরকে তদ্দেশে কথ্য ভাষায় "জয়ন্তাপুর" বলা হয় বলিয়াই মুদ্রাতে "জয়ন্তাপুর" নাম মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

প্রতাপসিংহ ও লক্ষ্মীনারায়ণ

বাণসিংহের পরবর্ত্তী রাজা প্রতাপসিংহ। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (সম্ভবতঃ) তিনি জয়ন্তীয়ার রাজসিংহাসনে ছিলেন; ইঁহার রাজত্ব বিবরণ কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না। ইঁহার পরে লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। গেইট সাহেব কৃত আসামের ইতিহাসে ইঁহার রাজত্বকাল ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। তিনি জয়ন্তীয়াপুরে যে এক রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আছে। ইহার দ্বারদেশে সংলগ্ন প্রস্তর লিপিতে "১৬৩২" শক অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু (১৬৩২ শক) ১৭১০ খৃষ্টাব্দ ইঁহার সময়ের অনেক পরবর্ত্তী বলিয়া গেইট সাহেব অনুমান করেন যে, ১৬০২ শকই বিশুদ্ধ পাঠ। যাহা হউক, এ প্রস্তর-লিপি ১৬৩২ শকে, পরবর্ত্তী রাজা কর্ত্তৃক তথায় যে সংলগ্ন হয় নাই, তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

অন্যত্র২ উল্লেখ আছে যে, আহোমরাজ চক্রধ্বজ (সুপাং মাং) এবং উদয়াদিত্যের (সুনাট ফা) সহিত লক্ষ্মীনারায়ণের রাজনৈতিক পত্রাদির আদান প্রদান চলিত। উদয়াদিত্য লক্ষ্মীনারায়ণের সাময়িক রাজা হইলেও চক্রধ্বজ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা ছিলেন; "আসামের বুরঞ্জী" হইতে তাহা জানিতে পারা যায়।

লক্ষ্মীনারায়ণের পরে রামসিংহ জয়ন্তীয়ার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬৯৪ হইতে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইঁহার রাজত্বকাল। প্রতারণা পূর্ব্বক পর সম্পত্তি গ্রাস করিতে প্রয়াস পাইলে কিরূপ প্রতিফল পাইতে হয়, তদুদাহরণে ইঁহার কাহিনী পূর্ণ।

কাছাড়রাজের প্রতি জয়ন্তীয়াপতির চাতুর্য্য

কাছাড়রাজ তাম্রধ্বজের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে হৈড়ম্ব (কাছাড়) পতিগণ আসামের আহোম নৃপতির করপ্রদ রাজা স্বরূপ ছিলেন। তাম্রধ্বজ কর প্রদান করা রহিত করেন। ইহাতে আহোম রাজ রুদ্রসিংহ (সুক্রংফা) ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের শেষাংশে কাছাড়রাজ্য আক্রমনার্থ দুইদল সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয় দলে প্রায় সপ্ততি সহস্র সৈন্য ছিল। একদল সৈন্য রহা দুর্গের পথে এবং অপর দল ধনশিরী (ধনশ্রী) নদীতীর পথে ধাবিত হয়। ইহারা অতি সহজেই কীর্ত্তিপুর (মাইবঙ্গ) অধিকার করিল। তাম্রধ্বজ পলায়নপূর্ব্বক কাছাড়ের সমতলস্থিত খাসপুরে গমন করেন।

জয়ন্তীয়াপতি রামসিংহের সহিত তাম্রধ্বজের প্রীতিবন্ধন ছিল; খাসপুর আসিয়াই তিনি সত্বর রামসিংহের সহায়তা প্রাপ্তের প্রত্যাশায় তৎসকাশে দূত পাঠাইলেন। এদিকে জ্বর ও আমাশয় পীড়া সংক্রামক ভাবে আহোম সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলে, তাহারা কাছাড় পরিত্যাগ করতঃ চলিয়া গেল। অতঃপর রাম সিংহের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যক নাই, ভাবিয়া তাম্রধ্বজ তাহাকে জানাইলেন। কিন্তু তিনি অবসর ত্যাগের পাত্র ছিলেন না, তাই সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া খাসপুরে আগমন করিলেন। ত্রিপুরার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে–"জয়ন্তীয়ারাজ একখানি উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ নৌকা প্রস্তুতপূর্ব্বক তদারোহণে খাসপুরে গমন করেন। তিনি মহারাজ তাম্রধ্বজকে বলিলেন, "বন্ধো! আমি এই নৌকা আপনার জন্য প্রস্তুত করাইয়াছি, আসুন আমরা উভয়ে ইহাতে একবার আরোহণ করি"। সরলচিত্ত তাম্রধ্বজ সেই নৌকায় আরোহণ করিলে, কপটমিত্র জয়ন্তীয়াপতি তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক বরবক্রের প্রবল স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। কাছাড়-পতির সৈন্যগণ আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে ধনুর্ব্বাণ হস্তে

২. "Report on the Progress of the Historical Researches in Assam-1897. P. 18.



জৈন্তীয়া রাজ্যের মুদ্রা
(দ্বিতীয় ভাগ-চতুর্থ খণ্ড)



কাছাড় রাজ্যের মুদ্রা
(উপসংহার)

দণ্ডায়মান হইল। তাম্রধ্বজ হস্তসঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। জয়ন্তীয়া-পতি স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া কাছাড়পতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তাম্রধ্বজের পত্নী রাণী চন্দ্রপ্রভাবতী জয়ন্তীয়ারাজের বিশ্বাসঘাতকতা ও সমস্ত অবস্থা বর্ণন পূর্ব্বক আসামের অধিপতি স্বর্গদেবের[৩] সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।[৪]

রামসিংহ এই সময় কাছাড়ের অনেক স্থান নিজরাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বুন্দাশীল ও ইচ্ছামতী দুর্গ এই সময় আক্রান্ত ও পরিগৃহীত হইয়াছিল। গেইট সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাম্রধ্বজ নিজেও স্বর্গদেবের নিকট, জনৈক ধর্ম্মাচার্য্য দ্বারা পূর্ব্ব অবাধ্যতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।[৫]

আহোম সৈন্যের জয়ন্তীয়া আক্রমণ

কাছাড়-রাজ মহিষীর প্রার্থনানুসারে আহোমরাজ রুদ্রসিংহ, তাম্রধ্বজকে সত্বর মুক্তি দেওয়ার জন্য রামসিংহকে, তদীয় সামন্ত গোভা নাম স্থানের আহোম রাজকর্ত্তৃক জানাইলেন। রামসিংহ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ইহাতে রুদ্রসিংহ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। প্রথমেই গোভার বাজার বন্ধ করা হইল, তৎপর ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের প্রথমাংশে ত্রিচত্বারিংশৎ সহস্র (৪৩০০০) সৈন্যসহ সেনাপতি বড়বড় য়া কপিল উপত্যকা পথে জয়ন্তীয়াপুর অবরোধ করিতে ধাবিত হইলেন। দ্বিতীয় একদল সৈন্য সেনা-নায়ক বড়ফুকনের অধীনে গোভার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল।

জয়ন্তীয়ার অন্তর্গত বালেশ্বর. ধলাগাও, ও মূলা গোল স্বল্পায়াসেই অধিকৃত হইল। বড়বড়ুয়া মূলাগোল হইতে জয়ন্তীয়া-পতির নিকট এক দূত পাঠাইয়া, তাম্রধ্বজকে অর্পণ করা হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। রামসিংহ তাঁহাকে এবং বড় ফুকন্‌কে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন এবং স্থানে স্থানে কামান পাতিয়া রাখিলেন। কিন্তু যখন বিরাট আহোম বাহিনী সন্নিকটবর্ত্তী হইল, নগরে আতঙ্কের উচ্ছ্বাস উঠিল, অন্তঃপুর মধ্য হইতে বিলাপধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, তখন তাঁহার সাহস ও রণোৎসাহ চলিয়া গেল। তিনি মূল্যবান ধনরত্ন ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া পলায়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

জয়ন্তীয়ার সম্ভ্রান্ত সর্দ্দারগণ ইহা জানিতে পারিলেন এবং রাজাকে নিষেধ করিলেন। তাঁহাদিগকে আক্রমণকারীর অত্যাচারের লক্ষীভূত রাখিয়া পলায়ন করিতে, রামসিংহকে তাঁহারা দিলেন না;–আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন।

রামসিংহ উপায়ান্তর বিহীন হইয়া বিংশতি সংখ্যক হস্তী উপহার সহ বড়বড় য়ার শিবিরে চলিলেন। শিবিরে পৌছিলে তাঁহাকে হস্তী হইতে অবতরণ করিতে হইল; তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ সেনাপতির বস্ত্রাবাসে উপস্থিত হইলেন।

বড়বড়ুয়া সসম্মানে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর জয়ন্তীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেওয়া হইল না।

প্রজাদের গোলযোগ ও জয়ন্তীয়াজয়

এদিকে রামসিংহকে রাজধানী আসিতে না দেওয়ায়, জয়ন্তীয়ার সম্ভ্রান্ত সর্দ্দারগণ ব্যথিত ও বিচলিত হইলেন, এবং বড়ফুকন চালিত আহোম সৈন্যকে ক্রমাগত দুইবার আক্রমণ করিলেন।

---

৩. দেবরাজ ইন্দ্রবংশজ আহোমরাজগণ স্বর্গদেব উপাধি দারণ করিতেন।

৪. শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস ৩য় ভাগ ১ম অধ্যায় ২৬১ পৃষ্ঠা।

৫. Gait's History of Assam. Chap. XI. P. 258.

দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই আক্রমণ ফলপ্রদ না হওয়ায় তাঁহাদিগকে নিজ হতাহত সৈন্য লইয়া ফিরিতে হইল। অবশেষে জয়ন্তীয়াবাসিগণ বুড়ীটিকর পাহাড়ে নববলের সহিত বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিল, এবং নিজেদের পূর্ব্ব প্রস্তুত কয়েকটী অস্থায়ী দুর্গে নিরাপদে অবস্থান করিতে লাগিল।

আহোম সৈন্যগণ পথের দুর্গমতায় ও এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণ বশতঃ পরিশ্রান্ত হইয়া নব সাহায্যের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাঁহাদের সাহায্যকারী সৈন্য আসিয়া পৌঁছিলে, তাহারা সহজেই জয়ন্তীয়াবাসীদিগকে তাড়াইয়া দিল। বিতাড়িত জয়ন্তীয়াবাসীগণ বড়পাণি নদীতটস্থ আটক বা অস্থায়ী দুর্গে আসিয়া জানাইল যে, আহোম সৈন্য গোভায় চলিয়া গেলে, তাহারা তাম্রধ্বজকে প্রত্যর্পণ করিবে। বড়ফুকন একথা গ্রাহ্য করিলেন না এবং তত্রত্য অস্থায়ী-দুর্গ আক্রমণ করতঃ হস্তগত করিলেন। এই সময় বড়বড়ুয়া জয়ন্তীয়াপুরে পৌঁছিয়াছেন, সংবাদ পাইয়া, তৎসহ সম্মিলিত হইতে তিনি ত্বরিত পদে ধাবিত হইলেন।

জয়ন্তীয়া অধিকৃত হইল। রুদ্রসিংহ, হৈড়ম্বরাজ তাম্রধ্বজ ও জয়ন্তীয়াপতিকে তাঁহার নিকট প্রেরণের আদেশ দিলেন। তদনুসারে হৈড়ম্বরাজ মাইবঙ্গ পথে এবং রামসিংহ জয়ন্তীয়ার পার্ব্বত্যপথে প্রেরিত হইলেন। রুদ্রসিংহের আদেশানুসারে জয়ন্তীয়া-পতির ধনরত্ন, অস্ত্রশস্ত্র, গজবাজি, তৎসকাশে নীত হইল এবং অপর সম্পত্তি সৈন্যগণ মধ্যে বিতরীত হইল। জয়ন্তীয়া ও কাছাড়রাজ্য আহোমরাজ্যের অঙ্গীভূত করা হইল। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এই বিষয় ঘোষণা করা হয়। রুদ্রসিংহ এই রাজনৈতিক সংবাদ শ্রীহট্টের (গৌড়ের) তদানীন্তন ফৌজদার মতিউল্লা বাহাদুরকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

প্রজাদের পুনরাক্রমণ ও আহোমদের পরাজয়

এদিকে জয়ন্তীয়ার অধিবাসিগণ ইহাতে আরও উত্তেজিত হইল। রাজাকে হিন্দু প্রজা দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করে। সেই রাজা পর শিবিরে বন্দী, ইহা তাহাদের একান্ত অসহ্য। তাহারা নিজ অধিপতির উদ্ধার কল্পে প্রাণান্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা জয়ন্তীয়ার সামন্ত-নৃপতি খাইরামাধিপতি বড় দলকেই স্বমতে আনয়ন করিল এবং দুইশত খাসিয়াপল্লীর অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত ও অনুসঙ্গী করিয়া শেষ চেষ্টায় বৃত হইল।

রামসিংহ আহোমদের দ্বারা গোভায় নীত হইয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট সৈনিক বেষ্টনে, সতর্কভাবে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল। জয়ন্তীয়ার প্রজাগণ তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিল না বটে, কিন্তু বড়ফুকনের বিজিত অষ্ট দুর্গের মধ্যে তিনটী প্রথমেই পুনরাধিকৃত হইল। জয়ন্তেশ্বরীর মূর্ত্তি অহোমগণ লইয়া গিয়াছিল, তাঁহারও উদ্ধার করা হইল। অহোম সেনা-নায়ক বহু চেষ্টা করিয়াও সংগ্রাম জয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বহুতর অহোমবীর রণশায়ী হইল; ইহাতে অবশিষ্টেরা চকিত, শঙ্কিত ও ছত্রভঙ্গ ক্রমে পলায়িত হইতে লাগিল; এবং অবশেষে পশ্চাদ্ধাবিত জয়ন্তীয়াপুরিগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইল।

এই পরাজয় সংবাদ প্রাপ্তে রাজা রুদ্রসিংহ অন্যতর সেনানায়ক বুড়া গোসাঞির অধিনায়কত্বে আরও চারি সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহারা আসিয়া পৌঁছিলে সংমিলিত সৈন্যগণ জয়ন্তীয়াপুরিদিগকে আক্রমণ করিল।

জয়ন্তীয়াবাসিগণ "বেগতিক" দেখিয়া সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইল না, কিন্তু শিবিরে প্রত্যাগমণ কালে ছাউনির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাদি দগ্ধ করিয়া দিল।

তৃতীয় অধ্যায়
পরবর্ত্তী কীর্ত্তি

জয়নারায়ণ ও হাটকেশ্বর

রাম সিংহের উত্তরাধিকারী জয়নারায়ণ তাঁহার মৃত্যুর পরেই সিংহাসনারোহণ করেন। রাজকোষে একান্ত অর্থাভাব দর্শনে তিনি প্রথমেই টাকা প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার রাজ্যারোহণ কালের একটা টাকা পাওয়া গিয়েছে। ইহার সম্মুখ দিকে "শ্রীশ্রীজয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শাকে ১৫৯২" এবং বিপরীত দিকে "শ্রীশ্রীশিব চরণ কমল মধুকরস্য।" এইরূপ লিখিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর বৎসরে মুদ্রিত আর একটা "কাটরা টাকা" মিলিয়াছে; তাহারও উভয়দিকে পূর্ব্বোক্তরূপ এবং শক সংখ্যা ১৬৫৩ মুদ্রিত আছে।

রাজা জয়নারায়ণের সময়ে শ্রীহট্টের চুড়খাইড় পরগণার সেন গ্রাম নিবাসী আগমবাগীশ উপাধি-ধারী জনৈক বিপ্র হাটকেশ্বর মহাদেবকে জয়ন্তীয়ার বড়হাওর নামক স্থান হইতে নিজগ্রামে আনয়ন ও স্থাপন করেন।

হাটকেশ্বর শিব শ্রীহট্টের হিন্দুরাজা গোবিন্দের পূজিত দেবতা। যখন শ্রীহট্টে যবনগণ প্রবিষ্ট হয়, যখন শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ প্রভৃতি দেবস্থান সংগোপিত করিয়া, বিপ্লবের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা হয়, তখন এই প্রাচীন শিব প্রান্তবর্ত্তী হিন্দুরাজ্য জয়ন্তীয়ার জঙ্গলাচ্ছাদিত প্রান্তরে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক আনীত ও রক্ষিত হন।

এই শিব রাজা জয়নারায়ণের সময়ে আগমবাগীশ কর্ত্তৃক সেনগ্রামে নীত হইলে, রাজা তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে সেনগ্রামে আগমন করেন। চুড়খাইড় সম্ভবতঃ তৎকালেই জয়ন্তীয়া রাজ্যের অধীন করা হয়। জয়ন্তীয়ার শেষ নৃপতি রাজেন্দ্র সিংহের সময় পর্য্যন্ত ইহা জয়ন্তীয়ার অধীন ছিল। সেন গ্রামে পৌঁছিয়া রাজা আগমবাগীশকে শিব আনয়নের বিষয় জিজ্ঞাসিলে তিনি ভীত হইলেন ও বলিলেন যে ইচ্ছা করিলে মহারাজ মহাদেবকে পুনঃ জয়ন্তীয়াপুরে লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু শিব আর স্থানান্তরিত হইলেন না এবং আগমবাগীশকে তাঁহার সেবায়েত নিযুক্ত করা হইল। হাটকেশ্বরের বিশেষ বিবরণ ভৌগলিক-বৃত্তান্ত ভাগে ৯ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

জয়নারায়ণ ও শূরদর্প নারায়ণ

কাছাড়-প্রতি তাম্রধ্বজের পুত্র শূরদর্প নারায়ণ ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে নয় বৎসর সিংহাসনারোহণ করেন। জয়নারায়ণেরও সিংহাসনারোহণ কাল তাহাই। শূরদর্প নারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জয়নারায়ণ আহোম-পতির রক্ষাধীনে ছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার সহিত জয়ন্তীয়াপতির বিরোধ উপস্থিত হয়। উভয়েই স্ব স্ব পূর্ব্ববর্ত্তীর ন্যায় পরস্পরের অহিত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বিবাদের প্রকাশ্য কারণ, একটি অতি জঘন্য ঘটনা। ত্রিপুরার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে, "জয়ন্তীয়া-পতির ভ্রাতা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর কলুষিত প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করেন। সেই পাপিষ্ঠ ও পাপীয়সীর আশ্রয়দাতা বলিয়া জয়ন্তী-রাজ কাছাড়-পতির

প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করেন। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে জয়ন্তীয়াপতির ভ্রাতা স্বীয় প্রণয়িণী ও সহচরবর্গের সহিত দুরাক্রম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রবাদ অনুসারে জয়ন্তীয়া-পতির ভ্রাতা ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী অঙ্গমী নাগা সরদারগণের আদি পিতামাতা। তাঁহাদের অনুচরবর্গ ও অন্যান্য নাগাজাতির সংযোগে পরাক্রমশালী অঙ্গমী নাগাদিগের উৎপত্তি। প্রবল সংগ্রামে কাছাড়পতি পরাজিত হন। জয়ন্তীয়া-রাজ কর্ত্তৃক মাইবঙ্গ নগরী বিনষ্ট হয়। কাছাড়পতি বর্তমান কাছাড় প্রদেশে উপনীত হইয়া খাসপুরে রাজপাট স্থাপন করেন।"[১] শূরদর্প নারায়ন আহোম নৃপতির আশ্রিত ছিলেন, সুতরাং তিনি "আসামপতির সাহায্যে জয়ন্তীয়া বিনষ্ট করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু অকাল-মৃত্যু দ্বারা তাঁহার সমস্ত উদ্যোগ বিফল হইয়াছিল।"[২]

বড় গোসাঞি (দ্বিতীয়)

জয়নারায়ণের মৃত্যুর (১৭৩১ খৃষ্টাব্দ) পর বড় গোসাঞি (দ্বিতীয়) সিংহাসনারোহণ করেন। এই সময়ের একটি সিকি মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তাহার সম্মুখদিগকে "শ্রীশ্রীরাজা বড় গোসাঞি" এবং বিপরীত দিকে "সিংহ বাহাদুরস্য–১৬৫৩" এইরূপ লিখিত আছে। সুতরং "রাজা বড় গোসাঞি সিংহ বাহাদুরের" সিংহাসনারোহণ কাল ১৭৩১ খৃষ্টাব্দের পরে হইতে পারে না। তাঁহার নামাঙ্কিত ১৬৯২ শতাব্দীয় একখানা তাম্রপত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতএব ১৭৩১ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশবর্ষ কাল ব্যাপিয়া তিনি রাজ্যশাসন করেন, ইহা নিঃসংশয়িতভাবে বলা যাইতে পারে।

এইরূপ কথিত আছে যে, এক সময় বড় গোসাঞি এবং তাঁহার ভগ্নী গৌরী কুয়রীকে সামন্তরাজ খাইরামের "সিম্" (অধিপতি) ধৃত করিয়া নিয়াছিলেন। অবশেষে চেরাপুঞ্জির সিম্ অমরসিংহের প্রেরিত এক ব্যক্তির সহায়তায় তাঁহারা বিমুক্ত হন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ দুইখানা বৃহৎ গ্রাম তদীয় রাজ্য ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

চেরারাজের বংশধরগণ স্থলপ্রদেশে, আঙ্গাজোর ও ফতেপুর নামক উক্ত দুইগ্রাম অদ্যাপি লাখেরাজ ভোগ করিতেছেন।

কি কারণে বলা যায় না, ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কতকটি সৈন্য ও সর্দ্দারগণসহ আহোম রাজ্যের সীমার সন্নিকটে গিয়াছিলেন। পরে রহাগামী ক্ষুদ্র আহোম সৈন্যদলের উপস্থিতিতে বিস্মিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন।

ইহার পরে, বড় গোসাঞি ও তাঁহার পত্নী রাণী কাশ্বাসতী হরেকৃষ্ণ উপাধ্যায় নামক ব্রাহ্মণ হইতে ঈশ্বরোপাসনার জন্য মন্ত্র গ্রহণ করেন। বড় গোসাঞি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ পরগণা সাতবাক-নয়ামাটি মৌজা হইতে সিংহমোহরাঙ্কিত তাম্রপত্রে ৬০/ হাল ভূমি এবং কাশাসতী দেবীরাজ অভিমতে পরগণা বাজেরাজ–ধনপুর মৌজা হইতে ৩০/হাল ভূমি গুরুকে ব্রহ্মত্র দান করেন।

কালীস্থাপন ও সন্ন্যাসগ্রহণ

কথিত আছে, বড় গোসাঞির সময়ে নিজপাটের প্রসিদ্ধ কালীমূর্ত্তি স্থাপিত হন। প্রাচীর বেষ্টিত বাটীকায় সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়া, তাহাতে এই কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কালীর এরূপ মাহাত্ম্য ছিল যে, কোন ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াও কালী বাড়ীতে আশ্রয় লইতে পারিলে দণ্ড হইতে মুক্ত হইত। এই কালীর অর্চ্চনার জন্য লীলাপুরী নামক এক সন্ন্যাসী যুবককে নিযুক্ত করা হয়। লীলাপুরীর মহিমার কথা অধিক বলিবার আবশ্যক করে না,

১. শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপরার ইতিহাস ৩য় ভাগ ১ম অধ্যায় পৃষ্ঠা ২৫৫।
২. শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপরার ইতিহাস ৩য় ভাগ ১ম অধ্যায় পৃষ্ঠা ২৬১।

তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও উপদেশে মোহিত হইয়া বড় গোসাঞি ব্রহ্মপুরী হইতে সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করতঃ সন্ন্যাসী হন। (১৭৭০ খৃষ্টাব্দ।) সন্ন্যাসী হইলে তাঁহার নাম "রাজপুরী" রাখা হয়। এই সময় তিনি খরিল পরগণায় ষোলহাল জমিসহ নিজপাটের কালীবাড়ী উক্ত লীলাপুরীকে দান করেন। এই ভূমি তাঁহার ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয় এবং উত্তরাধিকারী ছত্রসিংহ, মন্ত্রী উমন্‌পনর ও সেনাপতি মাণিক্যরায়ের অভিমতে প্রদত্ত হয়।[৩] এই "অভিমতি" গ্রহণ করায় বোধ হয় যে, তখন রাজ্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। সরকারী কাগজপত্রে দৃষ্ট হয় যে, সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরেই এই ভূমি প্রদত্ত হয়। ইহাও জানা যায় যে বড় গোসাঞি (রাজপুরী) হইতে আত্মাপুরী সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৪]

বড় গোসাঞির দান অনেক পরগণাতেই দৃষ্ট হয়। বর্ণফৌদ ও বাউরভাগ পরগণার ঝিঙাবাড়ী ও দলইর কান্দিতে তিনি কালীর সেবা পরিচালনার্থ যে ভূমি দান করেন, তাহা অদ্যাপি উক্ত কালীবাড়ীর নিষ্কর মহাল রূপে আছে।[৫] দেবত্র ও ব্রহ্মত্র ব্যতীতও তাঁহার ভূদানের বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। বিনন্দ রাম লস্কর নামক ব্যক্তিকে তিনি তিপরা খাল মৌজা হইতে কতক ভূমি "নিমকি" দান করিয়াছিলেন।[৬]

ছত্রসিংহ

বড় গোসাঞি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর ছত্রসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। শ্রীহট্টের কোন কোন অধিবাসীর উপর অত্যাচার করাতে, মেজর হেনিকার (Major Henniker) কর্ত্তৃক, ইহার রাজত্ব সময়ে জয়ন্তীয়া জয় করা হয়। পরে জয়ন্তীয়া-পতি অর্থদণ্ড দিয়া কোম্পানী বাহাদুরের তুষ্টি বিধান করিলে (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে) জয়ন্তীয়া রাজ্য বৃটিশ কবল হইতে বিমুক্ত হয়।[৭] ছত্রসিংহ রাজার, এই সময়কার (১৬৯৬ শাকাঙ্কিত) একটা কাটরা টাকা পাওয়া গিয়াছে। অর্থদণ্ড প্রদানে অর্থাভাব হওয়ায় ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দেই তৎকর্ত্তৃক যে কতক টাকা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা বলা যাইতে পারে।

৩. Report on the Progress of Historical Researches in Assam-1897. P. 1.

৪. জয়ন্তীয়ায় বৃটিশাধিকার স্থাপিত হইলে ভূমি বন্দোবস্তকালে মালীকগণ স্বত্বের যে প্রমাণ উপস্থিত করেন, তন্মধ্যে দয়ালপুরী সিংহমোহরাঙ্কিত যে সনদ দাখিল করেন, তাঁহার বিবরণ শ্রহিট্টের মহাফেজখানায় রক্ষিত, জয়ন্তীয়া প্রথম বন্দোবস্তের কাগজে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত কাগজের ৪র্থ ধারার ৩৯নং মোকদ্দমার বিবরণে লিখিত আছে–"দয়ালপুরী ১৬৯২ শকাব্দা সনের ১৭ই কার্ত্তিক সিংহ মোহরের তাম্রপত্র দাখিল করে। ইহাতে জানা গেল যে জয়ন্তার বড় গোসাইন রাজা লীলাপুরী সন্ন্যাসী হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মঠ মন্দির অর্থাৎ নিজপাট মৌজার কালীবাড়ী ও খরিল পরগণায় ১৬/ হাল জমি এই পত্র দ্বারায় লীলাপুরীকে দান করিয়াছিলেন। সে মতে লীলাপুরী ও তস্য শিষ্য আত্মাপুরীর মরণান্তর বাদীর গুরু গোবিন্দপুরী বাদীকে হিস্বায় রাখিয়া (?) মৃত্যু হওয়াতে তদবধি বাদী উক্ত মঠমন্দিরে দখলকার থাকিয়া প্রশংসিত দেবতার সেবা পূজা করিতেছে।"

৫. জয়ন্তীয়ার প্রথম বন্দোবস্তের কাগজ, পং বাউরভাগ। রোবকারি–সন ১২৪৭ বাংলা ১১ শ্রাবণ।

৬. জয়ন্তীয়ার প্রথম বন্দোবস্তের কাগজে ৩৫ নং মোকদ্দমার বিবরণে দৃষ্ট হয় যে ভবানী বড়দলইর পুত্র শ্যামরায় লস্কর, তাঁহার পিতামহ বিনন্দরাম লস্করের "নিমকি" স্বরূপ প্রাপ্ত তিনহালের ভূমের দাবি উপস্থিত করিয়াছিল! এই নিম্‌কি শব্দ হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে জয়ন্তীয়ায় যাহারা লবণ (নিমক) প্রস্তুত করিত, তাহারা পুরস্কার স্বরূপ ভূমি লাখেরাজ প্রাপ্ত হইত। আবার "লাখেরাজ" অর্থেও জয়ন্তীয়ায় "নিম্‌কি" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৭. Gait's History of Assam. Vol. XI. P. 261.

তৎকর্ত্তৃক খাজা খিদুরের স্ত্রী নমসবিবি নাম্নী রমণীকে "নিমকির জন্য" প্রায় কুড়ি হাল ভূমি লাখেরাজ দানের কথা জ্ঞাত হওয়া যায়।[৮]

যাত্রানারায়ণ ও বিজয়নারায়ণ

ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর যাত্রানারায়ণ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করতঃ পাঁচ বৎসর কাল রাজত্ব করেন বলিয়া, আমাদের জয়ন্তীয়া-বিবরণ প্রদাতা শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল লিখিয়াছেন; কিন্তু গেইট সাহেব লিখিত আসামের ইতিহাসে ইঁহার নাম লিখিত হয় নাই। এই গ্রন্থের "এ" পরিশিষ্টে জয়ন্তীয়া রাজগণের গুণাবলী লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ছত্রসিংহের পর রাজা বিজয়নারায়ণের রাজত্বকাল ১৭৮০ হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ১৭০৪। ৭ শতাব্দের দুইটি "কাটরা টাকা" পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও রাজার নাম লিখিত নাই।

রাণী কাশাসতী

বড় গোসাঞির বিধবা পত্নী রাণী কাশাসতী রাজপুরীর (বড় গোসাঞির) শিষ্য আত্মাপুরীকে বাজেরাজ পরগণাস্থ লামা গোবিন্দপুরে দেবত্র স্বরূপ ১৭১০ শকে পৌষ মাসে (১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ) সিংহমোহরাঙ্কিত তাম্রপত্রে ২৭/০ হাল ভূমি নিষ্কর দান করেন।[৯] এই ভূমি জয়ন্তীয়া-পতির অভিমতে প্রদত্ত হয়। অন্যত্র[১০] দেখিতে পাওয়া যায় ঐ কাশাসতী দেবীই লীলাপুরী সন্ন্যাসীর মঠস্থ কালীর সেবা পরিচালনার্থে রাজা বিজয়নারায়ণের অভিমতে ২৫/০ হাল জমি দান করেন। এই ভূমি ১৭১০ শকে প্রদত্ত হয়।

এতদ্দ্বারা দ্বিতীয় রামসিংহের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্ব অর্থাৎ ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নারায়ণের শাসনকাল বলা যাইতে পারে। এই দুই সেনাপতির শাসনকাল লইয়া আরও গোলযোগ দৃষ্ট হয়। গবর্ণমেন্ট রক্ষিত কাগজে[১১] লিখিত আছে, "জয়ন্তীর যাত্রানারায়ণ রাজা দেওয়ান মাণিক চন্দ্র রায়কে পং আড়াইখা সম্বন্ধিয় বগাবাড়ি মৌজা হইতে ২৩/।০ জমি ১৭১২ শতাব্দ সনের ২৫ ভাদ্র তারিখে সিংহমোহরের পত্র দ্বারায় দান করিয়াছিলেন।"[১২] ইহা হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দেও যাত্রানারায়ণের বিদ্যমানতা প্রমাণিত হইতেছে। এবং তাহাতে এই উভয়কে একব্যক্তি বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে।[১৩] গেইট সাহেবের আসামের ইতিহাসে রাজাদের নামাবলীতে এই জন্যই একটি নাম বিলোপ করা হইয়াছে। আমাদের জয়ন্তীয়ার বিবরণ প্রদাতাও, পাঁচ বৎসর মাত্র যাত্রানারায়ণের শাসনকাল লিখিয়া, পরে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নারায়ণের শাসনকাল বলিয়া লিখিয়াছেন।

---

৮. রোবকারি-সন ১২৪৭, -পং বর্ণফৌদ।

৯. জয়ন্তীয়া প্রথম বন্দোবস্তের কাগজ, রোবকারি-১২৪৭ বাংলা।

১০. Report on the progress of Historical Researches in Assam. p. 12.

১১. জয়ন্তীয়া প্রথম বন্দোবস্তের কাগজ, রোবকারি–১২৪৭ বাংলা-শ্রাবণ।

১২. অবিকল লিখিত হইল, বর্ণাশুদ্ধি পর্য্যন্ত রাখিয়া দিলাম। জয়ন্তী বা জয়ন্তীয়াপুর তদ্দেশে কথ্য ভাষায় "জয়ন্তাপুর" বলিয়া কথিত হয়।

১৩. এইরূপ অনুমান করিবার পক্ষে একটা সুবিধাও আছে। বাঙ্গালা ভাষায় বিজয়ও যাত্রা একার্থ প্রকাশক।
উদাহরণঃ–"বিজয় করিল নন্দে নন্দ ঘোষের বালা।
হাতেতে মোহন বাঁশী গলে বনমালা॥"–প্রাচীন পদ
এবংঃ–
"একেক দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতী।
জগন্নাথের বিজয় করায় করি হাতাহাতি॥"–শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

রামসিংহ (দ্বিতীয়)

রামসিংহ (দ্বিতীয়) ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ের একটা সিকিমুদ্রা ও একটা টাকা পাওয়া গিয়াছে। সিকি মুদ্রার রামসিংহ সম্মুখ দিকে "শ্রীশ্রী সিংহ নৃপবরস্য" এবং বিপরীত দিকে "শাকে ১৭১২" অঙ্কিত। টাকাও ঐ শকাব্দেই মুদ্রিত হয়, তাহারও সম্মুখদিকে পূর্ব্বরূপ এবং বিপরীত দিকে শকাব্দ অঙ্কিত আছে।

রামসিংহ অল্প বয়সেই সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন, তিনি সিংহাসনারোহণ করিয়াও নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। একখানা দানপত্র হইতে জানা যায় যে বিজয় মুন্সেফ নামক ব্যক্তি হইতে তিনি লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।[১৪]

ঢুপীর মঠ ও বিবিধ দান

রাজা রামসিংহের ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল, তিনি প্রথম যৌবনেই নিত্যানন্দ গোস্বামী নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষিত হন এবং ঢুপী নামক গ্রামস্থ্ প্রায় ৪০০ হস্ত উচ্চ একটি সুন্দর শৈলখণ্ডের উপর সুচারু শিল্প শোভিত এক উচ্চ-চূড় মন্দিরে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে রামেশ্বর নামক শিব স্থাপন করেন। শিবের সন্নিকটে একটা প্রস্তরময় বৃষ রক্ষিত হয়, এটিকে হঠাৎ সজীব বলিয়াই বোধ হইত। বিগত ভীষণ ভূকম্পে এই বৃষটি ও যে মন্দির চূড়া প্রায় দশ মাইল দূর হইতে দৃষ্ট হইত, তাহা বিচূর্ণিত ও ধরাশায়ী হয়। রামেশ্বরকে উদ্ধার করা হইয়াছে। কিন্তু বৃষটি এখনও ইষ্টক রাশির তলে শয্যাগত রহিয়াছে। এই মঠের নামই ঢুপীর মঠ।[১৫]

রাজা শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া রুকড়পুরী নামক সন্ন্যাসীকে তাঁহার সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করেন ও তৎসেবা পরিচালনার্থে বৌলখেল, জলডুবি খেল হইতে প্রায় ঊনবিংশতি হাল ভূমি দান করেন। ইহার পরেও তিনি এই মঠের জন্য দেবত্র দান করিয়াছিলেন; তিনি (১৭৩৫ শতাব্দের ২৫শে ফাল্গুন তারিখে, অর্থাৎ) ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পাঁচভাগ পরগণা হইতেও ১২৯/০ হাল ভূমি দান করেন।[১৬]

নিত্যানন্দ গোস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়াছি, এই গোস্বামীর উপদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা হয় এবং তিনি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ যুগলমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, এই নিত্যানন্দ গোস্বামীকেই তাঁহার অর্চ্চনাকার্য্যে নিয়োজিত করেন ও সেবা পরিচালনার জন্য

১৪. "রামসিংহ রাজা বিজয় 'মুনছিপ' হইতে বন্দুক ফয়ের করণের সঙ্কেত শিক্ষা করিয়া বৌলাখেল মৌজা হইতে দশকেয়ারি একহাত জমি সিংহমোহরের পত্র দ্বারা" দান করেন।-জয়ন্তীয়া প্রথম বন্দোবস্তের কাগজ, মোকদ্দমা নং ৩৭।৫৫।

১৫. জয়ন্তীয়ার প্রথম বন্দোবস্তের কাগজে দৃষ্ট হয় যে, জগন্নাথপুরী বাদী নামীয় ৬২ নং আপত্তির মোকদ্দমার বিবরণে প্রকাশ আছে ঃ-"রাজা রামসিংহ ঢুপী পর্ব্বতে শ্রীশ্রীরামেশ্বর শিব স্থাপন করিয়া বাদীর পরমগুরু কুকড়পুরী সন্ন্যাসীকে বৌলখেল মৌজা হৈতে তিন কেত্তা জমি মঠ মন্দির সহিত ১৭২০ সনের লিখিত সিংহমোহরের পত্র দ্বারায় দান করাতে রুকড় সন্ন্যাসী, ওপরবাদীর গুরু লীলাপুরী ইহার উপস্বত্ব ভোগদখল করে। ইহা প্রমাণিত হওয়াতে মোয়াজি ৬৷৷ জমি নিষ্কর বাহাল থাকা ও বাকি জমির প্রতি + + + (কীট ভক্ষিত) নিযুক্ত করা বিহিত হয়।"
ইহা হইতে রুকড়পুরীর পরবর্ত্তীগণের নামও পাওয়া যাইতেছে; যথা-রুকড়পুরীর শিষ্য লীলাপুরী, তৎশিষ্য জগন্নাথপুরী। কিন্তু আমাদের জয়ন্তীয়ার বিবরণ প্রদাতা ভিন্নরূপ শিষ্য-প্রণালিকা প্রেরণ করিয়াছেন।

১৬. জয়ন্তীয়ার প্রথম বন্দোবস্তের কাগজ।

চিকনাগোল হইতে ৩৮/০ হাল জমি দান করেন।[১৭]

বড় গোসাঞির বিধবা পত্নী রাণী কাশাসতী দীর্ঘজীবনী রমণী ছিলেন; এই সময় পর্যন্ত তিনি জীবিতা ছিলেন। রাজা রামসিংহের অনুমোদিত তাঁহার প্রদত্ত দানপত্র দৃষ্ট হয়। তিনিও রাধাগোবিন্দের সেবা-পরিচালনার্থ উক্ত গোস্বামীকে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রাধানগর হইতে কতক ভূমি দান করেন।[১৮]

ধর্ম্মপরায়ণা রাণী কাশাসতী বৃদ্ধকালে বহু দেবত্র দান করিয়া জয়ন্তীয়ায় অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি রামসিংহের অভিমতে ঐ বৎসরেই ভূধরনামক শিব, বাসুদেব ও জগন্নাথের সেবা নির্ব্বাহের জন্য ধর্ম্মপুর মৌজা হইতে ২৮৸০ হাল ভূমি দান করেন।[১৯] ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় এক দানপত্র ছাড়াও তিনি উক্ত দেবতাত্রয়ের উদ্দেশ্যে আরও কতক ভূমি দান করিয়াছিলেন।[২০]

সন্ধি

ব্রহ্মযুদ্ধের আরম্ভকালে ইংরেজ-গভর্ণমেন্ট সীমান্তবর্ত্তী জয়ন্তীয়াপতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তীয়াপতি ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে যে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়, তাহাতে "জয়ন্তীয়া অধিপতির স্বাধীনতা চিরদিন অক্ষুণ্ন থাকবে" এই মর্ম্মের সর্ত্তও ছিল।

বৃটিশ পলিটিকেল অফিসার ব্রহ্মদেশীয়দিগকে জয়ন্তীয়ারাজ্যে প্রবিষ্ট না হইবার জন্য এক নিষেধ পত্রিকা লিখিয়াছেন। এই পত্র প্রাপ্তে ব্রহ্মদেশীয়েরাও আর এক "উপর চাল" চালিয়াছিল, তাহারা আপনাদিগকে আহোমদের স্থলবর্ত্তী বলিয়া এবং জয়ন্তীয়ার সহিত আহোমদের পূর্ব্ব সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া, রাজা রামসিংহকে তাহাদের বশ্যতা স্বীকারের জন্য আহ্বান করিয়াছিল। ইহার পরে ব্রহ্মদেশীয় একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল জয়ন্তীয়া রাজ্য সীমার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল; কিন্তু একদল ইংরেজ-সৈন্য রাজসৈন্যের সহিত সম্মিলিত হওয়ার সংবাদ পাইয়াই তাহারা চলিয়া যায়।

এই যৎসামান্য গোলযোগ ব্যতীত রামসিংহের শাসনকাল পরম শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষকাল তিনি জয়ন্তীয়ার শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। তাঁহার সময়ে জয়ন্তীয়ায় অনেক মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, স্থাপত্য বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হয়। অনেকেই রাজদত্ত ভূসম্পত্তি প্রাপ্তে অবস্থার উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়।

---

১৭. "রাজা রামসিংহ বাদী জগবন্ধু গোস্বামীর পিতা নিত্যানন্দ গোস্বামীকে ১৭৩৮ সনের ২৫ অগ্রহায়ণ তারিখে রাধাগোবিন্দ দেবতা স্থাপিত করিয়া মৌজা চিকনাগোল হইতে এক কিত্তায় ২৬/০ হাল ও এক কিত্তায় ১২/০ হাল সিংহমোহরের তাম্রপত্রে দেবউত্তর (দেবত্র) দান করিয়াছিলেন।"
জয়ন্তীয়া (পাঁচভাগ পং) প্রথম বন্দোবস্তের কাগজ,-১২৪৭ বাংলা ১১ই শ্রাবণের রোবকারি।

১৮. ঐ কাগজে-পং বাজেরাজ
ভূমিপরিমাণ-২৪--০ হাল
দানকারিণী-রাণী কাশাসতী
প্রাপক-নিত্যানন্দ গোস্বামী
তারিখ ৭ই ভাদ্র, ১৭২৭ শকাব্দ
Report on the Progress of the Historical Researches in Assam বিবরণীতেও এই ভূদানের উল্লেখ আছে।

১৯ জয়ন্তীয়ার প্রথম বন্দোবস্তের কাগজ, রোবকারি-১২৪৭ বাংলা ১১ শ্রাবণ।

২০ Report on the Progress of the Historical Researches in Assam-1897. P. 12.

তাহার সময়ে প্রজা সাধারণের অবস্থা ভাল ছিল, দেশের দারিদ্র দূর হইয়াছিল এবং তাহাতে রাজকোষেও অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। রাজকোষে অর্থাভাব উপস্থিত হইলেই সাধারণতঃ দেশের হিতকর কার্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। রাজকোষে অর্থ থাকিলেই এ দেশের রাজারা সাধারণতঃ দান ধ্যান ও দেবপ্রতিষ্ঠাদি সৎকার্যে মনোযোগ দিয়া থাকেন।

রাজা রামসিংহের মৃত্যুর সহিতই জয়ন্তীয়ার সৌভাগ্যসূর্য চিরঅস্তমিত হয়। যে উদ্ধত রাজছত্র পাঠান ও মোগলের প্রচণ্ড প্রতাপেও বিনত হয় নাই, রামসিংহের মৃত্যুর পরেই তাহা বিভগ্ন হইয়া যায়। পরপর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইতেছে ; এস্থলে স্বাধীন নৃপতি বর্গের নাম ও [illegible]ত শাসন কালের উল্লেখ পূর্ব্বক জয়ন্তীয়ার [illegible]ভাগ্য যুগাধ্যায়ের উপসংহার করা গেল।

রাজগণের নাম	সম্ভাবিত শাসন কাল।
১ মহারাজ পর্ব্বতরায়	১৫০০-১৫১৬ খৃষ্টাব্দ
২ " মাঝ গোসাঞি	১৫১৬-১৫৩২ খৃষ্টাব্দ
৩ " বুড়া পর্ব্বত রায়	১৫৩২-১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ
৪ " বড় গোসাঞি (১ম)	১৫৪৮-১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ
৫ " বিজয় মাণিক	১৫৬৪-১৫৮০ খৃষ্টাব্দ
৬ " প্রতাপ রায়	১৫৮০-১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ
৭ " ধন মাণিক	১৫৯৬-১৬১২ খৃষ্টাব্দ
৮ " যশোমাণিক	১৬১২-১৬২৫ খৃষ্টাব্দ
৯ " সুন্দর রায়	১৬২৫-১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ
১০ " ছোট পর্ব্বতরায়	১৬৩৬-১৬৪৭ খৃষ্টাব্দ
১১ " যশোমন্ত রায়	১৬৪৭-১৬৬০ খৃষ্টাব্দ
১২ " বাণসিংহ	১৬৬০-১৬৬৯ খৃষ্টাব্দ
১৩ " প্রতাপসিংহ	১৬৬৯-১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ
১৪ " লক্ষীনারায়ণ	১৬৭৮-১৬৯৪ খৃষ্টাব্দ
১৫ " রামসিংহ (১ম)	১৬৯৪-১৭০৮ খৃষ্টাব্দ
১৬ " জয়নারায়ণ	১৭০৮-১৭৩১ খৃষ্টাব্দ
১৭ " বড় গোসাঞি (২য়)	১৭৩১-১৭৭০ খৃষ্টাব্দ
১৮ " ছত্রসিংহ	১৭৭০-১৭৮০ খৃষ্টাব্দ
১৯ " যাত্রানারায়ণ বা বিজয় নারায়ণ	১৭৮০-১৭৯০ খৃষ্টাব্দ
২০ " রামসিংহ (২য়)	১৭৯০-১৮৩২ খৃষ্টাব্দ

চতুর্থ অধ্যায়
বৃটিশাধিকার

"খোজকর"

জয়ন্তীয়া মহাপীঠ প্রকাশ সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহার সহিত একটি রাখাল বালকের অপমৃত্যুর কথা জড়িত রহিয়াছে। সেই গল্পচ্ছলেই হউক বা কালিকা পুরাণোক্ত বিধানানুযায়ীই হউক ফালজোরের কালী সদনে নরবলি প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শারদীয়া পূজার নবমী তিথিতে এবং রাজকুমারদের জন্মাদি বিশেষ উৎসব উপলক্ষে তথায় নরবলি দেওয়া হইত। চরগণ ভিন্ন রাজ্য হইতেই সাধারণতঃ বলির জন্য মনুষ্য সংগ্রহ করিত। তৎকালে শ্রীহট্টবাসীর ইহা এক ভীষণ ভয়ের বিষয় ছিল। মনুষ্য সংগ্রহকারীরা "খোজকর" বা "খোজেধরা" নামে কথিত হইত। খোজকরের নাম করিয়া বৃদ্ধেরা শিশুদিগকে ভয় দেখাইত; অতি দুরন্ত ছেলেও খোজকরের নামে গৃহকোণে লুকাইত।[১]

১৮২১ খৃষ্টাব্দে যখন রামসিংহ (২য়) জয়ন্তীয়ার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, তখন শ্রীহট্ট হইতে কয়েকটি বৃটিশ প্রজা ধৃত করিয়া জয়ন্তেশ্বরীর নিকট বলি দেওয়া হয়। গবর্ণমেন্ট এই সংবাদ প্রাপ্তে রায় সিংহকে এক সুতীব্র পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে বৃটিশ প্রজার উপর এইরূপ অকথ্য অত্যাচার ঘটিলে–এইরূপ নরহত্যা হইলে জয়ন্তীয়া অধিকার করা হইবে। ইহার পর কয়েক বৎসর নরবলির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

রাজেন্দ্রসিংহ ও নরবলির কথা

রামসিংহের মৃত্যুর পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। ঐ বৎসরেই কয়েকটি বৃটিশ প্রজাকে কালীর সম্মুখে বলি দেওয়ার কথা প্রচারিত হয়; ইহাতেই বিভ্রাট ঘটে। কিন্তু জানা যায় যে, রাজা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন। যদিও জয়ন্তীয়ায় এরূপ একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছিল যে, যে বৎসরে দেবীর নিকট নরবলি না হইবে, সেই বৎসরে রাজা রাজ্যচ্যুত হইবেন; যদিও অজ্ঞতাবশতঃ এই প্রবাদে অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তথাপি রাজাকে এই হত্যা সম্বন্ধে দোষী স্থির করা সঙ্গত হয় না। জয়ন্তীয়াপুরের কোন ব্যক্তিই ব্যক্ত করে না যে,

---

১ আমাদের বাল্যকালে এই ভয়ের কারণ দূর হইয়া গেলেও, "খোজে ধরার ভয়" দেখানের রীতি অচল হয় নাই। জয়ন্তীয়ার মত, অতি প্রাচীন কালে ত্রৈপুর-রাজগণও নরবলি দিতেন। এমন কি, জনৈক রাজা নরবলির প্রসাদ খাইয়াছিলেন বলিয়া সংস্কৃত রাজমালায় লিখিত আছে। যাহা হউক, খোজকর শব্দের ব্যবহার শ্রীহট্ট অঞ্চলে, জয়ন্তীয়ার নরবলির পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। আইন-ই-আকবরিতে লিখিত আছে যে, শ্রীহট্ট হইতে খোজা আমদানী হইত। খোজা ব্যবসায়ীগণ অপরের ছেলে চুরী করিয়া প্রক্রিয়া বিশেষে তাহাদিগকে নপুংসক করিয়া লইত। "খোজকর" শব্দের প্রচলন সম্ভবতঃ সেই সময় হইতে হইয়া থাকিবে; পরে জয়ন্তীয়ার ছেলেধরাদের প্রতিও ঐ শব্দ প্রযোজ্য হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় লিখিয়াছেনঃ–"শ্রীহট্ট হইতে খোজা ভারতের সর্ব্বত্র রপ্তানি হইত। মোসলমানদের এই একটা ব্যবসায় দাঁড়াইয়াছিল যে উহারা ছেলেদের খোজা করিয়া বিক্রি করিত। কেবল নিজেদের বালকগণের যে এই দশা করিত, তাহা নহে, বলে ছলে অন্যান্য স্থল হইতে ছেলে সংগ্রহ করিয়া খোজা করিত। জাহাঙ্গীরের সময় উহা নিবৃত্ত হয় ঐ ব্যবসায় হইতেই খোজকরের ভয় এদেশে প্রবল হইয়াছিল।"

রাজা রাজেন্দ্রসিংহ এই হত্যা সংশ্রবে ছিলেন।[২]

রাজা রাজেন্দ্রসিংহ বৈষ্ণবধর্ম্মের গোড়া ছিলেন, বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। "জীবে দয়া" যে ধর্ম্মের সার উপদেশ, সেই ধর্ম্ম তিনি যাজন করিতেন, সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে-হরিনাম সংকীর্ত্তনেই তিনি সর্বদা রত থাকিতেন, এই জন্য বালক হইলেও লোকের কাছে তিনি "রাজা যুধিষ্ঠির" বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। রাজা রাজেন্দ্রসিংহ ভক্ত ছিলেন, ভক্তির সহিত নিজ উপাস্যদেবতার লীলাঘটিত গীত রচনা করিতেন ও তাহা স্বয়ং গান করিয়া তৃপ্ত হইতেন।[৩]

এই কবি ও ভক্ত রাজা হত্যা সংশ্রবে ছিলেন ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। রাজা হত্যা সংশ্রবে না থাকিলেও কুচক্রীর চক্রজালে তিনি জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কুচক্রীর চক্রান্ত ও ভীষণ বলি

শ্রুত হওয়া যায় যে, জয়ন্তীয়ারাজের জনৈক মন্ত্রী কোন গুরুতর অপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি[৪] কোনক্রমে করাগার হইতে পলায়ন করেন; এবং আত্মরক্ষা ও প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবল তাড়নায় অধীর হইয়া কৌশলক্রমে পরম যত্নে এইরূপ একটি ঘটনার সৃষ্টিক্রমে তাহা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের গোচরীভূত করেন। গোভার সামন্ত নৃপতি তাঁহার সহায় ছিলেন।

---

২. আমাদের জয়ন্তীয়ার বিবরণ প্রদাতা শ্রীযুত রাধাচরণ পাল লিখিয়াছেন–"আমরা গভীর অনুসন্ধানে পরিজ্ঞাত হইয়াছি, রাজা কখনও নরবলি দিতেন না। রাজেন্দ্রসিংহের সমসাময়িক অনেক লোককে বাল্যকালে দেখিয়াছি, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এরূপ বলিতেন।"

৩. এই নৃপতি-কবি কৃত একটি ঝুলন-সঙ্গীত এইঃ–
ঝুলন সঙ্গীত
রাগিণী-সুরট মল্লার, তাল-কেওয়ালি।
ঘুঙ্গুরেরা ঝননন বাজে,
দঁহু ঝোলনা ঝোলে। [ধ্রু]
রঙ্গে রঙ্গিনী রঙ্গিয়া গোপীয়ানা বিছে,
ক্যাবলি আচানক ছাজে (সাজে)॥
ছোওয়া বেলি, কুন্দন কেওয়ালী,
জাই জুই দল বেল চাম্বেলি,
মত্ত চিত্ত মধুপান মগনমে,
ভ্রমরা ভননন গাজে॥১॥
রূপ রঙ্গকি ঘটা বনিয়ে,
এওছে ছিঙ্গরোয়া বরণ নাহি যাওয়ে,
নিরখি নিরখি বলি যাউ,
চরণকো রাজা রাজেন্দ্রসিংহ মহারাজে॥ ২॥
শব্দের অর্থঃ–
ঘুঙ্গুরোয়া=ঘুঁঘুর, পায়ের অলঙ্কার বিশেষ।
গোপীয়ানা=গোপীগণ।
ছোওয়া=পুষ্পবিশেষ।
গোজে=গুঞ্জন করে।
বিছে=মধ্যে।
বনিয়ে=নির্ম্মিত হওয়া, তৈয়ার হওয়া।
এওছে ছিঙ্গরোয়া=এরূপ শৃঙ্গার বা বেশ।

৪. এই মহাত্মার বংশীয়গণ অদ্যাপি জয়ন্তীয়ায় বাস করিতেছেন।

গোভা-পতি ছত্রসিংহ এই অনর্থের মূল। তাঁহার নিয়োজিত চরগণ বলির জন্য চারিটি বৃটিশপ্রজা ধৃত করিয়া লইয়া যায়। ঐ ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনটিকে কালীর সম্মুখে বলি দেওয়া হয়, চতুর্থ ব্যক্তি পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করে। এই নৃশংস ব্যাপারের সংবাদ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষীয়ের গোচরীভুক্ত হইলে গভর্ণমেন্ট প্রকুপিত হন। হতাবশিষ্ট চতুর্থ ব্যক্তি গবর্ণমেন্টে এই সংবাদ প্রথম প্রচারিত করে বলিয়াও শুনা যায়।[৫]

জয়ন্তীয়া গ্রহণ

প্রায় আড়াই বৎসর কাল রাজা ও গবর্ণমেন্টের মধ্যে এই বিষয় লইয়া লেখালেখি হইল, প্রকৃত হত্যাকারীকে বাহির করিয়া দিতে বলা হইল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই, তখন শাস্তি স্বরূপ জয়ন্তীয়ার সমতল ক্ষেত্রে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ শাসনাধীন করা হয়।[৬] ইহাই সরকারি বিবরণের মর্ম্ম।

লোকমুখে আরও কিঞ্চিৎ জানা যায়। ছাতকের ইংলিশ কোম্পানীর হেরি সাহেব (Harry Inglis)-যিনি এসিষ্টান্ট পলিটিকেল এজেন্ট ছিলেন, ইতিপূর্ব্বে জয়ন্তীয়াপতির সহিত ব্যক্তিগতভাবে মৈত্রী স্থাপিত করিয়াছিলেন। সরলহৃদয় রাজা, রাজনীতিবিৎ এই ইংরেজ বন্ধুর কূটকৌশলে বিনা যুদ্ধে নিরস্ত্র ও শান্তভাবে ধৃত হন। তিনি স্বীয় সেনাপতি ও মন্ত্রীবর্গের নিষেধ সত্ত্বেও বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করেন। শোনা যায় যে, তখন তিনি ষোলবর্ষ বয়সের বালকমাত্র ছিলেন। তখনও তাঁহার মুখে রেখা-গোপ বই উঠে নাই। তাঁহাকে শ্রীহট্টে আনয়ন করা এবং তত্রত্য বাবু মুরারি চন্দ্রের বাড়িতে রাখা হয়।[৭]

এইরূপে জয়ন্তীয়া রাজ্যের সমতলভাগ গৃহীত ও রাজা বন্দীদশাগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার রাজ্যের পার্ব্বত্য অংশ তখনও গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু রাজ্যের লাভজনক সমতলাংশ গৃহীত

---

৫. "In 1832, four subjects of the British Government were seized by Chutter sing, the Raja of Gova, one of the petty chieftains dependent on Jynteeah, they were carried to a temple within the boundaries of Goba where three were barbarously immolated at the shrine of Kali, the fourth providentially effected his escape into the British territories and gave intimation of the horrible sacrifice which had been accomplished."
-Mackenzie's North-East Frontiers of Bengal. P. 233.
এই বিবরণে পাওয়া যাইতেছে যে, জয়ন্তীয়ার সামন্তরাজ্য গোভাস্থিত কোন এক কালী মূর্ত্তির নিকটে এই নরবলি দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা জয়ন্তীয়ারাজের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত জনশ্রুতির সত্যতা সম্যক উপলব্ধি হয়।

৬. 'In consequence of British subjects having been sacrificed at the shrine of Kali at Jaintea and of the contumcious refusal of the Raja to surrender the murderers, his state annexed to the British dominions in the year 1835.'
-Report on the Re-settlement of Jaintia Parganas 1880.

৭. জয়ন্তীয়ার একটি গ্রাম্য গীতিতে এই করুণ রসাত্মক কথার আভাস পাওয়া যায়ঃ-
"মুই কই যাউম রে-কোথায় গেলে তরি,
হাকিম হৈলা হুকুমদার পেদা প্রাণের বৈরী;
-রে মুই কই যাউম রে।
বাট্টি রুটি ইন্দ্র (রাজেন্দ্র) সিংরে, মুখে রেখা দাড়ি,
বন্দী করি থৈল নিয়া মুরারি চান্দের বাড়ী,
-রে মুই কই যাউম রে"।

হওয়ায়, ক্ষোভ ও অভিমানে তিনি পার্ব্বত্য অংশও স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন; তখন তাঁহাকে মাসিক পাঁচশত টাকা বৃত্তি দিয়া শ্রীহট্টেই রাখা হইল। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। সরকারি কাগজ পত্রেও এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।[৮]

মাসিক এই সামান্য বৃত্তিতে তাঁহার কখন কখন অকুলান হইত, কেনই বা কুলাইবে? জানা যায় যে, তখনকার সহরবাসী বিখ্যাত ধনী কাঙ্গাল দাস সাহাজীর নিকট রাজার সোনার থালি, কাঁদি সহিত স্বর্ণময় কলার থোড়, সোনার কুমড়া ইত্যাদি মূল্যবান দ্রব্যরাজি বাঁধা পড়িয়াছিল।

জয়ন্তীয়ার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইলে, অধিবাসীবর্গ স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছিল, কিছুই অবধারণ করিতে পারে নাই; কিন্তু মন্ত্রী ও কর্ম্মচারিগণ সহসা বশতাপন্ন হন নাই। প্রজা সাধারণ ক্রমে তাঁহাদের মতাবলম্বী হইয়াছিল। জয়ন্তীয়ার সমতলভাগ বৃটিশ শাসনাধীন হইলেও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্যন্ত পার্ব্বত্য অংশ পরিগৃহীত হইতে পারে নাই।

জয়ন্তীয়া রাজ্যের সমতল প্রদেশ শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলায় এবং গোভাপতির অধিকৃত স্থান নওগাঁ জিলায় ভুক্ত হয়; তদ্ব্যতীত পার্ব্বত্য ভাগ খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্ব্বত জিলার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে।

রাজা নরেন্দ্রসিংহ

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্র সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর নরেন্দ্রসিংহ নামে মাত্র রাজা হন। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট জয়ন্তীয়ার এই নিরীহ স্বপদচ্যুত বংশধরকে বৃত্তি দেওয়ার উপযুক্ত বোধ করেন নাই। পরে শ্রীহট্টের ডিপুটী কমিশনার মিঃ লটমন জনসন সাহেব নরেন্দ্র সিংহের দুরবস্থার কথা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টে পরিজ্ঞাপন করেন, তখন তাঁহাকেও মাসিক পাঁচশত টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়ার আদেশ হয় ও তিনিও আজীবন এই বৃত্তি ভোগ করেন।

রাজেন্দ্রসিংহ গম্ভীর প্রকৃতি বিশিষ্ট, বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহার পরদুঃখ কাতরাদি গুণের কথা এখনও ভুলিতে পারে নাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে (মাঘমাসে) দেশের সাধারণ জনগণকে কাঁদাইয়া নরেন্দ্রসিংহ অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হন। রাজ্যহীন হইলেও নরেন্দ্রসিংহ প্রজাবর্গ হইতে, যে কোনও স্বাধীন সেনাপতির ন্যায় শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইতেন। তিনি যখন জয়ন্তীয়া হইতে শ্রীহট্টে আসিতেন, তাঁহার সঙ্গে শরীর রক্ষক ও পতাকাবাহী এ . অনুসঙ্গিবর্গ অনুগমন করিত। পথে একদা তদবস্থায় তিনি হঠাৎ ব্যঘ্রাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী

রাজা নরেন্দ্রসিংহের ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী শ্রীযুত নরসিংহ ও ছত্রসিংহ ভূপতি এখন বর্তমান আছেন। ইঁহারা শৈশবেই মাতৃহীন। পরে একমাত্র অভিভাবক স্নেহময় মাতুলের মৃত্যু হইলে, একবারে তাঁহারা নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন। তখন শ্রীহট্টের জজ বাহাদুর ইঁহাদের

৮. "The Raja was deposed on the charge of complicity with certain of his tribesmen who had carried off three British subjects and barbarously immolated them at the shrine of Kali. The portion of his territory that lay in plains was forth-with annexed to the district of Sylhet and Raja voluntarily resigned the hill-portion. A pension of 500 a month was granted to the deposed Raja for life and he resided in Sylhet until his death in 1861."
-Hunter's Statistical Accounts of Assam.

অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। এবং তাহাদিগকে শ্রীহট্ট সহরে আনাইয়া ইংরেজী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহারা অনেক দিন শ্রীহট্টে অবস্থান করেন, কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে বৃত্তি দেওয়ার আবশ্যক মনে করেন নাই। বিগত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা জয়ন্তীয়াপুরে গমন করেন। তাঁহারা জয়ন্তীয়ায় গিয়া ভগ্নপ্রায় প্রাচীন প্রাসাদের একাংশেই বাস করিতেছেন!

রাজবাটীর অবস্থা

যে রাজবাটী এক সময় শ্রীহট্টের গৌরব স্বরূপ ছিল, এখন তাহার শোচনীয় ভগ্নাবস্থা দৃষ্টে কে না ব্যথিত হয়? প্রস্তর-রচিত প্রকাণ্ড দরবার গৃহ, তাহাতে প্রস্তরময় প্রশস্ত "চৌকী" গুলি পড়িয়া রহিয়াছে! সৈন্যাহ্বানের প্রস্তরময় "বড় মাড়ৌ" নামক উচ্চ মঞ্চ,-প্রয়োজন সময়ে যাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্যধ্বনি করিলে বহুক্রোশ দূর হইতে শুনা যাইত; এবং জয়ন্তেশ্বরীর সুচাররু মন্দির ও কোষাগার ইত্যাদি ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। বৃহত্তর কামান গুলি–যাহা শ্রীহট্টে আনয়ন করার সুবিধা হয় নাই,[৯] পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। বহুতর মন্দির ও গৃহাদির অবস্থা একরূপই; এই সকল আর মনুষ্য ব্যবহারযোগ্য রহে নাই। জয়ন্তীয়ার এ দুর্দ্দিনে জয়ন্তেশ্বরীর ধাতুময়ী মূর্ত্তিও জয়ন্তীয়া হইতে অন্তর্হিতা-অপর্হিতা হইয়াছেন! নাই–ঐশ্বর্য্য গর্ব্বিতা জয়ন্তীয়ায় এখন আর কিছুই নাই!

যে রাজবাটী এক সময়ে খাসিয়া রমণীগণের কলকণ্ঠের কিন্নর-গীতিতে মুখরিত ছিল, তাহা এখন নীরব-নিস্তব্ধ, -বহুল অংশ পরিত্যক্ত, ভয়ে তথায় লোক চলাচল করে না; এই ভগ্নপ্রায় ভয়াবহ প্রাচীন বাটীতে দৈন্যদশাপন্ন নরসিংহ ও ছত্রসিংহ বাস করিতেছেন! কাল, তুমিই জগতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা!

যাঁহারা সহস্র লোকের আহার দাতা ছিলেন, তাঁহাদের বংশরদের আজ এই দশা! যাঁহারা ৪৮৪ বর্গমাইল সমতল ভূমি ও ৬০৬০ বর্গমাইল পার্ব্বত্য প্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরদের এই অবস্থা! জয়ন্তীয়ার হাট হইতে যে কথঞ্চিত আয় হয়, তাহাতেই নির্ভর করিয়া কোন রূপে তাঁহাদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে! পরিবর্তনশীল কাল, তুমিই জগতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা!

---

৯. শ্রীহট্টে ডিপুটী কমিশনার অফিসের সম্মুখে সংরক্ষিত দুইটি বড় কামান জয়ন্তীয়া হইতে আনীত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজস্বাদির কথা

সীমা

জয়ন্তীয়ার সমতল ক্ষেত্রের উত্তর সীমা খাসিয়া জয়ন্তীয়া পর্ব্বত, পূর্ব্বে কাছাড় জিলা, দক্ষিণে সুরমা নদী, উত্তর কাছ, দক্ষিণ কাছ[১] ও ইছা কলস পরগণা; পশ্চিমে বরম, পয়াইন তেলিখাল নামক অপ্রশস্ত তিনটি নদী। পরিমাণ ৪৮৪ বর্গমাইল। রাজাদের সময়ে আয়তন সময় সময় আরও বর্ধিত হইত এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশ সহ ইহা একটি দেশ বলিয়াই গণ্য হইত।

পূর্ব্বকার রাজস্ব

কিন্তু তখন জয়ন্তীয়া রাজ্যের আয় যথেষ্ট ছিল না। প্রধানতঃ শস্যাদিই প্রজাগণ হইতে গ্রহণ করা হইত, নগদ টাকা অত্যল্পই রাজস্ব আদায় করা যাইত। হাট বাজার ও ঘাট ইত্যাদি হইতে প্রায় নয় সহস্র টাকা বার্ষিক আদায় হইত। অর্থদণ্ড ও উপহার ইত্যাদি আয়ের মধ্যেই গণ্য ছিল। নগদ আয় এই সমুদায়ে ত্রিশ সহস্র মুদ্রার অধিক ছিল না। ইহাই সরকারী ইতিহাসের মত।[২] কিন্তু ইহা যে কতদূর বিশ্বাস্য বলা যায় না; জয়ন্তীয়া-রাজ-ভাণ্ডারের "সাত রাজার ধনের" কথা এখনও প্রবাদরূপে লোকে বলিয়া থাকে।

ভূমির উপর যে কর ধার্য ছিল, সরকারী কাজপত্রে তাহার নিরিখ বা পরিমাণ অতি সামান্য ছিল বলিয়া দৃষ্ট হয়। বিংশতি হাল জমির খাজানা মধ্যে সামান্য কিছু শস্য ও নগদ ৮ (আট) টাকা মাত্র হিসেবে আদায় করা হইত।[৩]

---

১. এই পরগণা পূর্ব্বে জয়ন্তীয়া রাজ্যের অধীন ছিল।

২. The revenue of Raja was derived from several heads. Land revenue was paid in kind or labour, fees were levied on appointments, or ghats, bazars and fisheries, an item which was said to bring in about 8800 per annum. Other sources of revnue were monopolies, presents and fines. The total income of Raja was estimated at from 25000 to 30000 per annum, and to this must be added the amount required to satisfy the demands of the subordinate officers through whose hands it passed."
-Allen's Assam District Gazetteers VoL. II. (Sylhet) Chap. VII. P. 234.

৩. কমিশনার মিঃ লুইস সাহেবের ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ নং চিঠির ১২ ধারার মর্ম্মমতে দেখা যায় যেঃ–
"রাজার আমলে প্রত্যেক চৌধুরী চটী ২০ হালের কাত ৮ টাকা ও শিকদার চটী ৪ টাকা একুনে নগদ ১২ টাকা সেলামি ও

ধান্য	২০ ভূতা। (মাপ বিশেষ।)
কলাই	১ পালি। (মাপ বিশেষ।)
তিসি	৩ সের।
ঘৃত	২ সের।
কলা	৫ ছড়া।
শনপাট	২০ মুড়া।
গরু	১ রাস।
কৌড়ি	॥৯ গণ্ডা রাজ সরকারে দিতেক।"

তদ্ব্যতীত শারদীয়া পূজাকালেও কিছু দ্রব্যাদি[৪] আদায় হইত এবং হস্তী খেদা উপলক্ষে কোন কোন স্থানের প্রজাদিগকে খাটিতে হইত।[৫]

শস্যশ্যামলা সমতল ক্ষেত্রেই যখন রাজস্বের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল, তখন আয়োপায়হীন পর্ব্বত হইতে যে বেশী কিছু আদায় হইত না, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। প্রত্যেক পার্ব্বত্য-পল্লী হইতে বার্ষিক একটা করিয়া পুংছাগল রাজস্ব পাওয়া যাইত। এরূপ অবস্থায় জয়ন্তীয়ার প্রজারা যে পরম সুখে কাল কর্ত্তন করিত, তাহা বলা বাহুল্য।

সুবিধা অসুবিধা ও বাঙালি কর্ম্মচারী

এইরূপ রাজস্ব আদায়ের প্রথা থাকায়, রাজকোষে বিশেষ অর্থ সঞ্চিত হোক, বা না হোক, রাজাদের আবশ্যকীয় ব্যয় ও কার্য নির্ব্বাহের কোন অসুবিধা ঘটিত না। কারণ কোনও কর্মচারিকেই নগদ টাকায় বেতন দেওয়া হইত না, প্রত্যেকেই তাহাদের পদানুরূপ ভূমি লাখেরাজ পাইত; এই সমস্ত লাখেরাজ ভূমির মধ্যে অনেকটিই এখন পূর্ব্বাধিকারীর পদের নামানুসারে আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। "বাটা ধরণীর মাটী", "ডাবা ধরণীর মাটী", "ঠাকুরের মাটী", "শিবের মাটী", ইত্যাদি ভূপরিচায়ক সংজ্ঞা জয়ন্তীয়ায় প্রবেশ করিলেই শুনিতে পাওয়া যায়।

রাজা যখন দরবারে বসিতেন, তখন যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে সভাসদ, মন্ত্রী, সভাপণ্ডিত, সেনাপতি প্রভৃতি উপবেশন করিতেন; ইঁহাদের অধিকাংশই শ্রীহট্টবাসী বাঙালী ছিলেন। রাজার ত্রিপার্শ্বে পরিচায়কবর্গ দাঁড়াইয়া থাকিত। 'ডাবাধরণী' অভিধাযুক্ত কর্মচারী ডাবা (হুকা) ধারণ করিয়া রহিত। ইচ্ছা মাত্র রাজা তাহাতে তাম্রকূট সেবন করিতেন। 'বাটা ধরণী' উপাধিযুক্ত ব্যক্তি সজ্জিত পান দান (পানের বাটা বা ডিবা) হস্তে পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিত;[৬] ইচ্ছা মাত্র রাজা তাহা হইতে তাম্বুল গ্রহণ করতঃ তাহা চর্ব্বণ করিতেন। রাজা রাজেন্দ্রসিংহের সময়ে শ্যামাচরণ বাটাধরণী পানদান ধারণ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

জয়ন্তীয়া-পতির সেনাপতিগণ প্রায়ই শ্রীহট্টের হিন্দুসাধারণ হইতে নিযুক্ত হইতেন। রাজা বড়গোসাঞির সেনাপতি মাণিক্যরায়ের নাম জানা গিয়েছে। শ্রীহট্টবাসী হিন্দু সেনাপতি নিয়োগ করায় রাজাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভিন্নজাতীয় সেনাপতি থাকায় খাসিয়া বা সিন্টেঙ সর্দ্দারগণ তাঁহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে অগ্রসর হইত না। শ্রীহট্টের ভিন্ন অংশে বাসকারী "সেনাপতি" ছিলেন। শ্রীহট্টের কৌড়িয়া পরগনার অন্তর্গত চন্দ্রগ্রামের "দাস, সেনাপতি"[৭] মূর্ত্তির "ধরসেনাপতি" বড়লেখার "দাস সেনাপতি" গণের নাম, এস্থলে করা যাইতে পারে। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও সসম্মানে ঐ সকল স্থানে বাস করিতেছেন।

---

৪. শারদীয়া পূজাকালে দিতে হইতঃ–

'ধান্য	৷৹ পুরসা। (মাপ বিশেষ।)
ঘৃত	৷৹ অর্দ্ধসের।
কলা	১ ছড়া।
কলাই	১ কাটি।' (মাপ বিশেষ।)

৫. হস্তী খেদার জন্য প্রজাদিগকে একহাল করিয়া ভূমি নিষ্কর দেওয়া হইত, যাহারা এইরূপ নিষ্কর ভূমি ভোগ করিত, খেদা উপস্থিত হইলে বিনা বেতনে তাহাদিগকে খাটিতে হইত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়।

৬. পূর্ব্বকালীন নরপতিগণের "তাম্বুল করঙ্ক বাহিনী" স্ত্রীলোক নিযুক্ত থাকিত।

৭. এই বংশীয় গজেন্দ্রকিশোর দাস প্রথমে জয়ন্তীয়ার সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হন। ভ্রাতুষ্পুত্র হরচন্দ্র হইতেই চন্দ্রগ্রামের নামকরণ হয়। হরচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র মাণিক্য রাজা বড়গোসাঞির সময়ে জয়ন্তীয়ায় সেনাপতি ছিলেন। ইঁহাদের কাহিনী বংশ বৃত্তান্ত ভাগে বর্ণিত হইবে।

জয়ন্তীয়ার রাজকীয় চিহ্ন সিংহ ছিল। সনদ, তাম্রশাসন এবং পতাকাদিতে সিংহ চিহ্নই অঙ্কিত থাকিত।

ভূমি বন্দোবস্ত

জয়ন্তীয়া রাজ্য বৃটিশাধিকৃত হইলে, প্রথমেই সমতল ভূমির পরিমাণ নির্দ্ধারণার্থে জমি পরিমাপ করার বন্দোবস্ত হয়। পরিমাপ কার্য সমাপ্ত হইলে, রঘুনাথ পাল ও মদনমোহন ঘোষ নামক কর্মচারিদ্বয় গবর্ণমেন্টে নক্সা দাখিল করেন, এবং কাপ্তেন ফিসার প্রথমতঃ এক বৎসর ম্যাদে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জমির বন্দোবস্ত দেন। ভূমির নিরিখ নির্দ্ধারণার্থ প্রতি মৌজায় এক এক "বৈঠক" হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চের লিখিত "সদর কৌন্সিলের" চিঠির মর্ম্মানুসারে জয়ন্তীয়রাজ্য শ্রীহট্ট জিলার সংসৃষ্ট থাকা স্থির হয়।[৮]

বৃটিশাধিকারের পূর্ব্বে কাছাড়াধিপতির অধিকৃত জয়ন্তীয়ার কোন কোন অংশ কাছাড় জিলার সংসৃষ্ট হইয়া কাছাড়াধীনে ছিল, পরে তাহাও শ্রীহট্টের কালেক্টরী ভুক্ত হয়। এই সমস্ত জমির পরিমাপ কার্য হেনরি থুলিওর (Lieutenant H. Thuillier) সাহেবের ২৪ অঙ্গুলি হাতের "নল" দ্বারা হইয়া, ভূপরিমাপ নির্দ্দিষ্ট হয়।[৯]

"নিরিখি" নির্দ্ধারণার্থ প্রতি পরগণায় "বৈঠক" বসিলে অনেকেই অনেক বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, অনেকেই নিষ্কর ভোগের "দাবী" প্রদর্শন করিয়াছিল। তন্মধ্যে যাহাদের দাবি বলবৎ হয়, তাহাদের নিষ্কর "বাহাল" রাখা হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশেরই দাবি অগ্রাহ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আড়াইখাঁ পরগণার শুভাসিংহরাজা ফতেপুর মৌজার তাবৎ জমি রাজদত্ত নিষ্কর বলিয়া আপত্তি করেন, কিন্তু তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য হয়। পাঁচভাগ পরগণার প্রত্যেক প্রজা পূজার যোগান দেওয়া ও খেদার পারিশ্রমিক বাবতে একহাল করিয়া নিষ্কর ভোগের আপত্তি করিয়াছিল, তাহাও গ্রাহ্য হয় নাই। সর্ব্বত্রই ২০ হাল ভূমির রাজস্ব, আট টাকা মাত্র দেওয়ার কথা উঠিয়াছিল। রাজাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতার দেবত্র ভূমিগুলিই নিষ্কর রাখা হয়; তদ্ব্যতীত অপর প্রজাগণ অবশেষে বাধ্য হইয়া বন্দোবস্ত লইতে আরম্ভ করে।

জয়ন্তীয়ার উপবিভাগ

বলা গিয়াছে যে ৬০৬০ বর্গমাইল পার্ব্বত্য প্রদেশ ব্যতীত জয়ন্তীয়ার সমতল ভূমির পরিমাণ ৪৮৪ বর্গমাইল ছিল। রাজাদের সময়ে পার্ব্বত্য প্রদেশ দ্বাদশ "রাজে" বা উপবিভাগে

৮. জয়ন্তীয়ার প্রথম বন্দোবস্তের কাগজ (প্রতি পরগণার) প্রথম ধারায় এইরূপ লিখিত হইয়াছেঃ–

"প্রকাশ আছে যে শ্রীযুত সদর কৌন্সিলেব সাহেবদিগের আজ্ঞামতে জয়ন্তারাজ্য সরকার বাহাদুরের অধিকার হইয়া ঐ রাজ্যের জমি জমা নির্দ্দিষ্ট না থাকা প্রযুক্ত প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত কাপ্তেন নস্তব সাহেবের আজ্ঞানুসারে রঘুনাথ পাল ও মদন মোহন ঘোষ নক্সানবিস জয়ন্তাসম্বন্ধীয় পরগণার নক্সা দাখিল করিলে ঐ রাজ্যে হেড়ম্ব সংসৃষ্ট হওয়াতে শ্রীযুক্ত কাপ্তেন তামিস ফিশার সাহেব জয়ন্তানিবাসী লোকদিগের স্বীকার মতে জয়ন্তা সম্বন্ধীয় তাবৎ পরগণার জমিনের বন্দোবস্ত সন ১২৪২ বাঙ্গালাতে এক বৎসর ম্যাদ করিয়া, সন ১৮৩৭ ইং ২১ মার্চ্চের চিঠির আদেশানুসারে জয়ন্তারাজ্যে এই (শ্রীহট্ট) জিলার সংসৃষ্ট ও তাহার বন্দোবস্তের ভার এ হুজুর (শ্রীহট্টে কালেক্টর সাহেব নিকট) প্রতিপালন হইবেক ও এই পরগণার তাবৎ জমির কাগজ প্রস্তুত হওয়াতে তদস্তপূর্ব্বক সন ১৮২৫ ইং ৯ আইনের ৫ ধারার ২য় ও ৪র্থ প্রকরণ মতে (অমুক) মৌজায় বৈঠক করা গেল।"

৯. পূর্ব্বোক্ত কাগজে (কোন কোন পরগণার) দ্বিতীয় ধারায় এইরূপ লিখিত হইয়াছেঃ– "হৈড়ম্বের সুপ্রেন্টান্ট সাহেবের সমীপীয় ৬নং বহিতে পরগণার মোয়াজি (এত) হাল ছিল কিন্তু অদ্য শ্রীযুক্ত হেনরি থুলিওর বেরনিউ সার্ব্বেয়ার সাহেব দ্বাবায় ২৪ অঙ্গুলি হাতের নলে (এত) হাল জমি নির্দ্ধারিত হইল।"

এই পরিমাপে জমির পরিমাণ অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। "নল"–মাপকাঠি বিশেষ।

এবং সমতল ক্ষেত্র দশ রাজে বিভক্ত ছিল। এই দশরাজের নাম, যথাঃ–

(১) জয়ন্তীয়া পুরীরাজ। (২) চারিকাঠা।
(৩) জাফলং। (৪) ফালজোর।
(৫) ধরগাম। (৬) আড়াই খাঁ।
(৭) পাঁচভাগ। (৮) খরিল।
(৯) চতুল। (১০) চাউরা।

প্রথমোক্ত চারি রাজের নাম "খেল" ; এবং অবশিষ্টগুলি "হাজারকি' নামে খ্যাত ছিল। এই সমতল ক্ষেত্রে কোন পর্ব্বত নাই, পশ্চিমাংশের অনেকটা জলাভূমি মাত্র আছে। এই সমতল ভূভাগের ৩১০০০০ একর জমি মধ্যে, উত্তরদিগ্বর্ত্তী সাতবাক পরগণায় ৯৫৫০০ একর পতিত ভূমি ব্যতীত অবশিষ্ট ২১৪৫০০ একরেই চাষ হইয়া থাকে।[১০] জয়ন্তীয়ায় ভূমি আবাদ ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে, উক্ত দশরাজ পরে সপ্তদশ পরগণাতে বিভক্ত হয়।[১১] যথাঃ–

(১) পীয়াইনগোল-----৭৪.০৬ বর্গমাইল
(২) ধরগাম-----১০৫.৭৮ "
(৩) জাফলং----- ৪০.০৭ "
(৪) জয়ন্তীয়াপুরীরাজ-----৫৯.১৫ "
(৫) আড়াই খাঁ-----৬৩.৪১ "
(৬) পশ্চিমভাগ-----৭৩.৪৯ "
(৭) খরিল----- ৪৬.৯৫ "
(৮) বর্ণফৌদ-----৬৬.৮৩ " এই সপ্তদশ এবং-
(৯) বাউরভাগ-----১৯.৬৩ "
(১০) বড়দেশ-----০৩.০৯ বর্গমাইল
(১১) বাজেরাজ-----১২.১৫ "
(১২) চতুল-----৩৩.৯৫ "
(১৩) চারিকাঠা-----৩৭.৮৮ "
(১৪) ফালজোর-----৩১.৮৪ "
(১৫) চাউরা-----০৯.৯২ "
(১৬) মূলাগোল-----৫৯.১৪ "
(১৭) সাতবাক-----৩৬.৮৫ "
(১৮) পশ্চিমভাগ বাজে রাজ-০৪.৫৪[১২]

শেষোক্ত পশ্চিম-বাজেরাজকে পৃথক এক পরগণা গণ্যে সাধারণতঃ "জয়ন্তীয়া পরগণা" বলিতে এই অষ্টাদশটি পরগণাই বুঝায়; কিন্তু সরকারী কাগজপত্রে সপ্তদশ পরগণাই লিখিত আছে।

রাজস্বের পরিমাণ

প্রজারা বন্দোবস্ত লইতে আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ খাজনার হার অধিক ছিল না, কিন্তু পরিণামে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।[১৩] ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের একাব্দ ম্যাদি বন্দোবস্তে সমস্ত জয়ন্তীয়া

১০. Allen's Assam District Gazeteers Vol. II. (Sylhet) Chap. VIII. P. 233. iii.

১১. পূর্ব্বে দক্ষিণকাছ প্রভৃতি জয়ন্তীয়ার অন্তর্গত ছিল, এই সময় তাহা জয়ন্তীয়া হইতে নিযুক্ত হইলেও, নূতন জরিপে ভূপরিমাণ অনেক বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। (বর্গমাইল প্রমাণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।)

১২. এই পরগণাটির স্থান মানচিত্রে নির্দ্দেশিত হয় নাই।

১৩. খাজনার হার এবং দ্বিতীয় পরিমাপে জমির পরিমাণ কিরূপ বর্দ্ধিত হয়, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইলঃ–

নাম (কাছাড় সংসৃষ্ঠ কাগজে)	ভুপরিমান (২য় পরিমাপে)	ভুপরিমান দুফসল	রাজস্বহার (কেদার প্রতি) একফসল	ভিট
পিয়াইনগোল৭৬৫/০ হাল	৩২৫০/০ হাল	৬	৬	৬
ধরগাম	...	-	-	-
জাফলং	-	-	-	-
আড়াইখাঁ ১০৬৪/০ "	৩৭০৭/০ "	-	-	-

রাজ্যে ৩৫৯৮৮ টাকা রাজস্ব ধার্য করা হয়।[১৪]

এই টাকা কেবল ১৮ পরগণা অর্থাৎ সমতলভূমি হইতে গৃহীত হয়; তৎকালে পর্ব্বত হইতে রাজস্ব আদায় হয় নাই। ১৮৩৮ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই জমির প্রকৃত বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এবং ম্যাদও এক বৎসরের স্থলে পাঁচ বৎসর করা হইয়াছিল।[১৫]

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার জয়ন্তীয়ায় একটি বন্দোবস্ত হয়, তখন ব্যাদ বর্দ্ধিত হইয়া ২০ বৎসর করা হয় এবং পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতেও ঐ সময়ে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু পার্ব্বত্য জাতীয়গণ রাজাদের সময়ের রাজস্ব প্রদানের প্রথামত প্রতি পল্লী হইতে একটি করিয়া পুংছাগল প্রদান করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।[১৬]

জয়ন্তীয়ায় ক্রমাগত ছয়বার ভুবন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রতি বন্দোবস্তেই রাজস্বের হার ও ভূপরিমাণ বৃদ্ধির সহিত রাজস্বও বর্দ্ধিত হইয়াছে; নিম্নে তাহা লিখিত হইল ঃ–

সময়		রাজ পরিমাণ
১ম বন্দোবস্ত	১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ	৩৫৯৮৮ টাকা।
২য় বন্দোবস্ত	১৮৩৮-১৮৪০ খৃষ্টাব্দ	৩৮৯২৮ টাকা
৩য় বন্দোবস্ত	১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ	৪২৮৪৬ টাকা
৪র্থ বন্দোবস্ত	১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ	৫৭৬৫০ টাকা
৫ম বন্দোবস্ত	১৮৭৬-১৮৮১ খৃষ্টাব্দ	১৬৭৫৪২ টাকা
৬ষ্ঠ বন্দোবস্ত	১৮৯২-১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ	২২১৭২৮ টাকা

এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে গবর্ণমেন্ট জয়ন্তীয়া হইতে বার্ষিক দ্বিলক্ষাধিক টাকা কেবল ভূরাজস্ব মধ্যেই প্রাপ্ত হন।

রাজস্ব আদায় জন্য জয়ন্তীয়ায় দুইটি তহশীল আফিস স্থাপিত হইয়াছে, একটি গোয়াইন ঘাট নামক স্থানে, অপরটি কানাইরঘাটে।

পীয়াইনগোল, ধরগাম, জাফলং জয়ন্তীয়াপুরীরাজ, আড়াই খাঁ ও পশ্চিম ভাগ এই ছয়টি পরগণা গোয়াইনঘাট তহশীলের অধীন, অবশিষ্ট পরগণাগুলি কানাইরঘাট তহশীলের অন্তর্ভূক্ত।

পাঁচভাগ	-	৪১৯০/০ "	-	-	
খরিল	-	২৩১৩/০ "	-	-	
বর্ণফৌদ	৮৩২/০	"	২৮৫২/০ "		
বাজেরাজ	-	১৪০৫/০			
বাউরভাগ	৬৮৬/০ "	৭৬৯/০ "			
ফালজোর	১৩০৯/০ "	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
মুলাগোল	১৪৮৩/০ "	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সাতবাক			[illegible]	[illegible]	[illegible]
পশ্চিমবাজেরাজ	২১০/০ "	৩০৯/০ "	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চুড়খাইড়			[illegible]	[illegible]	[illegible]

১৪. In 1836 a summary settlement was concluded for one year by Captain Fisher the revenue assessed amounted to 35988 which was belived he fairly equivalent of the amount taken by the jaintia Raha."
-Assam District Gazetteers. Vol. II. (Sylhet) Chap. VII. P. 234.

১৫. -Assam District Gazetteers. Vol. II. (Sylhet) Chap. VII. P. 234.

16. "The administration of the nill, no charge was indigenous revenue system which consisted simply of the payment of a he-goat once a year from each village."-See the Statistical Accounts of Assam.

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিবিধ কথা

জয়ন্তীয়ায় গবর্ণমেন্টের একটি থানা ও তদধীনে দুইটি আউটপোষ্ট স্থাপিত হইয়াছে। থানা কানাইরঘাটের এলাকায় প্রায় পঞ্চাশীতি সহস্র লোকের বাস, এখানে একজন সবইনিস্‌পেক্টর ও আটটি কনেষ্টবল থাকে। আউট পোষ্ট-জয়ন্তীয়াপুর ও ´গোইনঘাটেও একজন করিয়া সবইনিসপেক্টর ও যথাক্রমে চারি ও পাঁচটি কনেষ্টবল থাকার কথা আছে। কানাইরঘাট ও গোয়াইনঘাটে দুইটি তহশীল অফিস আছে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

নদী, উৎপন্নদ্রব্য ও বাজার ইত্যাদি

জয়ন্তীয়ায় সাধারণতঃ অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে, নদীর বেগ প্রখর। জয়ন্তীয়া লোভা, গোয়াইন, পীয়াইন, চেঙ্গরখাল, তেলিখাল, হারিগাঙ্গ ও বড়গাঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি প্রবাহিত। ইহারা সুরমা নদীতে পতিত হইতেছে; চেঙ্গর খাল গোয়াইন নদীর শাখা বিশেষ। এই সকল নদী সহযোগেই জয়ন্তীয়ায় অন্তর্ব্বাণিজ্য নির্ব্বাহিত হয়। তেজপত্র, কমলা, লঙ্কা, পাখা পাণ, ঝলাঙ্গ, ও কাষ্ঠ ইত্যাদিই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। জয়ন্তীয়ায় সুগন্ধযুক্ত সুমিষ্ট একপ্রকার কুমড় জন্মিয়া থাকে।

জয়ন্তীয়ায় প্রায় অষ্টাবিশংতি সংখ্যক বাজার আছে।[১] তন্মধ্যে নিজ পাটের বাজার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কানাইরঘাট, লাখাট, গাছবাড়ী, নওয়াবাজার প্রভৃতি অনতিবহৎ বাজারগুলি বিশেষ বিশেষ বারে বসিয়া থাকে। নিজ পাটের বাজারে পূর্ব্বে স্বদেশী এড়ি মুগার বস্ত্র পাওয়া যাইত, এখন আর পাওয়া যায় না।[২]

চা-বাগান

জয়ন্তীয়ার ভূমি স্বভাবতই উর্ব্বরা। ধান্য যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে; জয়ন্তীয়াবাসীগণ দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে জানিত না। কিন্তু প্রায় একাদশটি চা-বাগান হওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে জয়ন্তীয়ায় প্রতিবর্ষেই ধান আমদানী করিতে হয়। এই একাদশ সংখ্যক চা বাগান মধ্যে চিক্‌নাগোল নামক চা-বাগানটির স্বত্বাধিকারী বাবু জুয়ারমল তুষ্ণীয়াল নামক শ্রীহট্টের জনৈক

১. গোয়াইন ঘাট থানার অধীন বাজারগুলির নামঃ–
বিন্নাকান্দি, চৈলাখাল, গেরো, গোয়াইন, হরিপুর, জগাবহর হাওর, কহাইঘর, মাণিকগঞ্জ, মিতিরীমহাল, নিজপাট, পাঁচতাহীখেল, জাফলং বাগান, পানিছড়া, সরুফৌদ।
কানাইরঘাটের অধীন বাজারগুলির নামঃ–
আগবাটিয়া, ভবানীগঞ্জ, বীরদল, ফতেগঞ্জ, চতুলবাজার, গাছবাড়ী, কানাইরঘাট, লালাখাল, মানিকগঞ্জ, মুখীগঞ্জ, মূলাগোল, নূতনপুর, রাজাগঞ্জ, সরকারের হাট।

২. এখনও দুই একজন এড়ি কাপড়ের শিল্পী আছে কিন্তু ব্যবসায় চলে না বলিয়া তাহারা আবাদ করিয়াই দিন যাপন করিতেছে।

বস্ত্রব্যবসায়ী; অবশিষ্ট দশটিই ইংরেজ কোম্পানীর স্থাপিত।[৩] এই সমস্ত চা-বাগানের এলাকায় প্রায় ১৩৩৫৭ একর ভূমি আছে এবং সাত সহস্র কুলি কার্য্য করিয়া থাকে।

ডিস্পেন্সারি ও স্কুলাদি

জয়ন্তীয়া স্বভাতঃই বৃষ্টিপ্রধান স্থান বলিয়া স্বাস্থ্য খুব ভাল নহে। অনেকে বলেন যে চা-বাগান হওয়ার পূর্ব্বে স্বাস্থ্য ভাল ছিল। জয়ন্তীয়ায় তিনটি সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, একটি জয়ন্তীয়াপুরে, অপর দুইটি গোয়াইনঘাট ও কানাইরঘাটে। তিনটি ঔষধালয়ের জন্য গবর্ণমেন্ট বার্ষিক গড়ে তিনহাজার টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন।

জয়ন্তীয়ায় দুইটিমাত্র মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় আছে, একটি মধ্যবঙ্গ (জয়ন্তীয়াপুরে) ও অন্যটি মধ্যইংরেজী (কানাইরঘাটে); জয়ন্তীয়া হইতে গবর্ণমেন্ট প্রতিবর্ষে প্রায় দ্বিলক্ষ মুদ্রা রাজস্ব প্রাপ্ত হইলেও শিক্ষার জন্য অল্পমাত্রই ব্যয় দিয়া থাকেন। জয়ন্তীয়ার অধিবাসীগণ অশিক্ষিত,[৪] তাহাদের শিক্ষাকল্পে গবর্ণমেন্ট একটু কৃপাকটাক্ষ করিলেই হয়।

বাঙালা গ্রন্থ

শিক্ষা সম্বন্ধে জয়ন্তীয়া হীনদশাপন্ন হইলেও রাজাদের সময়ে শিক্ষিত লোকেরা বিশেষ সম্মান লাভ করিতেন। জয়ন্তীয়া বাসী বাঙ্গালী বিচরিত দুইখানা প্রাচীন গ্রন্থ আছে, একখানার নাম “রত্নাবলী।” দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম “অদ্ভুত ভারত।” অন্যায় সমরে অভিমন্যু নিহত হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় রমণীগণের যুদ্ধ বিবরণ ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভাষা ও সংজ্ঞাদি

শিব ওঝা, রামরায় মজুমদার, মোহন রাম ধর, প্রভৃতি জয়ন্তীয়ার সঙ্গীত রচয়িতা কবি; রাজা রাজেন্দ্র সিংহ বাহাদুরকেও ইঁহাদের একাসনে স্থান দান করা যাইতে পারে। ইঁহাদের

৩. চা-বাগানগুলির তালিকা নিম্নে লিখিত হইলঃ–

নাম	স্বত্বাধিকারী	যে থানাধীনে	অধিকৃত ভূমি
চেরাপাঙ্গ ও ফতেপুর	কন্‌ইলডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	গোয়াইন ঘাট	৮৭২ একর
চিকনাগোল	বাবুজুয়ারমল তুষ্ণীয়াল	ঐ	২৪৩০ একর
গুলনী	কন্‌সলিডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	ঐ	১৩৬৮ একর
জাফলং	ঐ	ঐ	১৯১০ একর
বাগছড়া	ঐ	জয়ন্তীয়াপুর	৭১৩ একর
জয়ন্তীয়া	ঐ	ঐ	৬১২ একর
কলাখাল	ঐ	ঐ	১৩৯৬ একর
দৌকারগোল	লুভা টি কোং	কানাইর ঘাট	৬৩০ একর
লুভাছড়া	ঐ	ঐ	৮৯২ একর
মূলাগোল	ঐ	ঐ	৯৩৭ একর
নূনছড়া	ঐ	ঐ	১০২৭ একর

৪. "The mass of the people is entirely ignorent, in each Parganas not half a dozen people will be found, who knows Bengali fairly "

-Jaintia Re-settlement Report-1880

রচিত গীত ও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে জয়ন্তীয়াপুরে ব্যবহৃত গ্রাম্য ভাষা বহুল পরিমাণে থাকায় অনেকের পক্ষে সুপাঠ্য বোধ হয় না। জয়ন্তীয়া শ্রীহট্টান্তর্গত হইলেও জলবায়ুর পার্থক্যের সহিত লোকের প্রকৃতি ও ভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকমের; ভাষায় গ্রাম্যতা দোষ অত্যাধিক। তথায় "নিজপাট" অর্থে জয়ন্তীয়ার রাজধানী গ্রামাদির শেষে প্রায়ই "খেল", "খেলা", "চাট", "ফৌদ", "দমকি", "পুঞ্জি" ইত্যাদি শব্দ সংযোজিত দৃষ্ট হয়।

রাজকীয় শাসন সম্পর্কীয় গ্রামাদি "খেল", এবং "কুয়রী" (রাজমাতা বা কন্যা), "কুয়র" (কুমার, বা উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীর ভোগত্র ভূম "খলা নামে খ্যাত। কতিপয় গৃহসমষ্টির নাম "চটি"; চারি চটিতে এক "ফৌদ" (ক্ষুদ্রগ্রাম); চারি ফৌদে[৫] এক "দমিক" (বৃহৎ গ্রাম) হইয়া থাকে। জয়ন্তীয়ায় সাধারণতঃ গ্রাম স্থানে "গাম"[৬] শব্দ কথিত হয়। জয়ন্তীয়ার বাঙ্গালীরা "মোগলান" শব্দে শ্রীহট্টের অপরাংশকে নির্দ্দেশ করে। মোগলান অর্থে মোগলদের অধিকৃত দেশ। শ্রীহট্ট মোগলদের অধিকৃত হইলেই জয়ন্তীয়ায় এই সংজ্ঞার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। জয়ন্তীয়া যে কখনও মোগলাধিকৃত হয় নাই, এই "মোগলান" শব্দের ব্যবহার দ্বারাই তাহা জানা যায়। জয়ন্তীয়ায় রাজকীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের "বিষয়ধর" সংজ্ঞা ছিল; কার্য ভেদে বিষয়ধরেরাই সেনাপতি, সহরদার, সুবেদার, মজুমদার, বড়দলই,[৭] দলই, মুন্‌সেফ, পুরকায়স্থ, ষষ্ঠী, সেতত, নক্তি, ওস্তাদ ও কীর্ত্তনী নামে খ্যাত হইতেন।

বড়দলই ও দলই প্রায়শঃ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পদবি ছিল; মুন্‌সেফগণও সম্মান ভাজন ছিলেন।

রামসিংহ রাজা, বিজয় মুন্‌সেফ হইতে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র গৌরচন্দ্র পিতৃপ্রাপ্ত লাখেরাজ অর্দ্ধজমায় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট হইতে ভোগ করিয়াছিলেন।

কীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তন

জয়ন্তীয়ায় কীর্ত্তনের বিশেষ আদর ছিল, কাজেই কীর্ত্তনী পদবীও সম্মানিত ছিল। রামরায় প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের কৃত সুললিত গীত গুলিই গান করা কীর্ত্তনীর ও ওস্তাদের কর্ম্ম জয়ন্তীয়ায় মৃদঙ্গ বাদকের সংজ্ঞা "ওস্তাদ।" তথায় কীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তনে বিভেদ আছে মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে ভাবভেদে (মান মথুরাদি) রাধাকৃষ্ণ লীলাত্মক গীতই কীর্ত্তন নামে কথিত হয়। সঙ্গীত সম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট লোক ভিন্ন অপর লোক কীর্ত্তনের দলে যোগ দিতে পারে না। কিন্তু সংকীর্ত্তনে সকলেই যোগদান করিতে পারে, এবং দেবতা লইয়া নগর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক গান করাই সংকীর্ত্তন বলিয়া কথিত থাকে।

রমণী-সঙ্গীত ও রাস গান

জয়ন্তীয়ায় স্ত্রীলোকেরাও "কীর্ত্তন" করে। তাহারা মৃদঙ্গ করতালের পরিবর্ত্তে করতালি দিয়া গান ধরে। জয়ন্তীয়ার স্ত্রী-সঙ্গীত অশ্লীলতা বর্জ্জিত এবং তাহারাও ভাবভেদে ও লীলানুক্রমে গান করিয়া থাকে,—এ রীতি তাহারা কদাপি ভঙ্গ করে না। জয়ন্তীয়ায় খাসিয়া রমণীগণ রাসগান করিয়া থাকে। মণিপুরী কুমারীরাও প্রশংসিতরূপে রাসগান করে। কিন্তু ইহাদের রাসের তুলনায়

৫. "ফৌদ" আসাম দেশজ গোত্রবাচক শব্দ।

৬. আশ্চর্য্যের বিষয়, ভাটেরার, তাম্রশাসনে "গাম" শব্দটি ভূরিশঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭. বড়দলই ও দলই আসাম দেশীয় শব্দ। দলই=দলপতি শব্দের অপভ্রংশ।

তাহা অতি তুচ্ছ। সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্নর গীতিকার কথা শুনা যায়, ইহাদের সুকণ্ঠ নিঃসৃত সুললিত স্বরলহরী শুনিলে, ইহাই সেই কিন্নর-গীতি বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বকথিত কবি রামরায় ও মোহনরায় বিশেষ যত্নে ইহাদিগকে রাসগানের রীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাসগানে তাঁহাদেরই রচিত ভাব রসাত্মক পদাবলী গীত হইয়া থাকে।

সামাজিকতা ও বিবাহ প্রথা

জয়ন্তীয়ার বাঙ্গালী হিন্দুদের সামাজিক প্রথা অল্প ইতরবিশেষে অপরাপর স্থানেরই মত; কিন্তু সামাজিক বিচারের প্রথা এখনও বলবত্তর রহিয়াছে।

অপরাধীর প্রতি দুই প্রকার দণ্ড বিহিত হইয়া থাকে,—গলবস্ত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও কীর্ত্তন দানে দোষ ক্ষালন করা। সামাজিক বিচার প্রথা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে জয়ন্তীয়ার রাজাদের মধ্যে কোনরূপ বিবাহ প্রথা ছিল না, এই কারণেই রাজাদের মধ্যে পুত্রের সিংহাসনারোহণ করার প্রথা হয় নাই এবং এই জন্যই তথায় ভাগিনেয়গণই উত্তরাধিকার লাভ করে।[৮] রাজাদের মধ্যে বিবাহ বিধি না থাকিলেও খাসিয়া প্রজাদের মধ্যে একরূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। বরকন্যার মনোমিলন হইলেই বিবাহ হইয়া গেল; অভিভাবককে কিছুই করিতে হয় না। বরের পক্ষে কন্যাকে যথাসাধ্য বস্ত্রালঙ্কার দান এবং উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজনকে ভোজন করানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। বিবাহের পর বরকে শ্বশুর গৃহে থাকিতে হয়।

ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ ও বিবাহ-চ্ছেদ প্রথাও প্রচলিত আছে। বিধবা-বিবাহের নাম "সেঙ্গা।" এক খানা পাণ ছিড়িয়া ফেলিয়া "নিকাশ" শব্দ উচ্চারণ করিলেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পরিশ্রমী,—ভিক্ষুক সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। "প্রমীলার রাজ্যে" পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অত্যাধিক সুশ্রী ও স্ফূর্ত্তিবিশিষ্টা।[৯] ইহারা অতিশয় অলঙ্কার প্রিয়া। খাসিয়া রমণীগণ ওজন বিশিষ্ট স্বর্ণহার অধিক ভালবাসে। জয়ন্তীয়ায় স্বর্ণকারদের ব্যবসায় এক সময় বিশেষ লাভজনক ছিল এবং এই শিল্প বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল।[১০]

৮. ইহা পার্ব্বত্য খাসিয়া রীতি। যেখানে বিবাহবন্ধন শ্লথ সেই অনার্য্য ভূভাগে এইরূপ রীতি প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়।

৯. এই বিষয়ে একটি প্রবাদ-বাক্য আছে যথাঃ–
"পান পানি নারী, তিনে জয়ন্তীয়া পুরী।"
বাংলা পাণ হইতে খাসিয়া পাণ উৎকৃষ্ট, জয়ন্তীয়ার নদীগুলি সুজলা (–সারি নদীর সুনির্ম্মল জলের তলস্থ বিচরণশীল মৎস্য সুস্পষ্ট দেখা যায়), এবং নারীগণ বিশেষ কান্তিবিশিষ্টা।

১০. জয়ন্তীয়ায় রমণীগণ সাধারণতঃ যে সকল অলঙ্কার ব্যবহার করে, তাহার নামঃ–
১। লং–উপরকাণের অলঙ্কার। স্বর্ণনির্ম্মিত, লংএর আকৃতি।
২। ছূচী–নিম্ন কাণের অলঙ্কার। (স্বর্ণনির্ম্মিত)
৩। (ক) প্রবাল খচিত স্বর্ণমালা,
(খ) স্বর্ণময় গল্লার গোটা, গলার অলঙ্কার। গলার হার
(গ) মোহনমালা
(ঘ) কণ্ঠি,
৪। নথ, বেশর ও ফুল। (স্বর্ণময়) নাকের অলঙ্কার।
৫। শাখা-রৌপ্যনির্ম্মিত হাতের অলঙ্কার।
৬। বাইনদড়ী, কবজ, হাতপাট্টা–বাহুর অলঙ্কার।
৭। খাড় ও পাজের-পায়ের অলঙ্কার।
এতদ্ব্যতীত "হাসলি" প্রভৃতি আরও দুই চারি পদ অলঙ্কার ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

ধর্ম্ম

জয়ন্তীয়ার রাজারা হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই শাক্ত এবং কেহ কেহ বৈষ্ণব ধর্মেও আস্থাবান ছিলেন। রাজা রাজেন্দ্র সিংহের বৈষ্ণবতা বিশেষরূপে খ্যাত হইয়াছিল। জয়ন্তীয়ায় দুর্গোৎসব পর্ব্ব মহাসমারোহে সম্পাদিত হইত; এই সময়ে নরবলি দানের প্রথা ছিল। মহাবিষুব সংক্রান্তিতেও রাজারা বিশেষ আড়ম্বর করিতেন। পার্ব্বত্য খাসিয়াদের মধ্যে ধর্ম্মহীন গোখাদক থাকিলেও, সিন্টেঙ্গণ হিন্দু ধর্ম্মে আস্থাবান; তাহারা দৈত্য দানব পূজা করিলেও তাহা অনেকটা হিন্দুধর্ম্মের আদর্শে মার্জ্জিত। নাটিয়াঙ্গের সিন্টেঙ্গণ "দুর্গামাই ও কালীমাই"কে পূজা করিয়া থাকে।

দেববিগ্রহাদি

রাজাদের স্থাপিত দেববিগ্রহ ও মহাপীঠ জয়ন্তীয়াবাসী বাঙ্গালী ও খাসিয়া সকলেই সমভাবে মান্য করে। ফালজোরের পীঠাধিষ্টাত্রী কালী ও রূপনাথ ব্যতীত পশ্চাদ্বর্ণিত দেবতার বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। জয়ন্তেশ্বরীর বিষয়ও এস্থলে বর্ণিত হইল না, তদ্বিবরণ প্রসঙ্গতঃ স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে। জয়ন্তীয়ার হরিপুরে "তপ্তকুণ্ড" নামে একটা উষ্ণ কুণ্ড আছে, তদ্বিবরণও অন্যত্র কথিত হইয়াছে।

বিন্নাটেকের কালী—এই কালীকে লোকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভয় করিয়া থাকে।

ইহার বাড়ীর নিকট দিয়া যে খাল প্রবাহিত হয় তাহার নাম "কালিকার খাল" হইয়াছে। এই কালী পূর্ব্বে বামজঙ্ঘাপীঠের নিকটে ছিলেন।

বাউর ভাগের কালী—একফুট দীর্ঘ, নয় ইঞ্চি প্রসর একখণ্ড প্রস্তরে এই কালীমূর্ত্তি উৎকীর্ণ। ইঁহার প্রসাদ কেহই খায় না। কথিত আছে যে, ইঁহার প্রসাদ ভক্ষণে রোগ জন্মে ও মৃত্যু হয়।

গৌরী শঙ্কর—রাজবাটীর এক মাইল উত্তরে এক শৈল খণ্ডের উপরে এক প্রস্তরখণ্ডে শিব ও দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র পল্লীটি দেবতার নামানুসারে "গৌরীভুবন" বলিয়া খ্যাত।

উমনন্দী—বড় গাঙ্গের তীরে প্রাচীর বেষ্টিত এক মন্দিরে হরপার্ব্বতীর প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত। ইহা উমানন্দী মন্দির নামে খ্যাত।

ভোলানাথ (দুইজন)—১. নিজ পাটের ভোলানাথ ছয়বুড়ী নদীতীরে অবস্থিত। ২. কামাইদ গ্রামের ভোলানাথ (আড়াই খাঁ পরগণাধীন) কামাইদ গ্রামে অবস্থিত। কথিত আছে, এই মহাদেবকে কুঠারঘাত করায় জনৈক যবন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জগন্নাথ—ডৌডিগ গ্রামে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তি আছেন।

রথযাত্রায় রাজারা এই স্থানে রথ দর্শন করিতেন।

নিজ পাটের কালী—এই কালীর বিবরণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। মহারাজ বড় গোসাঞি, লীলাপুরী দ্বারা এই কালী প্রতিষ্ঠা করেন ও পশ্চাৎ স্বয়ং সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ ইঁহার অর্চ্চনায় জীবন কর্ত্তন করেন ও বহুতর নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। অদ্যাপি বাজেরাজ পরগণার গোবিন্দপুরে--৩৯৭/০ বিঘা, বর্ণফৌদের ঝিঙাবাড়ীতে ৮৫/০ বিঘা ও ৫২৭/০ বিঘা, বাউরভাগের দলইর কান্দিতে ৪৫/০ বিঘা নিষ্কর ভূমি আছে। লীলাপুরী সেবায়েতগণের নামাবরী এইঃ—

প্রথমতঃ—লীলাপুরী। (সন্ন্যাসী)

তৎশিষ্য-রাজপুরী। (মহারাজ বড় গোসাঞি)

" —আত্মাপুরী।

"—গোবিন্দপুরী।

"— দয়ালপুরী।

"—বিশ্বনাথপুরী।

"—রামপুরী।

"—কৈলাশপুরী ও গণেশপুরী।

ইঁহারা জীবিত আছেন।

রামেশ্বর শিব—ইঁহারা বিবরণও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। রাজা রামসিংহ (দ্বিতীয়) এই শিব প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারই মন্দির প্রসিদ্ধ ঢুপীর মঠ। রাজা দেবসেবার জন্য বহু দেবত্র দান করেন, অদ্যাপি বাজেরাজ, খরিল, জয়ন্তীয়াপুরীরাজ প্রভৃতি পরগণায় ৪৭৮/০ বিঘা নিষ্কর ভূমি এই দেবতার) সেবা পরিচালনার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। রুকড়পুরী হইতে সেবায়েতগণের নামবলী এইঃ—

প্রথমতঃ—রুকড়পুরী। (সন্ন্যাসী)

তৎশিষ্য—লালপুরী।

তৎশিষ্য—জগন্নাথপুরী।[১১]

তৎশিষ্য— গোবিন্দপুরী।

তৎশিষ্য—কল্যাণপুরী।

তৎশিষ্য—ভৈরবপুরী। (জীবিত)

তৎশিষ্য—ভবানীপুরী। (জীবিত)।

শ্রীযুক্ত ভৈরব পুরী সন্ন্যাসীর বয়ঃক্রম প্রায় ১০০ শত বৎসর হইবে। সাধারণে ইঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া মান্য করে। শুনা যায় যে, নিশীথ সময়ে ইনি ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুপূর্ণ জঙ্গল দিয়া গমনাগমন করেন; ব্যাঘ্রাদি তাঁহার কোন অনিষ্টই করে না। এই সাধু মহাত্মার পবিত্র নামের সহিত আমরা জয়ন্তীয়ার সাধারণ বিবরণ পরিসমাপ্ত করিলাম।

---

১১. রাজা রামসিংহের প্রদত্ত সনদে দৃষ্ট হয় যে, রুকড়পুরীর শিষ্য লালপুরী এবং তৎশিষ্য জগন্নাথপুরী। ইহাই যথার্থ বোধ হয়। মতান্তরেঃ-

রুকড়পুরী

ভবানীপুরী ভৈরবপুরী

তৎশিষ্য - জগন্নাথপুরী

" - গোবর্দ্ধনপুরী

" - কল্যাণপুরী।

" - ভৈরবপুরী। (জীবিত)

" - ভবানীপুরী।"

পঞ্চম খণ্ড

ইংরেজ প্রভাব

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অবস্থা

পাশ্চাত্য জাতির ভারতাগমন

ইউরোপীয় জাতির মধ্যে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম পর্টুগীজদের আগমন হয়; ইহাদের পরে ওলন্দাজগণ চুঁচুড়ায় এক উপনিবেশ স্থাপন করে। তৎপর দিনেমারগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে আসিয়া শ্রীরামপুর অধিকার করে। ইহাদের পরেই ইংরেজ জাতীয় বণিকগণের শুভাগমন হয়।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামে এক বণিক সম্প্রদায় গঠিত হয়, ইঁহারা বাণিজ্যার্থে ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক সুরাট, হুগলী, কাশিম বাজার প্রভৃতি স্থানে কুঠী স্থাপন করেন।

ইংরেজ আগমনের অল্প পরেই ফরাসীদের চক্ষু ফুটিল, তাহারা দেখিল যে স্পর্শমণির স্পর্শে রাঙ্ সোণা হয়। অমনি ভারতাভিমুখে ফরাসী জাহাজ ধাবিত হইল। ফরাসীদের অধিকৃতস্থানের মধ্যে ভারতে পণ্ডিচেরী, চন্দ্রনগর এখনও তাহাদের গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা তনয়া জাহানীরার বস্ত্রাঞ্চলে অগ্নি সংযুক্ত হইয়া গাত্র দগ্ধ হয়। চিকিৎসক বৌটন সাহেব ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে সুরাট হইতে দিল্লী গিয়া তাঁহার আরোগ্য করেন এবং অভিপ্রেত পুরস্কার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইলে, মনস্বী চিকিৎসক নিজ স্বার্থাপেক্ষা জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ মূল্যবান জ্ঞান করেন; তাঁহার প্রার্থনানুসারে ইংরেজ কোম্পানী বঙ্গে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীগণ ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম বালেশ্বরে কুঠী স্থাপন করেন। বণিক আর্টজন বিনতভাবে উড়িষ্যার মোসলমান শাসন কর্ত্তার তুষ্টি বিধানে বাণিজ্য বিস্তারে সূত্রপাত করেন।

যখন সিরাজউদ্দৌলা বঙ্গের সিংহাসনে অধিরুঢ়, বঙ্গে তখন ইংরেজ বণিকের বাণিজ্য বিশেষ ভাবে প্রসারিত হইয়াছিল। দৈব্য নির্ব্বন্ধে সেই সময় (১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে) পলাশী ক্ষেত্রে নবাব সৈন্যের সহিত ইংরেজদের এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিশাল নবাব সৈন্যের বিশ্বাসঘাতক অধিনায়কের শৈথিল্য প্রযুক্ত নবাব পক্ষ পরাজিত হইল, ইংরেজগণ বিজয় গৌরবে বঙ্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে অকর্ম্মণ্য নবাব মীরজাফরের সময় ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ গ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট তখন বাঙালার নবাবের অধীনে ছিল, সুতরাং বঙ্গের অপরাপর জিলার ন্যায় শ্রীহট্টেও ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীহট্টের মোসলমান ফৌজদারের অধিকৃত ভূভাগের পরিমাণ তখন ২৮৬১ বর্গমাইল মাত্র ছিল; ইংরেজ কোম্পানী ২৮৬১ বর্গমাইল ভূভাগের রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত হন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী বা শুধু রাজস্ব আদায়ের ভারই গ্রহণ করেন; শাসনভার বা ফৌজদারী ক্ষমতা তখনও মোসলমান নবাবগণের হাতেই ন্যস্ত থাকে। শ্রীহট্টের তৎকালীন মোসলমান ফৌজদারগণের নাম ও শাসন বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত দ্বিতীয়ভাগ দ্বিতীয়খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

শ্রীহট্টে প্রথম ইংরেজ শাসনকর্ত্তা

মোগল শাসন সময়ে শ্রীহট্ট হইতে হস্তী, মসল্লা, কাষ্ঠ প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য ব্যতীত যৎসামান্য কর আদায় হইলেও শ্রীহট্ট শাসনকর্ত্তার পদ অতি গৌরবান্বিত বিবেচিত হইত—বঙ্গীয় নবাবের ঘনিষ্ট আত্মীয়বর্গই এখানকার আমিল পদে নিয়োজিত হইতেন।[১] ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণ করিলে পূর্ব্ববঙ্গের রাজস্ব সংগ্রহ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ ঢাকায় "রেভিনিউ বোর্ড" প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বোর্ড হইতে মিষ্টার থেকারে (Thackera) সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী রূপে শ্রীহট্টে প্রথম আগমন করেন। শ্রীহট্টে তখন যে সকল ইংরেজ কর্ম্মচারী আগমন করেন তাঁহাদের "রেসিডেন্ট" আখ্যা ছিল, ইহাদের পদ অতি সম্মানিত বিবেচিত হইত। এই প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক থেকারের পিতামহ শ্রীহট্টের এই সম্মানিত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

থেকারে শ্রীহট্টে পৌছিয়াই প্রথমে বাসের নিমিত্ত এক বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করেন। নবাব তালাবের পশ্চিম তীরে, বর্তমানে যথায় ডিপুটী কমিশনারের বাঙ্গালা বিদ্যমান, সেই গৃহ তাহারই সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সময় শ্রীহট্টে কোন আদালত ছিল না; তরফের সুলতানসিতে নবাবি বিচারালয় ছিল; বিচারের জন্য অর্থী প্রত্যর্থীগণ সুলতানসি গমন করিত।[২]

মিষ্টার থেকারের সময়ে জয়ন্তীয়া-পতি ছত্রসিংহ শ্রীহট্টের বৃটিশ প্রজাদিগকে নিপীড়িত করেন। ইহাতে মেজর হেনিকার কর্ত্তৃক পরিচলিত হইয়া ইংরেজ সৈন্য জয়ন্তীয়া জয়ে সমর্থ হয়; জয়ন্তীয়া-পতি অর্থ দণ্ড দিয়া কোম্পানী বাহাদুরের তুষ্টি বিধানে অব্যাহতি লাভ করেন।[৩] থেকারের পরবর্ত্তী ইংরেজ কর্মচারীর নাম মিষ্টর সমনার (sumner) এবং মিষ্টার হলাণ্ড (Holland)।[৪]

মিষ্টার সমনারের নাম "আসাম ডিষ্ট্রিক্ট গেজিটিয়ার" গ্রন্থে নাই। সমনার থেকারের সহকারী কর্মচারী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মিষ্টার হলাণ্ড ঢাকা কৌন্সিলের সদস্য ছিলেন। শ্রীহট্টের ভূস্বামীবর্গের সহ ভূমির বন্দোবস্ত ও রাজস্ব নির্দ্ধারণের জন্য ঢাকা কৌন্সিল হইতে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টে প্রেরিত হন। তিনি শ্রীহট্টে আগমন পূর্ব্বক রাজস্বের এক হিসাব প্রস্তুত করেন তাহাতে শ্রীহট্টের রাজস্ব প্রায় ২৫০০০০ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। তিনি ইহাও উল্লেখ করেন শ্রীহট্টের অধিবাসীগণ উদ্ধত প্রকৃতি বিধায় তৎপ্রদত্ত হিসাবানুরূপ রাজস্ব আদায় করা সুকঠিন।[৫]

---

১. "The District Yielded little revenue to Government beyond a few elephants, spices, and wood, **** The station itself was always considered as an honorable appointment. as such was occupied by a near relation of the Nawab of Bengal."
-Hunter's Statistical Acoounts of Assam, Vol. II. (Sylhet).

২. See 'Assam District Gazetteers. VOL. II. (Sylhet) P. 42

৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় ভাগ চতুর্থ খণ্ড তৃতীয় অধ্যায় দেখ।

৪. "After the Dewany had been obtained by British Government, an officer was placed in charge of the District, and Messrs Thackeray Sumner and Holland successively held the appointment."
-Principal Heads of the History and statistic of the Dacca Division. P. 291.
শ্রীহট্টের কালেক্টরগণের ক্রমানুযায়ী নামাবলীজ জ-পরিশিষ্টে (২য় ভাগ ৫ম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

৫. "Mr. Holland having finished his business in that trouble some settlement returned to Dacca and presented his rent-roll to the Council, amounting to no less than Rs. 250000 per annum, but he said at the same time, that they were most turbulent people and that it would require much trouble to realize it"
-The lives of the Lindsaya.

শ্রীহট্টের দেওয়ান

ইতিপূর্ব্বে (২য় ভাগ ২য় খণ্ডে ৩য় অধ্যায়) সাদেকুল হরমাণিক নামাঙ্কিত শ্রীহট্টের মোহরের বিষয় বলা হইয়াছে, মোহরোল্লিখিত মাণিক চাঁদ দেওয়ান দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন, এবং সেই সময়ে তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেও শ্রীহট্টের দেওয়ানীর ভার এতৎকাল পর্যন্ত তাহারই উপর ন্যস্ত ছিল।

মাণিক চাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তরাধিকারী ক্রমে শ্রীহট্টের দেওয়ান ছিলেন। তদীয় পিতা দেওয়ান মুক্তারাম যশস্বী পুরুষ ছিলেন। মণিপুরাধিপতি পেম হেইবার সময় (১৭১৪ খৃষ্টাব্দ) হইতে নানা বিষয়ে শ্রীহট্টের অধিবাসীগণ সহ মণিপুরীদের সংশ্রব ঘটে। অতঃপর মণিপুরের কোন রাজা কিয়ৎকালের জন্য শ্রীহট্টে আসিয়া বাস করেন বলিয়া কথিত আছে। সম্ভবত ব্রহ্মরাজের ভয়ে মণিপুর পতি শ্রীহট্টে আগমন করিয়া থাকিতে পারেন। মণিপুর পতির সহিত সেই সময়ে দেওয়ান মুক্তারামের সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল, তাঁহার চিহ্ন স্বরূপ দেওয়ানকে তিনি দুই দেববিগ্রহ প্রদান করেন। রাজদত্ত সেই দুই বিগ্রহকে মুক্তারাম সাদিপুরে স্থাপন করিয়া দেবসেবার জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন।[৬] এইরূপে সাদিপুরের আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সাদিপুরের দেবত্র ভূমির আয় বর্তমানে সহস্র মুদ্রার ন্যূন নহে। মুক্তারামের একমাত্র পুত্র দেওয়ান মাণিক চাঁদ।

পাথারিয়াবাসী দুর্ল্লব দাস নামক প্রভূত ধনশালী এক ব্যক্তির লবণের এক চেটিয়া কারবার ছিল, তিনি অনেক ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন; মাণিক চাঁদের সহিত তাঁহার এক বৃহৎ মোকদ্দমা ছিল। এই মোকদ্দমায় দেওয়ানকে জওয়াব দাখিল করিতে এবং দেওয়ানী পদের জামানত পুনঃসংস্কার করিতে ঢাকায় যাইতে হয়, এই জন্য হলাণ্ড সাহেবকে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে চার্জ্জ সমজাইয়া দিয়া আপন কাজে ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন।[৭] দেওয়ানের মৃত্যু সম্বন্ধে এক রহস্য আছে; কোন ঘটনায় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু প্রচারিত হয়; ইহার পর তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আত্মগোপন করিতে হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

বাবু মুরারি চন্দ্র দেওয়ানের একমাত্র পুত্র ছিলেন। দেওয়ানের মৃত্যুর সহিত দেওয়ানী পদ উঠিয়া যায়। বাবু মুরারি চন্দ্রের কীর্ত্তিকাহিনী বংশ বৃত্তান্ত খণ্ডে বর্ণিতব্য। শ্রীহট্টের স্বনাম ধন্য

৬. "Raja of Manipur is said to have resided some times in Sylhet The Abaters of the Sadipur Akhra are also said to have been given over to Muktaram, founder of the Akhra and the father of Manika-Chand Dewan, by the Raja of Manipur."

-Hunter's Statistical Accounts of Assam, Vol. II (Sylhet) P. 120

৭. মিঃ হলাণ্ড দেওয়ান হইতে চার্জ্জ গ্রহণ করিয়া ঢাকা-রেভিনিউ কৌন্সিলের বড় সাহেব বরাবরে যে রিপোর্ট দেন, তাহার জাবেদা নকল সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল। মূল কাগজে দস্তখতটা উঠিয়া যাওয়ায় অপাঠ্য হইয়াছে;–

To John Hogarth Esqr, Acting Chief and Co-Provincial Council of Revenue Dacca.

Gentlemen.

Manick Chand the Dewan of this place being obliged to repair to Dacca in order to find Bail and answer to a suit commeneed against him by one Dullab Das in the supreme court of Indicature I have taken upon myself the charge of traansecting the minutes of the Business of this Province till his return.

I have the honour to be your most obedient servent.

Gentlemen

Sylhet

The 12th January 1778.

রাজা গিরিশচন্দ্র ইঁহারই একমাত্র কন্যা ব্রজসুন্দরীর পোষ্য পুত্র ছিলেন এবং মুরারী চাঁদ কলেজ স্থাপন দ্বারা স্বীয় মাতামহের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

হলাণ্ড সাহেব ঢাকা প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার শ্রীহট্টে আসিতে অসম্মত হইলে, রবার্ট লিণ্ডসে (Rober Lindsay) সাহেব শ্রীহট্টের রেসিডেন্টি পদে নিযুক্ত হন। লিণ্ডসে সাহেব ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন ও আড়াই বৎসরকাল ঢাকায় অবস্থিতি করার পর রেসিডেন্ট ও কালেক্টর স্বরূপে শ্রীহট্টে আগমন করেন। তিনি দশ বৎসরের উর্দ্ধকাল এই পদে ছিলেন; মিষ্টার হিণ্ডমেন সাহেব তাঁহার সহকারী কার্যকারক ছিলেন।[৮] লিণ্ডসে সাহেব তাহার শাসন সময়ের বিস্তৃত বিবরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শ্রীহট্টের অনেক কথা অবগত হওয়া যায়।

লিণ্ড্সে সাহেবের শাসনকাল

শ্রীহট্টের প্রাকৃতিক দৃশ্য

লিণ্ডসে সাহেব লিখিয়াছেনঃ—

"আমি ঢাকা হইতে নৌকা যোগ অনুকূল স্রোতে যাত্রা করিলাম। বিংশতি মাইল অতিক্রান্ত হইলেই নৌকা এক বিশাল জলস্রোতে পতিত হইল, ইহার নাম মেঘনা (মেঘনাদ)। এই স্রোত অবলম্বনে আমাদিগকে বহুদূর অগ্রসর হইতে হইবে। নীল লহরীমালা বিলসিত জলরাশি থৈ থৈ করিতেছে, অল্প বায়ুবেগেই বিশাল তরঙ্গরাজি উত্থিত হইতেছিল। আমার নৌকা তৎপর শত মাইল বিস্তৃত এক হ্রদে উপস্থিত হয়। নৌকার গতি নির্দ্ধারণের জন্য আমাদিগকে সমুদ্র যাত্রার উপযোগী কম্পাস যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।"[৯]

"নৌকা ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। কোথাও জলরাশির মধ্যে দ্বীপের পর মনুষ্যবাস সমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। প্রত্যেক গৃহস্থের নৌকাই সম্বল। জল পরিপ্লাবিত এইরূপ বহুস্থান অতিক্রম করিয়া নৌকা শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চলিল। অর্দ্ধ জলমগ্ন সুন্দর সবুজ ধান্যক্ষেত্র; গাছগুলি সরিয়া অগ্রগতি নৌকার পথ দিতেছিল এবং নৌকা অগ্রসর হইলেই পশ্চাতে পুনঃ মস্তক তুলিয়া দণ্ডায়মান হইতেছিল, এ দৃশ্য অতি মনোমুগ্ধকর;[১০] কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষ অগণ্য পতঙ্গের উৎপাতন বড়ই বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল; দীপ জ্বালিলে ইহাদের উৎপাত প্রবর্দ্ধিত হইত।"

"যাত্রার সপ্তম দিবসে প্রায় চল্লিশ মাইল দূর হইতে শ্রীহট্টের উচ্চ পদস্থ শ্রেণীর মেঘসন্নিভ শ্যামল দৃশ্য নয়ন পথে পতিত হইল। নৌকা অগ্রসর হইলে ক্রমে সুরমা বক্ষে চলিতে লাগিল, আর ত্রিশ মাইল অগ্রসর হইলেই শ্রীহট্ট পৌঁছা যাইবে। এথা হইতে নৌকা ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিল, নদীতীর ক্রমশঃ উচ্চ দেখাইতে লাগিল এবং চতুষ্পার্শের দৃশ্য মনোহারী চিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল।"

---

৮. শ্রীহট্ট দর্পণ পুস্তিকায় হড্সন এবং অন্যত্র হামিল্টন বলিয়া লিখিত আছে। ঢাকা ব্লু বুকে "হিণ্ড্মেন" নাম দৃষ্ট; আমরা এই নাম এস্থলে গ্রহণ করিয়াছি।

৯. "In passing my boat to-wards Sylhet. I had recourse to my Compass, the same as if sea and stecred a straight Course through a lake not less than one hundred miles in extent."
-The Lives of the Lindsays.

১০. "In crossing this country. I frequently passed through the fields of wild rice, **** The herbage giving way to the boat as it advanced and again rising immediately behind it, formed a very novel scene."
-The Lives of the Lindsays.
লিণ্ডসে দৃষ্ট হ্রদ (হাওর) ক্রমশঃ ভরট হইয়া যাইতেছে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইহাই প্রকাণ্ড সাগর সদৃশ ছিল।

শ্রীহট্ট সহর ও দরগা

"আমলাগণ তরণী সুসজ্জিত করিয়া অভ্যর্থনার জন্য শ্রীহট্ট হইতে আগমন করিয়াছিল, এবং আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিল। একটি বৃহৎ বাজার ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি টীলা এবং প্রায় সমসংখ্যক হিন্দু মুসলমান অধিবাসীগণের আবাস গৃহ লইয়াই তখনকার সহর ছিল।[১১] শ্রীহট্টে শাহজলালের প্রসিদ্ধ দরগার কথা আমি জ্ঞাত হইয়াছিলাম; ভারতবর্ষের প্রত্যেক অংশ হইতে মোসলমান যাত্রীগণ এই দরগায় সমাগত হইয়া থাকে।"

"নবাগত রেসিডেন্টকেও এই দরগার সম্মান প্রদর্শন করিতে হইত, ইহাই চিরন্তন রীতি ছিল। সেই রীতি অনুসারে আমাকেও পাদুকা বাহিরে রাখিয়া নগ্নপদে কবর দর্শনে ও পীরের সম্মানার্থ তথায় পাঁচটি সুবর্ণ মুদ্রা উপঢৌকন দিতে হইয়াছিল।",

"দরগা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে প্রজাপুঞ্জ সম্মান প্রদর্শনে আসিতে লাগিল হিন্দু অনুশাসনানুসারে রিক্তহস্তে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করা অনুচিত। কাজেই সাক্ষাৎকারীদের উপহৃত রৌপ্য মুদ্রায় আমার টেবিল আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। এক টাকার কম কেহই প্রদান করে নাই। সম্ভ্রান্ত দাতাদিগকে কিছু পান সুপারি দিয়া বিদায় করা হইয়াছিল।"

"হলাণ্ড সাহেবের কর্ম্মচারী গুকরি সিং (মতান্তরে গোলাব সিং) এবং প্রেম নারায়ণ বসু নামে দুই ব্যক্তি তখনকার বিভিন্ন অফিসের কার্য চালাইতে ছিল, ইহারা বেশ সচ্চরিত্র লোক। আমি তাহাদিগকে নিজকার্যে বহাল রাখিয়া ছিলাম। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষ ত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত আমার নিকট ছিল এবং পরেও আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় পত্র লিখিত।"

লিণ্ডস সাহেবের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে দেশের শাসনভার তখনও মোসলমান নবাবের হাত ছিল। রাজস্ব বিভাগ ব্যতীত বিচার সম্পর্কে তাঁহার নিজের পরও এক আদালত ছিল। কিন্তু বিচার কার্যে দেশীয় পণ্ডিতবর্গ হইতে তিনি আইনের ব্যাখ্যা বিষয়ে সহায়তা পাইতেন।

অশান্তি দমন

লিণ্ডসে সাহেব শ্রীহট্টে, আসিয়াই এক গোলযোগে পতিত হন। কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের প্রাক্কালে খাসিয়ারা মোসলমান ফৌজদারদের সহ নিয়ত বিরোধ করিত, ইংরেজ আমলের আরম্ভকালেও তাহা তিরোহিত হয় নাই, ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দেই ইহার সূত্রপাত হয়। ইংরেজ পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি অনেক জাতীয় লোকেরা ব্যবসায়োপলক্ষে শ্রীহট্টে থাকিত, "নিম্নশ্রেণীর" এই সমস্ত ইউরোপীয় জাতির অসদ্ব্যবহারে খাসিয়ারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। লিণ্ডসে সাহেব এই ব্যবসায়ীদিগকে রক্ষার জন্য এক ক্ষুদ্র দুর্গ প্রস্তুত করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।[১২] কেবল সীমান্ত দেশে নহে, দেশের অভ্যন্তরেও এই সময়ে একটি গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এই সনে কোন নীলাম ক্রেতাকে ভূমিতে দখল দেওয়াইবার জন্য দশজন সিপাহী ও হাবিলদার বালিশিরা প্রেরিত হয়। ইহাতে ভূমির পূর্ব্বাধিকারী উত্তেজিত হইয়া দুইজন সৈনিককে হত ও বহুতর ব্যক্তিকে আহত করে। কেবল তাহাই নহে, এই সময় গবর্ণমেন্টের রাজস্ব, ২০০০ সহস্র টাকার কৌড়ি বোঝাই নৌকা লুণ্ঠন করে। এই সংবাদ প্রাপ্তে শ্রীহট্ট হইতে নূতন সৈন্যদল বালিশিরা প্রেরিত হয় ও তাহারা নীলাম ক্রেতাকে ভূমিতে দখল দেয়। তৎকালে পূর্ব্বাধিকারী অনুপস্থিত ছিল, কিন্তু সে সত্ত্বরেই বহুলোক লইয়া উপস্থিত হইল;

১১. The Lives of the Lindsays VoL. III P. 167.
১২. Allen's Assam District Gazetteer's VoL. II. (Sylhet) P. 53

যাহাকে পাইল, কাটিতে লাগিল; কাছারী প্রভৃতিতে অগ্নিসংযোগ করিল ও বহুতর সিপাহীকে নিহত ও বন্দী করিয়া পলাইয়া গেল।[১৩] যাহা হউক, এই বিদ্রোহীকে কর্তৃপক্ষ ঢাকায় গ্রেফতার করায় অশান্তি দমিত হয়।

শ্রীহট্টে কৌড়ি-মুদ্রা ও রাজস্ব

নবাব আমলে শ্রীহট্টে কৌড়ির প্রচলন ছিল, লিণ্ডসে সাহেব কৌড়ির বিভ্রাটে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির অনুকরণে তিনি এই সময় চূণার ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন;

"ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেব ন্যায় শ্রীহট্টে রাজস্ব আদায় হইত না। এদেশে রৌপ্য বা তাম্রের প্রচলন ছিল না বলিলেও হয়। আফ্রিকার রমণীগণ যে কৌড়িকে অঙ্গের ভূষণ মনে করে, তাহাই এথায় মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত, বাঙ্গালার অন্যান্য অংশে যে কৌড়ি নাই তাহা নহে; তথায় ইহা সামান্য খাদ্যোপকরণ ক্রয়ার্থ ইতর শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ। সমুদ্র হইতে সার্দ্ধ শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্রীহট্টে কিরূপে কৌড়ি প্রধান মুদ্রার স্থান অধিকার করিল, বলা যায় না।

"আশ্চয্যের বিষয় যে বালেশ্বর হইতে চট্টল পর্যন্ত, অথবা মালাবার বা করমণ্ডলের বিশাল উপকূল ভাগের কোথাও কৌড়ি অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। শ্রীহট্ট হইতে সার্দ্ধ সপ্তশত ক্রোশ দূরবর্ত্তী মালদ্বীপ ও নিকোবর দ্বীপদ্বয়ে বহুল পরিমাণে কৌড়ি জন্মিয়া থাকে।

"আমার সংগৃহীত রাজস্বের মোট পরিমাণ ২৫০০০০ টাকা হইয়াছিল। এই টাকার বিপুল কৌড়িরাশি রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ করা যে কতদূর আয়াসসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই সকল কৌড়ি রাখার জন্য অনেকগুলি বড় বড় ঘর নির্মাণ ও বৎসর শেষে এক বৃহৎ তরী শ্রেণী সজ্জিত করতঃ ঢাকায় প্রেরণ করিতে হইত। ইহাতে শতকরা দশটাকা ক্ষতি হইত। ঢাকা যাওয়ার পথেও আরও কতক অপচয় ঘটিত।"

"আমার পূর্ব্বে ঢাকায় কৌড়ি পাঠাইতে এক একটি করিয়া গণনা করার প্রথা ছিল, আমি তাহা উঠাইয়া ওজন পূর্ব্বক কৌড়ি গ্রহণের প্রথা প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিলে আমার বিচরণ কৃষ্ণকায় খাজাঞ্চি তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রকাশ করে। কিন্তু আমার হুকুম অন্যথা হইবার নহে, কাজেই ওজন আরম্ভ হয়। কিন্তু কৌড়ির গায়ে বালি সংলগ্ন থাকায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা এক তৃতীয়াংশ অধিক মূল্য দাঁড়াইল। আমি তখন একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাপ যন্ত্র নির্ম্মাণ ক্রমে তদ্দারা ওজন কার্য সমাধা করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ খাজাঞ্জির পরামর্শে এক ঝুড়িতে কৌড়ি রাখিয়া পরিমাপের কার্য নির্ব্বাহ করা হইত। এইরূপে রাজস্ব আদায় করিয়া ঢাকায় প্রেরণ ও প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় পূর্ব্বক রৌপ্য মুদ্রায় পরিণত করা হইত। সুখের বিষয় যে, এই প্রথা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, সত্ত্বরেই তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়।"

রেসিডেন্টের বেতন ও তখনকার বাণিজ্য

"এখন ব্যবসায় বাণিজ্যের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র আমার নয়ন সমক্ষে প্রসারিত দেখিতে পাইলাম। রেসিডেন্টরূপে আমার বার্ষিক বেতন পঞ্চ সহস্র মুদ্রার অধিক ছিল না; সুতরাং ধনোপার্জ্জনের উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; তাহা ব্যক্তিগত পরিশ্রমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত।"

১৩. Allen's Assam District Gazetteers VoL. II (Sylhet) P 39

"দেশের নিম্নভূমির অবস্থা শোচনীয় ছিল, ধান্য ব্যতীত তথায় আর কিছু জন্মিত না। পাহাড় সংলগ্ন ভূমির অবস্থা কিছু উন্নত ছিল, তথায় ইক্ষু, তুলা প্রভৃতি মূল্যবান শস্য জন্মিত। ইহা ছাড়া উচ্চস্থানে নৌকা ও অর্ণবপোত উপযোগী উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ ও উচ্চ অঙ্গের লৌহ পাওয়া যাইত। চীন সীমান্ত হইতে 'মুগাজ ধুতি' নামক নিম্নশ্রেণীর রেশম আমদানী হইত। তদ্ব্যতীত পর্ব্বত শ্রেণী চুণের অফুরন্ত ভাণ্ডার স্বরূপ ছিল।"

"বাণিজ্যের এই শাখার উপরেই আমার ভাবি সৌভাগ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পাহাড়ের তলভূমিতে উৎকৃষ্ট হাতীও পাওয়া যাইত। আরও অনেকগুলি সামান্য জিনিষ বিক্রয়ার্থ বিদেশে প্রেরিত হইত। যথা—খারাপ মসলিন, গজদন্ত, গম, মধু ও বনজ ঔষধ। যথাসময়ে প্রকৃতি সতী অক্ষয় ভাণ্ডার খুলিয়া ললাম কমলা লেবু বিলাইতেন।"

"চূণাব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পারিলাম যে, গ্রীক, আর্ম্মেনিয়ান ও নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয়গণ কর্তৃক সামান্য ভাবে ইহার ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে। তাহাদের অপেক্ষা আমার অধিক সুযোগ সুবিধা থাকায় সত্ত্বরেই এক চেটিয়া অধিকার হইবে বলিয়া আমার ধারণা জন্মিল।"

লিণ্ডসে সাহেবের চুনার ব্যবসায়

"এরূপ ধারণা আমার অন্যায় হয় নাই; সত্ত্বরেই আশাতিরিক্ত ফল লাভ হইল। যে কৌড়িরাশি রাজস্ব স্বরূপ আদায় হইত, তাদ্বারা আমি চুনা ক্রয় করিয়া, বিদেশে রপ্তানি করিতাম এবং ছয়মাস মধ্যে তাহার মূল্য স্বরূপ রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া ঢাকায় রাজস্ব প্রেরণ করিতাম।"

"চূণের পাহাড় আমাদের এলাকাধীন ছিল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন দলপতিগণের অধিকারে ছিল। ঐ চূণা পাহাড় তাহাদের নিকট হইতে পত্তনি গ্রহণ করার বাসনা আমার হৃদয়ে জাগরূক হয়। সুতরাং দলপতিদের নিকট আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। তাহারা এতদ্বিষয়ে ইতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ জন্য পূর্ব্বে আমার সহিত দেখা করিতে চাহিল। গিরি-পাদলগ্ন পাণ্ডুয়াভূমে সভার স্থান স্থিরীকৃত হইল।"

"প্রকৃতি দেবী তথায় বড় মোহন বেশে সজ্জিতা হইয়াছেন। উচ্চ গিরি চূড়াগুলি মনোহর পত্র পুষ্পে শোভিত হইয়া সমতল ভূমি হইতে কেমন সুন্দর সোজাভাবে উত্থিত হইয়াছে; বৃক্ষে বৃক্ষে উষ্ণদেশ সুলভ নানা জাতীয় ফুল ফলরাজি কি সুন্দর শোভাই বিকাশ করিতেছে প্রকৃতির এহেন রূপমাধুর্য আমি আর কোথাও দেখি নাই। বিশাল গিরিহৃদয় লম্বমান রজতরেখারূপী জলপ্রপাত সমূহে বিভক্ত হইয়া কি অনুপম শোভাই প্রকটিত করিতেছিল। প্রবাহিনীর বারিই বা কি স্বচ্ছ, নিম্নে যে জলজন্তুগুলি খেলিয়া বেড়াইতেছিল তাহাও পরিদৃশ্যমান হইতেছিল; আমার মনে হইল, আমি যেন স্বর্গরাজ্যের মনোরম প্রদেশে উপবেশন করিয়া রহিয়াছি।"

"কিন্তু এই সাধের ইডেন উদ্যানের অধিবাসীদিগকে দেখিয়া আমার সে চমক ভাঙ্গিল। বিপুল পার্ব্বত্য রাজ্যের নানাভাগ হইতে দলপতি-দল বহু সহচর পরিবৃত হইয়া রণবেশে আমার সহিত দেখা করিতে উপস্থিত হইল। আমার সহিত তাহাদের শান্তি ও বন্ধুতার ভাব ব্যতীত আর কিছু না থাকিলেও তাহাদের ভাবভঙ্গি, যুদ্ধনাদ ও অস্ত্রসঞ্চালনাদি দৃষ্টে বোধ হইল যে, অপরাপর অসভ্য জাতি হইতে তাহাদের প্রকৃতি কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে।"

"কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইলে দলপতিগণ আমাকে চূণের খনি দেখাইতে চাহিল। তদনুসারে ছয় খানা নৌকা সজ্জিত হইলে, প্রত্যেক নৌকায় ছয়জন করিয়া বলিষ্ঠ নাবিক নিয়োজিত করা হইল। বহুকষ্টে আমরা চূণা পাহাড়ে উপনীত হইলাম। আমি তথায় যে পরিমাণ চূণা দেখিলাম,

তাহাতে সমস্ত পৃথিবীর কার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতে পারে। চূণা বোঝাই হইলে নৌকাগুলি যেন বিদ্যুদ্বেগে অবতরণ করিতেছে মনে হইল।"

"পাণ্ডুয়ায় অবস্থিতি কলে রেশম, নানাজাতি ফল ও উৎকৃষ্ট লৌহ লইয়া একদল অসভ্য জাতি আসিয়াছিল। তাহাদের স্ত্রীলোকেরাও ভার বহন করে। অধিকরূপে পাণ ও চূণ ব্যবহার করায় তাহাদের দাঁত ভয়ানক কাল, দেহ পুরুষোচিত কর্কশ। কিন্তু যুবতীগণ সুশ্রী এবং বিবাহ না হইলে পাণ চর্ব্বণের অধিকার নাই বলিয়া দাঁতগুলিও পরিষ্কার। তাহাদের বলের বিষয় আমি কল্পনাও করিতে পারি না। আমি একটি বালিকার লৌহভার উঠাইবার অনুমতি লই। কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়া আমি কৃতকার্য্য হইতে না পারায় তাহাদের মধ্যে হাসির রোল পড়িয়া যায়।"

দেশী সৈন্য

"আমার সঙ্গে এক শতের অধিক সৈনিক পুরুষ ছিল না। তন্মধ্যে প্রায় অধিকাংশই হিন্দুস্থানী লোক থাকায় পার্ব্বত্য প্রদেশের জলবায়ু তাহাদের সহ্য হইল না, তাহারা দলে দলে মরিতে লাগিল। আমি তখন দেশ রক্ষার জন্য দেশী সৈন্য সংগ্রহের বিষয় বোর্ডে লিখিলে, শ্রীহট্টবাসী দ্বারা এক দল সৈন্য গঠন করিবার অনুমতি লাভ করি। অচিরেই আমার অধিনায়কত্বের একদল দেশী সৈন্য প্রস্তুত হইল। আমার ইচ্ছামত আমি ঐ সৈন্য দলের সংখ্যার হ্রাস করিতে পারিতাম এবং কোন বিপজ্জনক কার্য উপস্থিত হইলে আমি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতাম।"[১৪]

ভীষণ বন্যা

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এবং তৎপরবর্ত্তী শ্রীহট্টে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছিল, এমন কি লোকের গোলাগৃহ ধান্য ধারণে সক্ষম হয় নাই। দেশের লোক উৎফুল্ল হইল, দেশে আনন্দ উৎসব চলিতে লাগিল, কিন্তু এ আনন্দ অচিরাৎ ঘোর নিরানন্দে পরিণত হইয়া গেল।

প্রচুর বৃষ্টি হইয়া নদীতে হঠাৎ ত্রিশ ফিট জল বৃদ্ধি পাইল, দেখিতে দেখিতে লোকের বাড়ী ঘর ডুবিয়া গেল, গরু মহিষ ভাসিতে লাগিল, লোক মাচা প্রস্তুত করিয়া অনেকেই তাহাতে আশ্রয় লইল। সে এক ভীষণ দৃশ্য, লোকের আর্তনাদ, জলের কল কল ধ্বনি;-গৃহ প্রাঙ্গনে সাগর তরঙ্গ খেলা করিতে লাগিল। সমগ্র দেশে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল, ভীষণ বন্যা দেশটাকে একাবারে ছারখার করিল। লিণ্ডসে সাহেব লিখিয়াছেনঃ—

"এতদপেক্ষা ভয়াবহ দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না। ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে এত গো মহিষ প্রভৃতি অসংখ্য জীব প্রাণ হারাইতে ছিল যে, যার কোন উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভব ছিল না। বিগত বৎসরের অপরিমিত শস্যে পরিপূর্ণ নদীতীরস্থিত ভাণ্ডার-গৃহগুলি বিশাল বন্যাস্রোতে ভাসিয়া গেল। উচ্চ ভূমিস্থিত সামান্য কতিপয় শস্যাগার ভিন্ন থাকিবার মধ্যে কিছুই রহিল না;

১৪. "Our military strength did not in general exceed one hundred effective men. The men were chiefly natives of the higher provineess but the climate of the hills was so pernicious to their health that the whole detachments were destroyed. I proposed to the Board to undertake the defence of the Province myself. at an expense far inferior to the former, with native troops formed into a militia corps. This was readily agreed to the command remained with me, and this arangment continued during my residence in this country My corps I increased or reduced as occasion required. I accompanied them myself in every service of difficalty." -The Lives of the Lindsays.

রহিল কেবল দেশব্যাপী হৃদয়ভেদী আর্তনাদ। দর্শদিনের মধ্যে দারুন অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল, প্রচুর শস্য ও সমৃদ্ধিপূর্ণ শ্রীহট্টভূমি দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইল।"

"আমি নিরুপায় হইয়া, যে সমুদায় ধান্য বিক্রয়ার্থ বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা পুনরানয়ন জন্য নৌকা পাঠাইলাম। কিয়দংশ ধান্য পুনরানীত হইল বটে কিন্তু গতবারের অধিকাংশ ধান্য বিনষ্ট হওয়ায় এবং এবারের ফসলও অগাধ জলে নিমগ্ন থাকায় দেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে অধিবাসীগণকে রক্ষা করার কোন উপায়ই দৃষ্ট হইল না।"

"আমি নিজে বিষম সমস্যায় পতিত হইলাম। পূর্ব্বে "সুপ্রিম বোর্ডে" দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রেরণ করি বর্ত্তমানে ঠিক তাহার বিপরীত বিবরণ প্রেরণ করিত হইল। গবর্ণমেন্ট যদিও তৎকালে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তথাপি এই বিবরণ তাহাদের এত অসম্ভব বোধ হইল যে, তাহারা দেশের অবস্থা জ্ঞাপন জন্য একজর্ন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে স্থানীয় তদন্তের জন্য পাঠাইলেন। সে ব্যক্তি নিম্নভূমির নিদারুন দুর্গতি দেখিয়াই আমার প্রত্যেক বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিল। কাজেই গবর্ণমেন্ট বিশেষ সাহায্য করিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও-বলিতে দুঃখ হয়, প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক দারুণ জঠর জ্বালায় প্রাণ হারাইল।"

শ্রীহট্ট ইজারা

যখন শ্রীহট্টবাসীর এইরূপ দুঃসময় উপস্থিত, তখন তাহারা আর এক সমস্যায় পড়িয়াছিল। গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভারত শাসনকাল ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; তিনি নিজ প্রিয়পাত্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে বঙ্গের কোন কোন জিলা ইজারা দিয়াছিলেন। ইহাতে পূর্ব্ব মালিকগণকে স্বসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া ইজারাদারের গৃহীত রাজস্ব হইতে কিছু কিছু খোরাকী মাত্র পাইয়াই তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল।[১৫] লিণ্ডসে জীবনী গ্রন্থে কথিত আছে যে, শ্রীহট্ট জিলাও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইজারা নিয়াছিলেন।

এই সময় গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শ্রীহট্টে আগমন করেন, তদবসরে লিণ্ডসে সাহেব ঢাকা হইয়া কিছুকালের জন্য হিন্দুস্থান দেখিতে গমন করেন। গঙ্গাগোবিন্দ স্বয়ং শ্রীহট্ট আগমন করিয়াও রাজস্ব সংগ্রহে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়া চলিয়া যান। লিণ্ডসে সাহেব তখন বেনারসে ছিলেন, জরুরী চিঠি দিয়া বেনারস হইতে তাঁহাকে আনাইয়া শ্রীহট্টে পুনঃ প্রেরণ করা হয়। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন যে, শ্রীহট্টের লোককে শাসন করিয়া, রীতিমত রাজস্ব সংগ্রহ করা "কালা আদমীর কাজ নহে।" এই অত্যল্প কাল লিণ্ডসে সাহেব শ্রীহট্টে না থাকিলেও হামিল্টন নামে তাঁহার এক সহকারী ইংরেজ কর্মচারী সস্ত্রীক শ্রীহট্টে ছিলেন। হামিল্টনের স্ত্রীর পূর্ব্বে কোন ইংরেজ-মহিলা শ্রীহট্টে আগমন করেন নাই।

লিণ্ডসে সাহেব যখন ঢাকা গমন করেন; তখন বন্যার জল অপসারিত হইয়াছিল বটে কিন্তু খাদ্যাভাবে লোকে তখনও কষ্ট পাইতেছিল, আহারের জন্য হাওরের গভীর জলে ডুব দিয়া শালুক বা নীলোৎপলের মূল ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে সাহেব বহুলোককে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি শ্রীহট্টে প্রত্যাগত হইয়াও শ্রীহট্টবাসী জনসাধারণের ক্লেশ অপনোদন করিতে সমর্থ হন নাই। পূর্ব্বে পেটের কঠোর জ্বালায় লোককে ঘাস পাতা খাইতে হইয়াছিল, পরে অন্নকষ্ট বিদূরীত হইলেও শ্রীহট্টের অধিবাসীগণের দুঃখের অবসান হয় নাই। অল্পাহারের পর পূর্ণ আহার অনেকেরই অসহ্য হইয়াছিল।" তজ্জন্য আমাশয়; উদরাময় প্রভৃতি রোগের উৎপাত উপস্থিত হইয়াছিল।

১৫. W. W. Hunter's Adessertaion on landed property &c.

মোহরমের হাঙ্গামা

বিপদ বিপদকে আকর্ষণ করে; এই সময় শ্রীহট্টে এক ভীষণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। লিণ্ডসে সাহেব শ্রীহট্টের হিন্দুগণের নানা গুণের প্রশংসাবাদ করিলেও মোসলমানদিগকে উর্দ্ধত ও অদম্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তৎকালীন মোসলমানগণ ইংরেজদিগকে বিদ্বেষ করিত, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মোহরম পর্ব্ব উপলক্ষে শ্রীহট্টবাসী মোসলমানগণ এই বিদ্বেষের প্রকাশ্য পরিচয় দিয়াছিল। শ্রীহট্টে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ কল্পে তাহারা বদ্ধপরিকর হইলে যে হাঙ্গামো উপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে লিণ্ডসে সাহেব লিখিয়াছেন—

"মোহরম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম্মালম্বী ব্যক্তিবর্গের বার্ষিক ধর্মোৎসব হওয়ার প্রাক্কালে একদল হিন্দু অধিবাসী আমার নিকট গোপনে এই কথা জানায় যে উৎসবে মোসলমানগণ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হওয়ার নিশ্চিত সংবাদ তাহারা পাইয়াছে এবং হিন্দু দেবমন্দিরাদিতেই যে এই আগমণের প্রথম সূচনা হইবে, তাহারও উল্লেখ করে। তদুত্তরে, "এইরূপ উত্থানের কোন পরিচিহ্নই আজ পর্যন্ত লক্ষিত হয় নাই ও তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে;" এই বলিয়া আমি তাহাদিগকে বিদায় করি। আমার সৈন্যগণ তৎকালে প্রদেশময় নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত থাকায় ৪০ বা ৫০ জনের অধিক কর্মঠ লোক একত্র করিতে পারি নাই; এই সামান্য সৈন্যবল প্রস্তুত রাখিবার জন্য আমার কৃষ্ণকায় জমাদারকে আদেশ করি।"

"উৎসব দিনে রাত্রি পাঁচ ঘটিকার পূর্ব্ব পর্যন্ত কোন দুর্ঘটনাই ঘটে নাই। তৎপর দলে দলে হিন্দু অধিবাসীগণ দ্রুত পদ বিক্ষেপে, যেন প্রাণ ভয়ে আসিয়া আমার বাসভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সকলের গায়েই মোসলমানদের অত্যাচারের চিহ্ন বিদ্যমান, সকলেই আহত। এ দৃশ্য অবলোকনে আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক পিস্তলগুলি সজ্জিত করতঃ প্রিয় ভৃত্যের হস্তে অর্পণ করিয়া, তাহাকে অনুক্ষণ আমার কাছে থাকিতে ও আমাকে বিপদাপন্ন দেখিলে এই পিস্তল আমার হাতে দিতে আদেশ করি। তৎপর আশ্বারোহীর একখানা হাল্কা তরবারি হাতে লইয়া বর্হিগত হই। বিলম্বের সময় ছিল না, শহরের নানাদিকে আগুন জ্বলিয়া ছিল।"

এই সমস্ত সৈন্যবল লইয়া লোকসমারোহের দিকে অগ্রসর হইলাম। লোকসংখ্যা সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল, তদপেক্ষা অনেক অধিক দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। আমার অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পশ্চাতে হটিয়া একটি পাহাড়ের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। আমি তাহাদিগকে অনুসরণ ক্রমে পাহাড়ের শিখর দেশে উপনীত হইয়া তৎসম্মুখস্থ সমতল ক্ষেত্রে আমার সেনা ব্যূহ রচনা করি। তৎপর বিনা যুদ্ধে মীমাংসা সম্ভবপর কিনা আলাপক্রমে জানিবার জন্য কালা জমাদার সহ সেনা নিবাস হইতে অগ্রবর্ত্তী হইয়া দেখি, জনৈক উচ্চ পদস্থ ধর্ম্মযাজক তিনশত লোকের পুরোভাগে অবস্থিত। তাহার ব্যবহার অতি গর্ব্বিত। আমি প্রধান শান্তিরক্ষক রূপে যে তথায় তাহার সম্মুখীন হইয়াছি, এই কথা তাহাকে শান্তভাবে জানাইয়া বলিলাম, "আমি শুনিয়াছি, শহরে হাঙ্গামা হইয়াছে, আগামী কল্য তাঁহার বিচার করিব, আপাততঃ তোমারা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন কর, এই আমার বাসনা।"

"সে বিনা বাক্যব্যয়ে তন্মুহূর্ত্তেই আপন অসি উত্তোলন করিল ও উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'আজ মারিবার দিন, নয় মরিবার দিন, আজ ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিন! এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক গুরুতর আঘাত করিল।[১৬] সৌভাগ্যক্রমে ঐ আঘাত আমি স্বীয় হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা প্রত্যাখ্যান করি, অন্যথা আমার জীবন রক্ষার উপায় থাকিত

১৬. "He immediately drew his sword, and exclaiming with a laud voice this is the day to kill or die-the reign of the English is at an end!' aimed a heavy blow at my head."
-The Lives of the Lindsays.

না। আমার কৃষ্ণকায় ভৃত্য সেই মুহূর্ত্তেই আমার হাতে একটি পিস্তল দেয়, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা আওয়াজ করিলে সেই ধর্ম্মযাজক সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া প্রাণ হারায়। সিপাহীগণ আমার এই বিপদাপন্ন অবস্থা দৃষ্টে আমাকে সম্মুখে রাখিয়াই পশ্চাৎ হইতে শত্রুনিবাসে গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। আমি কৃষ্ণকায় জমাদার সহ ইন্দ্রজাল প্রভাবেই যেন রক্ষা পাইয়া আপন সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম ও তৎপর 'বেয়নেট' যোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা নানাদিকে পলাইয়া গেল।"

আমি তখন রণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, এই স্বল্প কাল মধ্যে কি দুর্ঘটনাই ঘটিয়াছে; হতভাগ্য ধর্ম্ম যাজক দুইটি ভ্রাতা সহ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের মৃত দেহ রণভূমে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। তদীয় সহচরগণ মধ্যেও অনেকেই আহত হইয়া ভূমি শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। এদিকে আমাদের পক্ষে একজন সিপাহী ও ছয়জন জন আহত হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশত তাহারা পলায়ন করে নাই, অন্যথায় শহরে একটি ইংরেজও প্রাণে বাঁচিত না।

"আমার ইংরেজ সহকারী জীবন হারাইয়াছেন বলিয়া আমার ধারণা ছিল, কিন্তু তাঁহাকেও অনুসন্ধানে পাওয়া গেল। তিনি আমার নিকটে সরল ভাবে স্বীকার করিলেন যে, তিনি সমর ক্ষেত্রের বিভীষিকা দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।"

"বিষয়টি যেরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষকে উহা জানান আমি উচিত মনে করিলাম। আমি তৎকালে অসুবিধা ভোগ করিতেছি মনে করিয়া তাঁহারা তৎক্ষণাৎ নূতন সৈন্য প্রেরণের আদেশ করিলেন। কিন্তু গোলযোগ সত্ত্বরেই নিবৃত্ত হওয়ায় সৈন্য আনয়নের আবশ্যক হয় নাই এবং উক্ত আদেশ রহিত হয়।"[১৭]

লিণ্ডসে সাহেব মোহরমের প্রসিদ্ধ হাঙ্গামার বিবরণ সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলকে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের রিপোর্ট দ্বারা জ্ঞাপন করেন। এই রিপোর্টে কয়েকটা নুতন কথা পাওয়া যায়—আক্রমণকারীগণ প্রথমেই দেওয়ানের বাড়ী আক্রমণ করিয়া শহরের সর্ব্বত্র অগ্নিদান করিয়াছিল। সদকানুনগো মহাতাব খাঁর বিষয় পূর্ব্বে বলা গিয়াছে ইহার পুত্র মসুদ বখৎ এই সময় কানুনগো ছিলেন। লিণ্ডসে সাহেব প্রথমতঃ তাঁহাকে ও কোম্পানীর সিপাহীর জমাদারকে হাঙ্গামাস্থলে প্রেরণ করেন; পরে সন্ধ্যার পূর্ব্ব সময় তিনি সৈন্যসহ যোগ দেন। কোম্পানীর সিপাহীর সেই জামাদার এই যুদ্ধে পশ্চাৎ নিহত হয়।[১৮]

১৭. The Lives of the Lindsays নামক গ্রন্থে এই বিবরণ বর্ণিত আছে, এবং Hunte's Statistical Accounts of Assam. Vol. II. গ্রন্থে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অনুবাদে আমরা ১৩০০ বঙ্গাব্দে "শ্রীহট্টবাসী" পত্রিকা প্রবন্ধ হইতে কতক সহায়তা লাভ করিয়াছি।

১৮. এই প্রাচীন রিপোর্ট পর পৃষ্ঠায় টীকাস্থলে উদ্ধৃত করা গেল; কীট ভক্ষত হওয়ায় যে যে স্থানে অপাঠ্য হইয়াছে, সেই সেই স্থানে** চিহ্ন দৃষ্ট হইবে,-

THE HON'BLE WARREN HASTINGS

Governor Geeral and

Members of the Supreme Council.

FORT WILLIAM.

'Gentlemen,

It gives me to be under the necessity of despatching an express to acquaint you with following particulars. For some days past since the two-thirds of the inhabitants of Sylhet have shown signs of the most turbulent and unruly disposition till this day they continued assembling, in numerous bodies and being armed held consultations upon the plain. Their intentions were at first not known further than being prepared for every kind of violence-At last they determined that the Gintoos should

দেওয়ান মাণিকচাঁদের বিষয়ও রিপোর্টে উল্লেখ করা গিয়াছে, মাণিক চাঁদ তখন অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; এই হাঙ্গামায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে বলিয়া প্রকাশ।[১৯]

অনেকে বলেন যে, হাঙ্গামার কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু হাঙ্গামা উপলক্ষে তাঁহার মৃত্যু ঘোষিত হওয়ায়, যে কয়েকদিন জীবিত ছিলেন,—তাঁহাকে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।!!

এই হাঙ্গামার নায়ক ধর্ম্মযাজকের নাম কি ছিল, জানা যায় না। তাঁহার যে দুই ভ্রাতার কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাঁহারা "পীরজাদা" বলিয়া খ্যাত ছিলেন; ইহাদের ডাক নাম হাদা মিয়া ও

discontinue their religious ceremonies during the Mohorum and these harmless people were threatened with dreadful consequence if they disobeyed Gintoos in a public body represented this to me as a grievance they had never before experienced durıng the present Government petitioned for redress, I * I could do my utmost endeavours to prevent any * from taking place this I did to the utmost of my * but without effect. Duriug the whole * this day they continued assembling and * proceeded to the Dewans' house of worship and insisted upon his shutting it up which he accordingly did but with this * not satisfied they insisted also upon the wooden Gods being* destroyed this * was not * Dewan with his priests exposed their persons in * of the * Intelligence being brought me to this effect, I immediately despatched my Jemander of seapoys and the Head Canongoe both of them Musselmen to endeavour persuade the * to desist * their reasoning proved in vain the----Zeal proceed to Hostilities ** the priest burnt the houses of worship and dragged the images in derision thro-the town still greater outrages would have been committed when I found it my duty to remain no longer inactive. With 30 seapoys to-wards the close of evening I marched to the place where the mob was assembled who retired at my approach from thence to the house were I was told the Ringleaders had met; it was situated upon the top of a Hill, I myself marched at the Head of the seapoys upon my arrival at the summit I found a small body of men drawn out upon the table completely armed with swords drawn and ready for these were of the priest tribe who hold large portions of land Government and were surrounded by their dependents likewise armed: here I ordered the seapoys to halt and attended only with my jemander of seapoys I advanced expostulated with them their mode of conduct but they were deaf to * words. I told them that a disturbance happened of the * nature that I presented * not as an enemy but as amediatar and * order that a proper investigation might place; their anwser was short. We are not * dogs of Ferengies to obey their orders saying ** of the Ringleaders-advance blow at * with * Tulwar this the jemander fortunately * the brought my Jemander to the ground, when the seapoys pushed forward the unfortunate men mad with enthusistic zeal now throw themselves * upon the detachment sword in hand and were finally overcome desparately wounded twelve of my men. Here the disturbance ended and altho two day's of festival still remain I see no prospect of its renewal for those People who were of the most turbulent disposition are no mare, four of them fell in the action and I am happy to find that few or none but these desparadoes have suffered-

As am fully concious of having acted with the greatest * at the same time with colness and moderation during coourse of this unhappy disturbance I flatter myself my conduct will not meet your disapprobation-

I have the honour to be, with the greatest
respect, Honorable Sir and Gentlemen,
your most obt. humble servent
-R. L'

Sylhet
December 14th, 1782.

১৯. "A skirmish is said to have take place in town by the Mahmdans in which Manic Chand Dewan was supposed to be killed."
-Hunter's statistical Accounts of Assam Vol. II. (Sylhet). P. 129.

মাধা মিয়া। শ্রীহট্টের ইদ্‌গার ময়দানের উত্তরদিগ্বর্ত্তী টীলার উপর থাকিয়া প্রথমতঃ তাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই টীলাকে অদ্যাপি লোকে হাদামিয়া-মাধামিয়ার টিলা বলিয়া থাকে।

সৈয়দ বংশীয় এই সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মযাজকদের মৃত্যুতে মোসলমানদের মনের আক্রোশ শীঘ্র প্রশমিত হয় নাই। কিছুকাল পরে এক ধর্ম্মোন্মত্ত ফকির কোন অভিযোগ সম্বন্ধে এক দরখাস্ত দিতে লিণ্ডসে সাহেবের সহিত দেখা করিতে চাহে। তাহার ভাব ভঙ্গীতে হামিন্টন সাহেবের মনে সন্দেহ হওয়ায় সে ধরা পড়ে। তখন সেই ফকির প্রতিশোধ গ্রহণে অকৃতকার্য্য হইয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করত নিজের উদরে প্রবেশ করাইয়া আত্মহত্যা করে। এই ঘটনার পর হইতে লিণ্ডসে সাহেব সহচর ব্যতীত নগর ভ্রমণে বাহির হইতেন না।[২০]

খাসিয়া আক্রমণ

ইতি পূর্ব্বে খাসিয়াদের অসন্তোষের বিষয় বলা গিয়াছে, উপরোক্ত হাঙ্গামা নিবৃত্ত হইতে না হইতেই তাহারা পুনঃ উত্তেজিত হইয়া উঠে। উহারা ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এক হাবিলদারকে নিহত করে। তাহাই পর ইংরেজ গারদ আক্রান্ত হয়; ইহাতে উভয় পক্ষেরই বিশেষ ক্ষতি হয়। লিণ্ডসে সাহেবের নিজের কারবার স্থলও রক্ষা পায় নাই; তাঁহাদের বহুতর ভৃত্যকে খাসিয়ারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল।[২১]

পুনঃ বন্যা

পরবর্ত্তী বর্ষা সমাগমে (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে) প্রচুর বৃষ্টি হইল, বন্যায় খাসিয়াগণ পর্ব্বত শৃঙ্গ আশ্রয় করায় তাহাদের উৎপাত নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু শ্রীহট্ট জলের তলে ডুবিয়া গেল। লোকে বলিতে লাগিল যে, স্বরণাতীত কাল পর্যন্ত এইরূপ জলের খেলা আর দৃষ্ট হয় নাই। শহরের গৃহাদি জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল, গবাদি পশু ও বহুতর মনুষ্য স্রোতোমুখে ভাসিয়া গিয়াছিল।[২২] সেপ্টেম্বর মাসে ব্রহ্মপুত্র তীর হইতে সরমাতট পর্যন্ত ভূভাগ তরঙ্গ সমাকুল বৃহৎ বারিধারা ন্যায়-প্রতীয়মান হইয়াছিল, দেশের দুই তৃতীয়াংশ পশু ভাসিয়া গিয়াছিল এবং নিম্ন স্থানবাসী এক চতুর্থাংশ মনুষ্য প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।[২৩]

চাউলের মূল্য

পরবর্ত্তী বর্ষে বিধাতা প্রসন্ন হইলেন, প্রচুর ধান্য হইল, বাজারে টাকায় সাড়ে চারিমণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইতে লাগিল, লোকে খাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। টাকায় সাড়ে চারিমণ! —শেষে তাহাও লইতে ক্রেতার অভাব উপস্থিত হইয়াছিল।[২৪]

এই বৎসরে শ্রীহট্টের পূর্ব্ব-দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে যুগপৎ দুইটা উৎপাত উপস্থিত হয়। শ্রীহট্টের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে সাহু জাতীয় রাধারাম, নবাব উপাধি ধারণ পূর্ব্বক স্বাধীনতা

২০. The Lives of the Lindsays.

২১. Assam District Gazetteers VOL II. (Sylhet). Chap. II. P. 34.

২২. See the Collector's letter No. 46, dated 25th june 1784.

২৩. Do No. 56 dated 3th March 1785.

২৪. "In 1786 when rice sold at four and a half maunds to the rupee, the price said to be so low as barely to cover the cost of cooly hire to the bazar."
-Assam District Gazetteers. Vol. II. P. 51.

অবলম্বন করেন; ইঁহার বিবরণ পূর্ব্বে (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে ২য় ভাগ, ২য় খণ্ডে, ১১শ অধ্যায়ে) বলা গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ খাসিয়া অভিযান;—খাসিয়া ইতিপূর্ব্বে একবার ইংরেজ গারদ আক্রমণ করিয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছিল। এই সময়ে লাউড়ের খাসিয়ারা নিকটবর্ত্তী প্রতিবাসীদের সহিত একযোগে শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্রে পতিত হইয়া হত্যা ও বিলুণ্ঠনে লোকের বিষম ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল। তাহারা শ্রীহট্টের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী বংশীকুণ্ডা, রণদিঘা, সেলবরষ, বেতাল, আটগাও আক্রমণ করিয়া প্রায় তিন শতের অধিক অধিবাসীকে বধ করে। এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রই শ্রীহট্ট হইতে সৈন্য প্রেরিত হয়; কিন্তু পার্ব্বত্য খাসিয়ারা সৈন্য পৌঁছার পূর্ব্বেই পর্ব্বতারোহণ করে।[২৫] যাহা হউক লিণ্ডসে সাহেবের যত্নে অচিরেই শান্তি সংস্থাপিত হয়। এই বৎসরে লিণ্ডসে সাহেব ছোটলেখা পরগণায় সাড়ে একুশ হাল ভূমি দেবত্র দান করেন।[২৬] তৎপ্রদত্ত অনেক লাখেরাজ ভূমি আছে।

গম ও কফি

দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে দেশের কৃষি বিষয়ে উন্নতি বিধান কল্পে লিণ্ডসে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি এ দেশের উচ্চ ভূমি গম চাষের পক্ষে অতি উপযোগী বোধ করিয়া জমিদারদিগকে গম চাষের জন্য অনুরোধ করেন ও পঞ্চাশ মন বীজ আনাইয়া বিতরণ করেন। সকলেই সাগ্রহে বীজ গ্রহণ করিয়াছিল। শস্য জন্মিয়াছে কি না, সাহেব ইহা জিজ্ঞাসা করিলে "উত্তম রূপে শস্য জন্মিয়াছে" সর্ব্বত্রই এই উত্তর প্রাপ্ত হন; কিন্তু পর বর্ষে জানা গেল, দেশের প্রথা ছাড়িয়া একটি লোকও নূতন পথে অগ্রসর হয় নাই; গমের একটি বীজও ভূমিতে উপ্ত হয় নাই!

সাহেব কফির চাষও প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কফির চারা আনাইয়া এক সময় আপন উদ্যান রক্ষককে দিয়াছিলেন। এই চারা রোপিত হওয়ার পর তিনি অল্পকালের জন্য শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বাগান দর্শনে গমন করিয়া দেখিতে পান যে কয়েকটি চারা বৃহৎ ও নূতন এবং কতকটা ক্ষুদ্র। ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য প্রকৃত কথা ব্যক্ত করিতে উদ্যান রক্ষককে বাধ্য করা হয়। সে বলে যে, গরু ও ছাগলে অনেকটা চারা নষ্ট করিয়া ফেলায়, সে জঙ্গল হইতে ঐরূপ চারা আনিয়া রোপন করিয়াছে। বৃক্ষগুলি ফলবান হইলে দেখা গেল যে, সকল বৃক্ষেই একরূপ ফল হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীহট্টের জঙ্গলে স্বভাবজাত কফি বৃক্ষ আছে; এবং শ্রীহট্টের ভূমি কফি চাষের যোগ্য।[২৭]

জাহাজ নির্ম্মাণ ও পশু শিকার

শ্রীহট্টের জঙ্গলে জাহাজ নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠের প্রাচুর্য্য দৃষ্টে লিণ্ডসে সাহেব ৪০০ টন বোঝাই হইতে পারে, এরূপ এক জাহাজ নির্মাণ করেন; সাগরগম্য জাহাজ নির্মাণ ও এই জাহাজ ১৭ ফিট জল ভাঙ্গিয়া চলিত। তদ্ব্যতীত তিনি ২০ খানা জাহাজের এক বহর নির্মাণ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে চাউল বোঝাই লইয়া এই বহর মান্দ্রাজ প্রেরিত

25. Collector's letter No. 84 dated 26th October 1787.

২৬. ছোটলেখার ধর্ম্মদাস বৈষ্ণব ১১৯২ বাংলা ১লা মাঘ এই ভূমি প্রাপ্ত হন। মোহরে "কোম্পানী এঙ্গরাজ বাহাদুর" ও লিণ্ডসে সাহেবের দস্তখত আছে।

২৭. সম্প্রতি দক্ষিণ শ্রীহট্টের চা কর সাহেবেরা অল্প স্বল্প কফির চাষ করিতেছেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ভৌগলিক বৃত্তান্তের ৩ অধ্যায় দেখ।

হয়।[২৮] তৎকালে ভারতবর্ষীয় সূত্রধরগণ জাহাজ নির্মাণে সমর্থ ছিল।[২৯] লিণ্ডসে সাহেব প্রায়ই শিকারে যাইতেন, এবং প্রতিবর্ষে প্রায় ৫০/৬০টি ব্যাঘ্র বধ করিতেন। ব্যাঘ্র ও মহিষের লড়াই সম্বন্ধে তিনি অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একবার "কুকি পাহাড়ে" (সম্ভবতঃ প্রতাপগড় পাহাড়ে) হস্তী ধরতে গিয়া একটি গণ্ডার বধ করেন ও একটি কুকি বালককে ধৃত করিয়া আনেন। ইঁহার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, একটা পোষা বানর ব্যতীত আর কাহারও সংসর্গ তাহার ভাল লাগিল না এবং তাহার শিক্ষা ক্ষমতা এরূপ নিম্ন শ্রেণীর ছিল যে, এক বৎসরে ঐ কুকি বালক দেশীয় ভাষায় একটি শব্দও শিখিতে পারে নাই; পরিশেষে একদিন সে পলাইয়া অরণ্য আশ্রয় করে।

পুণ্যাহ

লিণ্ডসে সাহেব ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুন কার্যত্যাগ করিয়া প্রচুর অর্থ লইয়া বিলাতে গমন করেন; এই অর্থবলে তথায় তিনি "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লিণ্ডসে সাহেবের শাসনকালে নানাবিধ কৌতুকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। তিনি যেমন দেশের বিদ্রোহ দমন ও শান্তি স্থাপন করেন; তেমনি রাজস্ব আদায় সম্বন্ধেও বিশেষ বন্দোবস্ত করতঃ কৃতকার্য্য হন। রাজস্ব আদায়ের প্রথম দিন পুণ্যাহ-পর্ব্ব নামে খ্যাত। পুণ্যাহ নবাবি আমলের কথা। পুণ্যাহ-পর্ব্বে শ্রীহট্টের প্রথম জমিদারের কপালে তিনি স্বয়ং চন্দনের ফোটা ও গলায় ফুলের মালা দিতেন, তৎপরেই রাজস্ব গৃহীত হইতে আরম্ভ হইত।

শ্রীহট্ট জিলায় খিত্তা পরগণা হইতেই প্রথম ভূবন্দোবস্ত আরম্ভ হয়, এইজন্য রাজস্বের কাগজ পত্রে খিত্তা পরগণার নাম প্রথম এবং খিত্তার ১নং তালুক, শ্রীহট্ট জিলার সমস্ত তালুকের আদি; এই জন্য খিত্তার ১নং তালুকের অধিকারীই এই "ফুল চন্দন" রূপে সম্মান প্রাপ্ত হইতেন।[৩০]

জল ও অগ্নি-পরীক্ষা

লিণ্ডসে সাহেবের সময়ে শাসন বা ফৌজদারী বিচার ভার মোসলমান ফৌজদারের উপর থাকিলেও তিনি বিচার কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ ও দৃষ্টি রাখিতেন। তখন বিচার কার্য্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করা যে স্থলে কঠিন হইয়া উঠিত, সে স্থলে জল বা অগ্নি পরীক্ষা গৃহীত হইত। একদা জল পরীক্ষা উপস্থিত হইলে তাঁহার সাক্ষাতে দুই ব্যক্তি জলে ডুব দেয়, কতক সময় পরে তাহারা ভাসিয়া উঠে, ও তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি নিরাপত্তিতে আপন অপরাধ স্বীকার করে। এতদৃষ্টে সাহেব বিস্মিত হইলেও তিনি ক্রমশঃ এ প্রথা উঠাইয়া দিতে যত্ন করেন।[৩১]

শ্রীহট্টের লোককে তিনি "মামলাবাজ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মোকদ্দমার মধ্যে শতকরা ৯০টি "হদশিকস্ব" বা সীমা ব্যত্যয়ের জন্য হইত। তিনি পোলিশ ও দেওয়ানী

২৮. Assam District Gazetteers Vol. II. (Sylhet) Chap V. P. 155.

২৯. জনৈক ইংরেজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেঃ–

"A Hundred years ago ship-building was in so exeelent condition in India that ships could be (and were) built which sailed to the Thames in company with British-built ships and under the convoy of British frigates."

৩০. এই সম্মানিত বংশের অবস্থা কালক্রমে হীন হইয়া পড়ে এবং তদ্বংশীয় এক ব্যক্তি শ্রীহট্টের আখালিয়াতে বিবাহ করিয়া খিত্তা হইতে উঠিয়া সেই স্থানে গিয়া বাস করেন। বর্ত্তমানে এই বংশে শ্রীযুক্ত গোকুল নাথ চৌধুরী জীবিত আছেন।

৩১. Huner's Statistical Accounts of Assam Vol. II. (Sylhet) P. 113.

বিভাগেও সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ঐ সময় সতীদাহ প্রচলিত ছিল, শ্রীহট্টের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সতীগণ মৃত পতির চিতাগ্নিতে আত্মপ্রাণ আহুতি দিতেন। লিণ্ডসে সাহেব তাঁহার সময়ের সতীদাহের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন; আমরা বংশ-বৃত্তান্ত ভাগে তাহা বর্ণনা করিব।

সৈয়দ উল্লার অধ্যবসায়

শ্রীহট্টের মোসলমানদিগকে তিনি উদ্ধত, অশাসিত ও জিঘাংসাপরায়ণ বলিয়াছেন; বাস্তবিক তৎকালের মোসলমান সমাজ ইংরেজ বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। শ্রীহট্টের সৈয়দ উল্লা নামক ব্যক্তির কার্য্যতৎপরতা এই কথায় জলন্ত উদাহরণ। পূর্ব্বকথিত মোহরমের হাঙ্গামায় যে সকল লোক নিহত হয়, সৈয়দ উল্লার পিতা তন্মধ্যে একজন। বালক সৈয়দ উল্লাও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। লিণ্ডসে সাহেব ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া বিলাতে চলিয়া যাওয়ার অনেক পরে এই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং সে প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠে। সে উপান্তর না দেখিয়া বিলাতগামী কোন জাহাজের রসদাধ্যক্ষের ভৃত্যের পদ গ্রহণ করে। রসদাধ্যক্ষের নাম মিঃ স্মল, ইনি লিণ্ডসে সাহেবের প্রতিবাসী ছিলেন। সৈয়দ উল্লা ইঁহার সঙ্গে ইংলণ্ডে গিয়া পিতৃহন্ত্যাকে খুঁজিতে থাকে। একদা লিণ্ডসে সাহেবের সহিত পথে দেখা হইলে সে তৎসন্নিধানেই তাঁহারই সন্ধান জিজ্ঞাসা করে। লিণ্ডসে সাহেব নিজের পরিচয় দিলে সে বলিয়া উঠিল,—"কি তুমিই আমাদের পীরজাদাদিগকে ও আমার বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়াছিলে?" লিণ্ডসে সাহেব আরক্তলোচন, জিঘাংসা পরায়ণ সেই যুবককে মিষ্ট বাক্যে বুঝাইলেন যে, ইহাতে তাঁহার কোন দোষ ছিল না। তখন সেই বীরহৃদয় সরল যুবক অকপটে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, ক্রটী স্বীকার করে। লিণ্ডসে সাহেব শ্রীহট্টবাসীর প্রকৃতি ভালরূপে জানিতেন। এই যুবক তাঁহাকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীহট্ট হইতে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিল, তখন সে সাহেবকে নির্দ্দোষ জানিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল, তখন সাহেবও আদরের সহিত আশ্রয় দিলেন; ইহার প্রতি তিনি আর অনুমাত্র অবিশ্বাস পোষণ করেন নাই। অনেকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াও তিনি ইহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করেন; সে প্রাচ্য প্রণালীর তরকারী যোগে এক বেলা সাহেবের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিত।[৩২] সাহেব বিলাতে গিয়াও অধিবাসীর প্রতি মমতা শূন্য হইতে পারেন নাই; তিনি পূর্ব্বে কর্ম্মচারীদের নিকট পত্র লিখিয়া তখনও শ্রীহট্টের সংবাদ অবগত হইতেন। তখনকার ভারত প্রবাসী ইংরেজগণ প্রায়ই এইরূপ সহৃদয় ছিলেন এবং সহৃদয়তার জন্যই তাঁহারা ভারতবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন।

৩২. The Lives of the Lindsays Vol. III, PP 215-217.

দ্বিতীয় অধ্যায়

দশসনা বন্দোবস্ত

লিণ্ডসে সাহেবের পর জন উইলিস (John Willis) সাহেব শ্রীহট্টের রেসিডেন্টের পদ প্রাপ্ত হন। সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি "দেলার জঙ্গ বাহাদুর" এই উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার কার্যকাল। শ্রীহট্টে আসিয়াই প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি শ্রীহট্টের জেইল নির্ম্মাণ করেন।

গঙ্গাসিংহের দৌরাত্ম্য

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষ সময় এক দুর্ঘটনার সূচনা হয়; গঙ্গাসিংহ নামক এক দস্যু খাসিয়াদের যোগে ইছামতি থানা ও বাজার লুণ্ঠন ও তত্রত্য অনেক ব্যক্তিকে নিহত করে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, অধিবাসীদিগকে শুধু মৎস্য ও তরকারী খাইয়া প্রাণধারণ করিতে হইতেছে।

উইলিস্ সাহেব এ বিষয়ে অবহেলা করা অসঙ্গত মনে করিলেন, তিনি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসেই খাসিয়া পর্ব্বতের পাদস্থিত পাণ্ডুয়াতে এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। খাসিয়ারা ইহাতে ভীত হইল না, তাহারা ঐ স্থান দিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিহত করিল। প্রথমেই থানাদার মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন; দুইজন ইংরেজ সওদাগর বহু কষ্টে রক্ষা পাইলেন। এই সংবাদ কলিকাতায় প্রেরণ করা হয় এবং লেপ্টন্যান্ট চিপের অধিনায়কত্বে নূতন এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়। লেপ্টন্যান্ট চিপের প্রতি উইলিস্ সাহেবের আদেশ ছিল যে বিশেষ কারণ ব্যতীত অগ্নিদান বা গুরুতর অত্যাচার যেন করা না হয় ; সদ্ভাবে যাহাতে কার্য সিদ্ধ হয়, তাহাই কর্তব্য হইবে। বস্তুতঃ বিনা রক্তপাতেই পাণ্ডুয়া পুনরাধিকৃত হইয়াছিল।

জনহিতকর কার্য্য

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে উইলিস্ সাহেব সমগ্র শ্রীহট্ট জিলার লোক সংখ্যাও গ্রহণ করেন। তাহাতে দেখা গেল, শ্রীহট্টের অধিবাসী সংখ্যা ৪৯২৯৪৫ জন মাত্র; তন্মধ্যে সহরেই ৭৫৩৮২ জন অধিবাসী। এই সংখ্যা প্রকৃত জনসংখ্যাপেক্ষা অনেক ন্যূন[১] হইলেও, পরবর্ত্তী বন্যা রোগ জনিত মৃত্যুই সংখ্যা হ্রাসের কারণ ছিল, সন্দেহ নাই। উইলিস্ সাহেব এই সনেই একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনয়ন জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী রেসিডেন্টের সময় প্লাবনে শ্রীহট্টের যেরূপ ক্ষতি সাধিত হয়; তাহার নিরাকরণ কল্পেও উইলিস্ সাহেব চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সুরমা নদীর তীরদেশ স্বভাবতঃ নিম্ন বলিয়া

---

১. The figures were evidently very much below the mark." &c.
-District Gazetteers VOL. II. P. 65.
প্রথমোক্ত সংখ্যার মধ্যে ১৮৮২৪৫ পুরুষ, ১৬৪৩৮১ স্ত্রী এবং ১৪০৩১৯ শিশু গণিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সহরের জন সংখ্যাই অধিক ছিল।

বর্ষাকালে তীরভূমি প্রায়শঃ পরিপ্লাবিত হইত। হিন্দু রাজাদের আমলের বহু প্রাচীন একটা বাঁধ সম্পূর্ণ অকর্মণ্য অদৃশ্য প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা মেরামতের জন্য আট হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল; উইলিস্ সাহেব ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সুরমা তীরে প্রায় একশত মাইল দীর্ঘ বাঁধ প্রস্তুত করিয়া লোক-ক্লেশ বারণ করেন।

শেষ কানুনগো ও জিলা জরিপ

উইলিস্ সাহেব শ্রীহট্টে আসিয়াই লর্ড কর্ণওয়ালিসের উপদেশানুসারে জরিপ আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বে সদর কানুনগো মসুদ বখতের নাম উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহার কার্য্যকাল অন্তে কিছু দিনের জন্য কানুনগো পদ উঠিয়া যায় এবং তৎস্থলে ওয়াদাদারগণ নিযুক্ত হন; ইঁহারা চৌধুরীদের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন।[২] উইলিস সাহেব ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে জরিপ কাজ সমাধা করেন।

বঙ্গের অপরাপর স্থানে যেমন চৌধুরীদের নামে জরিপ হয়, শ্রীহট্টে তদনুরূপ না হইয়া খোদ প্রজাদের নামে হইয়াছিল।[৩] এই জরিপে শ্রীহট্ট জিলার ২১০০ বর্গ মাইল ভূমি পরিমাপিত হয়। জরিপ করিবার কালে কানুনগো ও মোসলমান অধিবাসীগণ নানারূপে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিল।[৪] অতঃপর ভূমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব হইলে উইলিস সাহেব কানুনগো পদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক মনে করেন। ভূতপূর্ব্ব কানুনগো মসুদবখতের ভ্রাতা গোপন গাজীর পুত্র মোহম্মদ বখ্‌ত মজুমদারকে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। ইনিই শ্রীহট্টের শেষ কানুনগো; দশসনা বন্দোবস্তের পর এই পদে একবারে উঠিয়া যায়। মীর খাঁ হইতে মোহম্মদ বখত পর্যন্ত ৩৩৩ বৎসর একই বংশীয় ব্যক্তিগণই শ্রীহট্টের গৌরব জনক সদর কানুনগো পদের দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্য করিয়াছিলেন।

দশসনা বন্দোবস্ত

লর্ড কর্ণওয়ালিসের পূর্ব্বে প্রায়শঃ জমিদারি নিলাম হইত, রাজকর্মচারিগণ উহা ক্রয় করিতেন; প্রজাদের উপর তাহাদের মায়া দয়া দেখা যাইত না, রাজস্ব আদায়ে গবর্ণমেন্টেরও বিলক্ষণ অসুবিধা হইত; এই সকল অনিষ্ট সংশোধনার্থে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ দশ বৎসর ম্যাদে একটি বন্দোবস্ত করেন; তাহাই চিরস্থায়ী রূপে গণ্য হইবার জন্য বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট লিখেন; কোম্পানীর অধ্যক্ষেরা সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে, তাহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া গণ্য হয়। এই বন্দোবস্ত অনুসারে মিরাশদারগণ ভূমির অধিকারী হইলেন, তাঁহাদের সহিত রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিলেন যে, ভবিষ্যতে সে রাজস্ব কখনও বর্দ্ধিত করা হইবে না।

২. 'Under British Government, canangoes were abolished for a time and Wahdadars appointed over the Choudhuris. Cansngoes were again employed for a short time previous to the deccunial settlement.' -Dacca Blue Book. P. 292.

৩. 'He did not, as in most of the other districts of Bengal, enter into engagements with the chaudris or land revenue collectors, but settlement was as a rule made direct with the actual cultivators of the soil.'
-Assam District Gazetteers Vol. II. Chap. VII. P. 214.

৪. Collector's letter to the Governor General and Members of the Supreme council, No. 119, dated 24th February 1790.

জন উইলিস্‌ও জরিপ শেষ করিয়া, শ্রীহট্টে ২৬৩৯৩টি মহালে ৩,১৬,৯১১ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীহট্ট জিলায় এক বাণিয়াচঙ্গের অধিপতি ব্যতীত প্রকৃত জমিদার পদবাচ্য কেহ ছিলেন না,[৫] অধিকাংশ ভূমিই জোতদখলকারদের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। পরে ইংলণ্ড হইতে মঞ্জুরী হুকুম আসিলে এই দশসনা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। এই বিজ্ঞাপনই আইনে পরিণত হইয়া "১৭৯৩ ইং ১ আইন" নামে খ্যাত হয়; এবং উক্ত চিরস্থায়ী মহালগুলি "দশসনা" মহাল নামেই আখ্যাত হইয়া থাকে।

এই সময় উইলিস সাহেব শ্রীহট্টবাসী একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির সহায়তা পাইয়াছিলেন, ইঁহার নাম লালা আনন্দ রাম। প্রসিদ্ধ ফরহাদ খাঁর পুলের দক্ষিণ কোণে, গোয়ালিছড়ার পূর্ব্বতীরে ইঁহার বাড়ির ভগ্নাবশেষ এখনও লক্ষিত হয়। লালা আনন্দরাম শ্রীহট্টের সাহু বংশীয় ছিলেন। শ্রীহট্টের দশসনা মহাল সমূহের উপর যে জমা ধার্য্য হয়, লালা আনন্দরাম কর্ত্তৃকই তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

রাজস্ব আদায়ের অসুবিধার জন্য এই সময় শ্রীহট্ট জিলার দশটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়, এই কেন্দ্র সমূহও "জিলা" বলিয়া খ্যাত। তখনও শ্রীহট্টে নবাবি আমলের নির্দ্দিষ্ট ১৬৪টি পরগণা ছিল। এই সময় লস্করপুর ঢাকার রাজস্ব বিভাগ হইতে পৃথক হইয়া শ্রীহট্টের কালেক্টরী ভুক্ত হয়।[৬] এই জিলা গুলির নাম শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ১ম ভাগ ১০ম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।[৭] প্রত্যেক জিলায় এক এক জন স্থানীয় কর্ম্মচারি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জন উইলিসের সময় সে সকল মহাল বন্দোবস্ত হয়, পরবর্ত্তী কালে তদ্ব্যতীত চিরস্থায়ী মহাল সংখ্যা আরও অনেক বর্দ্ধিত হয়। ঐ সময়কার অনেক দেবত্র, ব্রহ্মত্র, চেরাগী, মুদতমাস, খানেবাড়ী, নানকার প্রভৃতি নিস্কর মহালে পরে জমা ধার্য্য হইয়া সকর চিরস্থায়ী মহালের সংখ্যা বর্দ্ধিত করে, তদ্বিবরণ পরে কথিত হইবে।

ফরাসীর অদম্যতা

জন উইলিস্ সাহেবের প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানেই বিশেষ দৃষ্টি ছিল। শাহ জলালের দরগার বড় মসজিদ গৃহের সম্মুখ পার্শ্বস্থ ছোট প্রার্থনাগারটি তিনি নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।[৮] তাঁহার সময় শ্রীহট্টে একজন ফরাসী অদম্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যক্তির নাম ডিকেম্পিনী (M. Dechaimpign) ছিল; সে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীহট্টে বসবাস করিতেছিল। লিণ্ডসে সাহেবের সময়ে এই ব্যক্তি কোনরূপ অশিষ্ঠ ব্যবহার করে নাই, কিন্তু এই সময়ে যে যথার্থস্বরূপ প্রকটিত করিয়াছিল। সে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করে; বিক্রেতার উহাতে প্রকৃত স্বত্ব ছিল কিনা বলা

৫. 'The only zeminder known by that name, being the owner of Baniachung. At the time of the Permanent settlement, the actual occupiers of the land and not the Choudhuris were selected as the persons with whom the settlement was made.'
-Hunter's Statistical Accounts of Assam Vol. II. (Sylhet) P. 117.

৬. 'Mr. Willis time the District was divided into ten zillas Containing 164 pargans. Laskarpur which was transferred from Dacca between 1789 and 1793.
-Dacca blue book. P. 291.

৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ১ম ভাগ ১ম অধ্যায়ে জয়ন্তীয়াও একটি জিলা রূপে লিখিত হইয়াছে। জয়ন্তীয়ার ৩৩টি চিরস্থায়ী মহাল থাকিলেও, জয়ন্তীয়া ইহার কয়েক বৎসর পরে বৃটিশ শাসনাধীন হইয়া এলাম মহালের গণ্য হয়। প্রত্যেক জিলার স্থানীয় কর্ম্মচারীই "জিলাদার" নামে খ্যাত। জিলাদারগণ তহশীলদারের অধীন কর্ম্মচারী।

৮. The Assam District Gaxetteers VOL. II. Chap. III. P. 82.

যায় না। গবর্ণমেন্টের অনুমতি না লইয়াই ঐ বিদেশী ব্যক্তি উক্ত ভূমিতে এক বাঙ্গলা (গৃহ) প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করলেন এবং নানারূপ আইন-বিগর্হিত কার্য করিতে থাকে। সে যাহার প্রতি বিরক্ত হইত, তাহাকেই কয়েদ, অর্থদণ্ড বা বন্দী করিত। একদা এক তালুকদারকে বন্দী করা হয়, উইলিস্ সাহেব ইহা জানিতে পারিয়া, তাহাকে মুক্ত দিতে অনুমতি করেন। ফরাসী-স্পষ্টরূপে বলে যে সে গবর্ণমেন্টের প্রজা নহে এবং উইলিসের আদেশ শুনিতে বাধ্য নহে। এই সময় স্বাধীন খাসিয়া সর্দ্দারের সহিত সে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। এই দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। তবে যখন তাহার স্বদেশে ঘোরতর বিপ্লব (ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন) উপস্থিত হয়, তখন সম্ভবতঃ সে দেশে চলিয়া গিয়াছিল।

জন হিতৈষী জন উইলিস সাহেব দশসনা বন্দোবস্তের কার্য সমাধা করিয়া শ্রীহট্ট হইতে চলিয়া যান।

তৎপরবর্ত্তী শাসনকর্তৃগণ

কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে সার জন শোর গবর্ণর জেনারল রূপে আগমন করেন, তৎপর মার্কুইস অব ওয়েলেসলী ১৭৯৮ হইতে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত শাসন করেন। শ্রীহট্টের এই সময়কার কালেক্টরগণ মধ্যে জন উইলিস ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট ত্যাগ করিলে, জে. আর. নটী (মতান্তরে জে. আর. বানটী) সাহেব অল্প কয়েক মাসের জন্য কালেক্টররূপে শ্রীহট্টে আগমন করেন। উইলিসের পর আর রেসিডেন্ট পদের নাম শুনা যায় না। নটী বা বানটী সাহেব শ্রীহট্টে নিজব্যয়ে একটি শড়ক প্রস্তুত করিয়া ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তৎপর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এইচ. লজ (H. Lodge) সাহেব শ্রীহট্টে আগমন করিয়া চারি বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। কলিকাতা হইতে শ্রীহট্টে আগমনের সময় তিনি ১০৬১ টাকা এলাওয়েন্স স্বরূপ গবর্ণমেন্ট হইতে আদায় করেন বলিয়া উক্ত আছে। লজ সাহেব নটী কৃত শড়কটি নিজ ব্যয়ে মেরামত করাইয়া ছিলেন।

লজ সাহেব চলিয়া গেলে মিঃ আমুটী (J. Amuty) সাহেব ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে শ্রীহট্টে আসিয়া পৌছেন। তখন শ্রীহট্টে আদালত গৃহাদির অবস্থা ভাল ছিল না, আমুটী সাহেব একটি ইষ্টকালয় প্রস্তুত করেন। তাঁহার রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে গোদাম গৃহের ন্যায় তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এক ইষ্টকালয়ের একাংশে কাগজ পত্র রক্ষিত হইত, একটি বাংলাতে মোহরেরগণ কাজ করিত ও অপরটিতে বিচার হইত। কালেক্টরের রিপোর্ট প্রাপ্তে সারজন শোর শ্রীহট্টে একটি উৎকৃষ্ট অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করেন। প্রত্যুত্তরে আমুটী সাহেব জ্ঞাপন করেন যে চারিটি প্রকোষ্ট ও উত্তর দক্ষিণ দিকে বারান্দা সমন্বিত একটি ভাল দালান দশ হাজার টাকার কমে কিছুতেই প্রস্তুত হইতে পারে না। এই প্রস্তাবানুসারে পরে একটি দালান প্রস্তুত করা হয়।

আমুটীর সময় (জানুয়ারী—১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ) উৎকৃষ্ট চাউলের মণ বাজারে বার আনাতে বিক্রয় হইত। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি সহরে গৃহকর স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন; গণনায় কসবা শ্রীহট্টে ৩১২২০ খানা গৃহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।[৯] ইহার পরবর্ষে সমগ্র জিলায় অধিবাসী বর্গের সংখ্যা ১০৩৬৩৭ ও তাহাদের ব্যবহার্য্য নৌকার সংখ্যা ২৩০০০ খানা হয়। ঐ সময় তালুকদারদের সংখ্যা ২৭০০০ ছিল।[১০]

ইতিপূর্বে[১১] বদরপুর দুর্গের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গাক্ষরে অঙ্কিত একখানা শাসনপত্র পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে "১২০৭ সাল" "বদরপুর" "কাপ্তান" "এঙ্গরাজ" এই

৯. Assam District Gazetteers Vol. II. Chap. VI. P. 197.
১০. W. Hamilton's East India Gazetteers VOL. II. P. 553.

কয়েকটি শব্দ ব্যতীত আর কিছুই পাঠ করা যায় না।[১২] বদরপুর দুর্গ আমুটীর সময় নির্ম্মিত হয় বলিয়া অনুমিত।

শ্রীহট্টের কালেক্টরীতে প্রাচীন সনদের কয়েকটি নকল বহি আছে, ঐ সকল কাগজ পত্রে আমুটী সাহেবের দস্তখত দৃষ্ট হয়।

আমুটী সাহেব ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিলে লেইরি (J. W. Lairy) সাহেব তিন মাসের জন্য শ্রীহট্টে আগমন করেন। তৎপর মলিং (C. S. Maling —মতান্তরে মরিং) সাহেব শাসনকাল; ইনি ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত কার্য্য করেন। মলিঙ্গের পর মরগান (F. Morgan.) সাহেব এক মাসের জন্য শ্রীহট্টে আগমন করেন; তৎপর ফ্রেঞ্চ্ (F. French.) সাহেব দশমাসের জন্য কালেক্টর নিযুক্ত হন; তাহার পরে মেকসুয়েল সাহেব (E. Mexwel) শ্রীহট্টে প্রেরিত হন; একমাস অন্তে পুনঃ ফ্রেঞ্চ সাহেব শ্রীহট্টে প্রত্যাগমন করেন ও প্রায় তিন বৎসর অবস্থিতি করেন। তিনি তিন মাসের জন্য স্থানান্তরে গমন করিলে মেক্নবল (J. W. Macnable) সাহেব শ্রীহট্টে প্রেরিত হন; তৎপর ফ্রেঞ্চ্ সাহেব পুনরাগমন করিয়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন পর্য্যন্ত একাক্রমে ছয় বৎসর কার্য্য করেন। তৎপর টমাস বার্ণহাম (Thomas Burnhum) এবং তাহার পরে ওয়ার্ড (J. P Ward) সাহেব কালেক্টর নিযুক্ত হন; ওয়ার্ড সাহেব ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীহট্টে ছিলেন।[১৩]

হস্তবোধ জরিপ (১৭৮৮-১৭৯০)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় শ্রীহট্টে অনেকস্থল অনাবাদ ও জঙ্গলপূর্ণ দুর্গম কার্য্য জরিপ কার্য্য সুচারুরূপে হইতে পারে নাই, এই জরিপ থাকায় দ্বারা ভূমির পরিমাণ মোটামুটি জানা গিয়াছিল; সেই জরিপ হস্তবোধ জরিপ নামে খ্যাত। হস্তবোধের জরিপ অনেক স্থলে শুদ্ধ নহে বলিয়া স্বয়ং উইলিস্ সাহেবই রিপোর্ট করিয়াছিলেন।[১৪] হস্তবোধের জরিপি জমিই "দশসনা" মহাল ভুক্ত হইয়াছিল।

এলাম জমি

দশসনা মহালের অতিরিক্ত অনেক ভূমিই শ্রীহট্টে ছিল, এবং সর্ব্বসাধারণে বিনা রাজস্বে তাহা ভোগ করিতেছিল, এই সমস্ত ভূমির অনুসন্ধানার্থে সদর বোর্ড ১৮০২ খৃষ্টাব্দে আদেশ করেন। তদনুসারে শ্রীহট্টের কালেক্টর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া পাটওয়ারিগণ দশসনা মহালের অন্তর্গত উক্ত ভূমির আনুমানিক মৌজাওয়ারি দাখিল করিলে, কালেক্টর সাহেব এই মর্ম্মে এলাম বা এতেলা নামা জারি করেন যে, পাটওয়ারিদের দাখিল মৌজাওয়ারির প্রতি কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে তাহা যেন উপস্থিত করা হয়। কিন্তু কার্য্য এই পর্য্যন্তই মাত্র হইল। এলাম বা এতেলানামা জারি হইয়া কার্য্য স্থগিত হওয়ায় এই অতিরিক্ত ভূমি পরে এলাম ভূমি নামে

১১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩ অধ্যায় দেখ।

১২. Report on the Progress of the Historical Researches in Assam 1897. P. 10

১৩. শ্রীহট্টের কালেক্টরগণের ক্রমানুযায়ী নাম ও শাসনকালের নির্দ্দেশ (২য় ভাগ ৫ খণ্ড ১/২ অধ্যায়ে উল্লেখিত) জ-পরিশিষ্ট দেখ।

১৪. The chittas purport to show the boundary of each estate, but these boundaries are often of a vague and useless characer, and some of the estates are simple said to be bounded by 'hills' or 'jungle.' -Assam District Gazetteers Vol II. (Sylhet) Chap. VII. P. 215.

অভিহিত হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এই ভূমির কিয়দংশ মলিং সাহেব কর্ত্তৃক চিরস্থায়ীরূপে "হালাবাদি" নামে বন্দোবস্ত হয়।

হালাবাদি মুমাদি প্রভৃতি চিরস্থায়ী মহাল

হাল অর্থে বর্ত্তমান। বর্ত্তমানে অর্থাৎ দশসনা বন্দোবস্তের পরে এই সময়ে (১৮০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) এইরূপ অনেক নূতন আবাদি ভূমি চিরস্থায়ীরূপে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়, এই সকল তালুক "হালাবাদি মুমাদি" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যা ৫০০ এবং রাজস্ব ২৮০৮ টাকা।

খাস হালাবাদি– এই নামে আর এক শ্রেণীর চিরস্থায়ী মহাল শ্রীহট্টে আছে, এই মহালগুলিও হালাবাদি মুমাদি শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল, পরে রাজস্ব বাকিতে নিলাম হইলে, গবর্ণমেন্ট স্বয়ং ক্রয় করতঃ সেই নির্দ্দিষ্ট খাজানার উপর অপরের নিকট বিক্রয় করেন। এই মহালগুলি গবর্ণমেন্টের খাস বা নিজস্ব হইয়াছিল বলিয়া "খাস হালাবাদি" নামে খ্যাত; এইরূপ মহালের সংখ্যা ১৫ এবং রাজস্ব ১৩২৮ টাকা।

খাস মুমাদি—শ্রীহট্টে এই নামে এক শ্রেণীর চিরস্থায়ী মহাল আছে। এইগুলি প্রকৃত দশসনা মহাল ছিল এবং পরে ইহাও খাজানা বাকিতে নিলাম হইয়া গেলে স্বয়ং গবর্ণমেন্ট ক্রয় করেন এবং নির্দ্দিষ্ট জমার উপর অপরের নিকট বিক্রয় করেন। এইরূপ মহালের সংখ্যা ৪৬৪টি এবং রাজস্ব ৬০৪০ টাকা।

কিন্তু এইরূপ মহালের ভূমির পরিমাণ নির্দ্দেশক হালাবাদি জরিপ ইহার আট বৎসর পরে আরম্ভ হইয়া কিছুদিন স্থগিত থাকে ও তাহার দুই বৎসর পরে পুনর্ব্বার আরম্ভ হইয়া জরিপ হয়।

বাজেয়াফ্‌তি মুমাদি—মহালের মোট সংখ্যা ৫০৯৯৪টি এবং রাজস্ব ৩৬৭৬৬০ টাকা। বাজেয়াফ্‌তি মহাল অনেকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, এই সকল মহালের মধ্যে ৩৬টি প্রধান।[১৫]

১৫. বাজেয়াফ্‌তি ৩৬টি প্রধান মহালের নামতত্ত্ব, সংখ্যা ও রাজস্ব পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ–

	নাম	সংখ্যা	রাজস্ব
১	দেবোত্তর (দেবত্র)–দেবোদ্দেশে যে ভূমি দাতব্য হইয়াছিল।	২০১৪	২০,৮৪৭
২	ব্রহ্মত্তর (ব্রহ্মত্র)-ব্রহ্মণের ভরণ পোষণার্থ দাতব্য ভূমি।	৭১১০	৭০১৪
৩	চেরাগী-মসজিদ ও কববদিতে চেরাগ বা প্রদীপ দেওয়ার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দাতব্য ভূমি।	৩৩০৪	৫০৫০
৪	মুদতমাশ–মোল্লা ও ছাত্রগণের জন্য যে ভূমি দেওয়া হইয়াছিল।	৪৮১৮	১২,২৬১
৫	শিন্নি-মোসলমান পীরেব সেবাব্যয় নির্ব্বাহার্থ দাতব্য ভূমি।	৪৯	৯১
৬	রুজিণা–বিশেষ কয়েক মোসলমান পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য দাতব্য ভূমি।	৪৫	২৭
৭	দারস্‌সফা-চিকিৎসালয়েব্যয় নির্ব্বাহার্থ দাতব্য ভূমি।	৫৪	৯১
৮	তোপখানা–নবাবি আমলে সেনা নিবাসের জন্য প্রদত্ত ভূমি।	১৯৬	৫০
৯	বখ্‌সা-বিশেষ কার্য্যে পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত ভূমি।	৭৫	৮৭
১০	জায়গীর-মুফ্‌তিগণকে ব্যবস্থাদানের জন্য বেতনের পরিবর্ত্তে প্রদত্ত ভূমি।	৭	২৭৫
১১	মোদরসা–সম্রাট কর্ত্তৃক শিক্ষা-ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত ভূমি।	৪১	৮৫
১২	শিবোত্তর (শিবত্র)–শিবপূজা পরিচালনার্থ প্রদত্ত ভূমি।	৫৬	১৫১
১৩	বিষ্ণুত্তর–বিষ্ণুপূজার ব্যয় বিধান জন্য প্রদত্ত ভূমি।	২২	১৫
১৪	দুর্গোত্তর–দুর্গাপূজার ব্যয় বিধান জন্য প্রদত্ত ভূমি।	১	২

ফ্রেঞ্চ সাহেবের সময়ে শ্রীহট্ট সহরে গৃহকর আদায় হইতে আরম্ভ হয়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে সহরে ১০০৯৮ খানা গৃহে মোট ৯২৬ টাকা আদায় করা হইয়াছিল। প্রথম উদ্যমে এই কর স্থাপন এক উৎপাতরূপে পরিণত হইয়াছিল, কারণ প্রত্যেকেই ইহাতে প্রতিবন্ধক জন্মাইয়াছিল, দোকানদারগণ দোকানপাট বন্ধ করিয়া দিযাছিল।

১৫	খারিজ জমা-দশসনা বন্দোবস্ত কালে বিশেষ কারণে কর ধার্য্য হয় নাই, এরূপ ভূমি।	৪৪	১০৯
১৬	খারিজ ইমাম-"ইমামের বায়েড়া" আলোকিত করার জন্য প্রদত্ত ভূমি।	১	৩
১৭	নজর ইমাম-ইমামের পারিতোষিক স্বরূপ তাজিয়াকারীর জন্য দাতব্য ভূমি।	৩৬	৭
১৮	খাস মহাল-চিরস্থায়ী মহালের মধ্যে রাজস্ব বাকিতে নিলাম হইয়া পরে যে ভূমি সরকারে খরিদ করা হয়।	৩৭	৬৫
১৯	সাফি-বন্দোবস্তের সময় যে ভূমির রাজস্ব সিনাক্ত করা হইয়াছিল।	১২	১৪
২০	মোজরাই-সরকারী মোহাফিজ খানার কাগজ হেফাজতে রক্ষার্থে ভূম্যাধিকারিগণ দফ্তরি নিযুক্ত করিতেন, ঐ দফ্তরিদের বেতনের পরিবর্ত্তে প্রদত্ত ভূমি।	৩৮	৩
২১	খুসবাস-চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভূম্যধিকারীগণ যে ভূমি নিষ্কর প্রাপ্ত হন।	১৮৯	১৪৪
২২	নানকার জমিদারি-চিরস্থায়ী বন্দোবস্থকালে কয়েক জন জমিদারকে যে ভূমি নিষ্কর প্রদত্ত হইয়াছিল।	২৫৯	৪৯২
২৩	নানকার কানুনগো-কানুনগোদের বেতনের পরিবর্ত্তে প্রদত্ত ভূমি।	১৭১৭	৪২৫১
২৪	রসুস জামিনী-অপর ব্যক্তিদের জামিন হওয়ার জন্য কানুনগোদিগকে প্রদত্ত ভূমি।	৩১	৯০
২৫	খোরপোষ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভরণপোষণ জন্য প্রদত্ত ভূমি।	৬	১৩
২৬	খানেবাড়ী-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাস জন্য প্রদত্ত ভূমি।	৩১৭৫	২৫০৭
২৭	বেলস্বরি খানেবাড়ী-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য যাহা অনির্দ্দিষ্ট ছিল।	২৯	১৭৫
২৮	হুড় মহাল-কর্দ্দমময় ভূমিকে হুড বলে, এইরূপ যে ভূমি পরে চাষযোগ্য হইলে বন্দোবস্ত হয়।	২১	১৩৩৪
২৯	তন্খা মোজরাই-শ্রীহট্টের কোন কোন আমিলের চাকরকে আবশ্যক মত লোকদিয়া সাহায্য করিবে বলিয়া যে ভূমি প্রদত্ত হয়।	১৪১	৩৭৪
৩০	ছেগা হিম্মত খাঁ-হিম্মত খাঁ সেনাপতিকে প্রদত্ত ভূমি।	২	৮৬
৩১	ঐ হাতিম খাঁ-হাতিম খাঁ সেনাপতিকে প্রদত্ত ভূমি।	৩	১০
৩২	ঐ অলী খাঁ-পার্ব্বত্য জাতিদের আক্রমণ সময় সাহায্যার্থ অলীখাঁকে প্রদত্ত ভূমি।	১০১	৭৬৮
৩৩	ঐ বক্তার সিংহ-বক্তার সিংহ সেনাপতিকে প্রদত্ত ভূমি।	১৪১	২৫৯
৩৪	ঐ লাখিরাজ মাজুল জমিদার-জমিদারি উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, এরূপ ব্যক্তিদের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত ভূমি।	১০	২৬
৩৫	চক সানন্দ রায়-সানন্দ রায়কে যে ভূমি নিষ্কর প্রদত্ত হইয়াছিল।	১৬	১৯
৩৬	নজর পঞ্চতন পাক-হজরত মোহাম্মদ, আলী, ফতেমা বিবি, হাসন ও হুসনের "পুণ্য পৌছান" অর্থাৎ ইঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও শির্ন্নি প্রভৃতি জন্য প্রদত্ত ভূমি। এতদ্ব্যতীত ইজাত মহাল নামে ৮৪৯ টাকা জমাযুক্ত আরও ৮টি মহাল আছে। এবং 'জয়ন্তীয়া মুমাদি' ও "এলাম মুমাদি" নামে আরও দুই প্রকার চিরস্থায়ী মহাল পরে বন্দোবস্ত হয়। জয়ন্তীয়া মুমাদির সংখ্যা ৩৩টি এবং রাজস্ব ৪০৩ টাকা; এলাম মুমাদির সংখ্যা ৯টি এবং রাজস্ব ১৩২ টাকা। শেষোক্ত দুইটি মহাল বাজেয়াপ্তি মহাল শ্রেণীর অন্তর্গত নহে।	৫	৫

বন্দর বাজার গঠন

এই সময় শ্রীহট্টের বন্দর-বাজার বর্ত্তমান স্থানে ছিল না। শহরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী দুপাড়ি হাওরের পশ্চিমাংশে, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত যে একটা বড় রাস্তা আছে, তখন ইহারই দুই ধারে দোকান শ্রেণী ছিল, এই সময় উক্ত বন্দর বাজারের অনেক দোকান পরিত্যক্ত হওয়ায় বাজারের অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান বন্দর বাজারের অনেক অংশই পূর্ব্বে জল্লা বা জলাশয়েরই নিম্নে ছিল, উত্তরের অল্পাংশেই ভূমি ছিল, বড় বড় মট্‌কা (মৃৎকলসী) ফেলিয়া তদুপরি মাটী ভরাইয়া অধিকাংশ স্থল কার্য্যোপযোগী করিয়া লওয়া হয়। যাহারা ঐ ভরট কার্য্য স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছে বাল্যকালে শুনিতে পাইয়াছিলেন, এমন ব্যক্তিগণ হইতে আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি, এবং "চালি বন্দর" বলিয়া খ্যাত পরিত্যক্ত বন্দরের ভগ্ন প্রায় কোন কোন ইষ্টক-গৃহ বাল্যকালে আমরাও দেখিয়াছি।

কেবল বন্দর-বাজার নহে, বর্ত্তমান সহরের অনেক প্রসিদ্ধ স্থল ও অনেক রাস্তা এই উপায়ে নির্ম্মিত হয়; এই সকল শড়কের দুই পার্শ্বে এখনও জল্লা রহিয়াছে,—দেখিলে বোধ হয় যে, মধ্যে মাটী ভরাইয়া পথটি প্রস্তুত করা গিয়াছে।

শ্রীহট্ট শহর

অতি পূর্ব্বে বরশালা ও গড়দুয়ার লইয়া শহর ছিল, পরে মোসলমান সময়ে কিছু দক্ষিণাবর্ত্তী হয়; তখনও আখালিয়া, রায়নগরের উত্তরাংশ ও শেখ ঘাটের কিয়দংশ সহরের অন্তর্গত ছিল। ইংরেজ আমলের প্রথমে নবাব তালাবের তীরদেশ হইতে পথঘাট পর্যন্ত শহর বিস্তৃত হয়। লিণ্ডসে সাহেব শহরটিকে একটি বৃহৎ বাজার বলিয়া লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সময়েই সহরের অনেক স্থান ভরাট করিয়া কার্যোপযোগী করা হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সহরের পরিধি ২ ক্রোশ বা চারি মাইল এবং অধিবাসী সংখ্যা ৩০০০ জন ছিল। সমগ্র জিলায় এই সময়ে অধিবাসী ১,৫০,০০০০ জন হইয়াছিল।

কল্যাণ সিংহের অকল্যাণ

ইতিপূর্ব্বে (২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে) সুবেদার কল্যাণ সিংহ কর্তৃক আগা মোহাম্মদ রেজা নামক মোগল বিদ্রোহীকে দমন করার কথা বলা গিয়াছে। মোগলকে বদরপুর হইতে বিতাড়িত করিয়া কল্যাণ সিংহ বদরপুরেই অবস্থিতি করেন। কিছুকাল পরে তিনি কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কতকগুলি পদচ্যুত ও পেন্‌শন প্রাপ্ত সিপাহী সংগ্রহ করিয়া, কাছাড়ের গাইলাকেন্দি নামক স্থানে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। তখন কৃষ্ণচন্দ্র কাছাড়ের রাজা, তিনি এই সংবাদ শ্রীহট্টের কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইলে, কল্যাণ সিংহের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। বৃটিশ সৈন্যাভিযান সংবাদে সুবেদার কল্যাণ সিংহ জয়ন্তীয়ায় পলায়ন করেন, কিন্তু অচিরেই জয়ন্তীয়া-পতি কর্ত্তৃক ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। একদা কল্যাণ সিংহ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া যান ও বিবিধ স্থান ভ্রমণ করিয়া কুমিল্লা নগরে উপস্থিত হন, তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর নানা বিষয়ে কাছাড়ের সহিত শ্রীহট্টের রাজনৈতিক সম্বন্ধ ঘটে, "উপসংহারে" অতি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করা যাইবে।

হালাবাদি জরিপ

১৮২০ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ড সাহেব হালাবাদি ভূমির জরিপ আরম্ভ করেন; কতক ভূমি জরিপ হইয়া নানা কারণে ইহা স্থগিত হয়। পরে ১৮২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে টকার (E. Tacker) সাহেব হালাবাদি জরিপ শেষ করেন। এই জরিপকে টকার সাহেবি জরিপও বলিয়া থাকে।

ওয়ার্ড সাহেবের পর কলিন্স (G. Collins) সাহেব শ্রীহট্টের কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন, তৎপরেই টকার সাহেব আগমন করেন। মধ্যে টরকুয়াণ্ড (W. J. Turquand) সাহেব তিন মাসের জন্য শ্রীহট্টে আসেন; টকার সাহেব ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীহট্টে অবস্থিতি করেন। টরকুয়াণ্ড্ সাহেবের মাসিক বেতন আড়াই হাজার টাকা ছিল।[১৬]

খাসিয়াদের আক্রমণ

শ্রীহট্টের উত্তর পর্ব্বতবাসী স্বাধীন খাসিয়া জাতি কখন কখন উত্তেজিত হইত, উইলিস সাহেবের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সেই উত্তেজনার মূলে ছাতকের ইংলিস্ কোম্পানীর কার্য্যকারিতা ছিল; ৪র্থ অধ্যায়ে ইংলিস্ বিবরণ প্রসঙ্গে তাহার অন্যরূপ প্রমাণ দেওয়া যাইবে। কিছুদিন খাসিয়ারা শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে তৎপ্রদেশে সৈন্য প্রেরণ অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ার সন্নিকটবর্ত্তী খাসিয়ারা এক সিপাহী ও এক ডাকওয়ালা এবং এক ধোবাকে নিহত করে।

এই সময় চেরাপুঞ্জিতে ডেভিড স্কট (David Scott) নামে গবর্ণর জেনারেলের জনৈক এজেন্ট বাস করিতেন। "সিলেট লাইট ইনফেন্টি" নামক দেশী সৈন্য দলের কিয়দংশ সীমান্ত রক্ষার্থ তথায় থাকিত। ডেভিড্ স্কট সাহেব অনুপস্থিত থাকায় শ্রীহট্টের কালেক্টর-ম্যাজিষ্ট্রেট টকার সাহেব উক্ত সৈন্য দলের অধিনায়ক কাপ্তেন লিষ্টার (Captain Lister) সাহেবকে নিজ দায়িত্বে লেখেন যে গবর্ণমেন্টের স্বার্থ রক্ষার্থ তিনি যেন আক্রমণকারী খাসিয়াদিগকে সৈন্য দ্বারা অচিরাৎ দমন করেন। এই উপদেশ মত কার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু ফল শুভজনক হয় নাই।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে আসাম ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয় তখন জয়ন্তীয়ার মধ্য দিয়া শ্রীহট্ট হইতে আসাম যাওয়া যাইতে পারিত; কিন্তু এই সময় ব্রহ্মযুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় বদরপুরে একদল সৈন্য প্রেরিত হয় ও জয়ন্তীয়ার পথ বন্ধ হইয়া যায়। তখন পাণ্ডুয়া, চেরাপুঞ্জি হইয়া শিলং যাওয়ার পথ প্রস্তুত করা আবশ্যক হইয়া উঠে। খাসিয়া পর্ব্বতের নংখাও নামক স্থানের রাজা ইংরেজদের কথামত পথ দিতে স্বীকৃতি হইয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সন্ধি বদ্ধ হন। তদানুসারে লেপ্টেনান্ট বেডিগফিল্ড্ (Bedigfield) ও বালটন (Burlton) সাহেব তথায় প্রেরিত হন। নিজ রাজ্যের ভিতর দিয়া পথ দিতে রাম্বরায় অঞ্চলের রাজাও স্বীকৃত হন; কিন্তু ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজাগণ এই জন্য নিতান্ত অশান্ত হইয়া উঠে; প্রথমে তিনিই আক্রান্ত ও নিহতন হন; অনেকটি গ্রাম লুণ্ঠিত হয়, খাসিয়া প্রজারা কামরূপ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া বনগাঁ থানা আক্রমণ করতঃ তত্রত্য পুলিশ কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে হত্যা করে। পূর্ব্বোক্ত লেপ্টেনান্টদ্বয় এবং কয়েকটি সিপাহীও নিহত হয়। গবর্ণমেন্টকে তখন বাধ্য হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হয়।[১৭]

কাপ্তেন লিষ্টার "সিলেট লাইট ইনফেন্টি" সৈন্যদল সহ পথে বিলম্ব না করিয়া বরাবর চেরাপুঞ্জি উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।[১৮] এলেন্স্ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে এই সময়,

---

১৬. ইঁহাদের শাসনকালের নির্দ্দেশ (২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ১।২ অধ্যায় উল্লেখিত) জ-পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

১৭. 'In 1826 the Raja of Nongkhlow allowed to make a road accioss the hill, to Connect Surma-Valley with Assam proper. On April 1829 Khasiyas arose in arms and massacred Lieutenants Bedigfield and together with some sepoys. This led to militaiy operations.'
-Hunter's Statistical Accounts of Assam.

১৮. See the letter address to G. Swinton Esq. Chief Secret ary to the Grovernment, Fort William; from David Scott, Agent to the Government General, dated 30th May 1829.

আবশ্যক হওয়ায় চেরাপুঞ্জির রাজাকে ভোলাগঞ্জ হইতে ৪৬ হাল ভূমি দিয়া চেরা ষ্টেশন গ্রহণ করা হয়। (১৮২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে।)

খাসিয়াদের যুদ্ধনীতি পৃথক, এক সঙ্গে হঠাৎ আপতিত হইয়া অপ্রস্তুত সৈন্যদিগকে হতাহত করিয়া চলিয়া যায়; সম্মুখ সমরে তাহারা অভ্যস্ত নহে। সুতরাং লিষ্টার সাহেবকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তিনি শ্রীঘ্র কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। গবর্ণমেন্ট সৈন্যদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাহাদের ভাতা এক টাকা হারে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন।[১৯]

লিষ্টার অনেকটি খণ্ড যুদ্ধের পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে খাসিয়াদের শেষ রাজাকে গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন।

টকার সাহেবের পর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীহট্টে আট জন কালেক্টরী আগমন করেন। (ইঁহাদের নিযুক্তি ও কার্য্য ত্যাগের তারিখ পরিশিষ্টে দেওয়া হলো।) এই সময় মধ্যে জয়ন্তীয়ায় ইংরেজাধিকার হয়, ও খাসিয়া এবং জয়ন্তীয়া পাহাড় এক ভিন্ন ডিষ্ট্রিক্টে পরিণত হয়।[২০]

নিষ্কর মহাল ও থাক জরিপ

ইংরেজ কর্ত্তৃক জয়ন্তীয়া জয়ের পর, এই সময়েই (১৮৩৬-১৮৪০ খৃষ্টাব্দ) শ্রীহট্টের নিষ্কর মহালগুলি জরিপ হয়।[২১] এবং থুলিয়ার সাহেব কর্ত্তৃক জয়ন্তীয়া জরিপ (১৮৩৭-১৮৪০ খৃষ্টাব্দ);

---

১৯. ++ I am directed to desire that you will communicate to Captain Lister and the officers of his corps the acknowledgments of the Governor General in council for there active an zealous exertions in the hills. As a reward to the men of corps for their good conduct, His Lordship in council has been pleased to grant them Batta of Re 1 per mensum during the time they were actually employed in the Hills, and to resolve that in future, they shall be entiled to the same indulgnce when over they may be engaged in service in the Cossiya hills, thus placing them on a footing, during sueh service, with the Local corps in Assam '
-Letter from the chief secretary to the Government of India to David Scott, the Agent.
-Dated 26th June 1829.

২০. এই ডিষ্ট্রিক্টের উত্তরে কামরূপ ও বনগাঁ, পূর্ব্বে কাছাড়, দক্ষিণে শ্রীহট্ট, এবং পশ্চিমে গারো পাহাড়। পরিমাণফল ৬০২৭ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা ২০২২৫০। ইহার প্রধান নগর শিলং। জোয়াই একটি মহকুমা এবং চেরাপুঞ্জি ও চেলা প্রসিদ্ধ স্থান। এ স্থানদ্বয়ে কয়লা ও লৌহের খণি আছে। থারিয়াঘাট তত্রত্য এক বড় পল্লি। মিলং সবডিভিশনে ১৫টি সিমশিপ, ৩টি লিংডশিপ ও ৭টি ওয়াদাদারশিপ (ষ্টেট) আছে। জোয়াইয়ে ১৯টি দলইশিপ ও ৩টি সরদারশিপ আছে।

২১. দশসনা বন্দোবস্তের সময় শ্রীহট্টে অনেক মহাল নিষ্কর থাকে, তৎপরে তাহা বাজেয়াফ্ত হইয়া কর ধার্য্য হয়, তাহা বাদে যে সকল মহাল নিষ্কর থাকে, তাহার সংখ্যা ১৭৭০টি মাত্র; নিম্নে ইহার সংখ্যা ও সংজ্ঞা দেওয়া গেলঃ–

	নাম	সংখ্যা	রাজস্ব
১.	সিদ্ধ নিষ্কর–প্রাচীন সনদ দৃষ্টে যে মহাল গুলি নিষ্কর রাখা হয় নাই।	৪০০	নাই
২.	খানেবাড়ী জমিদারি–জমিদারদের যে যে বাস ভূমি নিষ্কর আছে।	২৭	”
৩.	খসিমহাল–বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান সাহেবকে দেওয়া নিষ্কর ভূমি।	২৭	”
৪.	কসবে শ্রীহট্ট–হায়দর গাজীর প্রাপ্ত মহাল শ্রীহট্ট সহর।	১	”
৫.	সর্ব্বপ্রকার মহালের–রিভমশন চিরস্থায়ী প্রভৃতি বন্দোবস্ত হইয়া গেলে যে সকল মহালের ২৫ গুণ রাজস্ব এককালে গ্রহণ করিয়া নিষ্কর করা হইয়াছে।	১৩১৫	”
৬.	কিছমল–পং পাথারিয়ার এলাম ভূম হইতে ২৩৪০ একর ভূমি ৯৯২৪ টাকা গ্রহণে চা-কর সাহেবকে নিষ্কর দেওয়া হয়।	১	”
৭.	এলাম রিভশন-(এ গুলি পশ্চাৎ নিষ্কর করা হয়) এক টাকার ন্যূন পরিমিত কর যুক্ত মহাল গুলির ২৫ গুণ খাজনা দাখিল ক্রমে নিষ্কর করা হয়।	২৫	”

তিনি জয়ন্তীয়া জরিপের দুই বৎসর পর লাতু "জিলার" ১১টি পরগণায় জরিপ করেন। এই জরিপের ১৭ বৎসর পরে প্রসিদ্ধ থাক জরিপ হয়। প্রত্যেক মহাল থাক অর্থাৎ চিহ্নানুসারে জরিপ হয় বলিয়া এই জরিপ থাকবস্ত নামে খ্যাত। ইহাই প্রকৃত "রেভিনিউ সার্ভে।" প্রায় সাত বৎসরে এই জরিপ সমাধা হইয়াছিল। (১৮৫৯-১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।)

বর্ণিত সময়ে শ্রীহট্টের অবস্থা অনেকটা হীন হইয়া পড়ে, ৪০ বর্ষ পূর্ব্বে যে শ্রীহট্ট সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত ছিল, যথায় চাউলের মন বার আনা মূল্যে বিক্রয় হইত, এই সময় আর সেরূপ ছিল না। এই সময় সমগ্র জিলায় ৫০০০ টাকার উর্দ্ধ আয়ের জমিদারের সংখ্যা ১৫ জনের অধিক ছিল না, অধিকাংশ জমিদারের অবস্থাই শোচনীয় ছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব বাকিতে শ্রীহট্টে ১০০৪টি মহাল নিলাম হইয়া যায়, ইহাতেই দেশের অসচ্ছলতার কথা স্পষ্ট বোধগম্য হইবে।[২২] ইতিপূর্ব্বে খাসিয়াদের উল্লেখ করা হইয়াছে, খাসিয়া অভিযানের সময়েই শ্রীহট্টে কুকির উৎপাত আরম্ভ হয়; পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তদ্বিবরণ কথিত হইবে।

২২. The Friend of India, February 9th 1837.

তৃতীয় অধ্যায়
বিবিধ

কুকি জাতি

ত্রিপুরা পর্ব্বতের পূর্ব্ব ও উত্তরদিক্‌বর্ত্তী পর্ব্বতমালা পইতু, পাইতু, ফুন, ফুনতেই প্রভৃতিতে নানা শ্রেণীর অসভ্যদের বাস; এই অসভ্যগণের জাতের নাম খচাক। শ্রীহট্টবাসীগণ ইহাদিগকে কুকি নামে অভিহিত করেন; কাছাড়বাসী জন সাধারণের কাছে তাহারা লুশাই আখ্যা প্রাপ্ত হয় সরকারী কাগজপত্রে উভয় নামই দৃষ্ট হয়। কুকিগণ প্রাচীন কিরাত বংশজ।

কুকিদের প্রকৃতি অতি উদ্ধত; শত্রু দূরে থাক, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ঘটিলেও একে অন্যের প্রাণ বধ না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। তাহাদের একতার দৃঢ় বন্ধন অতীব প্রশংসনীয়। ব্যভিচার প্রায়ই দেখা যায় না, ব্যভিচারীর দণ্ড অতি কঠিন। কিন্তু অবিবাহিতাবস্থায় ইহা তত দোষনীয় গণ্য হয় না। ইহারা একরূপ উলঙ্গই থাকে। স্ত্রীলোকেরা সামান্য একখণ্ড বস্ত্রে সম্মুখ দিগ আবৃত করে কিন্তু তাহাও সর্ব্বদা স্মরণ থাকে না।

ইহারা মাংসাশী ও মদিরাসক্ত। কুক্কুরকে ভোজন করাইয়া বধ করতঃ অগ্নিদগ্ধ করিয়া উদরস্থ সিদ্ধ তণ্ডুল অতি উপাদেয় মিষ্টান্নের ন্যায় খাইয়া থাকে। পূর্ব্বে কুকিরা নরমাংস খাইত অধুনা তাহা করে না, কিন্তু যুদ্ধে প্রথম নিহত ব্যক্তির যকৃতের কিয়দংশ খাইয়া থাকে।

কুকিগণ ত্রিপুরাধিপতিকে তাহাদের সার্ব্বভৌম নরপতি বলিয়া মান্য করিলেও, তাঁহার বিরুদ্ধে বহুবার তাহাদের অস্ত্র ধারণ করিতে দেখা গিয়াছে। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলের সর্দ্দারগণ রাজা বলিয়া কথিত হয়।

প্রথম কুকি আক্রমণ

যে সময়ে শ্রীহট্টের উত্তরাংশে খাসিয়ারা ইংরেজের বিরুদ্ধাচারণ করিতেছিল, দক্ষিণাংশে সেই সময়েই কুকিগণ গোলযোগ উপস্থিত করে। টকার সাহেবের সময়ে (১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কুকিরাজ বৃন্তাই কয়েকটি কাঠুরিয়াকে পর্ব্বত মধ্যে নিহত করে। এই ঘটনার অনুসন্ধান জন্য দূত প্রেরিত হইলে, জানা গেল যে, প্রতাপগড়ের জমিদার[১] হইতে কুকিগণ উপহার পাইত রীত্যানুযায়ী উপহার না পাওয়ায় তাহারা ক্ষেপিয়া এইরূপ প্রতিশোধ দিয়াছে। কুকিরা গবর্ণমেন্টের সম্বাদ বাহকের মধ্যে দুই ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখে ও উহাদের মুক্তির জন্য টাকা দিয়া সেই দুই ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া আনেন।[২]

সেই প্রথম বারে গবর্ণমেন্ট কুকিদিগকে বৃটিশাধিকৃত বাজারে আসিতে নিষেধ করা ব্যতীত আর কোনও প্রতিকার করিতে পারেন নাই।

এই ঘটনার পর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কুকিগণ কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। ঐ সালের শেষভাগ হইতে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এনাণ্ড (A. S. Annand) সাহেব শ্রীহট্টের কালেক্টর ছিলেন। তাহার সময়ে দ্বিতীয় বার কুকির আক্রমণ হয়।

১. এই সময় উক্ত পরগণার অধিকাংশ ভাগই মৈনার চৌধুরী বংশীয়দের অধিকারে ছিল।

২. See the Assam Disrict Gazetteers Vol. (Sylhet) Chap. II, P. 43

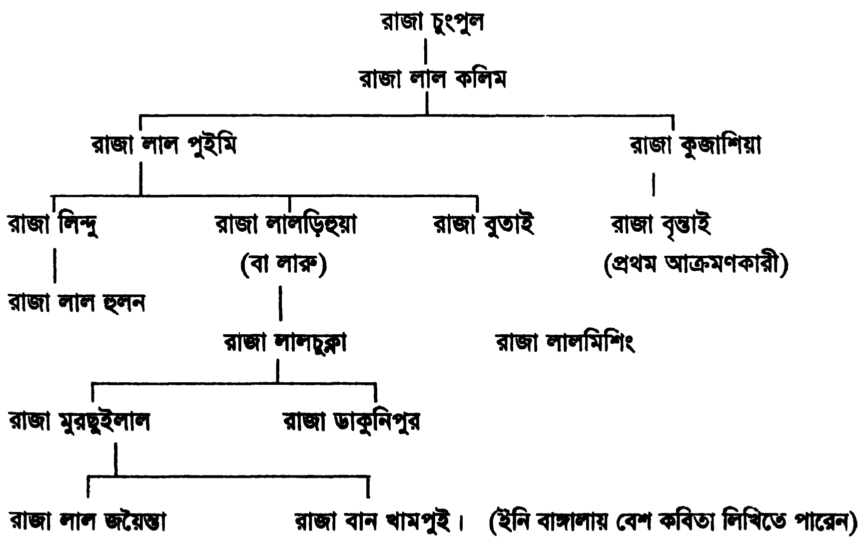
লালচুক্লার আক্রমণ

বলা গিয়াছে, কুকিগণ নামতঃ ত্রিপুরেশ্বরের অধীন, সুতরাং ইহাদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য সময় সময় ত্রিপুরার সঙ্গেও গবর্ণমেন্টকে বিবাদ করিতে হইয়াছিল। কুকিরাজ লালড়িহুয়ার পুত্র লালচুক্লা, পিতার মৃত দেহের সহিত লৌকিক প্রথা মত নরমুণ্ড দিতে ইচ্ছা করিয়া, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল প্রতাপগড় পরগণাস্থিত কচুবাড়ী আক্রমণ পূর্ব্বক ২০টি নরমুণ্ড ও ৬টি স্ত্রলোককে ধৃত করিয়া লইয়া যায়। লালচুক্লা ত্রিপুরেশ্বরের সামন্ত রাজা ছিল। এইজন্য এই অত্যাচারের প্রতিবিধানার্থে এনান্ড সাহেব গবর্ণমেন্টের পক্ষে ত্রিপুরেশ্বরকে লিখিলে, লালচুক্লাকে ধৃত করিতে ত্রিপুরাপতি দশজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া দেন। এই অভিযান প্রহসনের সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষ হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেন্ট বিরক্ত হইয়া মহারাজকে লিখিলেন যে, আগামী ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে অপরাধীকে গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পণ না করিলে, বৃটিশ সৈন্য অপরাধীকে ধৃত করিবার জন্য তাঁহার রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে বাধ্য হইবে।

এই ঘটনার পর ত্রিপুরেশ্বর ২৭ জন সাক্ষির সহিত ৪ জন কুকিকে শ্রীহট্টে পাঠাইয়া দিলেন; তাহারা এনান্ড সাহেবের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করে যে, এই বিবরণের কিছুই তাহারা জানে না। বস্তুতঃ এই বিষয়ে ত্রিপুরেশ্বর সন্তোষজনক কিছুই করিতে পারেন নাই। কাজেই গবর্ণমেন্ট স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; কাপ্তেন ব্লেকউড্ ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতর দিয়া লালচুক্লাকে ধরিতে সসৈন্যে ধাবিত হইলেন। লালচুক্লা[৩] অচিরেই আত্মসমর্পণ করে, শ্রীহট্টে তাহার বিচার হয় ও তৎপ্রতি দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কুকিরা শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার সীমান্ত স্থলে ভীষণ উৎপীড়ন করে ও দেড়শতের অধিক প্রজা বিনষ্ট করে। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট ইহার প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত হইলে ত্রিপুরাধিপতি জ্ঞাপন করেন যে, এই হত্যাকাণ্ড তাহার রাজ্যের মধ্যে ঘটিয়াছে, গবর্ণমেন্টের হস্তার্পণের অধিকার নাই। সে সময় কাপ্তেন ফিশারের মানচিত্রানুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের সীমার ভিতরে এই

৩. লালচুক্লা এক বিখ্যাক কুকি সর্দ্দার, ইহার বংশাবলী এইরূপঃ—



ঘটনা সংঘটিত হওয়া নিরূপিত হয়।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ও তাহার পরবর্ষে কুকিরা উৎপাত করে। এ অত্যাচারও লাতু কালেক্টরী বিভাগের অন্তর্গত স্থানে সংঘটিত হয়, এবং ইহাতেও মহারাজ পূর্ব্বোক্ত আপত্তি উত্থাপন করেন। এই সময় কাপ্তেন লিষ্টার সসৈন্যে কাছাড়ের দিকে কুকি দমনে গিয়াছিলেন। ইহার পর কয়েক বৎসর মধ্যে কুকিগণ শ্রীহট্ট জিলায় কোনও রূপ অত্যাচার করে নাই।

এনান্ড সাহেবের পর ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত শ্রীহট্টে যথাক্রমে ছয়জন কালেক্টর আগমন করতঃ কার্যকাল অন্তে চলিয়া যান, (ইঁহাদের নামাদি "জ"-পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য;) এতন্মধ্যে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পুলিশের রিপোর্টানুযায়ী শ্রীহট্টের জন সংখ্যা ১৩৯৩৫০০ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে হেউড্ (R. O. Heywood) সাহেব ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীহট্ট আগমন করিয়া দশন মাস অবস্থিতি করেন।

বিদ্রোহী সিপাহী ও লাতুর লড়াই

হেউডের শাসন সময় (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) শ্রীহট্টবাসীগণ বিশেষ উৎকণ্ঠিত ও সন্ত্রাসিত হইয়াছিল, সমগ্র ভারতব্যাপী যে ভীষণ বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, শত সহস্র ইংরেজ, শত শত রাজভক্ত প্রজার প্রাণ যে প্রজ্জ্বলদ বহ্নি মুখে আহুতি প্রাপ্ত হইতেছিল, তাহারই একটি স্ফুলিঙ্গ শ্রীহট্ট জিলার ইংরেজদিগকে বিদগ্ধ করিতে ধাবিত হইয়াছিল।

চট্টগ্রামে গবর্ণমেন্ট তিন শত সীমান্তরক্ষক সৈন্য ছিল।[৪] ইহারা উত্তর পশ্চিমের "সিপাহী বিদ্রোহের" সংবাদে বিদ্রোহী হইয়া, তথাকার কালেক্টরী লুণ্ঠন করতঃ ২৭৮২৬৭ টাকা ও তিনটি হস্তী লইয়া এবং কারারুদ্ধ অপরাধিদিগকে মুক্ত করিয়া, ত্রিপুরার মধ্যভেদ পূর্ব্বক শ্রীহট্ট জিলায় প্রবেশ করে। শ্রীহট্টে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা লংলার জমিদার মৌলবী আলী আহম্মদ খাঁর বৃদ্ধ পিতা ধর্ম্মভীরু গৌছআলী খাঁ হইতে রসদ আদায় করিয়া লয়, এই জন্য জমিদারকে পশ্চাৎ নির্দ্দোষীতার প্রমাণ দিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।[৫]

এই সংবাদ পাইয়া শ্রীহট্টের পদাতিক সৈন্যদল (Sylhet Light Infantry) লইয়া মেজর বিং (Major Byng) সাহেব প্রতাপগড় অভিমুখে ধাবিত হন। প্রতাপগড় পৌঁছিয়া সৈন্যগণ রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সংবাদ পাওয়া যায় যে, বিদ্রোহীরা লাতু অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে,[৬]

ইহা শ্রবণ মাত্র বিং সাহেব সৈন্যদিগকে লাতু যাত্রার আদেশ দেন, সৈন্যগণ "অর্দ্ধসিদ্ধ অন্ন" ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিল।

লাতুর বাজারের নিকট বিদ্রোহীদের সহিত বৃটিশ সৈন্যের সাক্ষাৎ, বিদ্রোহীগণ নদীতীরবর্ত্তী মাল-গড় টীলায় আশ্রয় লইল ও ইংরেজদের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। বৃটিশ সৈন্য নদীতীরে নিম্নে ছিল, বিদ্রোহীদের প্রথম গুলিতেই মেজর বিং প্রাণত্যাগ করেন। দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচটি বীর যোদ্ধা নিহত ও একটি গুরুতর আহত হইয়া পড়িল, সৈন্যগণ প্রমাদ গণিল। সুবেদার অযোধ্যাসিংহ তখন অপূর্ব্ব রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া সুকৌশলে জয়লাভ

৪. 2nd, 3rd, and 4th companies of the Regiment Native Infantry.

৫. Hunter's Statistical Accounts of Assam VOL. II. (Sylhet) P. 130.

৬. এই সংবাদ কালামিয়া নামক জনৈক মোসলমান প্রদান করিয়াছিল, কালামিয়া মৈনার চৌধুরীদের প্রজা ছিল, চৌধুরীদের ইহাকেই সৈন্যদের পথ প্রদর্শনের জন্য বিং সাহেবের সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত তাহারা রসদ ও কুলি ইত্যাদি প্রদান করিয়াও সাহায্য করেন।

করিলেন। ইহাই লাতুর লড়াই নামে খ্যাত।[৭]

২৩ জন হত ব্যক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্রোহীরা লুক্কায়িত হইল। তাহারা মণিপুর যাইতে না পারে, এই জন্য তাহাদিগকে বাঁধা দিতে পথে সৈন্য স্থাপিত করা হইয়াছিল। একস্থানে দশটি বিদ্রোহী দলভ্রষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল, এই সংবাদ পাইয়া ১৬ জন সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করে; আক্রান্তদের মধ্যে ৮ জন হত হইলে দুইজন পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করে।

বিদ্রোহীরা পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছিল, কিন্তু কাছাড়ের মোহনপুর ও বিননকান্দি নামক স্থানে পুনর্ব্বার পরাস্ত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। ইহারা জীবিত রহে, তাহারা সকলেই পলাইয়া কুকিদের আশ্রয়ে গমন করিয়াছিল।

ইহারা কুকিদিগকে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু কুকিগণ পাঁচ বৎসরের মধ্যে শ্রীহট্টে কোনরূপ অত্যাচার করে নাই।

আদমপুর আক্রমণ

বিদ্রোহের গোলযোগ দূর হইলে হে উড সাহেব শ্রীহট্ট ত্যাগ করেন, তৎপরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর মধ্যে সাতজন কালেক্টর শ্রীহট্ট আগমন করেন।[৮] তৎপরে স্মিথ (Theodore Smith) সাহেবের সময়ে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লালচুক্লার পুত্র মুরছুইলাল, সুখপাইলাল নামক[৯] দুর্দ্ধর্ষ স্বাধীন কুকি সর্দ্দারের ভগিনীকে বিবাহ করে; এই বিবাহে ভগিনীর সঙ্গে দাসী যৌতুক দিবার জন্য ইহারা একযোগে আদমপুরের নিকটবর্ত্তী তিনটি গ্রাম আক্রমণ করিয়া হত্যা ও অগ্নিদান করতঃ কয়েকটি স্ত্রীলোক ধৃত করিয়া লইয়া যায়। ইহার পরে কুকিগণ গবর্ণমেন্টের সহিত সন্ধি করে; যে সকল স্ত্রীলোক ধৃত করিয়া নিয়াছিল, তাহার কয়েকটি দাসী স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল, কয়েকটিকে কুকিগণ বিবাহ করিয়াছিল এবং কয়েকটি পলাইয়া দেশে আসিয়াছিল।

চঞ্চল-চরিত্র, অস্থির প্রকৃতি কুকিদের সন্ধি অধিকদিন স্থির থাকে নাই; সন্ধি ভঙ্গ করায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে হয়। এই সময় ত্রিপুরায় পলিটীকেল এজেন্টের নূতন পদ প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

৭. See the Assam District Gazetteers VOL. II. (Sylhet) Chap. II. P. 61.

৮. ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড জ-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৯. মুরছুইলাল নামতঃ ত্রিপুরেশ্বরের অধীন হইলেও রাজা সুখপাইলাল সম্পূর্ণ স্বাধীন সর্দ্দার ছিল। ত্রিপুরেশ্বর নানারূপ উপহার দিয়া সময় সময় তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। লঙ্গাই দফার হালামগণের নিকট রাজদণ্ড উপহার ধাতুনির্ম্মিত এক অশ্বারোহী যোদ্ধা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার পৃষ্ঠে ত্রিপুরেশ্বর বিজয় মাণিক্য ও ছত্র মাণিক্যের নামাঙ্কিত রহিয়াছে। শাখা-চেপাদি দফার হালাম কুকিগণের কাছে ইঁহাদেরই প্রদত্ত একহস্তী ও ব্যাঘ্র মূর্ত্তি মিলিয়াছে, তাহাদের পৃষ্ঠে এই সংস্কৃত বাক্যটি অঙ্কিত রহিয়াছেঃ–

"পূর্ব্বাপর্য্য ক্রমাত্তবন্ত আরীয়া,
ইদানীং যদি বৈপরীত্যমাচরন্তি।
তদোপরি ধর্ম্মঃ শসানাশো ভবিষ্যতি
পশ্চাদগজ শার্দ্দূলৌ।"

অর্থাৎ তোমাদের সহ পূর্ব্বাধি আত্মীয়তা আছে। এখন তোমরা সেই আত্মীয়তা রক্ষা না করিলে তোমাদের ধর্ম্ম ও শস্য নষ্ট হইবে এবং পরে তোমরা হস্তী অথবা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে।

(নব্য ভারত–১৩০৪ বাংলা ৭ম সংখ্যা)।

খেলাত প্রদান

এই সময় কাছাড়ের ডিপুটী কমিশনার এডগার সাহেব উপহার প্রদানে কুকিদিগকে শান্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; তিনি সুখপাইলালের সহিত সন্ধি ও বন্ধুতা স্থাপন করিয়া তাহাকে এক আশ্চর্য্য খেলাত দান করেন। লোহিত ও স্বর্ণ-পুষ্প খচিত সবুজ রঙ্গের পাজামা, সবুজ ও স্বর্ণ-প্রান্ত বিশিষ্ট বেগুণে রঙ্গের কুর্ত্তা, সবুজ ও স্বেত রেসমের নির্ম্মিত অদ্ভুতাকার টুপী, উজ্জ্বল কাচের মালা ও কাচ নির্ম্মিত কুণ্ডল, ইহাই উপহারের উপাদান।[১০]

এডগার সাহেব ভাবিলেন যে মূল্যহীন কাচমালা দিয়া অসভ্যদিগকে বাধ্য করিয়া লইলেন, কিন্তু তাহারা ভাবিল বিপরীত;—মণিপুর দরবারে গিয়া তাহারা প্রকাশ করিল যে, কাছাড়ের বড় সাহেব তাহাদের রাজাকে কর দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহারা ভাবিয়াছিল যে, তাহাদের অত্যাচার যত বাড়িবে, গবর্ণমেন্ট ততই ভীত হইবেন ও তাহাদিগকে আরও খেলাত দিবেন; এই ভাবিয়া কুকিগণ মণিপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জিলা বিশেষ উদ্যোগে এককালে আক্রমণ করে।

শেষ আক্রমণ

যখন সদরলেণ্ড (H. C. Satherland) সাহেব শ্রীহট্টে কালেক্টর স্বরূপ ছিলেন, এই আক্রমণ সেই সময়েই সংঘটিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী শ্রীহট্টের কাছাড়িয়া পাড়া আক্রমণ করিয়া কুকিগণ ২০টি মনুষ্য বধ ও কতকগুলি স্ত্রীলোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, ২৪শে তারিখ চরগোলা আক্রমণ করিয়া দুইজনকে বধ করে, এবং ২৭শে তারিখে আলীনগর আক্রমণ করিয়া অনেক লোককে হত্যা করে। কিন্তু ঐ সময়কার কাছাড়ের আক্রমণ বিশেষ ক্ষতি জনক ছিল, অনেকটি চা-বাগান আক্রান্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে আলেকজাণ্ডারপুর চা ক্ষেত্রের বহুতর কুলি ও মেনেজার উইঞ্চেষ্টার সাহেব নিহত হন, তাহার কন্যাকে কুকিরা ধৃত করিয়া লইয়া যায়। এই সকল আক্রমণ প্রধানতঃ এডগার সাহেবের বন্ধু কর্ত্তৃকই হইয়াছিল! এই সংবাদ প্রাপ্তে গবর্ণমেন্ট বুঝিলেন যে মূল্যহীন বেলওয়ারি মালায় অসভ্যগণ দমিত হইবে না, দস্তুর মত অভিযানের প্রয়োজন। তদনুসারে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কাছাড় ও চট্টগ্রামে দুইটি বৃহৎ সেনাদল গঠিত হয়; ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সময় পরাক্রমের সহিত কুকিদের বাসস্থান আক্রমণ করে; অনেকটি কুকি সর্দ্দার ধৃত ও বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা এই সময় নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, সুখপাইলালের বাস ভূমি ত্রিপুরা রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়।[১১]

ইহার কিছুকাল পরে তাহারা পুনর্ব্বার ক্ষেপিয়া উঠে, তখন গবর্নমেন্ট উত্তর লুশাই গ্রহণ করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাহারা উত্তরলুশাইর শাসন কর্ত্তা কাপ্তেন ব্রাউন সাহেবকে হত্যা করে, তখন গবর্ণমেন্ট ক্রুদ্ধ হইয়া লুশাইক্ষেত্রে যে অগ্নি ক্রীড়া প্রদর্শিত করেন, তাহার ফলে সমগ্র লুশাই প্রদেশ গবর্ণমেন্টের করায়ত্ত হয়। তদবধি আর তাহাদের অত্যাচার শুনা যায় নাই।

লুশাই প্রদেশ

গবর্ণমেন্ট ৭২২৭ বর্গমাইল পরিধি বিশিষ্ট লুশাই প্রদেশ হস্তগত করিয়া ক্রমে অসভ্য কুকিদিগকে সভ্যতার আলোক দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। লুশাই পর্ব্বত উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত।

---

১০. The observer. 25th February, 1871.

১১. Hunter's Statistical Accounts of Assam Vol. II (Sylhet) P. 129. Vide Assam District Gazetteers Vol. II. P. 45.

লুশাই প্রদেশের উত্তরে কাছাড় জিলা, পূর্ব্বে মণিপুর ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও পার্ব্বত্য চাটিগা। লোক সংখ্যা প্রায় ৮২৪৩৪। টিপাই, ধলেশ্বরী, সুনাই, এ প্রদেশের প্রধান নদী। আইজল ও লেংলে দুর্গই প্রধান স্থান। আইজলে একদল সৈন্য আছে, তদ্ব্যতীত সাইরাং ও চাঙ্গশীল সৈনিক নিবাস। টিপাইমুখ ও লুশাই হাটই প্রধান বাণিজ্য স্থান।

সে যাহা হউক, কুকিদের অত্যাচার হইতে প্রজা রক্ষার্থে শ্রীহট্টের দক্ষিণ অংশে লঙ্গাই, আদমপুর ও আলী নগর নামে তিনটি গারদ ছিল, গারদগুলিতে এক একজন হাবিলদার ও কয়েকটি সিপাহী থাকিত, কুকিরা দমিত হওয়ায় অনাবশ্যক বোধে এই গারদগুলি উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

কুকি সর্দ্দারগণও এখন অনেকেই শান্তভাবে অবলম্বর্ন করিয়াছে। ত্রিপুরেশ্বরের যত্নে তাঁহারা অধীন সামন্ত সর্দ্দারগণ মধ্যে সভ্যতালোক ঈষৎ প্রবেশোন্মুখ হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত মুরছুইলালের পুত্র বাণখাম্পুইরাজা বেশ বাঙ্গালা কবিতা লিখিতে পারেন।

হামিদবখ্‌ত্ মজুমদার

লুশাই যুদ্ধের প্রসঙ্গে হামিদবখ্‌ত্ মজুমদারের নাম অবশ্য উল্লেখযোগ্য। লুশাই সমরে ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সিপাহী বিদ্রোহের সময় হামিদবখ্‌ত্ মজুমদার সাহেব রাজভক্তির বিশেষ পরিচয় দেন, নানারূপে গবর্ণমেন্টের সহায়তা করেন।

যখন বিদ্রোহী সিপাহীদের আগমনের সংবাদে সহরের ইংরেজগণ ও অধিবাসী সমূহ ভয়ত্রস্ত হইয়াছিল, তখন শ্রীহট্টের শেষ কানুনগো হামিদবখ্‌ত্ সাহেবের পুত্র হাজি সৈয়দবখ্‌ত্ বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়া ছিলেন। তথাপি তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হামিদবখ্‌ত্ মজুমদারের সহিত, পৈত্রিক ছয়টি কামান লইয়া সহর রক্ষায় প্রস্তুত হন। কিন্তু সংশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া গবর্ণমেন্ট সেই কামান ছয়টি কাড়িয়া লন। শেষে কামানগুলি ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত হইলেও বৃদ্ধ হাজি সাহেব তাহা পুর্নগ্রহণ করেন নাই। কামানগুলি অদ্যাপি শ্রীহট্টের কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে।

সৈয়দবখ্‌ত্ মজুমদার অনেক দিন মক্কায় ছিলেন, এবং তিন বৎসরের জন্য মক্কায় সেরিফ কৌন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তুরস্কের সুলতান ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে "ষ্টার অব মেজিদি" উপাধি ও সম্মান সূচক সনন্দ দিয়াছিলেন।

দিল্লীর ভাগ্যচ্যুত সম্রাট-তনয় ফিরোজ শাহ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে শাহজালালের কবর দর্শনে আগমন করিলে, একমাত্র মজুমদার সাহেবেরই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হামিদবখ্‌ত্ মজুমদার লুশাই সমরে বিশেষরূপে সাহায্য করিলে; পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেন্ট ইঁহাকে আদালতে উপস্থিত না হইবার ক্ষমতা প্রদান করেন। হামিদবখ্‌ত্ সাহেব অনেক দিন ডিপুটী কালেক্টর ও ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব্বে "এলাম মুমাদি" মহালে উল্লেখ করিয়াছি, গবর্ণমেন্টের ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩৭১ নং পত্রের মর্ম্মানুসারে পাঁচ বৎসরের অগ্রিম খাজানা গ্রহণ পূর্ব্বক ১২ টাকা রাজস্ব "এলাম মুমাদি" নামে নয়টি মহাল তৎকর্ত্তৃক চিরস্থায়ীরূপে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।[১২]

এলাম ভূমি

এলাম শব্দের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; সাধারণতঃ লোকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অতিরিক্ত মহালকে এলাম বলিয়া থাকে। ১২৮৭-৩৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম লেপ্টেনান্ট পিশার সাহেব এলাম

১২. বংশবৃত্তান্ত ভাগে এই বংশের অপরাপর কথা সন্নিবেশিত হইবে।

জরিপ করেন। তাহার পরে অনেক নূতন ভূমি আবাদ হয়, অনেক ভূমি ভরট হইয়া বাহির হয়, এবং লুশাই সমের উপলক্ষে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার সীমা নির্দ্দেশ হওয়ায়ও কতক ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভূমির পরিমাণ অল্প নহে, ১৮৭১-১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ভূমি হামিদবখ্‌ত্ মজুমদার কর্ত্তৃক জরিপ হইয়া ১৪৪১৮৫ একর নির্দ্দিষ্ট হয়, ইহার মধ্যে ২১৮০২ একর আবাদ ছিল।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মিল্টন সাহেবের সময় দশ বৎসরের ম্যাদে একবার এলাম ভূমি বন্দোবস্ত হইলেও, এই সময়েই সদরলেণ্ড সাহেবের অভিপ্রায় মতে বন্দোবস্ত দেওয়ার পক্ষে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।[১৩] সদরলেণ্ড সাহেবের যত্নে শ্রীহট্টের আর একটি হিতকর কার্য্য হয়; ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার সময়েই জিলার রাস্তাঘাট প্রস্তুতাদির জন্য এক কোমিটী স্থাপিত হয়, ঐ কমিটির সভাপতি স্বয়ং সাহেবেই নিযুক্ত হন; ইহাই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড।

সদরলেণ্ড সাহেব শ্রীহট্টের শেষ কালেক্টর, ইঁহার সময়েই শ্রীহট্টকে আসাম ভুক্ত করা হয়; সুতরাং কালেক্টর নামের পরিবর্ত্তে ডিপুটী কমিশনার এই নাম হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট আসামে

প্রাচীন কালাবধি শ্রীহট্ট বঙ্গের অঙ্গরূপে ঢাকা বিভাগের কমিশনারের শাসনাধীন ছিল; ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশে পৃথক চিফকমিশনার নিয়োগ করার বিষয় স্থির হইলে দেখা গেল যে, আসামের আয় নিতান্ত অল্প, প্রযুক্ত চিফকমিশনারির ব্যয় সংকুলান হইবে না, এই জন্য আয় বহুল শ্রীহট্ট জিলাকেও আসাম প্রদেশ ভুক্ত করা হয়। ঐ সময় লর্ড নর্থব্রক ভারতের গবর্ণর জেনারেল; তিনি শ্রীহট্টে আগমন করিয়া ছিলেন। শ্রীহট্টবাসী আইন বর্জিত আসামের অধীনে যাইতে নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিল, তাহারা আপনাদের অসুবিধা ও দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিয়া লর্ড বাহাদুরের নিকট এক আবেদন করিয়াছিল, লর্ড নর্থব্রক যদিও তাহাদের সঙ্গত প্রার্থনায় কর্ণ-পাত করেন নাই, তথাপি তিনি প্রতিশ্রুত হন যে, শ্রীহট্টের বিধিব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ অব্যাহত

---

১৩. "In 1871, steps were taken to effect a settlement in a more regular and detailed manner, and definite rules were laid down in 1876."

-Assam Distriet Gazetteers Vol. II. (Sylhet) Chap. VII. P. 226.

এলাম ভূমির প্রকার, পাট্টার সংখ্যা ও রাজস্ব পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেলঃ–

নাম	সংখ্যা	রাজস্ব
১. এলাম–২০ বৎসর ম্যাদে হামিদবখ্‌ত্ সাহেব কর্ত্তৃক বন্দোবস্ত দেওয়া ভূমি।	৩১৯৩	৩৮৪০৮
২. নানকার পাটওয়ারি–পাটওয়ারিদের বেতনের পরিবর্ত্তে যে ভূমি দেওয়া হয় এবং উক্ত পদ উঠিয়া গেলে ১৮৩৩ অব্দে বাজেয়াফ্‌ত হইয়া ম্যাদি বন্দোবস্ত হয়।	১২৭৮	৪৩০৭
৩. চরভরট-নদীর পলি দ্বারা সে ভূমি ভরট হইয়াছিল, তাহা।	৫৯০	১৯৬৫
৪. বিল ভরট-বিল ভরিয়া যাওয়াতে যে ভূমি বাহির হইয়াছে।	৩৪	৮২
৫. খাস ম্যাদি–খাজানা বাকিতে গবর্ণমেণ্ট যে সকল মহাল ক্রয় করতঃ ম্যাদি বন্দোবস্ত দিয়াছেন।	১৭৩	১৬৫২
৬. জয়ন্তীয়া বায়তওয়ারি–জয়ন্তীয়ার প্রজাদের সহ যাহা বন্দোবস্ত হইয়াছে।	২১০১৩	৬৪৬৪৭
৭. ওয়েষ্টসেণ্ড (পতিত ভূমি)–বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৬৬ খৃষ্টাব্দে চিঠির মর্ম্ম মতে ৩০ বৎসর ম্যাদে যে ভূমি চাকরদের সহ বন্দোবস্ত হয়।	৭	২০০২৫

পরে ওয়েষ্ট লেণ্ডের সংখ্যা ও ম্যাদ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, জয়ন্তীয়ার ভূমি ও রাজস্ব পরিমাণও হইয়াছে। এলাম ভূমির রাজস্বে নিরিখ স্থায়ী নহে।

থাকিবে। রাজস্ব সংগ্রহ ও ভূমি বন্দোবস্তে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যে নীতি প্রচলিত, শ্রীহট্টে আসামের শাসন প্রণালী অনুসৃত হইবে না।[১৪]

শ্রীহট্ট আসাম ভুক্ত হওয়ার পর কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট পদের স্থলে ডিপুটী কমিশনারের পদ সৃষ্ট হয়।[১৫] ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ক্লে (A.L Clay) সাহেব প্রথম ডিপুটী কমিশনার রূপে আগমন করেন। তৎপরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এক মাসের জন্য মেনসন (A. Manson) সাহেব এবং তাহার পরে খ্যাতনামা লটমান্ জনসন (Henry luttmon johuson) সাহেব শ্রীহট্টে আগমন করেন। ইনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন।

চারি সবডিভিশন ও মিউনিসিপালিটি

শ্রীহট্টের পরিমাণ ফল প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চ সহস্র বর্গ মাইল, এতবড় একটা জিলার অধিবাসীবর্গকে এক স্থানে বসিয়া শাসন করা অসুবিধাজনক বলিয়া, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মহকুমা বিভাগের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, কিন্তু তখন এতৎ সম্বন্ধে কিছুই স্থির হয় নাই; পরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে করিমগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ও সুনামগঞ্জ সবডিভিশন পৃথক হইবে বলিয়া গেজেটে প্রকাশ হয়, তদনুসারে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সর্ব্ব প্রথমে সুনামগঞ্জ সবডিভিশন খোলা হয় ও একজন ইউরোপীয় সবডিভিশনেল অফিসারের উপর সমস্ত ভার অর্পিত হয়। উক্ত কর্ম্মচারীর বাসের জন্য বাংলা ও কাছারী গৃহ প্রস্তুতের ব্যয় তখন প্রথমতঃ ২০০০ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। ইহার পর-বর্ষেই করিমগঞ্জ ও হবিগঞ্জ সবডিভিশন স্থাপিত হয়।

---

১৪. ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটারী "শ্রীহট্টবাসী বর্গের আবেদনের প্রত্যুত্তরে শ্রীহট্টের কালেক্টর সাহেবকে এই চিঠি লেখেন"–

FORT WILLIAM,
The 5th September 1274.

"Sir,

1. His Excellency the Governor General in council directs me to acknowledge through the Government of Bengal receipt of this memorial signed by certain inhabitant of the District of Sylhet against the transfer of that district to Assam. The memorial begins by an allusion to the Bill which has since passed into law, for the transfer of certain powers from the Bengal Government to the Government of India and the impression of the memorialists seems to be that this law will effect some material change in the system under which they have been hitheto administered

2. In reply I am to explain for the information of memorialists that this law has only given formal completion to a deeision which has been passed after long and eareful consideration. It was recomend by the late Lieunt: Governor Sir Ceorge Campbell and it has been sanctioned by the secretary of state after due regard to all the considerations set forth in the memorial under acknowdedgement. But neither the transfer of the district nor the passing of an act formally withdraws the district from jurisdiction of certain authorities in Bengal will make any substantial change in the mode of administering Sylhet. There will *Certainly be no ehange* whatever in the system of law and judical procedure under which inhabitansts of Sylhet have hitherto lived, nor in the principles which apply through out Bengal to the settlement and collection of land revenue.

3. His Excellency the Governor General in Council regrets therefore that he can not aceded to the prayer of memorialists, and I am to request that his honour the Lieutt; Governor may be pleased to cause this reply to be communicated to them."

১৫. শ্রীহট্টের ডিপুটী কমিশনারদের নামাবলী ইত্যাদি (২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ১।২ অধ্যায় উল্লেখিত) জ-পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

এই বর্ষে সর্ব্ব প্রথম শ্রীহট্ট সহরে মিউনিসিপালিটি স্থাপন করা হয়, পরবর্ত্তী কালে ইহার প্রসার বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মিউনিসিপালিটির নির্দ্ধারণ অনুসারে শ্রীহট্ট সহরের উত্তর সীমা আম্বরখানার শড়ক, পূর্ব্বে গোয়ালি ছড়া, দক্ষিণে সুরমা নদী, পশ্চিমে সাগর দীঘীর পার ও উজানলেন। শ্রীহট্ট সহর কলিকাতা হইতে ৩৩২ মাইল এবং শিলং হইতে ৭২ মাইল দূরবর্ত্তী লোক সংখ্যা ১৩৮৯৩ জন।

তিনটি সবডিভিশন পৃথক হইয়া গেলে দেখা গেল যে, সদর ডিভিশনের আয়তন অনেক বড় রহিয়াছে, বিশেষঃ কাজ কর্ম্ম সদরে অত্যন্ত অধিক, এই জন্য ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ শ্রীহট্ট বা মৌলবীবাজার নামে পঞ্চম সবডিভিশন পৃথক করা হইল।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জনসন সাহেবের সময় হইতে শ্রীহট্টে স্থানীয়-কর বসিয়াছে। ইঁহারই প্রযত্নে শ্রীহট্টে ভলন্টিয়ার সৈন্য নির্দ্দিষ্ট হয়; তৎকালে (১৮৮০ খৃষ্টাব্দ) ইহাদের সংখ্যা ৪২ জন মাত্র ছিল।[১৬]

প্রতাপগড় তহশীল

জয়ন্তীয়া ব্যতীত শ্রীহট্টের মধ্যে প্রতাপগড় পরগণাতেই এলাম ভূমির পরিমাণ অধিক; এই জন্য প্রতাপগড়ে পৃথক তহশীল অফিস স্থাপনের প্রস্তাব ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে উপস্থিত হয়। প্রতাপগড়ের এলাম ভূমের রাজস্ব ৩৬০০ টাকা হইতে হঠাৎ ১১৮০০ টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় ঐ প্রস্তাব জনসন সাহেবের সময় কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপগড়ে নূতন বন্দোবস্ত হয়, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তহশীল অফিস উঠিয়া যায়।[১৭] মৈনার চৌধুরীদের কেহ কেহ স্বেচ্ছাতঃ চিরস্থায়ী মহাল এস্তেফা দিলে সেই ভূমি গবর্ণমেন্টের খাস গণ্য হয়, তখন সেই ভূমিই এস্তেফাকারী চৌধুরীগণ গবর্ণমেন্ট হইতে ম্যাদি বন্দোবস্ত আনেন; ইহাতে প্রতাপগড়ে "রসদ ববান" নামে[১৮] এক শ্রেণীর লোকের উৎপত্তি হয়; চৌধুরীদের আত্মবিরোধ মূলেই ইহার উদ্ভব। তদ্ব্যতীত দশসনা বন্দোবস্ত কালে প্রতাপগড়ে জঙ্গলা ভূমির আধিক্য বশতঃ তত্রত্য তালুক সমূহের সীমা নির্দ্দেশে অসুবিধা ঘটায়, চিরস্থায়ী ৮০টি তালুকের ভূমি অচিহ্নিত ভাবে কয়েকটি মৌজায় থাকায়, তথায় ৮০ ববান নামক আর একরূপ তালুকের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রতাপগড়ের অন্তর্গত দু-আলিয়া পাহাড়ে উক্ত রসদ ববান ও ৮০ ববানের ভূমি পড়িয়াছে।[১৯] এইরূপ মহাল এক প্রতাপগড় ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে নাই।

রসদ ববানের উৎপত্তি মিরাসদারদের ক্ষতিজনক হইলেও গবর্ণমেন্টের তহশীল আফিসের পক্ষে লাভকর হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দশসনা এস্তেফাকারী চৌধুরীগণ পরে এলাম ভূমির বন্দোবস্ত[২০] ছাড়িয়া দিলেই প্রতাপগড়ের খাস ভূমির খাজনা স্বয়ং গবর্ণমেন্ট গ্রহণ প্রবৃত্ত হন,

---

১৬. বিগত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহাদের সংখ্যা ৩৩৪ জনে পরিণত হয়, তন্মধ্যে শ্রীহট্টে বাস করেন ১৭৮ জন।

১৭. প্রতাপগড় পরগণার জঙ্গল ভূমি দ্রুতবেগে আবাদ হইতে থাকায় এবং দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী আবাদকারকদের করিমগঞ্জে গিয়া খাজনা দেওয়া অসুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় সম্প্রতি (১৯০৯ খৃষ্টাব্দ) প্রতাপগড়ে পুনঃ তহশীল আফিস স্থাপিত হইয়াছে ও তথায় একজন স্থায়ী সবডিপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮. Mr. Cossin's Notes on Baban Mahals, dated 25th June 1890.

19. "Further interest attaches to this pargana from the fact that certain claims, known as baban and rasad baban, are put forward the owners of some of the permanently settled estates to easements in the Dohaliya hills." &c.

-Assam District Gazetteers Vol. II. (Sylhet). Chap VII. P. 229.

২০. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগে এ সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইবে।

তখনই প্রতাপগড় তহশীল স্থাপনের প্রস্তাব হইয়া, পরে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়।

শ্রীহট্ট আসাম ভুক্ত হওয়ার পর স্থানীয় কর ও আসাম-ভূমি রাজস্ব বিষয়ক বিধি (১৮৮৬ সনের ১ আইন) শ্রীহট্টে প্রচলিত হয়। ইহাতে বলিতে গেলে লর্ড নর্থব্রুকের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার ব্যভিচার ঘটিয়াছে। শ্রীহট্টের স্থানীয় কর ও ভূরাজস্ব নামতঃ পৃথক হইলেও কার্য্যতঃ একরূপ। স্থানীয় কর বাকি পড়িলেও, ভূরাজস্ব বাকি পড়ার ন্যায়, তালুক নিলাম হইয়া আদায় করা যায়। ইহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে প্রকৃত পক্ষে আঘাত করা হইয়াছে। শ্রীহট্ট আসাম ভুক্ত হওয়ার কালে শ্রীহট্টবাসী যে ভয় করিয়াছিল, তাহাই সত্য পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। একত্রিংশৎ বর্ষ কাল আসামের অধীনে থাকিয়া,—পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সৃষ্ট হওয়ায়, আবার শ্রীহট্ট বঙ্গের সহিত একত্র হইয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় আবার ঢাকা বোর্ডের অধীন হইয়াছে; শ্রীহট্টবাসী গবর্ণমেন্টের নিকট অনেক আশাই করেন।

মহালের অধিকারী

শ্রীহট্টে বৃহৎ জমিদারের সংখ্যা অধিক না থাকিলেও, শস্য শ্যামল "লক্ষীর হাট" শ্রীহট্টের প্রজাগণ অন্যান্য জিলার অধিবাসী অপেক্ষা কোন অংশেই হীনদশাপন্ন নহে। শ্রীহট্টের অর্থ একত্রে দুই একস্থানে মাত্র ভাণ্ডার-বদ্ধ হয় নাই, বিভাগিত রূপে প্রত্যেকের ঘরেই গিয়াছে; এই জন্য শ্রীহট্টে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু ভূসম্পত্তির অধিকারী। ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। দশসনা বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরে (১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে) মহালের সংখ্যা ২৬৩৯৩ টি এবং অধিকারী সংখ্যা ২৯৩১৭ জন ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মহালগুলির সংখ্যা ৫২৭৮৬ এবং অধিকারী সংখ্যা প্রায় পঞ্চ লক্ষ হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মহালের সংখ্যা ৭৮১৫৫টিতে পরিণত হইয়াছিল এবং অধিকারী সংখ্যা ৫৪৮৬১২ জন হয়। তাহার পর হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এই সংখ্যা আরও অনেক বর্দ্ধিত হইয়া থাকিবে।

এইরূপ সকলেই কিছু কিছু ভূসম্পত্তির মালীক হওয়ায় তাহাদিগকে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জন্য বিশেষ চিন্তিত হয় না বটে, কিন্তু তাহাতেই শ্রীহট্টের ধনীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত ভূকম্পের পর হইতে শ্রীহট্টবাসী জনগণের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মন্দ হইয়া পড়িয়াছে; ভূমির অবস্থা পরিবর্ত্তন ও রোগের আধিক্যই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়।

ভূকম্প

ইতিপূর্ব্বে কয়েক বাণের বন্যার কথা উল্লেখ করা গিয়াছে। ইদানিং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীহট্ট জিলায় খুব জল হয়; কিন্তু উক্ত সনের ভূকম্পই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার ২৮ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে একবার ভয়ানক ভূকম্প হইয়া শ্রীহট্টের অনেক ক্ষতি করিয়াছিল। সেই ভূকম্পের বেগ ব্রহ্মদেশ হইতে পাটনা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এই সময় শ্রীহট্ট সহরের গির্জ্জার চূড়া ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, কাছারী গৃহের দেওয়াল ও সারকিট বাংলা প্রভৃতি ফাটিয়া চৌচির হইয়াছিল এবং জিলার পূর্ব্ব প্রান্তে নদীতীর অনেকটা বসিয়া গিয়াছিল। এই ভূকম্পের কাছাড়ের কোন কোন স্থলের ভূমি প্রায় ৪০ ফিট নিম্নগামী হইয়া পড়ে!

কিন্তু ঐ ভূকম্পও বিগত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পের তুলনায় কিছুই নহে। ১২ই জুন কিছুক্ষণেই প্রভাত হইয়াছিল, এই তারিখের ভীষণ ভূকম্পে শ্রীহট্টের যে ক্ষতি সংসাধিত

হইয়াছে, তাহা কখনও যে পূর্ণ হইবে, তার আশা নাই। এই ভীষণতম ভূকম্প বঙ্গদেশের একটি স্মৃতি-পীড়ক ঘটনা। রংপুর ও শ্রীহট্টেই ইহার তীব্রতা অধিক অনুভূত হয়। ১৭৫০০০০ বর্গমাইল ভূমি ব্যাপিয়া—হিমালয় হইতে মসলিপটম পর্য্যন্ত স্থান এককালে কম্পিত হইয়া উঠে। শ্রীহট্টে বৈকালে ৪টা ৫০ মিনিটের সময় কম্পন শুরু হয়, চালনির উপরে পরিচালিত তণ্ডুলের যেরূপ অবস্থা ঘটে, শ্রীহট্টবাসী সকলের অবস্থা তৎকালে অনেকটা সেইরূপ দাঁড়িয়েছিল। সকলেই সন্ত্রস্ত, স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত সহর ধ্বংশরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। আসামের চিফ্ কমিশনার সদাশয় কটন বাহাদুর এই সংবাদ প্রাপ্তে বড় লাটের নিকট এই মর্ম্মে টেলিগ্রাফ করেন যে, সমগ্র শ্রীহট্ট সহর ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আসাম গেজেটে শ্রীহট্টের অবস্থা জ্ঞাপক এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, শ্রীহট্ট জিলায় অধিকাংশ গ্রামই নদীতীরে স্থাপিত, শ্রীহট্ট জিলার নদী তীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অনেক স্থানই নদীগর্ভে পতিত ও অনেক স্থল বসিয়া গিয়াছে।[২১] এইরূপ ক্ষতি জিলার উত্তরাংশেই অধিক হইয়াছিল।[২২] এই ভূকম্প জিলার সর্ব্বত্র ভূমি চৌচির করিয়া, ভূগর্ভ হইতে কৃষ্ণবর্ণ বালুকা ও জলস্রোতঃ ও অঙ্গার বহির্গত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অনেক স্থলে বহু লোকের প্রাণ সংহার করিয়া হাহাকারের রোল উত্থিত করিয়া দিয়াছিল; গবর্ণমেন্টের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে এই ভূকম্পে শ্রীহট্ট জিলায় ৫৪৫ জন লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল।[২৩]

শ্রীহট্ট একটা প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর; কিন্তু ভূকম্পে ইহার অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি এককালে লোপ করিয়াছে! ইহার সৌন্দর্য্য সম্পদ একবারে বিনষ্ট করিয়াছে! কি সরকারী, কি অধিবাসীবর্গের নির্ম্মিত, ভূকম্পের পর কয়েকটি অট্টালিকাও দণ্ডায়মান ছিল না; এমন কি কোনও কোনও কুড়ে ঘর পর্য্যন্ত ভূমিসাৎ হইয়াছিল। শ্রীহট্টের এ ক্ষতি পূরণ হওয়া সময় সাপেক্ষ।

ভূকম্পের পর সহরের বর্ত্তমান অট্টালিকাদি নির্মাণ করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ডিপটী কমিশনারের আফিসই উল্লেখযোগ্য। এই দালান ৩৫০০০ বর্গফিট ভূমির উপর দণ্ডায়মান; ইহার প্রস্তুত ব্যয় ১৬৬০০০ টাকা।

তদ্ব্যতীত ১৪৬০০০ টাকা ব্যয়ে ৭.২ একর ব্যাপী শ্রীহট্ট জেইল মেরামত করা হয়।

২১. "Sylhet is a district which is permeated with river communication and water channels, and it is the usual custom to construct villages along the banks of rivers for the reason that during the rains the only round in the Country is found in such a position * * * The trip of high land is often not more than two hundred years broad, and the effect of the eatrth quake has been that in many places the land has been parallel to the bank. &c."
-Assam Gazette-June 1897.

২২. "This banks of the rivers, especially in the north, caved and many people were drowned."
-Assam District Gazetteers Vol. II. P. 14.

২৩. মৃত্যু সংখ্যাঃ-

সহর-৫৫	দক্ষিণ শ্রীহট্ট-৮,
উত্তর শ্রীহট্ট-১৭৮,	হবিগঞ্জ–৭,
করিমগঞ্জ–১০,	সুনামগঞ্জ-২৮৭ জন।

চতুর্থ অধ্যায়
ইংলিস কোম্পানী

ইংলিস কোম্পানী প্রতিষ্ঠা

শতাব্দীর অধিক কাল যাবৎ যাঁহাদের কার্য্য কলাপে শ্রীহট্টের এক অংশের জন সাধারণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, কোন কোন রাজনৈতিক বিষয়েও যাঁহারা সংলিপ্ত ছিলেন, শ্রীহট্টে বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে যাঁহারা অদ্বিতীয় প্রভাব বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ না থাকিলে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের অঙ্গহানি হইত, সন্দেহ নাই।

শ্রীহট্টের চূণা অতি প্রসিদ্ধ, এইরূপ উৎকৃষ্ট চূণা বঙ্গদেশের কুত্রাপি মিলে না। বাঙ্গালার নবাব মীরজাফর ও মীর কাশেমের সহিত ইংরেজের যে সন্ধি হয়, তাহাতেও প্রচুর লাভকর শ্রীহট্টের চূণার উল্লেখ থাকা অতি আবশ্যক বিবেচিত হয়।[১] নবাবের কর্ম্মচারী চূণার দারোগা বলিয়া অভিহিত হইতেন। তৎপর শ্রীহট্টে ইংরেজাধিকার পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইলে, বৃটিশ রাজপুরুষ লিণ্ডস সাহেব এই চূণার কারবারে প্রভূত ধন উপার্জ্জনপূর্ব্বক লর্ড শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। লিণ্ডসে সাহেবের পরেই ইংলিস কোম্পানীর অভ্যুদয় হয়।[২]

ইংলিস কোম্পানী ছাতকেই চূণার প্রধান আড্ডা করেন। ইংলিস কোম্পানীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ছাতক একটি সামান্য গ্রাম ছিল। তৎপূর্ব্বে একজন সন্ন্যাসী একটা ছত্রক (ছাতি) ভূমিতে প্রোথিত করিয়া তাহার তলে অবস্থিতি করিতেন। ক্রমে ঐ স্থানে একটা ক্ষুদ্র হাট বসে এবং তাহাই কালক্রমে ছত্রক বা ছাতক বাজার আখ্যা হইয়াছে।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে লিণ্ডসে সাহেব শ্রীহট্ট ত্যাগ করেন, তাহার চারি বৎসর পরে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রেইট ও জর্জ্জ ইংলিস নামক দুইজন ইংরেজ মিলিত হইয়া "রেইট ইংলিস এণ্ড কোম্পানী" নামে যৌথ কারবার স্থাপন করিয়া চূণার ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রেইট সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় তদীয় স্ত্রী মিসেস ইরেইট অধিকারিণী হইয়া জর্জ্জ ইংলিস সাহেবের নিকট নিজ অংশ বিক্রয় করেন। তদবধি এই কারবার "ইংলিস কোম্পানী" নামে খ্যাত হয়।

জর্জ্জ ইংলিস পূর্ণ উদ্যমে চূণার কারবার চালাইয়া ছিলেন, তিনি চূণা ব্যবসায়ীগণ হইতে সমস্ত চূণা ক্রয় করিয়া লইতেন ও তাহা কলিকাতায় চালান দিতেন। জর্জ্জ ইংলিস সাহেব শ্রীহট্ট জিলায় ৫৬ বৎসর বাস করিয়া ৭৬ বৎসর বয়সে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

---

১. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায় দেখ।
-Vide Aitchinson's Treatis, Engagement and Sanads Vol. I. P. 48-55.

2. "Mr Linddsay, (originally) a writer in the service of the East India company, established a factory at Sylhet, and commenced the lime trade with Calcutta, reaping enormous fortune for himself and laying the foundation of that prosperity amonst the people which has been much advanced by the exertion of the Inglis family, and has steadily progressed under the protecting rule of the Inlis Government"
-Sir Joseph D. Hooker's Himalayan Journal.

ছাতকের একটি টিলার উপর তাঁহার সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে; পঞ্চ সোপানে চত্বরে উঠিতে হয়, গ্রেনাইট প্রস্তরে অঙ্কিত জীবনী-লিপি সহ এই অত্যুচ্চ মন্দির প্রায় দেড় প্রহর দূরবর্ত্তী স্থান হইতে দৃষ্ট হয়। এই সুদৃঢ় সমাধি স্তম্ভের চূড়া বিগত ভূকম্পে ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

জর্জ্জ ইংলিস, হারি ইংলিস ও জন ইংলিস নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জন ইংলিস উদাসীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। শ্রীহট্টে গির্জ্জা-গৃহ যে স্থানে অবস্থিত, ঐ বিস্তৃত স্থান ইনিই ধর্ম্মোদ্দেশে দান করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর অল্প পরেই তিনি নিজ অংশ জ্যেষ্ঠের নিকট বিক্রয় করিয়া যথেচ্ছ চলিয়া যান। হারি সাহেব ইংলিস কোম্পানীর একমাত্র অধিকারী হইয়া বিশেষ যত্নের সহিত কারবার চালাইতে থাকেন।

খাসিয়া পর্ব্বতে বৃটিশ কর্ম্মচারী

লিন্ডসে সাহেবের সময় একবার খাসিয়ারা উৎপাত করে। তাহার কিছু পরে শ্রীহট্টের রেসিডেন্ট জন উইলিসের সময় কাপ্তেন টমাস ওয়েলস্ (Captain T. Welsh) ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে খাসিয়া পর্ব্বতে প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর ডেভিট্ স্কট এজেন্ট রূপে তথায় প্রেরিত হন; ১৮২৬-৩১ খৃষ্টাব্দ তিনি খাসিয়া পর্ব্বতে ছিলেন। ইহার সময়ে খাসিয়া পাহড়ে প্রকৃত বৃটিশ প্রভুত্ব প্রবল হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পরে, অল্পকাল রবার্টসন ও কর্ণেল জেঙ্কিস (Mr. T. C. Robertson and Col. Jenkins) সাহেবের উপর খাসিয়া পর্ব্বতের ভার থাকে। তৎপর প্রসিদ্ধ কর্ণেল লিষ্টার (Col. F. G. Lister) ১৮৩৫-৫৪ খৃষ্টাব্দ খাসিয়া পাহাড়ে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের পক্ষে অবস্থিতি করেন। ইনিই "Sylhet Light Infantry" সৈন্য দলের অধিনায়ক ছিলেন এবং চেরার দেওয়ানী কার্য্যভারও তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। অমিত-বলশালী এই যোদ্ধা পুরুষের বাহুবলে নাগাপাহাড়[৩] ও গারোপাহাড়ে[৪] বৃটিশ পতাকা উড্ডীন হয়। এই সময় খাসিয়া পাহাড়ের পলিটিকেল এজেন্টের উপর ভারতের উত্তর-পূর্ব্বাংশের সমস্ত ভার ন্যস্ত হয়। হারি সাহেব পিতার জীবদ্দশায় ১৮৩৫-৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই এজেন্টের সহকারী স্বরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই পদে থাকিয়াই তিনি জয়ন্তীয়া দখল করেন, তৎপ্রসঙ্গে জয়ন্তীয়ার করিয়াছিলেন। এই পদে থাকিয়াই তিনি জয়ন্তীয়া দখল করেন, তৎপ্রসঙ্গে জয়ন্তীয়ার বিবরণে ইতিপূর্ব্বে [২য় ভাগ ৪র্থ খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে] কথিত হইয়াছে।

চূণের একচেটিয়া

হারি সাহেব কার্য্যোপলক্ষে অনেক খাসিয়া সর্দ্দারের সহিত পরিচিত হওয়ায়, অতি শ্রীঘ্রই কোম্পানীর বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হন। জয়ন্তীয়া দখল করায় গবর্ণমেন্টের নিকট হারি সাহেবের প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হয়। কর্ণেল লিষ্টার সাহেব নিজ দুহিতা সোফিয়াকে তাঁহার নিকট বিবাহ দেন। ফলে হারি সাহেব খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্ব্বতের সমস্ত চূণা পাথরের মহাল ইজারা বন্দোবস্ত লইয়া চূণার একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

---

৩. নাগরাজ তনয়া উলুপীর পুত্র ঐরাবত নাগা প্রদেশের রাজা ছিলেন, ইহা মহাভারত হইতে জানা যায়। নাগা জিলার পশ্চিমে ও উত্তরে নওগাঁ ও শিবসাগর, পূর্ব্বে স্বাধীন নাগা পাহাড়, দক্ষিণে মণিপুর ও কাছাড় জিলা। পরিধি ১৭০৬ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা–১০২৪০২। প্রধান নগর–কোহিমা।

৪. গারো পাহাড় সুরমা উপত্যকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহার উত্তরে গোয়ালপাড়া, পূর্ব্বে খাসিয়া পাহাড়, দক্ষিণে ময়মনসিংহ, পশ্চিমে গোয়ালপাড়া ও রংপুর। পরিধি ৩১৪০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১৩৮২৭৪ জন। প্রধান নগর-তুরা।

প্রতি বৎসরে সমস্ত খনির কাজ চলিত না। জলের গতিক দৃষ্টে যে খনির পাথর নামান সুবিধাজনক বোধ করিতেন, সেই খনিতেই কাজ হইত। বৎসর ভরা ডিনামাইট ও লৌহ-শাবলাঘাতে পাথর ভাঙ্গিয়া পাহাড়-ঘাটে মজুদ রাখা হইত, পূর্ণ বর্ষাতে পর্ব্বত হইতে মাপের "ঢকি নৌকা" দ্বারা চূণা নামান যাইত, শরৎ কালে বন সংগৃহীত হইত, হেমন্তে চূণা "পোক্তানি" (পাড়া) এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে চূণা গোলাজাত করিয়া রাখা হইত। মহালের খাজনা, চূণা ভাঙ্গানি ও লামানি এবং আমলাদের বেতন ইত্যাদি সমস্ত খরচ ধরিয়া, পাথরের উপর হাজার করা যে দর নির্দ্ধারিত হইত, তাহারই দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করা যাইত। ইহাতে হ্যারি সাহেবের সময়ে ২৫০,০০০ টাকা মূলধনে ২৫০,০০০ টাকাই লভ্য দাঁড়াইত। এরূপ আশ্চর্য্য লাভজনক ব্যবসায়ের কথা অল্পই শুনা যায়।

বৎসরের প্রথম ভাগে সরমানদীতে,-গোবিন্দগঞ্জ হইতে সুনামগঞ্জ পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া, ব্যাপারীগণ অবস্থিতি করিত এবং এক অবধারিত দিবসে প্রতি ব্যবসায়ীকে নম্বর দিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত। এই ব্যবসায়ীগণ জমিদারি পুণ্যাহের অনুক্রমে মে মাসের কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে কোম্পানীর আফিসে উপস্থিত হইয়া দেয় মূল্যের কিয়দংশ অগ্রিম প্রদান করিত। তৎপর কোম্পানী বর্ষার মধ্যে ঘাটে ঘাটে নম্বরানুক্রমে তাঁহাদের নৌকায় চূণা পৌছাইয়া দিতেন। ৩০শে এপ্রিল হিসাব নিকাশ হইত, প্রধান গোমস্তা বা দেওয়ান টাকা লইতেন। ঐ দিনে তাঁহার সম্মুখে "কোমর"—পরিমিত টাকার রাশি স্তূপীকৃত হইতে দেখা যাইত।

এতদ্ব্যতীত হ্যারি সাহেব হেমন্তে ছাতকের নদীত্রয়ের সঙ্গম-সংঘটিত চরে কমলার কারবার খুলিতেন; ইহাতেও প্রচুর লভ্য হইত।

প্রচুর লাভকর এই ব্যবসাগুলির ফল একা হ্যারি সাহেব ভোগ করিতেছেন, এতদৃষ্টে অন্যান্য ইংরেজ বণিকদের প্রলোভিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু কোনও ইংরেজ, এই লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, খাসিয়া পাহাড়ে প্রবেশ করলেই, প্রতাপশালী ইংলিস কোম্পানী তাঁহাকে বহ্নি-মুখ পতঙ্গের দশা প্রাপ্ত করাইতে চেষ্টা করিতেন।

কোম্পানীর অত্যাচার

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আসামের কমিশনারের (Commissioner of Assam) অধীনে চেরাতে প্রধান এসিষ্টেন্ট্ কমিশনারের (Principal A. C.) পদ প্রতিষ্ঠিত হয়, সুলেখক সুদক্ষ হডসন (C. K. Hodson) সাহেব ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন।

এই সময় মিঃ কোলমেন (Colemen) নামে এক বণিক, এক মোনশী ও ২৫-৩০ জন লোক লইয়া বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে শ্রীহট্ট হইতে চেরাপুঞ্জি যাত্রা করেন। চেলার এলাকাস্থ কাপড়িয়া বাজারে তিনি অবস্থিতি কালে কোন ওয়াদাদারের লোকেরা তাহাকে আক্রমণ করে ও তাঁহার খাসিয়া চাকরকে ধরিয়া লইয়া পনর দিন আটক রাখে। সাহেব তখন নৌকায় শ্রীহট্টে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু অনতিবিলম্বেই সশস্ত্র বৃহৎ একদল বাঙ্গালী তদীয় নৌকা আক্রমণ করে। ভয়ে সাহেব নৌকা হইতে লাফ দিয়া পলায়ন পূর্ব্বক নিবিড় বনের ভিতর দিয়া পাণ্ডুয়ার পুলিশ ষ্টেশনে উপস্থিত হন। এই বাঙ্গালী অস্ত্রধারী লোকেরা কাহার প্ররোচনায় এই কার্য্যে অগ্রসর হয়, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহে নাই। কিন্তু আদালতে অনেক সময় সত্যও মিথ্যাতে পরিণত হইয়া থাকে; সুতরাং সাহেব আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনও ফল পাইলেন না।

এই ঘটনার প্রায় সমসময়ে কলিকাতার গ্লাডষ্টোন উইলি এণ্ড কোম্পানী (Messrs Gladstone Wyllie and Co.) হেডেন সাহেবকে (Mr. R. G. Haddan) পেট্রোলিয়াম তৈলের

অনুসন্ধান করিতে খাসিয়া পর্ব্বতে প্রেরণ করেন। হেডেন সাহেব, হেলফর্ড ব্রাউনলো (Mr. Halford Brown low) সাহেবের সহিত নৌকাযোগে ছাতক হইতে চেলায় রওয়ানা হন।

কোথাও কোন কিছু নাই, হঠাৎ কাপড়িয়া বাজারের কিছু ভাটীতে একদল বাঙ্গালী লাঠিয়াল তাঁহার নৌকা আক্রমণ পূর্ব্বক দুইটা হস্তী দ্বারা নৌকা ভাঙ্গিয়া উঠাইয়া ফেলে। গজারোহী একজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের আদেশে লাঠিয়ালেরা সাহেবের বন্দুক ও দুই শত টাকার সম্পত্তি কাড়িয়া লয়, তাঁহাদিগকে জলের মধ্য দিয়া ছেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যায় এবং রক্ত মাখা আর্দ্রবস্ত্রে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কয়েদ রাখিয়া পরে ছাতকে বাহির করিয়া দেয়।

ইঁহারাও ইংলিস কোম্পানীর নামে এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, আক্রমণকারীরা ইংলিস কোম্পানীর বাধ্য ও অনুগত, ইংলিস কোম্পানীই এই ব্যাপারে মূলীভূত কারণ। ইহারও ফল পূর্ব্বানুরূপ হইয়াছিল!

কোম্পানীর লোকানুরাগ লাভ

এই সময় ইংলিস কোম্পানী কারবার ব্যতীত অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন; ছাতকে এজমালী দুই তালুকের ৪/৫ মাইল মধ্যে, আর কাহারও অধিকার ছিল না। লাউড়ে ইংলিস কোম্পানীরই একাধিপত্য ছিল। মহারাম, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানের অধিকাংশেই কোম্পানীর অধিকার ছিল, এমতাবস্থায় ওয়াদাদার বা ক্ষুদ্র মিরাশদারগণ বাধ্য না হইবে কেন? আবার জমিদারিতে খাজনার হার পার্শ্ববর্ত্তী তালুক হইতে অর্দ্ধেকেরও কম ছিল, সুতরাং প্রজা সাধারণ বাধ্য না হইবে কেন? এতদ্ব্যতীত পদস্থ লোকের কাহাকে কর্ম্ম দিয়া, কাহাকেও বা কোনরূপ সুবিধা করিয়া দিয়া বশে রাখা হইয়াছিল। ছাতকের চৌধুরীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দ হইলেও তাঁহারা কোম্পানীর কোন কর্ম্ম স্বীকার করেন নাই। হারি সাহেব তাঁহাদের শক্তিকে বাটীতে বসিয়া বিনা কাজেই মাসিক দশ টাকা হিসাবে সম্মানজনক (Honarary) বৃত্তি ভোগের ব্যবস্থা করেন, এত করিলে লোক বাধ্য না হইয়া পারে কি?

এতদ্ব্যতীত শাহ আরপীনের দরগাতে বৃত্তি বরাদ্ধ ছিল, ছাতকের কালী এবং মহাপ্রভুর আখড়ায় বৃত্তি স্থাপিত করা হয়। সমারোহ সহকারে ঐ দেবতার রথ ও দোল ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত। হারি সাহেবের চেরাপুঞ্জিত খাস কুঠির হাতাতে রথোৎসব হইত, ঠাকুরকে হস্তীর উপর উঠাইয়া ছাতক হইতে তথায় নেওয়া যাইত; অনেক খাসিয়া এই উৎসবে যোগ দিত; ইহাতে তাহাদের মধ্যেও কিয়ৎপরিমাণে হিন্দুয়ানীর প্রচার হইত। এই সকল কারণে কোম্পানীর প্রতি সাধারণের বিশেষ অনুরাগ ছিল; এই সকলই কোম্পানীর ব্যবসায়ের সুবিধা বিধানের পক্ষে উপায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কোম্পানীর বিরাগ লাভ

চেরাপুঞ্জিরপ্রধান এসিষ্টেন্ট কমিশনার হডসন সাহেবের নিকট কোম্পানীর ব্যবহার ভাল লাগিত না। ইংলিস কোম্পানীর পক্ষ হইতে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইত, ইনি তাহা ডিসমিস করিয়া ফেলিতেন। ইহাতে কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ নিতান্তই উত্যক্ত ও অসুবিধা গ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

হড্‌সন সাহেবের আগমনের দুই বৎসর পরে ঢাকা রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য এলেন (W. J. Allen) সাহেব খাসিয়া পর্ব্বত সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য প্রেরিত হইয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তাহা সাধারণতঃ "এলেনস্ রিপোর্ট" বলিয়া খ্যাত।

এই রিপোর্টে উপরিউক্ত বিবরণ এবং তাদৃশ বহু প্রথা বর্ণিত হইয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে চেরা হইতে প্রায় শত মাইল দুরস্থ গৌহাটীতে আসামের কমিশনারের কোর্টে চেরাপুঞ্জির সকল মোকদ্দমারই আপিল যাইত; এলেন সাহেবের মতানুসারে এই সময় হইতে শ্রীহট্টের সিভিল ও সেশন জজের আদালতে চেরাপুঞ্জির আপিল হইবে বলিয়া স্থির হয়। কেবল পূর্বদেশ সংক্রান্ত ও পলিটিকেল মোকদ্দমা এজেন্ট ও আসামের কমিশনারের নিকট পূর্ব্ববৎ হইত। এলেন সাহেব যে রিপোর্ট করেন, তাহাই পরে ইংলিস কোম্পানীর এক চেটিয়া ব্যবসায় ভাঙ্গিয়া যাইবার কারণ স্বরূপ হইয়াছিল।

হারি সাহেবও এলেন ও হড্ সনের ব্যবহারে বিরক্ত ছিলেন। হড্ সনের কথা আমলারা প্রায়শই তাঁহার নিকট বলিত। একদা তিনি নিজ দেওয়ান ব্রজমোহন রায়কে বলেন:—"রও, ইহাকে আমি ঘরের বিল্লি (বিড়াল) বানাইব।"

আমলাদের লভ্য

এই ব্রজমোহন রায়ের বেতন ১২ টাকা হইতে ২০০ টাকাতে উন্নীত হইয়াছিল। বেতন ব্যতীত কর্ম্মচারিগণ কোম্পানীর লভ্যের উপর হার মতে কমিশন পাইতেন। দেওয়ানের পদে বেতন বাদে কমিশন বাবতে বৎসরে দুই সহস্র হইতে পঞ্চ সহস্র টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত। দেওয়ান হইতে সামান্য চৌকিদারকে পর্য্যন্ত কমিশন দেওয়ার রীতি ছিল। ইহাতে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। বৎসরের শেষে সকলেই এক সঙ্গে কতক টাকা পাইতে পারিত। কমলা লেবুর অস্থায়ী বিভাগে কোম্পানীর অংশ ও অপর লোকের অংশ থাকিলেও আমলারা পুরা লাভের উপরই কমিশন পাইতেন। দেওয়ান খাজাঞ্জি, সেরেস্তাদার, ডিহিমোহরের, মোহাফেজ, বরকন্দাজ, চৌকিদার ইত্যাদি স্থায়ী কর্ম্মচারী সংখ্যা অনেক ছিল। কমলা বিভাগে সাময়িক অনেক কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইত। কর্ম্মচারীগণের বিশেষ বিদায় কালের বেতন কর্ত্তিত হইত না, এবং বিদায়ের মধ্যে কাহাকেও ডাকাইয়া কাজে হাজির করিলে পথ খরচ দেওয়া যাইত। কর্ম্মপ্রার্থিগণ কর্ম্ম না পাইয়া ফিরিয়া গেলেও যাতায়াত খরচ দেওয়া হইত। ইহা হারি সাহেবের বিশেষ উদারতার পরিচায়ক।

হারি সাহেব অনেক দিন এদেশে থাকিয়া, এ দেশীয় আচার ব্যবহারের অনেকটা পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি গুড়গুড়ি হুঁকাতে তাম্রকুট পান করিতেন। তাঁহার সদ্ব্যবহারে ও সৌভাগ্য প্রভৃতি নানা কারণে সাধারণে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিত। হারি সাহেব সম্বন্ধে নানা গল্প শুনা গিয়া থাকে।[৫]

---

৫. এস্থলে একটা আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। একদা এক প্রৌঢ় বয়স্ক চেরাপুঞ্জিতে গিয়া দরবারে উপবিষ্ট হারি সাহেবের পদে পতিত হইয়া ক্ষমা চাইতে থাকেন ও ভাই ভাই বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হন। কারণ জিজ্ঞাসায় ব্রাহ্মণ বলেন যে, শ্রীক্ষেত্রে গিয়া তিনি দেবতার দর্শন পান নাই। প্রত্যাদেশে জানিয়াছেন, পূর্ব্বজন্মে হারি সাহেব তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাহার নিকট তিনি গুরুতর দোষে অপরাধী। যদি তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণে ও ক্ষমা প্রাপ্তে অপরাধ মোচিত না হয়, তবে দর্শন পাইবেন না, এবং অপরাধের জন্যও অনেক ভুগিতে হইবে। প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির পর ব্রাহ্মণ বহু অনুসন্ধানে এখানে আসিয়াছেন।

হারি সাহেব ব্রাহ্মণের কথা শুনিলেন এবং জুয়াচোর মনে করিয়া তাঁহাকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। পরে আমলাদের পরামর্শে শ্রীক্ষেত্রে পুলিশ কর্ম্মচারীকে এই বিষয় অনুসন্ধানের অনুরোধ করিলেন। তত্রত্য পুলিশ কর্ম্মচারীরা তিনমাস অনুসন্ধান করিয়া পরে ইহা সত্য বলিয়াই লিখিলেন, তখন হারি সাহেবের আর বিস্ময়ের অবধি থাকিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণ কিরূপে ম্লেচ্ছের প্রসাদ খাইবেন! পণ্ডিতগণের ব্যবস্থায় তখন এক পাত্রে কিছু মিছরি রক্ষিত হয়, এবং তাহা হইতে সাহেব একটু গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ সেই মিছরি প্রসাদ ভক্ষণে ও ক্ষমা প্রাপ্তে পুনঃ শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। হারি সাহেব ব্রাহ্মণকে এক জোড়া কাপড় এবং শ্রীক্ষেত্রে যাতায়াতের খরচ দিয়া বিদায় দেন।

মেনেজার নিযুক্তি হারি সাহেবের মৃত্যু

নিজ আগ্রহে বৃদ্ধ বয়সে হারি সাহেব বিলাত যাইতে প্রস্তুত হন। এই সময় তিনি আপন বিরুদ্ধাচারী হড্‌সন সাহেবকে মেনেজার নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। প্রস্তাব চলিল, কিন্তু হড্‌সন কোম্পানীর "বিলি" হইতে স্বীকার পাইলেন না। হারি সাহেব মাসিক সহস্র টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি হইলেন, তেজস্বী হড্‌সন তথাপি অস্বীকৃত হইলেন। তাহার পরে হারি সাহেব, বেতন বাদে কোম্পানীর লভ্যের এক চতুর্থাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিলে, হড্‌সন আর লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু এই লভ্যের কথা লিখিত ভাবে ছিল না—মৌখিক ছিল।

এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া হারি সাহেব বিলাত যাত্রা করেন, এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা হইল; বিলাত পৌঁছিয়াই ৫৭ বৎসর বয়সে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই দীর্ঘবপু দীর্ঘশ্মশ্রু সুগঠিত দেহ হারি সাহেব মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহ চেরাপুঞ্জিতে লইয়া গিয়া মাটীর উপরে রাখিয়া যেন সমাহিত করা হয়। এইরূপ সমাহিত করার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যে সকল স্বাধীন খাসিয়া সর্দ্দার হইতে চূণা মহাল ইজারা আনেন, তাঁহার দেহ যতদিন "মাটীর নীচে" না যায় ততদিন পর্য্যন্ত সর্ত্তভঙ্গ করিতে পারিবে না বলিয়া তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছিলেন। যাহা হউক তাঁহার দেহ বহুমূল্য মসল্লার আরকে চিরাপাচ্য রাখার মানসে মমি করিয়া রাখা হয়। পরে তাঁহার মৃত্যুর দশ বৎসরান্তে তদীয় (Mummy) পত্নীর মৃত্যু হইলে উভয়ের শবদেহ একত্রে চেরাপুঞ্জিতে আনিয়া কথানুরূপ রক্ষিত হয়।

কিন্তু একত্রে দেহ রক্ষিত হইলেও সোফিয়ার ব্যবহার হিন্দুর নিকট মার্জ্জনী নহে। উপযুক্ত পুত্র কন্যার জননী হইয়াও স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পত্যন্তর গ্রহণ করেন। কথিত আছে, এই জন্য লজ্জায় তাঁহার প্রথম পুত্র আত্মহত্যা করেন। এই বিবাহের ফলেও সোফিয়ার একটি পুত্র জাত হয়।

কোম্পানীর অধিকারিণী ও হড্‌সন সাহেব

হারি সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী কোম্পানীর অধিকারিণী হন, ও শেষ পুত্র কিছু বড় হইলে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ছাতক আসিলে মেনেজার হড্‌সন সাহেব সহ কোম্পানীর লভ্যের চতুর্থাংশ টাকার বিষয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। হড্‌সন সাহেব শ্রীহট্টের সদর আমিনীতে এই বিষয়ে অভিযোগ করিলে মেম সাহেব জবাব দেন যে, মেনেজারের মাসিক বেতন সহস্র মুদ্রা; ইহাই প্রচুর। তিনি ত অংশী নহেন যে, লভ্যের চতুর্থাংশ পাইবেন? শ্রীহট্টে মেমের জয় হওয়ায় আপিল হয় ও দেওয়ান ব্রজমোহন সাক্ষ্য নির্ভরে হড্‌সন জয়লাভ করেন। মেম তখন বিলাতের প্রিভি কৌন্সিলে পুনরপি আপিল করতে উদ্যতা হন। হড্‌সন বিলাতের আপিলের খরচ চালাইতে অসমর্থ ছিলেন, কাজেই লভ্য বাবতে অশীতি সহস্র টাকা মাত্র আপোষ লইয়া লভ্যের দাবী ত্যাগ করেন। হড্‌সন এই টাকা তখন গ্রহণ না করিয়া কোম্পানীর খাতায় নিজ নামে জমা রাখিয়া দেন।

হড্‌সন সাহেব ন্যায়বান ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। হারি সাহেবের মৃত্যুর পর যেরূপ উদ্যামে কর্ম্ম চালাইতে ছিলেন, তাহাতে কোম্পানীর চরম উন্নতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেম সাহেবের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তাঁহার মন অনেকটা ভগ্ন হইয়া যায়, উদ্যম উৎসাহ কমিয়া যায়, তিনি কার্য্যস্থানে না থাকিয়া অধিকাংশ সময়ই শ্রীহট্ট সহরে, ঢাকায় বা কালিকাতায় কাটাইতেন। শ্রীহট্টে নবাব তালাবের দক্ষিণ তীরে নদীর উপরে হড্‌সন সাহেবের কুঠি ছিল,

ভূকম্পে তাহার চিহ্ন বিলোপ হইয়াছে। মেনেজারের শৈথিল্যে কোম্পানীর অবনতির সূত্রপাত হয়, কমলা ও জমিদারি বিভাগেও ক্ষতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

হড্‌সন সাহেবের সহিত আপোষ হইলে মেম বিলাতে চলিয়া যায়; তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে চরম-পত্র সম্পাদিত করেন, তাহাতে তাঁহার তিন পুত্র কোম্পানীর অধিকারী হন। ইঁহাদের মধ্যে এল. এ. এল ইংলিস (Liond Arthur Lister Inglis),—যিনি সাধারণতঃ লিও ইংলিস নামে খ্যাত ছিলেন, বিলাতের মেনেজার নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষে আসিয়াও তাঁহাকে কারবার দেখিতে হইত। লিও ইংলিস সাহেব উদ্ধত প্রকৃতি লোক ছিলেন। শিকার, নৌকাচালন ইত্যাদিতে সময় ক্ষেপন করিতে ভালবাসিতেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি পিতামাতার চেরাপুঞ্জির কুঠির হাতায় চত্বরোপরি স্থাপন করিয়া তদুপরি সমাধি নির্ম্মাণ করেন; ইহাতে হারি সাহেবের দেহ মাটীর উপরেই থাকিয়া যায়।

শেডওয়েলের মেনেজারি

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে চেরাপুঞ্জি হইতে শিলং নামক স্থানে আসামের রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইলে, লিও ইংলিস সাহেব পিতার আমলের সমস্ত সরঞ্জাম একষ্ট্রা এসিষ্টেন্ট্ কমিশনার শেডওয়েল (Mr. J. B. Shadwell.) সাহেবের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলেন এবং শিলং সহরে যে ক্ষুদ্র হ্রদের পূর্ব্বতীরে গবণমেন্ট হাউস অবস্থিত, তাহার পশ্চিমপারে "ইংলিস-বী" (Inglis-by) নামে এক বিচিত্র বাসভবন প্রস্তুত করেন, সদ্বীপ কৃত্রিম সরোবর, বৃক্ষ-বটিকা, জলপ্রণালিকা প্রভৃতি সাজ সজ্জায় এই বাটী গবর্ণমেন্ট হাউস হইতে কম সুন্দর ছিল না।

লিও ইংলিস, শেড্‌ওয়েল্ সাহেবকে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হড্‌সন সাহেবের নীচে চীফ্ একাউন্টেন্ট পদে নিযুক্ত করেন। অল্পকাল মধ্যে হড্‌সনের মৃত্যু হওয়ায় ইনিই তৎপদে বৃত হন। হড্‌সনের যে ৮০,০০০ টাকা জমা ছিল, প্রতি বৎসর নিকাশের সময় ঐ টাকা লইয়া যাইতে বলা হইলে তিনি গ্রহণ না করিয়া বলিতেন, "আমার সামান্য দৃষ্টিপাতের জন্য কোম্পানী মাসিক সহস্র মুদ্রা দিতেছেন; এই টাকা কোম্পানীতেই জমা থাকুক।" তাঁহার মৃত্যুর পর কাজেই তদীয় অভিপ্রায় মত উক্ত টাকা কোম্পানীর মূলধন ভুক্ত করা হয়।

লিও ইংলিস সাহেব শিলং বাসকালে, চিফ্‌কমিশনার ইলিয়াট (Mr. C. A Elliote) সাহেবের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব হয়, কিন্তু কোন গুহ্য কারণে এই সদ্ভাব শেষে ভীষণ শত্রুতায় পরিণত হইয়াছিল। শুনা যায় যে, তিনি ইলিয়ট সাহেবকে অনেক লোকের সাক্ষাতে অপমানিত করিয়াছিলেন। ইহার ফল কোম্পানীর পক্ষে ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ইলিয়ট সাহেবের সময়ে কোন কোন চূণা পাথরের মহালের ইজারার ম্যাদ অতীত হয়, এই সূত্রে এন্‌েল্স্ রিপোর্টের উল্লেখ ক্রমে আসাম গবর্ণমেন্ট, ইংলিস গবর্ণমেন্টে লিখিয়া, ইংলিস কোম্পানীর একচেটিয়া ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। যে মহালের ম্যাদ অন্ত হয়, তাহাই প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইতে থাকে। সে সময় মেনেজার সাহেব কৌশলক্রমে মহাল গুলি বিনামা বন্দোবস্ত করিয়া কোম্পানীর মান রক্ষা করেন। যাহা হউক, ইলিয়ট সাহেবের সহিত অসদ্ব্যবহার করাতে শিলং শহরের সাহেব সমাজ লিও ইংলিস সাহেবের উপর বিরক্ত হওয়ায় তিনি বিলাতে চলিয়া যান। এই সময় চেরাপুঞ্জির পুলিশ দ্বারা কোম্পানী নানারূপে বাধা প্রাপ্ত হন; শেডওয়েল সাহেব এই সকল বিষয় এবং ইংলিস কোম্পানী দ্বারা দেশের কিরূপ উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া গবর্ণমেন্টে চিফ্ কমিশনারের হুকুমের বিরুদ্ধে এক

দরখাস্ত করেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। এই সময় কোম্পানীর আয় অনেক কমিয়া যায়, ব্যয় বাদে ৮০/৯০ সহস্রের অধিক লভ্য দাঁড়ায় নাই। ইলিয়ট সাহেব চলিয়া গেলে কোম্পানীর একটু সুবিধা হইয়াছিল।

কোম্পানীর অবনতি

লিও ইংলিস ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পুনরাগমন করেন। তিনি নিজ উপভ্রাতার অংশ ক্রয় করিয়া লওয়ায় কোম্পানীতে অপরের অংশও রহিত হয়, কিন্তু অন্য কারণে কোম্পানীর অবনতি ঘটিতে আরম্ভ হয়। লিও ইংলিস সাহেবের আগমনের ফলে শেডওয়েল সাহেব নূতন দেওয়ান নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির নিয়োগে সকলের অভিমত না থাকায় আমলাদের মধ্যে দুইটি দল গঠিত হয়। বিরুদ্ধ দলের কেহ কেহ লিও সাহেবের নিকট মেনেজারের বিরুদ্ধে নানা কথা তুলিতে থাকে।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ছাতকে কিলবর্ণ কোম্পানীর এক এজেন্সি স্থাপিত হয়। এজেন্ট সাহেবের সহিত শেডওয়েল সাহেবের পূর্ব্বপরিচয় থাকায়, তিনি কোম্পানীর কুঠির হাতায় উক্ত এজেন্টের বাসা ও জাহাজ গুদাম ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। জাহাজের ষ্টেশন, কোম্পানীর কুঠির সম্মুখে আসায় জাহাজে চূণা বোঝাই দেওয়ারও সুবিধা হয়। তদনন্তর যখন দারুন ভূকম্পে সমস্ত গৃহাদি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল, পাহাড়ের অনেক নদীর গতিরোধ, অনেকের গতি পরিবর্ত্তিত এবং কোন কোন স্থানে নূতন স্রোতের উদ্ভব হইল; যখন চূণার খনি কোন কোনটি অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল, কোন পাহাড় ধসিয়া কমলার বাগান সব বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন ইংলিস কোম্পানীর যে বিস্তর ক্ষতি হইল,—তাহা বলা বাহুল্য।

এই সময় কিলবর্ণ কোম্পানীর এজেন্ট ও ইংলিস কোম্পানীকে নূতন গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া দিতে তাড়া দিতে লাগিলেন, এবং ভিতরে ভিতরে স্থানটি গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার জন্য প্রস্তাব চালাইলেন। শেড্ওয়েল সাহেবের এক পুত্র কিলবর্ণ কোম্পানীর কয়লার কারবারের এজেন্ট ছিলেন। এই সূত্রে লিও ইংলিস সাহেবের বিরুদ্ধপক্ষীয় আমলাগণ তদ্বিরুদ্ধে নানা কথা উত্থাপন করিতে লাগিল।

ভূগ্রহণের প্রশ্ন মীমাংসায় শ্রীহট্টের তদানিন্তন ডিপুটি কমিশনার ওব্রয়েন (P. H. Obrien) সাহেব ছাতকে গিয়া তদন্ত করেন এবং ইংলিস কোম্পানীর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত ভূমিতেই এজেন্ট সাহেবকে গৃহ প্রস্তুত করিতে হুকুম দেন। ইংলিস কোম্পানীরই জয় হইল; এজেন্ট সাহেব গৃহাদি প্রস্তুত না করিয়া ঘাটে এক ফ্লেট রাখিয়াই কাজ চালাইতে লাগিলেন।

কোম্পানীর বিলোপ

এই সকল কারণ পরম্পরায় লিও ইংলিস সাহেরে মন বিরক্ত হইয়া উঠিল; কোম্পানীর আমলাদের মধ্যেও বিভিন্ন দলাদলি চলিতেছিল; লিও ইংলিস সাহেব এই সময়ই কারবার ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন। এই সংবাদে দেশের অনেক গণ্যমান্য লোক তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, এমন কি, আসামের চিফ্ কমিশনার মহামতি কটন (H. J. S. Cotton) সাহেবও বলিয়াছিলেন যে, এই ষ্টেট অতি প্রাচীন, ইহার দ্বারা এ দেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অতএব ইহা নষ্ট করা সঙ্গত নহে। কিন্তু লিও ইংলিস সাহেব এক কথার লোক ছিলেন, তিনি কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না।

অনেকেই কোম্পানীর সম্পত্তি ক্রয় করিতে উদ্যত হইল, তন্মধ্যে প্রখ্যাত-নামা স্বর্গীয় মহারাজ সূর্য্যকান্ত বাহাদুর অন্যতম। কোম্পানীর লাউড় বিভাগের সংলগ্নভাবে গৌরীপুরের জমিদারি থাকায় তত্রত্য জমিদার বাবুও উহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন। গৌরীপুরের মেনেজার অতি সুচতুর লোক, তাঁহার বাক্য মহিমায় সাহেব প্রায় চারিলক্ষ টাকার সম্পত্তি আড়াই লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন। এই সময়ে ভাগ্যকুলের কুণ্ডবাবুগণ সংবাদ পাইয়া প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাদের নিকট ষ্টেট বিক্রয় করিলে তাঁহারা আরও পঁচিশ হাজার টাকা অধিক দিবেন। পঁচিশ হাজার কেন পঁচিশ লক্ষ হলেও কথা ভঙ্গ করিতে পারেন না বলিয়া লিও ইংলিস সাহেব তাঁহাদের অগ্রাহ্য করিলেন। গৌরীপুরের সহিত সমস্ত ঠিক হইয়া উঠিল এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে ষ্টেট বিক্রীত হওয়ায় ১০৮ বৎসরের কোম্পানী ভাঙ্গিয়া গেল। তখন এই ষ্টেটের মালীক গৌরীপুরের জমিদার পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহোদয়। বর্ত্তমানে তাঁহার অধীনে কারবার ও জমিদারি উভয়েরই উন্নতি লক্ষিত হইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইংরেজ আমলের প্রথম শতাব্দী

ব্যবসায়

শ্রীহট্ট জিলার অধিবাসীগণের অবস্থা পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল, তাহারা ক্রমাগত দৈন্যদশায় পতিত হইতেছে। ইংরেজ গবর্ণমেন্টের দেওয়ানী গ্রহণের পর হইতে শত বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বকার অবস্থার সহিত বর্ত্তমান কালের আচার ব্যবহারের অনেক প্রভেদ বৈষম্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে যেমন ব্যবসায়াদি জাতিগত ছিল, এখন আর তদ্রূপ নাই; এই সময় মধ্যেই ধীরে ধীরে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। তখনও ব্রাহ্মণ গুরুতা, রাজপণ্ডিতি ও যাজনাদি ত্যাগ করিয়া অধিক মাত্রায় চাকুরী ও দোকানদারী প্রভৃতি কায়স্থ ও বৈশ্যোচিত বৃত্তি নিতান্ত অভাবে না পড়িলে গ্রহণ করিতেন না। কেহ কেহ দেবত্র ব্রহ্মত্র শাসনে নিযুক্ত থাকিলেও গুরুতাদিই মূল ব্যবসায় ছিল; তাঁহারা সামাজিক বিষয়ে "পাতি" বা ব্যবস্থা পত্র দিতেন, ব্যবস্থাদানে অনেক স্থলেই অর্থ মিলিত।

চিকিৎসা প্রধানতঃ বৈদ্যেরই ছিল, ইঁহারা কবিরাজ নামে খ্যাত হইতেন। সমাজে কবিরাজদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। রোগী আরোগ্য হইলে কবিরাজ আরোগ্য স্নান দিয়া নববস্ত্র, কলসী বা পারিতোষিক লইতেন; কবিরাজকে সকলেই সম্ভ্রম করিত। শ্রীহট্টে বৈদ্য-কায়স্থ ভেদ না থাকায় কবিরাজদের ব্যবসায় প্রায়শঃ ব্রাহ্মণগণেরাই করিতেন।

কায়স্থগণ প্রধানতঃ রাজকার্য্য ও মোহরেরি করিতেন। কায়স্থের কাজের তখন অতিশয় সম্মান ছিল। দলিলাদি লিখিয়া স্বচ্ছন্দে তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেন। এখনকার মতন তখন সকল জাতিতে লিখাপড়ার এত চর্চ্চা ছিল না। দলিলাদি লিখাইবার জন্য প্রহর, দেড় প্রহর দূর হইতে হাটিয়া লোকে মোহরেরকে লইয়া যাইত। কায়স্থগণ লিখাপড়ার কাজে অত্যন্ত নিপুণতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিতেন বলিয়া "কায়েতে বুদ্ধি" বা "মোহরেরি বুঝ" কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ফলতঃ সকল জাতিরই ব্যবসায়গত বিশেষত্ব যুক্ত সম্মান যথেষ্ট ছিল।

এই সময়কার সাহু জাতির বিষয়ে শ্রীযুক্ত সারদা চরণ ধর মহাশয় লিখিয়াছেন,—"সাহু জাতি সম্বন্ধে কিছু না বলিলে চলিবে না। যাঁহারা কায়স্থ জাতি হইতে জাতিচ্যুত বা সমাজচ্যুত হইয়া নূতন উপসম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শুধু তাঁহাদের পূর্ব্বকার উচ্চ শ্রেণীর উপযুক্ত ব্যবসায় অর্থাৎ বিষয় কর্ম্মেই লিপ্ত ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ আবার বাণিজ্যাদিতে ও মহাজনী ব্যবসায়ও লিপ্ত হন। তাঁহাদের ধনীগণ "সাহাজী" এই সম্মানসূচক উপাধিতে অভিহিত হইতেন। তখন "সাহাজী" পদবীটি সওদাগরের সম্মান আনয়ন করিত। শ্রীহট্টে অনেক ধনী সাহাজীর বাড়ী অদ্যাপি লোকমুখে পরিচিত হইয়া থাকে। পরে তাঁহাদেরই সন্তান সন্ততিগণ স্বীয় উপাধি ধারণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া দাস আখ্যা[১] ধারণ করেন।"

পরে তিনি লিখিয়াছেন—"নবশাখকুল যথা- তৈলিক, ফুলমালী, গোপ, নাপিত, কুম্ভকার, বারুই, তাঁতি ও কামার এবং দাস প্রভৃতি নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ লাভ করিত।"

"কর্ম্মী শ্রেণীতে কৈবর্ত্ত, সোণার, সুতার, নট, ধোপা, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতীর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিত। যুগীরা দেশের কাপড় যোগাইত। গুঁড়িরা অনেকেই তখন সাহা উপাধি ধারণ করিলেও ব্যবসায় ত্যাগ করে নাই।"

পবিত্রতা

জাতিগত ব্যবসায় থাকায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যবসায় সহজেই উন্নতি করিতে পারিত। শ্রীহট্টের সামাজিক বিবরণ বংশ-বৃত্তান্ত ভাগে কথিত হইতে বলিয়া তদ্বিষয়ে কিছুই লিখিত হইল না, এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার প্রতি তখনও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। মোসলমান আমলের কথা যথাস্থানে বলিয়াছি; জাতির পবিত্রতা রক্ষা কল্পে সমাজ কিরূপ কঠোর শাসন করিতেন, রাজা সুবিদ নারায়ণের সময় সাহা সংস্রবজনিত সাহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটনাই তাহার প্রমাণ। তখন মোসলমানের আহার্য্যের গন্ধ প্রাপ্তে জাতি যাইত। সর্ব্বানন্দের জাতিপাতের ঘটনা পাঠক জ্ঞাত হইয়াছেন; তাহার বহু পরেও এই কারণেই কৌড়িয়ার রামপাশার চৌধুরীগণ মোসলমান দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।[২] তখন অন্ত্যজ এবং ভিন্ন জাতির সহিত সহজে কেহ সংসর্গ করিত না। এখন প্রকাশ্যে অস্বীকার মাত্র করিলে অতি গুরুতর বিষয়ও সমাজ সহ্য করিয়া থাকে।

ইংরেজ রাজের অভেদাচারের প্রভাব শিক্ষিত সমাজে বহু মাত্রায় সংক্রমিত হইতেছে, কিন্তু তৎকালে ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে এভাব অনেকটা কম ছিল। ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে পৃথক আসন দেওয়া হইত, ব্রাহ্মণের জন্য পৃথক হুঁকা রক্ষার প্রতি তীব্র দৃষ্টি ছিল। অতিবড় ধনবান ও শক্তিমান ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণের সমক্ষে ক্ষুদ্র ছিলেন। কি জমিদার কি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, ব্রাহ্মণের পদধূলি লইতে কেহই লজ্জা বা অপমান বোধ করিতেন না। ব্রাহ্মণও এই মর্যাদা প্রাপ্তির উপযোগী চরিত্র রক্ষা করিতেন।

জমিদার, মিরাশদার ও জমির পরিমাণ

ইংরেজ আমলের প্রথমে দুই চারি স্থলে "চৌধুরী" খেতাব প্রদত্ত হইলেও দশসনা বন্দোবস্তের পরে এই খেতাব দেওয়ার প্রথা রহিত হয়। তৎকালে চৌধুরীরাই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে সাধারণতঃ গণ্য হইতেন। শ্রীহট্টের অনেক উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণও এই উপাধিদারী। তদ্ব্যতীত নবাবি আমলের শিকদার, কানুনগো, পুরকায়স্থ প্রভৃতি বংশানুক্রমিক উপাধিধারীদেরও বিশেষ সম্মান ছিল।

সচরাচর চৌধুরাই শ্রীহট্টের প্রধান ভূম্যধিকারী; তদ্ব্যতীত তাপাদার, তালুকদার প্রভৃতিও অল্পাধিক পরিমাণে ভূমির অধিকারী ছিলেন। শ্রীহট্টে পঞ্চশত মুদ্রার অধিক রাজস্ব প্রদানকারী জমিদার বলিয়া সম্মানিত, পঞ্চাশৎ মুদ্রার অধিক রাজস্ব প্রদাতা মিরাশদার নামে খ্যাত এবং তন্নিম্নে যাহারা রাজস্ব প্রদান করেন, তাঁহারা তাপাদার বা তালুকদার শ্রেণীতে গণ্য হন।

---

১. পূর্ব্বাবধিই শ্রীহট্টের পূর্ব্বাংশে সাহুজাতীয় ব্যক্তিগণের সাধারণ উপাধি দাস। সহরবাসী সাহু জাতীয়গণকায়স্থকুলোচিত তাহাদের পূর্ব্ব উপাধিই (সেন, দত্ত প্রভৃতি যে উপাধি পূর্ব্বে কায়স্থ থাকাকালে ছিল) প্রায়শঃ ধারণ করেন।

২. পঞ্চখণ্ড প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়, বংশ-বৃত্তান্ত ভাগে তাহা কথিত হইবে।

৩. শ্রীহট্টের পক্ষে ইহা বড় গৌরবের কথা যে কেবল এখানেই সংস্কৃত মূলক রেখ যষ্টি, কেদার, হল (হাল) প্রভৃতি পরিমাণ অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

শ্রীহট্টের ভূমি পরিমাপে দস্তিদারী নল ব্যবহার হইত, এখনও হয়। ইহার মাপ ১৮ ইঞ্চি হাতের ১৪ হাত এখানকার ভূমির পরিমাণও সমগ্র বাঙ্গালাদেশ হইতে বিভিন্ন।

শ্রীহট্টের ভূমির পরিমাণ এইরূপঃ—

৩ ক্রান্তিতে	১ কড়া
৪ কড়ায়	১ গণ্ডা
২০ গণ্ডায়	১ পণ
৪ পণে	১ রেখ (৪৯ বর্গহাত)
৪ রেখে	১ যষ্টি
৭ যষ্টিতে	১ পোয়া
৪ পোয়া বা ২৮ যষ্টিতে	১ কেয়ার (কেদার)
১২ কেয়ারে	১ হাল(হল)(৬৫৮৫ বর্গহাত)৩

কৌড়ির প্রচলনও শ্রীহট্টের একটি বিশেষত্ব, শ্রীহট্টের মুদ্রার পরিমাণ এইরূপঃ—

৪ কোড়িতে	১ গণ্ডা
৫ গণ্ডায়	১ পয়সা
২০ গণ্ডায় বা ৪ পোয়াতে	১ আনা বা পণ
১৬ পণে	১ কাহন বা টাকা

কিন্তু লিণ্ডসে সাহেব শ্রীহট্টের রেসিডেন্ট থাকা কালে ৪ কাহনে বা ৫১২০ কৌড়িতে ১ টাকা গণ্য হইত। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে কৌড়ির প্রচলন বন্ধ হয়।

বাড়ীঘর ও দ্রব্যের মূল্য

তৎকালে ধনীগণ লাদাউ দালান নির্ম্মাণ করিতেন; তাহা অধিক কাল স্থায়ী হইত। কোন কোন পুরাতন দালান অদ্যাপি অটুট রহিয়াছে। উপরে অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছে, দ্বিখণ্ড করিতে পারে নাই। প্রবল ভূকম্পে বরং বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভাঙ্গে নাই। ভদ্র বিশিষ্টের বহির্ব্বাটীতে পুষ্করিণীপারে শিবমন্দির ও ভিতর বাটীতে বিষ্ণু মন্দির থাকিত; গৃহস্থ ঠাকুরের সেবাতে মনোযোগী থাকিতেন; পূজারি দ্বারা রীতিমত পূজা অর্চ্চা হইত। লোকের দেবদ্বিজ ভক্তি ছিল। গৃহস্থ নিদ্রা ত্যাগ করিয়াই ঠাকুর ঘরের দ্বারে প্রণাম করিয়া বা সূর্য্য প্রণাম করিয়া, গো গৃহের দোয়ার নিজে খুলিয়া গরু কেমন আছে দেখিতেন। কাহারও বাটীতে কিছু ফলিলে অগ্রে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে না দিয়া খাইতেন না। দ্রব্যাদি সুলভ ছিল, টাকায় দেড়মণ চাউল পাওয়া যাইত, ঘৃতের সের আনা, তৈলের সের আনা, দুধের সের দুই পয়সাতে পাওয়া যাইত। কোন কোন গ্রামে দুধ বিক্রয়ই হইত না! মাসে এক টাকা খরচ করিলে একজনে রাজভোগে খাইতে পারিত। চাকরের মাসিক বেতন আনা, ॥০ আনা কি উর্দ্ধসংখ্যা আনা ছিল। জমির মূল্যেও সুলভ ছিল, এক কেদার ভূমি দশ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত না।

ভ্রমণে ভয়

পথের সুবিধা না থাকিলেও লোকে তীর্থ যাত্রা করিত। ভয় সঙ্কুল পথে স্ত্রী-পুরুষ দল বাঁধিয়া তীর্থে যাইতেন। জীবনে একবার তীর্থ দর্শন না করিলে জীবন বৃথা গণ্য হইত। এক দিনের পথ

যাইতে হইলেই,—গ্রাম হইতে সহরে যাইতে হইলেই, কান্না কাটা লাগিত, যাত্রীকে বাড়ী বাড়ী খাওয়াইত। যাত্রীকে উপযুক্ত রূপ লোক লস্কর লইয়া সুরক্ষিত ভাবে চলিতে হইত। তথাপি পথে প্রায়শঃ রাহাজানি, ডাকাতি হইত। ভাটী অঞ্চলের কোন কোন জমিদার দস্যুবৃত্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। লুঠতরাজ দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রায়ই হইত। দারগা, বরকন্দাজ রীতিমত ভয়ের পাত্র ছিল। ইহারা গ্রামে আসিলে লোকে যে কোন প্রকারে তাহাদের তুষ্টি সম্পাদন করিত।

জলদস্যুদের ভয় বারণার্থে জল পুলিশ নিযুক্ত ছিল, ইহারা নৌকায় থাকিত। জল পুলিশের নৌকা দস্যু সন্ধানে নদী পথ ভ্রমণ করিত। ইহাদের নৌকায় "নাগরা" থাকিত; দারগার নায়ের নাগরার ধ্বনিতে লোক চমকিত ও ত্রাসিত হইত।

কাছারীর আমলাগণ, এমন কি হাকিম পর্য্যন্ত বেজায় ঘুষ প্রিয় ছিলেন। বিচারে ঘুষ প্রদানই মোকদ্দমা জয়ের কারণ ছিল। ঘুষের জোরে একজনের সম্পত্তি অপরের হইয়া যাইত। তবে এখনকার মত এত মিথ্যা সাক্ষ্য ছিল না। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য ভয়ানক পাপ কাজ বিবেচিত হইত। কিন্তু অনেক বিষয়ই পঞ্চায়েতের দ্বারা মীমাংসিত হইত, তাহাতে ন্যায়ের মর্যাদা বিশেষ ভাবে রক্ষিত হইত।

ধরিত্রী এত অনুর্ব্বরা ছিল না, ক্ষেত্রে অল্পয়াসে প্রচুর শস্য জন্মিত। গাভীতে যত দুধ দিত, গাছ যত বড় হইত ও যত বেশী ফল ধরিত, এখন তাহার অর্দ্ধা অর্দ্ধি হইয়াছে। রোগ-শোক এত অধিক ছিল না; তখন সড়কের বাহুল্য ছিল না—দেশের জল প্রবাহ ভালরূপ নিষ্কাশিত হইবারও বাধা ছিল না। সুতরাং ম্যালেরিয়ার এত প্রকোপ হয় নাই। ওলাউঠাই একমাত্র মহামারী ছিল, বহু বৎসর পরে ইহা এক একবার দেখা দিত। লোক সবল ও সুস্থদেহ, প্রফুল্ল ও শ্রম সহিষ্ণু, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিল। দুর্ভিক্ষ্য তখন এইরূপ "গায়ের লাগা" ছিল না; এক পেটের জন্য লোকের কোন চিন্তাই করিতে হইত না। গৃহস্থের সন্তানাদিও সংখ্যায় অধিক, দীর্ঘজীবী ও সুস্থকায় হইত।

স্ত্রীলোকের ব্যবহার

স্ত্রীলোকের ব্যবহারে এখন যেরূপ বিলাসিতার লীলা পরিলক্ষিত হয়, তখন তদ্রূপ ছিল না; এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত সারদা চরণ ধর মহাশয় আমাদিগকে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেনঃ—"ব্রাহ্মণ ও শুদ্র লোকের মেয়ে মাত্রেরই কলসী দিয়া পুষ্করিণী হইতে জল আনয়ন করিতে, পাকশাক করিতে ও চরখা দিয়া সূতা কাটিতে হইত, ইহাতে কেহই লজ্জা মনে করিত না। সূতা কাটার পয়সা মেয়েদের অলঙ্কারের ন্যায় নিজস্বই হইত। বিধবারা সূতা কাটিয়াই শিশু সন্তান নিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইত; কাহারও গলগ্রহ না হইয়াও থাকিতে পারিত। গৃহস্থবাড়ীতে নিত্য ব্যবহার্য্য শাকসজী প্রধানতঃ মেয়েদের যত্নেই জন্মিত। শাশুড়ীকে তাহারা মা হইতেও অধিক ভক্তি করিত। স্বামীকে দেবতার মত, শশুর ও ভাসুরকে গুরুর ন্যায় দেখিত। এই সময়ে কেহ কেহ সহমরণ যাইত বলিয়া জানা যায়। তাহারা স্বামীর পাতে খাইত ও এক শয্যাতে উঠিতে ও ত্যাগ করিতে প্রতিদিনই স্বামীর পাদবন্দনা করিত। ননদ ভাজে ঝগড়া চিরপ্রসিদ্ধ ছিল। অসতীর ভয়ঙ্কর লাঞ্ছনা ছিল, ধরা পড়িলে চুল কাটিয়া গালে চূণ কালী দিয়া কুলের বাহির করিয়া দিত। অসতী হইবার সুযোগও বড়ই কম ছিল। মেয়েরা মোটা শাড়ি পরাই ভদ্রতাজনক ও সম্মানসূচক মনে করিত। মিহিধুতির চল ছিল না, চাদর ব্যবহার্য্য ছিল। কুলের অলঙ্কার, শাড়ী ও শাল পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করা হইত। মেয়েরা সীমান্তে ও ললাটে সধবার চিহ্ন সিন্দুরের বড় ফোটা ও হাতে সেরভর ওজনের বড় বড় ধবল শঙ্খা ধারন করিত। শাশুড়ী হইতে পুত্রবধু

পৌত্রবধু পর্য্যন্ত, এমন কি ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত অনেক পুরুষে চলিত। স্ত্রীলোকেরা মাথায় টীকা; কানে ঠেক, কানফুল, কড়ি; নাকে নথ ও সেবর; গলায় মালা, হাঁসলি, পাঁচ লহরী বা সাতলহরী ব্যবহার করিতেন। হাতে শঙ্খ, কঙ্কণ, বলয়; বাহুতে বাজু বন্ধ, বাজু; পায়ে বেকি, খাড় , ঘুঙ্গুর ও পাজেব পরিত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েরা রজত অলঙ্কারই বেশী পরিত; দুই চারিপদ স্বর্ণালঙ্কারও থাকিত। ধনীদের মেয়েরাও কোমরের নীচে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করিত না। অলঙ্কারের কারুকার্য্য অপেক্ষা ওজনের গুরুত্বই গৌরবের কারণ হইত। যিনি যত বেশী ওজনের অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন, তিনি তত অবস্থাপন্ন ধনীর মেয়ে বা গৃহিনী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। স্ত্রীলোকদিগকে নয়নে কজ্জল, পায়ে আলতা ব্যবহার করিতে হইত। শাড়ীর মধ্যে মেঘডম্বর, চন্দ্রকোণা, রাসমণ্ডল প্রভৃতি প্রধান ছিল; কছিদা, ছয়নু ও গণপিছ প্রভৃতির বহুল প্রচলন ছিল; বিবাহের কন্যাকে লেটের চাদর দেওয়া যাইত। স্ত্রীলোকেরা বড়ই লজ্জাশীলা ছিল, কিন্তু গর্ভাধানের সংস্কার-উৎসবের ধামালি গানে তাহারা অশ্লীলতার শ্রাদ্ধ করিতেন। শ্রীহট্টে বাসর গৃহের উৎপাত কোন দিনই বেশী ছিল না। বিবাহাদিতে স্ত্রীআচারের বিশেষ ঘটা ছিল। স্ত্রীলোকেরা কাজকর্ম্মে দক্ষ ছিলেন, সাধারণ ঔষধপত্র মুখে মুখে জানিতেন ও সময়ে ব্যবহার করাইতেন। তখনকার স্ত্রীলোকেরা স্বীয় চরিত্রে ও গুণে যথার্থই রূপিনী ছিলেন।"

বিবাহ ও ভোজন

বিবাহ উৎসব বিশেষ ঘটার সহিত সম্পন্ন হইত। বিবাহকালে বরকেও কাণে কুণ্ডল, মণিবন্ধে বাজুবন্ধ, গলায় হার এবং মাথায় শোলার মুকুট পরিতে হইত। বরের হাতে কোন কোন স্থলে বালা শোভা পাইত। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী ধুমধামেব্ সহিত লোক লস্কর লইয়া চলিতেন। উভয় দলে প্রায়ই লাঠিযুদ্ধ হইত ও তাহাতে জয়লাভ না করিলে বিজিত পক্ষকে অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইত। নিমন্ত্রণে সাধারণতঃ নিরূপিত গুয়াপাণ ও সম্ভ্রান্ত স্থলে কাটাপাণ ও তৈল না পাঠাইলে নিমন্ত্রণ উপযুক্ত বিবেচিত হইত না। খাওয়াতে রীত্যনুযায়ী উপবেশন করার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, (এখনও অনেকটা আছে।) গ্রামে কে কাহার অগ্রে, কে কোন বংশের পরে বসিবেন, তাহার একটু ব্যতিক্রম হইত না। খাদ্যে নানারকমের পিঠা ও শ্রীহট্টের বিশেষত্ব বিরণীর ভাতের বাহুল্য ঘটিত। ভদ্র বিশিষ্টগণ (বোধ হয় যবনানুকরণে) লৌহ নির্ম্মিত আধ-হাত উচু "ভোজন বেড়ীর" উপর থালা রাখিয়া খাইতেন ও ডাবরে মোচন করিতেন। পংক্তি ভোজনের বাধা নিয়ম ছিল, যে সে আনিয়া ভাত পরিবেশন করিতে পারিতেন না, যে সে ঘরের মেয়ে দশজনের জন্য পাক করিতে পাইতেন না। কাহারও সম্বন্ধ একটু খাট হইলে জ্ঞাতি গোষ্ঠী দশজনে সে মেয়ের রাঁধা পাক স্পর্শ করিতেন না। অন্ন বিচার বড় বেশি ছিল; অস্নানে কেহই খাইত না।

পরিচ্ছদ ও আমোদ

সাধারণতঃ পুরুষেরা পরিধানে ধুতি, গায়ে চাদর, নিমা, শীতকালে মিরজাই ও আঙ্গরাখা (অঙ্গরক্ষা) ব্যবহার করিত। এক বস্ত্রে বাড়ীর বাহির হইত না। শীতকালে সাধারণ লোকে যুগীয়ানা গিলাপ, মধ্যবিত্ত প্রবীণ ব্যক্তি বনাত, তরুণ বয়স্কগণ দোলাই এবং সম্ভ্রান্তগণ শাল ব্যবহার করিতেন। দরবারে বা রাজদ্বারে যাইতে চাপকান, আচকান, লাটুদার পাগড়ী ও পায়ে নাগরা জুতা পরিতেন। সাধারণতঃ পুরুষেরা ধুতি হাটুর নীচে বড় নামিত না। পুরুষেরা কপালে স্বীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিধি মত তিলক দিতেন, নব্য বঙ্গের মত তাহা অসভ্যতার বিবেচিত হইত

না। চন্দন চর্চ্চিত দেহে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছাতা-বেহারা সহ গৃহের বাহির হইতেন। বেহারাগণ শ্রীহট্টের পত্র নির্ম্মিত বৃহৎ ছাতি দীর্ঘ বংশদণ্ডে উচু করিয়া মাথার উপর ধরিয়া চলিত। ছাতা বেহারার ব্যবহার আমরাও কিছু কিছু দেখিয়াছি। সম্ভ্রান্ত ধনীগণ পালকীতে বাহির হইতেন। তামাক পাণ মজলিশি ভদ্রতা ছিল, (এখনও আছে।) সঙ্গীত চর্চ্চা বেশী রকমই ছিল,[৪] জুয়াখেলাও খুব চলিত। ঘাটু গানে[৫] সকলেই আমোদ উপভোগ করিত, ঘাটুর গানও পরবর্ত্তী কালের ন্যায় ইতর-জন-সেবিত ছিল না,—কৃষ্ণলীলা গীত হইত। ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে ঘাটু ছোকরা রাজভোগে লালিত হইত।

দাস দাসী

দাস দাসীর সংখ্যা বাহুল্য সম্ভ্রমাধিক্যের কারণ হইত। ভদ্রলোক মাত্রেই এক জন নফর সঙ্গে না থাকিলে ঘরের বাহির হইতেন না। খালি মাথায় বাহির হওয়া অনেক স্থলেই অরীতি গণ্য হইত। পাগড়ী, লাঠি ও সাথে নফর থাকাই ভদ্রত্বের পরিচায়ক ছিল। দাস দাসীদের প্রতি অনেক সময় নির্দয় ব্যবহার করা হইত।

"দারে বালি কুড়ালরে শিল,
বাঁদিরে লাথি গোলামরে কিল।"

দাস দাসীকে "দুরুস্ত" রাখিবার এই মন্ত্র বা শ্লোক হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়েও দাস দাসী বিক্রয়ের প্রথা দূর হয় নাই, তবে দাস দাসীর মূল্য আমলাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং বিক্রেতাগণ বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে মুনিবানা বা মালিকানা বাবতে কিছু রাখিয়া অবশিষ্ট মূল্য দাসদাসির আত্মীয়স্বজনকেই দিতেন,[৬] কিন্তু পূর্ব্বে এ রীতি ছিল না।[৭] বিপদে পড়িয়া

৪. সঙ্গীত চর্চ্চার ফল স্বরূপ শ্রীহট্টে অনেক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের ও সঙ্গীত রচয়িতা উদ্ভব হইয়াছিল; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের বংশ-বৃত্তান্ত ও জীবন-বৃত্তান্ত ভাগে ইঁহাদের কথা লিখিত হইবে।

৫. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত–ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ভাগে অষ্টম অধ্যায়ে ইহার উল্লেখ করা গিয়াছে; মান, মাথুর ইত্যাদি ভেদে ঘাটুগান রচিত হইত। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেনকৃত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ে শ্রীহট্টের বি সত্যরাম কৃত একটি ঘাটু সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে।

৬. প্রমাণ স্বরূপ আমাদের গৃহ-সংরক্ষিত মদীয় খুল্লপিতামহ নামীয় কয়েক খানা মনুষ্য-ক্রয়-পত্র হইতে এক খানা দলিলের অবিকল নকল এস্থলে উদ্ধৃত হইলঃ–

"ইআরদিকীদ্ধক শ্রীফকীরচন্দ্র দাস ওলদে কানুরাম দাস চৌং সাকীন পরগণে জফড়গড় মৌজে ছায়াবাড়ি সদাশয়েষু লেখিতং শ্রীশান্তরাম দাস ওলদে পশাই রামদাস সাকীনাআন লোহারপাড়া মতাবেক পরগণে ডৌয়াদিগ নির্দ্দোয় ফারগ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চঃ আগে তুমার খরিদা নফর শ্রীগনেষ ভির্থর (১) পাশ আমার নফর সুকাই ভির্থর বেটি (২) শ্রীশচিদাসিকে বিবাহ দিবার কারণ নির্দ্দাআনা (৩) মবলগ ১৬ সুর্ল্ল (৪) রূপাত্তা (৫) সীক্কা তুমার পাশ হনে (৭) নগদ সমজীয়া নিয়া আমার দাসি মজকুরির মাতাকে ও ভ্রাতাকে সমজাইআ দিলাম এবং আমার মুনিবানা (৮) মবলগ ১-০ পনেদুই রূপায়া সীর্ক্কা সমজীয়া পাইআ দাসি মজকুরিকে নির্দ্দাও (৯) করিআ দিলাম দাসি মজকুরির দস্তর মতে তুমার কালিজি (১০) কার্য্য করিব এং দাসি মজকুরির গর্ভে যে সন্তানাদি হৈবেন এই শিরাতে (১১) আমার কুন (১২) অর্থে দাবি নাই দাসি মজুকুরি ও সন্তাাদির উপর আমি ও আমার সন্তান ইদর কুন অর্থে কুন দাবি নাই ও না রহিল আমার শত্ত পরিত্যাগে তুমি ও তুমার সন্তান আদির শত্ত (১৩) করিয়া দিলাম দান বিক্রি সত্যাধিকার সন্তানাদি ক্রমে তুমার এতধর্থে নির্দ্দাও ফারগ পত্র লেখিআ দিলাম ইতি সন ১২৪৩ সাল বাঙ্গালা মাহে ২৪ বৈশাখ।" (পার্শ্বে সাক্ষি সত জনের নাম ও দক্ষিণ শীর্ষে বিক্রেতার নাম আছে। আট আনার ষ্ট্যাপ।)

৭. ২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায়ের শেষাংশে উদ্ধৃত টীকায় দাসী বিক্রয় পত্র দ্রষ্টব্য।

স্বাধীন ব্যক্তিগণ আত্মবিক্রয় পূর্ব্বক চিরদাসত্ব অঙ্গীকারেরও উদাহরণ পাওয়া যায়।[৮]

মোসলমান মাহি জাতি

দেশে দুর্ভিক্ষ এত ছিল না, দৈবাৎ উপস্থিত হইলে নিম্ন শ্রেণীর লোক জাতি ত্যাগ করিত; মোল্লাগণ তাহাদিগকে মোসলমান করিয়া লইতেন। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সারদা চরণ ধর মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, "এ জিলার ভদ্র অভদ্র অধিকাংশ মোসলমান জাতিমারা হিন্দু। কৈবর্ত্ত, মাল, ডোম, চাঁড়ালগণ মোসলমান হইয়া 'মাহি' নাম ধারণ করতঃ অদ্যাপি পূর্ব্ব ব্যবসায়ই করিতেছে। আর অন্যান্য জাতি 'শেখ' ইত্যাদি হইয়া কৃষি ও অন্যান্য কর্ম্ম করিতেছে। ভদ্র মোসলমানগণ কায়স্থ-ব্যবসায় করিতেন, এখনও করেন। কি হিন্দু কি মোসলমান,-সামান্য লোকে পাদুকা ব্যবহার করিতে পারিত না, বিবাহের নহবৎখানা উঠাইতে পারিত না এবং তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা নাকে নথ ও পায়ে অলঙ্কার পরিতে পারিত না।"

দেবকার্য্য

ভদ্র গৃহস্থের বাটীতে দোল দুর্গোৎসব হইত, যতদূর সাধ্য স্বয়ং কর্ত্তাই দেবকার্য্যে স্বহস্তে কর্ম্ম করিতেন, এই সময়ে কেহ পাদুকা ব্যবহার করিতেন না। গুরুদের বাড়ীতে আসিলেও কেহ খড়ম বা জুতা ব্যবহার করিতেন না ও পাড়ার সকলেই সেই বাড়ীতে আসিয়া প্রসাদ পাইতেন। দুর্গোৎসবে কাঠাম বিসর্জ্জনে যাওয়া কালে প্রতি গ্রামেই কে আগে যাইবেন, কাহার কাঠাম পাছে

---

৮. প্রমাণ স্বরূপ আমাদের গৃহ-সংরক্ষিত মদীয় পিতামহ নামীয় কয়েক খাণ মনুষ্য-ক্রয়-পত্র হইতে একখানা দলিলের অবিকল নকল এস্থলে উদ্ধৃত হইলঃ–

'ইআদিকীর্দ্ধ শ্রীগৌরচন্দ্র দাস ওলদে কানুরাম দাস চৌং সাকিন পরগণে জফরগড় মৌজা। ছায়াবাড়ী সদাশয়েষু লেখিতং শ্রীগনেস কুইস্যারি (১) উম্মর (২) আন্দাজী ২৫ পচিশ বছর (৩) ওলদে জীত রাম কুইসারি সাকীন পরগণে সাবাজপুর মৌজে চান্দপুর ইলাল পরগণে জফরগড় মৌজে ছায়াবাড়ী মজকুর আত্মবিক্রয় পাট্টা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চঃ আগে আমি খানি বেগর (৪) ও পুসাগ (৫) বেগর পেরেসান (৬) কুন মতে জীবিকা রক্ষা হওয়াতে এবং ইমাক্যাদার (৭) হৈয়া (৮) ইমাক্যা পরিশোধ ও পরদাক্ত (৯) হৈতে পারিনা প্রযুক্ত আমি আমার সইছা (১০) পূর্ব্বক সহুসে (১১) আমার আত্ম অজয়মাল (১২) ১৬ শুল্ল (১৩) টাকা সীক্যা লৈয়া (১৪) আপনার স্থানে আত্ম-বিক্রি হৈলাম তহরির তারিখ আবদি (১৫) আপনার খানি (১৬) খাইয়া ও পুসাগ পৈরিয়া হামেসা (১৭) নিকট হাজির (১৮) থাকিআ আবরণী (১৯) হেজমত (২০) নেসী (২১) ঝুটা আঙ্গাক্তি (২২) সত্রব কাজী (২৩) বেদস্তুর (২৪) ভির্থত্তান (২৫) কর্ম্ম জখন্ (২৬) জাহা আজ্ঞাকর তাহা পালন করিমু এবং আমাকে আপনে বিবাহ দিলে জে (২৭) সন্তান আদি হৈবেক (২৮) তাহারাহ (২৯) আপনার ভির্থান (৩০) হৈবেক আমি ও আমার জে সন্তান ক্রমেতে আপনে ও আপনার সন্তান আদির দান বিক্রি সত্যাধিকার হৈল (৩১) আর অজেমাল (৩২) মং মজকুর আপনার পাস (৩৩) হৈতে আমার নিজ হস্থে বেবাক (৩৪) সমজিয়া লৈয়া আমার ইসাক্য পরিশুদার্থে (৩৫) দিলাম এতদর্থে আত্মবিক্রি পাট্টা পত্র লেখিয়া দিলাম। ইতি ১২৪২ সাল বাঙ্গালা মাহে ৬ শ্রাবণ। (পার্শ্বে সাক্ষি ৬ জন, দক্ষিণ শীর্ষে দলিলদাতা ও দলিল লেখকের নাম আছে। স্ট্যাম্প ।।০ আনা।)

(১) রাঢ় জাতীয় লোকেরা পূর্ব্বে "কুইসারি" বা কুশিয়ারি খেতাব লিখিত। ইঁহারা প্রধাণতঃ কুশিয়ার উৎপন্ন করিয়া থাকে। (২) বয়স, (৩) বৎসর, (৪) জন্য, (৫) পোষাক, (৬) শঙ্কট, (৭) "ইসাক্যা" ও পাঠ করা যায়। (৮) হইয়া, (৯) পোষণ, (১০) স্বইচ্ছা, (১১) স্বজ্ঞানে, (১২) মূল্য, (১৩) ষোল, (১৪) লইয়া, (১৫) অবধি, (১৬) ভক্ষ্য. (১৭) সর্ব্বদা, (১৮) উপস্থিত, (১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪) বুঝা গেল না। (২৫) ভৃত্যোপযোগী, (২৬) যখন, (২৭) যে, (২৮) হইবেক, (২৯) তাহারাও, (৩০) ভৃত্যবর্গ, (৩১) হইল, (৩২) মূল্য, (৩৩) পাশ, (৩৪) সমুদয়, (৩৫) পরিশোধার্থে।

যাইবে ইত্যাদি বাঁধা নিয়ম ছিল। বিবাহ ও শ্রাদ্ধ সভাতে এবং গোবিন্দ কীর্ত্তনের মেলে সামাজিক গোলমাল মীমাংসিত হইত। পুরাণ পাঠ, শনি ও সত্যনারায়ণের সেবায় পাঁচালী পাঠ, এবং শ্রাবণ মাসে পদ্ম পুরাণ পাঠ হইত, সুর সংযোগে যিনি লাচাড়ী গাইতে পারিতেন, তাঁহার খুব নাম ছিল। চামর হাতে খোল করতাল যোগেও পদ্মপুরাণ এবং চৈতন্যমঙ্গল গীত হইত। বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে তুলসী ও চন্দন সহ ভাগবৎ ও বিশ্বম্ভরের (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের) পূজা ও ধূপ ধুনা দেওয়া যাইত।

গ্রাম্য-বন্ধন

গ্রাম্য মেলবন্ধন বড়ই সুন্দর ছিল। ব্রাহ্মণ ভদ্র, বড় ও ছোট লোক একে অন্যকে বয়সের তারতম্যানুসারে "কাকা" "জেঠা" "দাদা" "পুতি" ইত্যাদি সম্বন্ধ পাতিয়া ডাকিত। বয়োধিক, হইলেই কেহ কাহাকেও নাম ধরিয়া ডাকিবার নিয়ম ছিল না, উহা বড়ই বে আদবি গণ্য হইত। ভাণ্ডারী বা ভৃত্যবর্গের সহিতও এইরূপ গ্রাম সম্বন্ধ্য রক্ষিত হইত এবং ব্যবহারে তাহা যেন প্রকৃত সম্বন্ধ বলিয়াই বোধ হইত। একান্নবর্ত্তী প্রথাতে তখন বিকারের কীট প্রবেশ করে নাই; বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠ যাহা করিতেন, অপর সকলের অবাধে তাহা মানিয়া চলিত; ছোট ভাই বড় ভাইকে পিতার মত ও তাহার স্ত্রীকে মাতার সমান দেখিতেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা "হামবড়াই" ভাব অপরিজ্ঞাত ছিল। হিন্দু মোসলমানে সদ্ভাব ছিল, কোন কোন গ্রামে মোসলমানেও বিষহরি ও শীতলি দেবীর পূজা দিত, দুর্গোৎসবের মিছিলের সঙ্গে মোসলমানরাও যাইত, পক্ষান্তরে মহরমের সময় হিন্দুরাও তরবারি খেলায় মাতিত।

সৎক্রিয়া ও সুশিক্ষা

কোন গৃহস্থের অবস্থা উন্নত হইলেই দেবালয় স্থাপন, পুষ্করিণী ও অশ্বত্থ নির্ম্মাদি করিতেন। ইতর লোকেরা টাকা হইলে নৌকা এবং পাট বিষহরি পূজাই অধিক করিত। নৌকা পূজার বিবরণ ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ভাগে (অষ্টম অধ্যায়ে) বলা গিয়াছে; বহু সংখ্যক দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সহ বিষহরির কাঠাম প্রস্তুত ক্রমে পূজা করাই নৌকা পূজা নামে খ্যাত। মানসিক কাব্যদুর্গা ও ডরাই পূজায় কপালী (কেওয়ালি) ও গুরমা (নপুংসক) গণ গান গাইত, উহাদের অশ্লীলতা গানে দুই ব্যক্তি একত্র উপবেশন করা কঠিন হইলেও অনেক লোকই তাহার পক্ষপাতি ছিল। ইহা এক রূপ উঠিয়াই গিয়াছে। পাড়ায় পাড়ায় রামায়ণ মহাভারত পাঠের প্রথা বড়ই সুন্দর ছিল; বলিতে গেলে কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের প্রভাবে,—রাম যুধিষ্ঠিরাদির আদর্শেই বঙ্গ সমাজ গঠিত হইয়াছিল এবং সে প্রভাব আজ পর্য্যন্ত একবারে লুপ্ত হয় নাই। হাট হইতে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা ঘরে ফিরিলে হাত পা ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া ঘরে যাইতেন। বাহ্যক্রিয়া সমাপনান্তেও বস্ত্রত্যাগ ও গা ধুইতে হইত। জলগ্রহণ ব্যতীত কেহই প্রস্রাব করিত না, লোকের স্বাস্থ্যও ভাল ছিল।

ছেলেদের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি এসময়ে উঠিয়া গেলেও গুরুমহাশয়ের বেত্রের গুণে ছাত্রের চরিত্র অনেকটা মার্জ্জিত হইত। ছেলেরা পিতামাতার নিকট মুখে মুখে চাণাক্য শ্লোক শিখিয়া লইত। ভূমিতে বালুকাস্তর বিস্তার করিয়া খড়ি দিয়া তাহাতে ক খ লিখিত, ও "শিশুবোধক" হইতে "ক য়ে করাত, খ য়ে খরগোস" শিখিত। লিখিবার উন্নতির সহিত কলাপাতে ও সর্ব্বশেষে ভোটিয়া কাগজে লিখিবার অধিকার পাইত। ছুটীর পূর্ব্বে

খড়িবাড়ী মাটীতে রাখিয়া তাহার উপরে মাথাদিয়া সরস্বতী প্রণাম করতঃ বাড়ী যাইত। সন্ধ্যার পর মজলিসে অভিভাবকদের মধ্যেও কখন কখন "শ্লোককণ্ঠ" চলিত। ইহাকে শ্লোকের লড়াই বলা যাইতে পারে। একজন প্রথমে একটি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিতেন, প্রতিদ্বন্দ্বীকে উচ্চারিত শ্লোকের শেষাক্ষরকে আদ্যাক্ষর করিয়া আর একটি বলিতে হইত; তখন প্রথম ব্যক্তিকে তদুচ্চারিত শ্লোকের শেষাক্ষরযুক্ত আর একটি শ্লোক বলিতে হইত, এইরূপ এক এক জন শত শত নূতন শ্লোক আবৃত্তি করিয়া, পরাস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্লোক শিক্ষার পরিচয় দিতেন ও আমোদ উপভোগ করিতেন।

ফলতঃ লোক অনেক পরিমাণে মার্জ্জিত চরিত্র ও সন্তুষ্ট ছিল। মোসলমানের পর ইংরেজের নূতন ও সুব্যবস্থিত শাসনে দেশের চোর দস্যুর ভয় দূর হওয়ায় লোকে অনেকটা নিরাপদ হইয়াছিল। ইংরেজের ন্যায়পরাণতার প্রতি কাহারও সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। ইংরেজ রাজপুরুষেরাও দেশের লোকের সহিত মিশিতেন। রাজনৈতিক কোন আন্দোলনের প্রয়োজন পড়িত না। কেবল ১৮৭৪ সালে শ্রীহট্ট আসাম ভুক্ত হওয়ার সময় একটু আন্দোলন চলিয়াছিল; তাহাও লাট সাহেব বাহাদুরের আশ্বাসবাণীতে অল্পেই দমিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইংরেজ আমলের প্রথম শতাব্দীতে শ্রীহট্টবাসী এতটা অভাবগ্রস্থ ছিল না, সুতরাং সুখেই ছিল।

উপসংহার—কাছাড়ের কথা

ভৌগোলিক

সীমাদি—কাছাড় জিলার উত্তরে নওগাঁ ও নাগা পাহাড়, পূর্ব্বে মণিপুর, দক্ষিণে লুশাই পাহাড়, পশ্চিমে শ্রীহট্ট জিলা ও জয়ন্তীয়া পাহাড়। এই জিলার পার্ব্বত্য অংশ উত্তর কাছাড় নামে খ্যাত। কাছাড় জিলার পরিমাণ ফল ৩৭৬৯ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ৪৫৫৫৯৩ জন মাত্র।

বিভাগাদি—কাছাড়ে সদর বিভাগ (শিলচর) ও হাইলাকান্দি এই দুইটি সবডিভিশন আছে; হাফলং বিভাগই উত্তর কাছাড়। এতদংশ ব্যতীত কাছাড় জিলার পরিমাণ ফল ২৩৬৩ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ৪১৪৭৮১ জন। কাছাড়ে শিলচর, লক্ষীপুর, হাইলাকান্দি ও কাঠিগড়া এই চারিটি থানা ও সুনাই এবং কাটিলিছড়া এই তিনটি ফাড়ি থানা আছে। কাছাড়ে উল্লেখিত ২২টি পরগণা, ১০৭৮টি গ্রাম ও ৯৫৬১৬ খানা বাড়ী আছে।

ডাক্তার খানা—কাছাড় জিলায় শিলচর, হাইলাকান্দি, কাঠিগড়া, হাফলং, লক্ষীপুর, বড়খলা, ফেন্ছাছড়া এই সাতটি ডাক্তারখানা আছে।

স্কুল—শিলচর ও হাইলাকান্দিতে দুইটি এনট্রেন্স্ স্কুল আছে, মধ্য ইংরেজি স্কুলের সংখ্যা তিনটি ও মধ্য বাঙ্গালা স্কুল একটি। উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ১১টি এবং নিম্ন প্রাইমারী স্কুল ২৩০টি; বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪টি মাত্র। তদ্ব্যতীত একটি ট্রেইনিং স্কুল ও সার্ভে স্কুল আছে।

কাছাড়ে দুইটি মুদ্রাযন্ত্র আছে এবং শিলচর নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে।

ডাকঘরাদি—কাছাড়ে পোষ্ট অফিসের সংখ্যা ৩০টি; তন্মধ্যে ১৯টিতে টেলিগ্রাফের তার সংলগ্ন আছে।

সুরমা উপত্যকার কমিশনার সাহেব শিলচরেই অবস্থিতি করেন। এ জিলা, একজন ডিপুটী কমিশনার কর্ত্তৃক শাসিত, তাঁহার জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়ের ক্ষমতাই আছে; তাঁহার অধীনে এসিষ্টান্ট কমিশনার প্রভৃতি আছেন।

পর্ব্বতাদি—বড় আইল, রেংটি, টীলাইন প্রভৃতি কাছাড়ের প্রধান পর্ব্বত, ইহার উচ্চতা ২৫০০ হইতে ৫০০০ ফিট পর্য্যন্ত। বড় আইলের উচ্চ শৃঙ্গ হেম্পিওপেট ৬১৫৩ ফিট উচ্চ। বরাক নদীর দক্ষিণ তীরে, জিলার পূর্ব্ব প্রান্তে ভুবন পাহাড়ে প্রসিদ্ধ ভুবনতীর্থ বিরাজমান। এই তীর্থে অনেক ছিন্নাবয়ব প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। অনেক সন্ন্যাসী ভুবন তীর্থে গমন করেন। কাছাড়ের পশ্চিম প্রান্তে শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের সন্ধিস্থলে সিদ্ধেশ্বর তীর্থ, ইহার বিবরণ ভৌগোলিক বৃত্তান্তে নবম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। নিমাতা পাহাড় এখন একটি স্বাস্থ্য নিবাসে পরিণত হইয়াছে।

নদী ও বিল—বরবক্র বা বরাকই কাছাড়ের প্রধান নদী। সোনাই, ধলাই, জিরি, জাটিঙ্গ প্রভৃতি ইহার উপনদী।

হাওরের মধ্যে বকরি হাওর (১০ বর্গ মাইল), বোয়ালিয়া (৬ বর্গ মাইল), চাতলা (দৈর্ঘ্য ১২ মাইল, প্রস্ত ২ মাইল,) বয়া (২ বর্গ মাইল) প্রভৃতি প্রধান।

পানিমুরের নিকটে কপিলী নদীর তীরে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে।

খনিজদ্রব্য—মাইবঙ্গের উত্তরে এবং গংজঙ্গের নিকটে চূণা পাথরের খনি আছে। বরাক

নদীর তীরে মাছিমপুরে মেটে তৈল মিলে, দামছড়াহাজার উত্তরে লারং নামক স্থানে কেরাসিন তৈল আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সরসপুর ভুবন প্রভৃতি পাহাড়ে লবণাক্ত উৎস আছে।

উৎপন্ন দ্রব্য—কাছাড় হইতে প্রধানতঃ চা, ধান, ইক্ষু, সুপারি, তিসি কার্পাস, কলাই, রবার, মোম, কাষ্ঠ, বেত্র, বাঁশ, ছন প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য প্রতি বৎসর রপ্তানি হইয়া থাকে।

কাছাড়ে চা বাগানের সংখ্যা ১৩৬টি, তন্মধ্যে সদর ডিভিশনে ১১৭টি চা ক্ষেত্র আছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ে সর্ব্বপ্রথম চা বাগানের সৃষ্টি হয়।

সমতল কাছাড়ে বাজারের সংখ্যা ৫৩টি মাত্র। কাছাড়ের প্রধান নগর শিলচর। লক্ষ্মীপুর একটি প্রসিদ্ধ বাজার। সোনাইমুখ কাষ্ঠ ও বাঁশ প্রভৃতি কারবারের প্রধান কেন্দ্র। কাছাড়ে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসিয়া থাকে। সিদ্ধেশ্বরের বারুণী অতি প্রসিদ্ধ।

জীবজন্তু—কাছাড়ের দক্ষিণ অংশে হাতী পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত বন্য, মহিষ, বৃষ, ভল্লুক, বিবিধ জাতীয় বানর, বনমানুষ প্রভৃতি আছে। পক্ষীর মধ্যে বন্য হংস, ময়ুর, তোতা ইত্যাদি এবং গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু ও মহিষই প্রধান।

অধিবাসী—নাগা, কুকি, মিকির, কাছাড়ী ও মণিপুরীই প্রধান। বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে; ইহারা সমস্তই শ্রীহট্ট জিলা হইতে তথায় গিয়া বাস করতঃ তথাকার অধিবাসী বলিয়া পরিণত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পরগণা সমূহের অনেকটিতেই বাঙ্গালী অধিবাসী আছে। কাছাড়ের ২২টি পরগণার নাম আয়তন, তালুক বা পাট্টার সংখ্যা এই স্থলেই সন্নিবেশিত করা গেলঃ—

পরগণা, যথা—

নাম		আয়তন (বর্গ মাইল)	তালু· খ্যা	রাজস্ব (টাকা)
১.	উদারবন্ধ	৫৭	৩৭৮	০
২.	কাঠিগড়া	১৮	৩২৮	৫৭৯৯
৩.	কালাইন	২৩	৩১২	৭১২৮
৪.	গুমরা	২৫	২১০	৩২৬৬
৫.	চাতলাহাওর	১২৯	২৭৪০	৩০১৫৬
৬.	জয়নগর	২৬	২৫৮	৩৩৪২
৭.	জলালপুর	১০	১৭১	৩৩৫০
৮.	ডেভিড্সনাবাদ	৫৫	৯	৩২৬৬
৯.	ফুলবাড়ী	১০	১৯৮	৪০০৭
১০.	বনরাজ	১৬৩	২৪৫	১০৮৮৬
১১.	বড়খলা	৩৮	৪৩৩	১৪২৯৫
১২.	বর্ণাপুর	৩৭	৮৮৮	১৭৫৮৮
১৪.	বংশীকুণ্ড	৫৩	১৬৭	৩৪৩৮
১৫.	বিক্রমপুর	২২	৩৮৩	৭৮১৬
১৬.	যাত্রাপুর	১২	৩৯৩	৫১২৬
১৭.	রাজনগর	১০	১৯৮	৪০০৭
১৮.	[illegible]পাইর বালি	৩৩	১৮১	০
১৯.	লক্ষ্মীপুর	১০৫	৯২	৩০২৭৪

২০. লেভারপুতা	১০	১১২	১৯১৪
২১. সরসপুর	৭৪	৫৩২	০
২২. সুনপুর	৩০	৬২৯	০

বর্গমাইল ও টাকার ভগ্নাংশ এস্থলে লিখিত হইল না।

ঐতিহাসিক

পূর্ব্বকথা

কাছাড়ের পূর্ব্বনাম হৈড়ম্বদেশ। কথিত আছে যে, হিড়িম্বা নাম্নী রাক্ষসী এই স্থলে বাস করিত, তাহার গর্ভে ভীমের ঔরসে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। ঘটোৎকচ এই প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। হিড়িম্বার বাসস্থান বলিয়া এই প্রদেশ হৈড়ম্ব দেশ নামে অভিহিত হয়। কাছাড়ের শ্রীযুক্ত মণিরাম বর্ম্মা মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, কাছাড়ী জাতির মধ্যে প্রচলিত স্তব বাক্যে হৈড়ম্ব শব্দের অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী বটবৃক্ষ সমন্বিত পবিত্র স্থান। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন বারণাবত নগরার নিকটে হিড়িম্বার বাসস্থান ছিল, বর্ত্তমান কাছাড়ে নহে। কাছাড়-রাজবংশ কামরূপের ফা বংশীয় কোন রাজ্যভ্রষ্ট নৃপতি হইতে উদ্ভূত। পরে এই দেশে কাছাড়ী জাতি বসতি করে। গেইট সাহেবের মতে কাছাড়ী জাতির বাসভূমি বলিয়া ইহা কাছাড় নামে অভিহিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মতে, সংস্কৃত কচ্ছ শব্দ হইতে শ্রীহট্টীয় অপভ্রংশে কাছার (পর্ব্বত সন্নিহিত স্থান)। এবং তাহা হইতে কাছাড় নাম হইয়াছে, এবং কাছাড়ের প্রধান ও আদিম অধিবাসীই কাছাড়ী জাতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।[১] কিন্তু হিড়িম্বা নামের সহিত এই জাতির বাসস্থানের সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতে ছিল বলিয়াই জানা যায়। পূর্ব্বে ইহারা কামরূপে বাস করিত, তথা হইতে ক্রমে দক্ষিণাবর্ত্তী হইয়াছিল। কোচ জাতির উৎপাতে পরে ইহারা ডিমাপুরে আসিয়া বাস করে। তাদের মতে ঐ স্থান হিড়িম্বাপুর নামেই খ্যাত ছিল, পরে বৈদেশিক লেখকগণ হিড়িম্বাপুর তৎপর ডিমাপুর আখ্যা ধারণ করে। আবার কাছাড়ী জাতির সাধারণ উপাধি ডিমাচা। ডিমাচাগণ মধ্যে যাহারা রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিতেন বিষ্ণু অংশ বলিয়া পরবর্ত্তী কালে তাহারাই নারায়ণ উপাধি ধারণ করেন। এই ডিমাচাগণের বাসভূমিই ডিমাপুর নামে খ্যাত হওয়াও অসম্ভব নহে, যাহা হউক, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন লিপিমালাতেও কাছাড়ের রাজগণকে "হেড়ম্বেশ্বর" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে দৃষ্ট হয়।[২]

ডিমাপুরে কাছাড়ীদের প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক চিহ্ন এখনও পরিলক্ষিত হয়, যখন আহোম

১. "Mr. Gait is of opinion that the Cacharis have given their name to the district of Cachar." We might as well be told that the Ramans gave name the Rome. The fact is that the name has been given to the district by the Bengalis of Sylhet, because it is an outlying place skirting the mountains. The word "Kachhar" is still used in Sylhet in designating a plot of land at the foot of a mountain, It is derived from sanskrit "Kachchha" which means "a plain near mountain," or "a place near water" whence the name of the State of Katch in Bombay, the "Kacharis" are natually the natives of Kachar as the Bengalis are of Bengal.'
-A. Critical study of Mr. Gait's History of Assam by Prof. Padmanth Bidyabinod M. A. P. 14.

২. 'The Kachari king at that time was styled Lord of Hidimba.' From this time, the name Hidimba or Hiramba frequently occurs in inscriptions and other records. * * It has been suggested that it had long been the name of the Kachari kingdom, and that Dimapur is in reality a curruption of Hidimbapur.'
-Mr. Gaits' History of Assam. Chap. X.; P. 244.



সিংহদ্বার

জাতি ইষ্টক প্রস্তুত করিতে শিখে নাই, ডিমাপুরের অধিবাসীরা তখন এই নগরের তিন দিক ইষ্টক-প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়াছিল। প্রায় দেড় মাইল স্থান ব্যাপিয়া উক্ত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আছে। ডিমাপুরের দক্ষিণ দিকে প্রাচীর ছিল না, ধনশ্রী নদী ঐ দিক রক্ষার জন্য ক্ষিপ্রগতি প্রবাহিত হইতেছিল। পূর্ব্বদিকে মজবুদ ইষ্টক নির্ম্মিত জানালা যুক্ত প্রবেশদ্বার। ইহার অভ্যন্তরে এক স্থানে গড়ে পাঁচ ফিট পরিধি বিশিষ্ট দ্বাদশ ফিট দীর্ঘ খোদিত প্রস্তর-স্তম্ভ-শ্রেণী রহিয়াছে; সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভটির উচ্চতা ১৬ ফিট এবং বেষ্টন প্রায় ২৩ ফিট। অদ্যাপি সর্ব্বগ্রাসী কাল ঐ গুলি ধ্বংস করিতে পারে নাই। ইহার একটি আলোক চিত্র এস্থলে প্রদত্ত হইল।

জন প্রবাদানুসারে এই নগর প্রাচীন নৃপতি চন্দ্রধ্বজ, কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। দেশাঙ্গরাজ ডিমাপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন,—১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে একদা তিনি আহোমগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন ও পরাস্ত হইয়া ডিমাপুর পরিত্যাগ করেন। তদবধিই ডিমাপুর পরিত্যক্ত হয়।

সম্ভবতঃ তিনিই মাইবঙ্গ নগর প্রতিষ্ঠা করেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য মাইবঙ্গের চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত করা হয়। প্রাচীরের অভ্যন্তরে নানা মন্দির শোভিত নগরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আছে।

চিলারায়ের আক্রমণ

কিন্তু মাইবঙ্গের বাসও কাছাড়ীদের নিরাপদ হয় নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কোচরাজ নরনারায়ণের প্রসিদ্ধ সেনাপতি শুক্লধ্বজ ওরফে চিলারায়[৩] কাছাড় আক্রমণ করেন। তখন কাছাড়ে কে রাজা ছিলেন, জানা যায় না, হৈড়ম্বেশ্বর বলিয়াই তিনি উল্লেখিত হইয়াছেন। হৈড়ম্বেশ্বর চিলারায়ের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া ছিলেন, কিন্তু জয়লাভ করিতে পারেন নাই; পরাভূত হইয়া নরনারায়ণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কাছাড়ে বার্ষিক ৭০,০০০ টাকা ১০০০ মোহর ও ৬০টি হাতী কর নির্দ্ধারিত হয়।[৪] যখন কাছাড় রাজ্য বার্ষিক এই গুরুভার বহন করিতে সমর্থ ছিল, তখনকার কাছাড় অত্যুন্নত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র রায় কৃত মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ১ম খণ্ডের ২১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে এক সময় রংপুর হইতে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত কাছাড় রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হইয়াছিল।

মাইবঙ্গে অধুনা আবিষ্কৃত একটি প্রস্তর লিপিতে মহারাজ মেঘ নারায়ণের নাম ও ১৪৯৮ শকাব্দ (১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ) অঙ্কিত আছে;[৫] ইহাতে বোধ হয় যে প্রাগুক্ত "হৈড়ম্বেশ্বর" উপাধিতে এই মেঘনারায়ণই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকিবেন।

---

৩. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৪র্থ খণ্ড ১ম অধ্যায়ে চিলারায়ের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৪. "চিলারায়ের নিজর পরাক্রমের হিড়ম্বার রজাক যুদ্ধত ঘটাই করে কয়েক নরনারায়ণ রজার তলতীয়া করে। হিড়ম্বেশ্বর যুদ্ধত ঘাটিলত বছরি ৭০,০০০ টাকা ১০০০ সোণার মোহর আরু ৬০টা হাতী কর স্বরূপে শোধাবলৈ মান্তি হৈ নিজস্ব করতলীয়া রজা বুলি স্বীকার করে।" –শ্রীযুকত পদ্মনাথ বরুয়া প্রণীত "আসামর বুরঞ্জী" ৫ম অধ্যায় ২০ পৃষ্ঠা।

৫. "শুভমস্তু শ্রীশ্রীমেঘনারায়ণ দেব
হাচেঙসা বংশ জা হৈ
মাইবঙ্গ রাজত।
শাকাব্দা ৪। ১৪৯৮ বতেবিখ আষাঢ় ২৬।"

ঐতিহাসিক ইষ্টক

কাছাড় জিলার বহুলাংশ একসময় ত্রৈপুর রাজবংশীয়দের অধীনে ছিল। ত্রৈপুর রাজবংশীয়গণের রাজধানী যে কাছাড় জিলার স্থানে স্থানে ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে[৬] বলা গিয়াছে। কথিত আছে কোন কাছাড়াধিপতির পুত্র ত্রৈপুর রাজবংশে বিবাহ করিয়া, প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে কাছাড়ের দক্ষিণ দিগবর্ত্তী সমতল ভাগ যৌতুক প্রাপ্ত হন।[৭] ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হাইলাকান্দি প্রভৃতি স্থান যে ত্রৈপুর গণের অধীনে ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৮] হাইলাকান্দির নিকটে "শুভমস্তু শকাব্দা ১৪ ৯" অঙ্কিত ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে; ঐ ইষ্টকগুলি কোন দীর্ঘিকার ঘাটে ছিল। লোকের ধারণা যে, এই ইষ্টক গুলি ত্রৈপুর নৃপতি নির্ম্মিত।[৯]

নির্ভয় নারায়ণ ও রণচণ্ডী দেবী এবং পরবর্ত্তীরাজগণ

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতে কাছাড়ের ঐতিহাসিক বিবরণ একরূপ অবগত হয়। উক্ত শতাব্দীর প্রারম্ভে কাছাড়-রাজ শক্রদমন জয়ন্তীয়া পতি ধনমানিককে যুদ্ধে ঘোরতর রূপে পরাভূত করতঃ নিজের করপ্রদ করিয়া ছিলেন; তাহার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৪র্থ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল জয়ন্তীয়া-পতি নহে, বীরবর শক্রদমন আহোম-নৃপতি প্রতাপ সিংহকেও পরাজয় করেন এবং স্বয়ং প্রতাপনারায়ণ নাম ধারণ পূর্ব্বক রাজধানী মাইবঙ্গকে কীর্ত্তিপুর নামে অভিহিত করেন।[১০]

ইনিই কাছাড় রাজ-বংশাবলীতে নির্ভয় নারায়ণ নামে কথিত হইয়াছেন।[১১] গল্পে কথিত হইয়াছে যে একদা তিনি স্বপ্নদর্শনে নদী তীরে গিয়া সর্পরূপিনী রণচণ্ডী দেবীকে দর্শন করেন। বিষধর সর্পকে তাঁহার ভয় হইল না, দেবী জ্ঞানে নির্ভয় চিত্তে তাহার লাঙ্গুলে হস্তার্পন করিলেন; সর্প তৎক্ষণাৎ অসিতে পরিণত হইল! এই দেবীরূপী তরবারি লইয়া তিনি গৃহে আগমন করিলেন। পরে রাত্রে পুনঃ স্বপ্নে অবগত হইলেন যে, এই অসি সযত্নে সংরক্ষিত হইলে তৎকৃপায় রাজবংশে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করিবে না। এই তরবারি তথাপি রাজবংশে পূজিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রবাদ আছে যে, কাছাড়ের শেষ রাজার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে এই তরবারি রাজপ্রসাদ হইতে অপসৃত হইয়াছিল।[১২]

---

৬. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ১ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে দেখ।

৭. "There is a tradition that it was formerly included in the Kingdom, and was presented by a king of that country to a Kachari Raja who married his daughter, about three hundred years ago."
-Mr. Gait's History of Assam. Chap. X. P. 247.

৮. Pemberton's Report.,-1835 A. P.

৯. ১৪ এবং ৯ সংখ্যার মধ্যে একটা ০ ছিল বলিয়া বোধ হয়, উহা স্পষ্টরূপে পাঠ করা দুষ্কর, ০ হইলে ১৪০৯ শকাব্দ হয়।
See the Report on the Progress of the Historical researches in Assam P. 10.

১০. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৪র্থ খণ্ড ১ম অধ্যায় দেখ।

১১. আমরা কাছাড় হইতে যে রাজ বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি এবং ১৩০৯ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ মাসের শিলচর পত্রে যে বংশাবলী মুদ্রিত হয়, তাহাতে অনেক নামই অতিরিক্ত যোজিত বলিয়া বোধ হয় এবং নাম গুলি ক্রমানুযায়ী লিখিত হয় নাই। ঞ-পরিশিষ্ট (১) ও (২) আমাদের সংগৃহীত ও মিঃ গেইট সাহেবের প্রস্তুত বংশাবলী দেওয়া হইল।

১২. রণচণ্ডী দেবীর মন্দিরের চিত্র এস্থলে দেওয়া গেল।

শক্রদমনের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র নরনারায়ণ অত্যল্প কাল রাজ্য ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তদীয় খুল্লতাত ভীমবল সিংহাসনারোহণ করেন, ইনিই শক্রদমনের সহিত আহোমরাজের পূর্ব্ব কথিত যুদ্ধকালে সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র উক্ত বল্লভ কিছুদিন রাজ্য শাসন করেন, তৎপুত্র বীরদর্প নারায়ণ ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ইনি এক আহোম রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেও উভয় পক্ষে সদ্ভাব সংরক্ষিত হইতে পারে নাই। নিরূপিত কর প্রদান না করিলে তাঁহার রাজ্য আক্রান্ত হইবে বলিয়া ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হয়! ইহার সময়ে কাছাড় রাজবংশে হিন্দু ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে, রাজবংশীয়গণ শাক্তমতে দীক্ষিত হন। ইহার নিদর্শন স্বরূপ বীবদর্প নারায়ণ একটি শঙ্খে পৌরানিক দশ অবতারের চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখেন। চিত্রের নিম্নদেশে ১৫৯৩ শকাব্দ বীরদর্প নারায়ণেব রাজত্ব কালে ইহা খোদিত হয় বলিয়া লিখিত আছে।[১৩] ১৬৭১ খৃষ্টাব্দের পর তিনি জীবিত ছিলেন কি না, জানা যায় না।

শক্রদমনের পর গরুড়ধ্বজ নারায়ণ এবং তাহার পর মকরধ্বজ রাজা হন। কথিত আছে যে, ইঁহার সময়ে ব্রহ্মা সৈন্য মণিপুর আক্রমণ করিলে, ইনিই স্বকীয় সৈন্য সাহায্যে ব্রহ্মসৈন্য বিতাড়িত করেন। তৎপরবর্ত্তী রাজা উদয়াদিত্য। ইঁহারা গড়ে দশ বৎসর করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উদযাদিত্যের পরে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে তাম্রধ্বজ সিংহাসনারোহন করেন। কথিত আছে, তিনি কোচ বংশীয় জনৈক সেনাপতির কাঞ্চনা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে আহোম-পতি রুদ্রসিংহ সপ্ততি সহস্র সৈন্যসহ কাছাড় আক্রমণ কবেন ও মাইবঙ্গ অধিকার করেন· তাম্রধ্বজ পলায়ন পূর্ব্বক খাসপুর (ব্রহ্মপুর)[১৪] গমন করতঃ তথায় অবস্থিতি করেন। ইহার বিস্তৃত বিববণ ২য় ভাগ ৪র্থ খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

তাম্রধ্বজের পুত্র সুরদর্প নারায়ণ। জয়ন্তীয়ার অধিপতি জয়নারায়ণ সহ ইহার বিবাদ বাঁধিয়াছিল, সে কাহিনীও ইতিপূর্ব্বে চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

ইহার পরবর্ত্তী রাজা হরিশচন্দ্র নারায়ণ, বংশাবলীতে ইনিই সম্ভবতঃ ধর্ম্মধ্বজ নামে কথিত হইয়াছেন। মাইবঙ্গের গিবিগাত্রোৎকীর্ণ একটী মন্দিরের প্রস্তর লিপি হইতে জানা যায় যে, ১৬৪৩ শকে (১৭২১ খৃষ্টাব্দে) হৈড়ম্বেশ্বর হরিশচন্দ্র নারায়ণের রাজত্বে ইহা নির্ম্মিত হয়।[১৫]

---

১৩. উক্ত ঐতিহাসিক শঙ্খের প্রতিকৃতি এস্থলে প্রদত্ত হইল।

১৪. কাছাড়ের শ্রীযুত মণি রাম বর্ম্মা মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে বহু পূর্ব্বে জনৈক কাছাড়ী নৃপতির সহিত তদীয় কনিষ্ঠের বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি ডিমাপুর হইতে ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা কালীন অনুসঙ্গি কয়েকটি কোচ একস্থানে উপনিবেশ করে, তাহাদের নামানুসারে সে স্থান কোচপুর নামে খ্যাত হয়, পরে কোচপুর হইতে খাসপুর নাম হইয়াছে। তাম্রধ্বজের কোচ জাতীয়া রাণী গ্রহণ ও খাসপুর পলায়ন, পরস্পর সম্বন্ধ সূচক এই কথাটি যথার্থ বলিয়াই অনুমিত হয়। খাসপুর রাজবাটীর সিংহদ্বারের চিত্র এই স্থানেই সন্নিবেশিত হইল।

১৫. প্রস্তর লিপিঃ–

"শ্রীশ্রীরণচণ্ডী পদারবিন্দ মধুকরস্য
বগা গোহাই শ্রীশ্রী রা
হিড়ম্বেশ্বর শ্রীশ্রীযুত হরিশচন্দ্র নারায়ণ
নৃপস্য শক শুবমস্তু শকাব্দ ১৬৪৩
মার্গ শীর্ষস্য দ্বাদশ দিবস গতে ভূমিপুত্র
বাসরে পাষাণ নির্ম্মিতং প্রাসাদং সম্পূর্ণ মিতি।"

ইহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র নারায়ণ সিংহাসনারোহণ করেন। ১৬৫৮ শকে (১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ) ভাদ্র মাসে তিনি বড়খলাবাসী মণিরাম লস্করকে নিজ উজির (মন্ত্রী) নিয়োগ করেন। এই নিয়োগ পত্র হইতে জানা যায় যে কাছাড়ের মন্ত্রীপদ বংশানুক্রমিক ছিল। দ্বিতীয় পত্র খানা মন্ত্রী প্রতি অনুগ্রহ বিষয়ক অঙ্গীকার পত্র। দুখানি সনন্দই আলোক চিত্রের সহিত এস্থলে উদ্ধৃত করা গেলঃ—

শ্রীরাম

স্বস্থিঃ প্রচণ্ড দৌর্দ্দণ্ড ভব প্রতাপ দাবানল শলভিকৃত বৈরিনিকর (১) শরবিন্দু সুন্দর জশ (২) হেড়ম্বরপুর পুরিত পুরন্দর শ্রীশ্রীযুক্ত কির্ত্তিচন্দ্র নারায়ণ মহারাজা মহামহগ্র (৩) প্রচণ্ড প্রতাপেষু—

অভয় পত্র লিখনং

মিধং কার্জ্যঞ্চ—

---আর বড়খলার চান্দখা লস্করর বেটা (৪) মনিবামরে আমি জানিয়া কাচারির নিঅমে (৫) উজির পাতিলাম (৬) এতে (৭) অখন (৮) অবধি তুমার (৯) উজিরর বেটা ও নাতি ও পরিনাতি (১০) তার ধারা সূত্র (১১) ক্রমে এই উজির হৈআ (১২) জাইব (১৩) আর

--স্বস্থি-স্বস্তি। (১) বৈরী নিকর। (২) যশঃ। (৩) মহামহোগ্র। (৪) বেটা=পুত্র। (৫) নিয়মে। (৬) উজির পাতিলাম=মন্ত্রী করিলাম। (৭) এতে-ইহাতে (৮) এখন (৯) তোমার। (১০) পরিনাতি=প্রপৌত্র। (১১) ধারা সূত্র=ধারাসূত্রানুসারে, বংশানুক্রমে (১২) হইয়া। (১৩) যাইব। (১৪) মজুমদার--পদ বিং (১৫) হইব। (১৬) ভুইয়া=পদ বিং। (১৭) এতদর্থে। (১৮) কালকাদাল=কালে। (১৯) কোন দিন। (২০) দড়=দৃঢ়। (২১) ভাড়িব=বঞ্চনা করিব। (২২) চতুঃসীমা। (২৩) পূর্ব্বে (২৪) হাওর। (২৫) পশ্চিমে। (২৬) সীমা। (২৭) অর্থ বোধ হইল না। (২৮) জায়রে--জিম্বায় অর্থাৎ তত্ত্বাধীনে। (২৯) পূর্ব্বক। (৩০) চতুঃসীমায়। (৩১) সন্দেহ না আছে=সন্দেহ নাই। (৩২) রাজ্যের। (৩৩) মনুষ্য। (৩৪) যে। (৩৫) অর্থবোধ হইল না। (৩৬) করিয়া। (৩৭) করিনু=করিব। (৩৮) ভাদ্রস্য।

এই অভয় পত্রের এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারেঃ–

বড়খলা বাসী চান্দখাঁ লস্করের পুত্র মণিরামের বিষয় অবগত হইয়া "কাচারির" প্রথামত মন্ত্রী নিযুক্ত করিলাম। এখন হইতে বংশানুক্রমে তোমার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে মন্ত্রী হইবেক। এতদ্ব্যতীত মজুমদারের পুত্র মজুমদার ও বড় ভুইয়ার পুত্র বড় ভুইয়াই হইবেক। এই বিধি কালানুক্রমে সুদৃঢ় থাকিবে, কাহাকেও বঞ্চনা করা হইবে না। আর---এই চতুঃসীমায় তোমাকে ভূমি দেওয়া গেল, এই দান সম্বন্ধেও কোন সংশয় নাই। এ রাজ্যের যে ব্যক্তি উজিরের বাক্যানুসারে না চলিবে---তাহার সর্ব্বস্ব দণ্ড করিব। এতদর্থে অভয় পত্র দিলাম। ইতি।

(১) চণ্ডী। (২) সাক্ষি। (৩) স্বস্তি। (৪) প্রতাপেষু। (৫) যত। (৬) এত। (৭) যদ বুনিয়াদ=যতদিন বংশ থাকিবেক। (৮) হাকিমতি=হাকিমের ক্ষমতা। (৯) তোমারে। (১০) এতে=ইহাতে। (১১) আইল=আলবাল। (১২) সীমা। (১৩) বিষয়েতে। (১৪) যে। (১৫) রক্ষা। (১৬) করিব। (১৭) মহা মহা। (১৮) অপরাধ। (১৯) ৭ শাঠা=সাতটা। (২০) ক্ষেমিয়া=ক্ষমা করিয়া। (২১) করিব। (২২) অপন্যায়=অন্যায়। (২৩) সাস্তি=দণ্ড। (২৪) লবন। (২৫) বেকবুল-অস্বীকার। (২৬) ভুলিব। (২৭) সত্য ৭=সাত সত্য।

এই অভয় পত্রের এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারেঃ–বড়খলাবাসী চান্দ লস্করের পুত্র মন্ত্রি মণিরামের প্রতি-যতদিন আমার রাজ্য সম্পদ থাকিবে, ততদিনের জন্য মন্ত্রীত্ব ও তদনসঙ্গীয় জমিদারী তোমাকে দিলাম, ইহা তোমার বংশাবলী ক্রমে থাকিবেক। তোমার প্রাপ্ত ভূমির সীমাদি লঙ্ঘন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি হিংসা করিবে, তাহাকে প্রাণদণ্ড করিব। এ বংশ তোমার বংশীয়কে পালন করিবেক। তোমার মহা মহা অপরাধ হইলে সাতটা অপরাধ ক্ষমা করতঃ তৎপর দণ্ড দেওয়া যাইবে। তোমার বংশীয় কেহ এ বংশ ইহাতে দণ্ড পাইবে না। এ অনুগ্রহ ভূলিলে (অস্পষ্ট) এ অঙ্গীকার ভুলিব না।

সাত সত্য। ইতি।

মজুন্দারের (১৪) বেটা মজুন্দার হৈব (১৫) আর বড় ভুইআর (১৬) বেটা বড় ভুইআ হৈব এতধর্থে (১৭) অভয় দিলাম এতে কাল কাদাল (১৮) কুনদিন (১৯) এই বাক্য দড় (২০) কুন জনে না ভাড়িব (২১) আর চতুরসিমা (২২) পূর্ব্বে (২৩) বল্লা হাহর (২৪) ও আভঙ্গ পশ্ছিমে (২৫) তহিরর পশ্ছিমর শিমা (২৬) এই তাহিররে (২৭) বড়খলার জায়রে (২৮) দিলাম আর উত্তরে পানিঘাট দক্ষিণে বড়বরাক এই পূর্ব্বক (২৯) চতুর স্থিমাএ (৩০) দিলাম এতে কুন সন্দেহ না আছে (৩১) আর রাজ্যর (৩২) মনুশ্য (৩৩) জে (৩৪) জনে উজিরর বাক্যে না চলে মেল দেয়ান (৩৫) হেলা করিআ (৩৬) (অস্পষ্ট)---সর্ব্বদণ্ড করিমু (৩৭) এতদর্থে অভয় পত্র দিলাম ইতি শক ১৬৫৮ ।২৯ ভাদ্রশ্য" (৩৮)

১৪ চণ্ডি (১) শাক্ষি (২)

"---স্বস্থি (৩) প্রচণ্ড দৌর্দ্দণ্ড ভব প্রতাপ দাবানল শলভিকৃত বৈরি নিকর শরদি সুন্দর জশ হেড়ম্বপুর প্রপুরিত পুরন্দর শ্রীশ্রীযুক্ত কির্ত্তিচন্দ্র নারায়ণ মহারাজা মহামহগ্র প্রচণ্ড প্রতাপষু (৪)—

অভয় খাতিল জমা

পত্র লেখিতং কাজ্যঞ্চঃ—

বড়খলার চান্দ লস্কর বেটা মণিরাম উজির গং (অস্পষ্ট) প্রতি আর আমার বংশেত জত (৫) দিবস রাজ্য সম্পদ আছে অত (৬) দিবস জদ বুনিআদ (৭) বংশাবলি হাক্ষিমইতি (৮) জমিধারি তুমারে (৯) দিলাম এতে (১০) তুমার আইল (১১) শিমাউ (১২) বিসএত (১৩) জে (১৪) হিংসা করে তার প্রাণ বৈক্ষা (১৫) না করিমু (১৬) আর আমার বংশে তুমার বংশরে পালন করিব মহা ২ (১৭) অপরাদ (১৮) পাইলে ৭ শাঠা (১৯) অপরাদ খেমিআ (২০) উচিত দণ্ড করিমু (২১) আর আমার বংশে তুমার বংশরে অপনিআয় (২২) শাস্থি (২৩) না করিমু তুমার বংশে আমার নুন (২৪) বেকবুল (২৫) করে (অস্পষ্ট) এই খাতিল জমাত না ভুলিমু (২৬) সত্য ৭ (২৭) এতেরিক্তে খাতিল জমা পত্র দিলাম। ইতি শক ১৬৫৮ তারিক ২৯ ভাদ্রস্য।"

এই দুখানা দলিল হইতে জানা যায় যে, কাছাড়ের মন্ত্রী জায়গীর পাইতেন, কোন ব্যক্তি মন্ত্রীকে হিংসা করিলে গুরুতর রাজদণ্ড ভোগ করিত। মন্ত্রী সাতবার "মহা অপরাধ" করিলে অব্যাহতি পাইতেন। "মহা অপরাধ" অর্থে হত্যা;—অদ্যাপি তদঞ্চলে মন্ত্রীর "সাত খুন মাফ" পাওয়ার কথা প্রবাদরূপে লিখিত আছে।

এই দুখানা দলিল হইতে ১৭৬ বৎসর পূর্ব্বে কাছাড়ে ব্যবহৃত বঙ্গভাষার কথাও প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। জয়ন্তীয়ায় প্রচলিত "পাতিলাম" প্রভৃতি শব্দও এই দলিলে দৃষ্ট হয়। প্রাচীন দলিল মাত্রেই বর্ণাশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য থাকা দৃষ্ট হয় না, —ইহাতেও নাই। ২য় দলিল খানার শীর্ষে "১৪ চণ্ডী" দেবীর নাম ত্রিপুরা রাজ্যের প্রসিদ্ধ ১৪ দেবতার স্মারক কি না বিবেচ্য।

মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের পর রামচন্দ্র রাজা হন। গেইট সাহেব ইঁহারই নাম "সন্ধিকারী" দিয়াছেন। বংশাবলীতে রাজার নাম রামচন্দ্র ছিল বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। রামচন্দ্রের শাসন সময়ে ত্রিপুরাধিপতি কাছাড় আক্রমণ করিয়াছিলেন; রামচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া তৎসহ সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে আহোমরাজ রাজেশ্বর সিংহের দূত ইঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তৎপ্রতি অসদ্ব্যবহার করায় আহোমরাজ ক্রুদ্ধ হন ও সেনাপতি বড়বড়ুয়াকে সসৈন্যে প্রেরণ

করেন। আহোম সৈন্যের আগমনে কাছাড়পতি ভীত হইয়া আত্মসমর্পণ করেন ও রাজেশ্বর সিংহ সন্নিধানে নীত হন। তখন রামচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া সন্ধি করতঃ আত্মমোচন করেন। সন্ধিকারী রাজা রামচন্দ্র ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

ইঁহার পরে হরিশচন্দ্র ভূপতি সিংহাসনারোহণ করেন, ইঁহার সিংহাসনারোহণের পরে রাজমাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর অভিপ্রায়ে তদানীন্তন রাজধানী খাসপুরে ১৬৯৩ শকে (১৭৭১ খৃষ্টাব্দে) এক নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।[১৬]

এই প্রাসাদ সংলগ্ন (এক হাত দীর্ঘ ও তিন পোয়া প্রস্থ) প্রস্তরের লিপি এস্থলে দেওয়া গেলঃ—

"শ্রীশ্রীনন্দনন্দনাজ্ঞয়া নেত্রাঙ্করস চন্দ্রমিতে
শাকে কার্ত্তিকস্থিতে ভাস্করে হেড়ম্বাধিপতি
শ্রীশ্রীমদ্ধরিশ্চন্দ্র নারায়ণাভ্যুদয়িনি রাজ্যে
তদন্তর্গত খাসপুর নাম নগরে----তৎপাদ
পঙ্কজ মকরন্দ লোলুপমানা শ্রীল শ্রীমতী
রাজ মাতা লক্ষ্মী প্রিয়াদেবী সাধিতেষ্টকাদি
নিচয় নির্ম্মিত বিচিত্র প্রাসাদভিরাম।"

তাঁহার মন্ত্রীর নাম জয়সিংহ বর্ম্মা ছিল। তিনি বর্ণারপুরের নিকট চন্দ্রগিরিতে এক মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শিব স্থাপন করেন। মন্দির সংলগ্ন লিপিতে "শ্রীযুক্ত জয়সিংহ মহাপাত্র—১৭০৬ শকাব্দ" লিখিত আছে। মহারাজ হরিশচন্দ্রের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র ও কনিষ্ঠের নাম গোবিন্দ চন্দ্র।

কাছাড়ের রাজধানী

ত্রৈপুর রাজধানীর ন্যায় কাছাড়ের রাজধানী উত্তর হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়াছে দেখা যায়। শিলচর হইতে প্রাচীনতম ডিমাপুর প্রায় একশত মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। ডিমাপুরের পর মাইবঙ্গের প্রতিষ্ঠা, ইহার অবস্থান বর্ত্তমান রাজধানী শিলচরের প্রায় পঞ্চাশৎ মাইল উত্তরে। তাহার পরেই খাসপুরে রাজধানী স্থাপিত হয়, ইহাও শিলচর হইতে কিঞ্চিদধিক দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। উদারবন্দ পরগণা স্থিত শিবরবন্দ মৌজায় উক্ত রাজপাট ছিল। ঐ স্থানে মহারাজ হরিশচন্দ্র ও তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দ চন্দ্রের নামে আখ্যাত তিনটি ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ আছে। তন্মধ্যে 'হরিশচন্দ্র রাজার পাট' নামে পরিচিত প্রাসাদের মেজটি দৈর্ঘ্যে ১২ ফিট প্রস্থে ৮ ফিট এবং চতুর্দ্দিগস্থ বারেন্দাগুলি ৪ ১/২ ফিট প্রশস্ত। খাসপুরের রাজবাটীর সিংহদ্বারের ও রণচণ্ডী দেবীর মন্দিরের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

রাজনগর পরগণায়ও প্রাচীন রাজকীর্ত্তির অনেক নিদর্শন আছে। উক্ত পরগণায় হাতীরহাড় নামক গ্রামে "গোয়ারের জঙ্গাল" বলিয়া খ্যাত দুইটি বাঁধ আছে, উহা ঘাঘরা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমদিগের বাঁধটির কোন কোন স্থান প্রায় ১০০ ফিট প্রশস্ত, ইহার উচ্চতা ১০ ফিট হইবে, ইহার নিম্নদেশে প্রায় দুই ফিট খনন করিলে একটা প্রাচীর পাওয়া যায়, ইহাও প্রায় ১৪০ ফিট দীর্ঘ এবং ছয় ফিট উচ্চ হইবে। জনপ্রবাদানুসারে তিপ্‌রা জাতীয়দের এদেশ আক্রমণ কালে উহা বিনির্ম্মিত হইয়াছিল।

---

১৬. See the Report on the Progress of the Historical Research in Assam.-1897. P 10.

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র

পিতার পরলোকগমণের পর কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কাছাড় রাজসিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ব্রাহ্মণ গুরুতর অভিপ্রায় লইয়া রাজ কার্য্য করিতেন বলিয়া কথিত আছে। যোগশাস্ত্রে পারদর্শী পঞ্চখণ্ড পরগণাবাসী গোপীনাথ শিরোমণি তাহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহাকে তিনি অনেক নিষ্কর ভূমিদান করেন।[১৭] সমগ্র কাছাড় জিলায় এই দান প্রাপ্ত ভূমিটুকু ব্যতীত আর দশসনা মহাল নাই। গেইট স্বীয় আসামের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, ইহার সময়েই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তাঁরা ভীমপুত্র ঘটোৎকচ বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতে ও আপনাদিগকে হিন্দু ও ক্ষত্রিয় জাতি বলিতে শিক্ষিত হয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মণিপুর রাজবংশে বিবাহ করেন ও শ্বশুরের উদাহরণে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অনেকের মতে ইহাই কাছাড় রাজবংশের হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ; বস্তুতঃ তাহা ভ্রান্ত ধারণা। মহারাজ সুরদর্প নারায়ণ প্রথম হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করেন; তদঙ্কিত শঙ্খ-চিত্রই তাহার প্রমাণ। কৃষ্ণচন্দ্রের বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের পরেই খাসপুরে বিষ্ণু মন্দির, দ্বাদশচক্রের মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিষ্ণু মন্দিরের চিত্র এস্থলে প্রদত্ত হইল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় আগা মোহাম্মদ রেজা নামক জনৈক মোগল কর্ত্তৃক খাসপুর আক্রান্ত হয়, কৃষ্ণচন্দ্র গোয়াবাড়ী নামক স্থানে পলায়ন করেন। বিজয়োন্মত্ত মোগল খাসপুর অধিকার করিয়া বদরপুর আক্রমণ করে, সে বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে[১৮] বর্ণনা করা গিয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে কাছাড় ও শ্রীহট্টের সীমা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। সীমা নির্দ্ধারণ জন্য গবর্ণমেন্ট পক্ষে শ্রীহট্টের এক আমীন গমন করেন ও সীমা স্থলে এক খালা খনন করা হয়। রাজ পক্ষীয় লোকেরা পরে সীমানাস্থিত এই খাল ভরাইয়া দেয় ও শস্য কাটিয়া লইয়া যায়। চাপঘাট পরগণাও এইরূপ ঘটনা ঘটে। এই সকল বিরক্তিকর ব্যাপার নিবারণের জন্য বদরপুরের দুর্গাধ্যক্ষ তীব্রভাবে আদিষ্ট হন। পরে অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, বিবাদীয় ভূমির অধিকাংশ যথার্থই কাছাড় রাজ্যের অন্তর্গত।[১৯] সুতরাং গবর্ণমেন্ট আর অগ্রসর হন নাই।

১৭. দানপত্রের প্রতিলিপি এইঃ–

"শ্রীশ্রীহেড়ম্বাধীপরাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রধ্বজ নারায়ণ বাহাদুর নৃপ-সম্মত-দান পত্রিকেয়ম।
গোপীনাথেতি বিখ্যাতঃ কুলীনশ্চ শ্রিয়ান্বিতঃ
প্রত্যক্ষ সাধকস্ত্বহি নাড়ী শোধন কর্ম্মভিঃ।
শ্রীহট্টান্তর্গতে মন্যো বংশ (অস্পষ্ট)
ইষ্টং মত্বা চ যং বিপ্রং সম্ভ্রমান্নত কন্দরঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহীশেন যত্র নম্রী কৃতং শিরঃ
ভূষা শিরোমণিস্তস্য সঙ্গতা প্রাজ্ঞ সম্মতা।
দানাহ মীদৃশং পাত্রং শাস্ত্রো---সমীক্ষচ।
প্রদত্তা ভবতে ভূমিঃ শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মণ।
শিরোমণিত্যু (অস্পষ্ট) পঞ্চখণ্ডাধিবাসিনে,
নিষ্কং ভুঞ্জতাং তান্নিম্নে যসীৎ সীমাকৃতা।
স্থাস্যত্যা সন্ততেঃ সাতু ভবন্নাম্না প্রভাষিতা।"

ইহার পরে ভূমির চতুঃসীমা ও পরিমাণ লিখিত ছিল, অক্ষর অস্পষ্ট ও অপাঠ্য বিধায় উদ্ধৃত হইল না। গোপীনাথ শিরোমণির জীবন চতুর্থ ভাগে দেওয়া যাইবে।

১৮. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায় দেখ।

১৯. Allen's Assam District Gaxetteers Vol. II. (Sylhet), P. 38.

মণিপুর

রাজধানী ও রাজবংশ

ইহার পর নানাকারণে মণিপুরের সহিত কাছাড়ের বিশেষ সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। এ স্থলে তাই মণিপুরের কথা একটু বলা প্রয়োজন। কাছাড়ের পূর্ব্বে সীমায় মণিপুর রাজ্য অবস্থিত, ইহার উত্তরে নাগা পাহাড়, দক্ষিণে লুশাই পাহাড় ও ব্রহ্ম দেশ এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ। আয়তন ৮৪৫৬ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ৮৪৪৬৫ জন। প্রধান নগর ইমফাল, লগতাক নামক সুবিস্তৃত হ্রদের সন্নিধানে অবস্থিত, উক্ত হ্রদের সংলগ্নভাবে লিমফেল ও তেইওল নামক বিস্তৃত ঝিল বিদ্যমান। এক সময় ইহারা লগতাকেরই অংশ ছিল, তৎকালে এই লগতাক সাগর সদৃশ প্রতীয়মান হইত, সন্দেহ নাই।

মণিপুরের অধিবাসী মণিপুরী জাতি অত্যন্ত পুষ্প প্রিয়। সর্ব্বদা সুন্দর ফুল, পুষ্পগুচ্ছ ও পত্রস্তবকাদি কাণে দেয়, কীর্ত্তনাদি উপলক্ষ পাইলেই গলদেশে পুষ্পমালা ধারণ করে, কপালে তিলক কাটে ও দেহ চন্দন চর্চ্চিত করে। কুমারীরা সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন থাকে ও সঙ্গীত ইহাদের অতি প্রিয়। এই মণিপুরীদের আচার ব্যবহার সে কথা স্মৃতিপথারূঢ় করিয়া দেয়।

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন মহেন্দ্র পর্ব্বত দর্শনের পর সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত মণিপুরাধিপতি চিত্রবাহন-দুহিতা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ পত্তনের পাশ্বস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী বর্ত্তমান মনফুরকেই কেহ কেহ মণিপুর বলিয়া অনুমান করেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ১ম খণ্ড প্রথম অধ্যায়ের শেষে টীকা প্রসঙ্গে[২০] আমরা মণিপুরের অবস্থান বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী প্রাগজ্যোতিষ, কৌণ্ডিল্য, শোণিতপুর (তেজপুর) প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্যনগরী সমূহের অবস্থানের সহিত নাগরাজ-রাজ্য নাগাপাহাড় এবং তদ্দক্ষিণাদিগ্বর্ত্তী মণিপুর রাজ্যের সংস্থিতি প্রভৃতি চিন্তা করিলে এই মণিপুরকেই মহাভারতোক্ত মণিপুর বলিতেই মনে হয়। পূর্ব্বোক্ত ঝিলাদি সমন্বিত লগতাক তৎকালে সাগর সদৃশ ছিল এবং তাহাই যে সাগর বলিয়া বর্ণিত হয় নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না।[২১] আবার স্থান বিশেষের রাজবংশ অজ্ঞাত কারণে ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করায় সে স্থানও পূর্ব্ব নামে পরিচিত হওয়াও অসম্ভব নহে।

নাগারাজ্য ও মণিপুর যেরূপ পাশাপাশি, এই উভয় রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যেও তদ্রূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। মণিপুর রাজ্যের রাজগনের অভিষেক কালীন সর্পের মূর্ত্তিময় অঙ্গত্রাণ ইত্যাদি ধারণ করায় এই সম্বন্ধ সূচিত হয়। কোন কারণে মণিপুরীদের জাতিপাত ঘটিলে নাগান্ন ভক্ষণে তাহারা সমাজে পুনঃ গৃহীত হওয়ার প্রথা পরস্পরের সম্পর্কই বিজ্ঞাপিত করে। কিন্তু চতুর্দ্দিকস্থ অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির তুলনায় মণিপুরীদিগকে সুসভ্য বলা যাইতে পারে, ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি দৃষ্টে গন্ধর্ব্ব জাতি বলিয়া তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা হয়।

প্রাচীন কাহিনী

মণিপুরের পূর্ব্ব ইতিহাস একরূপ অজ্ঞাত হইলেও নাগাজাতীয় নৃপতি প্রসিদ্ধ পেম হেইবার পূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে ৩৬ জন নরপতির রাজ্যশাসন কথা শুনা যায়। পেমহেইবা মণিপুর-রাজ্যের দত্তক পুত্র ছিলেন, ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতাকে নিহত ক্রমে গরীব নয়াজ নাম ধারণ পূর্ব্বক

২০. ১২ পৃষ্ঠা দেখ।

২১. খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে শ্রীহট্ট ও সাগর তীরে ছিল?



বিষ্ণু মন্দির

সিংহাসনাধিকার করেন; ইহার রাজত্বকাল ৪০ বৎসর; এই সময়ে ব্রহ্মরাজ্যও মণিপুরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গরীব নয়াজের ২য় পুত্র জিটসই ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামসইকে নিহত করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন, কিন্তু পাঁচ বৎসর মাত্র রাজত্ব করার পর সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুরুটসহ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। ইনি দুই বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন; তৎপর শ্যামসইর পুত্র গুরুশ্যাম রাজা হন। ইনি নিজ ভ্রাতা জয়সিংহ ভাগ্যচন্দ্রকে সাহায্যার্থে রাখেন। ভাগ্যচন্দ্রই পরে মণিপুরের রাজা হন, ইহার সময়েই মণিপুরে গোবিন্দজী স্থাপিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর কয়েকবার মণিপুর ব্রহ্মসৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রহ্মসৈন্য কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কাছাড়ে পলায়ন করেন; ভাগ্যচন্দ্র বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যের পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নবদ্বীপ গমন করেন, কিন্তু ভগবানগোলার সন্নিকটে পদ্মাগর্ভে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

কাছাড় রাজ্যের অসহায়তা

তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র হর্ষচন্দ্র (মতান্তরে রবীন চন্দ্র) তিন বৎসর রাজত্ব করেন। মধুচন্দ্র নামে তাঁহার দূর সম্পর্কিত এক ভ্রাতা তাহাকে নিহত করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু মধুচন্দ্রেরও ভাগ্য বড় সুপ্রসন্ন ছিল না। তিনিও নিজ ভ্রাতা কর্ত্তৃক উত্যক্ত হন, প্রকৃতই ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মণিপুরে বিষম অন্তর্বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। মধুচন্দ্র (মধুসিংহ) স্বীয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া, কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন।[২২] কৃষ্ণচন্দ্র ৫০০ সৈন্য সহ তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মধুসিংহ প্রাণত্যাগ করেন। তৎপর ব্রহ্মরাজ মণিপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং তখন মারজিৎকে বাধ্য হইয়া কিয়ৎকালের জন্য মহারাজ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে কাছাড়ে আসিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে কাছাড়াধিপতির ভ্রাতা গোবিন্দ চন্দ্র অতিথি মারজিতের একটা মনোহর অশ্ব বলক্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২৩] এ ঘটনার তিন বৎসর পরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহারাজ গোবিন্দ চন্দ্র

কৃষ্ণ চন্দ্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দ চন্দ্রই সিংহাসনারোহন করেন। গোবিন্দ চন্দ্র সিংহাসনারোহন করিয়া রাজ্যের বিধি ব্যবস্থা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। এই সময়ে তিনি কাছাড়ের আইন সংস্কার নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত তৎপ্রবর্ত্তিত দণ্ডবিধি ইত্যাদি বিষয়ক কয়েকটি আইনের মূল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে,—দণ্ডের মধ্যে অর্থ দণ্ডই অধিক ছিল। ব্রাহ্মণকে প্রায়ই দণ্ডভোগ করিতে হইত না, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণোৎপীড়নকাবী গুরু দণ্ডে দণ্ডিত হইত। হস্তদ্বারা যে ব্রাহ্মণকে আঘাত করিত, তাহার হস্ত ছেদন করা যাইত। ব্রাহ্মণের একাসনে উপবেশন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত এবং নিতম্বের মাংশছেদনই ইহার দণ্ড ছিল। স্বর্ণ রত্নাদি বিষয়ে বঞ্চনা করিলে নাসিকা ও হস্তছেদনই দণ্ড ছিল। চুরের প্রতি গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ঘোড়া, হাতী, গরু প্রভৃতি হরণ কারীর হস্তপদ ছেদিত হইত। শত পণ স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং ২০ দ্রোণ ধান্য হরণে মৃত্যুদণ্ড বিহিত ছিল। কিন্তু চোর ব্রাহ্মণ হইলে তাহার দণ্ড অপমান, কারণ "ব্রাহ্মণের যে অপমান, সেই বধের তুল্য।" ভয় প্রদর্শন করিয়া কেহ

২২. Hunter's Statistical Accounts of Assam. Vol. II. (Sylhet) P. 120.

২৩. শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস ৩য় ভাগ ১ম অধ্যায় ২৬৩ পৃষ্ঠা।

কার্য্যোদ্ধার করিলে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইত। অসমর্থ বৃদ্ধ পোষণ না করিলেও অর্থদণ্ড দিতে হইত। নীচ জাতি অন্য জাতীকে অপমান করিলে বিশেষরূপে দণ্ডিত হইত। সাধারণতঃ সুরাপানে গুরুদণ্ডই বিহিত ছিল, ব্রাহ্মণকে সুরাপান করাইলে বধদণ্ড নির্দ্দিষ্ট ছিল। "লশুণ" অপবিত্র বস্তুর মধ্যে গণ্য হইত এবং উচ্চ জাতিকে ভক্ষণ করাইলে দণ্ডিত হইতে হইত। অপরাধী স্ত্রীলোকের প্রতি অবস্থানুসারে দণ্ডের গুরুত্ব ছিল,— অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক পুরুষকে বিষ বা অগ্নিদ্বারা নিহত করিয়া তাহাকে জলে ডুবাইয়া মারাই বিধি ছিল। স্ত্রীলোকের প্রতি বলৎকার করিলে অপরাধীকে লৌহ কটাহে রাখিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া দগ্ধ করা হইত। বলৎকার ব্যতীত অর্থ দণ্ডই বিহিত ছিল। এতদ্দেশে বিন্না নামে দীর্ঘপত্র বিশিষ্ট স্বনাম প্রসিদ্ধ একরূপ তৃণ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, যে গৃহ দাহ করে, শয্যাদি নাশ করে ও রাজপত্নী গমন করে, উক্ত বিন্না তৃণের পত্রাচ্ছিদিত করিয়া তাহাকে অগ্নিদগ্ধ করতঃ হনন করাই বিধি ছিল; কিন্তু বধ্য ব্যক্তি ১০০ শত মোহর দিতে পারিলে অব্যাহতি পাইত। অঙ্গচ্ছেদ দণ্ডে দণ্ডনীয় ব্যক্তির অব্যাহতি পাইতে হইলে ৫০টি মোহর প্রদান নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাজাজ্ঞা খণ্ডনকারীর কিন্তু কিছুতেই অব্যাহতির পথ ছিল না। এরূপ বিশেষ বিশেষ অপরাধে গুরুদণ্ড ব্যবস্থিত থাকিলেও লোক সাধারণতঃ নীতি বিহীন কার্য্য করিতে ভীত হইত, কাজেই কচিৎ এইরূপ দণ্ড লোকে ভোগ করিত।

এই আইন গুলির যে জীর্ণ শীর্ণ মূল পুস্তক আমাদের হস্তগত হয়, তাহাদের উপর ও নীচ দিক পঁচিয়া নষ্ট হইয়া পড়ায় অপাঠ্য হওয়ায় সমুদায় পাঠ করা হয় নাই। রাজকীয় উক্ত জীর্ণ আইন সর্ব্বধ্বংসী কালের হস্ত হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে। যতদূর পাঠকরা যায়, অপরিবর্ত্তিত ভাবে উপসংহারের টিকাধ্যায়ে তাহা যোজিত হইল। এতদ্বারা এদেশীয় পরবর্ত্তী হিন্দু নৃপতি বর্গের প্রচারিত আইনের নমুনা ও শাসননীতির আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

মহারাজ গোবিন্দ চন্দ্র এই সময় স্বনামাঙ্কিত মুদ্রাও প্রচারিত করিয়া ছিলেন, এই সময়কার একটী কাছাড়ী রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; ইহার একদিকে "গোবিন্দ চন্দ্র রাজেন্দ্র" বাহাদুরের নাম ও অপরদিকে "হেড়িম্ব পুরধীশ শ্রীরণচণ্ডী পদাজুষ" ইতি বাক্যে অঙ্কিত। গোবিন্দ্র চন্দ্র খাসপুরে প্রসিদ্ধ "স্নান মন্দির" প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহা অদ্যাপি অভগ্নাবস্থায় আছে। এস্থলে উক্ত স্নান মন্দির এবং তৎপ্রচারিত মুদ্রার চিত্র দেওয়া গেল।

মারজিতের আক্রমণ

মণিপুর-পতি মধুসিংহের উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করা গিয়াছে, তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা গম্ভীরসিংহকে গোবিন্দ চন্দ্র নিজ সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গম্ভীরসিংহ মারজিতের চির বিরোধী ছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মারজিত কাছাড়া আক্রমণ করেন। গোবিন্দ চন্দ্রও বাধা দিতে অগ্র হইলেন, কিন্তু সেনাপতি গম্ভীরসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ভ্রাতৃপক্ষে যোগ দেন। গোবিন্দ চন্দ্র ভাবেন নাই যে মণিপুর-বীর গম্ভীরসিংহ ব্যক্তিগত ভাবে ভ্রাতার বৈরী হইলেও এক্ষণে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া শ্যামল পর্ব্বতমালা-বিলাসিত স্বদেশ "মিতাই ভূমিকে" তিনি পরাধীন করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন না; গোবিন্দ চন্দ্রের সমস্ত আশা ভরসা নির্ব্বাপিত হইল; এই অচিন্তিত পূর্ব্ব বিপৎপাতে গোবিন্দ চন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া শ্রীহট্টে আগমন পূর্ব্বক ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থী হন। কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে নিরাশ হইতে হয়।

গোবিন্দচন্দ্রের সেনাপতি স্বরূপে গম্ভীরসিংহ মারজিতকে পরাজিত না করিলেও একাঙ্গ ভাবে তৎপক্ষে যোগ দেন নাই। তাঁহার অপর ভ্রাতা চৌরজিৎ নির্ব্বাসিত ভাবে জয়ন্তীয়ায়



স্নান মন্দির

ছিলেন, গম্ভীরসিংহ তাঁহাকে আহ্বান করেন। ভ্রাতার আহ্বানে তিনি সসৈন্যে কাছাড়ে আগমন করিলে ভয়ে মারজিত মণিপুরে প্রস্থান করেন। চৌরজিৎ কাছাড়ের দক্ষিণ দিক আয়ত্ত করিয়া লন।

ইহার পরবর্ষে ব্রহ্মরাজ জয় করেন; মারজিৎ বিপৎকালে কাছাড়ে আগমন পূর্ব্বক ভ্রাতা চৌরজিৎ ও গম্ভীর সিংহের সহিত সন্ধি করিয়া কাছাড়ে বাস করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তথায়ও তিনি শান্তি লাভে সমর্থ হইলেন না, ব্রহ্মরাজ তাহার অনুসরণে কাছাড় আক্রমণ করেন। মারজিৎকেও গোবিন্দচন্দ্রের সমদশা লাভ করিতে হইল,—তিনিও ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থী হইলেন।

ব্রহ্ম যুদ্ধ ও বদরপুরের সন্ধি

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ গবর্ণর জেনারল ব্রহ্মযুদ্ধ ঘোষণা পত্রে লিখিত হয় যে গবর্ণমেন্টের আশ্রিত কাছাড় রাজ্যে ব্রহ্ম সেন্য প্রবেশ করায় গবর্ণমেন্ট অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। যে দিবস লর্ড আমাহার্ষ্ট এই ঘোষণা প্রচার করেন, তাহার পরদিন গবর্ণরজেনারলের এজেন্ট স্কল সাহেব বদরপুরে গোবিন্দচন্দ্রের সহিত সন্ধি পত্র সাক্ষর করেন, তাহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বহিঃশত্রু হইতে চিরদিন কাছাড় রাজ্য রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহাও নির্দ্ধারিত হয় যে যুদ্ধাবশানে কাছাড়পতি দশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক কর প্রদান করিবেন।

জুন মাসে বারশত সৈন্য লইয়া কর্ণেল ইনেস (Colonel Innes) সাহেব কাছাড় যাত্রা করতঃ যাত্রাপুর অধিকার করেন; যাত্রাপুর অধিকৃত হওয়ার পর দুধপাতিল নামক স্থান অধিকৃত হয় এবং মণিপুর পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুতের জন্য কার্য্যারম্ভ হয়। কিন্তু বৃষ্টি প্রভৃতির প্রতিবন্ধক ও স্থানের দুর্গমতায় রাস্তা প্রস্তুতের কাজ অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই উদ্যমে বহুতর বলীবর্দ্দ ও অনেকটি হস্তী বিনষ্ট হয়, ইনেস চালিত সৈন্যও কাছাড় উদ্ধারাস্তর প্রতি নিবৃত্ত হয়। ব্রহ্ম সৈন্য সমূহ কাছাড় হইতে মণিপুরে গিয়া আড্ডা করে।

ব্রহ্ম সৈন্য কর্ত্তৃক মণিপুর অধিকৃত হইলে মণিপুরের বহুতর প্রজা পলায়ন করিয়া কাছাড় ও শ্রীহট্টে আগমন পূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই সময়েই গম্ভীরসিংহ পাঁচশত অনুচর সহ শ্রীহট্টে আগমন করেন। শ্রীহট্টের মণিপুরী রাজবাটী এই সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল। গত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূকম্পে উক্ত রাজবাটী বিধ্বস্ত হইয়াছে।

গম্ভীরসিংহ শ্রীহট্টে

গবর্ণমেন্টের আশ্রয়ে গম্ভীরসিংহ শ্রীহট্টে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহার সৈন্যদিগকে গবর্ণমেন্ট অস্ত্রশস্ত্র দিয়া পরিপুষ্ট ও সুশিক্ষিত করিলেন। ইহাতে অবশ্যই গবর্ণমেন্টের সুউদ্দেশ্য ছিল। এই সৈন্য সংখ্যা ক্রমে দ্বিগুণ হইতেও অধিক হইয়াছিল। গম্ভীরসিংহ বীরপুরুষ ছিলেন, গবর্ণমেন্ট পুনঃ পুনঃ ইহা স্বীকার করিয়াছেন। গম্ভীরসিংহ হইতে গবর্ণমেন্ট অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট হইতে খাসিয়া পর্ব্বতের উপর দিয়া রাস্তা প্রস্তুত কালে, খাসিয়াদের অন্যতম অধিনায়ক কমলাসিংহ ও চৌবরসিংহ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া, তত্রত্য ইংরেজ কর্ম্মচারী সহ বহু সংখ্যক দেশীয় লোক নিহত করে। শ্রীহট্টের রাজকর্ম্মচারীর অনুরোধে পার্ব্বত্য-যুদ্ধ-বিশারদ গম্ভীরসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। ইতিপূর্ব্বে (৫ম খণ্ডে) দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে খাসিয়া বিজয়ের যে বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, সে যুদ্ধ প্রধানতঃ ইঁহারই সহায়তা

ও শৌর্য্যে জয় করা হয়।

এই সময়ে মহরম পর্ব্ব ও রথযাত্রা এক তারিখে উপস্থিত হওয়ায় শ্রীহট্টের হিন্দু ও মোসলমান মধ্যে এক হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। শ্রীহট্টের বীর্য্যবান মোসলমানদিগকে দমিত রাখা অসম্ভব বোধ করিয়া, নামে মাত্র নবাব, গণর খাঁ কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন যে রথযাত্রার তারিখটা একদিন পিছাইয়া দেওয়া হউক। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ গম্ভীরসিংহকে এই কথা ব্যক্ত করিলে তিনি বলেন যে, তাহা কদাপি সম্ভবপর নহে। কাজেই এক তারিখে হিন্দু মোসলমানের উভয় উৎসবই সম্পাদিত হয়, এবং উভয় পক্ষে ঘোরতব বিবাদ উপস্থিত হয়। মোসলমানগণ হিন্দুদিগকে তীব্রতেজে আক্রমণ করে। হিন্দুগণ ভয়ে গম্ভীরসিংহের নিকট উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য তৎপর মণিপুরী সৈন্যের সহিত লাঠির সহায়তায় মোসলমানগণ অল্পক্ষণ মাত্র মারামারি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

গম্ভীরসিংহের সৈন্যদল "গম্ভীরসিংহের লেভী" নামে খ্যাত ছিল, এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কাপ্তেন গ্রাণ্ট সাহেব ইহার অধিনায়ক নিযুক্ত হন। এই মণিপুরী সৈন্যদল ব্রহ্মযুদ্ধের সময় বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল। ব্রহ্ম সৈন্য সমূহ কাছাড় হইতে মণিপুরে গিয়া আড্ডা করিলে, গম্ভীরসিংহ নিজ পাঁচ মণিপুরী সৈন্য লইয়া ব্রহ্ম সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া দিতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে লেপ্টেনাণ্ট পেম্বারটন (Lent: Pemberton) সহ শ্রীহট্ট হইতে যাত্রা করেন, এবং বহু কষ্টের পর ১০ই জুন মণিপুর উপস্থিত হন। তাঁহার উপস্থিতি মাত্র শত্রুগণ ইমফার ত্যাগ করতঃ ১০ মাইল দূরবর্ত্তী অন্দ্র নামক স্থানে চলিয়া যায় এবং অবশেষে মণিপুর ত্যাগ করে।

ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারী যান্দবো নগরে যে সন্ধি সাক্ষরিত হয়, তাহার সর্ত্তানুসারে গম্ভীরসিংহ ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক মণিপুর-পতি বলিয়া স্বীকৃত হন।[২৪] অতঃপর গম্ভীরসিংহ নির্ব্বিবাদে মণিপুরের সিংহাসনারোহণ করেন।[২৫]

গোবিন্দচন্দ্র কাছাড়ে

ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র কাছাড়ের রাজ সিংহাসনে পুনরারোহণ করেন (১৮২৬ খৃষ্টাব্দ।) কিন্তু অধিক দিন রাজ্য সম্ভোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে

২৪. A collection of Treaties &c. Vol. I. P. 213.

২৫ মণিপুরের অবশিষ্ট কথাঃ--

গম্ভীর সিংহের ভ্রাতা মধুসিংহের ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হইলে তদীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ রাজা হন ও সেনাপতি নরসিংহের তত্ত্বাধীনে থাকেন। নরসিংহ রাজমাতা কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় গুপ্ত মন্ত্রনা জ্ঞাত হইয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং রাজা হন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নরসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতাই রাজা হন, কিন্তু নরসিংহের পুত্রগণ তখন পলায়িত চন্দ্রকর্ত্তিকে কাছাড় হইতে আনয়ন করতঃ মণিপুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের নাগাযুদ্ধে চন্দ্রকীর্ত্তি গবর্ণমেন্টকে সৈন্যদ্বারা বিশেষ সহায়তা করেন, সাত বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয় ও তদীয় জ্যেষ্ঠ্য পুত্র সুবচন্দ্র সিংহ রাজা লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ সহ বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এই সময়ে কুলচন্দ্র রাজা হন; গবর্ণমেন্ট ইহা অনুমোদন করেন ও বীর সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে রাজ্য হইতে দূরে রাখিতে অনুরোধ করেন। এই অনুবোধ রক্ষিত না হওয়ায় আসামের চিফকমিশনার কুইণ্টন সাহেব পরিষদবর্গ ও ৪০০ সৈন্য সহ মণিপুরে গমন করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মাঘ টিকেন্দ্রজিৎকে ধৃত করার উদ্দেশে যুদ্ধ হয় ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত হয়। তখন সপারিষদ চিফকমিশনার নিবস্ত্রাবস্থায় টিকেন্দ্রজিৎসহ সাক্ষাৎ করিতে গিয়া উদ্ধত মণিপুরগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দয় ভাবে নিহত হন! এই লোমহর্ষণ ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পরিণাম ফল টিকেন্দ্রজিৎতের ফাঁসি! কুলচন্দ্রের নির্ব্বাসন এবং নরসিংহের প্রপৌত্র বালক চূড়াচান্দকে রাজ্য সমর্পন।

কতকগুলি মণিপুরী,—সম্ভবতঃ তৎকর্ত্তৃক অপমানিত মারজিতের অনুচর, একদা রজনী যোগে গোপনভাবে রাজ প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। গোবিন্দচন্দ্রের উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না, কাজেই তদীয় গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।[২৬]

উত্তর কাছাড়

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাচাদিন নামে এক সেবক উত্তরাদিগ্বর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ শাসনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাজ্য সংক্রান্ত গোলযোগে তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। গোবিন্দচন্দ্র কৌশল জাল বিস্তার ক্রমে তাঁহার পুত্র তুলারাম, পিতার কর্ম্মকাণ্ডে গোবিন্দচন্দ্রের ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়ান। এবং নাগা, কুকি প্রভৃতি দ্বারা দল গঠিত করিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে থাকেন। ক্রমাগত তিনটি যুদ্ধে তুলারাম জয়লাভ করেন। বহুকাল কলহের পর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র তুলারামকে ২২২৪ বর্গমাইল পরিমিত ভূমির অধিকার ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে অধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাই সম্প্রতি উত্তর কাছাড় নামে অভিহিত।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তুলারামের রাজ্যসীমা উত্তরে যমুনা ও দয়াং নদী, পূর্ব্বে ধনশ্রী নদী, দক্ষিণে মাহুর নদী ও নাগাপাহাড় এবং পশ্চিমে দয়াং নদী নির্দ্দিষ্ট। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তুলারামের মৃত্যু হয়। তুলারামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নকুলরাম ও ব্রজনাথ উত্তর কাছাড় শাসন করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বার্ষিক ৮টি হাতী কর স্বরূপ দিতে হইত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে নকুলরাম নাগাদিগের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই নকুলরাম গবর্ণমেন্টের আদেশ গ্রহণ করেন নাই, এই কারণে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় রাজ্য গবর্ণমেন্ট অধিকার করেন। নকুলরামের বংশধরগণ কিঞ্চিৎ বৃত্তি ও কতক ভূমি নিষ্কর স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

কাছাড় রাজ্যের আধুনিক কথা

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কাছাড় রাজ্য অধিকৃত হইলে কাপ্তেন ফিসার ইহার প্রধান শাসনকর্ত্তা বা সুপারিনটেন্‌ডেন্ট নিযুক্ত হন। কিন্তু এই রাজ্য গবর্ণমেন্টের অধিকারভুক্ত হওয়ায় ঘোষণা পত্র ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্টের পূর্ব্বে প্রচারিত হয় নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কাছাড় জিলা ঢাকা কমিশনারের অধীন করা হয়, কিন্তু ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দেওয়ানী বিচার প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে দণ্ডবিধি আইনানুসারে বিচার আরম্ভ হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সুপারিনটেনডেন্ট পদের পরিবর্ত্তে ডিপুটী কমিশনার পদের সৃষ্টি হয়, এই কর্ম্মচারীর ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ও সবজজের ক্ষমতা আছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীহট্টের জজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কাছাড় গিয়া সেসনের বিচার করিয়া আসিতেছেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন হাইলাকান্দি সবডিভিশন পৃথক করা হয় ও একজন এসিষ্টান্টের উপর ইহার শাসনভার সমর্পিত করা হয়। ইহার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লুশাই কর্ত্তৃক কাছাড় আক্রান্ত হয়, তদ্বিবরণ প্রসঙ্গতঃ ৫ম খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে বিবৃত করা গিয়াছে। লুশাইগণ বাঁশের ছিলকা ভাঙ্গিয়া বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত করতঃ শাঙ্কেতিক ভাবে বাক্য আদান প্রদান করিয়া থাকে; এই নিরক্ষর অসভ্যগণের মধ্যে ইহা পরস্পর পত্র ব্যবহার স্বরূপ হয়।

২৬. "Gobinda chandra was finally assasinated in 1830 without any son British took possession of the country, in accordance with the condition of the treaty of 1826."

-Hunter's S. A. of Assam. Vol. II. (Sylhet)

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসামে চিফকমিশনার পদের সৃষ্টি হইলে কাছাড়কে পুনর্ব্বার আসাম প্রদেশ ভুক্ত করা হইয়াছিল; সম্প্রতি ইহাও পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

উত্তর কাছাড়ের সবডিভিশনেল আফিস গংজং নামক শৈল শৃঙ্গে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই (১৮৮২ খৃষ্টাব্দ) শম্ভুধন নামক এক কাছাড়ী প্রকাশ করে যে, সে স্বর্গ হইতে অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করতঃ "দেও" হইয়াছে! সুতরাং সে দেও উপাধি ধারণ করিয়া অনেক উদ্ধত সহচর সহ লোকের ভীতি উৎপাদন করে। মাইবঙ্গের চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী অধিবাসী তাহাকে মান্য করিয়া একরূপ কর দিতে আরম্ভ করে। কাছাড়ের ডিপুটী কমিশনার মেজর বয়েড ইহাকে দমন করা আবশ্যক বোধে দলবল সহ মাইবঙ্গ উপস্থিত হন। পরদিন প্রত্যুষে বিকট বাদ্য ও চিৎকার ধ্বনিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়; ত্রস্তে সৈনিকগণ সঙ্গীন সহ বন্দুক হস্তে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়ায়। দেখিতে দেখিতে দেওগণ দা হস্তে তীরবেগে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আঘাত করিতে আরম্ভ করে; পলায়ন কালে দৈবচক্রে শম্ভুধন নিহত হয়। মেজর বয়েডের হস্তের দুই আঙ্গুলির মধ্যে গুরুতর আঘাত লাগায় কিছু দিন মধ্যে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আফিসাদি গংজং হইতে ৩১১৭ ফিট উচ্চ হাফলং শৃঙ্গে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এস্থানের উত্তর পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী প্রাকৃতিক শোভা অতিশয় সুন্দর। পুলিশ সুপারিনডেনডেণ্টই এখানকার প্রধান কর্ম্মচারী; বিচার ও শাসন, উভয় ক্ষমতাই তিনি পরিচালন করেন।

উপসংহারের টীকা

মহারাজ গোবিন্দ চন্দ্রের আইন

(খণ্ডিত)

তেষাং পতনে দ্বিগুণঃ—

উপরে যে সকল লিখা গিয়াছে ভেদের কথা ইহাতে যদি ঐ সকলের পতন হয় তবে রাজাতে (১) ৬২৷৷১০ সাগে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।—

মারণে মারনং—

মারণেতে যদি মারিত ব্যক্তি মৃত হয় তবে তাহাকেহ রাজা প্রতিবদল শূলাদি দ্বারা মারিত হয়—

কৃতাপরাধোপি রাজনি কৃত প্রহারং শুল মারো প্যাগ্নেপচেৎ—

কৃতাপরাধী যে রাজা তাকেই যদি কোন ব্যক্তিয়ে প্রহার করে তবে তাকে শূল দিয়া গাথিয়া অগ্নিতে পাচনা করিব ব্রাহ্মণের মারণন্তিক শাস্তি পাই—

ব্রাহ্মণেতের বিষয়মেতৎ সর্ব্ব পাপষ বস্তিতেমপি ব্রাহ্মণং কদাচিদপিন হন্যাৎ—

সর্ব্ব পাপযুক্ত যে ব্রাহ্মণ তাকেহ (২) বধ করিতে পারে না—

ভার্য্যা পুত্রদাস শিষ্য কনিষ্ঠ সোদরাঃ কৃতাপরাধ্য (ছিন্ন) রজ্বাবন্ধনেন (ছিন্ন)* অতি সূক্ষ্ম কঞ্চি ইতি খ্যাতেন এষাং পৃষ্ঠে তাড়নং কুর্য্যাৎ—

ভার্য্য ও পুত্র দাস ও শিশ্য ও কনিষ্ঠ সোদর এই সকলে অপরাধ করিলে রাজ্বাদি বন্ধন করিয়া বাসের সূক্ষ্ম কঞ্চি (৩) দিয়া পৃষ্ঠেতে তাড়ন করিতে পারে এহাতে রাজদণ্ড নাই—

যুগপ (ছিন্ন) পদপথি তুল্য গমনেচ ঃ সহোপবেশনে বাতাড়ন দপদণ্ডঃ—

ব্রাহ্মণের সহিত তুল্য হৈয়া বাদ (৪) করে যে শূদ্রে কিম্বা পথে যাইতে সমান হৈয়া গমন করে যে শূদ্রে কিম্বা এক সমান সয্যাতে শয়ন করে যে শূদ্রে কিম্বা সমান আসনেতে বৈশে (৫) যে শূদ্রে তাকে রাজা বেত দিবেন—

১. রাজাতে=রাজাকে।

২. তাহাকেহ=তাহাকেও।

* আইন গ্রন্থাবলীর কাগজ জীর্ণ; কাগজ পচিয়া উপর ও নীচ দিক ক্ষয় হইয়াছে ও নাড়াচাড়ায়। ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে, এক এক স্থল খসিয়া পড়িয়াছে, তৎস্থলে (ছিন্ন) লিখিত হইল।
কোন ও চিহ্নাদি নাই, ছেদ স্থলে এক এক রেখা মাত্র অঙ্কিত আছে।

চর্ম্মভেদে সর্ব্বত্র সার্দ্ধ দ্বিশত পণাঃ—	সমান ব্যক্তিয়ে (৬) মারণেতে (৭) যদি চর্ম্ম ভেদ হয় তবে রাজাতে ১৫৷৷৴পনর কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।
(ছিন্ন) পঞ্চদশত (ছিন্ন)—	সমান ব্যক্তিয়ে মারিতে যদি মাংস ভেদ হয় তবে রাজাতে ৩১ ৷০ একত্তিস কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়—
অস্থিভেদে সহস্র পণাঃ (ছিন্ন) নাসাকর দন্তা স্ত্রী নাং অস্থিভেদ পঞ্চশত পণাঃ—	সমান ব্যক্তিয়ে অস্থি ভেদ করিলে ৬২৷৷ শাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয় কর্ণ কিম্বা নাসিকা কিম্বা দন্তাদি ভেদ করিলে রাজাতে ৩১ একত্তিস কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়।
(ছিন্ন) ভ্রমিতে উভয়োর্দ্দণ্ডঃ—	এবঞ্চ সমান ব্রাহ্মণে যদি এক জনার উপর আরেক (৮) জনায়ে পরস্পর অস্ত্র ভ্রমায় তবে উভয়েহি রাজাতে ৩১ ৷০ একত্তিস কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়—
ব্রাহ্মণেষু কোপাৎ পানিং প্রহরণ শূদ্রঃ পাণি ছেদন দণ্ডঃ—	শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণকে হস্ত দ্বারা প্রহার করে তবে তাহাকে হস্ত ছেদন করিতে হয়—
কোপাৎ পাদেন প্রহরণ পাদ ছেদন দণ্ড্যঃ—	শূদ্রে যদি ক্রোধত পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণকে প্রহার করে তবে তাহার পাদ ছেদন করিতে হয়—
সহাসনেবসন্ শূদ্রঃ কট্যাং কৃতচিহ্নঃ (ছিন্ন) অথবা নিতম্ব সমীপ মাংস খণ্ডং কর্ত্তয়েৎ—	ব্রাহ্মণের একাসনেতে একাকী যদি শূদ্র বৈসে তবে তাহার নিতম্বের মাংস ছেদন করিতে হয়—
কোপাৎ প্রহারার্থং ভ্রুকুট্য মুখং বিস্তারয়ত শূদ্রস্য দ্বাবাষ্টৌ ছেদয়েৎ—	শূদ্রে কোপ করিয়া ব্রাহ্মণকে মারিবার নিমিত্তে যদি ভ্রুকুটী মুখ বিস্তার করে তবে দুইয় (৯) ঠোট ছেদন করিতে হয়—
ব্রাহ্মণোপরি মুত্র মুৎসৃজতঃ শূদ্রস্য লিঙ্গং ছেদয়েৎ—	শূদ্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাহ্মণের উপর প্রস্রাব করে তবে তাহার লিঙ্গ ছেদন করিতে হয়—
ব্রাহ্মণোপরি পুরীষোৎসর্গে গুদং ছেদয়েৎ—	শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণের উপর বিষ্ঠা ক্ষেপন করে তবে তার গুদ ছেদন করিতে হয়—

৩. বাঁশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীর্ঘ শাখাকে কঞ্চি বলে
৪. বাদ=বাদানুবাদ।
৫. বৈশে=উপবেশন করে।
৬. ব্যক্তিয়ে=ব্যক্তি।
৭. মারণেতে=প্রহারে।
৮. আরেক=আরও এক।
৯. দুইয়=উভয়।

ব্রাহ্মণস্য কেশেষু পাদয়ো র্ব্বগ্রীবায়াং বা অণ্ডকোষে বা কোগাদগৃহ্নতঃ শূদ্রস্যহস্তৌ ছেদয়েৎ—

শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণের কেশেতে ধরে কিম্বা গ্রীবাতে ধরে কিম্বা পায়েতে ধরে কিম্বা অণ্ডকোষেতে ধরে তবে তার হস্ত ছেদন করিতে হয়—

(এস্থলে একপাতা নাই।)

শিরসি প্রহরন্ চৌরবৎ (ছিন্ন) প্রাপ্নোতি—

কিন্তু মস্তকেতে তাড়না করিলে চৌরির প্রায় রাজদণ্ড দিতে হয়—

মহিষাদিনাং কুক্কুরাদীনাঞ্চ স্বামী শক্তোপ্যেতান অবারয়ন সার্দ্ধদ্বিশত পণ দণ্ড্যঃ—

মহীষাদির ও কুক্কুরাদির স্বামী সমর্থ থাকিতে কোন ব্যক্তিব উপব মহিষাদি ও কুক্কুরাদি রুষিতে যদি বাবণ না করে তবে ১৫।৶পনর কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয—

(ছিন্ন) ত্যক্তেপি যদি না তদাপঞ্চ শত পণ দণ্ড্যঃ—

দূরকর ২ এমত বলিতেহ যদি মহিষাদি ও কুক্কুরাদির স্বামীয়ে আসিয়া বারণ না করে ত রাজাতে ৩১ ।০ একত্তিস কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়—

বাক পারুষ্যাদিনা নীচো যদি লজ্ঘয়েৎ তদাং নীচং স এর রাজদণ্ড্যোন ভবতি—

নীচ লোকে যদি (ছিন্ন) ব্যক্তিকে বাক্য দ্বাবা (ছিন্ন) এহাতে নীচ লোক (ছিন্ন) ম ব্যক্তিয়ে হস্তদ্বারা (ছিন্ন) তবে রাজ দণ্ড হয় না—

সম্পূর্ণ

জানা কর্ত্তব্য কোন কোন ব্যক্তিকে চৌর বলা জায তাহা নিরুপনের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হুজুর কৌশল (৮) হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণি (১০) ও ভাষাতে (১১) নীচের লিখিতানুসাবে শক ১৭৩৯ সালেব ১ পহিলা বৈশাখে জারী করিলেন—

চৌবৈঃ সহ মিলন খনিত্রাদি দ্রব্যাণমন্য তমেনাপি চৌরমবধার্য্য রাজা চোরিত দ্রব্যং দ্রব্যস্বামীনে দাপয়িত্বা শাস্ত্রোক্তং দণ্ডং গৃহ্নীয়াৎ—

চৌরের সহিত সর্ব্বদা সংসর্গ করে যে কিম্বা যাহাব পাশ চৌব কর্ম্মের খনিত্রাদি অস্ত্র থাকে ও যাহার পাশ চৌরিত দ্রব্য পাওয়া জায় সেহ চোর হয়—এই এই চিহ্ন দ্বারা চোরকে অবধাবণ করিযা রাজায় (১২) সপ্রমাণ দ্রব্যস্বামীকে দ্রব্য দেওয়াইযা চোবকে যথা (ছিন্ন) বেন—

চোরানাং নিগ্রহে পরমং যত্ন কুর্য্যাৎ

চোরকে নিগ্রহ কবিতে রাজা পবম যত্ন করিবেন—চোরের নিগ্রহেতে যশোবৃদ্ধি হয অতএব পরম যত্ন কবিব

চোরাশ্চ (ছিন্ন)—

চোর দুই প্রকার হয়—

প্রকাশা (ছিন্ন)—
তত্র প্রকাশ চৌরা বণিগাদয়ঃ—
অপ্রকাশ চৌরা সন্ধি (ছিন্ন)—

প্রকাশ চোর ও অপ্রকাশ চোর
কপট তোল (১৩) করে যে বণিগাদি সেই প্রকাশ চোর—
সন্ধানাদি দ্বারা চৌরি করে যে সেই অপ্রকাশ চৌর—

জানা কর্ত্তব্য কপট তোল করি ও কপট গণা (১৪) করি ও কপট লেখ্য দ্বারা ধনের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া পুত্রদ্বারাদিকে প্রতিপোষণ করে যে ব্যক্তি ঐ ২ ব্যক্তি রায়ে (১৫) কতহ্রাসেতে কি দণ্ড হবে তাহা নিরুপণ নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত হেড়ম্বেশ্বর বাহাদুরের হুজুর কৌশল হৈতে বিবাদ দর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণি ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৯৩ সালের ১ পহিলা বৈশাখ জারী করিলেন ইতি

কপট (ছিন্ন) কপট লেখ্যেন কপট গণনেন অর্থস্য বৃদ্ধি হ্রাসাভ্যাং বণিজ: পরিবারান্ পুষ্ণন্তি—

কপট তোল ও কপট গণন ও কপট লেখ্য এই সকল দ্বারা ধনের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া পুত্রদারাদিগকে প্রতি পালন করে যে ব্যক্তি—

যঃ কপট তুলাদিনা পরদ্রব্যাষ্টমাং সম্পতরতি সপণ শতদ্বয় দণ্ড্যঃ—

রা দ্রব্যের অষ্টম ভাগের ১ এক ভাগ হরণ করিলে রাজাতে ১২॥ সাড়ে বার কাহন দণ্ড দিতে হয়—

যত্তু নবমাংশ অপহরতি স পঞ্চবিংশতি পণ ন্যূনপণ শতদ্বয় দণ্ডং দদ্যাৎ—

এবং নবম ভাগের এক ভাগ হরণ করিলে রাজাতে ১০৸৵দশ কাহন পনর পণ দণ্ড দিতে হয়—

দশমাংশ হরণে পঞ্চাশৎ পণন্যূনপণ দ্বিশতং দণ্ডং—

দশমাংশ হরণ করিলে রাজাতে ৯ । নও কাহন ছয় পণ দণ্ড দিতে হয়—

একাদশাংশ হরণে পঞ্চপণাধিক সপ্ততি পণ নূন্যপন দ্বিশতং—

একাদশাংশ হরণ করিলে ৮।৮ আষ্ট (১৬) কাহন সাত পণ রাজাতে দণ্ড দিতে হয়—

দ্বাদশাংশ হরণে পণ শতং দণ্ডং—

দ্বাদশাংশ হরণ করিলে রাজাতে ৬ ।০ স্বয়া ছয় পণ দণ্ড দিতে হয়—

ত্রয়োদশাংশ হরণে পঞ্চপণাধিক সপ্ততি পণাঃ—

ত্রয়োদশাংশ হরণেতে ৪৷৷৵চাইর কাহন এগার (১৭) পণ রাজাতে দণ্ড দিতে হয়—

* ৯. কৌশল-কৌন্সিল?
১০. দেববানি= সংস্কৃত।'
১১. ভাষা=বঙ্গভাষা।
১২. রাজায়=রাজা।
১৩. তোল=ওজন।
১৫. ব্যক্তিরায়=ব্যক্তিরা, ব্যক্তিগণ।

চতুৰ্দ্দশাংশ হরণে পঞ্চাশৎপণাঃ—

চতুর্দ্দশাংশ হরণেতে ৩৷৷০ তিন কাহন দুই পণ দণ্ড দিতে হয়—

পঞ্চদশাংশ হরণে পঞ্চ (ছিন্ন) পণাঃ—

পঞ্চদশাংশ হরণেতে ১৷৴০ এক কাহন নও (১৮) পণ দণ্ড দিতে হয়— এই ক্রমে অধিকাংশ হরণেতে অধিক দণ্ড দিতে হয়—

ষষ্ট সপ্তমাংশ মপহরতি তস্য পণ দ্বিশতোপরি পঞ্চবিংশতি পণ বৃদ্ধিঃ—

সপ্তমাংশ হরণেতে ১৪৴০ এক চৌদ্দ কাহণ এক পণ দণ্ড দিতে হয়—

যষ্টাং (ছিন্ন) পণদ্বিশতোপরি পঞ্চাশৎ পণ বৃদ্ধিঃ—

ষষ্টাংশ হরণেতে ১৭৷৷৴সতর কাহণ দশ পণ দণ্ড দিতে হয়—

পঞ্চমাংশ হরণে পণ দ্বিশতোপরি পঞ্চ সপ্ততি পণ বৃদ্ধিঃ—

পঞ্চমাংশ হরণেতে ১৭৷৷৶৴সতর কাহন তিন পণ দণ্ড দিতে হয়—

চতুর্থাংশ হরণে পণদ্বিশতোপরি শতপণ বৃদ্ধিঃ—

চতুর্থাংশ হরণ করিলে ১৯৷৲ উন্বইস (১৯) কাহন বার পণ দণ্ড দিতে হয়—

তৃতীয়াংশ হরণে পণদ্বিশতোপরি পঞ্চবিংশতি পণাধিক শতপণবৃদ্ধিঃ—

তৃতীয়াংশ হরণ করিলে ২১৷৴একইস কাহন পাঁচ পণ দণ্ড দিতে হয়—

দ্বিতীয়াংশ হরণে পণদ্বিশতোপরি পঞ্চাৎপণাধিক শতপণ বৃদ্ধিঃ—

দ্বিতীয়াংশ হরণ করিলে রাজাতে ২২৸৴০ বাইস কাহন চৌদ্দ পণ দণ্ড দিতে হয়—

এবঞ্চ চোবিত দ্রব্য মষ্টধা বিভজ্য ষ্টমাংশঃ—

চোরিত দ্রব্যকে অষ্ট ভাগ করিয়া প্রতি ভাগেতে যাহা হয় এই এক ভাগকে পুনশ্চ

নবধা বিভজ্য নবমাংশ ইত্যাদি ক্রমেণ বোধ্যঃ—

নবমাংশ ও দশমাংশ ইত্যাক্রমে (২০) বৃদ্ধি ও হ্রাস করিতে হয়—

জানা কর্ত্তব্য তাম্রাদি ঔষধ দ্বারা সুবর্ণ করি বিক্রী (২১) করিলে এবং কুক্কুরাদির মাংস হরিণাদির মাংস করি (২২) বিক্রী করিলে এবং অল্প মূল্য দ্রব্য যদি বঞ্চনা করি বহুমূল্য বিক্রী করিলে যাহা দণ্ড হবে তাহা নিরুপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হুজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পইলা বৈশাখে জারী করিলেন ইতি

অসুবর্ণস্য ঔষাধি যোগাৎ সুবর্ণনুভ্রম মুৎপাদ্য যঃ ক্রয়াদি ব্যবহারং করোতি যশ্চম্বাদি মাংসং হরিণাদি মাংসত্বেন প্রকাশ্য বিক্রি নীয়তে স নাসাদণ্ড কর শূন্য করণীয়ঃ পন সহস্র দণ্ডশ্চ

সুবর্ণাতিরিক্ত যে দ্রব্য তাতে (২২) ঔষধাদি কোন লাগাইয়া সুবর্ণের সমান করিয়া সুবর্ণ হেন ভ্রম জন্মাইয়া এবং কুক্কুরাদির মাংসকে হরিণাদির মাংস হেন প্রকাশ করিয়া বিক্রয়াদি ব্যবহার করে যে ব্যক্তি তাহার নাসাছেদ ও হস্তছেদ ও দন্ত শূন্য করিয়া ৬২৷৷০ রাজা দণ্ড লইতে হয়

---

১৬. আষ্ট= আট। ১৭. এগৃগার=এগার। ১৮. নও=নয়।

(ছিন্ন) দ্রবাং গ্রহীত্বা (ছিন্ন) প্রকাশ্য (ছিন্ন) কোন বঞ্চয়ন্তি তেহর্থানুরূপতোদণ্ডাঃ

অল্প মূল্য দ্রব্য আনিয়া যদি বহু মূল্য দ্রব্য হেন প্রকাশ করিয়া স্ত্রী ও বালককে বঞ্চনা করিয়া স্ত্রী ও বালকেতে বিক্রয় করে তবে মূল্যানুরূপ অর্থাৎ যত টাকার দ্রব্য হয় তত টাকা রাজাতে দণ্ড দিতে হয়

ঔষধাদি যোগাদ্ধেমাদিকং কৃত্রিমং কৃত্বা যে বিক্রীণন্তিতে ক্রেতা মূল্যং দত্বা মূলদ্বিগুণং দণ্ডং রাজনি দদ্যাৎ—

ঔষধাদি দিয়া সুবর্ণাদিতে কৃত্রিম জন্মাইয়া যেই ব্যক্তিয়ে বিক্রয় করে সেই ব্যক্তিযে ক্রয় কর্ত্তাতে (২৩) মূল্য ফিরৎ দিয়া রাজাতে মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হয়—

শুদ্ধ সুবর্ণ নক্তন্দিবমগ্নৌধ্মায়নানে ক্ষয়োন ভবতি—

এক রাত্রি ও এক দিবস কাল ব্যাপক অগ্নিতে দাহ রিলে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষীণ না হয় যে সুবর্ণ তাকেহি (২৪)

শুদ্ধ সুবর্ণ জানিবা—

অথ রজত পণশতে পলদ্বয় মেব—

তথা ভবতি ত্রপুনিরাঙ্গ শীশৈ বা অষ্ট পলামব—

এক রাত্রি দিবা ব্যাপক অগ্নিতে দাহ করিলে শত পলেতে দুই পল ক্ষীণ হয় যে রজতেতে (২৫) তাকেহি শুদ্ধ রূপা বলি—

তথা তাবতি তাম্রেপণ পঞ্চকং—

পিতল ও রাঙ্গ ও শীস (২৬) (ছিন্ন) ত্রিদিবা ব্যাপক অগ্নি (ছিন্ন) করিলে যদি অষ্ট পণ (ছিন্ন) তাবহি শুদ্ধ জানিবা—

শতপল তাম্রেতে ৫ পাঁচ পদ ক্ষীণ হয়—

তাদৃশে লৌহে দশপলানি ক্ষীয়ন্তে—

শত পল লৌহেতে ১০ দশ পল যদি ক্ষীণ হয় তবেহি শুদ্ধ তাহা—

ইতি সম্পূর্ণ

জানা কর্ত্তব্য অপ্রকাশ চোর অর্থাৎ সিংহ দিয়া (২৭) গৃহেতে প্রবিষ্ট হৈয়া চোরি করে যে ব্যক্তিয়ে তাহার কি ২ দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হুজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখে জারী করিলেন ইতি—

খননং কৃত্বা গৃহং প্রবিশ্য যে চৌবাশ্চৌর্যং কুর্ব্বন্তি রাজাতেষাং হস্তৌ ছিত্বা তীক্ষ্ণ শূলে নিবেশয়েৎ—

খনন করিয়া গৃহেতে প্রবিষ্ট হৈয়া চৌরি করে যে ব্যক্তি এমত চোরকে রাজায়ে হস্ত দ্বয় ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ শূলেতে প্রবিষ্ট করেন—

১৯. উন্বইস=উনিশ।
২০. ইত্যাক্রমে=ইত্যাদি ক্রমে
২১. বিক্রী=বিক্রয়।
২২. কবি=কবিয়া (বলিয়া)।
* তাতে=তাহাতে।

(ছিন্না) নাং না তাদি রত্না (ছিন্ন) বাণ বধ্যঃ—	কুলীন পুরুষ ও স্ত্রীলোক ও মরকত অর্থাৎ প্রস্তরাদি ও রত্ন এই সকলকে রাত্রিতে উপরের লিখিতানুসারে যদি চোরি করে তবে সেই বধ্য হয়—
মধ্যম পুরুষ হরণে হস্তপাদৌ ছিত্বা চতুষ্পথে স্থাপ্য—	এবং মধ্যম পুরুষকে যদি হরণ করে তবে রাজা তাহার হস্ত ও পাদ ছেদন করিয়া সেই চোর ব্যক্তিকে চতুষ্পথে অর্থাৎ চৌক বাজারে রাখিবেন—
অধম পুরুষ হরণে পণসহস্রদণ্ডঃ—	যদি অধম পুরুষকে হরণ করে তবে রাজাতে ৬২ বাসইট কাহন আষ্ট পণ দণ্ড দিতে হয়—
অশ্ব হর্ত্তারং হস্তপাদৌ কটিং ছিত্ব প্রমাপয়েৎ—	ঘোটক হরণ করে যে ব্যক্তি তাহার হস্ত ও পদ ও কোটি ছেদ করিয়া মারিবেক—
গবোষ্ট্রগজাপহরণে একচরাণা দিকঃ কার্য্য—	গো ও অষ্ট্র অর্থাৎ উট ও গজ অর্থাৎ হস্থি এই সকলকে চোরি করিলে তাহার এক চরণ ছেদন করিবেক।—
বিংশতি দ্রোণ ন্যূন ধান্যাপ হরণে তৎসমং ধানং স্বামিনি দদ্যাৎ তদেকাদশ গুণঞ্চ রাজনি দণ্ডত্বেন দদ্যাচ্চ—	বিংশতি দ্রোণের (ছিন্ন) ধান্যর ন্যূন ধান্য (ছিন্ন) ধান্যর স্বামীকে তাদৃ (ছিন্ন) দিয়া রাজাতে ঐ ধান্যে (ছিন্ন) শদগুণ ধান্যের মূল্য দণ্ড দিতে হয়—
ইতোধিকাপ হরণে মারণীয়ঃ—	বিংশতি দ্রোণ পরিমিত ধান্যের অধিক ধান্য চোরি করিলে মারনীয় হয়—
ব্রাহ্মণস্যাবমানমেব বধঃ—	যদি ব্রাহ্মণ চোর হয় তবে তাহাকে অপমান করিব ব্রাহ্মণের যে অপমান সেই বধের তুল্য—
মধ্যবিধ ব্রাহ্মণ চৌরস্য ললাটে ভগাদি চিহ্নং কৃত্বা রাজ্যাগ্বিঃ সারয়েৎ—	মধ্যম ব্রাহ্মণে যদি চৌরি করে তবে তাহার ললাটেতে ভগাঙ্ক করাইয়া রাজ্য হৈতে বাহির করিবেক—
চৌরিতত্বেন জ্ঞাতানাং দ্রব্যাণাং ক্রেতা রক্ষিতা গোপন কর্ত্তা চ—	চোরিত দ্রব্য হেন জানিয়া যেই ব্যক্তিয়ে ক্রয় ও রক্ষণ ও গোপন করে সেই চৌর—
চৌর সম দণ্ড্যঃ—	সমান দণ্ড হয়।

২৩. ক্রয় কর্ত্তাতে= ক্রেতাকে।
২৪. তাকেহি = তাহাকেই।
২৫. রজতেতে=রজতে।
২৬. শীস= সীসক।
২৭. সিংহ দিয়া=মাটি খনন করার উপযোগী সিং এর আকৃতি যন্ত্র দ্বারা খুঁদিয়া সিঁদ কাটিয়া।

সম্পূর্ণ

জানা কর্ত্তব্য অকস্মাৎ কর্ম্ম করে যে ও বল করি কর্ম্ম করে (২৮) [ছিন্ন] করি কর্ম্ম করে যে তাহার দণ্ড কি হবে তাহা নিরূপণের [ছিন্ন] এই আইন শ্রীযুত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হুজুর [ছিন্ন] হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সনের ১ বৈশাখে জারী করিলেন

সহসা বলেন দর্পিতৈর্ষৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে তৎ সাহসং প্রথম মধ্যমোত্তমভেদাৎ তৎ ত্রিবিধং—

অকস্মাৎ যে কর্ম্ম করে ও বলদ্বারা কর্ম্ম করে যে দর্পদ্বারা কর্ম্ম করে যে তাহার নাম সহসা সেই প্রথম মধ্যম উত্তম ভেদে তিন প্রকার হয়—

লাঙ্গলসেতু পুষ্প মূল ফলেষু সাহসন বিনাশিতেষু বা তেষাং মধ্যে অল্প মূল্যেষু পণশতং—

লাঙ্গল (২৯) সেতু পুষ্প ও মূল ও ফল এই সবের মধ্যে অল্প মূল্য যেই সেই দ্রব্য (৩০) হয় তাহাকে যদি সাহসাদি দ্বারা চোরি করে অথবা বিনাশ করে তবে রাজাতে ৬।০ সয়াছয় কাহন দণ্ড দিতে হয়—

বহুমূল্যে তদ্দ্রব্যসম ধনং দণ্ডঃ—

বহু মূল্যেই যেই যেই দ্রব্য যদি চোরি করে কিম্বা নাশ করে তবে রাজাতে সেই দ্রব্যের সমান মূল্য দণ্ড দিতে হয়—

স্ত্রীপুং হেমরত্নাদেব বিপ্রধন কৃমি কোষাদ্ভব বস্ত্র বিশেষেষু মূল্যসম দণ্ডঃ—

স্ত্রী ও পুরুষ হেম ও রত্ন ও দেব বিপ্রধান ও কৃমি কোষাদ্ভব অর্থাৎ তসরাদি বস্ত্র ও পট্ট বস্ত্রাদি ঐ সকল দ্রব্য চোরি করিলে রাজাতে ঐ দ্রব্যের সমান মূল্য দণ্ড দিতে হয়—

হীন পুরুষে দ্বিগুণ দণ্ডঃ—

হীন বর্ণ পুরুষে যদি সাহস করি উপরের লিখিতানুসারে কর্ম্ম করে তবে রাজাতে দ্রব্যের দ্বিগুণ মূল্য দণ্ড দিতে হয়—

চোর সংসর্গ নিবৃত্ত যে হর্ত্তা তাড়নীয় স্যাৎ—

চোরের সংসর্গে নিবৃতে (৩১) থাকে যে তাহাকে রা [ছিন্না] করিতে হয়—

অথ প্রথম সাহসস্যাল্পধনে শতং মধ্যমধনে দ্বিশতং তদপেক্ষ্য কিঞ্চিদধিকে (ছিন্ন) দ্বিশতং বহু মূল্যেতে (ছিন্ন) সমং মধ্যম সাহসস্য পঞ্চশতং তত্রাপি ক্রিয়াভেদো বিবক্ষণীয়ঃ—

উত্তরোত্তর ক্রমে অধিক [ছিন্ন] করিলে উত্তরোত্তর ক্রমে দণ্ড অধিক হয় অথবা ১৫॥০/০ পনর কাহন দশ পণের ন্যূন ধন চোরি করিলে ৬।০ সয়াছয়কাহন দণ্ড—১৫॥ পনর কাহন দশ পণ চোরি করলে ১২॥০ সাড়ে বার কাহন দণ্ড—

তদপেক্ষাত (৩২) কিঞ্চিৎ অধিক ধন চুরি করিলে ১৫॥৵৴ পনর কাহন দশ পণ দণ্ড তদপেক্ষাত অধিক ধন চোরি করিলে সেই ধনের তুল্য ধন দণ্ড এবং বহু মূল্য দ্রব্য হয় তবে তাহার মূল্যের সমান দণ্ড—

২৮. বল করি=বলপূর্ব্বক।
২৯. কৃষি কার্য্যের যন্ত্র বিং।
৩০. যেই যেই= যে যে।
৩১. নিবৃতে=নিভৃতে।

জানা কর্ত্তব্য মাতা পিতা স্ত্রী ও পুত্র ঐ সকলকে ভরণ পোষণ না করিলে এবং ব্রাহ্মণেতে ও ক্ষত্রিতে ও বৈশ্যেতে ও শূদ্রেতে (৩৩) বিষ্ঠা দিয়া কিম্বাসুরাও রসুন ভক্ষণ কায এবং মোহন ও বশিকরণ ও উচ্চাটন ঐ সকল করাইবার উদ্যেগ করে যে এবং ব্রাহ্মণের ভেশ (৩৪) ধারণা (৩৫) করে যে শূদ্রে তাহার কি দণ্ড হবে তাহার নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হুজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পন গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১লা পহিলা বৈশাখে জারী করিলেন—

মাতৃ পিতৃ স্ত্রী পুত্র ভরণ পোষণ (ছিন্ন) পণাষ্ট পণা দণ্ডঃ—	সমর্থ থাকিয়া যেই ব্যক্তিয়ে মাতা পিতা ও স্ত্রী ও পুত্র এই সকলকে যদি ভরণ পোষণ না করে তবে সেই ব্যক্তিয়ে রাজাতে ৩৫৷৹ সাড়ে পয়ত্তিস কাহন দণ্ড দিতে হয়—
ব্রাহ্মণ দূষণে শূদ্রস্য ষোড়শ সুবর্ণ দণ্ডঃ—	শূদ্রে যদি বিষ্ঠাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে দুষ্ট করে তবে রাজাতে ১৬ ষোড়শ সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়—
লশুনাদিকং ভো· য়িত্বা শত সুবর্ণ দণ্ড—	শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণকে লশুনাদি ভক্ষণ করায় তবে রাজাতে ১০০ একশত সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়—
সুরাং পায়য়িত্বা বধ্যঃ—	সুরাপান করাইয়া যদি শূদ্রে ব্রাহ্মণকে দুষ্ট করে তবে রাজা ঐ ব্যক্তিকে বধ করিতে হয়—
বিষ্টাদিনা ক্ষত্রিয়ং দূষয়িত্বা অষ্টৌ সুবর্ণান দণ্ড্যঃ—	এবং শূদ্রে যদি বিষ্ঠাদি দ্বারা ক্ষত্রিয়কে দুষ্ট করে তবে রাজাতে ৮ আষ্ট সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়—
লশুনাদিনা পঞ্চাশ১—	যদি লশুনাদি দ্বারা নষ্ট করে তবে রাজাতে ৫০ পঞ্চাশ সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়—
(ছিন্ন) রয়া অঙ্গছেদ—	সুরা ভক্ষণ করাইয়া যদি ক্ষত্রিয়কে দুষ্ট করে তবে রাজা তাহার অঙ্গছেদ করিতে হয়—
বিষ্ঠাদিনা বৈশ্যং দূষয়িত্বা চতুঃ সুবর্ণান দণ্ড্যঃ	এবং বৈশ্যকে যদি শূদ্রে বিষ্ঠাদি দ্বারা নষ্ট করে তবে রাজাতে ৪ চাইর সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়।—
লশুনাদিনা পঞ্চবিংশতি সুবর্ণান দণ্ড্যঃ	লশুনাদি ভক্ষণ করাইলে রাজাতে ২৫ পঞ্চবিংশতি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়—
সুরয়া অল্পাঙ্গছেদঃ ইত্যুৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণাদি বিষয়ং	সুরাপান করাইয়া দুষ্ট করাইলে অঙ্গুলীছেদ করাইয়া দুষ্ট করাইলে অঙ্গুলীছেদ করিতে হয়-এই সব দণ্ড উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ও উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় ও উৎকৃষ্ট বৈশ্যের হয়—
অন্যত্র দ্বিশতপণা দণ্ডঃ	অন্যত্র এতাদৃশ কর্ম্ম করিলে ১২৷৹ সাড়ে বা৲ কাহন দণ্ড দিতে হয়—

৩২. তদপেক্ষাত = তদপেক্ষাও ৩৩. শূদ্রেতে= শূদ্রকে ৩৪. ভেশ= বেশ ৩৫. ধারণা = ধারণ

এবং স্তম্ভন মোহন বশীকরণ বিদ্বেষণোচ্চাটন মারণ রূপ ষটকর্ম্মস্বপি

স্তম্ভন ও মোহন ও বশীকরণ ও উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ ও মারণ এইসব কর্ম্মের উদ্যোগ করে যে ব্যক্তি তাকে রাজাতে ১২৷৷০ সাড়ে বার কাহন দণ্ড দিতে হয়—

জানা কর্ত্তব্য যেই ২ খানে বধ ও হস্তাদি ও হস্তাদি ছেদন তাহার প্রতিনিধি দণ্ড কি দিবেক তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হুজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৯৩ সালের ১ পহিলা বৈশাখ জারী করিলেন ইতি—

বধ প্রতিনিধি দণ্ডঃ সুবর্ণ শতং—

বধযোগ্য অপরাধি ব্যক্তিয়ে যদি ১০০ একশত সুবর্ণ দণ্ড দিতে পারে তবে ঐ ব্যক্তিকে বধ করাবেন না।

অঙ্গছেদন প্রতিনিধিঃ পঞ্চাশৎ—

এবং অঙ্গছেদন যোগ্য অপরাধি ব্যক্তিয়ে যদি ৫০ পঞ্চাশৎ সুবর্ণ দণ্ড দিতে পারে তবে অঙ্গছেদ করাবেন না।

রাজ্যাদ্বহিস্করণ প্রতিনিধিঃ—

বিংশতিঃ রাজ্য হৈতে বাহির করিবার যোগ্য অপরাধি ব্যক্তিয়ে যদি ২৫ পঞ্চবিংশতি সুবর্ণ দণ্ড দিতে পারে তবে বাহির করাবেন না।

জানা কর্ত্তব্য নিরপরাধির অপরাধি বলিয়া বান্ধিলে এবং অপরাধি ব্যক্তিকে (ছিন্ন) এবং অন্যের শরীরেতে শস্ত্র (ছিন্ন) তনমাত্রেতে এবং স্ত্রী (ছিন্ন) শ করিলে এবং রাজাজ্ঞা পালন না করিলে যেই যেই দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হুজুর কৌশল হৈতে বিবাদপূর্ণ গ্রন্থানুসারে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখ জারী করিলেন ইতি—

নিরপরাধং যো বধ্নতি যশ্চ সাপরাধং মুঞ্চতি স পণ সহস্র দণ্ডার্হঃ—

নিরপরাধি ব্যক্তিকে যদি অপরাধি হেন বলিয়া বান্ধে এবং অপরাধি ব্যক্তিকে পাইয়া যে ছাড়ে এই দুই ব্যক্তিয়ে রাজাতে ৬২৷৷০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়—

কূট প্রমাণের কূট মুদ্রয়া বা যঃ কার্য্যং সাধয়েৎ স পণ সহস্র দণ্ডার্হ (ছিন্ন) অল্পাপরাধ বিষয়ং—

কূট প্রমাণ অর্থাৎ মিথ্যা লেখা পত্র করিয়া ও কূট মুদ্রা অর্থাৎ মিথ্যা মোহর বানাইয়া (৩৬) কার্য্যোদ্ধার করে যে ব্যক্তি সেই রাজাতে ৬২৷৷০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড অতি অল্প বিসয়েতে (৩৭) করিতে হয়—

পরদেহে শস্ত্রপাতন মাত্রে ব্রাহ্মণীতর গর্ব্ভ পাতনে চ পণ সহস্রং—

অন্যের শরীরেতে অস্ত্র দ্বারা অল্প ক্ষত করিলে এবং ব্রাহ্মণী ভিম্বা যে স্ত্রী যদি ইহার গর্ব্ভ নষ্ট করে তবে রাজাতে ৬২৷৷০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়—

(ছিন্ন) পবীতাদি বিপ্র চিহ্ন ধারণেন জীবিকাং কুর্ব্বতঃ শূদ্রস্যাষ্ট শতপণ দণ্ডঃ—

যজ্ঞপবীতাদি ধারণ করি ব্রাহ্মণের যেই ২ চিহ্ন তাকেহ (৩৮) ধারণ করিয়া যদি উপজীবিকা করে তবে সেই শূদ্রে রাজাতে ৫০ পঞ্চাশ কাহন দণ্ড দিতে হয়—

বিক্রয়িনঃ দেব প্রতিমাভেদকস্য পণ সহস্র দণ্ডঃ—

যাহার ভক্ষ যেই দ্রব্য না হয় সেই দ্রব্য যদি তাহার পাশ বিক্রয় করে এবং নির্ম্মিত দেবতা প্রতিমা ভাঙ্গে তবে ঐ ২ ব্যক্তিরা (৩৯) রাজ্যাতে ৬২॥০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়—

বিষাগ্ন্যাদিনা পুরুষঘ্নীং (ছিন্ন) পঞ্চাগাব্‌র্ভণীং স্ত্রিয়ং শিলাং বধ্বা অপ্সু প্রবেশয়েৎ—

বিষদ্বারা কিম্বা অগ্নি দ্বারা পুরুষকে মারে যেই স্ত্রীয়ে কিম্বা সেও অর্থাৎ পুন নষ্ট করে যে স্ত্রীয়ে তাকে শিলা বান্ধিয়া জলেতে ক্ষেপনা করিব। কিন্তু গর্ভাযুক্তা হইলে জলেতে ক্ষেপনা করিবে না

পতিগুরু নিজপত্যঘ্নীং কর্ণকরনাসৌষ্ট শূন্যাং কৃত্বা গোদ্বারা প্রমাপয়েৎ—

স্বামী কিম্বা গুরু কিম্বা আত্ম পুত্র এই সকলকে বধ করে যে স্ত্রীয়ে তাহার নাসা ও হস্ত ও ওষ্ট অর্থাৎ ঠুক (৪০) এই সকল ছেদন করিয়া গো দ্বারা মারিবেক—

শুদ্ধিচিন্তামণৌ স্ত্রীনাং বধাঙ্গং ছেদন নিষেধঃ—

কিন্তু শুদ্ধিচিন্তামণিকারের মতে স্ত্রীলোকের বধ ও অঙ্গচ্ছেদ করিতে পাবে নাহি (৪১) শিরোমুণ্ডনাদি (ছিন্ন) অপমান করিয়া দেশের বাহির করিবেক—

শিষ্যগা গুরুগা পতিঘ্নী নিন্দিতগাচ ত্যাজ্যা—

শিষ্য গামিনী ও গুরু গামিণী ও পতিঘ্নী অর্থাৎ পতিকেহ মারিয়াছে যেই স্ত্রীয়ে এই সকল স্ত্রীকেহ এতাদৃশ মতে দেশের বাহির করিব এবং নিন্দিত পুরুষ গামিনী যে স্ত্রী তাকেহ (৪২) এতাদৃশমতে দেশের বাহির করিব—

বিবাদ নির্ণয়ে ধান্যাদি শস্য যুক্ত ভূমি গৃহ সমূহ গ্রাম গোষ্ঠাদি নানাবিধ শস্যযুক্ত খলসংজ্ঞক স্থান দাহকা রাজপত্ন্যভিগামিচ ধীরণ পত্রাগ্নিনা দগ্ধব্যাঃ বীবণং বির্ণ্ণা ইতি খ্যাতং—

বিবাদ নির্ণয়েতে লিখিয়াছেন—ধান্যাদি শস্য যুক্ত যে ভূমি ও গৃহ সমূহ ও গ্রাম ও গোষ্ঠাদি ও নানাবিধ শস্যখলা (৪৩) নাম এই সকলেতে অগ্নি দিয়া দাহ করে যে ব্যক্তি এবং রাজপত্নীতে অভিগমন করি যে ব্যক্তি তাকে বীর্ন্না (৪৪) পত্র দিয়া বেষ্টিত করিয়া দাহ করিবেক—

৩৬. বানাইয়া = প্রস্তুত করিয়া।
৩৭. বিষয়েতে = বিষয়ে।
৩৮. তাকেহ = তাহাও
৩৯. ব্যক্তিরা = ব্যক্তিগণ।
৪০. ঠুট= ঠোট।

৪১. নাহি= কদাপিনা।
৪২. তাকেহ= তাহাকেও
৪৩. খলা = ধ্যান্যাদি [illegible]হের নির্দিষ্ট স্থান
৪৪. বীন্না = বিণ্ণা তৃণ, শ্রীহট্ট ও কাছাড়াঞ্চলের মাঠে দীর্ঘপত্রএকরুপ তৃণ জন্মে।

সম্পূর্ণ

যদি গবির্ভণী স্ত্রীকে পরিশ্রম— করাইয়া গর্ভ নষ্ট করে তবে ১৫৷৷০/০ পনর কাহন দশপন এবং যদি ঔষধাদির যোগ করাইয়া গর্ভ নষ্ট করে তবে ৩১।০ সয়া একতিস কাহন এবং যদি প্রহার দ্বারা গর্ভ নষ্ট করে তবে রাজাতে ৬২৷৷- সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়

পরিশ্রম জননে ঔষধ প্রয়োগেন প্রহারেণ বা গর্ভপাতান প্রথমধ্যমোত্তম (ছিন্ন) দণ্ডাঃ

অকৃত্বামপি রাজাজ্ঞাং কৃতাং কৃত্বায়ঃ প্রকাশয়তি রাজাজ্ঞা খণ্ডয়তি বা কূট প্রস্ত রাদিনা তোলয়তি বা তস্য মারণ মঙ্গ ছেদো বা—

রাজায় যেই বিষয়ের আজ্ঞা না দিয়াছেন সেই বিষয়ের আজ্ঞা দিয়াছেন হেন বলিয়া যে প্রকাশ করে ও যে ব্যক্তিয়ে রাজাজ্ঞা খণ্ডন করে ও যে ব্যক্তিয়ে কূট প্রস্তরাদি অর্থাৎ অল্প শিলা দ্বারা তোল (৪৫) করিয়া অধিক বানায় (৪৬) এই সকল ব্যক্তির মারণ রূপ দণ্ড ও অঙ্গ ছেদন রূপ দণ্ড করিবেক কিন্তু এই দণ্ড বিষয় বুঝিয়া করিতে হয়।

জানা কর্ত্তব্য এক ব্যক্তিয়ে অন্য ব্যক্তিকে প্রকাশিত মতে বধ করিলে এবং অপ্রকাশিত মতে বধ করিলে যাহা দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হুজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পন গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের রে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখে জারী করিলেন—

প্রকাশ বধকা (ছিন্ন) নির্জ্জন স্থানং নীত্বা বা বধ (ছিন্ন) তেষমঙ্গ ছেদন পূর্ব্বক মারণং—

প্রকাশ করি বধ করে যে ব্যক্তি ও অপ্রকাশক করি বধ করে যে ব্যক্তি এই দুই ব্যক্তিকে রাজায়ে অঙ্গছেদন পূর্ব্বক মারিবেক—

তাদৃশ বধকস্য ব্রাহ্মণস্য শিরোমূণ্ডয়িত্বা ললাটে ভগাঙ্কং দত্বা গর্দ্দভেন পুরাদ্বহিস্করণং দণ্ড—

কিন্তু এতাদৃশ বধক যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে বধ করিতে পারে না কিন্তু শিরোমুণ্ডন করাইয়া ললাটেতে ভগাঙ্ক করাইয়া গর্দ্দভেতে চড়াইয়া পুরী হৈতে বাহির করিব

জানা কর্ত্তব্য অন্যের স্ত্রীর সহিত মৈথুন করিলে এই ব্যক্তির কি দণ্ড হবে এবং অন্যের স্ত্রীরে জাইয়া যদি মোহ জন্মায় তবে কি দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হুজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পন গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখে জারি করিলেন ইতি—

৪৫. তোল = তৌল। ৪৬. বানায়= প্রস্তুত করে (এস্থলে) প্রদর্শণ করে।

পরস্ত্রীয়া সহ নির্জ্জনে রাত্যাদিৗ সন্ধান পূর্ব্বকমবস্থিতিঃ আকর্ষণ (ছিন্ন) সম্ভাষণঞ্চ (ছিন্ন) দিচ ক্রীড়া (ছিন্ন) নালিঙ্গনানিচ (ছিন্ন) স্ত্রীয়াসহ মৈথুনাকুল সম্ভাষণে প্রথম সাহস দণ্ডঃ—

অন্যের স্ত্রীর সহিত প্রতি সন্ধান করিয়া নির্জ্জন স্থানেতে নিয়া কি (ছিন্ন) দি কালেতে অবস্থিত হৈয়া চিত্তাকর্ষণের উপযুক্ত কথা কহে যে ব্যক্তি ও অন্যের স্ত্রীর সহিত এক শয্যাতে শয়ন করে যে ও ক্রীড়া করায় ও চুম্বন আলিঙ্গন করে যে এই সব ব্যক্তিরা রাজাতে ১৫॥ পনর কাহন দশ পন দণ্ড দিতে হয়—

পরদারাভিমর্ষিণো ব্রাহ্মণে তরান্ ত্রীন্ কর্ণ নাসাদি ছেদন রূপ দণ্ডং কৃত্বা প্রবাসয়েৎ—

ব্রাহ্মণাতিরিক্ত যে তিনবর্ণ সে যদি পরদার করে তবে তাহার কর্ণ ও নাসাদি ছেদন করাইয়া বাহির করাইব সমান বর্ণেতে এতাদৃশ দণ্ড—

ক্ষত্রিয়াং বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণোগত্যা পঞ্চশত পণ দণ্ডার্হঃ—

ব্রাহ্মণে যদি ক্ষত্রিণীও বৈশ্যানী ও শূদ্রানী গমন করে তবে রাজাতে ৩১ ।০ একত্তিস কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়—

রজক য়েং গত্বা সহস্যং—

রজক অর্থাৎ ধুপা চর্ম্মকারক অর্থাৎ চামারর স্ত্রী যদি ব্রাহ্মণাদি গমন করে তবে রাজাতে ৬২॥০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়—

ধন ভ্রাত্রাদি সৌন্দর্য্যাদি দর্পণ যা পতি (ছিন্ন) ভ্যভিচরতি তাং (ছিন্ন) লোক মধ্যে কুক্কুরৈ খাদয়েৎ—

ধন ও ভ্রাতাদির ও সৌন্দর্য্য এই সবের গর্ব্বেতে দর্প করিয়া স্বামীকে না মানিয়া অন্য পুরুষের সহিত (ছিন্ন) র করে যেই স্ত্রীয়ে এতা (ছিন্ন) স্ত্রীকে রাজায়ে লোক (ছিন্ন) তে আনাইয়া কুক্কুর দিয়া খাবাইবেক—

অননুরক্তায়াং দর্পেনাভি গন্তারং য়ে শায়য়িত্বা দাহয়েৎ—

অননুরক্তা অর্থাৎ মানেনা যে স্ত্রী তাকে যদি দর্প করিয়া অভিগমন করে তবে তাহাকে অগ্নি মধ্যেতে লৌহমায় পাত্রেতে শয়ন করাইয়া দাহ করাবেক—

মারণ নিযুক্তঃ পুরুষাস্তত্র কাষ্ঠং ক্ষিপেষু—

মারণেতে নিযুক্ত যেই যেই পুরুষ সেই সকলে তাহার উপর কাষ্ঠ ক্ষেপনা করিবেক

চণ্ডালাদি স্ত্রীগমনে ক্ষত্রিয় বৈশ্যৌ কৃতাশিরষ্ক পুরুষাকেঙ্কৌ প্রবাসয়েৎ—

ক্ষত্রিয়ে ও বৈশ্যে যদি চণ্ডালাদির স্ত্রী গমন করে তবে তাহার শরীরেতে মস্তর রহিত পুরুষ অঙ্কিত করাইয়া দেশ হৈতে বাহির করাব—

ইতি সম্পূর্ণ

আমাদের প্রাপ্ত আইন গ্রন্থাবলীতে ইহার পর আরও একটি পাতা ছিল, কিন্তু তাহা এত জীর্ণ ও মলাযুক্ত যে অনেক স্থলে অক্ষর পাঠ করা কঠিন, তাই উক্ত অপাঠ্য পাতের নকল এ স্থলে দেওয়া গেল না। এই অপাঠ্য পত্রের পরও আর অনেকটি পত্রে সমাবেশ ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা ও সম্মুখের কয়েকটি পত্র বহু অনুসন্ধানেও পাওয়া যায় নাই।

যাহা পাওয়া গিয়াছে, অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে বাংলা লেখকদের বর্ণ শুদ্ধির দিকে দৃষ্টি থাকিত না। প্রায় সর্ব্বত্র ইহা দেখা যায়। আইনের সংস্কৃত অংশও যথাযথ উদ্ধৃত হইয়াছে; কোন অংশই সংশোধন করা হয় নাই। প্রাচীন লেখার উপর কোন স্থলেই হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

পরিশিষ্ট

প্রথম ভাগ

প্রথম ভাগের

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট (ক)

(ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ১ম ভাগ ১ম অধ্যায়)

১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যার বিবরণ

১

১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনানুসারে শ্রীহট্ট জিলার লোকসংখ্যা—২,২৪১,৮৪৮ জন।

তৎপূর্ব্বে	১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গণনানুসারে	২১৫৪৫৯৩	জন ছিল।
"	১৮৮১ " "	১৯৬৯০০৯	"
"	১৮৭২ " "	১৭১৯৫৩৯	"

শ্রীহট্টের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।

২

১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনানুসারে শ্রীহট্ট জিলায় মোট হিন্দু সংখ্যা ১০৪৯২৪৮ এবং। সংখ্যা ১১৮০৩২৪ জন। ব্রাহ্ম, খৃষ্টীয়ান ও জৈনাদি বিবিধ কার্যালম্বী ১২২৭৬ জন মাত্র হয়।

৩

১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনায় সমগ্র শ্রীহট্ট জিলায় পুরুষ সংখ্যা ১১৪১০৬০ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১১০০৭৮৮ জন মাত্র হয়।

৪

১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনানুসারে শ্রীহট্টে, বিবাহিত ব্যক্তির সংখ্যা ৮৯০৭১১ জন (তন্মধ্যে পুং ৪৩৫৩৭৩ জন এবং স্ত্রী ৪৫৪৭৯৮ জন); এবং অবিবাহিতের সংখ্যা—১০৭৭৪৩৬ জন। (তন্মধ্যে পুং ৬৫০৯৩ এবং স্ত্রী ৪১২৩৪৩ জন।)

বিপত্নীক ও বিধবা সংখ্যা—২৭৪২৪১ জন (ইহার মধ্যে, বিপত্নীক ৪০৫৯৪ জন এবং বিধবা ২৩৩৬৪৭ জন।)

ক. হিন্দুদের মধ্যে বিবাহিত ৪২০৮৩৩ জন (তন্মধ্যে পুং ২০৭৯০৭ জন এবং স্ত্রী ২১২৯২৬ জন।)

অবিবাহিত ৪৬০৭০৯ জন (তন্মধ্যে পুং ৩০০০৫৪ জন এবং স্ত্রী ১৬০৬৫৫ জন।)

খ. মোসলমান মধ্যে বিবাহিত ৪৬৪২৪৩ জন, (তন্মধ্যে পুং সংখ্যা ২২৪৮৭৮ জন এবং

স্ত্রী ২৩৯৩৬৫ জন।)

অবিবাহিত মোসলমান সংখ্যা ৬১০৫৫২ জন, (তন্মধ্যে পুং ৩৬১৫২০ জন এবং স্ত্রী ২৪৯০৩২ জন।)

৫

১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনানুসারে শ্রীহট্ট জিলায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ৯৭৫১৯ জন মাত্র হয়। (ইহার মধ্যে পুং সংখ্যা ৯২৯৬৮ জন এবং স্ত্রী ৪৫৫১ জন মাত্র।)

ক. ইহাদের মধ্যে বঙ্গভাষাজ্ঞ ৯৩০৫৭ জন, (তন্মধ্যে পুং সংখ্যা ৮৮৭৬১ জন এবং স্ত্রী ৪২৯৬ জন।) ইংরেজী ভাষাজ্ঞ ৫৯৬৬ জন (তন্মধ্যে পুং ৫৮৫৫ জন ও স্ত্রী ১১১ জন মাত্র।) অন্যান্য ভাষাবিদের সংখ্যা ৩৭৯১ জন মাত্র, (তন্মধ্যে পুং ৩৫৭৫ এবং স্ত্রী সংখ্যা ২১৬ জন মাত্র।)

খ. বঙ্গভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে হিন্দু ৭১২২১ জন (তন্মধ্যে পুং ৬৭৬১৩ জন ও স্ত্রী ৩৬০৮ জন।)

ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে হিন্দু সংখ্যা ৪৭১৬ জন তন্মধ্যে পুং ৪৬৭৪ জন ও স্ত্রী ৪২ জন।)

ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মোসলমান সংখ্যা ৯৭০ জন (তন্মধ্যে পুং ৯৬১ জন ও স্ত্রী ৯ জন।)

লিখিতে পড়িতে জানেন, এরূপ মোসলমানের সংখ্যা ২১৬৪৬ জন, (তন্মধ্যে পুং ২১০১১ জন ও স্ত্রী ৬৩৫ জন।)

৬

১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণানুসারে শ্রীহট্ট জিলায় অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা ২১৪৩২৯ জন, (তন্মধ্যে পুং ১০৪৮০৯২ জন এবং স্ত্রী ১০৯৬২৩৭ জন।)

৭

১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণানুসারে ব্যবসায় উল্লেখে নিম্নলিখিত রূপ সংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে;—মিরাসদার বা ভূমির উপস্বত্বভোগী—৪৮৫১০৩

(তন্মধ্যে পুং ২৫১২৫৬ স্ত্রী ২৩৩৮৪৭)

প্রজা বা কৃষিজীবী ১১৬৮৫৬৪ (তন্মধ্যে পুং ৫৯৫৭৯৩ স্ত্রী ৫৭২৭৭১)

বাগানের মজুর (প্রধানত বৈদেশিক) ১৩৫২১৪ (তন্মধ্যে পুং ৬৬১৯১ স্ত্রী ৬৯০২৩)

জালজীবী ১১৩৭২২ (তন্মধ্যে পুং ৫৮০৬৫ স্ত্রী ৫৫৬৫৭)

গুরুতা বা পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী ২৮৬৮৬ (তন্মধ্যে পুং ১৪৪৫৪ স্ত্রী ১৪৩৩২)

সাধারণ মজুর ২২৭৬৩ (তন্মধ্যে পুং ১১৮৩৮ স্ত্রী ১০৯২৫)

লোক গণনা সম্বন্ধে অপর জ্ঞাতব্য (ছ) এবং (জ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট (খ)
(ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ১ম ভাগ ১ম অধ্যায়)
শ্রীহট্টের বাজারসমূহ

উত্তর শ্রীহট্ট

সদর থানাধীনে

আখালিয়া বাজার। কাজির বাজার বন্দর বাজার।

গোলাপগঞ্জ থানাধীনে

কুড়ের বাজার। গোলাপগঞ্জ। চন্দরপুর।
ঠাকুর বাড়ী। পুরকায়স্থ বাজার। পূর্ব্বভাগ বাজার।
ভাইয়ার বাজার। ভাইয়ার (পুরাতন) রাখালগঞ্জ।

ফেঁচুগঞ্জ থানাধীনে

ঘিলাছড়া। চৌধুরী বাজার। ফেঁচুগঞ্জ
বিহানী বাজার। সেনর বাজার।

বালাগঞ্জ থানাধীনে

খনকার বাজার। গিয়াসনগর বাজার। গোয়ালা বাজার।
থানার বাজার। দেওয়ানর বাজার। নওয়া বাজার।
পরগণার বাজার। পুরকায়স্থ বাজার। বালাগঞ্জ।
বরুঙ্গার বাজার। মঙ্গলচণ্ডীর বাজার। মোক্তারপুর বাজার।
সরকার বাজার

বিশ্বনাথ থানাধীনে

আমতলি বাজার। কামালর বাজার। কালীগঞ্জ।
পরগণার বাজার। বিশ্বনাথের বাজার। মুফতির বাজার।
রাজাগঞ্জ। লামাকাজি বাজার। সৈফাগঞ্জ।
হব্রার বাজার

জয়ন্তীয়া অঞ্চলের কানাইঘাট থানাধীনে

মগবাটিয়া বাজার। কানাইরঘাট বাজার। গাছবাড়ী বাজার।
চাতল বাজার। চান্দের হাট। নূতনপুর বাজার।
বীরদল বাজার। ভবানীগঞ্জ। মাণিকগঞ্জ।
দেবীগঞ্জ। মূলাগাল বাজার। রাজাগঞ্জ।

গোয়াইনঘাট থানাধীনে

কানাইঘর বাজার। গারোর বাজার। গোয়াইন বাজার।
জগাবহর বাজার। জাফলং বাজার। নিজপাট বাজার।
পাঁচহাতী খেল বাজার। পানিছড়া বাজার। বিন্নাকান্দি বাজার।
মানিকগঞ্জ। মিরতিরি বাজার। সরুফৌদ বাজার।

করিমগঞ্জ

করিমগঞ্জ থানাধীনে

কচুমুখ বাজার। করিমগঞ্জ। কালীগঞ্জ।
কালীনগর বাজার। কাজিখালের ধার বাজার। কুছখাউরী বাজার।
খলার বাজার। ঘোড়ামারালসকর বাজার। চপরা বাজার।
চাঁদনিঘাট বাজার। ছাগলীর বাজার। দত্তপুর বাজার।
দরগার বাজার। নয়াবাজার। পুরান বাজার।
বচলার বাজার। বদরপুর বাজার। বাবুর বাজার।
বিয়াবাইল বাজার ঐ (পুরাতন) বৈদ্যনগর।
ভাঙ্গা বাজার। ভোলানাথ বাজার। মণিপুরীপাড়া বাজার।
মিয়াখালি বাজার। মিয়ারবাজার। নীরের বাজার।
মোনশী বাজার। রতনগঞ্জ। রাতাবাড়ী বাজার।
লক্ষ্মীর বাজার। লাতু বাজার। নিলাম বাজার।
শ্রীকোণা বাজার। শ্রীগৌরী বাজার শাহজলালর বাজার।
সাহজী বাজার। সুরানন্দপুর বাজার। স্বরূপগঞ্জ।

জলঢুপ থানাধীনে

আজীমগঞ্জ। আফিসর বাজার। আভঙ্গীর বাজার।
আলীনগর বাজার। কলাজুরা বাজার। কাকুরা বাজার।
কানুনগোর বাজার। কাটলতলি বাজার। কামালর বাজার।
কালীবাড়ী বাজার। গজভাগ বাজার। গঘড়ার বাজার।
গাঙ্গকুলর বাজার। গোপালরায়ের বাজার। ঘাঘুর বাজার।
চরিয়া বাজার। চুড়খাই বাজার। জলঢুব বাজার।
তালিমপুর বাজার। তেরাদল বাজার। দাশের বাজার।
দক্ষিণগোল বাজার। দুবাঘর বাজার। ধামাইর বাজার।
পাখীয়ালা বাজার। ফকিরর বাজার। বড়লিখার বাজার।
বরণীর বাজার। বিচরার বাজার। বিহানি বাজার।
বৈরাগী বাজার। যোগপ্রচণ্ড খাঁ বাজার। বোয়ালির বাজার।

ভোলাঢহর বাজার।	মিয়াখালি বাজার।	মোনশী বাজার।
রাধার বাজার।	রাজার বাজার।	রামদার বাজার।
শালেশ্বর বাজার।	শিরাজগঞ্জ।	শিয়ালঠেক।
সাবাজপুর বাজার।	সুজানগর বাজার।	সোণারূপা বাজার।

রাতাবাড়ী ও পাথারকান্দি থানাধীনে

আদমটীলা বাগানহাট।	আনীপুর বাগান হাট।	ইভটীলা বাগান হাট।
ইচাগঞ্জ।	এরালীগোল বাগান বার্জার।	ঔদন বাজার।
কানাই বাজার।	চরগোলা বাজার।	চান্দখিরা বাগানহাট।
তিলভূম বাগান হাট।	নয়াবাজার।	পরগণার বাজার।
পাথরকান্দি বাজার।	পুরনী বাগানহাট।	বড়নালীর বাজার।
বাবুর বাজার।	বালীছড়া বাজার।	বৈঠাখাল বাগানহাট।
মেধ্‌লি বাগান হাট।	লঙ্গাই বাগানহাট।	সলগই বাগানহাট।
হাতীখিরা হাট।	----	সলগই বাগানহাট।

দক্ষিণ শ্রীহট্ট

কমলগঞ্জ থানাধীনে

আদিয়াছড়া বাগান।	আলীনগর বাগান।	কমলগঞ্জ বাজার।
কাটাবিল বাগানহাট।	কাণিহাটী বাজার।	কূর্ম্মছড়া বাগানহাট।
ঘাটের বাজার।	টীলার বাজার।	তুলসীদাসীর বাজার।
তেতইগাঁর বাজার।	দীঘীর পারর বাজার।	দৌরাছড়া বাগানহাট।
পাথারিয়া বাগানহাট।	বাবুর বাজার (শ্রীনাথপুর)।	
বাবুর বাজার (কামার ঢেকি)	বাদেউরাহাতের বাজার।	বৈরাগীর বাজার।
মদনপুর বাগান।	মহালরপাড়া বাজার।	মাধবপুর বাগানহাট।
মিরতিঙ্গা বাগানহাট।	মোনশী বাজার।	রাণীর বাজার।
সলিমুল্লার বাজার।	শমসেরনগর বাজার।	সরকারের বাজার।

মতিগঞ্জ থানাধীনে

কাকিয়াছড়া বাজার।	কালাপুর গোসাঞির বাজার।	জীবনগঞ্জ বাজার।
মতিগঞ্জ।	রাজারবাজার।	বৌলেশ্বির বাজার।
শ্রীমঙ্গল বাজার।	সিন্দুর খাঁ বাজার।	

মৌলবীবাজার থানাধীনে

আখাইলকুড়া।	কালেরখাঁ বাজার	কাজির বাজার (আথানগিরি)

কাজির বাজার (বেকামুড়া)।	গোবিন্দপুর বাজার।	
গোপীনাথগঞ্জ।	ফকিরর বাজার।	নয়াবাজার।
ঢিপির বাজার।	দশের বাজার।	দীঘীরপার বাজার।
দুর্গাগঞ্জ।	ভৈরবের বাজার।	বদনগঞ্জ।
মনুমুখ বাজার।	মৌলবী বাজার।	শিবগঞ্জ।
শ্যামরায়ের বাজার।	সরকারের বাজার।	

রাজনগর থানাধীনে

কদম হাট।	কানকাপন বাজার।	ঘরগাও বাজার।
ঘোষের বাজার।	চৌধুরীর বাজার।	দেওয়ানদীঘীরপার বাজার।
তারাপাশাবাজার।	রাজকৃষ্ণর বাজার।	বাগিচার বাজার।
ভাঙ্গার হাট।	ভাটের বাজার।	ভৈরবগঞ্জ।
সবকারের বাজার।	সাহেবের বাজার।	সোণাতুলা বাজার।

হবিগঞ্জ

নবিগঞ্জ থানাধীনে

ইনায়েতগঞ্জ।	খাগাউড়া বাজার।	গোপায়া বাজার।
নবিগঞ্জ।	শিবগঞ্জ।	সৈয়দপুর বাজার।

মাধবপুর থানাধীনে

ইটাখলা বাজার।	কালীর বাজার।	জগদীপপুর বাজার।
ছাতি আইন বাজার।	তেলিয়াপাড়া বাজার।	দেওগাছ বাজার।
ধর্ম্মঘর বাজার।	মনতলা বাজার।	মাধবপুর বাজার।
মোনশী বাজার।	বাগাসুরা বাজার।	বেজোড়া হাট।
সাহাপুর হাট।	সুরমাছড়া বাগানহাট।	সেনঘর বাজার।

মুচিকান্দি থানাধীনে

আমু বাজার।	আসাবপাড়া বাজার।	গড়গড়িয়া বাজার।
গাজীগঞ্জ।	চান্দপুর বাজার।	চান্দভাঙ্গা বাজার।
চুনারুঘাট বাজার।	দারাগাও বাজার।	দেওয়ানডি বাজার।
পারকুল বাজার।	বসিরগঞ্জ।	মুচিকান্দি বাজার।
রাজাবাজার।	রেমাছড়া বাজার।	লস্করপুর বাজার।
লালচান্দ বাজার।	সাকির মাহামুদ।	হবিবুল্লা বাজার।

লাখাই থানাধীনে

বুল্লাবাজার।	লাখাই বাজার।	

বাণিয়াচঙ্গ থানাধীনে

আজমীরগঞ্জ।	ইকরাম বাজার।	কমলগঞ্জ।
গুণাই বাজার।	জলসুখা বাজার।	পুকরা বাজার।
মারকলি বাজার।	বাণিয়াচঙ্গ বাজার	বিরাটর হাট।
বিথঙ্গলবাজার।	শনঘর বাজার।	সুজাতপুর।

হবিগঞ্জ থানাধীনে

তুঙ্গেশ্বর বাজার।	দাউদনগর বাজার।	নন্দনপুর বাজার।
পুঁটিয়াজুরী বাজার।	পুরীখলা বাজার।	পৈল বাজার।
বাহুবল বাজার।	বেকিটেকা বাজার।	মশাজান বাজার।
মীরপুর হাট।	শায়েস্তাগঞ্জ।	সরকারের বাজার।
সাহাজী বাজার।	সুঘর বাজার।	হবিগঞ্জ।

সুনামগঞ্জ

ছাতক থানাধীনে

আমবাড়ী বাজার।	ইমামগঞ্জ হাট।	কালাকুরা বাজার।
গোবিন্দগঞ্জ।	চৌধুরীর হাট।	ছাতক বাজার।
জাউয়ার হাট।	জিয়াপুর বাজার।	দোহালিয়া বাজার।
দোয়ারা বাজার।	নয়াবাজার।	মঙ্গলপুর বাজার।
মরজা বাজার।	বারুইগাঁও বাজার।	সিংহচাপড় বাজার।
সোণাউতা বাজার।	হিমচৌধুরীর হাট।	

জগন্নাথপুর থানাধীনে

ইসাকপুর বাজার।	কামারখালা বাজার।	কামিনীপুর বাজার।
কেশবপুর বাজার।	জগন্নাথপুর বাজার।	পাটখুরা বাজার।
পালিগাও বাজার।	বুধরাইল বাজার।	রমাপতি বাজার।
রসুলগঞ্জ।	শিবগঞ্জ।	হুসেনপুর হাট।

তাহিরপুর থানাধীনে

তাহিরপুর বাজার।	বাঁধাঘাট বাজার।	শ্রীপুর বাজার

দিরাই থানাধীনে

আনন্দপুর বাজার। গাছিয়া বাজার। চরণারচর বাজার।
রাহুতলা বাজার। শ্যামারচর বাজার। সজনপুর বাজার।
সল্লা বাজার। হুসেনপুর বাজার।

ধর্ম্মপাশা থানাধীনে

ধর্ম্মপাশা বাজার। জয়শ্রী বাজার। পাইকার হাটী বাজার।
বিচনা বাজার। বীর বাজার। মহিশ্বলা বাজার।
মধ্য বাজার। রাজপুর বাজার। শণবাড়ী বাজার।

সুনামগঞ্জ থানাধীনে

জয়কলস বাজার। জয়নগর বাজার। পাগলা বাজার।
সাচনা বাজার। সুনামগঞ্জ।

বাজার সংখ্যা

উত্তর শ্রীহট্ট (জয়ন্তীয়ার বাজারসহ)	—	৬৬
করিমগঞ্জ (চা বাগানের বাজারসহ)	—	১০৭
দক্ষিণ শ্রীহট্ট (চা বাগানের বাজারসহ)	—	৭১
হবিগঞ্জ (চা বাগানে বাজারসহ)	—	৬৭
সুনামগঞ্জ -------------------------	—	৫৭
	মোট =	৩৬৮

পরিশিষ্ট (গ)

(ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ১ম ভাগ ১ম অধ্যায়)

শ্রীহট্টের পোষ্ট অফিসসমূহ

উত্তর শ্রীহট্ট

হেড্ আফিস :—শ্রীহট্ট বা সিলেট (সহরে)।

তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস

আখালিয়া (আখালিয়া)	কুরুয়া (কুরুয়া)	খাদিমনগর (শ্রীহট্ট)
গোলাপগঞ্জ (বরায়া)	জলালপুর (জলালপুর)	জয়ন্তীয়াপুর (জয়ন্তীয়া পুরীরাজ)
তাজপুর (দুলালী)	ঢাকা দক্ষিণ (ঢাকা দক্ষিণ)	বিশ্বনাথ (বাজুবণ ভাগ)
ভোলাগঞ্জ (পাণ্ডুয়া)	রায়নগর (শ্রীহট্ট)	লালবাজার (চৈতন্যনগর)।

সব আফিস :—গোয়াইন ঘাট (ধরগাম)।

তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস :—জাফলং (জাফলং)।

সব আফিস :—ফেঞ্চু গঞ্জ (হাউলিমৌরাপুর)।*

তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস—

গিলাছড়া (গিলাছড়া), মোগল বাজার (রেঙ্গা)।

সব আফিস :—বালাগঞ্জ (বোয়ালজুর)।

তদ্ব্যতীত—কানাইর ঘাট, (চাউরা, জয়ন্তীয়া,* এই ব্রাঞ্চ আফিস করিমগঞ্জ সব আফিসের অধীন; এবং বেগমপুর (অরঙ্গপুর) এই ব্রাঞ্চ আফিস দক্ষিণ শ্রীহট্টের মনুমুখ সব আফিসের অধীন।

করিমগঞ্জ

সব আফিস :— করিমগঞ্জ (কুশিয়ার কুল)।*

তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস—

করিমগঞ্জ বাজার (কুশিয়ার কুল)	কালীগঞ্জ বাজার (এগারসতী)	
গঙ্গাজল (চাপঘাট)	জলডুব (বাহাদুরপুর)	বড়লিখা (পাথারিয়া)
বিহানিবাজার (পঞ্চখণ্ড)	ভাঙ্গাবাজার (চাপঘাট)	বীরশ্রী (কুশিয়ার কুল)
লাউতা (পঞ্চখণ্ড)	লাতু (বারপাড়া)	শ্রীগৌরী (চাপঘাট)
সিদ্ধরপুর		

সব আফিস :— চুরখাই (চুড়খাইড়)

তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস—
আটগ্রাম [ইছামতী]— ব্রাহ্মণগাও [ইছামতী]
সব আপিস :–চান্দখিরা (প্রতাপগড়)*।
তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস—
হাতীখিরা [প্রতাপগড়]

সব আফিস :–দক্ষিণ ভাগ (পাথারিয়া)।*
ঐ দুর্ল্লভছড়া [প্রতাপগড়]।*
ঐ ইছামতী [ইছামতী]*।
ঐ পাথারকান্দি [প্রতাপগড়]*

তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস—
কানাই বাজার [প্রতাপগড়] নিলাম বাজার [ডৌয়াদি]
সব আফিস :– রাতাবাড়ী [পলডহর]

দক্ষিণ শ্রীহট্ট

সব আফিস :– মৌলবী বাজার (চৌয়ালিস্)
তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস—
কমলপুর (ভানুগাছ) দুল্লভপুর (চৌয়ালিস) দীঘীরপার (চৌয়ালিস)
রাজনগর (শমশেরনগর)
সব আফিস :– কাজলদাড়া (লংলা)*।
তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস—
ইন্দেশ্বর (ইন্দেশ্বর)* করিমপুর (ইন্দেশ্বর) খাজুরীছড়া (ছয়চিরি)
ফুলতলা (ভাটেরা)*

সব আফিস :– কুলাউড়া (লংলা)
তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস–
পৃথিমপাশা (লংলা) রজনীগঞ্জ (লংলা)
সব আফিস :– শমশেরনগর (কাণিহাটী)*।
কমলগঞ্জ (ভানুগাছ) কৈলাসহর (রাজকী)* দত্তগ্রাম (কাণিহাটী)
হাজিপুর
সব আফিস :– যোগছড়া (আদমপুর)*
সব আফিস :– সাতগাও (সাতগাও)
তদ্ব্যতীত—শমশেরগঞ্জ (সাতগাও) এই ব্রাঞ্চ আফিস
হবিগঞ্জ সবডিভিশনের সাটিয়াজুরী সব আফিসের অধীন।

হবিগঞ্জ

সব আফিস · হবিগঞ্জ [তরফ]*

তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস—

কালিয়ার ভাঙ্গা (বাণিয়াচঙ্গ) জলসুখা (জলসুখা) পৈল (তরফ)
পুখুরা (বাণিয়াচঙ্গ) মাদনা (লখাই)* মান্দারকান্দি (মান্দারকান্দি)
বামৈ (বামৈ) বাণিয়াচঙ্গ (বাণিয়াচঙ্গ) বেকিটেকা (তরফ)
ব্রাহ্মণডুরা (উচাইল) লাখাই (লাখাই) , সুজাতপুর (জোয়ানসাহী)

সব আফিস :– আজমীরগঞ্জ (জয়ার বাণিয়াচঙ্গ)

তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস—

কাকাইলছেও (বিথঙ্গল) বিথঙ্গল (বিথঙ্গল)

সব আফিস :– আদমপুর (আদমপুর)।*

ঐ ইটাখলা (বেজোড়া)*।

তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস—

ছাতি আইন (বেজোড়া) গোবিন্দপুর (কাশিমনগর) মাধবপুর (বেজোড়া)
বেজোড়া (বেজোড়া)

সব আফিস :– ইনায়েতগঞ্জ (আগনা)

তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস—

সৈদপুর বাজার (আগনা)

সব আফিস :– কালীঘাট [বালিশিরা]

ঐ চান্দপুর বাগান [তরফ]

ঐ নবিগঞ্জ (জয়ার বাণিয়াচঙ্গ)

তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস

কলাভরপুর লুগাও (দিনারপুর)

সব আফিস :– শায়েস্তাগঞ্জ (তরফ)

তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস—

আসাম পাড়া (তরফ) গোপায়া (তরফ) চুনারুঘাট (তরফ) নরপতি (তরফ) বসিরগঞ্জ বাজার (তরফ) মুচিকান্দি (তরফ) লালচান্দ (তরফ) সুঘর (তরফ)

সব আফিস :– সাটিয়াজুরী (তরফ)

তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস—

পুঁটিজুরী (পুঁটিজুরী) বাহুবল (ফয়জাবাদ) রসিদপুর (তরফ)

সব আফিস—শ্রীমঙ্গল (বালিশিরা)

সুনামগঞ্জ

সব আফিস :– সুনামগঞ্জ (লক্ষণশ্রী)

আমবাড়ী (পাগলা)	গৌরারং (লক্ষণশ্রী)	তাহিরপুর (লাউড়)
দিরাইচান্দপুর (খালিসা বেতাল)	ধর্ম্মপাশা (শেলবরষ)	পাগলা (পাগলা)
পাথারিয়া (খালিসা বেতাল)	সুখাইড় [সুখাইড়]	সাচনা [বেতাল]

সব আফিস :– ছাতক [ছাতক]*

সব আফিস :– গোবিন্দগঞ্জ [কৌড়িয়া]

তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস—

জগঝাপ [পাগলা] জাতুয়া [জাতুয়া]

সব আফিস: দোয়ারাবাজার (দুহালিয়া)

তদ্ব্যতীত– কামারখাল [নৈগাঙ্গ], কুবাজপুর, (আতুয়াজান), জগন্নাথপুর [কিসমত] আতুয়াজান, জগন্নাথপুর (ঐ), পাইলগাও [ঐ]

এই চারিটী পোষ্ট আফিস হবিগঞ্জ সবডিভিশনের ইনায়েতগঞ্জ সব আফিসের অধীনে।

* চিহ্নিত পোষ্ট আফিসসমূহে টেলিগ্রাফের তার সংলগ্ন আছে।

পরিশিষ্ট (ঘ)

(শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত **১ম ভাগ ১ম** অধ্যায়)

শ্রীহট্টের পুলিশ ষ্টেশন ও আউট পোষ্টসমূহ

উত্তর শ্রীহট্ট

নাম	সব ইং	হেডকনেষ্টবল	কনেষ্টবল।
ষ্টেশন বা থানা			
শ্রীহট্ট (সদর)	৩	–	[illegible]
তদধীন আউট পোষ্ট			
শ্রীহট্ট সহর	১	–	[illegible]
[illegible]গঞ্জ	১	.	
গোয়াইন ঘাট	১	–	[illegible]
ফেঞ্চুগঞ্জ	–	১	২
ষ্টেশন বা থানা			
কোনাইঘাট	১	–	৮
তদধীন আউট পোষ্ট			
[illegible]পুর	১	–	৪
ষ্টেশন বা থানা			
[illegible]	[illegible]	–	৮
[illegible]			
[illegible]	১	–	৫

করিমগঞ্জ

নাম	সব ইং	হেডকনেষ্টবল	কনেষ্টবল।
ষ্টেশন বা থানা			
[illegible]	৩	১	১৬
তদধীন আউট পোষ্ট			
[illegible]	১	১	৫
[illegible]	১	.	৫
[illegible]	১		৮

দক্ষিণ শ্রীহট্ট

নাম	সব ইং	হেডকনেষ্টবল	কনেষ্টবল।
ষ্টেশন বা থানা			
মৌলবী বাজার	[illegible]	.	১৪

তদধীন আউট পোষ্ট—			
শ্রীমঙ্গল	২		৬
ষ্টেশন বা থানা :—			
কুলাউড়া	২		৮

পূর্ব্বে মতিগঞ্জ, কমলগঞ্জ ও হিঙ্গাজিয়ায় আউটপোষ্ট ছিল।

হবিগঞ্জ

ষ্টেশন বা থানা :–			
হবিগঞ্জ	৪	-	১৪
তদধীন আউট পোষ্ট :–			
মুচিকান্দি	২	-	৮
ষ্টেশন বা থানা :–			
নবিগঞ্জ	২	-	১০
বাণিয়াচঙ্গ	২	-	৮
তদধীন আউট পোষ্ট–			
আবিদাবাদ	১	-	৬
ষ্টেশন বা থানা :–			
মাধবপুর	২	-	৮
তদধীন আউট পোষ্ট–			
লাখাই	১	-	৮

পূর্ব্বে আজমীরগঞ্জ একটি আউট পোষ্ট ছিল।

সুনামগঞ্জ

ষ্টেশন বা থানা :–			
সুনামগঞ্জ	২	-	১২
তদধীন আউট পোষ্ট :–			
তাহিরপুর	১	-	৪
ষ্টেশন বা থানা :–			
ছাতক	২	-	৮
ধর্ম্মপাশা	২	-	৮
দিরাই	-	১	৮
তদধীন আউট পোষ্ট—			
জগন্নাথপুর	১	-	৬

পূর্ব্বে পাণ্ডুয়াতে একটি আউট পোষ্ট ছিল। শ্রীহট্টের প্রত্যেক সবডিভিশনের এক একজন ইনিস্‌পেক্টর আছেন।

পরিশিষ্ট (ঙ)

(ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ১ম ভাগ চতুর্থ অধ্যায়)

শ্রীহট্টের চা বাগান সমূহ

উত্তর শ্রীহট্ট

সংখ্যা	নাম	অধিকারীর নাম	যে যে থানাধীনে	যত মাইল দূরে
১.	ইন্দানগর	লুভা টি কোং	ফেঞ্চুগঞ্জ	২১ ১/৪
২.	কালাগোল	কন্‌সলিডেটেড		
		টি এণ্ড লেণ্ড কোং	সদর	৯
৩.	কেওয়াছড়া	লাক্কতোড়া টি কোং	"	৫ ১/২
৪.	খাদিমনগর	নর্থ সিলেট টি কোং	"	"
৫.	গুলনী	কন্‌সলিডেটেড্		
		টি এণ্ড লেণ্ড কোং	গোয়াইনঘাট	১২
৬.	চেঙ্গারখাল (ফতেপুর)	ঐ	"	১০
৭.	চিকনাগোল	বাবুজোয়ারমল তুষ্ণিয়াল	"	১০ ১/২
৮.	জয়ন্তীয়া	কন্‌সলিডেটেড্		
		টি এণ্ড লেণ্ড কোং	"	৩২
৯.	জাফলং	ঐ	"	২৮
১০.	ডকার গোল	লুভা টি কোং	কানাইরঘাট	৪০
১১.	তারাপুর	বাবু বৈকুণ্ঠ চন্দ্র গুপ্ত	পারকুল	২
১২.	নুনছড়া	লুভা টি কোং	কানাইর ঘাট	৩৯
১৩.	বড়ঙ্গান	কন্‌সলিডেটেড্		
		টি এণ্ড লেণ্ড কোং	সদর	১০
১৪.	বাগছড়া	ঐ	জয়ন্তীয়াপুর	৩
১৫.	ব্রাহ্মণছড়া	মাং বক্‌স্ত, করিম বক্‌স,		
		গোলাম রব্বানি ও		
		আব্দুল মজিদ	ঐ	৪
১৬.	মহুরাপুর এবং			
	আনিপুর	লেণ্ড মর্গেজ বেঙ্ক		
		অব ইণ্ডিয়া	ফেঞ্চুগঞ্জ	২০
১৭.	মালনীছড়া	সিলেট টি কোং	জয়ন্তীয়াপুর	৩ ১/২
১৮.	মূলাগোল	লুভা টি কোং	কানাইর ঘাট	৩৫

১৯.	লাক্কাতোড়া	লাক্কাতোড়া টি কোং	সদর	৩
২০.	নালাখাল	কন্‌সলিডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	জয়ন্তীয়াপুর	৩৪
২১.	লভাছড়া	লুভা টি কোং	কানাইরঘাট	৩২

করিমগঞ্জ

সংখ্যা	নাম	অধিকারীর নাম	যে যে থানাধীনে	যত মাইল দূরে
১.	অলিভিয়া ছড়া	কন্‌সলিডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	রাতাবাড়ী	৪০
২.	আদম টীলা	মিঃ এইচ ব্রাউন কনেষ্টবল	পাথারকান্দি	২৩
৩.	আনিপুর	চরগোলা টি এসসিয়েশন	রাতাবাড়ী	৩০
৪.	এরালী গোল	এরালী গোল টি কোং	পাথারকান্দি	১৭
৫.	কালাছড়া	চরগোলা টি এসসিয়েশন	রাতাবাড়ী	৩২
৬.	কালীনগর	ভারত সমিতি	রাতাবাড়ী	৩০
৭.	কেকড়া গোল	কনসলিডেটেড টি এণ্ড লেণ্ড কোং	"	৪০
৮.	গম্ভীরছড়া	ঐ	"	৩৯
৯.	চরগোলা	চরগোলা টি এসসিয়েশন	"	৩০
১০.	চান্দখিরা	চান্দখিরা টি কোং	পাথারকান্দি	২৪
১১.	চান্দনী ঘাট ও বিদ্যানগর	রাজা গিরীশ চন্দ্র রায়	রাতাবাড়ী	২১
১২.	চাম্পাবাড়ী	পুতনী টি কোং	পাথারকান্দি	২৫
১৩.	টারবীণ ছড়া	চরগোলা টি এসসিয়েশন	রাতাবাড়ী	৩০
১৪.	তিলভূম	মিঃ জি এস্ সি ব্লেক প্রভৃতি	পাথারকান্দি	৩৪
১৫.	দক্ষিণ গোল	ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ	জলডুব	২১
১৬	ধামাই এবং শিলঘাট	ধামাই টি কোং	"	২৬
১৭.	পুতনী	পুতনী টি কোং	পাথারকান্দি	২৭
১৮.	পিপলা গোল	ঐ	"	২৬
১৯.	বৈঠাখাল	কনসলিডেটেড টি এণ্ড লেণ্ড কোং	"	২৬
২০.	ভুব্রিঘাট বা ইভ টীলা	মিঃ এম সি নৌড, লুইস ও		

		এফ এইচ নৌড	”	২৫
২১.	মদনপুর	বাবু ঈশ্বর চন্দ্র দত্ত ও		
		প্রসন্ন কুমার দত্ত	জলডুব	১৫
২২.	মাগুরাছড়া	চরগোলা টি এসসিয়েশন	রাতাবাড়ী	৪২
২৩.	মোকামছড়া	ইষ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড		
		সিলন টি কোং	”	৩৪
২৪.	লক্ষ্মীছড়া	বাবু ঈশ্বর চন্দ্র দত্ত ও		
		প্রসন্ন কুমার দত্ত	’পাথারকান্দি	৯
২৫.	লঙ্গাই ভেলি	লঙ্গাই ভেলি টি কোং	পাথারকান্দি	২৩
২৬.	লালখিরা			
	এবং সোণাখিরা	ঐ	”	২৭
২৭.	লালছড়া			
	এবং ফানাই	ইষ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড সিলন		
		টি কোং	রাতাবাড়ী	৩৭
২৮.	শমনভাগ	শমনভাগ টি কোং	জলডুব	২৭
২৯.	শিপিন জুরী বিল	শিপিন জুরী বিল টি কোং	পাথারকান্দি	২৮
৩০.	শিবছড়া	ইষ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড সিলন টি কোং	রাতাবাড়ী	৩৫
৩১	শিংলাছড়া			
	এবং বালিছড়া	চরগোলা টি এসসিয়েশন	রাতাবাড়ী	৩৬
৩২.	সলগই	হাতীখিরা টি কোং	পাথারকান্দি	৩০
৩৩.	সাহবাজপুর	বাবু গোলক চন্দ্র দাস		
		প্রভৃতি	জলডুব	১৫
৩৪.	সোণারুপা	মিঃ সি মেঞ্জিস প্রভৃতি	জলডুব	২৭
৩৫.	হাতীখিরা	হাতীখিরা টি কোং	পাথাবকান্দি	৩২

দক্ষিণ শ্রীহট্ট

সংখ্যা	নাম	অধিকারীর নাম	যে যে থানাধীনে	যত মাইল দূরে
১.	আমরইল ছড়া	কন্‌সলিডেটেড্		
		টি এণ্ড লেণ্ড কোং	শ্রীমঙ্গল	২৪
২.	আলীনগর	আলীনগর টি কোং	কমলগঞ্জ	১৬
৩.	ইটা	লংলা (শ্রীহট্ট) টি কোং	মৌলবীবাজার	১৬
৪.	উধনা	মিঃ এইচ. এস		
		কুরী প্রভৃতি	রাজনগর	১৩
৫.	উত্তরভাগ	ইন্দেশ্বর টি এণ্ড		

		ট্রেডিং কোং		১৫
৬.	কাকিয়াছড়া	কন্‌সলিডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	শ্রীমঙ্গল	১৭
৭.	কাজুরীছড়া	ঐ	”	২৩
৮.	কাণিহাটী	লংলা (শ্রীহট্ট) টি কোং	কমলগঞ্জ	১৬
৯.	কাপনা পাহাড়	মিঃ এইচ. আর কুগ প্রভৃতি	হিঙ্গাজিয়া	৩০
১০.	কালীঘাট	কন্‌সলিটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	শ্রীমঙ্গল	১৯
১১.	কালীটি	কালীটি টি কোং	হিঙ্গাজিয়া	২৪
১২.	কুর্ম্মছড়া	মি থমাস্ মেক্‌লিন	কমলগঞ্জ	২২
১৩.	ক্লেভাডন	মিঃ কে. সি. হেরিশন প্রভৃতি	জিঙ্গাজিয়া	২৭
১৪.	গন্ধীছড়া	কনসলিডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	মতিগঞ্জ	২২
১৫.	গয়াসনগর	মিঃ এইচ. পি. এস মেকমিকিন	মৌলবীবাজার	৭
১৬.	গাজীপুর	মিঃ এনড্রু ইউল এণ্ড কোং প্রভৃতি	হিঙ্গাজিয়া	২৩
১৭.	গোবিন্দপুর	বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ শর্ম্মা ও সুখময় চৌধুরী	কমলগঞ্জ	২০
১৮.	চাতলাপুর	আলীনগর টি কোং	”	১৯
১৯.	চান্দভাগ	লুভা টি কোং	রাজনগর	১৭
২০.	তিপরাছড়া	কন্‌সলিডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	শ্রীমঙ্গল	২৬
২১.	ধলাই	ধলাই টী কোং	কমলগঞ্জ	২৩
২২.	পত্রখলা	মিঃ থমাস মেকমিকিন	”	২২
২৩.	পর্ব্বতপুর	মিসট্রেস বেলফোর	রাজনগর	৮
২৪.	পান্নাকান্দি	সৈয়দ আলী আকবর খন্দকার	হিঙ্গাজিয়া	১৫
২৫.	পুঁটীয়াছড়া	কন্‌সলিডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	শ্রীমঙ্গল	২৩
২৬.	ফুলছড়া	ঐ	”	১৮
২৭.	ফুলতলা	নিউ সিলেট টি কোং	হিঙ্গাজিয়া	৩২
২৮.	ফুসকুরী	কন্‌সলিডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	মতিগঞ্জ	২২
২৯.	বরমচাল	মিঃ মেকলিন এণ্ড কোং প্রভৃতি	রাজনগর	২১
৩০.	গরমছড়া	কন্‌সলিডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	শ্রীমঙ্গল	২৪
৩১.	ভবউড়া (উত্তর)	ভবউড়া (শ্রীহট্ট) টি কোং	শ্রীমঙ্গল	১৪

৩২.	ঐ (দক্ষিণ)	ঐ	"	১৫
৩৩.	মিরতিংগা	মিঃ জে পিটার এণ্ড আরএলএস্টন	কমলগঞ্জ	৯
৩৪.	মাজডিহি	মাজডিহি টি কোং	শ্রীমঙ্গল	৯
৩৫.	মাধবপুর	মিঃ থমাস মেকমিকিন	কমলগঞ্জ	১৯
৩৬.	মির্জ্জাপুর	মিঃ সি. ই. লেন প্রভৃতি	শ্রীমঙ্গল	৩০
৩৭.	যোগছড়া	কন্সলিডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	"	১১
৩৮.	রত্ন	ইম্পিরিয়েল টি কোং	হিঙ্গাজিয়া	২৯
৩৯.	লাখিছড়া	কন্সলিডেটেড্ টি কোং	শ্রীমঙ্গল	২০
৪০.	রাঙ্গিয়াছড়া	মৌলবী আলী আমজদ খান	হিঙ্গাজিয়া	২১
৪১.	রাজকী	সুরমাভেলি টি কোং	"	৩৬
৪২.	রাজঘাট	কন্সলিডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	শ্রীমঙ্গল	২৫
৪৩.	রাজনগর	রাজনগর টি কোং	রাজনগর	১০
৪৪.	লংলা	লংলা (শ্রীহট্ট) টি কোং	হিঙ্গাজিয়া	১৪
৪৫.	লোযনী	মিঃ আর. এল আসটন	"	১২
৪৬.	শিঙ্গুর বা দীঘাইছড়া	কন্সলিডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	"	১৮
৪৭.	শিলুয়া	সুরমাভেলি টি কোং	"	৩৪
৪৮.	সমশের নগর (বাগীছড়াসহ)	লংলা শ্রীহট্ট টি কোং	কমলগঞ্জ	১৫
৪৯.	সাগর নাল	কন্সলিডেটেড টি এণ্ড লেণ্ড কোং	হিঙ্গাজিয়া	৩০
৫০.	সাত গাঁ	মিঃ জে এটকিন প্রভৃতি	শ্রীমঙ্গল	২১
৫১.	সিন্দরখান	কন্সলিডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কোং	"	২৪
৫২.	হরছড়া	বাবু সূর্য্যমণি দাস	রাজনগর	১৬
৫৩.	হালাইছড়া	কন্সলিডেটেড টি এণ্ড লেণ্ড কোং	হিঙ্গাজিয়া	১৪
৫৪.	হিঙ্গাজিয়া	চবগোলা টি এসসিয়েশন	"	১৫
৫৫.	হুগলীছড়া	কন্সলিডেটেড টি এণ্ড লেন্ড কোং	শ্রীমঙ্গল	২৬

হবিগঞ্জ

সংখ্যা	নাম	অধিকারীর নাম	যে যে থানাধীনে	যত মাইল দূরে
১.	আসো বা ঘনশ্যামপুর	মিঃ এচিশন প্রভৃতি	মুচিকান্দি	২৩
২.	চান্দপুর	চান্দপুর টি কোং	"	২১
৩.	চান্দিখিরা	চান্দিখিরা টি কোং	"	২২
৪.	দেওয়ানদি	মিঃ আর. এল এসটন প্রভৃতি	"	১৭

৫.	তেলিয়াপাড়া	তেলিয়া পাড়া টি কোং	মাধবপুর	২১
৬.	দারাগাও	উবউবা টি প্রভৃতি	মুচিকান্দি	১৬
৭.	পারকুল	পারকুল সিণ্ডিকেট	"	১৯
৮.	রসিদপুর	বরউড়া শ্রীহট্ট টি কোং	"	১৬
৯.	রেমা	ইম্পিরিয়েল টি কোং	"	২৪
১০.	লস্করপুর	লস্করপুর টি কোং	"	১৯
১১.	লালচান্দ	মিঃ আর. এল প্রভৃতি	"	১২
১২.	সুরমা	ইম্পিরিয়েল টি কোং	মাধবপুর	২০

তদ্ব্যতীত উত্তর শ্রীহট্টের অধীনে—

চোবাগাঙ্গ, দনকন গোল, দলদলি, ছড়া ও হামিদ নগর এই পাঁচটি চা বাগান।

করিমগঞ্জের অধীনে—

ত্রিমিতি, দুল্লভছড়া, রামনগর, টি ষ্টেট ও পাথরিয়া এই পাঁচটি চা ক্ষেত্র

দক্ষিণ শ্রীহট্টের অধীনে—

একারুনী, খাইছড়া, গন্ধিছড়া, তিলকপুর, দেওছড়া, দিলদরপুর, ভুবাছড়া, খালছড়া ও সুনতলা এই নয়টি চা বাগান।

এবং হবিগঞ্জের অধীনে—

কমলছড়া, কাপাইছড়া, ঘবঘরিয়া, পাঙ্কুশ ও শিলাছড়া এই পাঁচটি চা ক্ষেত্র। মোট ২৪টি চা বাগানের নাম পূর্ব্বোক্ত বিবরণে লিখিত হয় নাই; এতৎসহ শ্রীহট্টের চা বাগানসমূহের মোট সংখ্যা ১৩০টি।

পরিশিষ্ট (চ)
ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ১ম ভাগ ৫ম অধ্যায়
শড়কসমূহ

উত্তর শ্রীহট্ট

১. শ্রীহট্ট হইতে প্রাচীন প্রধান শড়ক পূর্ব্বাভিমুখে ঢাকাউত্তর পর্য্যন্ত খসিয়া করিমগঞ্জের এলাকায় প্রবেশ করত দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া কাছাড় গিয়াছে। এ শড়ক গাড়ী চলিবার যোগ্য। এ শড়কে দুইটি পরিদর্শন বাংলা আছে। নাম গোলাপগঞ্জ (১০ মাইল দূরে) ও রামদা (১৮ মাইল দূরে)।

২. শ্রীহট্ট হইতে একটা শড়ক পশ্চিমাভিমুখে গোবিন্দগঞ্জ ও তথা হইতে সুনামগঞ্জ গিয়াছে। ইহাও গাড়ী চলিবার যোগ্য। পং বাংলা,—গোবিন্দগঞ্জ (১৪ মাইল)। সুনামগঞ্জ (৪১ মাইল)।

৩. শ্রীহট্ট হইতে একটা শড়ক পূর্ব্ব উত্তরাভিমুখে কোম্পানীগঞ্জ গিয়াছে। পং বাংলা কোম্পানীগঞ্জ (১৭ মাইল)।

৪. শ্রীহট্ট হইতে একটা শড়ক পূর্ব্ব উত্তরাভিমুখে জয়ন্তীয়া—নিজপাট গিয়াছে। (তথা হইতে জোয়াই হইয়া একটা পথ ৬৪ মাইল দূরে শিলং গিয়াছে।) পং বাংলা-হরিপুর (১৪ মাইল); জয়ন্তীয়াপুর (২৬ মাইল)।

(ক)—জয়ন্তীয়াপুর হইতে একটা শাখা-পথ কানাইরঘাট হইয়া শ্রীহট্ট-কাছাড় রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে। পং বাংলা-কানাইবঘাট (২১ মাইল)

৫. শ্রীহট্ট হইতে একটা শড়ক দক্ষিণাভিমুখে ফেঁচুগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। ফেঁচুগঞ্জ পর্য্যন্ত গাড়ী চলিয়া থাকে পং বাংলা ফেঁচুগঞ্জ (১৫ মাইল)।

৬. শ্রীহট্ট হইতে একটি শড়ক দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে বেগমপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। (এ শড়কের একটা শাখা পশ্চিম দিকে বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত গিয়াছে।)

শাখাপথ—শ্রীহট্ট কাছাড-রোডের হেতিমগঞ্জ, এবং গোলাপগঞ্জ হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণমুখে দুইটি শড়ক ঢাকাদক্ষিণ ঠাকুরবাড়ী গিয়াছে এবং শ্রীহট্ট হইতে একটা শড়ক জলালপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

করিমগঞ্জ

১. শ্রীহট্ট-কাছাড-রোডের একটা শাখা চ্ড়খাই হইতে পূর্ব্বাভিমুখে করিমগঞ্জ হইয়া বদরপুর ও তথা হইতে কাছাড় গিয়াছে। পং বাংলা সেওলা। ডাক বাংলা করিমগঞ্জ ও বদরপুর।

২. করিমগঞ্জ হইতে দক্ষিণাভিমুখে দুল্লভছড়া পর্য্যন্ত একটা শড়ক গিয়াছে। পং বাংলা-নিলাম বাজার (১০ মাইল); পাথারকান্দি (২০ মাইল); দুল্লভছড়া (৩৪ মাইল)।

(ক) শাখা—পাথারকান্দি হইতে পশ্চিমাভিমুখে বড়লিখা।

(খ) পাথাবকান্দি হইতে দক্ষিণাভিমুখে চান্দখিরা, বৈঠাখাল হইয়া হাতীখিরা পর্য্যন্ত।

(গ) পাথাবকান্দি হইতে দক্ষিণাভিমুখে শিলুয়া পর্য্যন্ত।

৩. শ্রীহট্ট-কাছাড় রোডের চুড়খাই-করিমগঞ্জ শাখা হইতে একটা শড়ক পশ্চিমাভিমুখে লাতু ও তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখে বডলিখা ও জুড়ী ষ্টেশন হইয়া দক্ষিণ শ্রীহট্টে প্রবেশ করিয়াছে। পং বাংলা-বড়লিখা (১৫ মাইল)।

(ক) শাখা—লাতু ষ্টেশন হইতে পশ্চিমাভিমুখে (৪ মাইল দূরে) জলডুব ও তথা হইতে উত্তরাভিমুখে (৭ মাইল দূরে) বৈরাগী বাজাব পর্য্যন্ত গিয়াছে।

(খ) লাতু ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বাভিমুখে (৮ মাইল দূরে) নিলামবাজার পর্য্যন্ত।

দক্ষিণ শ্রীহট্ট

১. শ্রীহট্ট—ফেঁচুগঞ্জ রাস্তা বর্দ্ধিত হইয়া ভাটেরা, বরমচাল, হিঙ্গাজিয়া, তাজপুর প্রভৃতি অতিক্রম করত: শ্রীমঙ্গল ও মীরপুর হইয়া হবিগঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে।

পং বাংলা-শ্রীমঙ্গল ও মীরপুর।

(ক) শাখা—হিঙ্গাজিয়া হইতে মৌলবীবাজার।

(খ) শমশেরনগর ষ্টেশন হইতে মৌলবীবাজাব।

(গ) শ্রীমঙ্গল হইতে মৌলবীবাজার।

(ঘ) মৌলবীবাজার হইতে মনুমুখ (৯ মাইল দূরে)

হবিগঞ্জ

১. হবিগঞ্জ হইতে একটা শড়ক পশ্চিমাভিমুখে বাণিয়াচঙ্গ হইয়া জলসুখা গিয়াছে।

(ক) শাখা—হবিগঞ্জ হইতে মাদনা।

(খ) মুচিকান্দি হইতে ইটাখোলা।

২. হবিগঞ্জ হইতে দক্ষিণাভিমুখে একটা শড়ক গোবিন্দপুর গিয়াছে।

(ক) শাখা—জগদীশপুর হইতে মাধবপুর।

সুনামগঞ্জ

১. গোবিন্দগঞ্জ হইতে একটা শড়ক সুনামগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

পরিশিষ্ট (ছ)

(ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ১ম ভাগ ৭ম অধ্যায়)

সবডিভিশনানুসারে জাতি নির্দ্দেশে সংখ্যা

জাতি	উত্তর শ্রীহট্ট	করিমগঞ্জ	দক্ষিণ শ্রীহট্ট	হবিগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	মোট
কায়স্থ	১৫১৯৭	৬৯২৬	৮৯৮৮	২২০১২	১০৭৬০	৬৩৮৮৩
কামার	১০৫১	২২৮৫	২৮৬৮	২৪৮৫	১০০৬	৯৪৯৫
কুমার	১৩১০	১৯৯৮	৩৪৩৭	৩৯১৫	১৬৭৮	১২২৭৮
গণক	৭০৭	৪৫৬	৮৮৩	২৬০৮	৯৫৬	৫৬১০
গোয়ালা	১৩২৫	১৬৮৩	৫৭৭৪	৪৭৮৪	৫৬১	১৪১২৭
চামার	৪৯৮	৬৮৫৭	১০১৬৭	১৯৬১	২৭৬	১৯৭৫৯
ঢোলি	৯৭০	৬৬৮	৬৫৪৯	১৩৩২	৫৮৪	১০১০৩
তেলি	৩২৫২	৫১৪৭	৮৭৭৮	৯০৮১	৩৯৫৪	৩০৩১২
দাস	১৪৯৮৩	২১৫০২	২০৬৫৩	৩৩৯৭২	৬৩১৫৩	১৬৪২৬৩
ধোপা	৪৫৭৯	৪০৮৮	৫৫২৫	৫১২৩	৪০৭৩	২৩৫০৮
নমঃশূদ্র	২০৭৩৫	৩৫৮৫৮	১৫১৮২	৪২৩১৭	১৮২১৫	১৩২৩০৭
নাপিত	৩৪০৯	২৮৭৫	৪৫১২	৬৯২৩	৩৫০৫	২০২২৪
ব্রাহ্মণ	৮৬০১	৬৩৪৪	৯১৬৫	১১২৩৬	৪৪১৫	৩৯৭৬১
ভূঁইমালী	৬৪৫৪	১০১০৫	১৮৪১৩	৩৮৮০	১৫৩২	৪১১৮৪
মণিপুরী	৮১৭	১৩১১১	২৭৮	৫৩০	১৩০৭	১৬০৪৩
যুগী	১৫১৯৭	১৪৪৯৯	১৫৮৬৪	২১৯৮৬	১১৩৬৯	৭৮৯১৫
বারুই	১২৫১	৩৮৩৮	৯০২০	২২৩৫	২	১৬৩৪৬
----	৯৬২	৪৪৯	১১৭৩	৯০১	৩১১	৩৭৯৬
----	২৯৯৮	৩৮৭৮	৩৭৬৫	১৬৪৬৯	৭২৯৬	৩৪৪০৬

ক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

পরিশিষ্ট (জ)

(ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ১ম ভাগ ৭ম অধ্যায়)

১৯০১ খৃষ্টাব্দের চা-বাগানে কুলি সংখ্যা।

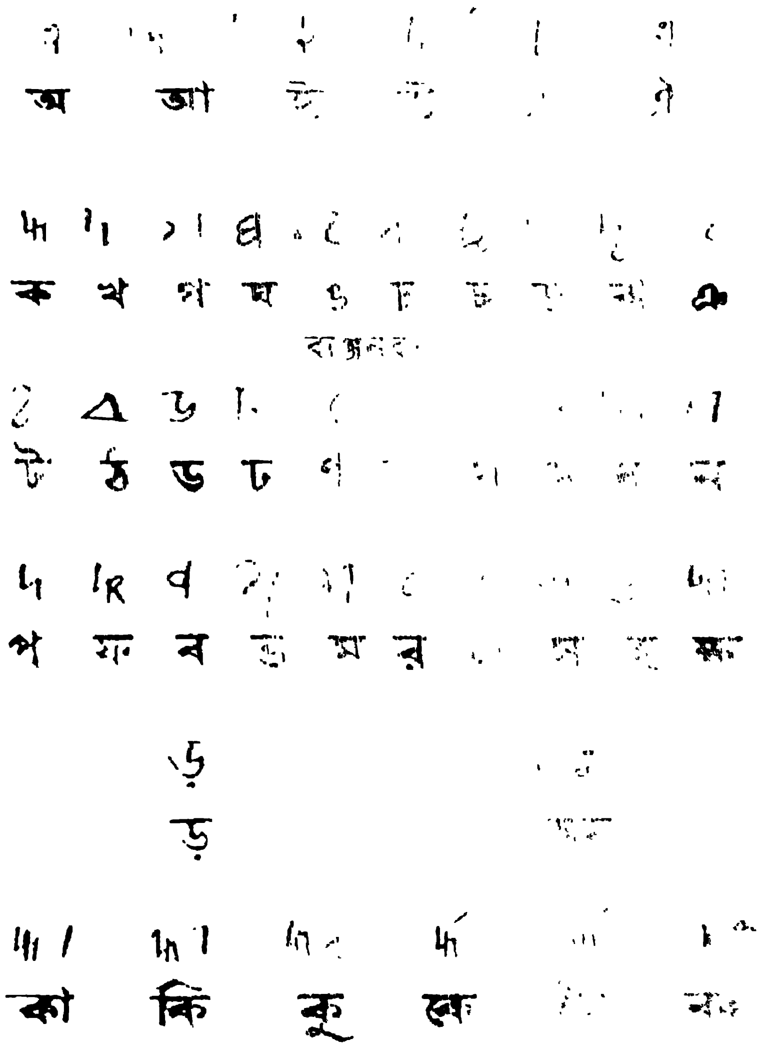
জাতি	পুং	স্ত্রী	জাতি	পুং	স্ত্রী
আগরিয়া	৯০	[illegible]	কুরামি	২৫৯১	১৯৭০
আগরওয়ালা	৮	[illegible]	কেওয়াত	২৪৪	২২৮
দাহিব	২৭৫[illegible]	[illegible]	কোচ	২০	৪৪
দাদুরা	১৯	[illegible]	কোল	১৯৫৬	১৭৮৬
আসামী	৩৭	[illegible]	কোরা	৫৯৯	৬৩৫
বাওন	৫৪[illegible]	[illegible]২৬	খস	১৬০৪	১৪৭৯
ইরি	[illegible]	[illegible]২১	খান	১৫৩	৮৬
মন্দ	[illegible]	২৪২	খান্দাইত	৫০	২৮
পাণ্ড	[illegible]	৫৫৭	খাবিয়া	২০৪	১৮৬
লওয়ার	[illegible]	১০২	[illegible]	৬৫	১১৪
গবাইট	২২৭	১৫৭	মাঝি	৪৫০	৪৬৪
গুরং	১৫৪	১২৫	মালো	৮৮০০	৭১৮২
ঘাটওয়ালা	২২০	২৩৪	মুন্দ	৩৮৫৯	৪১৫৭
ঘাসি	৬৩৭	৭৬১	মুসহর	১৪৬৮	১৪৩৭
চাষা	৪৩৭	১২৪	পাশী	১৯১৭	১৯০৮
নাগবংশী	১৩১	১১২	রাজওয়ার	১৭৯	৩১৭
নুনিয়া	২১০১	১৩৬০	রাজবংশী	৩০৯	২৬৩
তেলিঙ্গা	২৮৫	২৯৬	রাজবহর	৮৬৮	৫৫২
দোশাদ	১৩৯৪	১৪৫৮	লহাইতকুরি	২২৩	১৭৫
বাগদি	১০৬০	৯১৬	সাওতাল	৯৫৩৬	৬৮৫৭
বাণিয়া	৩৮৯	৪৭৬	সূত্রধর	৬৮৮৫	৬৮৬৩
বাউরি	৪৮১৭	৪২৮২	সূরাহিয়া	৩৭৪	০
বৈরাগী	১০০২	১২৬০	সেওর	২	১২
ভর	৪৪২৪	৪৪৩৪	হাইজঙ্গ	১৫১৬	১২৮৯
ভূইয়া	৩৫২৫	৩৪৮১	ক্ষত্রি	৫৩৫২	৫৩৩৮
ভূমিজ	২৫৬০	২৫২৮	ক্ষামতি	০	
মহিলি	৫৭০	৪০২			

অল্প সংখ্যক বলিয়া এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি জাতীয় লোকের সংখ্যা এ তালিকাভুক্ত করা হয় নাই।

পরিশিষ্ট (ক)

শ্রীহট্টের মোসলমানী নাগরাক্ষর

স্বরবর্ণ



পরিশিষ্ট (ঞ)

(ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ১ম ভাগ ৯ম অধ্যায়)

প্রধান দেবালয়সমূহ

উত্তর শ্রীহট্ট

নাম।	স্থাপয়িতা।	ঠিকানা প্রভৃতি
কালভৈরব	১৭৫০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত	দশনামী আখড়া নামে খ্যাত।
কালী	১৮০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত।	লংলাবাসী কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের তত্ত্বাবধানে কালীঘাটে প্রতিষ্ঠিত।
গোপাল জিউ	১৭৫০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত	আখড়ার নাম গোপালটীলা।
গোবিন্দ জিউ	১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রাঘব খলাবাসী জগন্নাথ নাজির কর্ত্তৃক স্থাপিত।	নয়া শড়ক শ্রীহট্ট।
গোবিন্দ জিউ	১৮০০ খৃষ্টাব্দে যশবন্ত সিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত।	জিন্দাবাজার, সিলেট।
জগন্নাথ জিউ	১৭৫০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত।	বালাগঞ্জ, শ্রীহট্ট।
জগন্নাথ জিউ	১৭৫০ খৃষ্টাব্দে হরকৃষ্ণ গোসাঞি কর্ত্তৃক স্থাপিত।	জিন্দাবাজার।
জগন্নাথ জিউ	১৮০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত।	কালীঘাট, শ্রীহট্ট।
মহাপ্রভু জিউ	১৭৫০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত।	সাদিপুর, শ্রীহট্ট।
রাধামাধব জিউ	১৭০০ ঠাকুর যুগল কর্ত্তৃক স্থাপিত।	যুগলটীলার আখাড়া নামে খ্যাত।
বলদেব জিউ	১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মদনমোস্সি স্থাপিত।	মিরাবাজার, শ্রীহট্ট
শ্রীদুর্গা	১৭৮০ খৃষ্টাব্দে লালা গৌরহরি সিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত।	শ্রীদুর্গা বাড়ী নামে খ্যাত।
শ্যামসুন্দর	১৮৫০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত।	শ্যামসুন্দরের আখড়া।

করিমগঞ্জ

কানাই লাল	ঠাকুর ফকির কর্ত্তৃক স্থাপিত।	হাটখলা, প্রতাপগড়।
মহাপ্রভু	ঠাকুর ফকির কর্ত্তৃক স্থাপিত।	বাদে কুশিয়ার কুল।
মহাপ্রভু	বাবু মুরারি চন্দ্র কর্ত্তৃক স্থাপিত।	ডৌয়াদি।

দক্ষিণ শ্রীহট্ট

মহেশ্বর	১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে হৃদয়ানন্দ দত্ত কর্ত্তৃক স্থাপিত।	গয়ঘর, ইটা।

কালী	১৭২৮ খৃষ্টাব্দে রাজারাম দাস কর্ত্তৃক স্থাপিত।	কদমহাটা, শমশের নগর
কালী	১৮০০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গারাম শর্ম্মা কর্ত্তৃক স্থাপিত।	সাধুহাটী, হাউলি সতরসতা
জগন্নাথ	১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ দাস কর্ত্তৃক স্থাপিত।	আখাইলকুর, শমসের নগর
বিনোদরায়	১৭০০ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর শান্তরাম কর্ত্তৃক স্থাপিত।	পানিশালি ইন্দ্রেশ্বর।
বিষ্ণুপদ	গয়ঘর বাসী অনুপরাম দত্ত কর্ত্তৃক ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত।	আব্দা, ইটা।

হবিগঞ্জ

কালী	মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য	বৈষগা-রাজকাছারী
কালী, মহাদেব ও বিষ্ণু	কেশব মিশ্র।	বাণিয়াচঙ্গ।
কালী, মহাদেব ও বিষ্ণু	১৭০০ খৃষ্টাব্দে লস্করপুরে স্থাপিত ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হবিগঞ্জে স্থানান্তরিত।	সহরে
গিরিধারী	রাঢ়ীশালবাসী লালসিং চৌধুরী কর্ত্তৃক ১৭০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। নয়াগাও মহাপ্রভুর কর্ত্তৃক ১৭০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত।	আখড়া।
গোবিন্দ জিউ	কৃষ্ণদাস রামায়েত।	নবিগঞ্জ বাজার।
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	রামনারায়ণ ও রাজনারায়ণ সাহা কর্ত্তৃক স্থাপিত।	ঘাটীয়া।
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বিদুরানন্দ গোস্বামী কর্ত্তৃক স্থাপিত।	ইকবাম।
রাধাগোবিন্দ	কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী।	মুড়াকড়ি।

সুনামগঞ্জ

নাম	স্থাপয়িতা।	ঠিকানা প্রভৃতি
কালী	বাণিয়াচঙ্গের হিন্দু ভূস্বামী স্থাপিত।	মন্দলীবাগ, ছাতক।
কালী	১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিলক নন্দী স্থাপিত।	তাঁতিকোণা, ছাতক
কালী	১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত।	সহরে।
চৈতন্যমহাপ্রভু	১৮০০ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ চৌধুরী।	তাঁতিকোণা, ছাতক।
জগন্নাথ	১৮০০ খৃষ্টাব্দে সুনামদী সিপাহী।	সহরে।
জগন্নাথ	১৮০০ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথপুরের চৌধুরীগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত	সহরে।
রাধামাধব	১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জানকীদাসী বৈষ্ণবী কর্ত্তৃক স্থাপিত।	পাথারিয়া

পরিশিষ্ট

দ্বিতীয় ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

পরিশিষ্ট (ক)

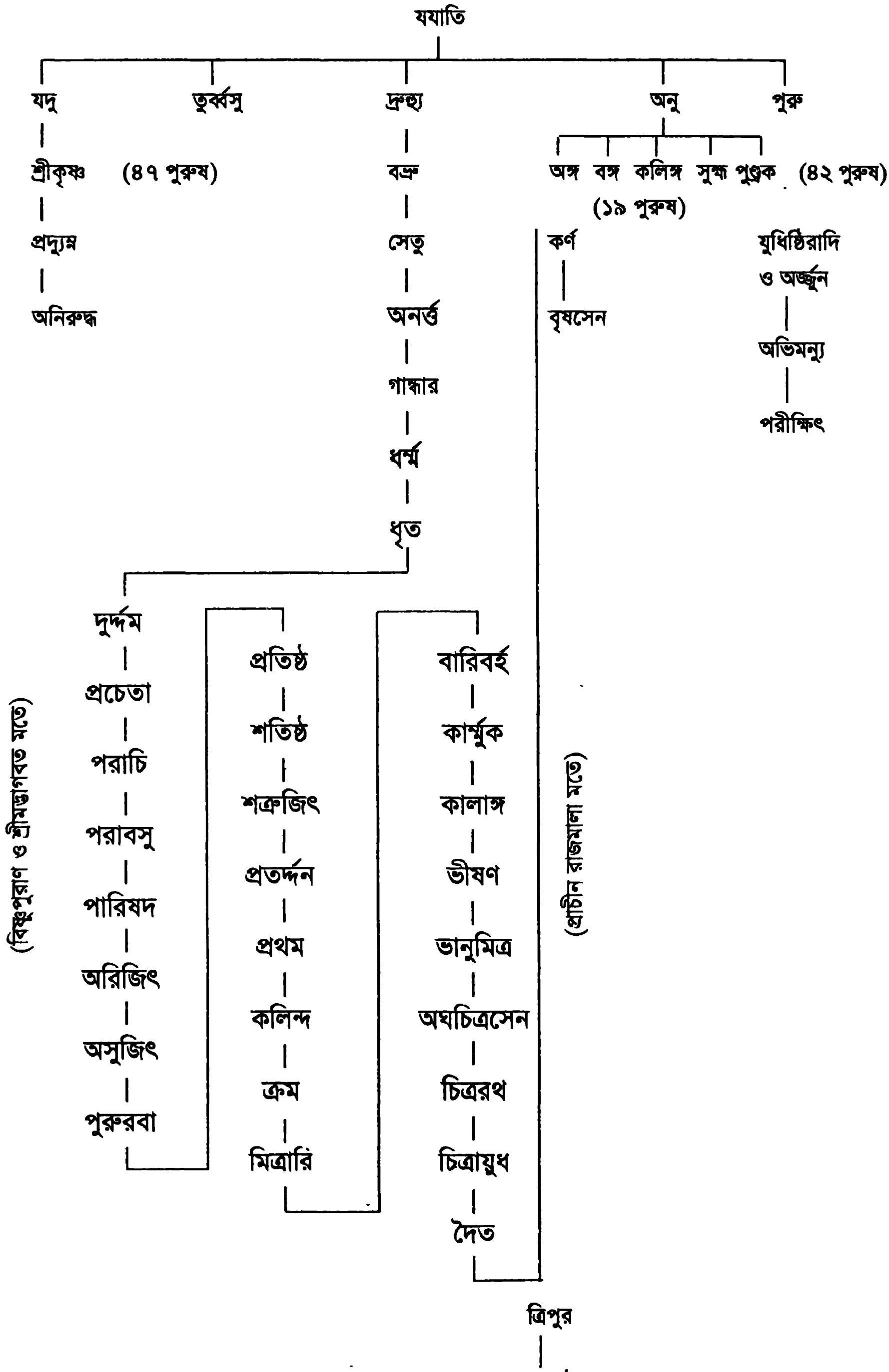
ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত
(২য় ভাগ ১ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়)

ত্রৈপুর রাজবংশ তালিকা

১. রাজমালা, ২. বিশ্বকোষ ও মহারাজ স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের অর্থসাহায্যে বিতরিত শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকা। প্রকাশিত তিনটি বংশ-তালিকা অবলম্বনে বিশেষ আলোচনা পূর্ব্বক লিখিত। (তিনটি বংশ-পত্রের লিখিত নামাবলীতে অনৈক্য প্রদর্শন জন্য নামের পূর্ব্বে যথাক্রমে (১) (২) (৩) সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে; এই অঙ্কপাত না থাকিলে তিনটি তালিকার মিল আছে বুঝিতে হইবে)

চন্দ্র
|
বুধ
|
পুরুরবা
|
আয়ু
|
নহুষ
|

(পরের পৃষ্ঠায়)


যযাতি
যদু
তুর্ব্বসু
দ্রুহ্য
অনু
পুরু
শ্রীকৃষ্ণ
(৪৭ পুরুষ)
বভ্রু
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্রক
(৪২ পুরুষ)
(১৯ পুরুষ)
প্রদ্যুম্ন
সেতু
কর্ণ
যুধিষ্ঠিরাদি
ও অর্জ্জুন
অনিরুদ্ধ
অনর্ত্ত
বৃষসেন
অভিমন্যু
গান্ধার
পরীক্ষিৎ
ধর্ম্ম
ধৃত
দুর্দ্দম
প্রচেতা
পরাচি
পরাবসু
পারিষদ
অরিজিৎ
অসুজিৎ
পুরুরবা
প্রতিষ্ঠ
শতিষ্ঠ
শক্রজিৎ
প্রতর্দ্দন
প্রথম
কলিন্দ
ক্রম
মিত্রারি
বারিবর্হ
কার্ম্মুক
কালাঙ্গ
ভীষণ
ভানুমিত্র
অঘচিত্রসেন
চিত্ররথ
চিত্রায়ুধ
দৈত
(বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত মতে)
(প্রাচীন রাজমালা মতে)
ত্রিপুর

(পরের পৃষ্ঠায়)

ত্রিলোচন
দক্ষিণ
৩য় দক্ষিণ
সুদক্ষিণ
ধর্ম্মতর
ধর্ম্মপাল
সুধর্ম্ম
তরবঙ্গ
দেবাঙ্গ
নরাঙ্গিত
ধর্ম্মাঙ্গদ
রুক্মাঙ্গদ
সোমাঙ্গদ
নৌযুংরায়
তরযুঙ্গ
১,২ তররাজ
৩ (রাজধর্ম্ম)
হামরাজ
বীরারাজ
শ্রীরাজ
শ্রীমান
লক্ষ্মীতরু

১, ২ তরলক্ষ্মী
৩ (রূপরায়)
১, ২ মাইলক্ষ্মী
৩ (লক্ষ্মীবান)
নাগেশ্বর
যোগেশ্বর
১, ২ ইশ্বর ফা
৩ (নীলধ্বজ)
১, ২ বঙ্গখাই
৩ (বসুরাজ)
ধনরাজফা
১, ২ মুচুংফা
৩ (হরিহর)
১, ২ মাইচুফা
৩ (চন্দ্রশেখর)
১ তওরাজ
২ তরুরাজ
৩ চন্দ্রসিংহ
১ তরফাণাইফা
২ ত্রিপলী
৩ সুমন্ত
৩ ধম্মন্ত
(এই নাম বিশ্বকোষ
ও রাজমালায় নাই)
রূপবন্ত
তরহাম

১, ২ খাহাম
৩ (হরিরাজ)
১, ২ কতরফা
৩ (কালীরাজ)
১, ২ কালতরফা
৩ (মাধব)
চন্দ্রফা
গজেশ্বর
বীরারাজ
নাগেশ্বর
শিখিরাজ
দেবরাজ
১ ধুরাসা
২ ধরাঈশ্বর
৩ ধূসরাঙ্গ
১ তীররাজ
২ ত্রিরাজ
৩ বারকীর্ত্তি
সাগরফা
সূর্য্যরায়
১ হাতুংফণাই
২ উত্তুঙ্গফণী
৩ ইন্দ্রকীর্ত্তি

১, ২ চরাচর
বীরসিংহ

১, ২ হাচুংফা
৩ সুরেন্দ্র

বিমার

কুমার

সুকুমার

১ তছরাও
২ তক্ষরাও
৩ বীরচন্দ্র

মিসনিরাজ

১, ২ তেংফা
৩ নগেন্দ্র

নরেন্দ্র

ইন্দ্রকীর্ত্তি

বিমানরারাজ

যশোরাজ

১, ২ নবাঙ্গ
৩ বঙ্গ

রাজগঙ্গা

১, ২ শুক্ররায়
৩ চিত্রসেন

প্রতীত

১ মিরিছিম
২ মরুসোম
৩ মরীচি

গগণ

১ নওরাজ
১ নওরাজ
২ নবরায়
৩ কীর্ত্তি

১ জুজারুফা
২ যুদ্ধজয়রাজ
৩ হিমতিছ

১ জাঙ্গেফা
২ জনকেফা
৩ বাজবন্তু

১ দেবরায়
২ দেবরাজ
৩ পার্থ

১, ২ শিবরায়
৩ সেবরায়

১ ডুঙ্গুরফা
২ দানকুরুফা
৩ হরিরায়
(বা শিবরায়)

২ কুরঙ্গফা
৩ কিরীট

৩ রামচন্দ্র
(এই নাম বিশ্বকোষ ও
রাজমালায় নাই)

১ ছেংফণাই
২ সিংহফণী
৩ নসিংহ

ললিতরায়
মুকুন্দফা

কমলরায়

কৃষ্ণদাস

যশোফা
৩ যশোরাজ

১, ২ মুচঙ্গফা
ও উদ্ধব

১, ২ সাধুরায়
৩ সাধরায়
প্রতাপরায়

বিষ্ণুপ্রসাদ

বাণেশ্বর

বীরবাহু

সম্রাট

১, ২ চম্পা
৩ চম্পাকেশ্বর

মেঘরাজ

১ ছেংফছাগ
২ দানকরুফা
৩ ধর্ম্মধর

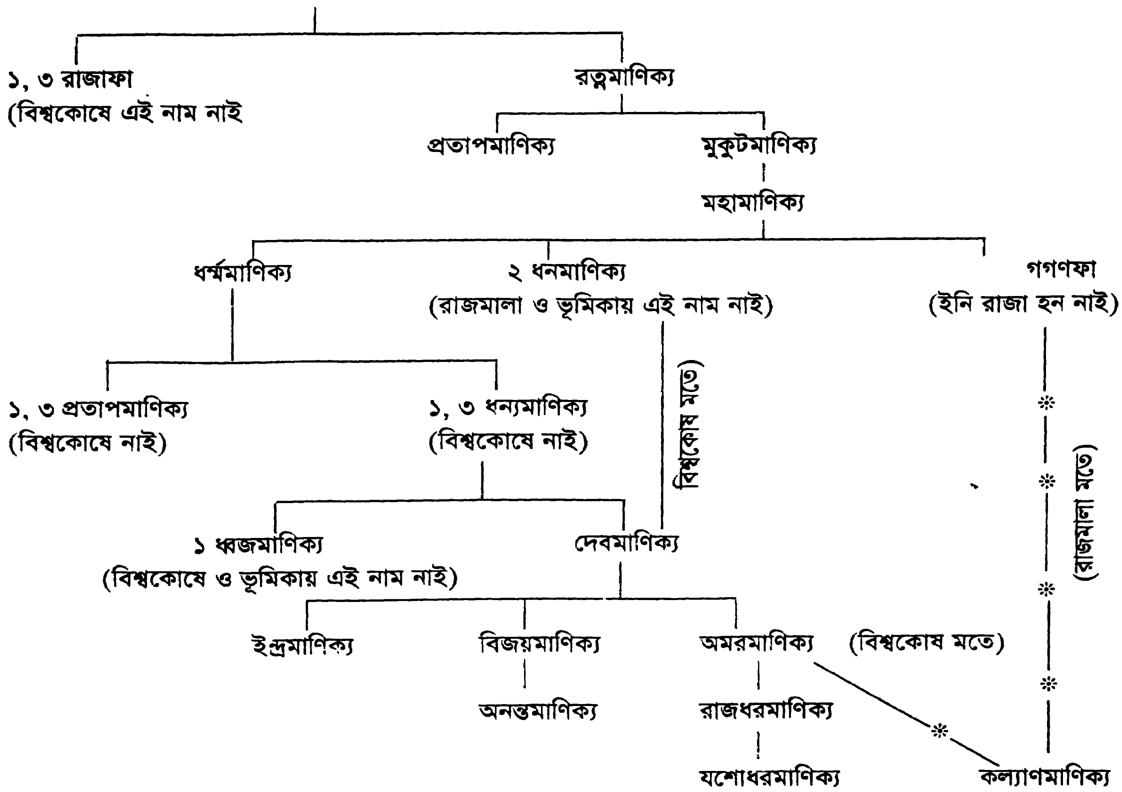
১ ছেংতুম্‌ফা
২ সিংহতুঙ্গফা
৩ কীর্ত্তিধর

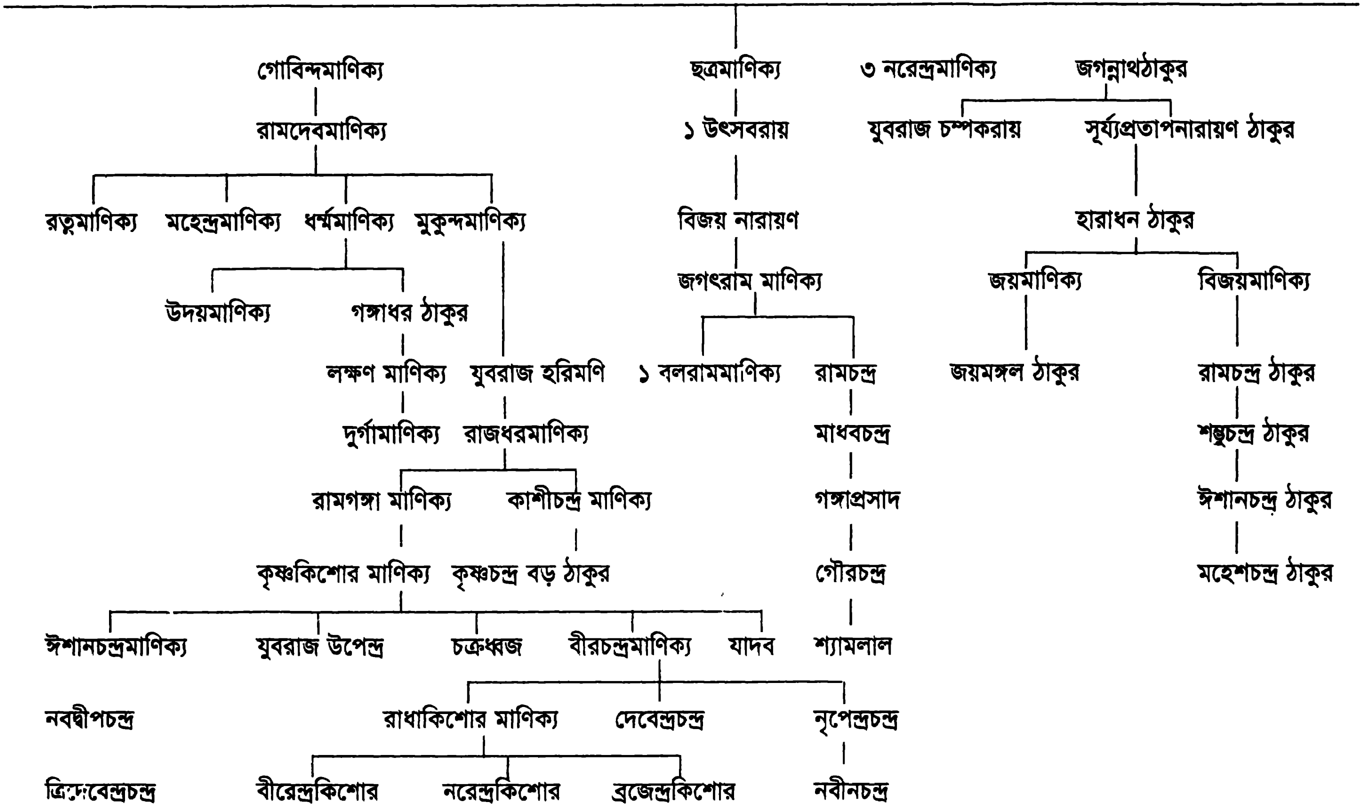
১ আচঙ্গফা
২ কুঞ্জহোমফা
৩ রাজসূর্য্য

১ খিছংফা
৩ মোহন
(বিশ্বকোষে এই নাম
নাই)

১ (দ্বিতীয়)

ডুঙ্গুরফা
২ " দানকুরুফা
৩ " হরিরায়


১, ৩ রাজাফা
(বিশ্বকোষে এই নাম নাই
রত্নমাণিক্য
প্রতাপমাণিক্য
মুকুটমাণিক্য
মহামাণিক্য
ধর্ম্মমাণিক্য
২ ধনমাণিক্য
(রাজমালা ও ভূমিকায় এই নাম নাই)
গগণফা
(ইনি রাজা হন নাই)
১, ৩ প্রতাপমাণিক্য
(বিশ্বকোষে নাই)
১, ৩ ধন্যমাণিক্য
(বিশ্বকোষে নাই)
(বিশ্বকোষ মতে)
(রাজমালা মতে)
১ ধ্বজমাণিক্য
(বিশ্বকোষে ও ভূমিকায় এই নাম নাই)
দেবমাণিক্য
ইন্দ্রমাণিক্য
বিজয়মাণিক্য
অমরমাণিক্য
(বিশ্বকোষ মতে)
অনন্তমাণিক্য
রাজধরমাণিক্য
যশোধরমাণিক্য
কল্যাণমাণিক্য



শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ মতে ত্রিপুরের পূর্ব্বগামী ৩০ পুরুষ পূর্ব্বে দ্রুহ্যুর নাম পাওয়া যায়। রাজমালা মতে দ্রুহ্যুর পুত্রই ত্রিপুর। মাণিক্য উপাধি প্রাপ্তির পরে প্রত্যেক রাজাই ঐ উপাধি ধারণ করেন, উপাধিবিহীন ব্যক্তিগণ সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। গগণফার পরবর্ত্তী কয়েক জন রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তত্তস্থলে (*) তারকা চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে।

পরিশিষ্ট (খ)

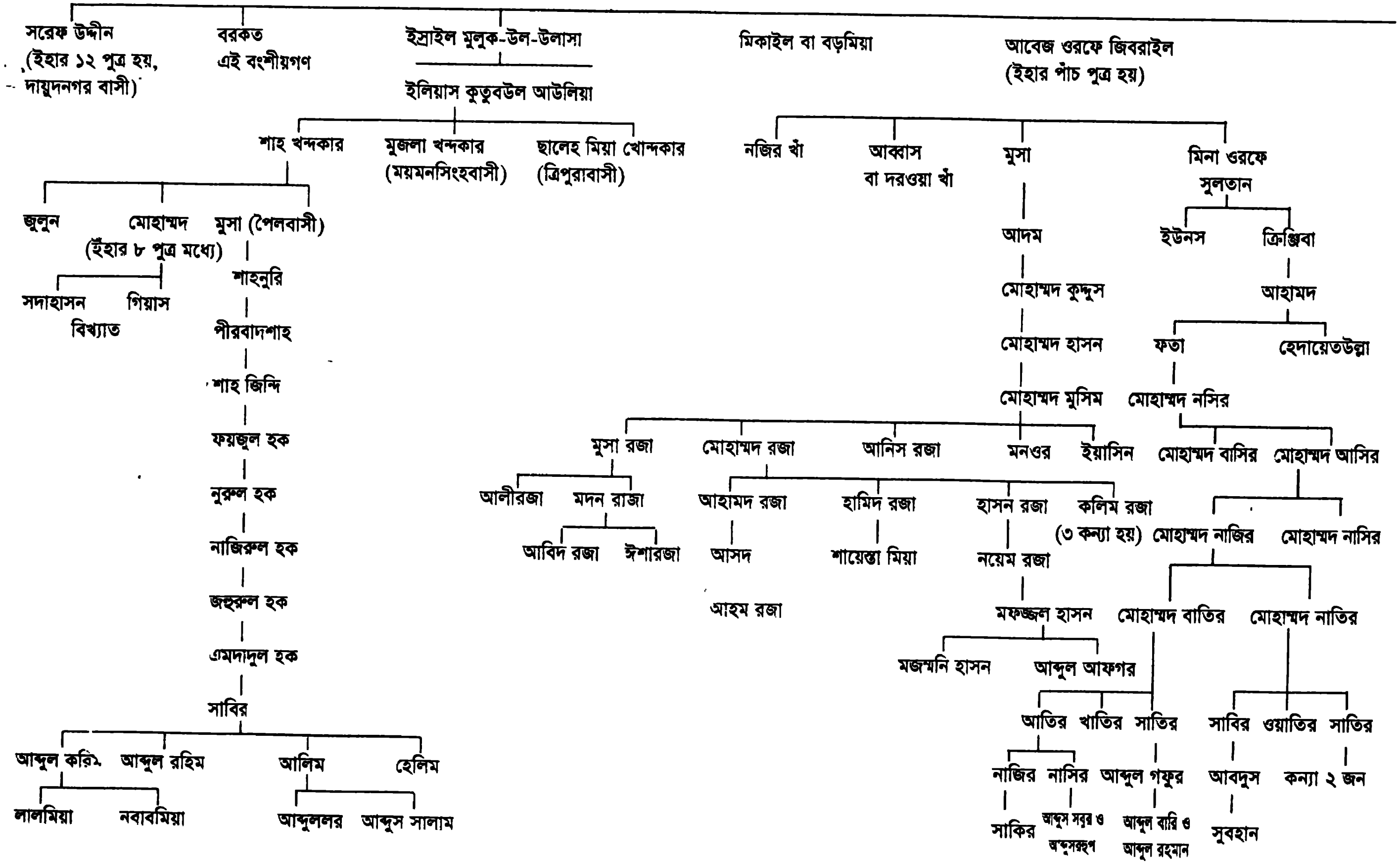
(ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ২য় খণ্ড ১ম অধ্যায়)

তরফের সৈয়দ বংশপত্রিকা

- সৈয়দ শাহ নসিরউদ্দীন সিপা-ই-সালার।*
  - সৈয়দ শাহ সিরাজ উদ্দীন
    - সৈয়দ মুসাফীর
      - সৈয়দ খোদাবন্দ
      - ইসমাইল (ইঁহার চারি পুত্র)
      - সুলেমান
      - ইব্রাহিম মলেক-উল-উলমা।
        - মুসা
          - ০
        - ঈশা
          - ০
        - ইউসুফ
          - ০
        - ইসহাক
          - ০
    - সৈয়দ ফকির (ইহা ছয় পুত্রের একতম রামশ্রী বাসী হন।)

* আলী হইতে নসিরউদ্দীন পর্য্যন্ত বংশাবলী এইরূপ ঃ

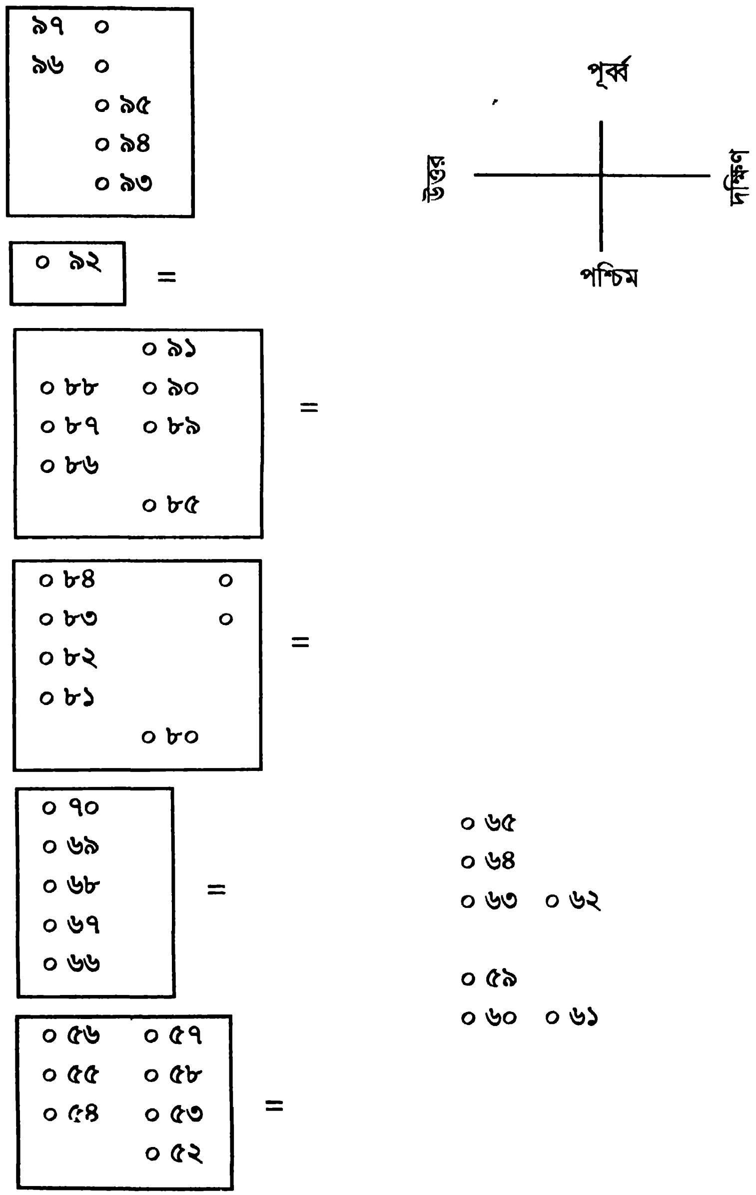
হজরত আলী
|
হজরত হোসেন
|
জয়নল আবেদীন
|
বাখর
|
জাফর
|
মুসা কাজিম
|
মোহাম্মদ তকি
|
মোহাম্মদ নকি
|
হাসন আসগরি
|
মেহেদী
|
খাজা আবুন ফরা
|
খাজা আবুল ফজল
|
খাজা দাউদ
|
হাসন আরবি
|
(ইঁহার পুত্রই সৈয়দ নসির উদ্দীন সিপা-ই-সালার)

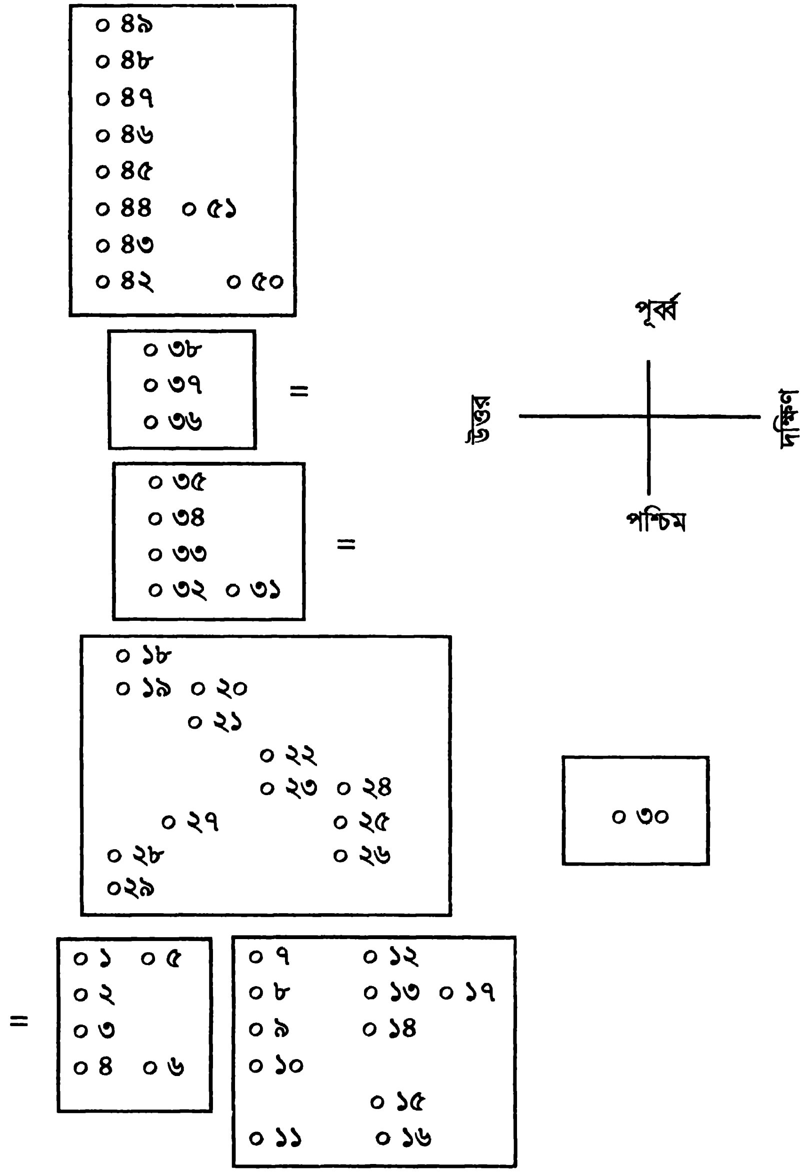

সরেফ উদ্দীন (ইহার ১২ পুত্র হয়, দায়ুদনগর বাসী)
বরকত এই বংশীয়গণ
ইস্রাইল মুলুক-উল-উলাসা
ইলিয়াস কুতুবউল আউলিয়া
শাহ খন্দকার
মুজলা খন্দকার (ময়মনসিংহবাসী)
ছালেহ মিয়া খোন্দকার (ত্রিপুরাবাসী)
জুলুন
মোহাম্মদ (ইঁহার ৮ পুত্র মধ্যে)
মুসা (পেলবাসী)
সদাহাসন বিখ্যাত
গিয়াস
শাহনুরি
পীরবাদশাহ
শাহ জিন্দি
ফয়জুল হক
নুরুল হক
নাজিরুল হক
জহুরুল হক
এমদাদুল হক
সাবির
আব্দুল করিম
আব্দুল রহিম
আলিম
হেলিম
লালমিয়া
নবাবমিয়া
আব্দুললর
আব্দুস সালাম
মিকাইল বা বড়মিয়া
আবেজ ওরফে জিবরাইল (ইহার পাঁচ পুত্র হয়)
নজির খাঁ
আব্বাস বা দরওয়া খাঁ
মুসা
মিনা ওরফে সুলতান
আদম
মোহাম্মদ কুদ্দুস
মোহাম্মদ হাসন
মোহাম্মদ মুসিম
মুসা রজা
মোহাম্মদ রজা
আনিস রজা
মনওর
ইয়াসিন
আলীরজা
মদন রাজা
আবিদ রজা
ঈশারজা
আহামদ রজা
হামিদ রজা
হাসন রজা
কলিম রজা (৩ কন্যা হয়)
আসদ
আহম রজা
শায়েস্তা মিয়া
নয়েম রজা
মফজ্জল হাসন
মজম্মনি হাসন
আব্দুল আফগর
ইউনস
ক্রিঞ্জিবা
আহামদ
ফতা
হেদায়েতউল্লা
মোহাম্মদ নসির
মোহাম্মদ বাসির
মোহাম্মদ আসির
মোহাম্মদ নাজির
মোহাম্মদ নাসির
মোহাম্মদ বাতির
মোহাম্মদ নাতির
আতির
খাতির
সাতির
সাবির
ওয়াতির
সাতির
নাজির
নাসির
আব্দুল গফুর
আবদুস
কন্যা ২ জন
সাকির
আব্দুস সবুর ও অব্দুসরুহুপ
আব্দুল বারি ও আব্দুল রহমান
সুবহান

পরিশিষ্ট (গ)

(ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৫ম অধ্যায়)

মুড়ারবন্দের দরগার নক্সা





মুড়ারবন্দের দরগায় শতাধিক কবর আছে, অধিকাংশই পৃথক ইষ্টকময় প্রাচীর বেষ্টিত ও উপরে ইষ্টকস্তূপ বিশিষ্ট। সৈয়দ নসিরউদ্দিন সাহেবের দেহ অন্তর্হিত হইলে তদীয় বস্ত্রাদি শ্রীহট্টে ও এই স্থানে কবর দেওয়া হয়। দরগাটির পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত, পূর্ব্ব প্রান্তে খোয়াই নদী প্রবাহিত। (০) শূন্য চিহ্ন দ্বারা কবরের অবস্থান পরিচিহ্নিত করা হইয়াছে। দুইটি রেখা পাতন পূর্ব্বক প্রবেশ পথ পরিচিহ্নিত করা হইয়াছে। এই নক্সা ১২০০ (অস্পষ্ট) অঙ্কিত নক্সা দৃষ্টে এই স্থলে যোজিত করা হইল। নিম্নে কবর সংখ্যানুসারে নির্দ্দেশ করা গেল, যথা—

শাহ্ সিরাজউদ্দিন
" নসিরউদ্দীন
ঐ স্ত্রী
শাহ মহেবউল্লা সাহবের স্ত্রী
শাহ মহেবউল্লা
ঐ ভ্রাতা
১১ শাহ মোহাম্মদ উল্লা
১৮ বড়মিয়া
১৯ দৌলত আবিদ
২২ শাহ দাউদসাহেবের স্ত্রী
২৩ শাহ দাউদ
২৮ শাহ খোদাবন্দ সাহেবের স্ত্রী
২৯ শাহ খোন্দাবন্দ
৩০ শাহ হাসনআলি
৩৩ সৈয়দশাহ
৩৪ শাহ সয়েফ
৩৫ ঐ স্ত্রী
৩৭ শাহ ইস্রাইল
৪৬ কুতুব-উল-আউলিয়া

৪৭ ঐ স্ত্রী
৪৮ ঐ বৈবাহিক
৪২ }
৪৩ } ঐ শিষ্য
৪৪ }

৫৫ শাহনুরি
৫৬ ঐ স্ত্রী
৫৯ মৌলবী ইসমাইল
৬০ আব্দুল ইমাম
৬১ সওদাগর আজিমাবাদ
৬২ একটি মসজিদগৃহ
৬৩ ইয়ার,মোহাম্মদ
৬৪ হাজি দৌলত
৬৫ মোহাম্মদ ইউসুফ
৬৮ শাহ খোন্দকার
৬৯ ঐ স্ত্রী
৮২ মিয়াখোন্দকার
৮৩ ঐ স্ত্রী
৮৭ মাজারিয়া খোন্দকার
৮৮ ঐ স্ত্রী
৯০ শাহ মুসা
৯১ ঐ স্ত্রী
৯২ শাহ মোহাম্মদ
৯৩ শাহ আব্বাস বেরারি সাহেবের কবর
৯৪ শাহ গিয়াস
৯৫ শাহ হারুণ

৯৬ শাহ কত্তু
৯৭ শাহ সুলেমন

পরিশিষ্ট (ঘ)
(ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৬।৭ম অধ্যায়)
ইটার রাজবংশাবলী–১ম

বাৎস গোত্রীয় আনন্দ হইতে পঞ্চদশপুরুষের নাম অজ্ঞাত, তৎপরঃ–

- নিধিপতি
  - ভূধর
    - কন্দর্প
      - বৃহস্পতি
        - লক্ষ্মীনাথ
          - দেবচন্দ্র
            - ভাস্কর
              - কেশব
                - কামদেব
                  - মহাদেব (মহাদেবি বড়কাপন
            - পুস্কর
            - প্রভাকর
              - শুভরাজ খাঁ
                - ভানুনারায়ণ
                  - রাজাসুবুদ্ধিনারায়ণ (সুবিদ নারায়ণ)
                    - (সূর্য্যনারায়ণ)* জামাল খাঁ
                    - (চন্দ্রনারায়ণ) কামাল খাঁ
                    - (শিবনারায়ণ) হাজি খাঁ
                      - অজ্ঞাত
                        - অজ্ঞাত
                          - অজ্ঞাত
                            - শাহ মোহাম্মদ
                            - আব্দুল মজিদ
                    - (কৃষ্ণনারায়ণ) ঈশা খাঁ
                - ইন্দ্রনারায়ণ*
              - শ্রীকৃষ্ণ
                - শ্রীপতিনারায়ণ (শ্রীপাড়া)

আবদুল মন্‌সুর
- আব্দুল মুজঃফর — আব্দুল রহুপ — মোহাম্মদ আনিস — মোহাম্মদ আফজল (ওরফে গান্দরমিয়া) — মোহাম্মদ ইয়াকুব — আমীর উন্নেসা (সিকান্দারমিয়ার স্ত্রী)
- আব্দুল ফজল — আব্দুল নওয়াজ — আব্দুল হাজরি +

আব্দুল মুজঃফর — আব্দুল হেকিম — মোহাম্মদ জাফর ও আব্দুল খয়ের (উভয়ই নিঃসন্তান)

আব্দুল কাশিম — মোহাম্মদ নসরফ — মোহাম্মদ আসরফ — মোহাম্মদ আবিদ — মোহাম্মদ মসরফ ও মস্তাফা

আব্দুল নহুর — মোহাম্মদ আসাদ (যাদু ঠাকুর) — মোহাম্মদ সাদির — মোহাম্মদ বাসির — মোহাম্মদ ওয়াতির (আদলমিয়া)

আব্দুল হুসন — গোলামসফি — মোহাম্মদ জমা — আব্দুল আলী

আব্দুল রহমান — মোহাম্মদ আবিদ — কুরবানআলী — একরামআলী — রেওয়াজআলী

শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মতে।
ইনি এ বংশে অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন, ইনি নিঃসন্তান ছিলেন।

ইটার রাজবংশাবলী–২য়

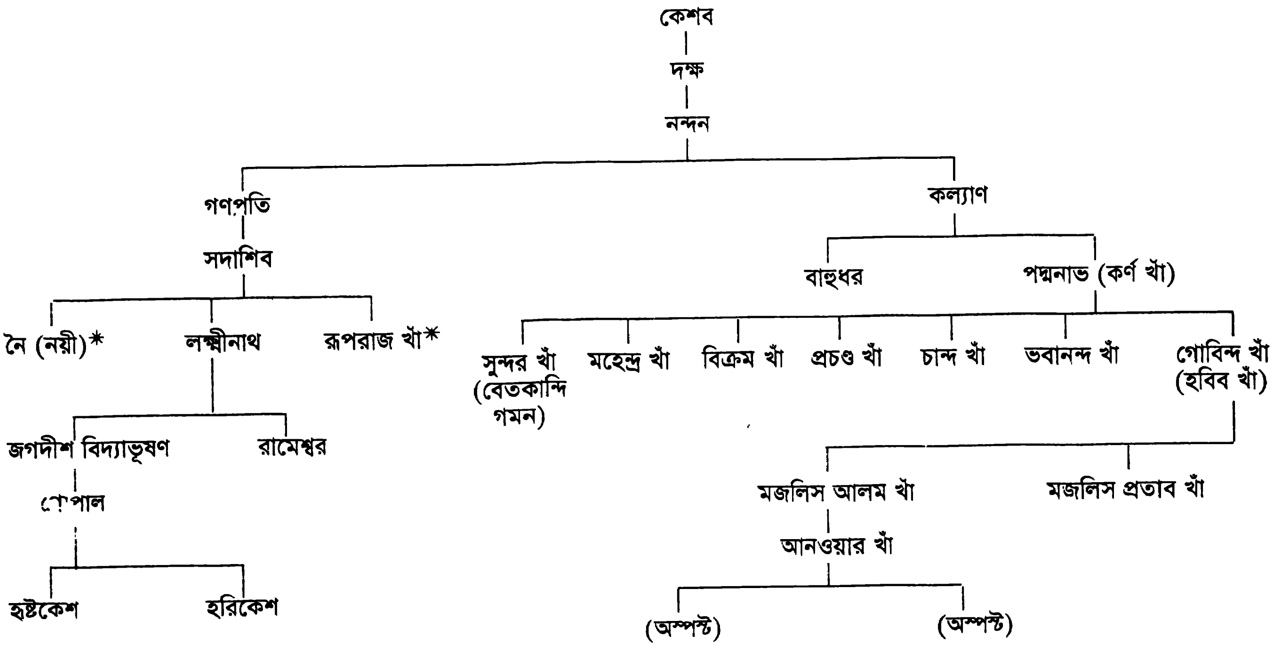
(১ম রাজবংশাবলী প্রথমাংশ দেখ)

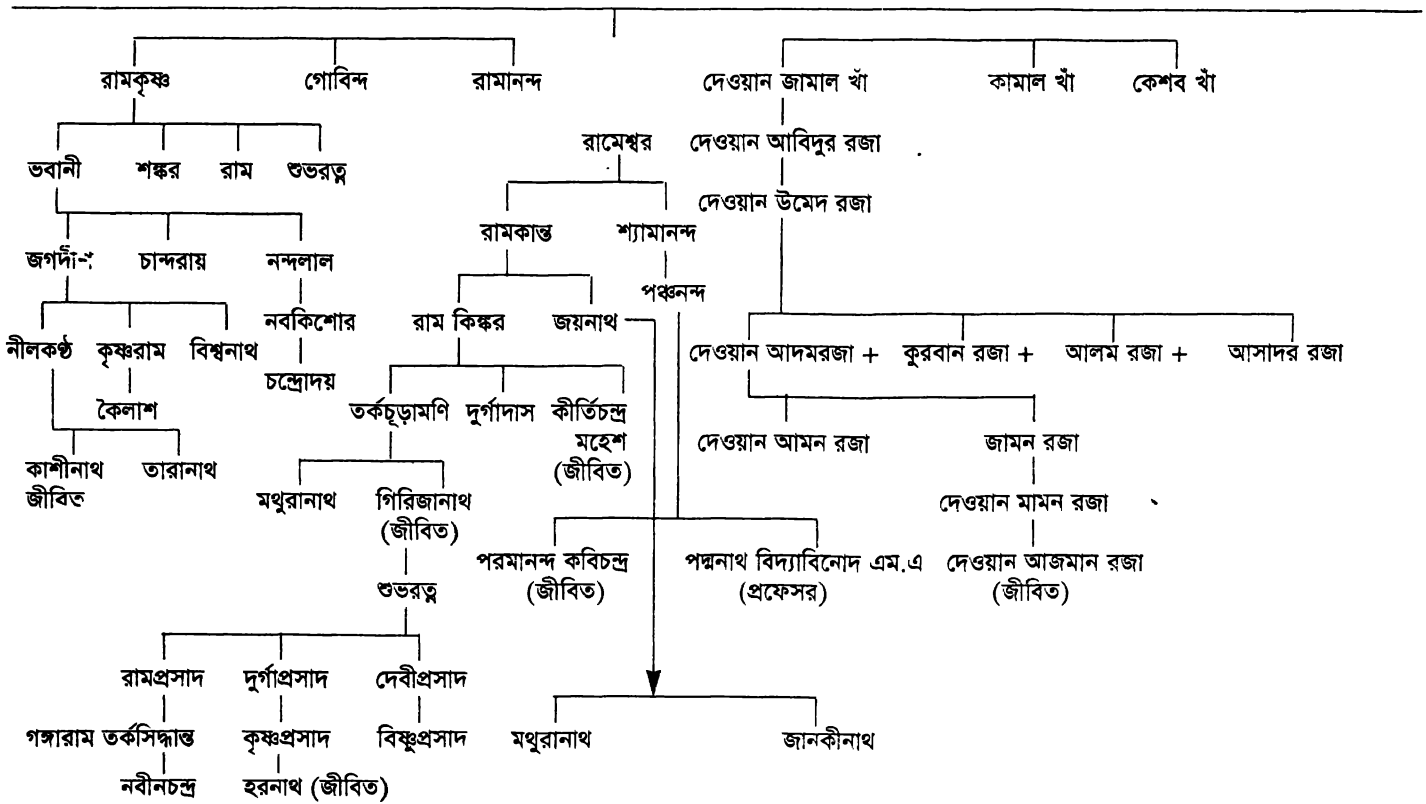
- শুভরাজ খাঁ
  - ভানুনারায়ণ
    - রাজা সুবুদ্ধিনারায়ণ
      - জামাল খাঁ
      - কামাল খাঁ
      - হাজি খাঁ
      - ঈশা খাঁ (কৃষ্ণনারায়ণ)
        - অজ্ঞাত
          - অজ্ঞাত
            - অজ্ঞাত
              - ইলিয়াস খাঁ
                - মোহাম্মদ সফি
                  - মোহাম্মদ তকি (ওরফে এবা)
                    - মোহাম্মদ সকি
                      - মোহাম্মদ মনসুর (কুটুমিয়া)
              - ইসরাইল খাঁ
                - মোহাম্মদ জাফর (বা মোহাম্মদ রূপ বা আলাওল খাঁ)
                  - মোহাম্মদ সকি (বা এতিম)
                    - মোহাম্মদ আলী
              - ইসমাইল খাঁ
                - মোহাম্মদ মইনউদ্দীন
                  - মোহাম্মদ নজু
                    - মোহাম্মদ আমীন (বা আশা)
                      - মোহাম্মদ আলী
                        মোহাম্মদ আসান
                        - আব্দুল খালেক চৌধুরী (খ্যাত সিকান্দর মিয়া)
                          - আব্দুল হামিদ চৌধুরী
                        - আব্দুল করিম চৌধুরী
                          - আব্দুল হেলিম চৌদুরী

পরিশিষ্ট (ঙ)
(ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ১০ ও ১১শ অধ্যায়)
প্রতাপগড়ের রাজবংশ

- মৃজা মালিক মোহাম্মদ তোরাণী
  - বড় মালিক / মালিক কামাল উদ্দীন
    - মালিক প্রতাব (রাজা)
      - বারামত খাঁ (রাজা)
        - জমসের খাঁ
          - আফতাবউদ্দীন (রাজা)
          - সাকিরউদ্দীন
            - সুলতা মোহাম্মদ (রাঙ্গাঠাকুর)
              - জানমোহাম্মদ
                - বদরুদ্দীন মোহাম্মদ
                  - গোলমআলী চৌধুরী
                    - গোলাম রজা
                      - আবিদ রজা
                        - আলী রজা
                          - শ্রীযুত সাদত রজা প্রভৃতি। (ছয় পুত্র জীবিত আছেন।)
                        - আহম্মদ রজা
                          - শ্রীযুত ইয়াকুব রজা
                      - আদম রজা
                    - গোলাম নবি
            - সিরাজুদ্দীন মোহাম্মদ (জফরগড়)
          - ওজমনউদ্দীন
            - আজফর মোহাম্মদ
          - ঔরুদ্দীন
          - তাহিরউদ্দীন
          - আসফউদ্দীন
        - সোবান্দাজ খাঁ
        - সরফরাজ খাঁ
        - তেগরাজ খাঁ
      - বড় খাঁ
      - আদম খাঁ
      - মজলিস করম
      - নওয়া খাঁ
  - ছোট মালিক

পরিশিষ্ট (চ)
(ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ২য় ভাগ ৩য় খণ্ড ২য় ও ৩য় অধ্যায়)
বাণিয়াচঙ্গের রাজবংশ





ইহাদের নামে মহল্লা আছে।

+ ইহাদের নামে চিরস্থায়ী মহাল আছে।

পরিশিষ্ট (ছ)

(ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ২য় ভাগ ৩য় খণ্ড ২য় ও ৩য় অধ্যায়)

জগন্নাথপুরের রাজবংশ

- রমানাথ (লাউড়)
  - একপুত্র (কাশীবাসী)
  - কেশব (জগন্নাথপুরের গমন)
    - শানি বা শনাই
      - প্রজাপতি
        - দুর্ব্বার খাঁ
          - রাজসিংহ (পণ্ডিত খাঁ)
            - জয় সিংহ (গোবিন্দ সিংহ)
            - বিজয় সিংহ
              - রাজবল্লভ (প্রতাপ সিংহ)
                - শ্রীমন্তরায়
                  - মথুরেশ রায়
                    - বিনোদ রায়
                      - যশমন্তরায়
                        - খুলনরায়+ (১৫ নং তাং)
                          - গোকুলচান্দ
                            - গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী
                          - বদনচান্দ
                            - তারানাথ চৌধুরী (জীবিত)
                      - সমুদরায়* (১৪ নং তাং)
                        - সুন্দররায়
                          - রামনারায়ণ
                            - করুণচন্দ্ররায় চৌধুরী (জীবিত)
                  - মধুসূদন রায়
                    - জগৎবল্লভ
              - গন্ধর্ব্বরায়
                - রামচন্দ্র রায়
                  - সুবিদ রায়
                    - রঘুনাথ রায়
                      - পুরুষোত্তম
                        - কামদেব
                          - জীবনরায়+ (৮ নং)
                            - রাজীবরায়
                              - জয়গোপাল
                                - অক্ষয়কুমার চৌধুরী (জীবিত)
                      - জগৎ রায়
                        - হরিরায় + (৮০ নং)
                          - স্বরূপরায়
                            - দীননাথ চৌধুরী
            - পরমানন্দ সিংহ
              - বিনোদ রায়
                - দেবচন্দ্র
                  - রঘুনাথ* (১০ নং তাং)
                    - হরিহর
                      - অনুপ রায়
                        - গোলোকনাথ
                          - গোপীনাথ চৌধুরী
                          - মদনমোহন চৌধুরী
                      - সানন্দ রায়
                        - সদানন্দ
  - একপুত্র (লাউড়ে অবস্থিতি)

ইঁহারা চিরস্থায়ী মহাল বন্দোবস্ত কারক। (মহালের নং নামের পরে দেওয়া হইয়াছে।)

+ ইঁহারা হালাবাদি মহাল বন্দোবস্ত কারক (মহারের নং নামের পরে দেওয়া হইয়াছে।)

পরিশিষ্ট (জ)
(ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ১ম ও ২য় অধ্যায়)
শ্রীহট্টের রেসিডেন্ট ও
কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডিপুটি কমিশনারগণের নামাবলী

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	আগমন কাল (তাং, মাস, খৃঃ)	গমন কাল (তাং, মাস, খৃঃ)
১	মিঃ থেকারে (শ্রীহট্টের প্রথম রেসিডেন্ট)	....	....
২	মিঃ সমনার (Mr. Sumner)	....	....
৩	মিঃ হলাণ্ড (Mr. Holland)	....	....
৪	রবার্ট লিণ্ডসে (Robert Lındsay)	১-১-১৭৭৯	৩০-৬-১৭৮৯
	মিঃ হিন্দমেন (Mr. Hyndamn) মতান্তর		
৫	মিঃ হডসন বা মিঃ হামিল্টন (সহকারী)	ঐ	ঐ
৬	জন উইলিস (John Willis)	৩০-৬-১৭৮৯	৩০-১১-১৭৯৩
৭	(মতান্তরে জে আর বার্নটী)	১-১২-১৭৯৩	১০-১-১৭৯৪
৮	এইচ লজ (H. Lodge)	১১-১-১৭৯৪	১৭৯৭
৯	জে আমুটী (J. Ahmuty)	০-১-১৭৯৭	০-৪-১৮০৩
১০	জে ডবলিউ লেইরি (J. W. Lairy)	০-৪-১৮০৩	০-৭-১৮০৩
	সি এস মলিং (C S Maling)		
১১	(মতান্তরে মিঃ মলিঙ্গ)	০-৭-১৮০৩	০-১-১৮০৭
১২	এফ মারগান (F. Morgan)	০-২-১৮০৭	০-৩-১৮০৮
১৩	জি ফ্রেঞ্চ (G French)	০-৪-১৭০৭	০-১১-১৮০৯
১৪	ই মেক্সুয়েল (E. Mexwell)	১২-১০-১৮০৯	৬-১১-১৮০৯
১৫	(পুনঃ) জে ফ্রিঞ্চ	৭-১১-১৮০৯	৩০-১১-১৮১২
১৬	জে ডবলিউ মেকনবল (G W Macnable)	১-১২-১৮১২	১৬-৩-১৮১৩
১৭	(পুনর্ব্বারি) জে ফ্রেঞ্চ	১৭-৩-১৮১৩	৬-১-১৮১৮
১৮	টমাস বার্ণহাম (Thomas Burnhum)	৬-১-১৮১৮	১৪-১২-১৮১৮
১৯	জে পি ওয়ার্ড (J. P. Ward)	১৪-১২-১৮১৮	১৭-৮-১৮২০
২০	জি কলিন্স (G. Collins)		
	মতান্তরে জি ফকলেস	১৭-৮-১৮২০	৮-৭-১৮২৪
২১	সি টকার (C. Tuker)	৮-৭-১৮২৪	১৭-১২-১৮২৫
২২	ডবলিউ জে টরকুয়াণ্ড (W. J. Turquand)	১৭-১২-১৮২৫	৮-৩-১৮২৬
২৩	(পুনঃ) সি টকার	৮-৩-১৮২৬	২৪-২-১৮২৯
২৪	সি বেরি (C Bury)	২৪-২-১৮২৯	১৫-৭-১৮২৯
২৫	(পুনঃ) ডবলিউ জে টরকুয়াণ্ড	১৫-৭-১৮২৯	৯-৪-১৮৩১
২৬	এফ্ গোল্ডসবেরি (F. Goldsbery)	৯-৪-১৮৩১	১৫-৮-১৮৩১

২৭	জেটেইল ফর্স সতান্তরে ষ্টেইন ফার্স	১৫-৮-১৮৩১	২৬-৬-১৮৩৫
২৮	এ সি বিডউয়েল (A. C. Bidwell)	২৬-৬-১৮৩৫	২৪-১১-১৮৩৫
২৯	আর এইচ মিলটন (R. H Milton)	২৪-১১-১৮৩৫	১৬-১১-১৮৩৫
৩০	এ সি প্লাওডেন (A. C Plowden)	১৬-১১-১৮৩৮	১৭-১০-১৮৩৯
৩১	(পুনঃ) এ সি বিডউয়েল	১৭-১০-১৮৩৯	৩০-৬-১৮৪০
৩২	(পুনঃ) এ সি প্লাওডেন	৩০-৬-১৮৪০	৭-৩-১৮৪২
৩৩	(পুনশ্চ) এ সি বিডউয়েল	৭-৩-১৮৪২	৪-২-১৮৪৩
৩৪	(পুনশ্চ) এ সি প্লওডেন	৪-২-১৮৪৩	২০-৩-১৮৪৩
৩৫	সি এফ সিলী (C. F. Sealy)	২০-৩-১৮৪৩	২৫-৪-১৮৪৩
৩৬	এ এস এনাণ্ড (A. S. Annand)	২৫-৪-১৮৪৩	১-৪-১৮৪৭
৩৭	সি ডবলিউ মেকিলফ	১-৪-১৮৪৭	১-১০-১৮৪৭
৩৮	(পুনঃ) এ এস এনাণ্ড	১-১০-১৮৪৭	১-১২-১৮৪৯
৩৯	ডবলিউ বি ব্যাকল (W. B. Buckle)	১-১২-১৮৪৯	৩-১-১৮৫০
৪০	এস এ জি সেভার শ্রীহট্ট দর্পণ গ্রন্থমতে মিঃ মাজ	৩-১-১৮৫০	৭-৯-১৮৫৫
৪১	টি সি লারকিন (T. C. Larkin)	৭-৯-১৮৫৫	২২-১২-১৮৫৫
৪২	এফ এ গ্লোভার (F. A.Glover)		
	শ্রীহট্ট দর্পণে-গলবর	২২-১২-১৮৫৫	৪-১-১৮৫৬
৪৩	এ সি বার্ণাডর (A. C Barnered)	৪-১-১৮৫৬	২৮-১-১৮৫৬
৪৪	(পুনঃ) এফ এ গ্লোভার	২৮-১-১৮৫৬	১৬-১২-১৮৫৬
৪৫	(পুনঃ) টি সি লারকিন	১৬-১২-১৮৫৬	১১-৩-১৮৫৬
৪৬	আর ও হেউড (R. O. Heywoode)	১১-৩-১৮৫৬	৬-১২-১৮৫৭
৪৭	এইচ নেলসন (H. Nelson)	৬-১২-১৮৫৮	২৮-৪-১৮৫৯
৪৮	ডবলিউ জে লঙ্গমোর (W. J. Longmore)	২৮-৪-১৮৫৯	১০-১১-১৮৫৯
৪৯	পি এ হামফ্রে (P. A. Humphurey)	১০-১১-১৮৫৯	১৩-১২-১৮৫৯
৫০	টি ওয়ালটন (T. Walton)	১৩-১২-১৮৫৯	১-৩-১৯৬০
৫১	জি জি বেলফোর (G. G. Balfour)	১-৩-১৮৬০	১২-৬-১৮৬১
৫২	(পুনঃ) টি ওয়ালট	১২-৬-১৮৬১	২৪-৬-১৮৬১
৫৩	এসএফ ডেভিস (S. F. Davis)	২৪-৬-১৮৬১	২-১২-১৮৬১
৫৪	থিওডর স্মিথ (Theodore Simith Incharge)	২-১২-১৮৬১	১২-৩-১৮৬১
৫৫	এস এইচ সি টেলার (S. H. C Taylor)	১২-৩-১৮৬১	পাঠ উদ্ধার সম্ভব হয়নি
৫৬	এইচ বেবরীজ	২০-২-১৮৬৪	”
৫৭	জেমস সাদরলেও ড্রমণ্ড	৫-৩-১৮৬৪	”
৫৮	(পুনঃ) এইচ বেবরীজ (Incharge)	২০-৪-১৮৬৪	”
৫৯	(পুনঃ) জেমস সাদরলেও ড্রমণ্ড	১০-৫-১৮৬৪	”
	(James Sutherland Drummond)		
৬০	ডবলিও কেম্বল (W Kemble Incharge)	২৬-৩-১৮৬৫	”

৬১	(পুনশ্চ) টি ওয়ালটন	৩০-৫-১৮৬৫	"
৬২	(পুনঃ) কেম্বল সাহেব	৬-১-১৮৬৮	
৬৩	এফ ডব্লিউ ভি পিটার্সন (F. W. V. Peterson)	১৭-১০-১৮৬৮	"
৬৪	(পুনশ্চ) কেম্বল সাহেব	১৭-১২-১৮৬৮	"
৬৫	(পুনশ্চ) ড্রমণ্ড সাহেব	১-১-১৮৭০	"
৬৬	এইচ সি সাদারলেণ্ড (H. C Sutherland)	২৭-১০-১৮৭০	"
৬৭	এ এল ক্লে (A. L. Clay)	০-১০-১৮৭৪	"
৬৮	এ মেনসন (A. Manson)	৫-৪-১৮৭৭	"
৬৯	হেনরী লটমন জনসন (Henry Luthmon Jonshon)	২২-৪-১৮৭৮	৯-৫-১৮৮৫
৭০	জি ষ্টিভেনসন (G Stevenson)	১০-৫-১৮৮৫	১১-০-১৮৮৯
৭১	জে কেনেডী (G. Kenedy)	১৩-৬-১৮৮৯	"
৭২	এফ এল হেরালড (F. L. Herald)	১১-৩-১৮৯১	"
৭৩	ডবলিউ এইচ লী (W. H. Lee officiating)	২৪-১২-১৮৯১	১৭-৩-১৮৯২
৭৪	পি এইচ ওব্রায়েন (P H. O'Brien)	১৮-৩-১৮৯২	১৯-৭-১৮৯২
৭৫	(পুনঃ) লী সাহেব (Acting Officer)	২০-৭-১৮৯২	২৯-১০-১৮৯৩
৭৬	বি বি নিউবোলড (B B Newbold) (officiating)	২৯-১০-১৮৯৩	১৮-৮-১৮৯৪
৭৭	এফসি হেনিকার (F. C. Heniker) (officiating)	৭-৪-১৮৯৫	৩-১২-১৮৯৫
৭৮	(পুনঃ) ওব্রায়েন সাহেব	৪-১২-১৮৯২	৭-৭-১৮৯৬
৭৯	এল জে কার্শ	৮-৭-১৮৯৬	১-১১-১৮৯৬
৮০	(পুনঃ) ওব্রায়েন সাহেব	২-১১-১৮৯৬	২৩-১-১৮৯৮
৮১	টি ইমার্সন (officiating)	২৭-২-১৮৯৮	২৭-১১-১৮৯৮
৮২	এ পোর্টিয়স (A Portious)	২৮-১১-১৮৯৮	২৭-১১-১৯০০
৮৩	ডি এইচ লিজ (D. H. Lees)	৮-৯-১৯০০	১১-৮-১৯০২
৮৪	আব্দুল মজিদ (officiating)	১২-৮-১৯০২	২০-১০-১৯০২
৮৫	(পুনঃ) লিজ সাহেব	২১-১০-১৯০২	১-৭-১৯০৩
৮৬	জে সি আরবুথ নট	১-৮-১৯০৩	
৮৭	এইচ এল সেলকেন্ড (H. L. Salkeld)		
৮৮	(পুনঃ) আরবুথ নট সাহেব (J. C. Arbuthnott)		
৮৯	এস জি হার্ট সাহেব		
৯০	মিঃ কোহন সাহেব		
৯১	মিঃ হেজলেট সাহেব		

(বর্তমানে)

মন্তব্য-৭৬ সংখ্যক সাহেব কিছুদিন স্থায়ী হইয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট (ঝ)
(ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়)
আসামের
চিফ-কমিশনারদের নামাবলী

ক্রমানুযায়ী নাম	শাসনকাল
কর্ণেল আর এইচ কিটিঞ্জ (Cal. R. H. Keatinge)	১৮৭৪-১৮৭৮
সার ষ্টুয়ার্ট বেলি (Sir Steuart Bayley)	১৮৭৮-১৮৮১
মিঃ সি এ ইলিয়ট (পরে সার চার্লস) (C. A. Elliote)	১৮৮১-১৮৮৩
মিঃ ডবলিউ ই ওয়ার্ড (W. E. Ward)	১৮৮৫-১৮৮৭
মিঃ ডি ফিটজ পেট্রিক (পরে সার ডেনিস) (Fitzpatric)	১৮৮৭-১৮৮৯
মিঃ জে ওয়েষ্ট লেণ্ড (পরে সার জেমস) (J. Westland)	১৮৮৯-১৮৮৯
মিঃ জে ডবলিউ কুইন্টন (J. W. Quinton)	১৮৮৯-১৮৯১
বিগ্রেডিয়ার জেনারেল কলেট (Brigrediar general Collect)	১৮৯১-১৮৯১
(পুনঃ) ডবলিউ ই ওয়ার্ড (পরে সার উইলিয়াম)	১৮৯১-১৮৯৬
অনারেবল জে এস কটন (Hon. J. S. Cotton)	১৮৯৬-১৯০০
মিঃ জে বি ফুলার (J. B. Fuller)	১৯০০-১৯০০
(পুনঃ) অনারেবল জে এস কটন (পরে সার হেনরি)	১৮৯৬-১৯০২
(পুনঃ) জে বি ফুলার (পরে সার বোম্‌ফিল্ড)	১৯০২-১৯০৪
অনারেবল এল হেয়ার (Hon. L. Hare) (পরে সাব লেনসেট)+	১৯০৬-১৯০৮
সার চার্লস বেলি (Sir Charles Bayley)	১৯০৮
সার লেনসেট হেয়ার+	বর্ত্তমান

※ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে ইনি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট নিযুক্ত।
+ ইহারা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট।

পরিশিষ্ট (এ-১)
ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত-উপসংহার

হৈড়ম্বীর রাজবংশাবলী

আমাদের সংগৃহীত এই বংশাবলীতে প্রায় ১৮০ জন নরপতির নাম দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রকাশিত বংশাবলীসহ ইহার অনেক অনৈক্য লক্ষিত হয়। কাছারের রাজগণের উপাধি "নারায়ণ" ; কিন্তু নিম্নে প্রত্যেক নামের সহিত অনাবশ্যক বোধে উপাধি লিখিত হইল না।

১. ভীমসেন
২. ঘটোৎকচ
৩. মেঘবর্ণ
৪. মেঘবল্লভ
৫. মেঘসিংহ
৬. মেঘরিপুধ্বজ
৭. মেঘকান্তি
৮. মেঘদর্প
৯. মেঘসালী
১০. মেঘদ্যুতি
১১. মেঘকেতু
১২. দিব্যনারায়ণ
১৩. দৈবান্ধব
১৪. শিব
১৫. শিবনাথ
১৬. শিবকান্তি
১৭. নির্ভয়নারায়ণ
১৮. উদয়ভীম
১৯. উত্থানধ্বজ?
২০. উমানন্দ
২১. উদ্দানন্দ
২২. কার্ত্তিকচন্দ্র
২৩. উইন্দ
২৪. মুনীন্দ্র নারায়ণ
২৫. কেতু
২৬. ভীমকীর্ত্তি
২৭. ভীষ্মসেন
২৮. ভীষ্মপালক
২৯. শিবমোহন
৩০. বিশ্বম্ভর
৩১. বিনোদকেশব
৩২. কেন্দ্রবল
৩৩. বিতাল
৩৪. বিশ্বপ্রমোদ
৩৫. উনদ (?)
৩৬. উপেন্দ্র
৩৭. উদয় চন্দ্র
৩৮. কালী
৩৯. কুণ্ডল্য (?)
৪০. রুদ্রচন্দ্র
৪১. কান্তিলচন্দ্র (?)
৪২. শক্রজিৎ
৪৩. সুদর্শন
৪৪. সুধৈর্য্য
৪৫. সুশীতল
৪৬. প্যারীভদ্র
৪৭. ভাস্করধ্বজ
৪৮. ভানুচন্দ্র
৪৯. বেতাল
৫০. হিরণ্যনারায়ণ
৫১. মিরেন্দ্র
৫২. ইন্দুচন্দ্র
৫৩. হিমেশ্বর
৫৪. ভদ্রসেন
৫৫. সকন (?)
৫৬. ঈশান
৫৭. ঈশ্বর
৫৮. ইন্দি (ইন্দ? চন্দ্র)
৫৯. ইন্দসিংহ
৬০. গুণকীর্ত্তি
৬১. পীতকীর্ত্তি
৬২. উপেন্দ্রকীর্ত্তি
৬৩. নীল নারায়ণ
৬৪. পদ্মনাভ
৬৫. পদ্মলোচন
৬৬. পদ্মসেন
৬৭. পীতনারায়ণ
৬৮. ভূষণারায়ণ
৬৯. গুণচন্দ্র
৭০. সুরসেন
৭১. রিপুদর্প
৭২. বলভদ্র
৭৩. চন্দ্রশেখর
৭৪. মুকুটভঞ্জন
৭৫. স্কন্দসেন
৭৬. দিগীশচন্দ্র
৭৭. দিব্যচন্দ্র
৭৮. দীবন্ধু

৭৯. দিবেন্দু (?)
৮০. গোত্রনারায়ণ
৮১. গোপী
৮২. মহেশ্বর
৮৩. মহেন্দ্র
৮৪. মণ্ডল
৮৫ কুলভদ্র
৮৬. কুলির (?)
৮৭. ভানু
৮৮. কমল
৮৯. পঙ্ক
৯০. সজীব
৯১. জয়দ্রথ
৯২. শত্রু
৯৩. শত্রুজিৎ
৯৪. গাণ্ডীব
৯৫. ভূতেন্দ্র
৯৬. ভুবনচন্দ্র
৯৭. ব্রহ্মজিৎ
৯৮. বিশ্বজিৎ
৯৯. মণিজিৎ
১০০. ভানুজিৎ
১০১. মদনজিৎ
১০২. ইন্দ্রজিৎ
১০৩. শঙ্খজিৎ
১০৪. বিনোদ
১০৫. বিন্দুচন্দ্র
১০৬. বিশ্বাসচন্দ্রধ্বজ
১০৭. বিন্দুরেকধ্বজ
১০৮. কুটধ্বজ
১০৯. প্রতাপধ্বজ
১১০. বিধুধ্বজ
১১১. ইন্দ্রধ্বজ
১১২. ললিতধ্বজ
১১৩. সিংহপাল
১১৪. হৈমধ্বজ
১১৫. শিখণ্ডচন্দ্র
১১৬. কুমুদধ্বজ
১১৭. প্রমত্তধ্বজ
১১৮. উদিতচন্দ্র
১১৯. প্রভাকর
১২০. কর্পূরচন্দ্র
১২১. গিরীশচন্দ্র
১২২. গৌরচন্দ্র
১২৩. বীরচন্দ্র
১২৪. সুজিত চন্দ্র
১২৫. সুহাক চন্দ্র
১২৬. রণচন্দ্র
১২৭. রুদ্রচন্দ্র
১২৮. প্রকাশচন্দ্র
১২৯. প্রফুল্লচন্দ্র
১৩০. প্রদ্যুম্নচন্দ্র
১৩১. প্রকাণ্ডচন্দ্র
১৩২. বিক্রমচন্দ্র
১৩৩. বিপুলচন্দ্র
১৩৪. বিষ্ণুচন্দ্র
১৩৫. বিশ্বেশ্বর
১৩৬. আদিত্য
১৩৭. বীরচন্দ্র
১৩৮. পুণ্ডরীকর
১৩৯. ভূপাল
১৪০. প্রসেন
১৪১. পুরন্দর
১৪২. ত্রিলোচন
১৪৩. দ্বিবিধ
১৪৪. কার্ত্তিকচন্দ্র
১৪৫. নীলচন্দ্র
১৪৬. মকরন্দচন্দ্র
১৪৭. জনার্দ্দন
১৪৮. কেশবচন্দ্র
১৪৯. রণচন্দ্র (দ্বিতীয়)
১৫০. মানচন্দ্র
১৫১. বীরদর্প
১৫২. বীরভদ্র
১৫৩. বীরসিংহ
১৫৪. নীরসিহং
১৫৫. মেঘবল
১৫৬. উদয়চন্দ্র
১৫৭. বাহুবর
১৫৮. শ্যামচন্দ্র
১৫৯. ইন্দ্রবল
১৬০. বীরধ্বজ
১৬১. চন্দ্রধ্বজ
১৬২. মেঘধ্বজ
১৬৩. শিখিধ্বজ
১৬৪. উদয়াদিত্য
১৬৫. ময়ূরধ্বজ
১৬৬. গরুড়ধ্বজ
১৬৭. মকরধ্বজ
১৬৮. তাম্রধ্বজ
১৬৯. সুরদর্পনারায়ণ
১৭০. গম্ভীরসিংহধ্বজ
১৭১. হিমোদ্রিনারায়ণ
১৭২. গোপীচন্দ্র
১৭৩. তুলসীধ্বজ
১৭৪. ধর্ম্মধ্বজ
১৭৫. রামচন্দ্র
১৭৬. কার্ত্তিকচন্দ্র
১৭৭. হরিশচন্দ্র
১৭৮. লক্ষ্মীচন্দ্র
১৭৯. কৃষ্ণচন্দ্র
১৮০. গোবিন্দচন্দ্র

পরিশিষ্ট (এঃ-২)

ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত-উপসংহার

আসামের ইতিহাস প্রণেতা মিঃ গেইট সাহেব সংকলিত কাছাড়ের পতিগণের ক্রমানুযায়ী নাম ও শাসন সময়।

১. খুনকরা—১৫২০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন বলিয়া জানা যায়।

২. দেশাঙ্গ—১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয় বলিয়া জানা যায়।

৩. হেড়ম্বেশ্বর (উপাধিমাত্র)—১৫৭০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন বলিযা জানা যায়।

৪. শত্রুদমন বা প্রত্যপনারায়ণ—১৬১০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন বলিয়া জানা যায়।

৫. নরনারায়ণ (শত্রুদমনের পুত্র)

৬. ভীমদর্প বা ভীমবল—১৫২০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয় বলিয়া জানা যায়।

৭. বীরদর্প—১৬৪৪-১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন।

৮. গরুধ্বজ

৯. সকরধ্বজ —(ক্রমান্বয়ে রাজা হন)

১১. তাম্রধ্বজ—১৭০৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন এবং ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন বলিয়া জানা যায়।

১২. সুরদর্প—১৭০৮ খৃষ্টাব্দে সিংহারোহণ করেন।

১৩. হরিশচন্দ্র নারায়ণ—১৭২১ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন বলিয়া জানা যায়।

১৪. সন্ধিকারী (নাম নহে)—১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন বলিয়া জানা যায়।

১৫. হরিশচন্দ্র ভূপতি—১৭৭১ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন বলিয়া জানা যায়।

১৬. কৃষ্ণচন্দ্র—১৬৯০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন বলিয়া জানা যায়।
এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

১৭. গোবিন্দচন্দ্র—১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।